পরিমার্জিত সংস্করণ

# বয়ান ও খুতবা

## (২য় খণ্ড)

গ্রন্থনায়
**মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন**
সিনিয়র মুহাদ্দিস-জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম মাদানিয়া,
যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১১০০
গ্রন্থকার, "আহকামে যিন্দেগী", "ফাযায়েলে যিন্দেগী",
"ফিকহুন নিছা", "ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ"
ও "ইসলামী মনোবিজ্ঞান" প্রভৃতি।

প্রকাশনায়
মাকতাবাতুল আবরার
১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল: ০১৭১২-৩০৬৩৬৪
www.maktabatulabrar.com
www.facebook/maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



বয়ান ও খুতবা (২য় খণ্ড)

**গ্রন্থকার:**
মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন

**প্রথম প্রকাশ**
রবিউল আউয়াল ১৪২৬ হিজরী, এপ্রিল ২০০৫ ইংরেজি, ফাল্গুন ১৪১১ বাংলা

**দ্বিতীয় সংস্করণ**
মুহাররম, ১৪৩০ হিজরী, জানুয়ারী, ২০০৯ ইংরেজি, ফাল্গুন ১৪১৫ বাংলা

**তৃতীয় সংস্করণ**
জুমাদাল উলা ১৪৩৫ হিজরী, মার্চ ২০১৪ ইংরেজি, ফাল্গুন ১৪২০ বাংলা

**কপিরাইট রেজিষ্ট্রেশন সার্টিফিকেট নং- ১০৩৮৪**

**প্রকাশনায়:**
মাকতাবাতুল আবরার
ইসলামী টাওয়ার, দোকান নং ২২-২৩
১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

www.maktabatulabrar.com
www.facebook.com/MaktabatulAbrarOfficial

(সর্বস্বত্ব গ্রন্থকার কর্তৃক সংরক্ষিত)

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

# সূচীপত্র

বিষয়বস্তু — পৃষ্ঠা নং


❑ মজলিসে দাওয়াতুল হক, বাংলাদেশ-এর আমীর হযরত মাওলানা মাহমূদুল হাসান (দামাত বারাকাতুহুম)-এর কথা ..... ৫
❑ গ্রন্থকার- মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন-এর কথা (ভূমিকা) ..... ৬
* ১ নং বয়ান: ঈমান ও ঈমানী চেতনার গুরুত্ব ..... ৭
* ২ নং বয়ান: আল্লাহ্‌র যাত বা সত্তার প্রতি ঈমান প্রসঙ্গ ..... ১৬
* ৩ নং বয়ান: তাওহীদ বা আল্লাহ্‌র কোনো শরীক না থাকা প্রসঙ্গ ..... ২৪
* ৪ নং বয়ান: আল্লাহ্‌র সিফাত তথা গুণাবলীর প্রতি ঈমান প্রসঙ্গ (১ম পর্ব) ..... ৩২
* ৫ নং বয়ান: আল্লাহ্‌র সিফাত তথা গুণাবলীর প্রতি ঈমান প্রসঙ্গ (২য় পর্ব) ..... ৪০
* ৬ নং বয়ান: আল্লাহ্‌র সিফাত তথা গুণাবলীর প্রতি ঈমান প্রসঙ্গ (৩য় পর্ব) ..... ৪৮
* ৭ নং বয়ান: আল্লাহ্‌র ইবাদতে শরীক না থাকা প্রসঙ্গ ..... ৫৭
* ৮ নং বয়ান: নবী রসূলগণের প্রতি ঈমান প্রসঙ্গ (১ম পর্ব) ..... ৬৫
* ৯ নং বয়ান: নবী রসূলগণের প্রতি ঈমান প্রসঙ্গ (২য় পর্ব) ..... ৭৪
* ১০ নং বয়ান: কিতাবের প্রতি ঈমান প্রসঙ্গ ..... ৮২
* ১১ নং বয়ান: ফিরিশতাদের প্রতি ঈমান প্রসঙ্গ ..... ৯২
* ১২ নং বয়ান: পরকালের প্রতি ঈমান (১ম পর্ব- কবরের আযাব প্রসঙ্গ) ..... ১০১
* ১৩ নং বয়ান: পরকালের প্রতি ঈমান (২য় পর্ব- কিয়ামত ও কিয়ামতের আলামত প্রসঙ্গ). . ১০৯
* ১৪ নং বয়ান: পরকালের প্রতি ঈমান (৩য় পর্ব- হাশর, হিসাব ও হাউযে কাউছার প্রসঙ্গ). . ১১৭
* ১৫ নং বয়ান: পরকালের প্রতি ঈমান (৪র্থ পর্ব- আমলনামা, মীযান ও পুলসিরাত প্রসঙ্গ). . ১২৬
* ১৬ নং বয়ান: পরকালের প্রতি ঈমান (৫ম পর্ব- জান্নাত ও জাহান্নাম প্রসঙ্গ) ..... ১৩৫
* ১৭ নং বয়ান: তাকদীরের প্রতি ঈমান ..... ১৪৩
* ১৮ নং বয়ান: আসবাব বা বস্তুর ক্ষমতা প্রসঙ্গ ..... ১৫১
* ১৯ নং বয়ান: মাতা-পিতার জন্য সন্তানের করণীয় ..... ১৫৯
* ২০ নং বয়ান: সন্তানের জন্য পিতা-মাতার করণীয় (১ম পর্ব) ..... ১৬৮
* ২১ নং বয়ান: সন্তানের জন্য পিতা-মাতার করণীয় (২য় পর্ব) ..... ১৭৬
* ২২ নং বয়ান: সন্তানের জন্য পিতা-মাতার করণীয় (৩য় পর্ব) ..... ১৮৫
* ২৩ নং বয়ান: অধীনস্থদের জন্য গুরুজনদের করণীয় ..... ১৯৩
* ২৪ নং বয়ান: স্বামী-স্ত্রীর অধিকার (১ম পর্ব) ..... ২০২
* ২৫ নং বয়ান: স্বামী-স্ত্রীর অধিকার (২য় পর্ব) ..... ২১১
* ২৬ নং বয়ান: সুন্নাতের উপর আমল করার গুরুত্ব ও ফায়দা (১ম পর্ব) ..... ২২০
* ২৭ নং বয়ান: সুন্নাতের উপর আমল করার গুরুত্ব ও ফায়দা (২য় পর্ব) ..... ২২৯
* ২৮ নং বয়ান: ৩টি বিশেষ সুন্নাতের আমল ..... ২৩৬


Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.




* ২৯ নং বয়ান: ৫টি বিশেষ নেক আমল প্রসঙ্গ ..... ২৪৬
* ৩০ নং বয়ান: ৬টা বিশেষ গোনাহ প্রসঙ্গ ..... ২৫৫
* ৩১ নং বয়ান: শবে বরাতের বয়ান ..... ২৬৪
* ৩২ নং বয়ান: (শবে বরাতের পরের জুমুআর বয়ান) জীবন গড়ার মূলনীতি ..... ২৭৩
* ৩৩ নং বয়ান: (রমজানের পূর্বের জুমুআর বয়ান) রমজানের প্রস্তুতি প্রসঙ্গ ..... ৩২১
❑ রমযানের ৩০ বয়ান ..... ২৮৩
❑ রমযান মাসের জুমুআসমূহের বয়ান (১ম খণ্ড দ্রষ্টব্য)
* ৩৪ নং বয়ান: ইসলাহে বাতেনের প্রয়োজনীয়তা ..... ৩২৯
* ৩৫ নং বয়ান: ইসলাহে বাতেনের তরীকা (১ম পর্ব) ..... ৩৩৮
* ৩৬ নং বয়ান: ইসলাহে বাতেনের তরীকা (২য় পর্ব) ..... ৩৪৭
❑ শবে কদর (কদরের রাত)-এর বয়ান (রমযানের ৩০ বয়ানের মধ্যে ২৭ নং বয়ান দ্রষ্টব্য)
❑ ঈদুল ফিত্‌রের বয়ান (১ম খণ্ড দ্রষ্টব্য)
* ৩৭ নং বয়ান: তাকাব্বুর বা অহংকার প্রসঙ্গ ..... ৩৫৬
* ৩৮ নং বয়ান: তাওয়াযু বা বিনয় প্রসঙ্গ ..... ৩৬৪
* ৩৯ নং বয়ান: হিংসা বা পরশ্রীকাতরতা প্রসঙ্গ ..... ৩৭২
* ৪০ নং বয়ান: গীবত: একটি মারাত্মক গোনাহ ..... ৩৮০
* ৪১ নং বয়ান: দুনিয়ার মহব্বত প্রসঙ্গ ..... ৩৮৮
* ৪২ নং বয়ান: ক্রোধ বা রাগ প্রসঙ্গ ..... ৩৯৬
* ৪৩ নং বয়ান: গোনাহের প্রতি আকর্ষণ ..... ৪০৬
* ৪৪ নং বয়ান: মিথ্যা, ওয়াদা খেলাফী ও খেয়ানত প্রসঙ্গ (১ম পর্ব) ..... ৪১৫
* ৪৫ নং বয়ান: মিথ্যা, ওয়াদা খেলাফী ও খেয়ানত প্রসঙ্গ (২য় পর্ব) ..... ৪২৪
* ৪৬ নং বয়ান: নেকী অর্জন করার সহজ পদ্ধতি ..... ৪৩২
❑ ঈদুল আয্‌হার বয়ান (১ম খণ্ড দ্রষ্টব্য)
* ৪৭ নং বয়ান: আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক জোড়ার সহজ উপায় (১ম পর্ব) ..... ৪৪১
* ৪৮ নং বয়ান: নেয়ামতের শোকর প্রসঙ্গ ..... ৪৫১
* ৪৯ নং বয়ান: সময়ের গুরুত্ব প্রসঙ্গ ..... ৪৬০
* ৫০ নং বয়ান: ইল্‌ম ও তাসহীহে নিয়ত প্রসঙ্গ ..... ৪৭০
* সমস্ত জুমুআর জন্য ছানী খুতবা ..... ৪৭৯


www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

## মজলিসে দাওয়াতুল হক বাংলাদেশ-এর আমীর হযরত মাওলানা মাহমূদুল হাসান (দামাত বারাকাতুহুম)-এর কথা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ!

ইসলামের পূর্ণ আনুগত্যের মাধ্যমে সমাজের সংশোধন বা ইসলাহ হতে পারে। এই সমাজ সংশোধনের বিশেষ প্রয়োজনকে সামনে রেখেই "বয়ান ও খুতবা" নামক গ্রন্থখানি রচনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। কেননা ইসলামের পূর্ণ আনুগত্য করার জন্য প্রয়োজন ইসলামের পূর্ণ জ্ঞান থাকা। ইসলামী জীবনবিধান এবং ইসলামী হুকুম-আহকামের ব্যাপক জ্ঞান ব্যতীত ঈমান ও ইসলামের ছাঁচে নিজেকে ঢেলে সাজানো সম্ভব নয়। সেই সাথে প্রয়োজন সমসাময়িক আধুনিক যুগ-জিজ্ঞাসার সঠিক উত্তর জানা থাকার। এর জন্য প্রয়োজন ব্যাপক জ্ঞান চর্চার। কিন্তু একথা সর্বজনস্বীকৃত যে, আমাদের সমাজে সাধারণ মানুষের মধ্যে কিতাবাদি পাঠ করে বা উলামায়ে কেরামের নিয়মিত ছাত্র হয়ে প্রয়োজনীয় ইসলামী শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জন করার লোকের সংখ্যা খুবই নগণ্য। আমাদের সমাজে সাধারণ মানুষ দ্বীনী কথা-বার্তা যা শুনে বা শেখে তার অনেকটাই মসজিদ থেকে শুনে বা শেখে। জুমুআ, ঈদ ইত্যাদি অনুষ্ঠানে ইমাম সাহেবগণ মসজিদে যে বয়ান পেশ করেন তা থেকেই তারা দ্বীনী জ্ঞান অর্জন করে থাকেন। কোন কোন মসজিদে অবশ্য ইমাম সাহেবগণ কুরআনে কারীমের তাফসীরের মাধ্যমেও জ্ঞান শিক্ষার সুযোগ বিস্তৃত করে চলেছেন। তবে সেখানে সাধারণ জনগণের উপস্থিতি আরও বেশি হওয়া কাম্য। এ হিসাবে আমাদের সমাজে মসজিদ হল সাধারণ মানুষের জন্য দ্বীনী জ্ঞান অর্জনের একটি অন্যতম মারকাজ। আইম্মা হযারাতের বয়ানের আলোকেই মুসল্লিদের ধ্যান-ধারণা এবং তাদের মন-মানসিকতা গড়ে উঠছে। আইম্মা হযারাত যেমন দ্বীনী রূহানী খোরাক দিচ্ছেন, তাঁদের মুসল্লিদের দ্বীনী রূহানী শাস্থ্য সেভাবেই গড়ে উঠছে।

এই পরিবেশ ও পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে ইমাম সাহেবগণ গোটা সমাজকে পূর্ণাঙ্গ দ্বীনী মেজাযে গড়ে তুলতে পারেন, গোটা সমাজকে পূর্ণ দ্বীনী ছাঁচে ঢেলে সাজাতে পারেন। এর জন্য তাদের বয়ান ও বক্তব্যকে সেভাবে ঢেলে সাজাতে হবে। তাদের বয়ান বক্তব্যে ইসলামের যাবতীয় বিষয়ে দিকনির্দেশনা থাকতে হবে, জীবন জগত সম্পর্কে সব জিজ্ঞাসার জবাব থাকতে হবে। যাতে করে মানুষ তাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামের দেয়া পূর্ণাঙ্গ দিক নির্দেশনা সম্পর্কে অবগত হয়ে তাদের পূর্ণ জীবন ইসলামের আলোকে ঢেলে সাজাতে পারে। এবং একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, শুধু বয়ান ও বক্তব্য দ্বারাই সহীহ আমল গড়ে ওঠে না। রসূল (সা.) বয়ান ও তা'লীমের সাথে সাথে প্রত্যেকটা আমলের বাস্তব প্রশিক্ষণও দিতেন। তাই বয়ান ও বক্তব্যের সাথে সাথে মুসল্লীদেরকে আমলের বাস্তব প্রশিক্ষণও দিতে হবে। ইমাম সাহেবদের বয়ান ও ওয়াজের সহযোগিতার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ইতিপূর্বে "বয়ান ও খুতবা" নামক গ্রন্থখানির ১ম খণ্ড প্রকাশ করা হয়েছিল। এখন তার ২য় খণ্ড প্রকাশ করা হল। ভবিষ্যতে ৩য় খণ্ড প্রকাশেরও আশা রইল। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাওফীক দান করুন এবং আমাদের সকলের মেহনতকে কবুল করুন। আমীন!

**মাহমূদুল হাসান**
আমীর, মজলিসে দাওয়াতুল হক বাংলাদেশ।
মুহ্তামিম ও শায়খুল হাদীছ, জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম মাদানিয়া
যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২৩৬

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



## ভূমিকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ!

ইল্‌ম বা দ্বীনী জ্ঞান হচ্ছে আমলের বুনিয়াদ। সহীহ ইল্‌ম ছাড়া সহীহ আমল সম্ভব নয়। এজন্য ইল্‌ম শিক্ষা করাকে ফরয করে দেয়া হয়েছে। একজন মানুষের সারা জীবনের সবকিছু– নামায, রোযা, ধনী হলে হজ্জ, যাকাত, কুরবানীসহ উঠা-বসা, চলা-ফেরা, আহার-নিদ্রা, শয়ন-স্বপ্ন ইত্যাদি যা কিছু তার জীবনের অংশ এই সবকিছুর মাসআলা-মাসায়েল ও তরীকা শিক্ষা করা জরুরী। মানুষ এই শিক্ষা অর্জন করতে পারে দ্বীনী কিতাবাদি পাঠ করে কিংবা উস্তাদ এবং ওয়ায়েজ ও মুবাল্লিগগণের মুখে শুনে। তবে আমাদের সমাজে সাধারণ মানুষের মধ্যে কিতাবাদি পাঠ করে বা ওয়াজের মজলিসে নিয়ে ওয়াজ শুনে শিক্ষা অর্জন করার লোকের সংখ্যা পর্যাপ্ত নয়। আমাদের সমাজে সাধারণ মানুষ দ্বীনী কথা-বার্তা যা শুনে বা শেখে তা প্রায়শঃই মসজিদ থেকেই শুনে বা শেখে। জুমুআ, ঈদ ইত্যাদি অনুষ্ঠানে ইমামগণ মসজিদে যে বয়ান পেশ করেন তা থেকেই তারা দ্বীনীজ্ঞান অর্জন করে থাকে। এ হিসাবে আমাদের সমাজে মসজিদ হল সাধারণ মানুষের জন্য দ্বীনী জ্ঞান অর্জনের অন্যতম মারকাজ।

এই পরিবেশ ও পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে ইমাম সাহেবগণ গোটা সমাজকে পূর্ণাঙ্গ দ্বীনী মেজাযে গড়ে তুলতে পারেন, গোটা সমাজকে পূর্ণ দ্বীনী ছাঁচে ঢেলে সাজাতে পারেন। আইম্মায়ে কেরাম হলেন সমাজ সংস্কারকের আসনে সমাসীন। তাঁরা পারেন গোটা সমাজের সংস্কার সাধন করতে। এর জন্য প্রয়োজন তাদের বয়ান ও বক্তব্যকে সেভাবে ঢেলে সাজানো। তাদের বয়ান বক্তব্যে ঈমান-আকীদা, ইবাদত-বন্দেগী, মু'আমালা, মু'আশারা, আমল-আখলাক ইত্যাদি জীবনের সব দিকের দিকনির্দেশনা থাকতে হবে। এরূপ দিকনির্দেশনা সম্বলিত বয়ানসমূহের সমন্বয়ে "বয়ান ও খুতবা" নামক এ গ্রন্থখানি রচনা করা হয়েছে। প্রত্যেকটি বয়ানের সাথে রয়েছে এক একটি আরবী খুতবা, যেটি পাঠ করা যেতে পারবে। ওয়ায়েজ ও মুবাল্লিগগণও এ গ্রন্থ থেকে সহযোগিতা নিতে পারবেন। দ্বীনী জ্ঞান ও উপদেশ অর্জনের উদ্দেশ্যে সর্বস্তরের সাধারণ মানুষের জন্যও গ্রন্থখানি পাঠ উপকারী হবে ইন্‌শাআল্লাহ।

বয়ান ও খুতবার ১ম খণ্ড ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। এখন ২য় খণ্ড পেশ করা হল। ১ম খণ্ডে মানুষের ঈমান-আমলের জন্য মানসিকতা গঠনের সহযোগী বিষয়বস্তু এবং ইবাদত সম্পর্কিত বয়ান সন্নিবেশিত হয়েছিল। ২য় খণ্ডে ঈমান, মুআশারা ও আখলাক বা তাসাওউফ বিষয়ক বিষয়ভিত্তিক বয়ান পেশ করা হল। জীবনের অন্যান্য অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়াদি সম্বলিত বয়ানের সমন্বয়ে ৩য় খণ্ড পেশ করা হবে ইনশাআল্লাহ। সবগুলো খণ্ড সামনে এসে গেলে একজন ইমাম, মুবাল্লিগ ও বক্তা জীবনের গুরুত্বপূর্ণ যে কোনো সাইড নিয়ে আলোচনা করতে এ গ্রন্থের সহযোগিতা নিতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তায়ালা তাওফীক দান করুন, এই গ্রন্থখানি দ্বারা সমাজের সংস্কার সাধন করুন এবং এই পাপী গ্রন্থকারের জন্য এটিকে নাজাতের ওছীলা করুন। আমীন!

বিনীত
**মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন**

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বয়ান নং-১

## ঈমান ও ঈমানী চেতনার গুরুত্ব

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَآءً حَتّٰٓى اِذَا جَآءَهٗ لَمْ يَجِدْهُ شَيْـًٔا. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهٗ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ اَتْبَعَ نَفْسَهٗ هَوَاهَا وَتَمَنّٰى عَلَى اللّٰهِ.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

আল্লাহ পাক আমাদেরকে যত দায়িত্ব দিয়েছেন, অল্প কথায় বলা যায় তা হল দুই ধরনের। ঈমানের দায়িত্ব এবং আমলের দায়িত্ব। এর মধ্যে ঈমান হচ্ছে প্রথম পর্যায়ের দায়িত্ব। কারণ ঈমান হল সমস্ত আমলের বুনিয়াদ। যার ঈমান সহীহ নয় তার আমল গ্রহণযোগ্য হয় না। সহীহ ঈমান না থাকলে আমলের ছওয়াব পাওয়া যায় না। রূহ ছাড়া অর্থাৎ, প্রাণ ছাড়া দেহ যেমন, ঈমান ছাড়া আমলও সেরকম। ঈমানহীন আমল হল প্রাণহীন দেহের মত। কারও যদি রূহ না থাকে, তাহলে আমরা বলি লোকটা নেই, চলে গেছে। যদিও তার দেহ পড়ে থাকে, তবুও আমরা বলি লোকটা নেই চলে গেছে। কারণ তার আসল জিনিস রূহ চলে গেছে। তাই দেহের কোনো ধর্তব্য থাকেনি। এমনিভাবে ঈমান না থাকলে আমল রূহছাড়া হয়ে যাওয়ার কারণে তারও কোন ধর্তব্য থাকে না। আল্লাহ রব্বুল আলামীন কুরআনে কারীমে বলেছেন,

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَآءً حَتّٰٓى اِذَا جَآءَهٗ لَمْ يَجِدْهُ شَيْـًٔا. (النور: ٣٩)

অর্থাৎ, যারা কাফের, যাদের ঈমান ঠিক নেই, তাদের আমল হল মরুভূমির মরিচিকার মত।

মরুভূমির ভিতরে দূরের থেকে মনে হয় ঐযে অনেক পানি দেখা যায়, কিন্তু নিকটে গেলে দেখা যায় পানির কোনো নাম-নিশানা নেই। অর্থাৎ, দূরের থেকে মনে হয় অনেক কিছু, কিন্তু আসলে কিছুই নয়। যাদের ঈমান নেই, তাদের আমলও অনুরূপ– মনে হবে অনেক আমল করছে, কিন্তু আসলে কিছুই হচ্ছে না। আসল সময়ে অর্থাৎ পরকালে দেখা যাবে আমলের কিছুই নেই। তাই ঈমান দুরস্ত করা মানুষের বুনিয়াদী ফরয। এজন্যই বলা হয়, اَوَّلُ الْفَرَائِضِ اَلْاِيْمَانُ অর্থাৎ, সর্বপ্রথম ও বুনিয়াদী ফরয হল ঈমান দুরস্ত করা। ঈমানী চেতনা সৃষ্টি করা।

ঈমানের বিষয়ে আলোচনার পূর্বে কয়েকটা কথা মনে রেখে নিতে হবে। এক নম্বর কথা আমরা দুনিয়াতে সব জিনিসকে যেভাবে বিচার-বিবেচনা করি, ঈমানের বিষয়গুলোকে সেভাবে বিচার করা যাবে না। আমরা দুনিয়াতে বিশেষ করে এই বিংশ একবিংশ শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিকভাবে সবকিছুকে বিচার করতে চাই, অর্থাৎ না দেখে শুধু শুনে কোনো কিছু বিশ্বাস করতে চাই না। আমাদের অনেকের এই মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে যে, চাক্ষুস দেখব, হাতে নাতে প্রমাণিত হবে, তারপর বিশ্বাস করব। কিন্তু ঈমানের বিষয়গুলো এর সম্পূর্ণ বিপরীত, না দেখে বিশ্বাস করতে হবে। কুরআনে কারীমের সর্বপ্রথম সূরা হল সূরায়ে বাকারা। যদিও প্রথমেই সূরা ফাতিহা আছে। তবে ফাতিহা অর্থ হল ভূমিকা। সূরা

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



ফাতিহা হল কুরআনের ভূমিকা। এরপর প্রথম সূরা হল সূরা বাকারা। এই সূরা বাকারার শুরুর দিকেই ঈমান সম্পর্কে বলা হয়েছে,

اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ.

অর্থাৎ, যারা না দেখে ঈমান আনে, না দেখে বিশ্বাস করে।

এখানে না দেখে ঈমান-বিশ্বাস আনতে বলা হয়েছে। ঈমানের সব বিষয়ই এরকম যে, না দেখে বিশ্বাস রাখতে হয়। যেমন আল্লাহর অস্তিত্ব না দেখে বিশ্বাস করতে হবে। জান্নাত-জাহান্নাম না দেখে তার প্রতি ঈমান আনতে হবে। ফিরিশতা, লওহ, কলম, আরশ, কুরসী, মীযান, পুলসিরাত ইত্যাদি ঈমান সম্পর্কিত সববিষয়ই না দেখে বিশ্বাস করতে হয়। আমরা এগুলো দেখিনি, না দেখেই বিশ্বাস করি। যদিও কেউ দেখেনি একথা নয়, রাসূল (সা.) তো দেখেছেন। যতগুলো বিষয়ের প্রতি আমরা ঈমান আনি, মে'রাজে রসূল (সা.) কে তার প্রায় সবগুলোই দেখানো হয়েছে। আমরা সাধারণ মানুষ না দেখলেও রসূল (সা.)কে দেখানো হয়েছে। যাতে একথা কেউ বলতে না পারে যে, মুসলমানরা কেউ এসব বিষয় দেখেনি, তবুও তারা এগুলো বিশ্বাস করে, মুসলমানরা অন্ধবিশ্বাসী। একথা যেন কেউ বলতে না পারে। তাই আমাদের মধ্যে একজনকে এসব বিষয় দেখানো হয়েছে। এমন একজনকে দেখানো হয়েছে, যিনি দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বিশ্বাসী ব্যক্তি, সবচেয়ে বড় সত্যবাদী ব্যক্তি। আমরা লক্ষ মানুষ দেখলে যে বিশ্বাসযোগ্যতা সৃষ্টি হত, আমরা কোটি মানুষ দেখলে যে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন হত, এক রসূল (সা.)-এর দেখার দ্বারা তার চেয়ে বেশি বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জিত হয়েছে। আমরা লক্ষ-কোটি মানুষ একজোট হয়ে মিথ্যা বলতে পারি, কিন্তু রসূল (সা.) কখনো মিথ্যা বলতে পারেন না। সেই যুগের কট্টর কাফেররা পর্যন্ত রসূল (সা.)কে অনেক কিছু বলেছে, কিন্তু মিথ্যুক বলতে পারেনি। আপন-পর, শত্রু-বন্ধু নির্বিশেষে সকলেই তাঁকে আল-আমীন বা সত্যবাদী ও বিশ্বাসী বলে স্বীকার করত। এরকম ব্যক্তিকে ঈমানের সাথে সংশ্লিষ্ট সবকিছু চাক্ষুসভাবে দেখানো হয়েছে, যাতে আমরা এগুলো না দেখে বিশ্বাস করলেও কোনো সন্দেহ না থাকে। কেউ যেন মনে করতে না পারে যে, এগুলো অন্ধবিশ্বাস।

দুই নম্বর কথা হল আমরা সবকিছুকে যুক্তি দিয়ে বুঝতে চাই। কিন্তু ঈমানের ক্ষেত্রে এই নীতিতে আসা যাবে না। ঈমানের বিষয়গুলো যুক্তিতে না ধরলেও বিশ্বাস করতে হবে। কুরআন-হাদীছে বলা হয়েছে, ইসলাম বলেছে তাই বিশ্বাস করতে হবে। যুক্তির ভিত্তিতে বিশ্বাস নয়, বরং কুরআন-হাদীছে এসেছে তাই বিশ্বাস করতে হবে। যুক্তিতে ধরলেও বিশ্বাস করতে হবে, যুক্তিতে না ধরলেও বিশ্বাস করতে হবে। কুরআন-হাদীছে এমন অনেক বিষয় বলা হয়েছে যা যুক্তিতে নাও ধরতে পারে, তবুও বিশ্বাস করতে হবে। যেমন– কুরআন শরীফে আল্লাহ পাক বলেছেন,

وَ لَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ.

অর্থাৎ, মানুষ যদি ঈমান আনে, তারা যদি পরহেযগার হয়, তাহলে আমি তাদের ওপর বরকতের দুয়ার খুলে দিব, আসমান থেকেও বরকত দান করব, যমীন থেকেও বরকত দান করব। (আরাফ: ৯৬)

আসমান থেকে আল্লাহর রহমত আসতে থাকবে, ফিরিশতাদের মাধ্যমে সাহায্য আসতে থাকবে, যমীনের ফসলে বরকত হতে থাকবে। এখানে চিন্তার বিষয় হল ঈমান আনলে ফসল বেশি হবে কেন? বরকত হবে কেন? এ বিষয়টি যুক্তিতে নাও ধরতে পারে, তবুও বিশ্বাস করতে হবে। ঈমান

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

ও পরহেযগারী থাকলে আল্লাহর সাহায্য আসবে; ফিরিশতাদের মাধ্যমে সাহায্য আসবে। এভাবে মুসলমানরা জনবল এবং অস্ত্রবলে খাটো থাকলেও শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হতে পারবে। এ বিষয়টিও যুক্তিতে না ধরতে পারে, তবুও বিশ্বাস করতে হবে। যুক্তি বলে যাদের অস্ত্রবল বেশি, যাদের সৈন্যবল বেশি, তারা যুদ্ধে জয়লাভ করবে। কিন্তু ইসলামের প্রথম যুগে অনেকগুলো যুদ্ধে এবং পরবর্তীতেও বহু যুদ্ধে দেখানো হয়েছে যে, মুসলমানদের জনসংখ্যাও কম, অস্ত্রবলও কম, তারপরও তারা বিজয়ী হয়েছেন। ঈমান এবং পরহেযগারীর কারণে আসমানী সাহায্য আসার ফলেই এমন হয়েছে। ইসলামের সর্বপ্রথম যুদ্ধ হল বদরের যুদ্ধ। মুসলমানরা ছিলেন ৩১৩ জন, কাফেররা ছিল প্রায় এক হাজার। কাফেরদের সব সৈন্যের ছিল ঘোড়া, তারা ছিল অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। আর মুসলমানদের ঘোড়া ছিল মাত্র একটা, তলোয়ার ছিল মাত্র দুটো। আর ছিল কতকগুলো লাঠি-সোঁটা। এ নিয়ে তাঁরা যুদ্ধ করেছেন। আল্লাহ পাক তাঁদেরকে জয়ী করে দিয়েছেন। এখানে যুক্তিতে ধরে না যে, তাঁরা জয়ী হবেন। মুনাফিক ধরনের কিছু লোক বলেছিল যে, আজ মুসলমানরা শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ পাক তাদের শেষ করেননি। যুদ্ধের ময়দানে রসূল (সা.) ঘোষণা দিয়েছিলেন যা কুরআন শরীফে উল্লেখিত হয়েছে,

بَلٰى اِنْ تَصْبِرُوْا وَ تَتَّقُوْا وَ يَاْتُوْكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ.

অর্থাৎ, তোমরা যদি সবর কর, যুদ্ধের ময়দানে অটল থাক, এবং পরহেযগারী অবলম্বন কর, আর কাফেররা এই মুহূর্তে তোমাদের ওপর আক্রমণ করে বসে, তাহলে তোমাদের প্রতিপালক পাঁচ হাজার চিহ্নিত ফিরিশতা দিয়ে তোমাদেরকে সাহায্য করবেন। (সূরা আলে ইমরান: ১২৫)

বাস্তবেও ফিরিশতাদেরকে দিয়ে মুসলমানদের সাহায্য করা হয়েছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), হযরত সাহ্‌ল ইবনে হুনাইফ (রা.) প্রমুখ সাহাবীগণ বদরের যুদ্ধে ফিরিশতাদের যুদ্ধ করতে দেখার চাক্ষুস ঘটনা বয়ান করেছেন। মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে– হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, আমি দেখলাম একজন আনসারী সাহাবী একজন মুশরিককে হত্যা করার জন্য অগ্রসর হয়েছেন, এরই মধ্যে উপর থেকে ছড়ি ও সওয়ারীর আওয়াজ শোনা গেল– اقدم حيزوم اقدم حيزوم অর্থাৎ, হাইযূম আগে বাড়, হাইযূম আগে বাড়। ব্যস দেখা গেল সেই মুশরিক চিৎ হয়ে পড়ে গেছে এবং নাক মুখ আঘাতের কারণে নীল হয়ে গেছে। এটা ছিল হযরত জিব্রাইল (আ.)-এর আওয়াজ। হযরত জিব্রাঈল (আ.) যে বাহনে চড়তেন সেই বাহনের নাম ছিল হাইযূম। আল্লামা যুরকানী বয়ান করেছেন– হযরত সাহ্‌ল ইবনে হুনাইফ (রা.) বলেন, বদরের দিন আমরা দেখেছি– আমাদের কেউ কোন মুশরিকের দিকে ইংগিত করেছে, আর তার ওপর তলোয়ার চালানোর আগেই দেখা গেছে তার কল্লা কেটে পড়ে গেছে, এভাবে বদরের যুদ্ধে নিরস্ত্র মুসলমানদেরকে আল্লাহ পাক সশস্ত্রবাহিনীর বিরুদ্ধে বিজয়ী করেছেন। এটা যুক্তিতে ধরে না। কিন্তু আল্লাহ পাক যখন কাউকে জয়ী করতে চান সে নিরস্ত্র হলেও তাকে জয়ী করতে পারেন। সৈন্যসংখ্যা কম হলেও তাদেরকে তিনি জয়ী করতে পারেন। আর যদি আল্লাহ না চান তাহলে সৈন্যসংখ্যা বেশি হলেও তারা জয়ী হতে পারে না। হুনাইনের যুদ্ধে মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা ছিল বেশি। যদিও কাফেরদের চেয়ে কম ছিল। মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা ছিল ১২ হাজার, কাফেরদের ছিল ২০ হাজার। তবে অন্যান্য যুদ্ধে মুসলমানদের সংখ্যা খুব বেশি কম থাকত, এ যুদ্ধে সেই তুলনায় বেশি ছিল। এ কারণে মুসলমানদের কেউ কেউ এরকম বলেছিলেন,

لَنْ نَغْلِبَ الْيَوْمَ مِنْ قِلَّةٍ. (البخاري باب قول الله تعالى :يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



অর্থাৎ, আজ আমরা সৈন্যসংখ্যা কম হওয়ার কারণে পরাজিত হব না। কারণ আজ আমাদের সৈন্যসংখ্যা বেশি।

আল্লাহ পাক এ যুদ্ধে প্রথম দিকে মুসলমানদেরকে পরাজিত করে দেন। যুদ্ধের ময়দান থেকে মুসলমান সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে চতুর্দিকে ভেগে যায়। রসূল (সা.) এবং তাঁর সাথে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন সাহাবী টিকে থাকেন। অবশিষ্ট সকলে ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করেন। আল্লাহ পাক এই প্রসঙ্গে আয়াত নাযিল করেছেন,

وَّ يَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْـًٔا وَّ ضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُّدْبِرِيْنَ. (সূরা তাওবাহ: ২৫)

অর্থাৎ, হুনাইনের যুদ্ধের কথা স্মরণ কর। যখন তোমাদের সৈন্যসংখ্যা বেশি হওয়ার কারণে তোমাদের মধ্যে বড়ায়ী এসে গিয়েছিল যে, আজ আমাদের সৈন্যসংখ্যা অনেক, তোমাদের কথায় সৈন্যসংখ্যার ওপর ভরসা প্রকাশ পেয়েছিল। আল্লাহ পাক তোমাদের সামনে দুনিয়া সংকুচিত করে দিয়েছিলেন। ফলে তোমাদের অবস্থা এমন হয়েছিল যেন পালানোরও কোনো স্থান নেই।

পরে সাহাবায়ে কেরাম নিজেদের ভুল বুঝতে পারেন যে, সৈন্যসংখ্যা নিয়ে অহংকার করা আমাদের ঠিক হয়নি। তারপর অবস্থা দুরস্ত হয়। রসূল (সা.)-এর পক্ষ থেকে হযরত আব্বাস (রা.) জোর আওয়াজে ডাক দিয়েছিলেন হে মুসলমানরা! আল্লাহর নবী যুদ্ধের ময়দানে, তোমরা কোথায়? আওয়াজ শুনে চতুর্দিক থেকে মুসলমানগণ আবার ময়দানে সমবেত হন। অবশেষে আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে জয়ী করে দেন। এ ঘটনায় দেখানো হয়েছে যে, জয়-পরাজয় সৈন্যসংখ্যা কম বা বেশি থাকার ভিত্তিতে হয় না। সৈন্যসংখ্যা বেশি থাকলেই বিজয় আসে না। বরং বিজয় আসে আল্লাহর নুসরত তথা আল্লাহর সাহায্যের ভিত্তিতে। ইসলামের প্রথমদিকে অনেক যুদ্ধে মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা কম ছিল, তা সত্ত্বেও আল্লাহ পাক তাদেরকে জয়ী করে দিয়েছেন। মু'তার যুদ্ধে মুসলমানরা ছিল মাত্র তিন হাজার। কাফেররা ছিল এক লক্ষ। তারা ছিল রোমান সৈন্য। রোমান সাম্রাজ্য ছিল তখনকার যুগে সবচেয়ে বড় পরাশক্তি। এই পরাশক্তির এক লক্ষ সৈন্যও তিন হাজার মুসলমানের সংগে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে যায়। আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে জয়ী করে দেন। যুদ্ধের ময়দানে অটল থাকলে পরহেযগারী অবলম্বন করলে বিজয় আসবে– একথা বারবার প্রমাণিত করা হয়। আল্লাহ তা'আলা ফিরিশতাদেরকে দিয়ে সাহায্য করে তাদেরকে বিজয়ী করেন। আল্লাহ পাক ঐ তীর-তলোয়ারের যুগে যেমন সাহায্য করেছিলেন এই পারমাণবিক যুগেও তেমনি সাহায্য করতে পারেন। ঐ খোদা আছেন, ঐ ফিরিশতা আছে। দুনিয়ার সমস্ত শক্তি মিলেও একজন ফিরিশতার মোকাবিলা করতে পারে না। একজন ফিরিশতার গায়ে এত শক্তি আছে, সারা দুনিয়াকে সে শেষ করে দিতে পারে। প্রশ্ন হতে পারে– তাহলে বদরের যুদ্ধে তিন হাজার ফিরিশতা পাঠানোর প্রয়োজন কী ছিল। একজন পাঠালেই তো হত? এটা হল মুসলমানদের মানসিক দুর্বলতা দূর করার জন্য। তারা যেন মনে শক্তি পায় যে, আমাদের সঙ্গে অনেক সংখ্যক ফিরিশতা আছেন। মানুষ সংখ্যায় বিশ্বাসী, মানুষ তো বস্তুতে বিশ্বাসী। তাই মানুষের মনকে মজবুত করার জন্য ফিরিশতাদের সংখ্যা বেশি রাখা হয়েছে। নতুবা আল্লাহর সাহায্য করতে বেশি ফিরিশতার দরকার হয় না। এমনকি একজন ফিরিশতারও দরকার হয় না। আল্লাহ পাকের অবস্থা হল– কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

إِنَّمَآ أَمْرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيْـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা যখন কোন বিষয় করার বা ঘটানোর ইচ্ছে করেন, তখন শুধু বলেন, হয়ে যা, ব্যস সাথে সাথে সেটা হয়ে যায়। (সূরা ইয়াছীন: ৮২)

যে কথা বলা হচ্ছিল ঈমানের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে ঈমানের বিষয়গুলো যুক্তির উর্ধের বিষয়। আমরা যুক্তিতে ধরলে বিশ্বাস করতে চাই নতুবা বিশ্বাস করতে চাই না। কিন্তু ঈমানের বিষয়গুলো হল এমন যা যুক্তিতে ধরলেও বিশ্বাস করতে হবে, যুক্তিতে না ধরলেও বিশ্বাস করতে হবে। কুরআন-হাদীছে আছে তাই বিশ্বাস করতে হবে।

তিন নম্বর কথা হল: আমরা বস্তুর ভিত্তিতে সবকিছুর বিচার করি, আমরা বস্তুর ভিত্তিতে বিশ্বাস করতে চাই, বস্তু দিয়ে সবকিছু মাপতে চাই, কিন্তু ঈমান-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বস্তু দিয়ে বিচার করা চলবে না। কুরআন-হাদীছ বস্তু দিয়ে কোনো কিছুকে বিচার করে না। আমরা বস্তু দিয়ে বিচার করি বলেই যার কাছে বস্তু আছে টাকা-পয়সা আছে তাকে দামী মানুষ মনে করি। যার গাড়ি-বাড়ি আছে, ব্যাংক-ব্যালেন্স আছে, দুনিয়ার নেতৃত্ব আছে, পদ আছে, তাকে সম্মানী মানুষ মনে করি। কিন্তু কুরআন-হাদীছ বস্তু দিয়ে বিচার করে না। তাই হাদীছে বলা হয়েছে,

لَيْسَ الْغِنٰى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلٰكِنَّ الْغِنٰى غِنَى النَّفْسِ. (البخاري : ٦٤٤٦ ومسلم :٢٤٦٧)

অর্থাৎ, তোমরা মনে কর, যার কাছে ধন-সম্পদ বেশি সে হল ধনী। কিন্তু আসলে সে ধনী নয়। প্রকৃতপক্ষে ধনী হল যার মন ধনী।

দেখা গেল ধনী-গরীব হওয়ার বিষয়টাকে বস্তু দিয়ে বিচার করা হল না। কুরআন শরীফে বলা হয়েছে,

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقٰكُمْ. (সূরা হুজুরাত: ১৩)

অর্থাৎ, আল্লাহর নিকট অধিক সম্মানী সেই যার তাকওয়া-পরহেযগারী অধিক।

এখানেও দেখা গেল মান-সম্মানের বিষয়টাকে বস্তু দিয়ে বিচার করা হয়নি। একজন মানুষ যদি ভাল নামায রোযা করে, কিন্তু আয়-ইনকাম ভাল করতে বুঝে না, ধন-সম্পদ জোগাড় করার কলা-কৌশল ভাল বোঝে না, তাহলে আমরা বলি, লোকটা আহাম্মক, কোনো বুদ্ধি-শুদ্ধি নেই। অর্থাৎ, বস্তু দিয়ে আমরা বুদ্ধির বিচার করি। কিন্তু হাদীছে বলা হয়েছে,

اَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنّٰى عَلَى اللّٰهِ. (رواه الترمذي برقم ٢٤٥٩ وقال: حسن)

অর্থাৎ যে নিজেকে চিনল যে, কোথা থেকে আমি এসেছি, কোথায় আমাকে যেতে হবে, আমি কে এইসব চিনে-বুঝে সেভাবে পরকালের জন্য আমল করল, সে হল বুদ্ধিমান। আর যে নিজের খেয়াল-খুশি মত চলল, পরকালের জন্য কিছুই করল না সে হল নির্বোধ, আহাম্মক। (তিরমিযী)

দেখা গেল বুদ্ধিমান বা নির্বোধ হওয়ার বিষয়টাকেও বস্তু দিয়ে বিচার করা হয়নি। আর এক হাদীছে বলা হয়েছে,

لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرْعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِيْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ. (البخاري برقم ٦١١٤ ومسلم برقم ٦٨٠٩)

অর্থাৎ, যার গায়ে শক্তি বেশি, অন্যকে আছাড় দিয়ে ফেলে দিতে পারে সে আসলে শক্তিশালী নয়, আসলে শক্তিশালী হল সেই, যে রাগের মুহূর্তে নিজেকে কন্ট্রোল বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



অর্থাৎ, যখন প্রচণ্ড রাগ এসে যায়, সব লণ্ড-ভণ্ড করে ফেলতে মনে চায়, তছনছ করে ফেলতে মনে চায়, প্রতিশোধ নিতে মনে চায়, এরূপ মুহূর্তে যে নিজেকে কন্ট্রোল বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, সেই হল শক্তিশালী ব্যক্তি। এখানেও দেখা গেল বস্তু দিয়ে বিচার করা হচ্ছে না। এমনিভাবে সবক্ষেত্রে ঈমানী চেতনাই হল– বস্তু দিয়ে কোনোকিছুর বিচার করা হবে না। বস্তুভিত্তিক চিন্তা-চেতনা গড়ে তোলা যাবে না। যুক্তিভিত্তিক চিন্তা-চেতনা গড়ে তোলা যাবে না। তবে একথার আদৌ এ অর্থ নয় যে, কুরআন-হাদীছের সবকিছু কি যুক্তিহীন ও যুক্তির বিপরীত। কুরআন-হাদীছের সব কথার যুক্তি আছে। তবে সব যুক্তি আমাদের বুঝে আসবে তা জরুরী নয়। যদি যুক্তিতে বুঝে আসে আল-হামদু লিল্লাহ। না বুঝে আসলেও কুরআন-হাদীছে বলা হয়েছে তাই মানতে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে বিশ্বাস করতে বলছেন তাই বিশ্বাস করতে হবে। এভাবে আল্লাহর কাছে সারেন্ডার বা আত্মসমর্পণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না, শুধু যুক্তি দিয়ে সবকিছু বুঝতে চায়, তাদের যুক্তিও এক পর্যায়ে গিয়ে শেষ হয়ে যায়। তখন তারা নির্বোধের মত হাওয়ার কাছে সারেন্ডার করে। একটা উদাহরণ শুনুন– জমি থেকে ফসল উৎপন্ন হয়। কেন ফসল উৎপন্ন হয়? এর পেছনে কী যুক্তি আছে? আমরা আল্লায় বিশ্বাসী লোকেরা শুরুতেই আল্লাহর কাছে সারেন্ডার বা আত্মসমর্পণ করে বলব, আল্লাহ জমি থেকে ফসল উৎপন্ন করান, তাই উৎপন্ন হয়। আর যারা আল্লায় বিশ্বাসী না, যুক্তিতে বিশ্বাসী, তারা যুক্তি দিয়ে বলবে, জমি থেকে ফসল উৎপন্ন হওয়ার কারণ হল মাটির মধ্যে উৎপাদনের ক্ষমতা আছে। যদি জিজ্ঞাসা করা হয়– মাটির মধ্যে উৎপাদনের ক্ষমতা হল কেন? তারা যুক্তি দিয়ে বলবে, কারণ মাটির উপাদানগুলোই এমন যা উৎপাদনের ক্ষমতা তৈরি করে। তারপর যদি প্রশ্ন করা হয়, মাটির উপাদানগুলো এমন হল কেন? তখন তারা কোনো জবাব দিতে পারবে না। বেশির থেকে বেশি বলবে, এমনিই এমন হয়েছে। এভাবে তারা হাওয়ার কাছে সারেন্ডার করে বোকা সাজবে। এমনিভাবে আগুনের ব্যাপারে আমরা বলব, আল্লাহ পাকই আগুনের মধ্যে পোড়ানোর ক্ষমতা রেখেছেন। যখন আল্লাহর ফয়সালা হবে যে, আগুন পোড়াবে না, তখন আগুন পোড়াতে পারবে না। হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে যখন আগুনে ফেলা হয়েছিল তখন আগুন তাঁকে পোড়ায়নি। কারণ আল্লাহ পাকের ফয়সালা হয়নি। যারা যুক্তিতে বিশ্বাস করে, তারা বলবে, আগুন পোড়ায় কেন? যেহেতু আগুনের ভিতরে পোড়ানোর ক্ষমতা আছে। প্রশ্ন হবে আগুনের মধ্যে পোড়ানোর ক্ষমতা হল কেন? তারা বলবে, কারণ আগুনের মধ্যে দাহিকা শক্তি আছে। প্রশ্ন হবে আগুনের মধ্যে দাহিকা শক্তি হল কেন? তারা বলবে, কারণ এর উপাদানটাই হল দাহ্য পদার্থ দিয়ে গঠিত। যখন দাহ্য পদার্থ তখন জ্বালাবেই। যদি প্রশ্ন করা হয় এগুলো দাহ্য পদার্থ হল কেন? অদাহ্য পদার্থ কেন হল না? তখন তারা আর কিছু বলতে পারবে না, বেশির থেকে বেশি বলবে এমনিই হয়েছে। এভাবে এক পর্যায়ে গিয়ে হাওয়ার কাছে সারেন্ডার করে বোকা সাজবে। এজন্য বলি– যুক্তি কিছুদূর চলে, বেশিদূর চলে না। এজন্য যারা যুক্তির ধ্বজাধারী এক পর্যায়ে গিয়ে তারা নাকে খত দিতে বাধ্য হয়। এক পর্যায়ে গিয়ে তারা বোকা সাজে। এর বিপরীত যারা আল্লাহকে মানে তারা বোকা সাজে না। তারা অজানার কাছে মাথা নত করে না। তারা শুরু থেকেই আল্লাহর কাছে মাথা নত করে। আল্লাহর কাছে মাথা নত করা বোকামী নয়। কারণ তিনি মহাজ্ঞানী। ক্ষুদ্র জ্ঞানী হয়ে মহাজ্ঞানীর কাছে মাথা নত করা বোকামী নয়। বরং অল্প বিদ্যা নিয়ে ফুটানী দেখিয়ে পরে যেয়ে চিৎপটাং দিয়ে পড়ে যাওয়া বোকামী। যারা যুক্তিপন্থি তারা শেষ পর্যন্ত গিয়ে শূন্যের কাছে অর্থাৎ, অযুক্তির কাছে মাথা নত করে। তারা শুরুতে বুদ্ধির ফুটানী দেখিয়ে পরে যেয়ে চিৎপটাং দিয়ে পড়ে। আমরা শুরু থেকেই আল্লাহর কাছে অর্থাৎ, মহাজ্ঞানীর কাছে সারেন্ডার করেছি, এটাই যুক্তির

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

কথা। শুরু থেকেই আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ পাকের থেকেই সবকিছু হয়। এরপর যদি যুক্তিতে বুঝে আসে আল-হামদু লিল্লাহ, বুঝে না আসলেও বিশ্বাস করব, কারণ কুরআন-হাদীছের কথা।

মানুষ যুক্তির পেছনে পড়ে কুরআন-হাদীছের কথা অস্বীকার করে যুগে যুগে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যুক্তির পেছনে পড়ে ইসলামের অনেক কিছুকে অস্বীকার করেছে। আবার একদিন যখন বুঝে এসেছে, তখন নাকে খত দিয়ে স্বীকারও করেছে। আমাদের কখনও নাকে খত দিতে হয়নি। কারণ যুক্তিতে না ধরলেও আমরা শুরু থেকেই বিশ্বাস করি। আমলনামা ওজন হবে– এক যুগে কিছু মানুষ এটাকে অবিশ্বাস করেছে। কারণ তখন তাদের যুক্তিতে ধরেনি যে, আমল যা দেখা যায় না, যা কোনো পদার্থ নয় তার আবার ওজন হবে কী করে? তারপর এক সময় যখন প্রমাণ হয়েছে যে, পদার্থ নয় এরকম জিনিসও মাপা যায়, যেমন আলো মাপা যায়, তখন তারা নাকে খত দিয়ে বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছে। হাদীছে এসেছে– জান্নাতে সর্বনিম্ন জান্নাতীকে কমপক্ষে দুনিয়ার দশ দুনিয়া পরিমাণ জায়গা দেয়া হবে। আমরা এটা বিশ্বাস করি। আগেও বিশ্বাস করেছি এখনও বিশ্বাস করি। আমাদেরকে বলা হয়েছে, আমরা অন্ধবিশ্বাসী। এত জায়গা কোথায়? কিন্তু এখন যখন বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে উর্ধ্ব জগতে এত জায়গা আছে যে, সর্বনিম্ন জান্নাতীকে দশ দুনিয়া পরিমাণ কেন, দশ কোটি দুনিয়ার পরিমাণ জায়গা দেয়া হলেও জায়গা ফুরাবে না। এ পর্যন্ত সবচেয়ে দূরের যে নক্ষত্র বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছে, সেটাকে বলা হয় কোয়াসার। বিজ্ঞানীদের হিসাবে এটা এক হাজার কোটি আলোকবর্ষ দূরে। আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে এক লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল অর্থাৎ, প্রায় তিন লক্ষ কিলোমিটার। অতএব এক হাজার কোটি আলোকবর্ষ দূরে থাকার অর্থ হল– কোনো দিন যদি এমন যানবাহন আবিষ্কার করা সম্ভব হয়, যা আলোর গতির মত প্রতি সেকেন্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল বেগে চলতে সক্ষম, আর সেই যানবাহনে চড়ে কেউ যদি দুনিয়া থেকে রওনা দেয়, তাহলে সেই কোয়াসার পর্যন্ত পৌঁছতে তার সময় লাগবে ১ হাজার কোটি বৎসর। আরও একটা কথা জানা দরকার- কুরআন শরীফে বলা হয়েছে,

إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ الْكَوَاكِبِ.

অর্থাৎ, এইসব গ্রহ-নক্ষত্র দ্বারা আমি প্রথম আসমানকে সজ্জিত করেছি। (সূরা সাফফাত: ৬)

অতএব সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্র প্রথম আসমানের নিচে, এর উপরে যেয়ে প্রথম আসমান। এরপর দ্বিতীয় আসমান, তারপর তৃতীয় আসমান, এভাবে ৪র্থ আসমান, পঞ্চম আসমান, ষষ্ঠ আসমান, সপ্তম আসমান। সপ্তম আসমানের উপরে হল জান্নাত। তাহলে এখন চিন্তা করে দেখুন– প্রথম আসমানের নিচে যদি এত জায়গা হয়, তাহলে সপ্তম আসমান পর্যন্ত কত জায়গা? সেই সপ্তম আসমানের উপরে জান্নাতে কত জায়গা? মানুষ কোনো দিন হিসাব করেও বের করতে পারবে না জান্নাতে কত জায়গা আছে। সর্বনিম্ন জান্নাতীকে দশ দুনিয়া কেন, যদি দশ হাজার দুনিয়া পরিমাণও জায়গা দেয়া হয়, তবুও জান্নাতের জায়গা ফুরাবে না। এসব কথা প্রমাণিত হওয়ার পর তারা নাকে খত দিয়ে মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে। আমরা শুরু থেকেই আল-হামদু লিল্লাহ এর সবকিছুকে বিশ্বাস করি। না দেখে বিশ্বাস করি। যুক্তিতে না ধরলেও বিশ্বাস করি। কুরআন-হাদীছের তথ্যের ভিত্তিতে বিশ্বাস করি। এরই নাম হল ঈমানী চেতনা। যদি এই ঈমানী চেতনা দুরস্ত হয়ে যায়, তাহলে সবকিছুকে বিশ্বাস করা সহজ হবে। আল্লাহ পাক আমাদের ঈমানী চেতনাকে দুরস্ত করে দিন। আমীন!

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



www.maktabatulabrar.com

## বয়ান নং ১-এর খুতবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَخَلَقَ الْاَنَامَ، وَشَرَعَ لَهُمْ مِنَ تَكَالِيْفِ الْاِيْمَانِ وَالْاَحْكَامِ، اَحْمَدُهٗ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا عَلٰى مَمَرِّ اللَّيَالِىْ وَالْاَيَّامِ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَآ شَرِيْكَ لَهٗ، اِلٰهٌ لَا تُحِيْطُ بِهِ الْعُقُوْلُ وَالْاَفْهَامُ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ خَاتَمُ الْاَنْبِيَآءِ الْكِرَامِ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ صَلَاةَ الْبَرَرَةِ الْعِظَامِ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الْاَئِمَّةِ الْاَعْلَامِ.

اَمَّا بَعْدُ :

فَيَا اَيُّهَا النَّاسُ! اِنَّ اَوَّلَ الْفَرَآئِضِ عَلَيْنَا هُوَ الْاِيْمَانُ، وَمَنْ لَّمْ يَكُنْ فِيْهِ الْاِيْمَانُ، اَعْمَالُهٗ كَالسَّرَابِ فِى الْقِيْعَانِ. قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِى الْكِتَابِ : وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَآءً. حَتّٰٓى اِذَا جَآءَهٗ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَّوَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهٗ فَوَفّٰهُ حِسَابَهٗ وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ.

وَاعْلَمُوْا اَيُّهَا النَّاسُ! اِنَّ اُمُوْرَ الْاِيْمَانِ مِمَّا لَا تُحِيْطُ بِهِ الْعُقُوْلُ وَالْاَنْظَارُ، فَعَلَى الْعِبَادِ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِهَا وَاِنْ لَّمْ يُدْرِكُوْا بِالْحَوَآسِّ وَالْاَبْصَارِ. قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِىْ اَوَّلِ سُوْرَةِ الْقُرْاٰنِ بَيَانًا لِشَاْنِ الْاِيْمَانِ : اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ. اَلْاٰيَةُ. وَاعْلَمُوْا اَنَّ هُنَاكَ كَثِيْرًا مِّنَ الْاُمُوْرِ فِى الْاَحَادِيْثِ وَالْقُرْاٰنِ، لَا تُدْرِكُهُ الْعُقُوْلُ وَالْاَذْهَانُ، وَمِنْ ذٰلِكَ مَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ. اَلْاٰيَةُ. وَقَالَ تَعَالٰى : بَلٰى اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا وَيَأْتُوْكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اٰلَافٍ مِّنَ الْمَلٰئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ. وَقَالَ تَعَالٰى فِىْ شَاْنِ مَنْ جَاهَدُوْا يَوْمَ حُنَيْنٍ وَقَالُوْا : لَنْ نَغْلِبَ الْيَوْمَ مِنْ قِلَّةٍ ثُمَّ هُزِمُوْا : وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِيْنَ. وَقَالَ تَعَالٰى : اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ. وَفِى الْحَدِيْثِ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ الْغِنٰى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، وَلٰكِنَّ الْغِنٰى غِنَى النَّفْسِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : اَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهٗ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَاجِزُ مَنْ اَتْبَعَ نَفْسَهٗ هَوَاهَا وَتَمَنّٰى عَلَى اللّٰهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَصَحَّحَهٗ. وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرْعَةِ، اِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِىْ يَمْلِكُ نَفْسَهٗ عِنْدَ الْغَضَبِ. فَعَلَيْنَا اَنْ نُؤْمِنَ بِمَا جَآءَ فِى الْقُرْاٰنِ وَالسُّنَّةِ، وَاِنْ لَّمْ تُدْرِكْهُ عُقُوْلُنَا الْقَاصِرَةُ.

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ : يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِىْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِىْ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ. وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا.

بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ، وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ، اِنَّهٗ تَعَالٰى كَرِيْمٌ مَّلِكٌ بَرٌّ رَّؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



বয়ান নং-২

## আল্লাহর যাত বা সত্তার প্রতি ঈমান প্রসঙ্গ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: اِنَّ فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَ فِىْ خَلْقِكُمْ وَ مَا يَبُثُّ مِنْ دَآبَّةٍ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ. وَقَالَ تَعَالٰى : قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اَللّٰهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

গত জুমুআয় ঈমানের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল, মানুষের জীবনে মৌলিকভাবে দুটো দায়িত্ব, ঈমান রাখা আর আমল করা। এর মধ্যে ঈমান হচ্ছে বুনিয়াদ। ঈমান না থাকলে আমলের কোনো মূল্য থাকে না। বুনিয়াদ বা ভিত ছাড়া যেমন বিল্ডিং দাঁড় করানো যায় না, তেমনি ঈমান ছাড়া আমলের বিল্ডিং দাঁড় হয় না। এখন জানা দরকার কয়টা জিনিসের প্রতি ঈমান রাখতে হয়। মৌলিকভাবে ছয়টা জিনিসের প্রতি ঈমান রাখতে হয়। আল্লাহর প্রতি ঈমান, আল্লাহর প্রেরিত রসূলদের প্রতি ঈমান, আসমানী কিতাবের প্রতি ঈমান, পরকালের প্রতি ঈমান, ফিরিশতাদের প্রতি ঈমান এবং তাকদীরের প্রতি ঈমান। মৌলিকভাবে এই ছয়টা জিনিসের প্রতি ঈমান-বিশ্বাস রাখতে হয়।

আল্লাহর প্রতি ঈমান-বিশ্বাস রাখার অর্থ হল তিনটা জিনিস বিশ্বাস করা। **এক.** আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করা। **দুই.** আল্লাহ এক একথা বিশ্বাস করা। অর্থাৎ, তাওহীদে বিশ্বাস করা। **তিন.** আল্লাহর যত গুণাবলী আছে সেই গুণাবলীতে তিনি একক, তাঁর সাথে কেউ শরীক নেই একথা বিশ্বাস করা। এক নম্বরে বলা হল আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করা। যারা আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না, তাদেরকে বলা হয় নাস্তিক, তারা কাফের। আর যারা বিশ্বাস করেন, তাদেরকে বলা হয় আস্তিক, তারা হলেন মু'মিন। যারা আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না তাদের অবিশ্বাসের প্রধান কারণ হল তারা আল্লাহকে দেখে না তাই বিশ্বাস করে না। অথচ পৃথিবীতে এমন বহু জিনিস আছে, যা আমরা দেখি না, তারপরও বিশ্বাস করি। এমনকি যে রূহ বা আত্মার কারণে আমরা বেঁচে থাকি, তাও আমরা দেখতে পাই না। এখন দেখি না বলে কি রূহকে অস্বীকার করা যাবে?

আল্লাহকে দেখা না গেলেও আল্লাহ যে আছেন তার অসংখ্য দলীল রয়েছে। একবার কিছু নাস্তিক গোছের লোক হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)কে আল্লাহ আছেন এ বিষয়ে বহাছের আহ্বান জানাল। বহাছের সময় নির্ধারিত হল। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) যে সময় যাওয়ার কথা ছিল, তারচেয়ে কিছু দেরী করে গেলেন। দেরীতে যাওয়ার কারণে তারা বলল, আপনার ওয়াদাই ঠিক নেই, আপনার সাথে আমরা কোনো বহাছ করব না। ইমাম আবূ হানীফা (রহ,) বললেন, আমার দেরী হওয়ার ঘটনা শুনুন– আমার আসার পথে একটা নদী পড়েছিল। নদীতে নৌকা মাঝি কিছুই ছিল না। চিন্তা করছিলাম কীভাবে পার হব। ইতিমধ্যে একটা কাণ্ড ঘটে গেল– নদীর পাশে একটা গাছ ছিল, গাছটা হঠাৎ কেটে পড়ে গেল। তারপর গাছটা আপনা আপনি চিরে তক্তা হয়ে গেল। তক্তাগুলো আপনা আপনি জুড়ে জুড়ে একটা নৌকা হয়ে গেল। আমি নৌকাতে আরোহণ করলাম। নৌকাটা আপনা আপনি নদী পাড়ি দিয়ে এপারে চলে এল। এই ঘটনার কারণে আমার একটু দেরী হয়ে গেছে। এ ঘটনা শুনে ঐ নাস্তিকরা বলল, এমন গাঁজাখুরি কথাও বিশ্বাস করতে হবে? কোনো লোক ছাড়া গাছ কেটে পড়ে কীভাবে? কোনো লোক ছাড়া নৌকা তৈরি হয়

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

কীভাবে? আর লোক ছাড়া নৌকা চলে কীভাবে? তখন হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বললেন, তাহলে তোমাদের সাথে আমার বহাছও শেষ। সামান্য একটা গাছ যদি কোনো লোক ছাড়া কেটে পড়তে না পারে, একটা নৌকা যদি মিস্ত্রী ছাড়া তৈরি হতে না পারে, একজন মাঝি ছাড়া যদি নৌকা চলতে না পারে, তাহলে এই বিশাল আসমান-যমীন, এই বিশাল পৃথিবী কোনো সৃষ্টিকর্তা ছাড়া এমনি এমনি সৃষ্টি হয় কীভাবে? এর কোনো পরিচালক ছাড়া এগুলো চলে কীভাবে? এগুলো চিন্তা করলেই বুঝে আসে যে, এসবের একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন। কুরআন শরীফে তাই বলা হয়েছে,

اِنَّ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ.

অর্থাৎ, আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবীর মাঝে মু'মিনদের জন্য বহু নিদর্শন রয়ে গেছে। (সূরা জাছিয়াঃ ৩)

অর্থাৎ, আসমান যমীনের সবকিছু নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে আল্লাহ আছেন তার প্রমাণ পাওয়া যাবে, আল্লাহর কুদরত ও শক্তিমত্তার প্রমাণ পাওয়া যাবে, আল্লাহর সৃষ্টি কত নিখুঁত, আল্লাহর সৃষ্টি কত নিপুণ, তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। ঈমানের পক্ষে বহু প্রমাণ পাওয়া যাবে। কুরআনের এক আয়াতে বলা হয়েছে,

مَا تَرٰى فِىْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّ هُوَ حَسِيْرٌ.

অর্থাৎ, আল্লাহর সৃষ্টিতে কোনো ত্রুটি দেখতে পাবে না। তুমি আমার সৃষ্টির দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখ, আমার সৃষ্টিতে কোনো ত্রুটি দেখতে পাও কি? আবার দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখ, তোমার দৃষ্টি ব্যর্থ হয়ে ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসবে, কোনো দোষ-ত্রুটি খুঁজে বের করতে পারবে না। (সূলা মুলকঃ ৩-৪)

আল্লাহর সৃষ্টির সবকিছুর মাঝে আল্লাহর প্রমাণ রয়েছে। এমনকি আল্লাহ পাক বলেছেন, তোমাদের নিজেদের মধ্যেও প্রমাণ রয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

وَفِىْٓ اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ. (সূরা যারিয়াতঃ ২১)

অর্থাৎ, তোমাদের নিজেদের মধ্যেও দলীল রয়ে গেছে। তবুও কি তোমাদের অন্তর্দৃষ্টি খুলবে না?

একজন মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে, মানুষ যদি চিন্তা করে দেখে, তাহলে সে স্বীকার করতে বাধ্য হবে, মানতে বাধ্য হবে যে, একজন মহাজ্ঞানী সুনিপুণ সৃষ্টিকর্তা ছাড়া এগুলো এভাবে হতে পারে না। যেমন মানুষের একটা অঙ্গ হল চোখ। এই চোখ নিয়ে যদি চিন্তা করা হয় যে, এই চোখ সবকিছু দেখছে এবং প্রত্যেকটা দেখা জিনিসের আকৃতি কি, রং কি সবকিছু আলাদা আলাদা বুঝতে পারছে। চোখে ধুলো-বালি যেয়ে দেখতে যেন অসুবিধে না হয়, সেজন্য আল্লাহ পাক চোখের উপরে ভ্রু দিয়ে দিয়েছেন। এরপরেও যদি কোনো ফাক দিয়ে ধুলো-বালি প্রবেশ করে, তাহলে চোখের পানির সাথে মিশে কেতর আকারে সেই ময়লা বের করে দেয়ার সিস্টেম রাখা হয়েছে। যেখানে চোখ রাখা দরকার সেখানেই রেখেছেন। যদি মাথার উপরে চোখ রাখা হত, তাহলে মাথা নিচু করে চলতে হত। সেটা হত অসুবিধেজনক। পিছনের দিকে চোখ থাকলে সামনের দিকে চলা দায় হত। মানুষের এই জিহ্বা সামান্য একটা মাংসপিণ্ড। এই মাংসপিণ্ড সবকিছুর স্বাদ আলাদা আলাদা করে দিচ্ছে। যেটা খাদ্য নয় সেটা জিহ্বার উপরে পড়লেই সাথে সাথে সংকেত দিচ্ছে যে, এটা খাদ্য নয়। গালের মধ্যে একটা চুল প্রবেশ করলে একটা অখাদ্য কণা প্রবেশ করলে সাথে সাথে জিহ্বা তা বলে দিচ্ছে। আল্লাহ পাক জিহ্বার মধ্যে এরকম অনুভূতি ক্ষমতা দিয়ে দিয়েছেন। এমনিভাবে প্রত্যেকটা অঙ্গ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে আমাদের নিজেদের মধ্যেই দলীল পাওয়া যাবে যে, আল্লাহ যে আছেন। আল্লাহ ছাড়া এই সবকিছু এত সুন্দরভাবে, এত মহাপরিকল্পনার অধীনে এমনি এমনি হয়ে যেতে পারে না।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



হযরত ইমাম শাফী (রহ.)কে আল্লাহ আছেন- তার দলীল জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছিলেন, আল্লাহ আছেন তার দলীল তো আসমান-যমীনের সবকিছুই। এই সামান্য একটা তুতগাছ, এই গাছের কথা চিন্তা করে দেখ। এই গাছের পাতা যদি রেশম পোকায় খায়, তাহলে এই পাতা খাওয়ার কারণে তার ভিতরে রেশম সুতা তৈরি হয়। এই পাতা যখন গরু ছাগলে খায় তখন লেদা হয়। আবার এই পাতা হরিণে খেলে তার পেটে মৃগনাভি কস্তুরী তৈরি হয়। কে দিয়ে রাখল এই পাতার ভিতরে এত রকম গুণ? এগুলো কি এমনি এমনি হয়ে গেছে?

হযরত ইমাম মালেক (রহ.)কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, আল্লাহ আছেন তার একটা দলীল দিন। ইমাম মালেক (রহ.) বলেছিলেন, এই একটা ডিমের বিষয়ে চিন্তা কর। এমনভাবে তার উপর কভার দেয়া হয়েছে, তার ভিতরে কোনো বায়ু বাতাস প্রবেশ করতে পারে না। কিন্তু তার ভিতরে একটা জীবন বেঁচে থাকে, তার ভিতর থেকে জীবন্ত বাচ্চা বের হয়ে আসে। এমনিভাবে আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা হলে আল্লাহ আছেন একথা বলতে মানুষ বাধ্য হবে। এতকিছু সত্ত্বেও আল্লাহকে দেখি না শুধু এ কারণে আল্লাহকে অবিশ্বাস করা অযৌক্তিক। তদুপরি আল্লাহকে দেখার বিষয়টা হল আমি না দেখলেও রসূল (সা.) তো দেখেছেন। আল্লাহর অস্তিত্বের পক্ষে যদি অন্য কোনো দলীল নাও থাকত তবুও শুধু রসূল (সা.) আল্লাহকে দেখেছেন এতটুকুই দলীলের জন্য যথেষ্ট ছিল। রসূল (সা.) বলেছেন,

رَاَيْتُ رَبِّيْ تَبَارَكَ وَتَعَالى. (رواه أحمد في مسنده برقم ٢٥٨٠)

অর্থাৎ, আমি আমার রবকে দেখেছি। (মুসনাদে আহমদ)

রাসূল (সা.)-এর এই কথাই আল্লাহ আছেন বিশ্বাস করার জন্য যথেষ্ট, আর কোন দলীলের প্রয়োজন নেই। আমরা অনেক কিছু দেখিনা তারপরও মানুষের কথায় বিশ্বাস করি। আমরা অনেকে লণ্ডন আমেরিকায় যায়নি, কিন্তু যারা গিয়েছেন দেখেছেন তাদের কথার ভিত্তিতে বিশ্বাস করি যে, লন্ডন আমেরিকা নামক দেশ আছে। শুনে শুনেই আমরা এটা বিশ্বাস করি।

এক হুজুরের কাছে কয়েকজন নাস্তিক লোক এসেছিল। তাদের একজন বলল-আল্লাহকে দেখা যায় না তাই বিশ্বাস করা অযৌক্তিক। আল্লাহ আছেন তার কোন দলীল নেই। কোন দলীল থাকলে সেই দলীলটা কি? হুজুর বললেন যার বাপের ঠিক নেই সে-ই এমন কথা বলতে পারে। লোকটা রেগে গিয়ে বলল, কী আমার বাপের ঠিক নেই? হুজুর জিজ্ঞাসা করলেন যাকে তোমার বাপ বল তিনিই যে তোমার বাপ তার দলীল দাও? লোকটা ভেবে চিন্তে কোন দলীল পেশ করতে পারল না। তখন হুজুর বললেন তিনিই যে তোমার পিতা তার কোন দলীল নেই, একমাত্র তোমার মায়ের কথা, তোমার মা বলেছেন যে, তিনিই তোমার পিতা, তোমার মা বলেছেন তাই তুমি এবং সকলে বিশ্বাস করছে। তদুপরি তোমার বাপের থেকেই যে তুমি তৈরি হয়েছ এটা তোমার মাও দেখেনি। বরং তার একটা ধারণা যে, তার সাথে মিলনের কারণে তার বীর্য থেকে তুমি হয়েছ। তার একটা ধারণার ভিত্তিতে বলা কথায় যদি একটা লোককে তুমি পিতা বলে স্বীকার করে নিতে পার, তাহলে আমাদের রাসূল (সা.) নিজে স্ব চোখে আল্লাহকে দেখে এসে বলেছেন সেটা কেন বিশ্বাস করা যাবে না? আর তিনি এমন ব্যক্তি আপন-পর শত্রু-বন্ধু নির্বিশেষে সকলেই যাকে আল-আমীন বা সত্যবাদী বলে স্বীকার করত। রাসূল (সা.)-এর মিশনকে ব্যর্থ করার জন্য কাফেররা বহু রকম অভিযোগ আরোপ করেছে। কেউ তাঁকে যাদুকর বলেছে, কেউ তাকে কবি বলেছে, কত রকম কত কিছু বলেছে, কিন্তু কেউ মিথ্যুক বলতে পারেনি। এই রাসূল-ই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন-এর অস্তিত্বকে দেখে এসে বলেছেন আল্লাহ আছেন। কাজেই আল্লাহকে দেখিনা এজন্য বিশ্বাস করব না এরকম কোন যুক্তির অবকাশ নেই। নাস্তিক লোকটি একথা শুনে লা-জওয়াব হয়ে গেল।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

এখন যদি কেউ প্রশ্ন করে সৃষ্টিকর্তা ছাড়া যখন কোন কিছুই হয় না, তাহলে আল্লাহরও একজন সৃষ্টিকর্তা থাকতে হবে, তিনি সৃষ্টিকর্তা ছাড়া হলেন কি করে? এ প্রশ্নের জওয়াব হল- যদি মেনে নেয়া হয় আল্লাহর একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন। তাহলে বলতে হবে আল্লাহর সৃষ্টিকর্তারও একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন, সেই সৃষ্টিকর্তারও একজন সৃষ্টিকর্তা আছে। এভাবে বলতে থাকলে প্রথম সৃষ্টিকর্তা কাউকেই সাব্যস্ত করা যাবে না, অনন্তকাল শুধু বলতে থাকতে হবে তারও একজন সৃষ্টিকর্তা আছে, তারও একজন সৃষ্টিকর্তা আছে। এটা কোন সমাধান নয়। সমাধান হল একের আগে আর কোন সংখ্যা থাকে না। একের আগে হল শূন্য। ১০ এর আগে ৯ তার আগে ৮ তার আগে ৭, ৬, ৫, ৪, ৩, ২, তার আগে ১, । এরপর যদি কেউ প্রশ্ন করে ১ -এর আগে কী? তাহলে তার উত্তর হল একের আগে কিছুই থাকে না। অতএব আল্লাহ সর্বপ্রথম, তাঁর পূর্বে কেউ নেই, তাঁর সৃষ্টিকর্তা নেই। এমন কোন সময় যায়নি যখন আল্লাহ ছিলেন না, হাজার বছর আগেও তিনি ছিলেন, লক্ষ বছর আগেও তিনি ছিলেন, তারও আগেও তিনি ছিলেন। অনন্তকাল ধরে তিনি আছেন তাঁর কোন শুরুও নেই, শেষও নেই, তিনি অনন্ত সত্তা, অসীম সত্তা। এটা আমাদের মস্তিষ্কে ঢুকবে না। কারণ মানুষের ধারণ ক্ষমতা সসীম বুদ্ধি ক্ষমতা সসীম। সসীম মস্তিষ্কে অসীম জিনিস ঢুকতে পারে না, তাই সসীম মস্তিষ্ক দিয়ে মানুষ আল্লাহর অসীম সত্তাকে পুরোপুরি বুঝতে পারবে না।

মানুষের সব ক্ষমতাই সসীম সীমাবদ্ধ। আমরা দেখি, এই দেখার ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ। একেবারে কাছের জিনিসও আমরা দেখতে পাই না, আবার নির্দিষ্ট দুরত্বের বাইরে থাকলেও দেখি না। বুঝা গেল আমাদের দেখার ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা আছে। মানুষের বলার ক্ষমতা ও গায়ের শক্তিরও সীমাবদ্ধতা আছে। মস্তিষ্কের ধারণ ক্ষমতারও সীমাবদ্ধতা আছে। এই সীমাবদ্ধ ক্ষমতা দিয়ে আল্লাহর অসীম সত্তাকে সে বুঝতে পারবে না। ১ কেজি ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটা কৌটার ভিতরে যদি ৫/১০ কেজি ঢোকাতে চাওয়া হয়, কিংবা পুরা দুনিয়া যদি সেই কৌটার মধ্যে ঢোকাতে চাওয়া হয়, তাহলে কৌটার অবস্থা কি হবে? কৌটাটা ফেটে যাবে। হোমিও প্যাথিক ঔষধের ছোট একটা শিশির মধ্যে যদি কেউ সাত সাগরের সব পানি ঢোকাতে চায়, তাহলে তা হবে বোকামী বা পাগলামী। তদ্রূপ সীমিত ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন মানুষের মস্তিষ্কে আল্লাহর অসীম সত্তাকে ঢোকাতে চাইলে তাও হবে বোকামী। এটা কখনই সম্ভব হবে না। আল্লাহর অসীম সত্তাকে পুরোপুরি উপলব্ধি করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এজন্যই হাদীছে এসেছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন,

تَفَكَّرُوْا فِىْ كُلِّ شَيْئٍ وَلَا تَفَكَّرُوْا فِى اللّٰهِ. (المقاصد الحسنة عن ابن ابى شيبة في العرش)

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর সৃষ্টির সবকিছু নিয়ে চিন্তা-ভাবনা কর। আল্লাহর সত্তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করো না। কাজেই আল্লাহ কীভাবে হলেন, অনন্তকাল ধরে কীভাবে থাকা সম্ভব -এ বিষয়টা আমাদের বুঝে আসবে না, কেউ এর সমাধান দিতে পারবে না। এর সমাধান বুঝার মত ক্ষমতাই আমাদের নেই। আমাদেরকে আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তার সত্তা অনন্তকাল ধরে আছে, তিনি অনন্ত-অসীম একথা বিশ্বাস করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তাই বিশ্বাস করতে হবে। এই বিশ্বাস ঈমানের অংশ।

যেমন আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করা ঈমানের অংশ, তেমনিভাবে তাঁর সাথে কেউ শরীক নেই একথা বিশ্বাস করাও ঈমানের অংশ। এটাকে বলা হয় তাওহীদ বা একত্ববাদ। একমাত্র ইসলাম ধর্মই এমন, যে ধর্ম তাওহীদ বা একত্ববাদের শিক্ষা দেয়। অন্যান্য ধর্ম এক আল্লাহর কথা বলে না বরং একাধিক খোদার কথা বলে। ইহুদীদের মধ্যে একটা দল আছে, যারা বলে হযরত উযায়র (আ.) আল্লাহর পুত্র ছিলেন। অথচ হযরত উযায়র (আ.) একজন নবী ছিলেন। তিনি তাওরাত কিতাব মুখস্থ করে ফেলেছিলেন। তখন কিছু লোক বলেছিল, একটা পুরো কিতাব মুখস্থ করে ফেলা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এ থেকেই তারা তাকে আল্লাহর পুত্র বলা শুরু করে। কী ছেলেমিপনা যুক্তি! তাহলে তো এই যুগের সব হাফেজকে আল্লাহর

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



পুত্র বলতে হয়। কুরআন শরীফ তাওরাত কিতাবের চেয়ে অনেক বড়। তাওরাত মুখস্থ করতে পেরে যদি আল্লাহর পুত্র হয়ে যাওয়া যায়, তাহলে কুরআন মুখস্থ করতে পারলে কী বলা চাই? নাউযুবিল্লাহ! একেবারে আল্লাহ বলা চাই! খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আ.)কে আল্লাহর পুত্র এবং আল্লাহকে তাঁর পিতা বলে? যেহেতু হযরত ঈসা (আ.)-এর পিতা ছিল না, তাই তারা আল্লাহকেই তার পিতা সাব্যস্ত করেছে। এখন কথা হল যদি কারও পিতা না থাকলেই আল্লাহকে তার পিতা বলতে হয়, তাহলে হযরত আদম (আ.)-এর যেহেতু মাতা-পিতা কেউই ছিল না, তাই আল্লাহকেই তার মাতা-পিতা উভয়ই বলতে হয়। হযরত ঈসা (আ.)-এর শুধু পিতা না থাকার কারণে যদি তাকে খোদা বলতে হয়, তাহলে হযরত আদম (আ.)-এর মাতা-পিতা দুজনই না থাকার কারণে তাকে ডাবল খোদা বলতে হয়। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক! যে আল্লাহ মাতা-পিতা উভয় ছাড়া হযরত আদম (আ.)কে সৃষ্টি করতে পারেন, সেই আল্লাহ পিতা ছাড়া কেন হযরত ঈসা (আ.)কে সৃষ্টি করতে পারবেন না? এই প্রশ্নের জওয়াব খ্রিস্টানরা দিতে পারেনি। যদি হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর পুত্র হবেন, তাহলে আল্লাহর স্ত্রী কে? যদি বলা হয়, হযরত ঈসা (আ.)-এর মা মরিয়ামই আল্লাহর স্ত্রী, তাহলে প্রশ্ন হবে যখন পিতা ছাড়া শিশু ঈসা-এর জন্ম হয় এবং সমাজের লোকেরা মরিয়ামকে ব্যভিচারিণী বলে অপবাদ দেয়, তখন মরিয়াম নিজেই বলতেন যে, আমার স্বামী আছে তোমরা আমাকে অপবাদ দেও কেন? তোমরা আমাকে কেন ব্যভিচারিণী বল, আমার ওপর কেন অপবাদ আরোপ কর যে, আমার সন্তানের বৈধ পিতা নেই, এ সন্তান অবৈধ সন্তান। আমার তো বৈধ স্বামী আছে, আমার স্বামী হলেন আল্লাহ। কিংবা বলতে হবে, আল্লাহ তার স্বামী হওয়া সত্ত্বেও তিনি স্বীকার করেননি। কারণ তিনি ছিলেন অবৈধ স্বামী। নাউযুবিল্লাহ! তাছাড়া মরিয়াম যদি আল্লাহর স্ত্রী হয়ে থাকবেন আর আল্লাহর সন্তান থাকবে, তাহলে আল্লাহর এক সন্তান হয়ে ক্ষান্ত হয়ে গেল কেন? এক সন্তান জন্ম দিয়েই কি আল্লাহর পাওয়ার শেষ হয়ে গেল? নাউযুবিল্লাহ! তাছাড়া হযরত ঈসা (আ.) মানুষের মত পানাহার করতেন, পেশাব-পায়খানা করতেন, অথচ আল্লাহ তা'আলা পানাহারও করেন না, পেশাব-পায়খানাও করেন না। আর সন্তান তো পিতার মতই হয়ে থাকে। পিতার যাত আর সন্তানের যাত একই হয়ে থাকে। মানুষের পেটে সিংহ হয় না, মানুষের পেটে গরু ছাগল হয় না, মানুষের সন্তান মানুষই হয়ে থাকে। তাই হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর সন্তান হয়ে থাকলে তিনিও আল্লাহর মতই হতেন। তার পানাহার পেশাব-পায়খানা ইত্যাদি থাকত না। যাহোক, যেকথা বলা হচ্ছিল, ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মের লোকেরা একত্ববাদের ওপর নেই। ইহুদী খ্রিস্টানরাও একত্ববাদের ওপর নেই। আর হিন্দুদের তো কথাই নেই। তারা ৩৩ কোটি দেবতায় বিশ্বাস করে। তিনজনকে তারা বড় খোদা বলে মানে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর মহাদেব। ব্রহ্মা হল সৃষ্টিকর্তা, যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। আর বিষ্ণু হল লালন-পালনকর্তা, তিনি সকলকে লালন-পালন করেন। একজন সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত, তার আর কোনো দায়িত্ব নেই, আরেকজন লালন-পালনের দায়িত্বে আছেন। আর মহাদেব হলেন সংহারকর্তা, যিনি সবকিছু সংহার করেন, সবকিছু ধ্বংস করার কাজ তার। এভাবে হিন্দুরা সৃষ্টি, লালন-পালন ও সংহারকে তিন খোদার মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছে। এক একজন এক এক ডিপার্টমেন্টের খোদা। ইসলামে কোন ডিপার্টমেন্টাল খোদা নেই, ইসলাম বলে এক খোদাই সব– সৃষ্টিও তিনি করেছেন, সবকিছু লালন-পালনও তিনি করেন, প্রয়োজনে গড়েনও তিনি, প্রয়োজনে ধ্বংসও করেন তিনি, ভাল-মন্দ সব কিছুই তাঁর হাতে।

হিন্দুরা বলে ভাল করে লক্ষী দেবীতে আর খারাপটা করে শনি দেবতায়। সম্ভবত এজন্যই তাদের থেকে এরকম একটা কথা চালু হয়েছে যে, কপালে শনি লেগেছে, অর্থাৎ, ভাগ্যে অশুভ লেগেছে, অকল্যাণ লেগেছে। আফসুস মুসলমানদের কেউ কেউও এরকম বলে থাকে। অথচ এরকম বলা ঠিক নয়, এটা হিন্দুদের ধারণা থেকে বের হয়েছে। আমাদের কাছে শনি লাগা বলে কিছু নেই। অনেকে দেখা যায় সন্তান সু-স্বভাবের হলে বা ভাল কাজ করলে সন্তানকে বলে থাকে লক্ষী ছেলে আমার, কী লক্ষী মেয়েটি ইত্যাদি।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

সম্ভবত একথাটাও হিন্দুদের লক্ষী দেবতার ধারণা থেকে জন্ম নিয়েছে। মুসলমানের পক্ষে এটা ব্যবহার করা ঠিক নয়। আমাদের আকীদা মতে ভাল-মন্দ সবকিছু একজনের হাতে। সৃষ্টি করা, লালন-পালন করা, ধ্বংস করা, মৃত্যু ঘটানো, জীবন দেয়া– সবকিছুই একজনের হাতে। আমরা তাওহীদ বা একত্ববাদে বিশ্বাসী।

এক খোদা ছাড়া একাধিক খোদায় বিশ্বাস করা অযৌক্তিক। কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে,

لَوْ كَانَ فِيْهِمَا اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا. (সূরা আম্বিয়া: ২২)

অর্থাৎ, আসমান-যমিনে একাধিক খোদা থাকলে আসমান-যমিন সব ধ্বংস হয়ে যেত।

একটা রাষ্ট্রে দুজন প্রধানমন্ত্রী থাকতে পারে না। একটা রাষ্ট্রে দুজন রাষ্ট্রপতি থাকতে পারে না। তাহলে একজন বলবে এক রকম, আরেকজন বলবে আরেক রকম, তাহলে গণ্ডগোল লাগবে, সংঘর্ষ লাগবে, রাষ্ট্রের বারটা বাজবে। এমনিভাবে দুই খোদা থাকলেও পৃথিবী বরবাদ হয়ে যেত। যদি বলা হয় এক খোদা অন্য খোদার কথা মেনে চললে তো আর সংঘর্ষ হবে না, তাহলে বলতে হবে সে আর খোদা থাকল না। যে অন্যের কথামত চলে সে খোদা হতে পারে না, বরং সে হয়ে যায় খোদার অনুসারী।

আসমান যমিন ও পৃথিবীর সবকিছু সাক্ষী যে, আল্লাহ একজন। আদিকাল থেকে এই আসমান-যমিনের সবকিছুই একই নিয়মে চলছে, একই নিয়মে সূর্য উদিত হচ্ছে, অস্ত যাচ্ছে। একই নিয়মে চন্দ্র উদিত হচ্ছে, অস্ত যাচ্ছে, বাড়ছে, কমছে। এভাবে পৃথিবীর সবকিছুই একই ধারায়, একই নিয়মে চলে আসছে। এ থেকে বুঝা যায় খোদা একজন, দুজন নয়। দুজন থাকলে কখনও না কখনও ব্যতিক্রমও হত। কারণ যিনি খোদা তিনি স্বতন্ত্র স্বাধীন ইচ্ছের অধিকারী হবেনই। তাই একাধিক খোদা থাকলে একাধিক খোদার একাধিক ইচ্ছের ফলে সবকিছু একাধিক রকম চলত, এক রকম চলত না। পৃথিবীর সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়ম একরকম চলতে থাকাই সাক্ষী যে, খোদা একজন। কবি বলেন,

وَفِيْ كُلِّ شَاهِدٌ + عَلٰى اَنَّهٗ وَاحِدٌ

'অর্থাৎ, সবকিছুই সাক্ষী যে, তিনি আল্লাহ একক, তার কোন শরীক নেই। পৃথিবীর সবকিছুই তাওহীদের দলীল।'

তাওহীদের শিক্ষা দিয়ে সূরা ইখলাসে বলা হয়েছে,

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ، اَللّٰهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُوْلَدْ، وَ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ

অর্থাৎ, হে নবী! তুমি মানুষকে বলে দাও! আল্লাহ একক, তাঁর কোন শরীক নেই। আল্লাহ কারও মুখাপেক্ষী নন। তিনি একাই সব কিছু করতে সক্ষম। কোন কাজ করতে তাঁর কোন সহযোগী বা সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। বরং অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে,

اِنَّمَآ اَمْرُهٗٓ اِذَآ اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ. (সূরা ইয়াছীন: ৮২)

অর্থাৎ, আল্লাহ যখন কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত নেন, শুধু বলেন হয়ে যা, ততক্ষণাৎ হয়ে যায়।

সূরা ইখলাসের শেষ ভাগে বলা হয়েছে, তাঁর কোনো সন্তান নেই। তিনিও কারও সন্তান নন। তিনি কারও থেকে জন্ম নেননি। বরং তিনি আপনা-আপনি আছেন। এই সূরার আলোকে আমাদের বিশ্বাস হল– আল্লাহ আছেন, আল্লাহ একক, আল্লাহ অদ্বিতীয়, আল্লাহর কোনো শরীক নেই। আল্লাহর সত্তা, আল্লাহর গুণাবলী কোনো কিছুতে কোনো শরীক নেই। এটাই আমাদের আকীদা-বিশ্বাস, এটাই আমাদের ঈমান। ইনশাআল্লাহ আগামী জুমুআয় এ সম্বন্ধে আরও কিছু আলোচনা করা হবে। আল্লাহ পাক তাওফীক দান করুন। আমীন!

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



**বয়ান নং ২-এর খুতবা**

اَلْحَمْدُ لِذَاتِهِ الْوَاجِبِ الْمَوْجُوْدِ فِى السَّابِقِ وَالْحَالِ وَالْمَالِ، اَلْمُسْتَجْمِعِ لِجَمِيْعِ صِفَاتِ الْكَمَالِ، اَحْمَدُهٗ حَمْدًا يَّلِيْقُ بِذَاتِهِ الْجَلَالِ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ فِى الصِّفَاتِ وَالْاَفْعَالِ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهُ الَّذِىْ رَفَعَ عَنَّا بِبَعْثِهِ الْاٰصَارَ وَالْاَغْلَالَ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الْمُتَّبِعِيْنَ لَهٗ فِى الْاَقْوَالِ وَالْاَفْعَالِ وَالْاَحْوَالِ.

اَمَّا بَعْدُ :

فَيَا اَيُّهَا النَّاسُ! اِنَّ هُنَاكَ سِتَّةَ اُمُوْرٍ مِّنَ الْمُؤْمَنِ بِهٖ، وَهِىَ الْاِيْمَانُ بِاللّٰهِ، وَالْاِيْمَانُ بِالْمَلَآئِكَةِ، وَالْاِيْمَانُ بِالرُّسُلِ، وَالْاِيْمَانُ بِالْكُتُبِ السَّمَاوِيَّةِ، وَالْاِيْمَانُ بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ، وَالْاِيْمَانُ بِالْقَدْرِ. وَذٰلِكَ مَا جَآءَ فِىْ حَدِيْثِ جِبْرَئِيْلَ حِيْنَ سَاَلَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْاِيْمَانُ؟ قَالَ : اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ.

وَاعْلَمُوْا اَنَّ مَعْنَى الْاِيْمَانِ بِاللّٰهِ اَلْاِيْمَانُ بِذَاتِهٖ وَصِفَاتِهٖ. وَاَنَّ ذَاتَهٗ تَعَالٰى وَاجِبُ الْوُجُوْدِ، قَدِيْمٌ لَا بِدَايَةَ لَهٗ وَلَا نِهَايَةَ. فَمَنْ تَفَكَّرَ فِىْ خَلْقِهٖ تَعَالٰى، تَبَيَّنَ لَهٗ وُجُوْدُهٗ وَقُدْرَتُهٗ جَلِيًّا. فَلِاَجْلِ ذٰلِكَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَفَكَّرُوْا فِىْ كُلِّ شَيْءٍ. اَلْحَدِيْثُ. وَقَالَ الشَّاعِرُ:

وَفِىْ كُلِّ شَاهِدٌ ÷ عَلٰى اَنَّهٗ وَاحِدٌ.

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বয়ান নং ৩

## তাওহীদ বা আল্লাহ্‌র কোনো শরীক না থাকা প্রসঙ্গ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَرُوْنِىْ مَا ذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِى السَّمٰوٰتِ. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِيْ مَعْصِيَّةِ الْخَالِقِ.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

গত জুমুআয় আল্লাহর যাত বা আল্লাহর সত্তার প্রতি কি ঈমান রাখতে হয়– এ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছিল। আল্লাহর যাত তথা আল্লাহর সত্তার প্রতি ঈমান রাখার অর্থ হল আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করা, আল্লাহর গুণাবলীর প্রতি বিশ্বাস করা এবং আল্লাহর সাথে কেউ শরীক নেই একথা বিশ্বাস করা তথা তাওহীদে বিশ্বাস করা। আল্লাহর সাথে কেউ শরীক নেই একথাটি ব্যাপক– তাঁর সত্তার সাথেও কেউ শরীক নেই, তাঁর গুণাবলীর সাথেও কেউ শরীক নেই, তাঁর ইবাদতেও কাউকে শরীক করা যাবে না। একে বলা হয় তাওহীদ বা একত্ববাদ।

মানুষ যখন তাওহীদে বিশ্বাসী হবে, তখন সে মনে করবে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো খালেক মালেক নেই, আর কোনো মা'বূদ নেই। এক আল্লাহই আমার সব। আমার জীবন থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত যা কিছু হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে সবকিছু তিনি একাই করেছেন, করছেন ও করবেন। কাজেই আমার ওপর, আমার জীবনের ওপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব করার অধিকার এককভাবে আল্লাহর, অন্য কারও নয়। আমার এই জীবন যেভাবে তিনি চালাতে বলবেন সেভাবেই চালাতে হবে। কারণ আমার উপর একক কর্তৃত্ব একমাত্র তাঁর, অন্য কারও নয়। এভাবে দুনিয়ার সমস্ত মানুষের ওপর কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর। তাই কুরআন শরীফে বলা হয়েছে,

اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ. (সূরা আনআম: ৫৭)

অর্থাৎ, একমাত্র আল্লাহর-ই অধিকার আছে মানুষকে হুকুম দেয়ার, অন্য কারও নয়।

মানুষ একমাত্র আল্লাহর হুকুমে চলতে পারে, অন্য কারও হুকুমে চলতে পারে না। কারণ মানুষের ওপর এককভাবে কর্তৃত্ব আল্লাহর, অন্য কারও নয়। শুধু মানুষের ওপর নয়, সারা দুনিয়ার সবকিছুর ওপর একক কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর। এজন্যই বলা হয় ইসলামের দৃষ্টিতে সার্বভৌমত্ব আল্লাহর, কোনো মানুষের নয়, কোনো দেশের নয়, কোনো সরকারের নয়। আমরা বলি দেশের সার্বভৌমত্ব সরকারের, সার্বভৌমত্ব জনগণের। সার্বভৌমত্ব কথাটা যদি এই অর্থে বলা হয় যে, আমরা অন্য কোনো রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব মানব না, তাহলে এ বলা ঠিক আছে, কিন্তু আসল সার্বভৌমত্ব তথা সর্বময় কর্তৃত্ব বলতে যা বোঝায় তা একমাত্র আল্লাহর, অন্য কারও নয়। সর্বময় কর্তৃত্ব করার অধিকার একমাত্র আল্লাহর, অন্য কারও নয়। তাই আমরা একমাত্র আল্লাহ্‌র গোলামী করতে পারি অন্য কারও নয়, একমাত্র আল্লাহর হুকুম মোতাবেক চলতে পারি অন্য কারও হুকুম মোতাবেক নয়, একমাত্র আল্লাহর আনুগত্য করতে পারি অন্য কারও নয়। অতএব যদি কেউ আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধে বলে, আমরা তার আনুগত্য করতে পারি না। হাদীছে তাই বলা হয়েছে,

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



وَاَنَّهٗ تَعَالٰى اَظْهَرَ الْاَدِلَّةَ الْقَاطِعَةَ عَلٰى وُجُوْدِهٖ وَوَحْدَانِيَّتِهٖ. قَالَ تَعَالٰى : اِنَّ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ. وَقَالَ فِىْ اٰيَةٍ اُخْرٰى : مَا تَرٰى فِىْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ، فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ، ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ. وَاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَظْهَرَ الْاٰيَاتِ فِى الْاٰفَاقِ وَفِى الْاَنْفُسِ. قَالَ تَعَالٰى : وَفِى الْاَرْضِ اٰيٰتٌ لِّلْمُوْقِنِيْنَ وَفِىْ اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ.

وَاعْلَمُوْا اَنَّ ذَاتَهٗ تَعَالٰى لَيْسَ مِنَ الْخِيَالَاتِ كَمَا زَعَمَهُ الزَّنَادِقَةُ وَالدَّهْرِيَّةُ. بَلْ هُوَ وَاجِبُ الْوُجُوْدِ، دَلَّ عَلَيْهِ كَثِيْرٌ مِّنَ الْاٰيَاتِ وَالْاَنْظَارِ، وَقَدْ رَاٰهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَخْبَرَ بِهٖ ـ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوْقُ ـ وَقَالَ : رَاَيْتُ رَبِّىْ عَزَّ وَجَلَّ. وَكَفٰى الْمُؤْمِنِيْنَ مَا قَالَ تَعَالٰى : قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ. اَللّٰهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ. وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ.

وَيَا لَلْعَجَبِ كَيْفَ تَكُوْنُ هٰذِهِ الْجِبَالُ وَالْبِحَارُ، وَهٰذِهِ الْاَشْجَارُ وَالْاَنْهَارُ، وَهٰذِهِ الْاَرْضُ وَالسَّمٰوٰتُ، وَهٰذِهِ النُّجُوْمُ وَالسَّيَّارَاتُ، وَغَيْرُ ذَالِكَ مِنْ اَنْوَاعِ الْمَخْلُوْقَاتِ وَلَيْسَ لَهَا خَالِقٌ! وَلَا بُدَّ لِكُلِّ مَصْنُوْعٍ مِنْ صَانِعٍ. فَلَمْ يُنْكِرْ وُجُوْدَ صَانِعِ الْعَالَمِ اِلَّا فَاعِقٌ مَّجْنُوْنٌ قَدْ ضَلَّ فِىْ سَبِيْلِ هَوَاهُ، وَوَسْوَسَ لَهُ الشَّيْطَانُ فَاَغْوَاهُ.

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ : لَوْ كَانَ فِيْهِمَا اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا. فَسُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

**لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِيْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ.** (رواه أحمد عن عمران بن حصين برقم ٢٠٦٧٢وقال شعيب الأنؤوط : صحيح على شرط الشيخين)

অর্থাৎ, আল্লাহ জাল্লা শানুহুর নাফরমানী হয়–এমন কোনো বিষয়ে কোনো মাখলূকের আনুগত্য করা যাবে না।

এমনকি আল্লাহ, আল্লাহর রসূলের পরই পিতা-মাতার হক। এই পিতা-মাতাও যদি কোন পাপ কাজের হুকুম দেন, তাহলে তা মানা চলবে না। পিতা-মাতারও অধিকার নেই কোনো পাপ কাজের হুকুম দেয়ার। নামায পড়তে পারবে না, মসজিদে যেতে পারবে না, দাড়ি রাখতে পারবে না, পর্দা করতে পারবে না, ইসলামী লেবাস-পোশাক পরিধান করতে পারবে না– এ জাতীয় কোনো হুকুম দেয়ার অধিকার নেই। শুধু পিতা-মাতা নয়, কেউ কাউকে এরকম কোনো পাপ কাজের হুকুম দেয়ার অধিকার রাখে না। হুকুম দেয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহর, বিধান দেয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহর।

এখানে একটা কথা উল্লেখ করতে হয়। প্রচলিত গণতন্ত্রের ধারণায় আমরা মনে করি জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ আইন দিতে পারেন, তারা আইন রচনা করার অধিকার রাখেন। ইসলাম এটা স্বীকার করে না। এটা ইসলামবিরোধী ধারণা। ইসলাম কাউকে নতুন কোন আইন রচনা করার অধিকার দেয়নি। নতুন কোনো আইন রচনা করার প্রয়োজনও নেই, যা আইন দেয়া দরকার, কুরআন-হাদীছ তা দিয়ে দিয়েছে। এখন যুগের চাহিদা অনুযায়ী নতুন কোনো সংযোজন ঘটাতে হলে হক্কানী উলামায়ে কেরাম, মুজতাহিদ উলামায়ে কেরাম কুরআন-হাদীছ থেকে ইজতেহাদ বা গবেষণা করে সেটা করতে পারবেন। তাও কুরআন-হাদীছের দেয়া আইনের মধ্যে থেকে করতে হবে, কুরআন-হাদীছের আইনের বিরুদ্ধে নয়। কুরআন-হাদীছের বাইরে কোনো আইন রচনা করার অধিকার কাউকে দেয়া হয়নি। ফাইনাল অথরিটি একমাত্র আল্লাহ। যদি আমারা বিশ্বাস করি জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি বা সরকার ফাইনাল অথরিটি, তাহলে সেটা হবে ইসলামপরিপন্থী ধারণা। এজন্যই আমরা বলি, মানুষ বিধান রচনা করতে পারে, এই ধারণাসম্বলিত গণতন্ত্র ইসলাম পরিপন্থী, ঈমান পরিপন্থী। মনে রাখতে হবে ইসলামকে বাদ দিয়ে কোনো তন্ত্রে-মন্ত্রে মুসলমানদের মুক্তি নেই। অতএব গণতন্ত্রে মুক্তি, সমাজতন্ত্রে মুক্তি, অমুক তন্ত্রে মুক্তি, তমুক তন্ত্রে মুক্তি, এত দফায় মুক্তি, তত দফায় মুক্তি– এ সমস্ত কথা বর্জন করা চাই, একমাত্র কুরআন-হাদীছ মানার মধ্যেই আমাদের মুক্তি। ইসলামের প্রথম যুগেও যেমন কুরআন হাদীছের মধ্যে মুক্তি ছিল, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই উৎকর্ষের যুগেও এর মধ্যে মুক্তি, কেয়ামত পর্যন্ত সকল যুগের সকল মানুষের জন্য এর মধ্যেই মুক্তি। যদি কেউ মনে করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষের এই যুগে কুরআন হাদীছ চলতে পারে না, তাহলে সেটা হবে কুফরী ধারণা। কোনো মুসলমান এ ধারণা রাখতে পারে না।

যাহোক যেকথা বলা হচ্ছিল- তাওহীদ বা এক আল্লাহতে বিশ্বাসী ব্যক্তি মনে করবে যে, এক আল্লাহ ব্যতীত আমার কোনো প্রভু নেই। কাজেই আমারওপর কর্তৃত্ব একমাত্র তাঁরই চলতে পারে অন্য কারও নয়।

তাওহীদ অর্থ আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস করা। আল্লাহর সত্তা এক– একথাও যেমন বিশ্বাস করা, তদ্রূপ আল্লাহর গুণাবলীতে আল্লাহ একক– একথাও বিশ্বাস করা। আল্লাহর গুণাবলীতে কেউ শরীক নেই এ কথা বিশ্বাস করাও তাওহীদ বা একত্বে বিশ্বাস করার অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর যত গুণাবলী আছে সে গুণাবলীতে কেউ শরীক নেই। আল্লাহর গুণাবলীর সংখ্যা কত, আল্লাহর কত গুণ আছে, তা বলে শেষ করা যাবে না। আল্লাহর পরিচয় এভাবে দেয়া হয়–

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



**اَللّٰهُ عَلَمٌ لِّلذَّاتِ الْوَاجِبِ الْوُجُوْدِ اَلْمُسْتَجْمِعِ لِجَمِيْعِ صِفَاتِ الْكَمَالِ.**

অর্থাৎ, "আল্লাহ" এমন এক সত্তার নাম, যিনি অনন্তকাল ধরে আছেন, যার কোনো শুরু নেই। আবার অনন্তকাল থাকবেন, যার কোনো শেষ নেই। যিনি সমস্ত মহৎ ও পূর্ণাঙ্গ গুণাবলীর অধিকারী।

এই পরিচয়ের মধ্যে কয়েকটা বিষয় আছে। একটা হল তিনি অনন্তকাল ধরে আছেন অর্থাৎ তাঁর কোনো শুরু নেই। হাজার বছর আগেও তিনি ছিলেন, লক্ষ কোটি বছর আগেও তিনি ছিলেন। এমনিভাবে পেছনের দিকে যত পূর্বের কথা বলা সম্ভব সবসময় ধরে তিনি আছেন। কোনো সময় এমন ছিল না, যখন তিনি ছিলেন না। এটা মানুষের বুঝে আসুক বা না আসুক, আল্লাহর সত্তা এমন অনাদি। এমনিভাবে তাঁর সত্তা অনন্ত, কোনো দিন যার শেষ নেই। আল্লাহর পরিচয়ের মধ্যে আর একটা বিষয় হল যত গুণাবলী হতে পারে, যত উৎকর্ষ হতে পারে, তিনি সবকিছুর অধিকারী। একজন মানুষ মৃত্যু পর্যন্ত ব্যাখ্যা করে শেষ করতে পারবে না যে, যত উৎকর্ষ আছে, যত গুণাবলী আছে তিনি সবকিছুর অধিকারী। এজন্যই বলা হয় আল্লাহর গুণাবলী কত কোনো মানুষ তার পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা দিতে পারে না। এক হাদীছে সংক্ষেপে আল্লাহর নিরানব্বইটা গুণবাচক নামের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই গুণবাচক নামগুলোর মধ্যে আল্লাহর গুণাবলীর পরিচয় কিছুটা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। নতুবা এই ৯৯টির মধ্যেই আল্লাহর গুণের পরিচয় শেষ নয়, মানুষ আল্লাহর গুণের পরিচয় দিয়ে শেষ করতে পারবে না। এই ৯৯টি গুণবাচক নামের মধ্যে আল্লাহর গুণাবলীর কিছুটা প্রকাশ হচ্ছে মাত্র। আল্লাহর এই গুণাবলীতে কেউ শরীক নেই।

যেমন আল্লাহর একটা গুণবাচক নাম হল খালেক। "খালেক" অর্থ সৃষ্টিকর্তা। আল্লাহই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, এই সৃষ্টি কাজে কেউ আল্লাহর শরীক নেই। আল্লাহ ছাড়া আর কেউ সৃষ্টি করতে পারে না। বিজ্ঞানীরা কোনো কিছু সৃষ্টি করতে পারে না, তারা শুধু আল্লাহর সৃষ্টবস্তুর মধ্যে পরিবর্তন ঘটিয়ে একটা নতুন রূপ দিতে পারে মাত্র। তারা একটা নতুন রূপ ঘটাতে পারে মাত্র, কিন্তু সৃষ্টি করতে পারে না। সৃষ্টি একমাত্র আল্লাহ-ই করতে পারেন। দুনিয়া ছিল না আল্লাহ দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন, কোনো বস্তু ছিল না আল্লাহর হুকুমে সববস্তু তৈরি হয়ে গেছে। মানুষ ছিল না আল্লাহর হুকুমে মানুষ তৈরি হয়ে গেছে। রূহ বা প্রাণ ছিল না আল্লাহর হুকুমে তৈরি হয়ে গেছে। এটাকেই বলা হয় সৃষ্টি। যার অস্তিত্ব ছিল না সেটাকে অস্তিত্ব দেয়াই হল সৃষ্টি। একমাত্র আল্লাহ-ই এটা করতে পারেন, অন্য কেউ পারে না। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

**قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِى السَّمٰوٰتِ.**

অর্থাৎ, হে নবী তুমি তাদেরকে বল! তোমরা আল্লাহ ব্যতীত আর যাদেরকে ডাক; দেখাও তো তারা পৃথিবীর কি সৃষ্টি করেছে? কিংবা আকাশ ও আকাশের কোনো কিছু সৃষ্টিতে তাদের শরীকানা আছে কি? (সূরা আহকাফ: ৪)

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা বোঝাতে চাচ্ছেন এই আসমান-যমিন, নদ-নদী, সাগর-মহাসাগর, পাহাড়-পর্বত, গাছ-পালা, বৃক্ষ-লতা, মানব-দানব, সবকিছু আমি সৃষ্টি করেছি, আমি ছাড়া আর কাউকে দেখাতে পারবে না, যে এগুলোর কোনটা সৃষ্টি করেছে। যাহোক সৃষ্টি করা আল্লাহর একটা গুণ, এই গুণে কেউ শরীক নেই।

এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা মহাজ্ঞানী। এই জ্ঞান আল্লাহর একটা সিফাত বা গুণ, এই গুণেও কেউ শরীক নেই। হয়তো কারও মনে সন্দেহ আসতে পারে যে, মানুষেরও জ্ঞান আছে, তাহলে মানুষ এই গুণে শরীক হয়ে গেল, তা নয়। মানুষের জ্ঞান আল্লাহর জ্ঞানের মত নয়। আল্লাহ তাআলা অতীত,

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বর্তমান, ভবিষ্যৎ সবটা একইসাথে জানেন, কিন্তু আমরা শুধু বর্তমানটা জানি, অতীতও সরাসরি জানি না, ভবিষ্যতে কি হবে তা-ও জানি না। এমনকি যে বর্তমানটা জানি দেখি, তাও সবটা জানি না দেখি না। আল্লাহর কাছে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ বলে কোনো পার্থক্য নেই, আল্লাহর কাছে সবটাই বর্তমানের মত। একটা উদাহরণ দিয়ে বিষয়টা বুঝা যেতে পারে। যেমন– আমার চোখের সামনে এক হাত জায়গার ভিতর দিয়ে একটা পিঁপড়া হাঁটতে থাকে। যখন সেই পিঁপড়াটা এক বিঘত পরিমাণ জায়গা পার হয়ে যাবে, তখন এক বিঘত পিছনের জায়গা তার কাছে অতীতের ব্যাপার বলে মনে হবে, আর এক বিঘত সামনেরটা মনে হবে ভবিষ্যতের ব্যাপার, কিন্তু আমার কাছে মনে হবে সবটাই সমান। কারণ ঐ এক হাতের মধ্যে পুরো জায়গাটাই আমার চোখের সামনে। তাই আমার কাছে এখানে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই। তদ্রূপ আল্লাহর সত্তা এত বড় যে, অতীতকাল, বর্তমানকাল ও ভবিষ্যৎকাল এই সবকাল থেকে তাঁর সত্তা অনেক বড়। তাই আল্লাহর কাছে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ বলে কোনো পার্থক্য নেই। সব তাঁর দৃষ্টির সামনে বর্তমান। তাই সবকাল সম্পর্কে তিনি অবগত। কিন্তু অতীত এবং ভবিষ্যৎ আমাদের থেকে গায়েব বা অদৃশ্য তাই আমরা অতীতকে সরাসরি দেখতে পাই না, ভবিষ্যতের গায়েব সম্পর্কেও আমরা অবগত নই। কোনো মানুষ ভবিষ্যৎ জানে না, একমাত্র আল্লাহই ভবিষ্যৎ জানেন।

এক শ্রেণির লোক আছেন, যারা বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গায়েব বা অদৃশ্য বিষয় জানেন, তারা এটা বলেন এজন্য যাতে মীলাদ পড়ার সময় কেয়াম করা যায়, অর্থাৎ দাঁড়ানো যায়। তারা বলেন, মীলাদে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নামে দূরূদ শরীফ পড়া হলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতে পেরে হাজির হয়ে যান, তাই রসূলের সম্মানে দাঁড়াতে হবে। প্রশ্ন হয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অগোচরে দুরূদ শরীফ পাঠ করা হয়, তিনি কী করে জানবেন যে, তার নামে দুরূদ পাঠ করা হচ্ছে? এ জন্যই তারা বলেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গায়েব জানেন। তাঁর নামে দুরূদ পাঠ করা হলে তিনি জানতে পারেন। কিন্তু আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা বিশ্বাস হল কোনো মানুষ গায়েব জানে না। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও গায়েব জানেন না। অন্য কোন নবী-রসূলও গায়েব জানেন না। তবে হ্যাঁ মু'জেযা স্বরূপ কোন নবীকে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন কোন ভবিষ্যতের বিষয় কখনো কখনো জানানো হয়। এরকম যেসব ভবিষ্যতের বিষয়ে নবীসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন, তাতে আমরা বিশ্বাস রাখি। এরকম ব্যতিক্রম ধরনের দুই চারটা বিষয় ছাড়া সাধারণভাবে নবী-রসূলগণ ভবিষ্যৎ বা গায়েব জানেন না। নিজেদের থেকে তাঁরা কোনো গায়েব জানেন না।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে জেনে অনেক গায়েবের বিষয় বা ভবিষ্যতের বিষয় বলে গেছেন এটা সত্য, কিন্তু আবার অনেক গায়েবের বিষয় তিনি জানতে পারেননি এটাও সত্য। ওহুদের যুদ্ধে ৭০ জন সাহাবী শহীদ হয়ে গেলেন, তিনি আগের থেকে এটা জানতেন না? যদি জানতেন, তাহলে জেনে বুঝে নিজের হাতে ৭০ জন সাহাবীকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পারতেন না। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সবচেয়ে প্রিয় বিবি ছিলেন হযরত আয়েশা (রা.)। তাঁর ওপর একজন পুরুষের সাথে অপকর্মের অভিযোগ উঠেছিল। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত পেরেশান ছিলেন। এ ব্যাপারে নিজের থেকে তিনি কিছুই বলছিলেন না, বরং ওহী আসার অপেক্ষা করছিলেন। যদি তিনি গায়েব জানতেন, তাহলে অবশ্যই বলে দিতেন যে, ঘটনা এরকম নয়; বরং আসল ঘটনা এরূপ। বাস্তব হল– একমাত্র আল্লাহ যতটুকু জানান তার বাইরে নবী-রসূলগণ কোনো গায়েব জানেন না। নবী রসূলগণ ব্যতীত আর কোনো মানুষের কাছে যেহেতু আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী আসে

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



না, তাই অন্য কারও পক্ষে গায়েবের কোনো কথা জানার, ভবিষ্যতের কোনো কিছু জানার কোনো উপায় নেই। তাই কোনো মানুষের ভবিষ্যদ্বাণীতে বিশ্বাস করা যাবে না। কোনো জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণীতে বিশ্বাস করা যায় না। কোনো গণকের ভবিষ্যদ্বাণীতে বিশ্বাস করা যায় না। ঝাঁড়-ফুক দেনেওয়ালা তদবীরকারক কোনো হুজুরের ভবিষ্যদ্বাণীতেও বিশ্বাস করা যাবে না। কেউ যদি মনে করেন এসব হুজুরদের কাছে জিন থাকে, জিনের মাধ্যমে জেনে তারা ভবিষ্যতের কথা বলতে পারেন, বা গায়েবের কথা বলতে পারেন। তাহলে শুনুন জিনরাও গায়েব জানে না। কুরআন শরীফে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, জিনেরা গায়েব জানে না। ইরশাদ হয়েছে,

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهٖٓ اِلَّا دَآبَّةُ الْاَرْضِ تَاْ كُلُ مِنْسَاَتَهٗ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ اَنْ لَّوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوْا فِى الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ.

অর্থাৎ, যখন আমি সুলায়মানের মৃত্যু ঘটালাম, তখন ঘুণ পোকাই জিনদেরকে তাঁর মৃত্যু সম্বন্ধে অবহিত করল। ঘুণ পোকা সুলায়মানের লাঠি খেয়ে যাচ্ছিল। অতঃপর যখন সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল, তখন জিনরা বুঝতে পারল যদি তাঁরা গায়েব জানত, তাহলে এত লাঞ্ছনাকর কাজে তারা আটক থাকত না। (সূরা সাবা: ১৪)

এ থেকে বুঝা গেল জিনরা গায়েব জানে না। অতএব জিনের মাধ্যমে কেউ গায়েবের খবর জেনে বলবে এটাও বিশ্বাস করা যাবে না।

তবে কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে, অনেক সময় দেখা যায় জ্যোতিষী, গণক প্রমুখদের কিছু কিছু ভবিষ্যদ্বাণী খেটে যায়? এ থেকে বুঝা যায় তারা গায়েব জানে। এর থেকে মানুষের ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। তারা ভাবে এরা গায়েব না জানলে এদের ভবিষ্যদ্বাণী ঠিক হয় কী করে? একটা হাদীছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন যে, যখন জাগতিক কোন বিষয়ে আল্লাহর ফয়সালা হয়। তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রথম আসমানে সে ফয়সালা ঘোষণা করা হয়; যাতে দায়িত্বশীল ফিরিশতাগণ সকলে নিজ নিজ দায়িত্ব বুঝে নিতে পারেন। শয়তান এবং শয়তানের দোসর জিনগোষ্ঠি ঐ ঘোষণা শোনার জন্য আসমান পর্যন্ত ওঠার চেষ্টা করে যাতে ভবিষ্যতে কী হবে সে খবরগুলো সংগ্রহ করে সে মোতাবেক পদক্ষেপ নিতে পারে। যখন তারা আসমানের কাছে পৌঁছে যায়, তখন তাদের প্রতি জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপ করে তাদেরকে বিতাড়িত করে দেয়া হয়। ইতিমধ্যে ছিটে-ফোঁটা দুই একটা কথা তারা শুনে ফেলে। তারা এগুলোই জ্যোতিষী এবং গণকদের মনে প্রক্ষিপ্ত করে। জ্যোতিষী গণকরা এর সাথে নিজেদের কল্পনা ও লক্ষণ থেকে বুঝে আরও কিছু মিশ্রিত করে ভবিষ্যদ্বাণী করে থাকে। ফলে দুই একটা খেটেও যায়। কারণ তার মধ্যে আসমান থেকে শুনা কথাও থাকে। আবার অনুমান করে বলা কথাও অনেক সময় খেটে যায়। কোন জ্যোতিষির কোন একটা ভবিষ্যদ্বাণী যদি একবার খেটে যায়, তাহলে সেটা তারা খুব ফলাও করে প্রচার করে থাকে যে, অমুক জ্যোতিষী এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন বাস্তবেও তাই ঘটেছে। কিন্তু যেগুলো খাটে না সেগুলো তারা প্রচার করে না।

আর একটা বিষয় হল– জ্যোতিষীরা গোলমেলে করে কথা বলে, দ্ব্যর্থহীনভাবে কথা বলে কম। একবার আমাদের দেশে দুই নেত্রীর ভিতরে চরম দ্বন্দ্ব চলছিল। তখন মহাজাতক বলে খ্যাত জ্যোতিষী সাহেব ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, অমুক অমুক গ্রহ অমুক রাশিতে অবস্থান করছে, এটা সংঘর্ষের লক্ষণ। অতএব যদি দুই নেত্রীর মধ্যে সমঝোতা না হয়, তাহলে দেশের ভবিষ্যৎ আশংকাজনক। তিনি বলেছিলেন, তবে অমুক একটা গ্রহ অমুক রাশিতে অবস্থান করছে, এটা শুভ লক্ষণ। তাই যদি দুই নেত্রীর

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

মাঝে মিল হয়ে যায়, তাহলে দেশের অবস্থা ভাল হবে। আপনারা লক্ষ করুন আমি আপনিও এমন ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারতাম যে, দুই নেত্রীর মাঝে মিল হয়ে গেলে মাশাআল্লাহ খুব শান্তি হবে, আর মিল না হলে অশান্তি হবে। তিনি মহাজাতক হয়ে দ্ব্যর্থহীন কিছু তো বলতে পারলেন না যে, দুই নেত্রীর মধ্যে মিল হবেই কিংবা হবে না। জ্যোতিষীরা চিরকাল-ই এরকম গোলমেলে কথা বলে থাকে। কারণ তারা যা বলে তার অনেকটাই অনুমান করে বলে। জ্যোতিষশাস্ত্র নিশ্চিত জ্ঞানভিত্তিক কোন শাস্ত্র নয়। পৃথিবীর অনেক বড় বড় জ্যোতিষী শেষ পর্যন্ত স্বীকার করেছেন যে, আমাদের এ শাস্ত্রটা হল সম্পূর্ণ অনুমানভিত্তিক। মুফতী শফী সাহেব (রহ.) জওয়াহেরুল ফেকাহ গ্রন্থে দলীল প্রমাণ সহকারে এসব কথা উল্লেখ করেছেন। যাহোক যে কথা হচ্ছিল জ্যোতিষীরাও গায়েব জানে না, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ গায়েব জানে না। আল্লাহর যতগুলো সিফাত বা গুণাবলীতে বিশ্বাস করতে হবে তার মধ্যে এটাও একটা যে, তিনি গায়েব জাননেওয়ালা এবং একমাত্র তিনি ছাড়া আর কেউ গায়েব জানে না।

আল্লাহ পাকের জ্ঞানের মত মানুষের জ্ঞান হতে পারে না। আল্লাহ পাকের জ্ঞানের সাথে মানুষের জ্ঞানের কোনো তুলনা হয় না। একটা ঘটনা শুনুন। বোখারী শরীফে ঘটনাটির উল্লেখ রয়েছে। একবার হযরত মূসা (আ.) আর খিজির (আ.) একসাথে সফর করছিলেন। হযরত খিজির (আ.)কে আল্লাহ পাক অনেক প্রাকৃতিক রহস্যের জ্ঞান দান করেছিলেন। প্রাকৃতিক অনেক বিষয়ের রহস্য তিনি বলতে পারতেন। হযরত মূসা (আ.) তাঁর কাছে গিয়েছিলেন সেই জাতীয় কিছু জ্ঞানের বিষয় শেখার জন্য। তারা দুজন একসাথে সফর করছিলেন। এক নদীর কাছে গিয়েছেন। নদী পার হওয়ার জন্য নৌকায় আরোহণ করেছেন। ইতিমধ্যে একটা পাখি নদী থেকে তার ঠোঁটে করে সামান্য পানি তুলে নিয়ে গেল। তখন হযরত খিজির (আ.) হযরত মূসা (আ.)কে বললেন, 'আপনাকে আমাকে যত জ্ঞান দেয়া হয়েছে, দুনিয়ার সমস্ত মাখলুককে যত জ্ঞান দেয়া হয়েছে, সেই জ্ঞান আর আল্লাহর জ্ঞানের তুলনা জানেন? এই পাখিটা ঠোঁটে করে যে সামান্য পানি তুলে নিয়ে গেল, এই সাগরের অথৈ পানির তুলনায় তা যত কম, আল্লাহর জ্ঞানের সামনে মাখলুকের জ্ঞান তার চেয়েও কম'। সুবহানাল্লাহ! এরপরও মানুষ জ্ঞান নিয়ে বড়ায়ী করে! কুরআনে কারীমের এক স্থানে আল্লাহর জ্ঞানের কিছুটা বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে,

وَ يَعْلَمُ مَا فِى الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ ؕ وَ مَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَ لَا حَبَّةٍ فِىْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَ لَا رَطْبٍ وَّ لَا يَابِسٍ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ.

এ আয়াতের বক্তব্য হল স্থল ও পানি ভাগের সবকিছুর বিষয়ে তিনি জ্ঞান রাখেন। নির্জন জঙ্গলের মধ্যে একটা গাছের ক্ষুদ্র একটা পাতা কীভাবে ঝরে পড়ে, কিংবা মাটির গভীরে একটা বীজ কীভাবে অঙ্কুরিত হয়, কীভাবে তার থেকে চারা গজায় এত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিসও আল্লাহ পাক জানেন। এমনকি তা ঘটার পরে জানেন তা নয়, বরং ঘটার পূর্বেও জানেন। সবকিছু সৃষ্টি করার পূর্বে লওহে মাহ্ফুজে তা লিখেও রেখেছেন যে, অমুক সময় এটা ঘটবে। (আনআ'মঃ ৫৯)

এ হল আল্লাহর জ্ঞানের সামান্যতম পরিচয়। এমন জ্ঞান আর কারও নেই, তাই আল্লাহর এই গুণেও কেউ শরীক নেই। আল্লাহর কোনো সিফাত বা কোনো গুণে কেউ শরীক নেই। ইনশাআল্লাহ এ সম্বন্ধে আগামীতে আরও আলোচনা করা হবে। আল্লাহ পাক তাওফীক দান করুন। আমীন!

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



বয়ান নং ৩-এর খুতবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْمُتَوَحِّدِ بِذَاتِهٖ وَصِفَاتِهٖ، اَلْمُتَنَزِّهِ عَنِ الشُّرَكَآءِ وَالْاَنْدَادِ وَاَمْثَالِهٖ، وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ لِعِبَادَتِهٖ وَتَوْحِيْدِهٖ، اَحْمَدُهٗ حَمْدًا كَثِيْرًا يَّلِيْقُ بِوَحْدَانِيَّتِهٖ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ فِىْ ذَاتِهٖ وَصِفَاتِهٖ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ سَيِّدُ رُسُلِ اللّٰهِ وَاَنْبِيَائِهٖ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ صَلَاةً دَائِمَةً اِلٰى يَوْمِ لِقَآئِهٖ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ سَادَةِ النَّاسِ وَاَتْقِيَائِهٖ.

اَمَّا بَعْدُ :

فَيَاَيُّهَا النَّاسُ! اِنَّ مَعْنَى الْاِيْمَانِ بِذَاتِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَصِفَاتِهٖ اَنَّ ذَاتَهُ الْوَاجِبَ وَاحِدٌ لَا شَرِيْكَ لَهٗ فِىْ ذَاتِهٖ وَصِفَاتِهٖ. وَاَنَّهُ تَعَالٰى اَظْهَرَ الْاَدِلَّةَ الْقَاطِعَةَ عَلٰى اَنَّهُ هُوَ الْمَعْبُوْدُ، وَهُوَ الْوَاحِدُ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الْمَقْصُوْدُ. قَالَ تَعَالٰى : لَوْ كَانَ فِيْهِمَا اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا. وَقَالَ تَعَالٰى : قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَرُوْنِىْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِى السَّمٰوٰتِ. وَقَالَ تَعَالٰى : لَوْ كَانَ مَعَهٗ اٰلِهَةٌ كَمَا يَقُوْلُوْنَ اِذًا لَّابْتَغَوْا اِلٰى ذِى الْعَرْشِ سَبِيْلًا. سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى عَمَّا يَقُوْلُوْنَ عُلُوًّا كَبِيْرًا. وَهٰكَذَا اَظْهَرَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ الْاَدِلَّةَ فِى الْاٰفَاقِ عَلٰى اَنَّهُ تَعَالٰى وَاحِدٌ، قَالَ الشَّاعِرُ:

وَفِىْ كُلِّ شَيْءٍ شَاهِدٌ + عَلٰى اَنَّهٗ وَاحِدُ.

وَكَمَا اَنَّهٗ وَاحِدٌ فِىْ ذَاتِهٖ لَا شَرِيْكَ لَهٗ فِيْهِ، كَذَالِكَ هُوَ وَاحِدٌ فِىْ صِفَاتِهٖ لَا مَثِيْلَ لَهٗ فِيْهَا. وَمِنْ جُمْلَةِ صِفَاتِهٖ تَعَالٰى عِلْمُهٗ، وَلَيْسَ فِى

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

الْعَالَمِ اَحَدٌ مِثْلُهُ. وَهُوَ تَعَالٰى يَعْلَمُ عِلْمَ الظَّاهِرِ وَالْغَآئِبِ، وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا هُوَ. وَيَعْلَمُ مَا فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا، وَلَا حَبَّةٍ فِىْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَّلَا يَابِسٍ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ. وَقَالَ : وَلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. وَبَعْضُ النَّاسِ يَظُنُّوْنَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَمُ الْغَيْبَ، وَهُوَ فَاسِدٌ. وَيَدُلُّ عَلٰى فَسَادِهٖ قِصَّةُ الْاِفْكِ وَشَهَادَةُ سَبْعِيْنَ مِنْ اَصْحَابِهٖ فِىْ اُحُدٍ وَغَيْرُ ذَالِكَ مِنَ الْوَاقِعَاتِ. وَحِيْنَ سَاَلَهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ السَّاعَةِ وَقَالَ : مَتَى السَّاعَةُ؟ اَجَابَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهٖ : مَا الْمَسْئُوْلُ عَنْهَا بِاَعْلَمَ مِنَ السَّآئِلِ. وَبَعْضُهُمْ يَظُنُّوْنَ اَنَّ الْجِنَّ يَعْلَمُ الْغَيْبَ، وَهُوَ اَيْضًا فَاسِدٌ. قَالَ تَعَالٰى : فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلٰى مَوْتِهٖ اِلَّا دَآبَّةُ الْاَرْضِ تَاْكُلُ مِنْسَأَتَهٗ. فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ اَنْ لَّوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوْا فِى الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ. فَلَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ اَحَدٌ اِلَّا اللّٰهُ. فَالسُّوَالُ عَنِ الْغَيْبِ فَاسِدٌ وَ بَاطِلٌ لَا عِنْدَ الْجِنِّ وَلَا عِنْدَ الْمُنَجِّمِ وَالْعَرَّافِ.

فَاَيُّهَا النَّاسُ! وَحِّدُوا اللّٰهَ، وَاجْتَنِبُوا الشِّرْكَ فِى الذَّاتِ وَالصِّفَاتِ، فَاِنَّ التَّوْحِيْدَ اَسَاسُ الْحَسَنَاتِ وَرَاْسُ الطَّاعَاتِ. وَاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِلَّا الشِّرْكَ. قَالَ تَعَالٰى : اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ.

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ : لَوْ كَانَ فِيْهِمَا اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا. فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ.



বয়ান নং ৪

## আল্লাহ্‌র সিফাত তথা গুণাবলীর প্রতি ঈমান প্রসঙ্গ (১ম পর্ব)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: هُوَاللّٰهُ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ، وَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: اِرْحَمُوْا مَنْ فِى الْاَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَّنْ فِى السَّمَاءِ. وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ: تَخَلَّقُوْا بِاَخْلَاقِ اللّٰهِ.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

আমরা ঈমান সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। গত জুমুআয় আল্লাহ্‌র সিফাত বা আল্লাহর গুণাবলীর প্রতি কি ঈমান রাখতে হবে এ সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করা হয়েছিল। আল্লাহর গুণাবলী আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহের মধ্যে ফুটে উঠেছে। আল্লাহর ৯৯টি গুণবাচক নাম রয়েছে। এই ৯৯টি নামের মধ্যে একটি নাম হল আর-রাহমান, আরেকটি হল আর-রাহীম। কুরআনে কারীমে অনেক স্থানে এই দুটো নামকে পাশা-পাশি উল্লেখ করা হয়। যেমন সূরা ফাতিহার মধ্যে বলা হয়েছে, الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ "আর-রাহমান" শব্দের যথাযথ অর্থ বাংলায় এক শব্দে প্রকাশ করা যায় না। মোটামুটিভাবে এর অর্থ হয়, অত্যন্ত দয়ালু। কিন্তু দয়া বলতে আমরা যে দয়া বুঝি, যতটুকু পরিমাণ দয়া বুঝি, আল্লাহর দয়া সেরকম নয়, তাঁর দয়ার পরিমাণও সেরকম নয়। আল্লাহ তা'আলা এমন দয়ালু যে, আপন-পর, শত্রু-বন্ধু নিকটের লোক, দূরের লোক নির্বিশেষে সকলের প্রতি দয়া করেন। মানুষ থেকে এমন ব্যাপক দয়া হয় না। আমরা আপন সন্তানদেরকে যেমন ভালবাসি, অন্যদের সন্তানকে সেরকম ভালবাসতে পারি না। আমরা আপনজনের প্রতি মনে যেরকম দয়া-মায়া উপলব্ধি করি, আপনজন নয় তাদের প্রতি সেরকম দয়া-মায়া উপলব্ধি করি না। কিন্তু আল্লাহ পাকের দয়া সকলের জন্য বিস্তৃত। যদি আল্লাহর এরকম দয়া না থাকত, তাহলে দুনিয়ায় কাফেরদেরকে –যারা আল্লাহকে মানে না, তাদেরকে– তিনি টিপে টিপে মেরে ফেলতেন। তাদেরকে অভুক্ত রেখে মেরে ফেলতেন। দুনিয়ায় যতটুকু আল্লাহ তাদেরকে খাওয়াচ্ছেন, যতটুকু সুখ-শান্তি দিচ্ছেন তা আল্লাহর দয়াতেই হচ্ছে।

আল্লাহর দয়ার পরিমাণ কতখানি তা আমাদের কল্পনায়ও আসবে না। একবার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বিষয়টার একটু বিবরণ দিয়েছিলেন। মদীনায় এক মহিলার সন্তান হারিয়ে গিয়েছিল। সন্তান হারিয়ে গেলে মাতা-পিতার কী অবস্থা হয় তা সকলেই বুঝতে পারে। উক্ত মহিলা দিশেহারা হয়ে পাগলের মত মদীনার অলি-গলিতে ঘুরছিল। বিলাপ করে করে কাঁদছিল আর মদীনার অলিতে গলিতে ঘুরছিল। আল্লাহর মর্জি ঘুরতে ঘুরতে মসজিদে নববীর কাছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সামনে এসে মহিলাটি তার সন্তানকে পেল। সন্তানকে পেয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাচ্ছিল আর আনন্দে কাঁদছিল। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিষয়টা দেখলেন। দেখে উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে বললেন, এই সন্তানের প্রতি তার মায়ের যে পরিমাণ দয়া, এমনিভাবে সারা দুনিয়ার সমস্ত মাতা-পিতার অন্তরে তাদের সন্তানের জন্য যে পরিমাণ দয়া, দুনিয়ার যত প্রাণী আছে তাদের বাচ্চাদের প্রতি তাদের যত দয়া-মায়া এই সমস্ত দয়া-মায়াকে যদি একত্র করা হয়, তার চেয়েও আল্লাহর দয়া-মায়া বেশি। সুবহানাল্লাহ! তাই বলা হচ্ছিল আল্লাহর দয়ার পরিমাণ কতটুকু তা আমাদের কল্পনায়ও আসবে না! "আর-রাহমান" নামের মধ্যে আল্লাহর এমন ব্যাপক দয়ার কথাই বোঝানো হয়েছে।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.
Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

যদি কারও মনে প্রশ্ন জাগে আল্লাহর দয়া-মায়া যদি এত বেশি হয়ে থাকবে, তাহলে তিনি কাফেরদেরকে পাপীদেরকে জাহান্নামের শাস্তি দিবেন কেন? এ প্রশ্নের জওয়াব হল– আল্লাহ যেমন দয়ালু, তেমনি অন্যায়ের শাস্তিদাতাও। আল্লাহর এক নাম যেমন "আর-রাহমান" বা অত্যন্ত দয়ালু, তেমনি আল্লাহর আরেক নাম রয়েছে "আল-মুনতাকিমু" অর্থাৎ, অন্যায়ের শাস্তিদাতা। তাই আল্লাহ যেমন দয়া করেন, তেমনি অন্যায়ের শাস্তিও দেন। যদি অন্যায়ের শাস্তি দেয়া না হয়, যদি অপরাধীদেরকে শাস্তি দেয়া না হয়, বরং তাদের প্রতি দয়া করা হয়, তাহলে তারা আরও অপরাধ করে যাবে, পৃথিবীতে ফ্যাসাদ ঘটাবে, নিরীহ মানুষের প্রতি তারা জুলুম করে যাবে। অতএব তাদেরকে শাস্তি না দেয়া, প্রকারান্তরে নিরীহ মানুষের প্রতি জুলুম করা। একজন মানুষের প্রতি আরেকজন জুলুম করে যাচ্ছে, যে জুলুম করছে তার প্রতি যদি আমি দয়া প্রদর্শন করি তাহলে এটা ঐ মাজলুমের প্রতি জুলুম হয়ে গেল। এটা মাজলুমের প্রতি বে-ইনসাফী হয়ে গেল, তার অধিকার নষ্ট করা হল। এসব কারণেই কোন অপরাধীকে শাস্তি না দিয়ে তাকে প্রশ্রয় দেয়া অন্যায়। আর আল্লাহ কোনো অন্যায় করতে পারেন না। তিনি দয়ার অজুহাতে অপরাধীকে প্রশ্রয় দিতে পারেন না। আল্লাহ পাক দয়া করেন কিন্তু সেটা এমন দয়া নয়, যে দয়া অন্য কারও প্রতি নির্দয়তার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। আল্লাহ পাকের গুণাবলীর মধ্যে ব্যালেন্স বা ভারসাম্য রয়েছে।

আল্লাহর দয়াগুণের প্রতি বিশ্বাদের দাবি হল আমরাও অন্যের প্রতি দয়া করব। আল্লাহর দয়াগুণের প্রতি বিশ্বাস মানুষের প্রতি দয়া করতে আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করবে। এভাবে আল্লাহর প্রত্যেক সিফাত বা গুণের প্রতি বিশ্বাস আমাদেরকে বিভিন্ন আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করবে। প্রত্যেকটা বিশ্বাসের সাথে আমল জড়িত আছে। এজন্যই বলা হয়,

تَخَلَّقُوْا بِاَخْلَاقِ اللّٰهِ.

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর চরিত্রে চরিত্রবান হও।

আল্লাহর যত গুণাবলী আছে সেই গুণাবলীর মধ্যে আল্লাহর চরিত্র ফুটে উঠেছে। সেই চরিত্রে আমাদেরকে চরিত্রবান হতে হবে। আল্লাহর দয়া গুণ দেখে আমরাও দয়া করব। আবার দয়া করতে যেয়ে কোন অন্যায়কে প্রশ্রয় দিব না, দয়ার নামে কোন অপরাধীকে প্রশ্রয় দিব না। কারও প্রতি এমন দয়া করতে পারব না, যা আরেকজনের প্রতি জুলুম হয়ে দাঁড়ায়। দয়া করতে যেয়ে কারও প্রতি বে-ইনসাফী করা যাবে না। হাদীছে বলা হয়েছে আল্লাহর দয়া গুণ গ্রহণ করলে আমরা আল্লাহর দয়া পাব। ইরশাদ হয়েছে,

اِرْحَمُوْا مَنْ فِى الْاَرْضِ يَرْحَمُكُمْ مَّنْ فِى السَّمَاءِ. (رواه الترمذي برقم ١٩٢٤ وقال حديث حسن صحيح)

অর্থাৎ, তোমরা দুনিয়াবাসীর প্রতি দয়া কর, তাহলে আসমানবাসী অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলাও তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।

মনে রাখতে হবে আল্লাহর মধ্যে দয়ার গুণ আছে, আবার অন্যায়ের শাস্তি দেয়ার গুণও আছে, তবে এ দুটোর ভিতরে দয়ার মাত্রাটা বেশি। আল্লাহ দয়াও করেন, শাস্তিও দেন, তবে তিনি দয়া বেশি করেন। হাদীছে কুদ্‌সীতে আল্লাহ পাক বলেছেন,

سَبَقَتْ رَحْمَتِيْ غَضَبِيْ. (رواه مسلم في صحيحه برقم ٧١٤٦)

'অর্থাৎ, আমার ক্রোধ আছে অর্থাৎ, অন্যায়ের কারণে আমি শাস্তি দেই, তবে ক্রোধের চেয়ে আমার দয়া প্রবল'।

এজন্য আল্লাহর আযাবের ভয়ও রাখতে হবে। সাথে সাথে আল্লাহর রহমতের অর্থাৎ, দয়ার আশাও রাখতে হবে। রহমতের আশা পরিমাণে বেশি রাখতে হবে। এ কারণেই সুন্নাত তরীকা রাখা হয়েছে–

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



যখন কারও মৃত্যু আসন্ন হয়ে যায় অর্থাৎ, যে মরণাপন্ন ব্যক্তি, তার কাছে আল্লাহর রহমতের কথা বেশি উল্লেখ করতে হবে। যাতে করে মৃত্যুর সময় তার মনে আল্লাহর রহমত পাওয়ার আশা প্রবল হয়ে যায়। ঐ মরণাপন্ন ব্যক্তি জীবদ্দশায় অনেক অপরাধ করে থাকতে পারে, তার অনেক দোষ ত্রুটি থাকতে পারে, মৃত্যুর সময় তার সামনে সেগুলো উল্লেখ না করা চাই। কারণ সেগুলো উল্লেখ করলে তার ভিতরে হতাশা আসতে পারে যে, হায়রে আমি কত অপরাধ করেছি, আল্লাহর কাছে বুঝি আমি ধরা পড়ে যাব, আমার বুঝি নাজাত হবে না। এভাবে তার মনে আল্লাহর রহমত পাওয়ার আশা দুর্বল হয়ে যাবে। আর এই অবস্থায় মৃত্যু হলে হয়তো আল্লাহর রহমত তার নসীব হবে না। কারণ যেরকম বিশ্বাস নিয়ে মানুষ আল্লাহর কাছে উপস্থিত হবে, আল্লাহ তার সংগে সেরকমই মো'আমালা করবেন। হাদীছে কুদসীতে এসেছে– আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ. (رواه البخاري في صحيحه برقم ٧٤٠٥ ومسلم في صحيحه برقم ٦٩٨١)

'অর্থাৎ, আমার বান্দা আমার প্রতি যেমন বিশ্বাস রাখে, আমি তার সাথে সেরকমই মো'আমালা করি'।

তাই মরণাপন্ন ব্যক্তির কাছে তার দোষ-ত্রুটির কথা উল্লেখ না করা চাই; বরং তার জীবনের ভাল ভাল কাজের কথা উল্লেখ করা চাই। যেমন আপনি জীবনে এই এই ভাল কাজ করেছেন, ঐ ঐ ভাল কাজ করেছেন, আল্লাহ্ আপনার প্রতি খুব রহমত করবেন – এরূপ বলা চাই। এরূপ করলে তার মনে আল্লাহর রহমত পাওয়ার আশা প্রবল হবে।

মরণাপন্ন ব্যক্তির সামনে কোন রকম হতাশামূলক কথা বলা উচিৎ নয়। যেমন বলা হল এই নাবালক বাচ্চা রেখে চলে যাচ্ছে, এদের কী হবে? কিংবা অবিবাহিত মেয়ে রেখে চলে যাচ্ছে, এদের কী হবে? কিংবা স্ত্রী বলল তুমি চলে যাচ্ছ, আমার কী হবে? ইত্যাদি এ জাতীয় কথা বলা উচিত নয়। এতে তার মধ্যে হতাশা সৃষ্টি হবে, তার মনে কষ্ট আসবে, এমনকি এসব কথা শুনে তার মনে আল্লাহর প্রতি খারাপ ধারণা সৃষ্টি হতে পারে যে, আমার প্রতি আল্লাহ অবিচার করছেন, এই নাবালক বাচ্চা-কাচ্চা রেখে আল্লাহ আমাকে তুলে নিচ্ছেন! বরং বলা উচিৎ আল্লাহ আপনাকে সুস্থ করবেন, আর যদি আল্লাহ আপনাকে তুলে নেয়া পছন্দ করেন, তাহলে আমাদেরকে আল্লাহ পাক দেখবেন। আপনার কোন চিন্তা নেই, আল্লাহ পাক আমাদের জন্য ভাল ফয়সালা করবেন। আপনার জন্যেও ভাল ফয়সালা করবেন, আপনি তো জীবনে অনেক ভাল কাজ করেছেন, তাই আল্লাহ আপনার জন্য রহমতের ফয়সালা করবেন। এ জাতীয় কথা বললে তার ভিতরে আল্লাহর রহমত পাওয়ার আশা প্রবল হবে, তার মনে আনন্দ আসবে, আল্লাহর প্রতি তার সু-ধারণা সৃষ্টি হবে। যাহোক যে কথা বলা হচ্ছিল আল্লাহর রহমতের মাত্রা বেশি – এই ঈমান রাখতে হবে। তাই আল্লাহর রহমত পাওয়ার আশা প্রবল রাখতে হবে। এজন্যেই আল্লাহর রহমত পাওয়ার আশা দুর্বল হতে পারে– এমন নীতি গ্রহণ করা যাবে না, এমন কোন কাজ করা যাবে না, এমন কোন কথা বলা যাবে না, এভাবে ঈমান বিভিন্ন আমল শিক্ষা দেয়। ঈমান হচ্ছে আমলের বুনিয়াদ। ঈমান সহীহ্ হলে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আমলও সহীহ্ হয়ে যাবে।

আল্লাহ পাক দয়ালু এই বিশ্বাস ভিতরে এসে গেলে সাথে সাথে এই বিশ্বাসও ভিতরে এসে যাবে যে, আল্লাহ পাক কাউকে না খাইয়ে মারবেন না, আল্লাহ পাক কাউকে সৃষ্টি করে তাকে রিযিক দিবেন না এরকম নির্দয় নিষ্ঠুর তিনি হতে পারেন না। অর্থাৎ, আল্লাহ পাক রাজ্জাক বা রিযিক দাতা-এই বিশ্বাসও এসে যাবে।

আল্লাহ পাক "রাজ্জাক" এই রাজ্জাকও আল্লাহর একটি বিশেষ সিফাত বা গুণ। রাজ্জাক অর্থ রিযিকদাতা। আল্লাহ পাক প্রত্যেককে রিযিক দান করেন, কাকে কী পরিমাণ রিযিক দিবেন–তাও আল্লাহ

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

পাক ফয়সালা করে রেখেছেন এবং সেই ফয়সালার ভিতরেই সব কিছু হয়ে থাকে। যাকে যতটুকু দেয়া কল্যাণ, তাকে ততটুকুই দেন। যার সম্পদ কম হওয়ার মধ্যে তার জন্য কল্যাণ, আল্লাহ পাক তাকে সম্পদ কম দেন। আর যার বেশি হওয়ার মধ্যে কল্যাণ তাকে বেশি দেন। আবার অনেক সময় পরীক্ষা করার জন্যও কম বা বেশি দিয়ে থাকেন। বেশি সম্পদ দিয়ে এই পরীক্ষা নেয়া হয় যে, সম্পদ পেয়ে সে আল্লাহকে ভুলে যায় কি-না, সম্পদের অসদ্ব্যবহার করে কি-না। সম্পদের যাকাত সদকা ইত্যাদি হক আদায় করে কি-না। আবার সম্পদ কম দিয়ে এই পরীক্ষা নেয়া হয় যে, সে সবর করে কি-না, সম্পদের আশায় সে হারাম পথে অগ্রসর হয় কি-না। এই পরীক্ষাও নেয়া হয় যে, তাকে অভাবের মধ্যে রাখা হয়েছে, এর মধ্যেই তার জন্য কল্যাণ– এই আকীদা-বিশ্বাস তার ঠিক আছে কি-না।

আল্লাহ পাক কাউকে ধন-সম্পদ কম দেন, কাউকে বেশি দেন, কাউকে গরীব রাখেন, কাউকে ধনী বানান- এর মধ্যে অনেক রহস্য রয়েছে। যেমন একটা রহস্য বয়ান করে কুরআন শরীফে বলা হয়েছে,

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ رَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا.

অর্থাৎ, আমি দুনিয়ায় মানুষের মাঝে রিযিক বন্টন করে দিয়েছি। কতক লোককে রিযিক বেশি দিয়ে তাদের স্তরকে উন্নীত করেছি, যাতে একে অপরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। (সূরা যুখরুফ: ৩২)

এখানে বোঝানো হয়েছে যে, ধনী গরীবের এই তারতম্য করা হয়েছে। যাতে দুনিয়ার ব্যালেন্স ঠিক থাকে এবং একজনের উপর আরেকজন কর্তৃত্ব করতে পারে। সবাই যদি সমান সম্পদশালী হত, তাহলে কেউ কারও কর্তৃত্ব মানত না, তাহলে অফিস আদালতে কেউ পিওন হতে চাইত না, সকলেই বস হতে চাইত। কেউ কারও অর্ডার মানত না, কারণ সকলেই মনে করত আমি তো ওনার চেয়ে খাটো নই। এরকম হলে দুনিয়ার প্রশাসন, শৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনা সব অচল হয়ে পড়ত, দুনিয়া অচল হয়ে পড়ত। টাকা-পয়সা, জ্ঞান-বুদ্ধি, ক্ষমতা, পদ-মর্যাদা এই সবকিছুর ভিতর যদি তারতম্য না থাকত তাহলে দুনিয়া চলত না আল্লাহ পাক এই দুনিয়াকে সচল রাখার জন্যই এই তারতম্য রেখেছেন। এখন বিশ্বাস রাখতে হবে আমার জন্য যেটা ভাল আল্লাহ আমার জন্য সেটাই করেছেন।

আল্লাহ পাক রিযিক দেনেওয়ালা। বর্তমানেও তিনি সকলকে রিযিক দিচ্ছেন, অতীতেও সকলকে তিনিই রিযিক দিয়েছেন। ভবিষ্যতেও তিনিই সকলকে রিযিক দিবেন এবং যার জন্য যতটুকু দেয়ার ফয়সালা তিনি করে রেখেছেন, তাকে সে অনুসারে পরিকল্পনা মোতাবেক দিবেন। সকলকে রিযিক দেয়ার দায়িত্ব আল্লাহ পাক নিয়ে নিয়েছেন– এই বিশ্বাস যদি আমাদের মধ্যে মজবুত থাকে, তাহলে আমরা এরূপ মনে করতে পারি না যে, দুনিয়ার লোক সংখ্যা যেভাবে বেড়ে যাচ্ছে, তাতে ভবিষ্যতে মানুষের খাদ্যের সংকট দেখা দিবে, বাসস্থানের সংকট দেখা দিবে, অতএব জন্মনিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি গ্রহণ করে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এরূপ মনে করলে এটা আল্লাহ যে রিযিকদাতা–এই আকীদা বিশ্বাসের পরিপন্থী হয়ে যাবে। এটা হবে ঈমানবিরোধী–চেতনা। ঈমানী–চেতনা হল যা কুরআন শরীফে বলা হয়েছে,

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا.

'অর্থাৎ, আল্লাহ বলেন, দুনিয়ার সমস্ত প্রাণীর রিযিক সরবরাহ করার দায়িত্ব আমার'। (সূরা হুদ: ৬)

এ আয়াতে বলা হয়েছে– শুধু মানুষের নয় সমস্ত প্রাণীর জীবিকা সরবারহ করার দায়িত্ব আল্লাহ নিয়ে নিয়েছেন। দুনিয়াতে পানির মধ্যে এমন এমন মাছ আছে প্রতিদিন যার এক একটার খাদ্য টনকে টন।

www.maktabatulabrar.com



বন জঙ্গলে এমন অসংখ্য জীব জানোয়ার আছে, যার এক একটার খাদ্য বহু মানুষের সমান। আল্লাহ তা'আলা এই সকল প্রাণীর খাদ্যের ব্যবস্থা করছেন। অসহায় জীব জানোয়ারের পর্যন্ত খাদ্য সরবরাহ করছেন। এরকম ঘটনা শোনা গিয়েছে-একটা মরা তাল গাছের ভিতরে একটা ফোকড়ের মধ্যে একটা অন্ধ সাপ রয়েছে, একটা পাখি বাইরের থেকে খাবার এনে এনে ঐ সাপের মুখে ছেড়ে দিচ্ছে, আর ঐ সাপ তা খেয়ে জীবন ধারণ করছে। কে ঐ পাখিকে শিখিয়ে দিল যে, ঐ অন্ধ সাপ চলা ফেরা করে জীবিকা আহরণ করতে সক্ষম নয়, তার মুখে খাবার পৌঁছে দাও? আল্লাহ পাক সকলের জন্য রিযিক সরবরাহের দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছেন। দুনিয়ার লোক সংখ্যা বাড়ছে খাদ্যের উৎপাদনও বৃদ্ধি পাচ্ছে। পূর্বে এক বিঘা জমিতে যেখানে এক মণ দুই মণ ধান হত, এখন সেখানে বিশ মণ পঁচিশ মণ ধান উৎপাদন হচ্ছে। কে মানুষকে এভাবে ফসল বেশি পরিমাণ উৎপাদন করার মেধা দিয়েছে? আল্লাহ পাকই দিয়েছেন। আল্লাহ মানুষ তৈরি করেছেন, এই মানুষের সংখ্যা যখন যেভাবে বৃদ্ধি পাবে, সে অনুপাতে সম্পদ বৃদ্ধি করার মত মেধাও তিনি দিয়ে দিচ্ছেন এবং দিবেন। প্রয়োজন মত বাসস্থানের ব্যবস্থাও তিনি সম্প্রসারিত করবেন। বহু ভূখণ্ড, বহু দ্বীপ-উপদ্বীপ আবিষ্কৃত হয়েছে, প্রয়োজনে আরও হবে। বহু অনাবাদী ভূমি আবাদ হয়েছে প্রয়োজনে আরও হবে। আল্লাহই করে দিবেন। নাউযুবিল্লাহ আল্লাহ পাক এমন বে-আক্কল নন যে, এত মানুষ পয়দা করবেন যাদেরকে তিনি খেতে দিতে পারবেন না, থাকার জায়গা দিতে পারবেন না। আল্লাহর সব কিছুই সু-নির্ধারিত পরিকল্পনা মোতাবেক হয়ে থাকে। তিনি জেনে বুঝেই সবকিছু করেন। মাপ ছাড়া কোন কাজ করেন না। আল্লাহ পাক বলেছেন,

وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ.

'অর্থাৎ, তাঁর নিকট সব কিছুরই পরিমাপ রয়েছে'। (সূরা রা'দ: ৮) অন্যত্র ইরশাদ করেন,

وَ اِنْ مِّنْ شَىْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَآئِنُهٗ وَ مَا نُنَزِّلُهٗۤ اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ.

'অর্থাৎ, আমার কাছে প্রত্যেক বস্তুর ভাণ্ডার রয়েছে, আমি নির্দিষ্ট পরিমাণেই তা সরবরাহ করে থাকি'। (সূরা হিজ্‌র: ২১)

এ আয়াতে বোঝানো হয়েছে রিযিক ইত্যাদি সবকিছুই তিনি পরিকল্পনা মোতাবেক দিয়ে থাকেন। তাঁর কোন কাজ অপরিকল্পিত বা এলোমেলো নয়। অতএব যদি মনে করা হয় বেশি জনসংখ্যা হতে দিব না, বরং জনসংখ্যা কমাব, যাতে বেশি লোকের অন্ন বস্তু অল্পসংখ্যক লোকেরা পর্যাপ্ত ব্যবহার করতে পারে। এ ধারণা ভুল। একজনের রিযিক আর একজন গ্রহণ করতে পারবে না। কবি বলেন,

برسر ہر دانۂ مکتوب داں + کہ ایں رزق فلان بن فلاں

অর্থাৎ, প্রত্যেকটা দানার উপর লেখা আছে এটা অমুকের পুত্র অমুকের, অতএব সে ছাড়া অন্য কেউ সেটা ভোগ করতে পারবে না। আমাদের চোখের সামনে এমন বহু ঘটনা ঘটে, একজন মানুষ খেতে বসেছে, খাওয়া শেষ হওয়ার আগেই তার মৃত্যু হয়ে গেল। কিংবা খাবার সামনে নিয়ে বসেছে, একটা দুঃসংবাদ এল, খাবার রেখে সে অন্যত্র চলে গেল, অন্য কেউ খেয়ে ফেলল। বুঝা গেল ঐ খাবারটা প্রথম ব্যক্তির জন্য বরাদ্দ ছিল না। যার জন্য বরাদ্দ ছিল সে-ই তা খেল। একটা ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে একজন মানুষ খাবার খাচ্ছিল। সেখানে এক কামেল ওলী উপস্থিত ছিলেন। তার অন্তরদৃষ্টি খোলা ছিল। তিনি বললেন আমি দেখতে পাচ্ছি তোমার এই বর্তনে একটা খাবার দানা আছে, যা একটা মুরগির খাবার। দেখা গেল সেই লোকটা খাওয়ার মধ্যে হঠাৎ বিষম লাগল, নাকের ভিতর খাদ্যকণা উঠে গেল। কোনভাবে সেটা বের করতে পারল না। অবশেষে ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হল। ডাক্তার যন্ত্র দিয়ে

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.
Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

খাদ্যকণাটা বের করলেন। খাদ্যকণাটি নাক থেকে মাটিতে পড়া মাত্রই একটা মোরগ এসে সেটা খেয়ে ফেলল। সুবহানাল্লাহ! কোন্ যুগের কোন মানুষের কোন্ প্রাণীর কতটুকু রিযিক সবকিছু সৃষ্টি করার আগেই আল্লাহ তার ফয়সালা করে রেখেছেন। আল্লাহর ফয়সালার কোন পরিবর্তন ঘটে না।

অতএব ভবিষ্যতে মানুষ বাড়লে তাদের অন্ন-বস্ত্রের কী উপায় হবে, তাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা কোথায় হবে? এসব চিন্তা করে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করলে তা হবে ঈমান-আকীদা বিরোধী। আল্লাহ যাদেরকে তৈরি করবেন, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ পাকই ভাল জানেন, তাদের বিষয়টা আল্লাহর পরিকল্পনার বাইরে নয়। তাদের বাসস্থান কোথায় হবে, তাদের খাদ্যের যোগান কীভাবে হবে, আল্লাহ পাকই তা ভাল জানেন। আল্লাহই তার দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছেন। আল্লাহর দায়িত্ব নিয়ে আমাদের টানাটানি করা উচিৎ নয়।

তবে একটা প্রশ্ন থেকে যায়- তাহলে কি জন্মনিয়ন্ত্রণের কোন পদ্ধতিই গ্রহণ করা যাবে না? তাহলে শুনুন- জন্মনিয়ন্ত্রণের কয়েক ধরনের পদ্ধতি রয়েছে। তার মধ্যে একটা হল স্থায়ী পদ্ধতি অর্থাৎ, পুরুষের জন্য ভ্যাসেকটমী এবং মহিলার জন্য লাইগেশন, এটা কোন অবস্থাতেই গ্রহণ করা জায়েয নয়। কারণ এই অপারেশন দ্বারা আল্লাহর দেয়া একটা ক্ষমতা অর্থাৎ, প্রজনন ক্ষমতাকে নষ্ট করে ফেলা হয়। আল্লাহর দেয়া কোন ক্ষমতাকে আমরা নষ্ট করতে পারি না। যেমন, আমার দৃষ্টি শক্তি আল্লাহর দেয়া একটা ক্ষমতা, আমি ইচ্ছা করলে আমার এই শক্তি নষ্ট করে দিতে পারব না, আমার জন্য এটা জায়েয হবে না। এমনি-ভাবে আল্লাহ আমাকে বলার শক্তি দিয়েছেন এবং বলার জন্য জিহ্বা দিয়েছেন, এখন আমি ইচ্ছা করলেই আমি আমার জিহ্বা কেটে ফেলে এই শক্তি নষ্ট করে দিতে পারি না। একথা বলা যাবে না যে, আমার এসব অঙ্গ আমি নষ্ট করে ফেলব, কার কী বলার আছে? কারণ আমি এগুলোর প্রকৃত মালিক নই। আসল মালিক আল্লাহ। তিনি আমাদের কাছে এসব অঙ্গ, এসব ক্ষমতা আমানত রেখেছেন, আমাদেরকে এগুলো হেফাযত করার দায়িত্ব দিয়েছেন, এগুলোর সদ্ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছেন, নষ্ট করার অধিকার দেননি। অতএব জন্মনিয়ন্ত্রণের স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণ করার মাধ্যমে আল্লাহর দেয়া প্রজনন ক্ষমতাকে নষ্ট করা জায়েয নয়।

হ্যাঁ অস্থায়ী পদ্ধতি যেমন বড়ি, কনডম ইত্যাদি যদি স্বাস্থ্যগত কারণে হয়, তাহলে তার ভিন্ন মাসআলা আছে। বিজ্ঞ, দ্বীনদার ডাক্তার যদি বলেন, 'এখন সন্তান নিলে স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর হবে', তাহলে সাময়িক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। যদি কেউ বেশি সন্তান হলে ঝামেলাবোধ করেন এবং অল্প সন্তান নিয়ে সিমসাম থাকতে চান, তাহলে এটা হল বিলাসিতার মানসিকতা, বিলাসিতা শরীআতে কাম্য নয়।

তবে মনে রাখতে হবে অধিক সন্তান হলে পৃথিবীর জনসংখ্যা বেড়ে খাদ্যের সংকট হবে, বাসস্থানের সংকট হবে, এসব ঈমানবিরোধী-চেতনা নিয়ে কোন পদ্ধতিই গ্রহণ করা জায়েয হবে না। আল্লাহ পাক সকলের জন্য রিযিক সরবরাহকারী, যার জন্য যতটুকু মুনাসেব, যার জন্য যতটুকু সংগত, যার জন্য যতটুকু ভাল, তার জন্য ততটুকু আল্লাহ দিবেন। তৈরিও করেন আল্লাহ, রিযিকও দান করেন তিনি। আল্লাহ রিযিকদাতা, আল্লাহ পরিকল্পনাকারী, আল্লাহর এসব গুণাবলীর প্রতি সহীহ বিশ্বাস থাকলে বহু আমল সহীহ হয়ে যাবে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে সহীহ সমঝ দান করুন। ইনশাআল্লাহ আগামীতে আল্লাহর আরও কিছু সিফাত বা গুণাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক দান করুন। আমীন!

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



**বয়ান নং ৪-এর খুতবা**

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْمُسْتَجْمِعِ لِجَمِيْعِ صِفَاتِ الْكَمَالِ، اَحْمَدُهٗ حَمْدًا كَثِيْرًا فِى الْحَالِ وَالْمَالِ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ فِى الصِّفَاتِ وَالْاَفْعَالِ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهُ الَّذِىْ اِخْتَصَّهٗ بِمَزِيْدِ الْفَضْلِ وَالْكَمَالِ، وَهُوَ الْهَادِىْ اِلٰى صَالِحِ الْاَعْمَالِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ صَلَاةً وَّسَلَامًا دَائِمَيْنِ بِلَا زَوَالٍ.

اَمَّا بَعْدُ :

فَيَاَيُّهَا النَّاسُ! عَلَيْنَا الْاِيْمَانُ بِذَاتِهٖ تَعَالٰى وَصِفَاتِهٖ. وَصِفَاتُهٗ تَعَالٰى كَثِيْرَةٌ ، ظَهَرَتْ فِىْ اَسْمَائِهِ الْحُسْنٰى. وَجَاءَ فِى الْحَدِيْثِ اِنَّ لِلّٰهِ تِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ اِسْمًا، مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ. وَمِنْ تِلْكَ الصِّفَاتِ اَنَّهٗ تَعَالٰى هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ. وَمِنْ رَّحْمَتِهٖ خَلَقَ هٰذِهِ الْاَرْضَ وَالسَّمٰوٰتِ، وَهٰذِهِ النُّجُوْمَ وَالسَّيَّارَاتِ، وَهٰذِهِ الْجِبَالَ وَالْبِحَارَ، وَهٰذِهِ الْاَشْجَارَ وَالْاَنْهَارَ. وَمِنْ رَّحْمَتِهٖ تَوَلّٰى مَسْئُوْلِيَّةَ تَرْزِيْقِ الْمَخْلُوْقَاتِ، فَقَالَ : وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا. وَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَسَّعَ الرِّزْقَ عَلٰى بَعْضٍ وَضَيَّقَ عَلٰى اٰخَرَ، ذَالِكَ مِنْ حِكْمَتِهٖ. قَالَ تَعَالٰى فِىْ كِتَابِهٖ : نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيْشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا. وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ. وَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى هُوَ

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

الْقَابِضُ الْبَاسِطُ، فَيَبْسُطُ الرِّزْقَ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ بِرَحْمَتِهٖ، وَيَقْدِرُ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ بِحِكْمَتِهٖ، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ، وَهُوَ تَعَالٰى عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالُ، وَقَالَ تَعَالٰى : وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهٗ، وَمَا نُنَزِّلُهٗ اِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُوْمٍ.

وَاِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَنَا بِالتَّخَلُّقِ بِاَخْلَاقِهٖ فَقَالَ : تَخَلَّقُوْا بِاَخْلَاقِ اللّٰهِ . فَعَلَيْنَا الرَّحْمَةُ بِالْخَلْقِ، فَيَرْحَمُنَا الْحَقُّ. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِرْحَمُوْا مَنْ فِى الْاَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ. وَفِى حَدِيْثٍ اٰخَرَ مَنْ لَّا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ.

وَكَمَا اَنَّهٗ تَعَالٰى هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ يَرْحَمُ مَنْ يَعْبُدُهٗ، كَذَالِكَ هُوَ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ يُعَذِّبُ مَنْ يَّعْصِيْهِ، فَالْاِيْمَانُ بَيْنَ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ. وَلٰكِنْ رَّحْمَتُهٗ سَبَقَتْ غَضَبَهٗ. وَفِى الْحَدِيْثِ الْقُدْسِيِّ – سَبَقَتْ رَحْمَتِىْ غَضَبِىْ.

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمُ : هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ.

اَقُوْلُ قَوْلِىْ هٰذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ لِىْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَاسْتَغْفِرُوْهُ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



বয়ান নং-৫

## আল্লাহর সিফাত তথা গুণাবলীর প্রতি ঈমান প্রসঙ্গ (২য় পর্ব)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ، اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ. وقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا يَزْنِى الزَّانِيْ حِيْنَ يَزْنِيْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ. الحديث.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

গত জুমুআয় আল্লাহর গুণাবলীর উপর কীভাবে ঈমান রাখতে হয় এ সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করা হয়েছিল। আল্লাহর ৯৯টা গুণবাচক নাম রয়েছে। এসব গুণবাচক নামের মধ্যে আল্লাহর গুণাবলী ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সূরা হাশরের একটা আয়াতের মধ্যে আল্লাহর এরকম কয়েকটা গুণবাচক নামের উল্লেখ এসেছে। ইরশাদ হয়েছে,

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ، اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ.

এ আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার ৮টা সিফাত বা গুণের কথা বলা হয়েছে। একটা হল "আল-মালিক" অর্থাৎ, তিনি সম্রাট, রাজত্ব পরিচালনাকারী। শুধু দুনিয়ার নয়, মহাবিশ্বের, মহারাজত্বের সম্রাট তিনি। মহারাজত্বের মহান পরিচালক তিনি। আল্লাহ মহাবিশ্বের, মহারাজত্বের পরিচালক মহান সম্রাট, মহান রাজা, এর অর্থ হল আমরা তাঁর প্রজা, মহাবিশ্বের সবকিছু তাঁর প্রজা। প্রজা যেমন রাজার আইনের বিরোধিতা করতে পারে না, তদ্রূপ আমরাও আল্লাহর আইনের বিরোধিতা করতে পারব না। কোন রাষ্ট্রের প্রজা যদি সেই রাষ্ট্রের আইন অমান্য করে, তাহলে সে অপরাধী সাব্যস্ত হয়। আর যদি আইনের বিরোধিতা করে, তাহলে তাকে রাষ্ট্রদ্রোহী সাব্যস্ত করা হয়। তাই আল্লাহর আইন তথা আল্লাহর দেয়া হুকুম-আহকাম ও আল্লাহর দেয়া বিধি-বিধানের বিরোধিতা করার বা অমান্য করার কোন অবকাশ নেই। একমাত্র জিন আর ইনসান এমন, যাদের কেউ কেউ আল্লাহর আইন তথা আল্লাহর বিধি-বিধান অমান্য করে। এ ছাড়া আসমান-যমীনের এবং প্রকৃতির সবকিছু এবং সকলে আল্লাহর হুকুম মান্য করে চলছে। কুরআন শরীফে বলা হয়েছে,

وَ لَهٗ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ طَوْعًا وَّ كَرْهًا وَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ.

অর্থাৎ, আসমান-যমীনের সবকিছু এবং সকলে স্বেচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক তাঁরই অনুগত। কারণ সব আল্লাহর প্রজা, আর প্রজা হয়ে রাজার আইন অমান্য করা বা তার বিরোধিতা করা যায় না। অমান্য করা বা বিরোধিতা করা হল অবাধ্যতা। কুরআন শরীফে ইরশাদ হয়েছে,

فَمَنْ تَوَلّٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ.

অর্থাৎ, যারা ঈমান-আমল তথা আল্লাহর হুকুম-আহকাম থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে নিবে, তারা অবাধ্য, কাফের।

অতএব আল্লাহর আইনের বিরোধিতাকারী মু'মিন মুসলমান নয় বরং কাফের, সে খোদাদ্রোহী। যারা ইসলামী আইনের বিরোধিতা করে, তারা আল্লাহর কাছে রাষ্ট্রদ্রোহী তথা খোদাদ্রোহী বলে পরিচিত। তারা

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

মু'মিন মুসলমানদের কাতারের মানুষ নয়। যারা রাষ্ট্রের আইনকে অযৌক্তিক বলে, তারা যেমন রাষ্ট্রদ্রোহী, তদ্রূপ যারা আল্লাহর আইন তথা আল্লাহর দেয়া বিধি-বিধানকে অযৌক্তিক প্রমাণ করার চেষ্টা করে বা বলে এটা যুক্তিযুক্ত নয়, এটা চলতে পারে না, এটাও আল্লাহর আইনের বিরোধিতা করা, এটাও অবাধ্যতা, এটাও খোদাদ্রোহিতা।

আল্লাহ তাআলা মালিক বা সম্রাট, তবে তিনি দুনিয়ার সম্রাটদের মত নন। দুনিয়ার সম্রাটরা ক্ষমতার দাপটে যাচ্ছেতাই করে, জুলুম করে অবিচার করে, ন্যায়-অন্যায়ের ধার ধারে না, যা খুশি তাই করতে থাকে, আল্লাহ তদ্রূপ নন। তিনি জুলুম, অবিচার ইত্যাদি যাবতীয় অন্যায় ও দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র। এজন্যই আল্লাহ মালিক বা সম্রাট একথা বলার সাথে সাথে বলা হয়েছে "আল-কুদ্দুস", এটাও আল্লাহর আর একটা গুণবাচক নাম, কুদ্দুস অর্থ পবিত্র, এখানে বোঝানো হয়েছে যে, তিনি সম্রাট, ক্ষমতা তাঁর হাতে, কিন্তু তিনি কারও প্রতি জুলুম করেন না, অবিচার করেন না, সবরকম জুলুম, অন্যায়, অবিচার থেকে তিনি পবিত্র, সবরকম দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন শুধু রাষ্ট্রীয় পরিচালনা কাজেই দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র নন, আল্লাহর সৃষ্টির কোন কিছুর মধ্যে কোন দোষ-ত্রুটি নেই। সবকিছু যেভাবে সৃষ্টি করার দরকার ছিল, সেভাবে তিনি সৃষ্টি করেছেন, সবকিছু যেভাবে সৃষ্টি করা যুক্তিযুক্ত ছিল সেভাবে তিনি সৃষ্টি করেছেন। দুনিয়ার একটা ক্ষুদ্রতম প্রাণীও তিনি অহেতুক সৃষ্টি করেননি। কোন কিছু খাপ ছাড়া সৃষ্টি করেননি। আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে কোন ত্রুটি নেই। সূরা মুলকের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলে দিয়েছেন,

مَا تَرٰى فِىْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ.

'অর্থাৎ, দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে কোন ত্রুটি কোন বৈপরিত্য তুমি দেখতে পাবে না'। তারপর আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّ هُوَ حَسِيْرٌ.

'অর্থাৎ, তোমার দৃষ্টি তুলে তাকাও, চোখ মেলে তাকাও, আমার সৃষ্টির মধ্যে কোন ত্রুটি খুঁজে পাওকি? আবার বলছি, দৃষ্টি তুলে তাকাও, তোমার দৃষ্টি ক্লান্ত হয়ে, ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসবে, আমার সৃষ্টির মাঝে কোন রকম দোষ ত্রুটি খুঁজে পাবে না'।

স্বভাব এবং চরিত্রেও আল্লাহ তাআলা পবিত্র। আল্লাহর যাহের, বাতেন সব পবিত্র। হাদীছে বলা হয়েছে,

اِنَّ اللّٰهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ، نَظِيْفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ. (رواه الترمذي برقم ٢٧٩٩ وقال حديث غريب)

অর্থাৎ, আল্লাহ যেহেতু পবিত্র-পরিচ্ছন্ন, তাই পবিত্রতাকে তিনি ভালবাসেন।

এখানে আমাদেরকে আল্লাহর পবিত্রতার গুণে গুণান্বিত হয়ে সবরকম পবিত্রতা অর্জন করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এমনকি হাদীছে এ-ও বলা হয়েছে যে, ঘরের আশ-পাশকেও পবিত্র রাখ। ইরশাদ হয়েছে,

نَظِّفُوْا اَفْنِيَتَكُمْ. (رواه الترمذي برقم ٢٧٩٩ وقال حديث غريب)

অর্থাৎ, তোমাদের ঘরের আশ-পাশকে পরিষ্কার রাখ। আল্লাহ পবিত্রতা এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাকে ভালবাসেন, কাজেই তুমি নিজেও পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন থাক, তোমার ঘরের আশ-পাশকেও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখ।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



এ হাদীছের আলোকে আমার ঘরের আশ-পাশে যদি রাস্তা ঘাট থাকে, সেটাও পরিচ্ছন্ন রাখা আমার দায়িত্ব। আমরা তো রাস্তা-ঘাট পরিস্কার করার সব দায়িত্ব মিউনিসিপলিটির উপর ছেড়ে দিয়েছি। আমি যত পারি রাস্তা ঘাট ময়লা করব, আর মিউনিসিপলিটি শুধু পরিষ্কার করে যাবে। কিন্তু আমাদের মত গরীব দেশের মিউনিসিপলিটির পক্ষে এত পরিষ্কার করা সম্ভব হচ্ছে না। ইসলামী তরীকায় চলে আসলে কোন সমস্যাই ছিল না। উপরোক্ত হাদীছের উপর আমল করে যদি আমি আমার ঘর, ঘরের আশ-পাশের রাস্তা-ঘাটকে পরিষ্কার রাখি, তাহলে পরিষ্কার করার জন্য মিউনিসিপলিটির বিশাল কোন বাহিনীর প্রয়োজন হয় না। যাহোক আল্লাহ যেহেতু পবিত্র, আল্লাহ পবিত্রতা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাকে ভালবাসেন। তাই আমি ঘর বাড়িও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখব, রাস্তা-ঘাটও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখব, কাপড়-চোপড়ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখব, হোক কমদামী পোষাক-পরিচ্ছদ কিন্তু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখব। আল্লাহ এটা পছন্দ করেন। আল্লাহ খুব বেশি কাপড় পছন্দ করেন এরকম নয়, বরং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা তিনি পছন্দ করেন। হ্যাঁ যদি আল্লাহ কাউকে অর্থের নেয়ামত দিয়ে থাকেন, তাহলে আল্লাহর নেয়ামতের বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর জন্য তিনি দামী পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করতে পারেন এই নিয়তে যে, আল্লাহ পাক আমাকে অর্থের নেয়ামত দিয়েছেন, তাঁর নেয়ামতের প্রকাশ ঘটাতে হবে। যদি এই নিয়তে হয় তাহলে ছওয়াবের হয়ে যাবে। যদি কেউ এই নিয়তে ছেঁড়া-ফাটা কাপড় পরিধান করেন যে, তার টাকা পয়সা সম্বন্ধে কেউ যেন বুঝতে না পারে, এভাবে আল্লাহর নেয়ামতকে গোপন করা হয়, তাহলে এই দৃষ্টিভঙ্গি ভাল নয়। কিংবা যদি কারও এরূপ নিয়ত থাকে যে, ছেঁড়া-ফাটা পোষাক পরিধান করব, ভাঙ্গা-চোরা অবস্থায় চলব, যাতে মানুষে মনে করে যে, ওনার দুনিয়ার প্রতি কোন মোহ নেই, খুব বুযুর্গ মানুষ, তাহলে এটাও হবে খারাপ। এভাবে নিয়তের ভিত্তিতে একই আমল ভালও সাব্যস্ত হয় খারাপও সাব্যস্ত হয়। একই আমল ভাল নিয়তে করলে ভাল সাব্যস্ত হয়, খারাপ নিয়তে করলে খারাপ সাব্যস্ত হয়।

আল্লাহর পবিত্রতা গুণে যদি আমরা বিশ্বাস করি, তাহলে আল্লাহর সৃষ্টির কোন ত্রুটি আমরা বলতে পারব না। আল্লাহ এটা কেন সৃষ্টি করলেন, ওটা কেন করলেন, আমাকে কেন গরীব বানালেন, ওমুককে কেন ধনী বানালেন, আমাকে এই গরীব দেশে কেন তৈরি করলেন, আমেরিকায় কেন তৈরি করলেন না, তাহলে ধনী দেশের মানুষ হতাম- এরকম কোন অভিযোগ মুখে বা মনে আনা যাবে না। আল্লাহ যেটা যেভাবে সৃষ্টি করা উপযোগী ছিল, সেটা সেভাবে সৃষ্টি করেছেন। যেটা যেমন হওয়া দরকার ছিল, যেমন হওয়ার যুক্তি ছিল, সেভাবেই তিনি করেছেন। আল্লাহর এই সিফাতে বিশ্বাস করলে পবিত্রতা অর্জন করতে হবে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন-এর আর দুইটি সিফাত বা গুণ হল আস-সালাম ও আল-মু'মিন। "আসসালাম" অর্থ শান্তিদানকারী ও শান্তিময় এবং "আল মু'মিন" অর্থ নিরাপদ ও নিরাপত্তা দানকারী। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সম্রাট হওয়া সত্ত্বেও নিরাপদ ও শান্তি দানকারী। আল্লাহর ক্ষমতা আছে তবে এই ক্ষমতার দ্বারা তিনি কাউকে বিপদে ফেলেন না, ক্ষমতার দ্বারা কারও জান-মালের নিরাপত্তা নষ্ট করেন না। দুনিয়ার কোন মানুষের ক্ষমতা থাকলে মানুষ তার ভয়ে সবসময় তটস্থ থাকে– কখন যেন সে কার জান-মালের ক্ষতি সাধন করে বসে, কখন যেন কার শান্তি নষ্ট করে বসে! কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ক্ষমতার অধিকারী, সাথে সাথে তিনি শান্তি দানকারী, তিনি নিরাপদ, তিনি কারও অশান্তির কারণ হন না, কারও শান্তি নষ্ট করেন না, তিনি কারও জান মালের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করেন না। বরং তিনি নিরাপত্তা বিধান করেন। বিপদ আপদ থেকে উদ্ধার করেন।

আল্লাহ শান্তি দানকারী। অতএব শান্তি কামনা করতে হলে আল্লাহর কাছেই কামনা করতে হবে। শান্তি

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

আল্লাহর কাছেই অন্য কারও কাছে নয়। আল্লাহর হুকুম মানলেই আমাদের শান্তি আসবে। দুনিয়াতেও শান্তি আসবে, আখেরাতেও শান্তি আসবে। আল্লাহর হুকুম-আহকাম কুরআন-হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। অতএব কুরআন হাদীছের মধ্যেই আমাদের শান্তির পথ বলে দেয়া হয়েছে। এখন যদি কেউ কুরআন-হাদীছকে বাদ দিয়ে মনে করে অমুকের আদর্শ মানার মধ্যে শান্তি তাহলে সেটা হবে গোমরাহী। এভাবে আল্লাহর এক একটা গুণের প্রতি ঈমান বিশ্বাস, মানুষের জীবনের অনেক নীতি পরিবর্তন করে দিবে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আর একটি গুণ হল আল-মুহাইমিনু, আল-মুহাইমিনু অর্থ নেগাহবান, অর্থাৎ, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সবকিছুর প্রতি স্বযত্ন লক্ষ রাখেন, সবকিছু তত্ত্বাবধায়ন করেন, সবকিছু নেগরানী করেন। আল্লাহর একটি গুণ হল আর-রাকীব, আর-রাকীব অর্থ পর্যবেক্ষণকারী, তিনি সবকিছু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিদর্শন করেন, সবকিছু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি এমন সম্রাট যার দৃষ্টির বাইরে যার পর্যবেক্ষণের বাইরে কোন কিছু নেই। গাছের একটা পাতা ঝরে পড়বে, তাও তার জানার বাইরে নয়। পড়ার পরে তিনি জানেন তা নয়, বরং পড়ার আগ থেকেই তিনি তা জানেন।

যদি কোন মানুষের এই বিশ্বাস থাকে যে, আল্লাহ তা'আলা আমার সবকিছু দেখেন এই এক বিশ্বাসই তার জীবনকে দুরস্ত করে দিতে পারে। মানুষ কোন অপরাধ করতে পারবে না, যদি তার ভিতরে এই বিশ্বাস মজবূত এবং জাগ্রত থাকে যে, আমি যা করছি আল্লাহ পাক তা দেখছেন। মানুষ আইনের চক্ষু ফাকি দিয়ে গোপনে অনেক অন্যায় করে, সে অন্যায় করতে পারে এই ভেবে যে, আইনের লোকজন তাকে দেখছে না। কিন্তু আল্লাহর কাছে গোপনীয়তা বলে কিছু নেই। আল্লাহর কাছে গোপন ও সদর সবই সমান। আমি যদি একশত হাত মাটির তলে যেয়েও কিছু করি, মঙ্গল গ্রহে যেয়েও কিছু করি আল্লাহ পাক তাও দেখছেন। তাই মু'মিন গোপনেও কোন অপরাধ করতে পারার কথা নয়। কারণ তার বিশ্বাস-আল্লাহ সব অবস্থাতেই সবকিছু দেখেন। যখন মানুষ কোন অপরাধ করে, তখন আল্লাহ তাকে দেখছেন এই ঈমানী বিশ্বাস তার ভিতরে জাগ্রত থাকে না। তার মধ্যে ঈমানী বিশ্বাস জাগ্রত থাকলে সে অপরাধ করতে পারত না। এক হাদীছে বলা হয়েছে,

لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. الحديث (رواه البخاري في صحيحه برقم ٢٤٧٥ ومسلم في صحيحه برقم ٢١١)

সংক্ষেপে হাদীছের অর্থ হল- যার ভিতরে ঈমানী-চেতনা জাগ্রত থাকে সে চুরি করতে পারে না, সে যেনা করতে পারে না, সে ডাকাতি করতে পারে না, সে ছিনতাই করতে পারে না, সে শরাব পান করতে পারে না। কারণ তার ভিতরে এই চেতনা জাগ্রত যে, আমার সবকিছু আল্লাহ দেখছেন, আমার সবকিছু আল্লাহর দৃষ্টির সামনে, তাঁর দৃষ্টির অগোচর বলে কিছু নেই, অপরাধ করলে আল্লাহ দেখবেন, শাস্তি দিবেন। এই বিশ্বাস থাকলে কীকরে সে অপরাধ করতে পারে?

এমনও মনে করা যাবে না যে, আমি অপরাধ করলে আল্লাহ দেখবেন, কিন্তু তিনি হয়তো আমকে শাস্তি দিতে পারবেন না। তাই বলা হয়েছে তিনি আল-আযীয, "আল-আযীয" অর্থ পরাক্রমশালী অর্থাৎ, তিনি সকলকে পরাভূত করতে সক্ষম। কেউ তাকে পরাভূত করতে বা তাঁর মোকাবিলা করতে সক্ষম নয়। কিয়ামতের দিন সমস্ত অপরাধীরা মিলে যদি আল্লাহর শাস্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চায় তা পারবে না। কেউ আল্লাহর মোকাবিলা করতে সক্ষম নয়। তিনি আল-জাব্বার, অর্থাৎ, প্রবল বিক্রমশালী, কেউ তাঁকে অক্ষম করতে সক্ষম নয়।

শুরুতে সুরা হাশরের যে আয়াত উল্লেখ করা হয়েছিল, তার মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অষ্টম

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



গুণ বলা হয়েছে, আল-মুতাকাব্বির, অর্থাৎ, তিনি সমুচ্চ মর্যাদার অধিকারী। গৌরবময়তার উঁচু স্তরে উন্নীত। তিনি এমন মহান গুণাবলীর অধিকারী যার ভিত্তিতে অহংকার একমাত্র তাঁকেই মানায়। অহংকার বা বড়ায়ী দেখানোর যোগ্যতা একমাত্র আল্লাহর, অন্য কারও নয়। মানুষ যেসব জিনিস নিয়ে অহংকার করে যেমন জ্ঞান, ধন-সম্পদ, পদমর্যাদা, ক্ষমতা, সৌন্দর্য, স্বাস্থ্য ইত্যাদি নিয়ে অহংকার করে, প্রকৃতপক্ষে এগুলো নিয়ে অহংকার করা মানুষের পক্ষে মানায় না। কেননা এগুলো আল্লাহর দেয়া, মানুষের বাহুবলে অর্জিত নয়, এগুলো মানুষের নিজস্ব গুণে অর্জিত হয়নি, বরং আল্লাহ দিয়েছেন তাই অর্জিত হয়েছে। তাই অন্যের দেয়া জিনিস নিয়ে সে কীভাবে অহংকার করবে? আল্লাহ রাব্বুল আলামীন-এর সমস্ত গুণ তাঁর নিজস্ব গুণ, অন্য কারও থেকে ধার করা নয়, অন্য কারও থেকে হাত পেতে নেয়া নয়। আল্লাহ তা'আলা নিজস্ব ক্ষমতা বলে, নিজ গুণ বলে গুণিয়ান। তাই অহংকার করা তাঁকেই মানায়, অন্য কাউকে নয়। আর আমরা? আমরা তো ফকীর, যা কিছু আসছে আল্লাহর থেকে আসছে। আল্লাহর এই গুণে বিশ্বাস করলে মানুষের ভিতরে অহংকার আসতে পারবে না। হাদীছে কুদছীতে বলা হয়েছে,

الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ. (رواه ابو داود في سننه برقم ٤٠٩٢)

অর্থাৎ, অহংকার ও বড়ত্ব হল আমার ভূষণ। এটা আমাকেই মানায় আর কাউকে নয়। যে এই ভূষণ নিয়ে টানাটানি করবে, আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব।

মানুষ যখন বিশ্বাস করবে যে, তার সমস্ত গুণ আল্লাহর দান, কোন গুণ তার নিজস্ব বাহুবলে অর্জিত নয়, তখন সে নিজের গুণের জন্য অহংকার করতে পারবে না। তার ভিতর অহংকার আসবে না, বরং যে আল্লাহ তাকে এইসব গুণ দান করেছেন, তার শোকর আদায় করার জন্য তাঁর সামনে তার মাথা নত হয়ে আসবে। তার ভিতরে তাকাব্বুর বা অহংকার নয়; বরং তাওয়াজু বা বিনয় আসবে।

সূরা হাশরের উক্ত আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর এই কয়েকটা গুণের কথা উল্লেখ করার পর বলেছেন,

سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ.

'অর্থাৎ, মানুষ আল্লাহর সাথে যা শরীক করে তা থেকে তিনি পবিত্র'।

কেউ মানুষকে আইন রচনার অধিকার দিয়ে আল্লাহর সাথে শরীক করে, কেউ আল্লাহর বিধান ছেড়ে দিয়ে মানুষের তৈরি বিভিন্ন দফার মধ্যে শান্তি খুঁজে আল্লাহর সাথে শরীক করে, কেউ আল্লাহর সত্ত্বার সাথে শরীক করে, কিংবা তাঁর গুণাবলীর সাথে শরীক করে, এভাবে মানুষ যতরকমে শরীক করে আল্লাহ তা'আলা সবরকম শরীক থেকে পবিত্র। আল্লাহর কোন শরীক নেই, আল্লাহর যাত বা সত্তায়ও কেউ শরীক নেই, আল্লাহর গুণাবলীতেও কেউ শরীক নেই। আল্লাহর যাত যেমন এক, আল্লাহর গুণাবলীতেও তিনি একক। তিনি ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু, অর্থাৎ, একক, তাঁর কোন শরীক নেই।

এরপর সূরা হাশরের সর্বশেষ আয়াতে আল্লাহ পাক বলেছেন,

هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى.

'অর্থাৎ, আল্লাহ পাক সৃষ্টিকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা, আকৃতিদাতা। এভাবে তাঁর রয়েছে অনেক উত্তম গুণাবাচক নাম।'

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

এর মধ্যে আল্লাহর সৃষ্টিকর্তা হওয়ার গুণ সম্বন্ধে পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আকৃতিদাতা। আকৃতি দেয়ার যে গুণ এই গুণেও কেউ শরীক নেই। আল্লাহ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, সবকিছুর ভিন্ন ভিন্ন আকৃতিও দান করেছেন। মানুষের এক রকম আকৃতি, জীব জানোয়ারেরও প্রত্যেকটার ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি। এক এক জাতির মধ্যেও প্রত্যেকটা সদস্যের ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি। মানুষ একটা জাতি, এই মানুষের মধ্যেও দুনিয়ার কোন একজন মানুষের সাথে অন্য একজনের আকৃতির মিল নেই। একটা গরুর সাথে আর একটা গরুর আকৃতির পার্থক্য আছে, একটা ছাগলের সাথে আরেকটা ছাগলের আকৃতির পার্থক্য আছে, একটা ঘোড়ার সাথে আরেকটা ঘোড়ার আকৃতির পার্থক্য আছে। এভাবে লক্ষ-কোটি রূপে আকৃতি আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দিয়ে রেখেছেন। কেমন শিল্পী তিনি! পানির উপরে রূপ এঁকে দেন। এক ফোঁটা পানি দ্বারা সন্তান তৈরি হচ্ছে, পানির ভিতরে তিনি রূপ এঁকে দেন। দুনিয়ায় এমন কোন শিল্পী আছে কি, যে পানির উপর ছবি আঁকতে পারে, পানির ভিতরে রূপ এঁকে দিতে পারে? আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এমন শিল্পী যিনি তা পারেন। এত কোটি কোটি, শত কোটি, হাজার কোটি রূপ তিনি দিয়ে থাকেন। এসব রূপ তিনি নিজের থেকে উদ্ভাবন করেন। তিনি যেমন নমুনা ছাড়া সৃষ্টি করেন, সৃষ্টি করার সময় তাঁর সামনে কোন নমুনা ছিল না। নমুনা ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন, তদ্রূপ এত মাখলুকের এত রূপ দিচ্ছেন, এর কোন নমুনা তার সামনে ছিল না। নিজের থেকেই সবরূপ তিনি উদ্ভাবন করেছেন। সুবহানাল্লাহ!

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আমার অনেক গুণবাচক নাম আছে। হাদীছে নিরানব্বইটা গুণবাচক নামের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। নিরানব্বইটার বাইরেও আরো দুই চারটা গুণবাচক নামের কথা হাদীছে উল্লেখ পাওয়া যায়। আল্লাহর এসব গুণবাচক নামের দ্বারা মোটামুটিভাবে আল্লাহর পরিচয় দেয়া হয়েছে। নতুবা আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ ও যথাযথ পরিচয় দিয়ে কেউ শেষ করতে পারবে না। আল্লাহর সৃষ্টির মহত্ব বর্ণনা করে যেমন শেষ করা যায় না, আল্লাহর সত্তা, আল্লাহর গুণাবলীর পূর্ণাঙ্গ ও যথাযথ পরিচয় দিয়েও শেষ করা যায় না। আল্লাহর সবকিছুই অসীম। তাঁর কোন কিছুই শেষ হয় না। শেষ করা যায় না। আল্লাহর অনেক গুণবাচক নাম রয়েছে এ কথা বলে এদিকেও ইংগিত করা হয়েছে।

সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াতের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর পরিচয়ের একটা সিংহ ভাগ ফুটিয়ে তুলেছেন মাত্র। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পরিচয় হল মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটাই হল ঈমানের মূল। আর মানুষের মধ্যে যদি ঈমান এসে যায় তাহলে মানুষের জীবন দুরস্ত হয়ে যায়। তার ইহকাল-পরকালের সফলতার পথ খুলে যায়। হয়ত এজন্যই সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াতের অনেক ফযীলত। কেউ যদি সকাল, বিকাল এই তিন আয়াত তেলাওয়াত করে তাহলে ৭০ হাজার ফিরিশতা তার জন্য দু'আ করতে থাকে। সকালে তেলাওয়াত করলে সারাদিন ৭০ হাজার ফিরিশতা তার জন্য দু'আ করতে থাকবে। সন্ধ্যায় তেলাওয়াত করা হলে ফজর পর্যন্ত ৭০ হাজার ফিরিশতা তার জন্য দু'আ করতে থাকবে। এই তিন আয়াত পড়ার আগে اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ তিনবার পড়ে নিতে হবে। এখানে বিসমিল্লাহ নেই, শুধু এই দু'আটি তিনবার পড়েই উক্ত তিন আয়াত পাঠ করতে হবে।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে বুঝার ও আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



## বয়ান নং ৫-এর খুতবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ الْجِنَانَ وَالْاَنَامَ، وَاَكْرَمَهُمْ بِالْاَمْنِ وَالسَّلَامِ، وَهُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، اِلٰهٌ لَّا تُحِيْطُ بِهِ الْعُقُوْلُ وَالْاَفْهَامُ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ سَيِّدُ الْاَنْبِيَآءِ الْكِرَامِ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ صَلَاةَ الْبَرَرَةِ الْعِظَامِ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الْهُدَاةِ الْاَعْلَامِ.

اَمَّا بَعْدُ :

اَيُّهَا النَّاسُ! عَلَيْنَا الْاِيْمَانُ بِذَاتِهٖ تَعَالٰى وَصِفَاتِهٖ. وَصِفَاتُهٗ تَعَالٰى كَثِيْرَةٌ، مِنْهَا اَنَّهٗ تَعَالٰى هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ. وَهُوَ تَعَالٰى مَلِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَلِكُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ، فَلَا حُكْمَ اِلَّا لَهٗ، قَالَ تَعَالٰى : اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ. وَقَالَ تَعَالٰى : وَلَهٗ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ. وَقَالَ : فَمَنْ تَوَلّٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ.

وَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى هُوَ الْقُدُّوْسُ، لَيْسَ فِى خَلْقِهٖ وَلَا فِى خُلُقِهٖ قُصُوْرٌ وَّفُتُوْرٌ. قَالَ تَعَالٰى : مَا تَرٰى فِىْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ. فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ. ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ. فَعَلَيْنَا التَّاَسِّىْ بِاُسْوَتِهٖ تَعَالٰى. وَهٰذَا مَا جَاءَ فِى الْحَدِيْثِ ـ اِنَّ اللّٰهَ نَظِيْفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ. وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : نَظِّفُوْا اَفْنِيَةَ بُيُوْتِكُمْ. وَعَلَيْنَا النَّظَافَةُ فِى الْاَخْلَاقِ اَيْضًا، فَلَا يَنْبَغِىْ لِلْمُؤْمِنِ الزِّنَا وَالسَّرِقَةُ وَغَيْرُ ذَالِكَ مِنَ الْمَعَاصِىْ مِمَّا يُدَنِّسُ الْاَخْلَاقَ.

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বয়ান নং-৬

## আল্লাহর সিফাত তথা গুণাবলীর প্রতি ঈমান প্রসঙ্গ (৩য় পর্ব)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ : اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ. وَقَالَ تَعَالٰى : هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: كَانَ فِيْ عَمَاءٍ مَا تَحْتَهٗ هَوَاءٌ وَمَا فَوْقَهٗ هَوَاءٌ.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

আল্লাহর গুণাবলীর প্রতি কীভাবে ঈমান রাখতে হয় এ প্রসঙ্গে আমরা গত কয়েক জুমুআ ধরে আলোচনা করে আসছিলাম। কুরআনে কারীমের বহু আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বিভিন্ন গুণবাচক নামের উল্লেখ করে নিজের পরিচয় তুলে ধরেছেন। এর মধ্যে আয়াতুল কুরছীতে ইরশাদ হয়েছে,

هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ.

অর্থাৎ, আল্লাহ একক, তিনি ছাড়া আর কোন মা'বূদ নেই, তাঁর সাথে আর কেউ শরীক নেই।

আল্লাহর সত্তা ও তাঁর সিফাত তথা গুণাবলী কোনটাতে কেউ শরীক নেই। তিনি আল-হাইয়্যুল কাইয়্যুম। আল-হাইয়্য অর্থ চিরঞ্জীব। যিনি চিরকাল জীবিত। যিনি অনন্তকাল ধরে জীবিত আছেন, আবার অনন্তকাল ধরে জীবিত থাকবেন। চিরঞ্জীব কথাটার মধ্যে বোঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ পাক অনাদি ও অনন্ত। অনাদি ও অনন্ত হওয়া স্পষ্টভাবে বোঝানোর জন্য আল্লাহর দুটো গুণ হল আল-আওয়ালু ও আল-আখির। ইরশাদ হয়েছে,

هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ.

অর্থাৎ, তিনি আওয়াল তিনি আখের। তিনি যাহের তিনি বাতেন। (হাদীদ: ৩)

"আল-আওয়াল" অর্থ অনাদি এবং "আল-আখির" অর্থ অনন্ত। অনাদি অর্থ যার কোন আদি বা শুরু নেই, সব সময় ধরে তিনি বিরাজমান আছেন। এমন কোন সময় যায়নি, যখন তিনি ছিলেন না। আর অনন্ত অর্থ যার কোন অন্ত বা শেষ নেই। এমন কোন সময় আসবে না, যখন তিনি থাকবেন না। এই সব গুণের মধ্যে কেউ শরীক নেই। আল্লাহ ব্যতীত আর কিছু অনাদি-অনন্ত নয়। একটা সময় এমন ছিল, যখন আল্লাহ ব্যতীত আর কিছু ছিল না। ইবনে মাজা ও তিরমিযী শরীফের এক হাদীছে এসেছে- রাসূল (সা.)কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল মাখলূক সৃষ্টি করার পূর্বে আল্লাহ কীভাবে ছিলেন? নবী (সা.) উত্তরে বলেন,

كَانَ فِيْ عَمَاءٍ مَا تَحْتَهٗ هَوَاءٌ وَمَا فَوْقَهٗ هَوَاءٌ. (رواه الترمذي برقم ٣١٠٩ وقال حديث حسن)

'অর্থাৎ, আল্লাহ তখন ছিলেন এক মহা শুন্যতার মধ্যে- তাঁর উপর নীচ সব দিকে মহাশুন্যতা বিরাজ করছিল'। এরপর একসময় আল্লাহ মাখলূক সৃষ্টি করেন। আবার একটা সময় আসবে অর্থাৎ, কিয়ামতের সময়, যখন আল্লাহ ব্যতীত সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। এরপর পরকালে মানুষ জান্নাত বা জাহান্নামে যাওয়ার পর যে জীবন লাভ করবে সেটা হবে অনন্ত। এরপর আর মৃত্যু আসবে না। হাদীছে এসেছে– জান্নাতীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে যাওয়ার পর তাদের সামনে মৃত্যুকে জবাই করে দেয়া হবে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষণা দেয়া হবে–

يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ لَا مَوْتَ وَلِأَهْلِ النَّارِ يَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ لَا مَوْتَ. (رواه البخاري برقم ٦٥٤٥)

www.maktabatulabrar.com



فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : لَا يَزْنِى الزَّانِىْ حِيْنَ يَزْنِىْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَايَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ النَّاسُ اِلَيْهِ فِيْهَا اَبْصَارَهُمْ حِيْنَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى هُوَ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ. فَلَا يَنْبَغِىْ لَنَا الْكِبْرُ وَالْخُيَلَاءُ. وَاِنَّ الْكِبْرَ حَرَامٌ مِّنَ الْكَبَائِرِ. وَقَدْ وَرَدَ الْوَعِيْدُ الشَّدِيْدُ عَلَيْهِ فِى الْقُرْاٰنِ وَالسُّنَّةِ. قَالَ تَعَالٰى : اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا. وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبْرٍ. وَفِى الْحَدِيْثِ الْقُدْسِيِّ_ اَلْكِبْرِيَاءُ رِدَائِىْ وَالْعَظْمَةُ اِزَارِىْ، فَمَنْ نَازَعَنِىْ وَاحِدًا مِّنْهُمَا اَلْقَيْتُهٗ فِى النَّارِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ : هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ، اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ. سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ. هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى، يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ، وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. اَقُوْلُ قَوْلِىْ هٰذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ لِىْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَاسْتَغْفِرُوْهُ، اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.
Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

অর্থাৎ, হে জান্নাতীগণ তোমাদেরকে অনন্ত জীবন দান করা হল, আর কখনও মৃত্যু তোমাদেরকে গ্রাস করবে না। আর হে জাহান্নামীগণ তোমাদেরকেও অনন্তকাল থাকতে হবে, আর কখনও তোমাদের মৃত্যু হবে না।

এ ঘোষণা শোনার পর জান্নাতীদের খুশির অন্ত থাকবে না, জাহান্নামীদেরও দুঃখের অন্ত থাকবে না। এ হিসেবে পরকালে মানুষ অনন্ত, কিন্তু দুনিয়াতে কেউ অনাদিও নয় অনন্তও নয়। একমাত্র আল্লাহ-ই হলেন অনাদি ও অনন্ত। তিনি যাহের তিনি বাতেন। বাতেন অর্থ গুপ্ত। আল্লাহর অস্তিত্ব দুনিয়ার চোখে দেখা যায় না, তাই তাকে বাতেন বা গুপ্ত বলা হয়। আবার তাঁর অস্তিত্ব গুপ্ত হওয়া সত্ত্বেও সৃষ্টির অণু-পরমাণু পর্যন্ত তাঁর অস্তিত্ব এবং তাঁর কুদরতের প্রকাশ্য সাক্ষী, এ হিসেবে তাঁকে যাহের বা প্রকাশ্য বলা হয়। যাহোক আল্লাহই আওয়াল, তিনিই আখের, তিনিই যাহের, তিনিই বাতেন। এটাই আমাদের ঈমান। এতদসত্ত্বেও একটা বিশেষ শ্রেণির অজ্ঞ লোকেরা তাদের পীর সাহেব সম্পর্কে বলে– বাবা আওয়াল তুমি, আখের তুমি, যাহের তুমি, বাতেন তুমি। এভাবে তারা একটা গান তৈরি করেছে। তারা আওয়াল-আখের, যাহের-বাতেন আল্লাহর এই গুণগুলো তাদের পীর তথা এক জন মানুষের জন্য প্রয়োগ করেছে। তারা আল্লাহকে যেমন সাজদা দেয়া হয়, সেভাবে তাদের পীরের কবরে সাজদা দেয়। এভাবে পীর সাহেবকে তারা আল্লাহর মর্যাদায় সমাসীন করেছে। পীরকে আল্লাহর স্থানে তুলে নিয়েছে। তারা পীরের কাছে সন্তান চায়, পীরের কাছে বিপদ-আপদ থেকে মুক্তি চায়। তারা মনে করে পীরের এগুলো করার ক্ষমতা আছে। তারা মুখেও বলে যে, আল্লাহর ধন রাসূলকে দিয়ে আল্লাহ গেছেন খালি হয়ে। আর রাসূলের ধন খাজাকে দিয়ে রাসূল গেছেন ফকীর হয়ে। অর্থাৎ, তারা বোঝাতে চায় এখন পীর বাবারা এবং খাজাবাবাদের কাছেই সবকিছুর ক্ষমতা, আল্লাহর হাতে আর কোনো ক্ষমতা নেই। তাই পীর বাবা এবং খাজা বাবাদের কাছেই সবকিছু চাইতে হবে। নাউযুবিল্লাহ! এটা শিরক। এভাবে আল্লাহর স্থানে মানুষকে নিয়ে আসা হয়েছে।

অনেক মানুষ আকীদা ঠিক আছে কি-না জানিনা কিন্তু কাজ এমন করে যা দ্বারা বুঝা যায় আল্লাহর চেয়ে তারা পীরকে উপরে মনে করে। যেমন– অনেক বাস-গাড়ীর ড্রাইভারকে আমরা দেখেছি। সারা পথ গাড়ীতে গানের ক্যাসেট বাজায়। কুরআন হাদীছের দোহাই দিয়ে যতই গান বন্ধ করতে বলা হয় গান আর বন্ধ হয় না। কিন্তু সামনে কোন পীর সাহেবের মাযার আসছে, এমন হলে গান বন্ধ করে দেয়। একবার ঢাকা থেকে খুলনা যাওয়ার পথে এরকম এক ড্রাইভারকে আমি বললাম ভাই! আপনাকে আল্লাহর বরাত দিয়ে অনেক অনুরোধ করে গান বন্ধ করতে বললাম, কিন্তু গান বন্ধ করলেন না। আল্লাহকে ভয় পেলেন না। এখন সামনে নওয়াপাড়া পীর সাহেবের মাযার আসছে, তাই আপনি গান বন্ধ করে দিলেন। তাহলে কি আল্লাহর চেয়ে পীর সাহেবকে বেশি ভয় পান? ড্রাইভার এ কথার কোনো জওয়াব দিতে পারেন। গান সম্বন্ধে আল্লাহ নিষেধ করেছেন, রাসূল নিষেধ করেছেন, এতে তার কোনো পরওয়া নেই, কিন্তু মাযারের সামনে গান চালালে পীর সাহেবের অসম্মান হবে, এতে তার ক্ষতি হয়ে যেতে পারে এই ভয়। তাই গান চালানো যাবে না। গান বন্ধ রাখতে হবে। এভাবে মানুষকে আল্লাহর পর্যায়ে বরং আল্লাহর চেয়ে উপরে নিয়ে যাওয়া হয়। হক্কানী পীর মাশায়েখদের সম্মান করা চাই। কিন্তু আল্লাহর স্তরে নিয়ে যাওয়া বাড়াবাড়ি। ইয়াহুদীরা এমন করত। ইহুদীদের সম্পর্কে কুরআন শরীফে বলা হয়েছে,

اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ.

অর্থাৎ, তারা তাদের ধর্মীয় গুরু, তাদের ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদেরকে খোদা বানিয়ে ফেলেছে, তাদেরকে খোদার মর্যাদা দিয়ে ফেলেছে। (তাওবা: ৩১)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



আমরাও অনেকে পীর সাহেবদেরকে খোদা বানিয়ে ফেলি। পীর সাহেবদের কাছে বিপদ-আপদ থেকে উদ্ধার চাওয়া হয়, পীর সাহেবদের কাছে সন্তান চাওয়া হয়, পীর সাহেবদের কাছে ভাগ্য চাওয়া হয়। অথচ সন্তান দেয়ার মালিক আল্লাহ, ভাগ্য আল্লাহর হাতে। বিপদ-আপদ থেকে উদ্ধার করার মালিক আল্লাহ। কুরআন শরীফে বলা হয়েছে,

يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّ اِنَاثًا وَ يَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا.

অর্থাৎ, তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। যাকে চান শুধু কন্যা সন্তান দেন, যাকে চান শুধু পুত্র সন্তান দেন, যাকে চান ছেলে-মেয়ে উভয় দেন আর যাকে চান নিঃসন্তান রাখেন। (শুরা: ৪৯-৫০)

এখানে বোঝানো হয়েছে সন্তান দেয়া না দেয়া আল্লাহর হাতে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও হাতে নয়। অতএব কোন পীর মুরশিদ সন্তান দিতে পারে এটা মনে করা শিরক। বিপদ আপদ থেকে উদ্ধার করাও একমাত্র আল্লাহর হাতে। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

وَ اِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗٓ اِلَّا هُوَ.

অর্থাৎ, আল্লাহ তোমার কোন বিপদ-আপদ ঘটাতে চাইলে তিনি ছাড়া আর কেউ তা থেকে উদ্ধার করার নেই। (আনআম: ১৭)

অতএব পীর সাহেবের কাছে কোনো বিপদ-আপদ থেকে উদ্ধার চাওয়াও শির্ক। পীর-মুরশিদদের হাতে কোন কিছু দেয়ার ক্ষমতা থাকলে পীর-মুরশিদরা আল্লাহর কাছে কেন চান? তারা আল্লাহর কাছে চান এ থেকে বুঝা গেল তাদের হাতে ক্ষমতা নেই, বরং ক্ষমতা আল্লাহর হাতে। যদি কেউ মনে করেন পীর মুরশিদগণ হলেন মাধ্যম, তাদেরকে মাধ্যম ধরে আল্লাহর কাছে চাওয়া হয়, তাহলে শুনুন, আল্লাহর কাছে চাওয়ার জন্য কোন মাধ্যম ধরার প্রয়োজন নেই, সরাসরি আল্লাহর কাছে চাওয়া নিয়ম। আল্লাহ পাক সকলের ভাষা বোঝেন, মাঝখানে কোন দোভাষীর প্রয়োজন নেই। আল্লাহ পাক দুনিয়ার রাজা বাদশাহদের মত নন, যাদের সাথে সবাই সরাসরি কথা বলতে পারে না। আল্লাহ পাক সরাসরি সকলের ডাক শোনেন। তাই কোন মাধ্যম ধরার প্রয়োজন নেই, সরাসরি আল্লাহর কাছে চাইতে হবে।

যাহোক আলোচনা করা হচ্ছিল যে, আল্লাহ পাক আল-হাইয়্যু বা চিরঞ্জীব, তিনি অনাদি-অনন্ত, তিনি আওয়াল তিনি আখের। এখন প্রশ্ন হতে পারে আল্লাহ পাক যদি চিরকাল ধরে থাকবেন, তাহলে কে তার অস্তিত্ব দান করল? কে তাকে প্রতিষ্ঠিত করল? এর জবাবে বলা হয়েছে, আল-কাইয়্যুম। আল-কাইয়্যুমও আল্লাহর একটি সিফাত, এর অর্থ হল তিনি নিজেই প্রতিষ্ঠিত, নিজেই নিজের ধারক-বাহক। শুধু নিজের ধারক-বাহক নন, বরং বিশ্বের সবকিছুরও ধারক-বাহক, বিশ্বের সবকিছুরও সংরক্ষণকারী। তাঁর অস্তিত্ব কারও দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নয় বরং বিশ্বের সবকিছুর তাঁর দ্বারা অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত। আল-কাইয়্যুম গুণটির ব্যাখ্যা এতখানি ব্যাপক।

প্রশ্ন হতে পারে যে, আল্লাহ সবকিছুর তত্তাবধান করেন, সবকিছু পরিচালনা করেন, তাহলে এই মহা বিশ্বের মহা ব্যবস্থাপনা করতে গিয়ে এই বিশাল সৃষ্টির সংরক্ষণ, তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা করতে গিয়ে তিনি ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে যান কি-না? ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে গেলে তাঁর নিদ্রা এসে যাবে, তাহলে ইত্যবসরে কে পরিচালনা করে? তার জওয়াব দিয়ে আল্লাহ পাক বলেছেন,

لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ.

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

'অর্থাৎ, আল্লাহর নিদ্রা তো দূরের কথা তাঁর তন্দ্রাও আসে না', অর্থাৎ, তাঁর সামান্যতম ক্লান্তিও আসে না, ফলে নিদ্রা তো দূরের কথা তন্দ্রাও আসে না। (বাকারাঃ ২৫৫)

দুনিয়ার যত শক্তিশালী কেউ হোক না কেন, সে তাঁর শক্তি প্রয়োগ করতে করতে এক সময় ক্লান্ত হয়ে পড়ে, কিন্তু আল্লাহ পাক এমন অটুট শক্তির অধিকারী, যার শক্তির ভিতরে কোন ভাঙ্গন আসে না, যার শক্তির ভিতরে কোন হ্রাস ঘটে না, যার শক্তির ভিতরে কোন দুর্বলতা আসে না। তাই কখনো তাঁর ক্লান্তি আসে না, অবসাদ আসে না। মানুষের যখন ক্লান্তি আসে তখন তার তন্দ্রা আসে, বেশি ক্লান্তি আসলে তার ঘুম এসে যায়। কিন্তু আল্লাহর কোন ক্লান্তি আসে না বলেই তাঁর তন্দ্রাও আসে না, নিদ্রাও আসে না। আল্লাহ তা'আলা আল হাইয়্যুল কাইয়্যুম। এই গুণ আল্লাহ ছাড়া আর কারও হতে পারে না। এজন্যই "আল-কাইয়্যুম" কোনো মানুষের জন্য ব্যবহার করা যায় না। এই শব্দ দিয়ে মানুষের নাম রাখতে হলে এর শুরুতে 'আব্দ' শব্দ যোগ করে আব্দুল কাইয়্যুম রাখতে হয়। শুধু কাইয়্যুম করে নাম রাখা যায় না। এমনিভাবে আল্লাহর সমস্ত নামের শুরুতে 'আব্দ" শব্দ যোগ করে মানুষের নাম রাখা নিয়ম। বলার সময় এবং ডাকার সময়ও আব্দ শব্দ যোগ করে নিতে হবে। আমরা আব্দুল কাইয়্যুমকে কাইয়্যুম বলে থাকি, এটা ঠিক নয়। এমনিভাবে "আব্দুল কাদের" "আব্দুল জাব্বার" "আব্দুল গফুর" "আব্দুল করীম" "আব্দুর রহীম" "আব্দুর রহমান" "আব্দুল মালেক" ইত্যাদি যত নামের শুরুতে আব্দ শব্দ যোগ করে নাম রাখা হয়। আব্দ শব্দ বাদ দিয়ে তাকে ডাকা যাবে না। তাহলে মানুষকে এক রকম খোদা বলেই ডাকা হয়ে যায়। এজন্য এটা ঠিক নয়। আব্দুল্লাহ নামের আব্দ শব্দ বাদ দিয়ে তাকে আল্লাহ বলে ডাকলে যেমন ভুল হয়, আব্দুর রহীম, আব্দুর রহমান ইত্যাদি নামের আব্দ বাদ দিয়ে শুধু রহীম ও রহমান ইত্যাদি বললেও প্রায় ওরকমই ভুল হয়। অথচ এরকম ভুল আমরা অনেকেই করি।

আমরা সন্তানের নাম রাখার সময় ভাল নাম রাখি, কিন্তু পরে ভাল নামকে বিকৃত করে ডাকি। অনেকে ভাল নাম রেখে সেই ভাল নাম শিকেয় তুলে রাখে। সেটা শুধু খাতা কলমে এবং হিসেবে থাকে, বলার মধ্যে থাকে না। একটা বাজে ডাক নাম রেখে সেই নামে ডাকতে থাকে। এরূপ করলে ভাল নাম রাখার কোনো ফায়দা নেই। ভাল নাম রাখতে হয় এজন্য যে, এই ভাল নাম বারবার মুখে উচ্চারণ হবে, তাহলে ভাল আছর হতে থাকবে, বরকত হতে থাকবে। ভাল নাম আলমারীতে তালাবদ্ধ করে রাখলে বা খাতায় বন্দী করে রাখলে সেই ফায়দা পাওয়া যাবে না।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ.

'অর্থাৎ, আসমান-যমীনের সবকিছু আল্লাহর মালিকানা'। তিনি মালিক হিসেবে সবকিছুর রক্ষণাবেক্ষণ করেন। এই রক্ষণাবেক্ষণেও কেউ তাঁর শরীক নেই। আসমান-যমীনের সবকিছুর উপর আল্লাহ্‌র এমন প্রভাব ও দাপট রয়েছে যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত আল্লাহর সামনে কথা বলার বা সুপারিশ করার সাহস কারও থাকবে না। আল্লাহ তাই বলেছেন,

مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلَّا بِاِذْنِهٖ.

'অর্থাৎ, কে এমন আছে যে আল্লাহর অনুমতি ছাড়া তাঁর সামনে সুপারিশ করার ক্ষমতা রাখে'?

কিয়ামতের দিন আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.) পর্যন্ত আল্লাহর কাছে সুপারিশ করার সাহস পাবেন না। যখন কিয়ামতের ময়দানে সবমানুষ বর্ণনাতীত কষ্টের মধ্যে থাকবে। আল্লাহ পাক বিচারও শুরু করছেন না। থমথমে অবস্থা বিরাজ করতে থাকবে। এ অবস্থায় পেরেশান হয়ে মানুষ দলে দলে ছুটে যাবে হযরত আদম (আ.)-এর কাছে যে, আল্লাহর কাছে একটু সুপারিশ করুন, তিনি যেন আমাদের বিচার কাজ শুরু করেন।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



হযরত আদম (আ.) বলবেন, আজ আল্লাহ জাল্লা শানুহু এত রাগান্বিত যে, পূর্বেও কখনও এমন রাগান্বিত হননি, ভবিষ্যতেও কখনও এমন রাগান্বিত হবেন না। আমার পক্ষে সুপারিশ করা সম্ভব নয়। হে আল্লাহ! আমাকে বাঁচাও আমাকে বাঁচাও। এরপর তিনি বলবেন তোমরা হযরত নূহ (আ.)-এর কাছে যাও, তিনিও এই জওয়াব দিবেন। এভাবে একে একে সব নবীই একই জওয়াব দিয়ে দিবেন। সর্বশেষে রাসূল (সা.) আল্লাহর কাছে সুপারিশ করার সাহস করবেন। এ থেকে বুঝা যায় আল্লাহ কত বড় দাপট, কত বড় প্রভাব প্রতিপত্তি ও জালালের অধিকারী যে, নবীগণ পর্যন্ত তাঁর সামনে "বিচার শুরু করা হোক" এতটুকু বিষয়ের সুপারিশ করার পর্যন্ত সাহস পাবেন না।

আল্লাহ জাল্লা শানুহুর এই দাপটের সামনে কোনো অপরাধী নিস্তার পাবে না। দুনিয়ার যতবড় দাপটশালী হোক না কেন, কেউ তখন নিস্তার পাবে না। কেউ অপরাধ করে থাকলে সেটা গোপন রেখেও নিস্তার পাওয়ার কোন উপায় নেই। কারণ আল্লাহ বলেছেন,

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ.

'অর্থাৎ, আল্লাহ মানুষের সামনে যা বর্তমান তা-ও জানেন, যা তাদের অগোচর তা-ও তিনি জানেন'।

অনাদীকাল থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত সবসময়ের সবকিছু তিনি জানেন। সামনেরটাও জানেন, পিছনেরটাও জানেন, যাহেরীটাও জানেন, বাতেনীটাও জানেন, কোনকিছু আল্লাহর জানার বাইরে নয়। অতএব-আল্লাহর কাছে কোন কিছু গোপন রেখে নিস্তার পাওয়ার পথ নেই।

আল্লাহ জাল্লা শানুহু কত মহান, কত মহা ক্ষমতাধর তিনি, তাঁর সত্তা কত বিশাল, সে সম্বন্ধে কিঞ্চিত ধারণা দেয়ার জন্য আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন,

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ.

অর্থাৎ, আল্লাহর কুরসী সমস্ত আসমান ও যমীনকে পরিবেষ্টন করে আছে।

আল্লাহর সিংহাসনকে বলা হয় আরশ। এই কদম রাখার স্থানকে বলা হয় কুরসী। কেউ কেউ বলেছেন আরশ এবং কুরসী একই। সত্তা কত বড়, সেটা বোঝানোর জন্য বলা হচ্ছে আল্লাহর যে কুরসী আছে তা সাত আসমান যমীন সবকিছুকে বেষ্টন করে আছে, অর্থাৎ, সাত আসমান-যমীনের চেয়েও কুরসী বড়। আল্লাহর কুরসী যদি এত বড় হয় তাহলে আল্লাহর সত্তা কত বড়, সুবহানাল্লাহ! হযরত আবু যর গিফারী (রা.) রাসূল (সা.) কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, আল্লাহর কুরসী কত বড়? আল্লাহর যাত কত বড়? রাসূল (সা.) বলেছিলেন,' বিশাল ময়দানের ভিতরে যদি একটা আংটি ফেলে দেয়া হয়, ঐ ময়দানের তুলনায় এ আংটি কত ছোট! ঐ আংটির তুলনায় ময়দান কত বড়। আল্লাহর আরশের তুলনায় কুরসী অত ছোট। আর আল্লাহর যাতের তুলনায় ঐ সিংহাসনও অত ছোট'। এটা একটা উদাহরণ দিয়ে কিছুটা বোঝানো হয়েছে, নতুবা আল্লাহর সত্তা অসীম। আসমান কত বড়? মানুষ অনেক গ্রহ উপগ্রহ আবিষ্কার করেছে কিন্তু এখনও প্রথম আসমান পর্যন্ত যেতে পারেনি। কাজেই আসমান কত বড় তা বিজ্ঞানীরাও এখনও বলতে পারে না। দুনিয়ার বিজ্ঞানীরা সর্বশেষ যে নক্ষত্রটা আবিষ্কার করেছে, তার নাম দিয়েছে কোয়াসার। বিজ্ঞানীদের হিসাব মতে এটা দুনিয়া থেকে এক হাজার কোটি আলোকবর্ষ দুরে। অর্থাৎ, যদি আলোর গতিতেও যানবহন চলতে সক্ষম হয়, তাহলে সেই যানে চড়ে দুনিয়া থেকে রওনা দিয়ে সেই নক্ষত্র পর্যন্ত পৌঁছতে এক হাজার কোটি বছর লাগবে। আলোর গতি হল এক সেকেন্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার। এই গতিতে চললেও দুনিয়া থেকে রওয়ানা দিয়ে সেই কোয়াসার পর্যন্ত পৌঁছতে এক হাজার কোটি বছর সময় লাগবে। এর উপরেও আরও গ্রহ নক্ষত্র থাকতে পারে। আর কুরআন শরীফের বর্ণনা মতে এই সব গ্রহ নক্ষত্র প্রথম আসমানের নীচে। কুরআনে বলা হয়েছে,

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ نِ الْكَوَاكِبِ. (সাফফাত: ৬)

অর্থাৎ, যত গ্রহ নক্ষত্র আছে এই সবকিছু দিয়ে আমি প্রথম আসমানকে সজ্জিত করেছি।

অতএব সব গ্রহ নক্ষত্র প্রথম আসমানের নীচে, এরপর প্রথম আসমান। প্রথম আসমান এতটা পুরু দুনিয়া থেকে প্রথম আসমানের নীচ পর্যন্ত যত দুরত্ব। এরপর দ্বিতীয় আসমানের মধ্যকার ফাকা স্থান হল এতটা তার নীচে দুনিয়া পর্যন্ত যত দুরত্ব। তারপর দ্বিতীয় আসমান। এভাবে দ্বিগুণ চতুর্গুণ বাড়তে বাড়তে তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ট ও সপ্তম আসমান। সপ্তম আসমানের উপরে জান্নাত। এই জান্নাতের উপরে হল আরশ কুরসী। তাহলে আরশ কুরসী কত বড়, তা আমাদের চিন্তায় আনাও সম্ভব নয়। তাহলে আল্লাহর সত্তা কত বড় তা-ও আমাদের চিন্তায় আনা সম্ভব নয়। অতএব আল্লাহর ক্ষমতা, শক্তি এবং দাপটের পরিমাণ কি তা-ও আমাদের কল্পনায়ও আসবে না।

আল্লাহর ক্ষমতা তো অনেক বড় ব্যাপার! আল্লাহর এক একটা মাখলূকের যে ক্ষমতা আছে, তাও আমাদের কল্পনায় আসবে না। আল্লাহর এক মাখলূক হল ফিরিশতা, এক এক ফিরিশতাকে এত ক্ষমতা দেয়া হয়েছে যা আমাদের কল্পনায়ও আসতে পারে না। হযরত লূত (আ.)-এর কওম যে বস্তিতে বাস করত সেই বস্তিকে উল্টিয়ে দেয়া হয়েছিল। পুরুষে পুরুষে সমকামিতার অপরাধে তাদেরকে এই শাস্তি দেয়া হয়েছিল? রেওয়ায়েতে আছে হযরত জিব্রাঈল (আ.) তার ছয়শত ডানার মধ্যে একটা ডানা দিয়ে ঐ পুরো বস্তিকে উর্ধ্বে তুলে নিয়ে উল্টিয়ে ফেলে দেন। কুরআন শরীফেও তাদের বস্তির উপর পাশকে নীচের দিকে এবং নীচের পাশকে উপর দিকে করে উল্টিয়ে দেয়ার কথা উল্লেখ আছে। সেই এলাকাটা এখন উবধফ ঝবধ বা মৃত সাগর নামে পরিচিত। সেটাকে মৃত সাগর বলা হয় এজন্য যে, সেখানে কোনো প্রাণী বাঁচে না। আল্লাহর গযবে তার পানি বিষাক্ত হয়ে গিয়েছে। বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে উত্তর দিকে ফিলিস্তিনে এই সাগরটি অবস্থিত। তাবলীগের আমীর মরহুম হযরত মাওলানা আব্দুল আযীয (রহ.) একবার ওখানে সফরে গিয়েছিলেন। তার পানি কেমন বিষাক্ত তা পরীক্ষা করার জন্য তিনি ওখান থেকে একটু পানি তুলে মুখে দিয়েছিলেন। এর ফলে তার মুখ পুড়ে যায়। দীর্ঘ দিন যাবত তিনি কথা বলতে পারতেন না। এটা এতই গযবের পানি। কোন বৈজ্ঞানিক এখনও আবিষ্কার করতে পারেনি এ পানি এরকম বিষাক্ত কেন। ওরা হয়তো এ জন্য গবেষণা করবেও না, কারণ গবেষণা করলে এটা বিষাক্ত হওয়ার পিছনে দুনিয়ার বস্তুগত কোন কারণ হয়তো খুঁজে পাবে না। তাহলে শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করতে হবে যে, এটা অপার্থিব অর্থাৎ, ঐশ্বরিক কোন কারণে হয়েছে। এরূপ বিশ্বাসের দিকে তারা যেতে চায় না বলেই হয়তো এর পিছনে গবেষণাও চালাবে না। যাহোক আল্লাহর এক ফিরিশতার শক্তির পরিমাণ কী তা বলা হচ্ছিল। আল্লাহর আর এক ফিরিশতা হযরত ইসরাফীল (আ.), তার শক্তি কী পরিমাণ? একটা ফুঁ দিয়ে তিনি সারা দুনিয়া ধ্বংস করে দিবেন। তিনি শিংগায় ফুঁ দিবেন, সেই ফুঁতে সমগ্র দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে। কুরআন শরীফে আসছে–

وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ. (সূরা কারিয়াহ)

অর্থাৎ, সেদিন শিংগায় ফুঁ দেয়ার পর পাহাড়গুলো ধুনিত তুলার মত উড়তে থাকবে।

আল্লাহর এক মাখলূকের যদি এত শক্তি হয় তাহলে আল্লাহর শক্তি কী পরিমাণ? মূলত সমস্ত শক্তি আল্লাহর। আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে যে শক্তি তাও আল্লাহর দেয়া শক্তি। কোন মাখলূকের নিজস্ব কোন শক্তি নেই। দুনিয়ার বিভিন্ন আসবাবের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমতা দিয়ে রেখেছেন, আসবাবের নিজস্ব কোনো ক্ষমতা নেই। সবকিছুর ক্ষমতা আল্লাহর দেয়া ক্ষমতা, অন্য কারও নিজস্ব কোনো ক্ষমতা নেই। আল্লাহ

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



তা'আলা মাঝে মধ্যে প্রমাণ দেখান যে, বস্তুর নিজস্ব কোনো ক্ষমতা নেই। হযরত ইব্রাহীম (আ.)কে আগুনে ফেলানো হয়েছিল, কিন্তু সে আগুন ইব্রাহীম (আ.)কে পোড়াতে পারেনি। যদি আগুনের মধ্যকার পোড়ানোর ক্ষমতা তার নিজস্ব ক্ষমতা হত, তাহলে সে আগুন ইব্রাহীম (আ.)কে পোড়াতে সক্ষম হত। হযরত মূসা (আ.) বনী ইসরাঈলসহ সমুদ্রের পানির ভিতর দিয়ে পার হয়ে যান। সমুদ্রের পানি ফাক হয়ে পানির ভিতরে রাস্তা বের হয়ে যায়। যদি পানির মধ্যে ডোবানোর ক্ষমতা তার নিজস্ব ক্ষমতা হত, তাহলে মূসা (আ.) বনী ইসরাঈলসহ পানিতে ডুবে মারা যেতেন, কিন্তু তা হয়নি। বুঝা গেল পানির মধ্যকার ডোবানোর ক্ষমতা পানির নিজস্ব ক্ষমতা নয়। এভাবে সবকিছুর ক্ষমতা আল্লাহর দেয়া ক্ষমতা। আল্লাহ যখন ক্ষমতা তুলে নেন তখন আর বস্তুর কোন ক্ষমতা থাকে না। এজন্যই আমরা যখন আসবাব ব্যবহার করব আল্লাহর নাম নিয়ে অর্থাৎ, বিসমিল্লাহ বলে ব্যবহার করব। তাহলে আল্লাহর হুকুম হলে সে আসবাব আমার অনুকূলে কাজে আসবে। আল্লাহর নামে ঔষধ সেবন করব, কারণ ঔষধের নিজস্ব ক্ষমতা নেই, তার ক্ষমতা আল্লাহর দেয়া ক্ষমতা। যদি আল্লাহর ইচ্ছা হয় তাহলেই সে ঔষধ আমার উপকারে আসবে, নতুবা উপকারে আসবে না। যখন খাবার খাব, আল্লাহর নাম নিয়ে খাব, কারণ সেই খাবার আমার উপকারে আসবে কি-না, সেই খাবার আমার স্বাস্থ্যের উপযোগী হবে কি-না, তা আল্লাহর মর্জির উপর নির্ভর করছে। যদি আল্লাহর মর্জি হয়, তাহলে আমার উপকারে আসবে, নতুবা উপকারে আসবে না। যাহোক আল্লাহর শক্তির কথা আলোচনা করা হচ্ছিল। আল্লাহর এই বিশাল ক্ষমতা থাকার কারণেই এই বিশাল আসমান-যমীনের পরিচালনায় তার কোনো ক্লান্তি আসে না। তাই আয়াতুল কুরসীর শেষ ভাগে বলা হয়েছে,

وَلَا يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ.

অর্থাৎ, এই বিশাল আসমান-যমীনকে সংরক্ষণ ও পরিচালনা করা তার পক্ষে মোটেই কঠিন নয়। তিনি সমুচ্চ সুমহান।

এভাবে আয়াতুল কুরসীর মধ্যে আল্লাহর কিছুটা পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহর পরিচয়টাই আমাদের কাছে মূল বিষয়। যদি আল্লাহকে চিনতে পারি, তাহলে দ্বীন-ধর্মকে চিনতে পারব এবং তার উপরে চলতে পারব, আল্লাহর পরিচয়টাই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এজন্য দেখা যায় যেসব আয়াতের মধ্যে আল্লাহর পরিচয় তুলে ধরা হয়, সেই আয়াতের ফযীলতও বেশি। গত জুমুআয় বলা হয়েছিল সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াতে আল্লাহর পরিচয় বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে, দেখা যায় তার ফযীলতও বেশি। আয়াতুল কুরসীর মধ্যেও আল্লাহর পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। আয়াতুল কুরসীরও ফযীলত অনেক। রাসূল (সা.) হযরত উবাই ইব্নে কা'ব (রা.)কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, কুরআনের ভিতরে সবচেয়ে বড় আয়াত, অর্থাৎ, মর্যাদার দিক থেকে বড় আয়াত কোনটা? তিনি বলেছিলেন আয়াতুল কুরসী। রাসূল (সা.) এই জওয়াব শুনে বলেছিলেন আলহামদু লিল্লাহ! আল্লাহ তোমাকে একজন ভাল জ্ঞানের অধিকারী বানিয়ে দিন। এরপর রাসূল (সা.) ইরশাদ করলেন, 'যে ব্যক্তি আয়াতুল কুরসী প্রতি ফরয নামাযের পরে একবার পাঠ করবে, মৃত্যুর সাথে সাথে সে জান্নাত লাভ করবে'। অর্থাৎ, কবরে থেকেও সে জান্নাতের নাজ নেয়ামত ভোগ করতে থাকবে। জান্নাতের আরাম আয়েশ উপলব্ধি করতে থাকবে। আয়াতুল কুরসী হল তৃতীয় পারার শুরুতে اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ থেকে وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ পর্যন্ত। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে সবকিছু সহীহ ভাবে বুঝার এবং আমল করার তাওফীক দিন। আমীন!

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বয়ান নং ৬-এর খুতবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ الْجِنَانَ وَالْاَنَامَ ، وَاَكْرَمَهُمْ بِالْاَمْنِ وَالسَّلَامِ، وَهُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، اِلٰهٌ لَّا تُحِيْطُ بِهِ الْعُقُوْلُ وَالْاَفْهَامُ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدِنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ سَيِّدُ الْاَنْبِيَاءِ الْكِرَامِ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ صَلَاةَ الْبَرَزَةِ الْعِظَامِ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الْهُدَاةِ الْاَعْلَامِ.

اَمَّا بَعْدُ :

اَيُّهَا النَّاسُ ! عَلَيْنَا الْاِيْمَانُ بِذَاتِهٖ تَعَالٰى وَصِفَاتِهٖ. وَصِفَاتُهٗ تَعَالٰى كَثِيْرَةٌ، مِّنْهَا اَنَّهٗ تَعَالٰى هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ. وَمَعْنَى الْاَوَّلِ وَالْاٰخِرِ اَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا بِدَايَةَ لَهٗ وَلَا نِهَايَةَ. فَكَانَ ذَاتُهٗ تَعَالٰى قَبْلَ كُلِّ مَخْلُوْقٍ اِلٰى مَا لَا بِدَايَةَ لَهٗ. وَسُئِلَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيْنَ كَانَ رَبُّنَا قَبْلَ اَنْ يَّخْلُقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ؟ فَقَالَ : كَانَ فِىْ عَمَاءٍ مَا تَحْتَهٗ هَوَاءٌ وَمَا فَوْقَهٗ هَوَاءٌ ثُمَّ خَلَقَ عَرْشَهٗ عَلَى الْمَاءِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ.

وَاعْلَمُوْا اَنَّ مَا يَقُوْلُهٗ بَعْضُ الْجَهَلَةِ بِاَنَّ شَيْخَهٗ فُلَانًا وَّفُلَانًا هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، ذَالِكَ خِلَافُ الْاِيْمَانِ. وَبَعْضُ الْجَهَلَةِ يُنْسِبُوْنَ اِلٰى مَشَائِخِهِمْ مَا لَا يَجُوْزُ اِنْسَابُهٗ اِلَّا اِلَى اللّٰهِ. وَهُمُ اتَّخَذُوْا مَشَائِخَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ كَمَا قَالَ تَعَالٰى فِىْ شَاْنِ الْيَهُوْدِ : اِتَّخَذُوْا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ. وَبَعْضُ الْجَهَلَةِ يَطْلُبُ الْاَوْلَادَ مِنْ مَّشَائِخِهِمْ مَعَ اَنَّ ذَالِكَ مِنْ شَاْنِهٖ تَعَالٰى. قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ فِى الْقُرْاٰنِ : يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، يَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ اِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ الذُّكُوْرَ، اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًا وَيَجْعَلُ

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



مَنْ يَّشَاءُ عَقِيْمًا. اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ. وَبَعْضُ الْجَهَلَةِ يَسْتَغِيْثُ مَشَائِخَهُمْ لِكَشْفِ الضُّرِ مَعَ اَنَّ ذَالِكَ اَيْضًا مِّنْ شَاْنِهٖ تَعَالٰى. قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِىْ كِتَابِهٖ : وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗ اِلَّا هُوَ. وَقَالَ تَعَالٰى : اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْٓءَ ؟

وَمِنْ صِفَاتِهٖ تَعَالٰى اَنَّهٗ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ، لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ. لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلَّا بِاِذْنِهٖ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِنْ عِلْمِهٖ اِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ.

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ : سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ . لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ، هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ.

اَقُوْلُ قَوْلِىْ هٰذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ لِىْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَاسْتَغْفِرُوْهُ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বয়ান নং-৭

## আল্লাহর ইবাদতে শরীক না থাকা প্রসঙ্গ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَالِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : لَوْ كُنْتُ اٰمِرُ اَحَدًا اَنْ يَّسْجُدَ لِاَحَدٍ لَاَمَرْتُ الْمَرْاَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

গত কয়েক জুমুআ পূর্বে আলোচনা শুরু করা হয়েছিল যে, আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখার অর্থ হল আল্লাহর যাত বা সত্তার প্রতি ঈমান রাখা, আল্লাহর গুণাবলীর প্রতি ঈমান রাখা, আর তাওহীদ বা একত্ববাদের প্রতি ঈমান রাখা। তাওহীদ বা একত্ববাদের অর্থ হল আল্লাহর সত্তা একক, তাঁর সত্তায় কেউ শরীক নেই, তাঁর গুণাবলীর মধ্যেও কেউ শরীক নেই। তাই আল্লাহর ইবাদতের ক্ষেত্রেও কাউকে শরীক করা যাবে না। আল্লাহ তাঁর সত্তায়ও একক, তাঁর গুণাবলীতেও একক এবং ইবাদত পাওয়ার ক্ষেত্রেও একক। আল্লাহর সত্তায় এবং গুণাবলীতে যেমন কাউকে শরীক করা যাবে না, আল্লাহর ইবাদতেও কাউকে শরীক করা যাবে না। এই শিরক বা আল্লাহর সাথে শরীক করা এত মারাত্মক গোনাহ যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সমস্ত গোনাহ্ ক্ষমা করেন কিন্তু শিরককে ক্ষমা করেন না। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ.

অর্থাৎ, আল্লাহর সাথে শিরক করা হলে অবশ্যই সে গোনাহ তিনি ক্ষমা করেন না। এ ছাড়া অন্যান্য গোনাহ যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করেন, যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন না। (নিছাঃ ৪৮)

এখানে স্পষ্টভাবে ঘোষণা দেয়া হয়েছে যে, শিরককে তিনি মাফ করবেন না। শরীক করাকে আল্লাহ তা'আলা কোন ক্রমেই বরদাশ্ত করেন না। দুনিয়াতেও মানুষ অনেক কিছুকে বরদাশ্ত করে, কিন্তু নিজের সাথে কাউকে শরীক করা বরদাশ্ত করে না। অনেক অপরাধ আমরা ক্ষমা করি, কিন্তু শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করি না। রাষ্ট্রের জনগণ যদি অপরাধ করে, তাহলে রাষ্ট্রপ্রধান যে কোন অপরাধকে ক্ষমা করতে পারেন। কিন্তু যদি অন্য একজনকে রাষ্ট্রপ্রধান বলে মানে অর্থাৎ, শরীক করে, তাহলে সে অপরাধ ক্ষমা করা হয় না। স্বামী তার স্ত্রীর অনেক অপরাধ ক্ষমা করবে কিন্তু স্বামীর সাথে যদি অন্য কাউকে শরীক করে, সে অপরাধ কোন স্বামী ক্ষমা করবে না। এটা শুধু মানুষের মধ্যে নয় জানোয়ারের মধ্যেও এ ব্যাপারটা দেখা যায়। যে সমস্ত জানোয়ার জোড়ায় জোড়ায় থাকে, তার মধ্যে যদি আরেকটা প্রবেশ করে, তাহলে তা সহ্য করা হয় না। অর্থাৎ, জীব জানোয়ারও শরীকানাকে পছন্দ করে না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় আজকাল কিছু মানুষ এটা পছন্দ করা শুরু করেছে। শুনেছি আজকাল নাকি কিছু লোক বউ বদলানোর অনুষ্ঠান করে। আমরা জানি না কীভাবে তারা এটা করে বা করতে পারে! এটা তো ইতর জানোয়ারও বরদাশ্ত করতে পারে না। শিয়াল, কুকুর যাদের কোন জোড়াবদ্ধ বা দাম্পত্য জীবন নেই, তারা এটা সহ্য করতে পারে, আত্মমর্যাদা সম্পন্ন মানুষ কী করে এটা সহ্য করতে পারে? বিবেক সম্পন্ন মানুষ কীভাবে এটা মেনে নিতে পারে? এরা তো জানোয়ারের চেয়েও নীচে নেমে গেছে। আল্লাহ তা'আলার এই উক্তি তাদের জন্য যথার্থ প্রযোজ্য,

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



اُولٰٓئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ.

'অর্থাৎ, ওরা জানোয়ারের মত বরং তার চেয়েও বিভ্রান্ত ও অধম'! (আ'রাফ: ১৭৯)

জানোয়ারের তবুও একটু আত্মমর্যাদাবোধ আছে, ওদের তা-ও নেই। কোন সুস্থরুচী ও সুস্থবিবেক সম্পন্ন মানুষ এটা বরদাশ্ত করতে পারে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনও এটাকে বরদাশ্ত করেন না। তাই সব গোনাহ্ তিনি মাফ করেন কিন্তু শিরকের গোনাহ্ মাফ করেন না।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, আল্লাহর ইবাদতের সাথে শরীক করা তথা আল্লাহকে ছেড়ে মানুষরে পূজা করা, মূর্তি পূজা করা শুরু হয়েছে পৃথিবীর প্রায় শুরু থেকে। সর্ব প্রথম নবী হলেন হযরত আদম (আ.)। তারপর নবী ছিলেন হযরত আদম (আ.)-এর পুত্র হযরত শীষ (আ.)। তার পরে নবী ইদ্রীস (আ.), এই হযরত ইদ্রীস (আ.)। কোন কোন ঐতিহাসিকের বর্ণনা মতে এর পর থেকেই মূর্তি পূজা শুরু হয়। এক বর্ণনা মতে হযরত ইদ্রীস (আ.)কে আল্লাহ তা'আলা স্বশরীরে আসমানে তুলে নেন। সূরা মরিয়ামের ভিতরে বলা হয়েছে,

وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا.

অর্থাৎ, আমি তাঁকে উচ্চ মর্যাদার স্থানে তুলে নেই। (মারইয়ামঃ ৫৭)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় কেউ কেউ বলেছেন সরাসরি তাঁকে আসমানে তুলে নেয়া হয়। অন্য বর্ণনামতে তাঁর স্বাভাবিক ওফাত ঘটে। তাঁকে আসমানে তুলে নেয়ার বা তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর অনুসারী ভক্তবৃন্দরা নবীর অনুপস্থিতিতে অত্যন্ত মর্মাহত হয়, তাদের বেহাল অবস্থা হয়ে যায়। তখন শয়তান তাদেরকে পরামর্শ দেয় যে, এখন তোমাদের শান্তনার জন্য একটা উপায় করা যায়, তা হলো তিনি যেমন ছিলেন হুবহু সেরকম একটা আকৃতি বানিয়ে তোমাদের সামনে রাখ, তাহলে তাকে দেখে মানুষ কিছুটা আত্মস্থ হতে পারবে, কিছুটা শান্তনা আসবে। শয়তানের পরিকল্পনা ছিল, এভাবে মূর্তি পূজার ভীত রচনা করা হবে। পরামর্শ মোতাবেক হযরত ইদ্রীস (আ.)-এর মূর্তি বানানো হয়। তাঁর মূর্তি দেখে ভক্তরা মনে মনে কিছুটা শান্তনা ও তৃপ্তি উপলব্ধি করতে থাকল যে, যাক নবীকে অন্তত দুচোখে দেখতে পাচ্ছি। তারপর ধীরে ধীরে শয়তান তাদেরকে মূর্তি পূজার দিকে অগ্রসর করতে থাকল। শয়তান তাদেরকে বোঝাল যে, এতো নবীর প্রতিকৃতি, দেখতে নবীর মতই, এ প্রতিকৃতিকে তাই শ্রদ্ধা করা উচিত। এভাবে সে মূর্তিকে একটু একটু করে শ্রদ্ধা করা শুরু হল। তারপর শ্রদ্ধা ভরে তার সামনে মাথা নত করা শুরু হল। এভাবে এক সময় সে মূর্তিকে সাজদা করা শুরু হল। এভাবে আস্তে আস্তে এক সময় রীতিমত তার পূজা শুরু হয়ে গেল।

শয়তান যেকোন কাজ করে সুদূর প্রসারী চিন্তা নিয়ে করে। হঠাৎ করেই যদি সে বলত যে, নবীর মূর্তি বানিয়ে তার পুজা কর, তাহলে মানুষ বলত, না অসম্ভব আল্লাহর ইবাদত ছাড়া কারও পূজা করা শিরক। তাই শয়তান অত্যন্ত কৌশলে ধীরে ধীরে তাদেরকে মূর্তি পূজার দিকে নিয়ে গেল।

শয়তানের এরকম সুদূর প্রসারী পরিকল্পনার আর একটা ঘটনা শুনুন-হাজী সাহেবগণ হজ্জ করতে গিয়ে সাফা মারওয়া দুই পাহাড়ে যে ছায়ী করেন, রাসূল (সা.)-এর প্রাথমিক যুগেও এই দুই পাহাড়ের উপরে দুটো মূর্তি রাখা ছিল। জাহেলী যুগের লোকেরা ছায়ী করার সময় এই দুই মূর্তিকে সাজদা করত বা চুমা দিত। এই মূর্তি দুটোর ইতিহাসও অনুরূপ। এক বর্ণনা অনুযায়ী মূর্তি দুটোর একটা ছিল পুরুষের মূর্তি, তার নাম ছিল ইসাফ। আর একটি নারীর মূর্তি, তার নাম ছিল নায়েলা। বাস্তবেই ইসাফ নামক একজন পুরুষ এবং নায়েলা নামে একজন নারী ছিল। তারা বায়তুল্লাহর ভিতরে ইবাদত বন্দেগী

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

করত। একবার শয়তানের ধোকায় তারা দুজন বায়তুল্লাহর ভিতরে অপকর্মে লিপ্ত হয়। আল্লাহর গযবে তারা দুজন পাথরে পরিণত হয়ে যায়। মানুষ সকাল বেলায় এসে মূর্তি দুটোকে দেখে চিনতে পারল যে, এতো সেই দুজন ইসাফ আর নায়েলা। তারা সিদ্ধান্ত নিল এই গযবের মূর্তি কাবা শরীফের ভিতরে রাখা যাবে না, বাইরে ফেলে দিতে হবে। শয়তান পরামর্শ দিল শুধু বাইরে ফেলে দিলে হবে না, মূর্তি দুটোকে বায়তুল্লাহর সামনে ঝুলিয়ে রাখ। প্রতিদিন মানুষ তাদেরকে জুতা পেটা করবে। যাতে ভবিষ্যতে কেউ এমন জঘন্য অপরাধ করার সাহস না পায়। পরামর্শটি বাহ্যিক ভাবে ভালই মনে হল। পরামর্শ মোতাবেক মূর্তি দুটোকে বায়তুল্লাহর দরজার সাথে লটকিয়ে রাখা হল। যখনই কেউ প্রবেশ করে জুতার পিটানী দেয়, বের হওয়ার সময়ও জুতার পিটানী দেয়। এভাবে চলতে থাকল।

এভাবে শত বছর পার হয়ে গেল। মানুষের আবেগ সব সময় এক রকম থাকে না। ধীরে ধীরে জুতা পিটানীর মাত্রা কমে গেল। এক সময় জুতা পিটানী একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল। মূর্তি দুটো আগের মতই সেখানে ঝুলানো থাকল। কিন্তু কেউ আর জুতা পিটানী করে না। এভাবে চলে গেল আরও শত বছর। এ মূর্তি দুটোর ইতিহাস মানুষ অনেকটা ভুলে গেল। তারপর এক সময় শয়তান কিছু লোকের মস্তিষ্কে এনে দিল যে, আমাদের পূর্ব পুরুষেরা এ দুটো মূর্তিকে কাবা শরীফের সাথে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন কেন? কেউ বলল হয়তো মূর্তির ভিতরে এ দুটো বিশেষ সম্মানের অধিকারী ছিল, তাই বায়তুল্লাহর সামনে তাদেরকে রাখা হয়েছিল। আবার কেউ কেউ বলল শুনেছি তাদেরকে জুতা দিয়ে পিটানো হত।

এভাবে বিতর্কের ভিতরে আরও বহুকাল কেটে গেল। এরপর কেউ কেউ বলল জুতা দিয়ে যদি এদেরকে পিটানো হত, তাহলে এখন কেন পিটানো হয় না, বুঝা গেল এই মত ঠিক নয়; বরং এরা বিশেষ সম্মানীয় দেবতা– এই মতই সঠিক। এভাবে কেউ কেউ মূর্তি দুটোকে সম্মান দেখানো শুরু করল। শয়তান বলল ঝুলানো মূর্তিকে যথাযথভাবে সম্মান দেখানো যায় না, নীচে নামিয়ে আন, যাতে যথার্থ সম্মান ও সেবা দিতে সুবিধে হয়। এভাবে মূর্তি দুটো নীচে চলে আসল। ধীরে ধীরে রীতিমত তাদের পূজা শুরু হল। এভাবে সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে শয়তান মানুষকে মূর্তি পূজায় লিপ্ত করেছে।

শয়তানের কু-মন্ত্রণা থেকেই মূর্তি পূজার প্রচলন ঘটেছে। নবীদের মূর্তি বানিয়ে তার পূজা করা হয়েছে, অনেক বুযুর্গদের মূর্তি বানিয়ে তার পূজা করা হয়েছে। এখনও অনেকে মুরব্বী ও বুযুর্গদের পূজা করে থাকে। মুরব্বী, গুরুজন ও পীর বুযুর্গদের ছবি ঘরে টানিয়ে রাখে। সেই ছবিকে মালা দেয়। ছবিকে সেবা দেয়, তার সামনে মাথা নত করে। এটাও এক ধরনের পূজা। মূর্তির সামনে যেমন হাত জড়ো করে, মাথা নত করে সম্মান দেখানো হয়। এই সব ছবির সাথেও অনেকটা সেরকম করা হয়। তাই এটাও অনেকটা পূজার শামিল। যদি এই মাথা নত করা, সাজদা দেয়া ইবাদতের উদ্দেশ্যে হয়, তাহলে তা শির্ক, আর যদি ইবাদতের উদ্দেশ্যে না হয় বরং শুধু সম্মানের উদ্দেশ্যে হয় তাহলে তা শির্ক নয়, কবীরা গোনাহ। তাছাড়া ছবি ও মূর্তি রাখার পাপ তো রয়েছেই। শরীআতে ছবি এবং মূর্তিকেই সমূলে নিষেধ করে দেয়া হয়েছে। নবী কারীম (সা.) ইরশাদ করেছেন,

إِنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللّٰهِ الْمُصَوِّرُوْنَ. (رواه البخاري في صحيحه برقم ٥٩٥٠ ومسلم في صحيحه برقم ٥٦٥٩)

'অর্থাৎ, যারা মূর্তি তৈরি করে আল্লাহর কাছে সব চেয়ে কঠিন শাস্তি হবে তাদের।'

রহমত থেকে দূরে সরানোর চূড়ান্ত পর্যায় হল তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করেন। এজন্য বলা হয়েছে মূর্তি বানানো, এবং মূর্তি ঘরে রাখা কবীরা গোনাহ। মনে রাখতে হবে; মূর্তির যা হুকুম ছবি বা ফটোরও

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com



তা-ই হুকুম। বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে যেমন হজ্জ ইত্যাদির ক্ষেত্রে অপারগ অবস্থায় ফুকাহায়ে কেরাম ফটো করার অনুমতি দিয়েছেন। এছাড়া সাধারণভাবে ফটো তোলার অনুমতি নেই। যে ঘরে ফটো বা মূর্তি থাকে, সে ঘরে রহমতের ফিরিশতা প্রবেশ করেন না। হাদীছে ইরশাদ হয়েছে,

لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا تَصَاوِيرُ. (رواه البخاري في صحيحه برقم ٥٩٤٩ ومسلم برقم ٥٦٤٢)

অর্থাৎ, যে ঘরে মূর্তি বা ছবি থাকে, সে ঘরে রহমতের ফিরিশতা প্রবেশ করে না।

শরীআতে মূর্তি, ছবি ও ফটো এত কঠোরভাবে নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ হল এগুলোর মধ্য দিয়ে শির্কের সুক্ষ্ম কীট অনুপ্রবেশ করে থাকে, এগুলো শির্কের সূত্র হয়ে দাঁড়ায়। তাই শরীআতে এগুলো নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। কারণ শির্ক হচ্ছে সবচেয়ে বড় গোনাহ্। এতবড় গোনাহ্ যে, আল্লাহ তা'আলা সব গোনাহ মাফ করেন কিন্তু শির্কের গোনাহ মাফ করেন না। অতএব যেসব জিনিস এই শির্কের সূত্র হয়, সেগুলোও সংগত কারণেই কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

যারা আল্লাহর বিভিন্ন প্রিয় বান্দাদের মূর্তি বানিয়ে পূজা করে, তাদের এই পূজা যে অযৌক্তিক তা বয়ান করে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادٌ اَمْثَالُكُمْ. (আ'রাফ: ১৯৪)

'অর্থাৎ, তোমরা যাদেরকে আহবান কর তারা তো তোমাদেরই মত আল্লাহর বান্দা'।

অর্থাৎ, তারা তো আল্লাহর বন্দেগী করে, আল্লাহর দাসত্ব করে, আল্লাহর ইবাদত করে। তাই তোমরা তাদের পূজা না করে, তারা যে আল্লাহর ইবাদত করে তাঁরই ইবাদত কর। তাদের পূজা কেন করবে? তারাে তো তোমাদেরই মত। হ্যাঁ তারা আমার ইবাদত করে আমার প্রিয় বান্দা হয়েছে। অতএব তাদেরকে মানতে হলে আমারই ইবাদত করা যুক্তি সংগত।

কিছু মূর্তি পূজারী লোক মূর্তি পূজার পক্ষে এই যুক্তি বের করেছিল যে, আমরা তাদের পূজা করি এজন্য যে, তারা আল্লাহর মনোনীত বান্দা। আমরা তাদের পূজা করলে তারা আমাদের প্রতি খুশি হয়ে আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে। কুরআন শরীফে তাদের এই যুক্তি তুলে ধরে বলা হয়েছে,

مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى.

অর্থাৎ, তারা বলে, আমরা তাদের পূজা করি এজন্য যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর কাছে নিকটবর্তী করে দিবে। (যুমার: ৩)

এখানে কয়েকটি কথা বোঝার প্রয়োজন। এক নং কথা হল– আল্লাহর নৈকট্য অর্জন হয় ইবাদত করার মাধ্যমে, পূজার মত আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজ করে অন্যের সুপারিশে নিকটবর্তী হওয়া যায় না। দুই নং কথা হল– আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার জন্য কারও সুপারিশের প্রয়োজন নেই, আল্লাহর দরবারে কোন দারোয়ান নেই, সরাসরি সেখানে যাওয়া যায়। আল্লাহর কোন দোভাষীর প্রয়োজন নেই, তিনি সকলের ভাষা বোঝেন। তাই যা বলার ও চাওয়ার আছে সরাসরি আল্লাহর কাছে বলা ও চাওয়ার নিয়ম রাখা হয়েছে। অতএব আল্লাহর কাছে নিকটবর্তী হওয়ার জন্য কোন মাধ্যম ধরার প্রয়োজন নেই। তিন নং কথা হল– আমরা তাদের পূজা করলে তারা এতে খুশি হবেন না, কারণ তারা নিজেরাই ছিলেন পূজার বিরোধী। কাজেই তাদের পূজা করলে তারা খুশি নয় বরং অখুশি হবেন, কাজেই এভাবে তাদের সুপারিশ পাওয়ার আশা করা হবে পাগলামী। যাহোক আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের মূর্তি বানিয়ে যারা পূজা করে, তাদের যুক্তিহীন তা বর্ণনা করা হল। আর এক শ্রেণির পূজারী আছে, যারা সত্যিকার কোন মানুষের নয়; বরং কল্পিত দেব-দেবীর মূর্তি বানিয়ে তার পূজা করে। যেমন হিন্দুরা নানান দেব-দেবীর মূর্তি বানিয়ে

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

পূজা করে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেবের পূজা করে। কালি, দূর্গা, কার্তিকের পূজা করে। এসব নামের বাস্তব কোন ব্যক্তি আদৌ যে দুনিয়াতে ছিল, তার কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ তারা দেখাতে পারে না, সবই কল্পিত। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে দলীল তো নেই-ই। কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে,

اِنْ هِيَ اِلَّآ اَسْمَآءٌ سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَ اٰبَآؤُكُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ.

অর্থাৎ, এগুলো কতক নাম ছাড়া আর কিছু নয়। তোমরা এবং তোমাদের পূর্ব পুরুষেরা যে নাম রেখে দিয়েছ। আল্লাহ এ ব্যাপারে কোন দলীল প্রেরণ করেননি। ওরা কল্পনা এবং খেয়াল খুশির অনুসরণ করে চলেছে।

এসব দেবতারা যে পূজা পাওয়ার যোগ্য নয়, তার যুক্তি বর্ণনা করে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

اَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَرُوْنِىْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِى السَّمٰوٰتِ.

অর্থাৎ, তোমরা যে ওদের পূজা কর, তোমরা আমাকে দেখাও ওরা পৃথিবীর কোন্ জিনিসটা সৃষ্টি করেছে? নাকি আসমানের কোন সৃষ্টির মাঝে ওরা শরীক আছে? অর্থাৎ, ওরা যখন দুনিয়ার কোন বস্তু সৃষ্টি করেনি তখন কেন ওদের পূজা করতে হবে? ওদের কোন কিছু সৃষ্টি করার ক্ষমতা তো দুরের কথা, আল্লাহ বলেন,

وَ اِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْـًٔا لَّا يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ.

'অর্থাৎ, ওদের সামনে যে খাদ্য খাবার তোমরা রাখ, মাছিতে সে খাবার ছিনিয়ে নিয়ে গেলে তা ঠেকানোর মত ক্ষমতাও ওদের নেই'। (হজ্জ: ৭৩)

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'ওরা ঠেকাবে কী করে ওদের তো দেখারও ক্ষমতা নেই'। ইরশাদ হয়েছে,

وَتَرٰهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ.

অর্থাৎ, তুমি দেখবে তারা তোমার দিকে চেয়ে আছে– কিন্তু আসলে ওরা কিছুই দেখতে পায় না।

দৃষ্টিশক্তি বলতেও ওদের কিছু নেই। আল্লাহ বোঝাতে চান এরকম অথর্ব মূর্তিকে তোমরা পূজা কর, যারা না কিছু সৃষ্টি করেছে, না ওদের কোনো ক্ষমতা আছে! রবি ঠাকুরও একটা কবিতার মধ্যে নিজ হাতে গড়া মাটির মূর্তির পূজা করার অযৌক্তিকতা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন,

মুগ্ধ ওহে স্বপ্ন ঘরে
যদি প্রাণের আসন কোণে
ধুলায় গড়া দেবতারে
লুকিয়ে রাখি সংগোপনে
চিরদিনের প্রভূ তবে,
তোদের মনে বিফল হবে
বাইরে সে দাঁড়িয়ে রবে
কতনা যুগ যুগান্তরে।

এ কবিতায় তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যুগ যুগ ধরে নিজের হাতে গড়া দেবতার পূজা করলেও আসল দেবতার সান্নিধ্য লাভ করা যাবে না। যাহোক গায়রুল্লাহ অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর পূজা

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



করার যত সুরত হতে পারে, সবই শিরক। এই পূজার অসারতা কুরআন হাদীছ দ্বারাও প্রমাণিত, যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত।

আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও সাজদা করাও পূজার মত। এ জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সাজদা করাও নিষিদ্ধ। যদি সেই সাজদা সম্মানের উদ্দেশ্যেও হয় তবুও তা নিষিদ্ধ। সম্মান করার উদ্দেশ্যেও কাউকে সাজদা করা যাবে না। আল্লাহ ছাড়া কাউকে যদি সাজদা করা যেত তাহলে রাসূল (সা.) দুনিয়ার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মানুষ, তাঁকে সাজদা করা যেত। সাহাবায়ে কেরাম রাসূল (সা.)কে সাজদা করার অনুমতি চেয়েছিলেন, কিন্তু রাসূল (সা.) সে অনুমতি দেননি। তিনি বলেছেন,

لَوْ كُنْتُ اٰمِرًا اَحَدًا اَنْ يَّسْجُدَ لِاَحَدٍ لَاَمَرْتُ الْمَرْأَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا. (رواه الترمذي برقم ١١٥٩ وقال حسن غريب)

'অর্থাৎ, কাউকে সাজদা করার অনুমতি নেই। যদি কাউকে নির্দেশ দিতাম অন্য কোন মানুষকে সাজদা করার, তাহলে স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম সে যেন তার স্বামীকে সাজদা করে'।

কিন্তু স্ত্রীকেও এই নির্দেশ দেয়া হয়নি। এ হাদীছে দুটো জিনিস বোঝানো হয়েছে। এক হল– আল্লাহ ছাড়া কাউকে সাজদা করা যাবে না। দুই হল স্ত্রীর কাছে স্বামীর মর্যাদা এত বেশি যে, কাউকে সাজদা করার অনুমতি থাকলে স্বামীকে সাজদা করতে হত। কিন্তু একমাত্র আল্লাহ ওয়াহ্দাহু লা-শারীকা লাহু ছাড়া আর কাউকে সাজদা করার অনুমতি নেই। মুসলমানের মাথা আর কারও সামনে ইবাদতের উদ্দেশ্যে নত হতে পারে না। সম্মান দেখানোর জন্যও মাথা নত করার রীতি শরীআতে রাখা হয়নি। কোন বুযুর্গদের কবরের কাছে যেয়েও মাথা নত করার অনুমতি নেই। শহীদ মিনারে যেয়েও মাথা নত করার অনুমতি নেই। আমরা জাতীয় সংগীতে বলি "ওমা তোমার পায়ে ঠেকাই মাথা" যদিও এ কথাটা হয়তো ভাবার্থে বলা হয় অর্থাৎ, মা বলে দেশকে বোঝানো হয় আর পায়ে মাথা ঠেকানো বলে দেশের আনুগত্য এবং দেশের প্রতি শ্রদ্ধা করা বোঝানো হয়। যদি এরকম ভাবার্থে নেয়া হয়, তাহলে এটা শিরক হবে না। তারপরও কথাটার মধ্যে শিরকের গন্ধ পাওয়া যায়। মনে হয় যেন নাউযুবিল্লাহ দেশকে মা কালির মত মনে করে তার পূজা করার জন্য তার পায়ে মাথা ঠেকানোর কথা বলা হচ্ছে। মুসলমান শিরক করবে না, মুসলমানের কথায় শিরকের গন্ধও না থাকা চাই। শিরক অনুপ্রবেশ করতে পারে এমন কোন পথও না রাখা চাই। কারণ শিরকের ব্যাপারে ইসলাম এত কঠোর মনোভাব পোষণ করেছে যে, অন্যান্য সব ধরনের গোনাহ ক্ষমা হতে পারবে, কিন্তু শিরক এমন গোনাহ যা ক্ষমা হবে না। তবে কখনো শিরকে লিপ্ত হয়ে গেলে আবার নতুন করে ইসলাম গ্রহণ করে ইসলামকে নবায়ন করে নিতে হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সব রকমের শিরক থেকে আমাদেরকে হেফাযত করুন। আমীন!

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বয়ান নং ৭-এর খুতবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْمُتَوَحِّدِ بِذَاتِهٖ وَصِفَاتِهٖ، اَلْمُتَنَزِّهِ عَنِ الشُّرَكَاءِ وَالْاَنْدَادِ وَاَمْثَالِهٖ، وَهُوَ الَّذِیْ خَلَقَ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ لِعِبَادَتِهٖ وَتَوْحِیْدِهٖ، اَحْمَدُهٗ حَمْدًا كَثِیْرًا یَّلِیْقُ بِوَحْدَانِیَّتِهٖ ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِیْكَ فِیْ ذَاتِهٖ وَصِفَاتِهٖ ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَیِّدَنَا وَنَبِیَّنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ سَیِّدُ رُسُلِ اللّٰهِ وَاَنْبِیَائِهٖ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَیْهِ صَلَاةً دَائِمَةً اِلٰى یَوْمِ لِقَائِهٖ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ سَادَةِ النَّاسِ وَاَتْقِیَائِهٖ.

اَمَّا بَعْدُ :

اَیُّهَا النَّاسُ! اِنَّ التَّوْحِیْدَ عَلٰى ثَلَاثِ طَبَقَاتٍ، اَلتَّوْحِیْدُ فِی الذَّاتِ، وَالتَّوْحِیْدُ فِی الصِّفَاتِ، وَالتَّوْحِیْدُ فِی الْعِبَادَاتِ. فَوَحِّدُوا اللّٰهَ فِیْ ذَاتِهٖ وَصِفَاتِهٖ وَعِبَادَتِهٖ، فَاِنَّ التَّوْحِیْدَ اَسَاسُ الْحَسَنَاتِ وَرَاْسُ الطَّاعَاتِ، وَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى جَعَلَ اَفْرَضَ الْفَرَائِضِ عَلَى الْعَبْدِ التَّوْحِیْدَ وَالْاِیْمَانَ، وَفَرَضَ عَلَیْهِ الْاِخْلَاصَ فِی الْعِبَادَاتِ فِی السِّرِّ وَالْاِعْلَانِ. فَاعْبُدُوْهُ تَعَالٰى كَمَا اَمَرَكُمْ بِعِبَادَتِهٖ وَتَوْحِیْدِهٖ اِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِیْنَ، قَالَ تَعَالٰى : وَمَا اُمِرُوْٓا اِلَّا لِیَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِیْنَ لَهُ الدِّیْنَ. وَاحْذَرُوْا عِبَادَةَ الْاَصْنَامِ، فَاِنَّهَا شِرْكٌ فِی الْعِبَادَةِ، وَاِنَّ اللّٰهَ لَا یَغْفِرُ اَنْ یُّشْرَكَ بِهٖ وَیَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ یَّشَاءُ. وَقَالَ تَعَالٰى بَیَانًا لِبُطْلَانِ مَا عَبَدُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ : اِنَّ الَّذِیْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادٌ اَمْثَالُكُمْ فَادْعُوْهُمْ فَلْیَسْتَجِیْبُوْا لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِیْنَ. وَقَالَ تَعَالٰى : قُلْ اَرَءَیْتُمْ مَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَرُوْنِیْ مَا ذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِی السَّمٰوٰتِ. وَقَالَ تَعَالٰى : اِنَّ الَّذِیْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ یَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوْا لَهٗ،

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



وَاِنْ یَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَیْئًا لَّا یَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ، ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ. وَقَالَ تَعَالٰى : اِنْ هِیَ اِلَّا اَسْمَاءٌ سَمَّیْتُمُوْهَا اَنْتُمْ وَاٰبَاۤؤُكُمْ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ. اِنْ یَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْاَنْفُسُ، وَلَقَدْ جَاۤءَهُمْ مِنْ رَّبِّهِمُ الْهُدٰى. وَهٰكَذَا عَدِیْدٌ مِّنْ صَرِیْحِ الْاٰیَاتِ الْقُرْاٰنِیَّةِ وَصَحِیْحِ الْاَحَادِیْثِ النَّبَوِیَّةِ تَدُلُّ عَلٰى قَبَاحَةِ الشِّرْكِ فِی الْعِبَادَةِ.

وَكَمَا اَنَّ الشَّرْعَ حَذَّرَ مِنْ صَرِیْحِ الشِّرْكِ فِی الْعِبَادَةِ، حَذَّرَ مِمَّا فِیْهِ شَائِبَةٌ لَّهٗ. وَلِاَجْلِ ذَالِكَ مَنَعَ الشَّرْعُ عَنِ التَّصَاوِیْرِ وَعَنْ سَجْدَةِ التَّعْظِیْمِ. قَالَ النَّبِیُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : اَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللّٰهِ الْمُصَوِّرُوْنَ. وَقَالَ : اِنَّ الْمَلٰٓئِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَیْتًا فِیْهِ تَمَاثِیْلُ اَوْ تَصَاوِیْرُ. وَقَالَ : لَوْ كُنْتُ اٰمِرَ اَحَدًا اَنْ یَّسْجُدَ لِاَحَدٍ لَاَمَرْتُ الْمَرْاَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا. فَالْحَذْرُ كُلَّ الْحَذْرِ عَنِ الشِّرْكِ.

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ : اِنَّ اللّٰهَ لَا یَغْفِرُ اَنْ یُّشْرَكَ بِهٖ وَیَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ یَّشَاءُ.

بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِی الْقُرْاٰنِ الْعَظِیْمِ، وَنَفَعَنَا وَاِیَّاكُمْ بِالْاٰیَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِیْمِ. اَقُوْلُ قَوْلِیْ هٰذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ لِیْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِیْنَ وَاسْتَغْفِرُوْهُ، اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ.

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বয়ান নং -৮

## নবী রাসূলদের প্রতি ঈমান প্রসঙ্গ (১ম পর্ব)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ لَانُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُسُلِهٖ، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَا يَسْمَعُ بِيْ اَحَدٌ مِّنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ يَهُوْدِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوْتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِيْ اُرْسِلْتُ بِهٖ اِلَّا كَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّارِ.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

আমরা ঈমান সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। মৌলিকভাবে যে ছয়টি বিষয়ের প্রতি ঈমান রাখতে হয়, তার মধ্যে প্রথম হল আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখা। আল্লাহর প্রতি কী কী ঈমান-বিশ্বাস রাখতে হয়, এ সম্পর্কে গত কয়েক জুমুআয় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহর প্রতি ঈমানের পর দ্বিতীয় মৌলিক বিষয় হল আল্লাহর প্রেরিত নবী-রাসূলদের প্রতি ঈমান রাখা। নবী আর রাসূল এই দুটো কথার মধ্যে একটু পার্থক্য রয়েছে। নবী এবং রাসূল সকলেই আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত, তবে তাদের মধ্যে যার কাছে নতুন কিতাব প্রেরিত হয় অর্থাৎ, যাকে নতুন কিতাব দেয়া হয়, তাঁকে বলা হয় রাসূল, আর যাকে নতুন কিতাব দেয়া হয় না, বরং তিনি পূর্বের কোন কিতাবের বিধি-বিধান অনুসারে চলেন এবং তার প্রচার করেন তাঁকে বলা হয় নবী। নবী হন বা রাসূল সকলের প্রতিই ঈমান রাখতে হবে। কোন নবী-রাসূলকে বিশ্বাস করা হবে, আর কাউকে বিশ্বাস করা হবে না, এরূপ পার্থক্য করা চলবে না। সূরা বাকারার শেষে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ لَانُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ.

অর্থাৎ, যারা মু'মিন তারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে, আল্লাহর ফিরিশতাদের প্রতি ঈমান রাখে, আল্লাহর প্রেরিত কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান রাখে এবং আল্লাহর প্রেরিত নবী-রাসূলদের প্রতি ঈমান রাখে। তারা বলে যে, আল্লাহর নবী রাসূলদের মাঝে আমরা ঈমান আনা না আনার ব্যাপারে পার্থক্য করি না।

এ আয়াতে সব নবী-রাসূলদের প্রতি ঈমান রাখতে বলা হয়েছে। তাঁরা সকলে আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ ছিলেন– একথা বিশ্বাস করতে হবে। কাউকে নবী-রাসূল বলে স্বীকার করব, আর কাউকে স্বীকার করব না, নবী-রাসূলদের ভিতরে এরকম পার্থক্য করা যাবে না। এক নবী-রাসূলকে আমি নবী-রাসূল বলে স্বীকার করলাম, আরেকজনকে আমি নবী-রাসূল বলে স্বীকার করলাম না, তাহলে আমি মু'মিন থাকতে পারলাম না। কাফের হয়ে যাব। ইহুদীরা হযরত মূসা (আ.) কে নবী স্বীকার করে কিন্তু হযরত ঈসা (আ.)কে নবী স্বীকার করে না। আবার খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আ.)কে নবী স্বীকার করে, কিন্তু হযরত মূসা (আ.)কে নবী বলে স্বীকার করে না। এ জন্য ইহুদী খ্রিস্টান সব দলই কাফের। এ ছাড়াও তাদের কাফের হওয়ার আরও অনেক কারণ রয়েছে।

আমরা মুসলমানরা সব নবী-রাসূলকেই আল্লাহর প্রেরিত নবী-রাসূল হিসেবে বিশ্বাস করি। তবে হ্যাঁ, সব নবী রাসূলকে বিশ্বাস করার অর্থ এই নয় যে, আমরা সব নবী-রাসূলের আনীত কিতাবের অনুসরণ করব। আমাদের নবী হলেন শেষ নবী। আর নিয়ম হল যখন কোন পরবর্তী নবী নতুন কিতাব নিয়ে আগমন করেন, তখন আগের নবীর কিতাবের বিধান রহিত হয়ে যায়। দুনিয়াতেও নিয়ম হল যখন কোন

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



একটা পদে পরবর্তী কর্মকর্তা আসেন তখন তার কথাই চলে। পূর্ববর্তী জনের কথা চলে না। হ্যাঁ পরবর্তী জন যদি আগের জনের চালু করা কথা বা কোন নিয়ম-নীতি বহাল রাখেন, তাহলে সেটা চালু থাকে, নতুবা চালু থাকে না। তাই সর্বশেষ নবী অর্থাৎ, আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর আগমনের পর তার আনীত কিতাব কুরআনের বিধানই চলবে। তাওরাত, ইঞ্জীল ইত্যাদি পূর্বের কোন কিতাবের বিধান এখন চলবে না। তাওরাত, ইঞ্জীল ইত্যাদি কিতাব নিজ নিজ যুগে কার্যকরী ছিল, কিন্তু কুরআন আসার পর সেগুলোর কার্যকারিতা রহিত হয়ে গেছে।

কুরআন হল সর্বশেষ ম্যাসেজ, সর্বশেষ বাণী। আর নিয়ম হল পরবর্তী ম্যাসেজ আসার পর আগের ম্যাসেজগুলোর কার্যকারিতা শেষ হয়ে যায়। এমনিভাবে নবী (সা.) হলেন লাস্ট ম্যাসেঞ্জার অর্থাৎ, আল্লাহর সর্বশেষ দূত। অতএব সর্বশেষ দূত আসার পর পূর্বের সব দূতের কার্যকারিতা শেষ হয়ে যায়। তাই নবী কারীম (সা.)-এর আগমনের পর হযরত মূসা, হযরত ঈসা প্রমুখ পূর্বের দূত বা পূর্বের নবীদের কার্যকারিতা স্থগিত হয়ে যাবে। যাহোক নবী-রাসূলদের প্রতি ঈমান আনার একটা অর্থ হল– সব নবী রাসূলকে আমরা নবী-রাসূল বলে বিশ্বাস করব। তবে হ্যাঁ, অনুসরণ করব সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর। আর আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) যেহেতু খাতামুন্নাবী অর্থাৎ, শেষ নবী, তারপর আর কোন নবী আসবেন না। তাই আমাদের নবী (সা.)-এর নবুওয়াত ও তাঁর কার্যকারিতা কিয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে। আমাদের নবীর প্রতি ঈমান রাখার মধ্যে তাঁর খতমে নবুওয়াতে বিশ্বাস রাখাও অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ, তিনি শেষ নবী, কিয়ামত পর্যন্ত সকল দেশের সকল মানুষের নবী-একথাও বিশ্বাস রাখতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ. (সাবা: ২৮)

'অর্থাৎ, আমি তোমাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রেরণ করেছি'। আর এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا. (আ'রা: ১৫৮)

'অর্থাৎ, তুমি বলে দাও, হে লোক সকলেরা! আমি তোমাদের সকলের নিকট আল্লাহর রাসূল'। এ আয়াতেও বোঝানো হয়েছে যে, তিনি সকলের জন্য নবী। আর এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

تَبٰرَكَ الَّذِيْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا. (ফুরকান: ১)

'অর্থাৎ, মহান ঐ সত্তা যিনি তাঁর বান্দার প্রতি ফুরকান অর্থাৎ, কুরআন অবতীর্ণ করেছেন, যাতে সে বিশ্ববাসীর জন্য সতর্ককারী হতে পারে'। এ আয়াতে স্পষ্টত বোঝানো হয়েছে যে, তিনি সকল বিশ্ববাসীর জন্য নবী।

হাদীছে নবীয়ে কারীম (সা.) ইরশাদ করেন,

كَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ اِلٰى قَوْمِهٖ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ اِلَى النَّاسِ عَامَّةً. (رواه البخاري في صحيحه برقم ٣٣٥)

'অর্থাৎ, পূর্বে কোন কোন নবী বিশেষভাবে তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরিত হতেন, আর আমি সমগ্র মানবজাতির নিকট প্রেরিত হয়েছি'।

অন্য এক হাদীছে নবী কারীম (সা.) ইরশাদ করেন,

فُضِّلْتُ عَلَى الْاَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ. الحديث. (رواه مسلم في صحيحه برقم ١١٩٥)

'অর্থাৎ, অন্যান্য নবীদের উপর ছয়টি বিষয়ে আমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে। তার মধ্যে একটি হল আমি সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রেরিত হয়েছি'।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

এসব হাদীছ দ্বারা স্পষ্টত প্রমাণিত হয় যে, আমাদের নবী (সা.)-এর নবুওয়াত বিশেষ কোনো দেশ বা গোষ্ঠীর জন্য নয়, বরং তিনি কিয়ামত পর্যন্ত সকল দেশের সকল জাতির সকলের জন্য নবী।

যুক্তিতেও বলে যে, আমাদের নবীর পর আর কোন নবী হতে পারে না, কেননা তিনি হলেন শ্রেষ্ঠ নবী। সকল নবীর চেয়ে মর্যাদায় তিনি শ্রেষ্ঠ। আর শ্রেষ্ঠ নবীর আগমনের পর আর কোন নবীর আগমনের প্রয়োজন থাকে না। তিনি যে সর্বশ্রেষ্ঠ নবী এবং সব নবী-রাসূলদের সর্দার এ কথা কুরআন, হাদীছ, ইজ্‌মা ও কেয়াস দ্বারা প্রমাণিত। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, এ কারণেই সব নবী-রাসূল থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়েছে যে, তারা যদি এই নবী (সা.)-এর যুগ পান তাহলে এই নবীর প্রতি ঈমান আনতে হবে। কুরআনের এক আয়াতে এ কথাই অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

وَ اِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَآ اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّ حِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَ لَتَنْصُرُنَّهٗ. (আলে ইমরান: ৮১)

রাসূল (সা.) সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। এ কারণে তাঁর উম্মতকেও সকল উম্মতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ উম্মত বলা হয়েছে। রাসূলের উম্মতের শ্রেষ্ঠ হওয়া তাঁরই শ্রেষ্ঠ হওয়ার প্রমাণ। এই উম্মত শ্রেষ্ঠ উম্মত, এ সম্পর্কে কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ. الاية

অর্থাৎ, তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত। মানবজাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে। (আলে ইমরান, ১১০)

যুক্তিতে আরও বলে যে, আমাদের নবীর পর আর কোন নবী হতে পারে না। কেননা রাসূল (সা.)-এর শরী'আত সকল শরী'আতের চেয়ে কামেল ও পূর্ণাঙ্গ। আর কামেল ও পূর্ণাঙ্গ শরীআত এসে যাওয়ার পর আর কোন নবী এবং আর কোন শরীআত আগমনের প্রয়োজন থাকে না। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا.

অর্থাৎ, আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম। (মায়িদা: ৩)

এইসব দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে প্রমাণিত যে, রাসূল (সা.) সমগ্র জাহানের সকল জাতির জন্য নবী। তাই তাঁর আগমনের পর তাঁর প্রতি ঈমান না আনলে সে জাহান্নামী হবে। রাসূলের আগমনের পর অন্য কোন নবীর প্রতি ঈমান নিয়ে আঁকড়ে থাকলেও মুক্তি হবে না। রাসূল (সা.)-এর আগমনের পর ইহুদীরা এখনও হযরত মূসা (আ.)কে আঁকড়ে ধরে আছে, রাসূলের প্রতি ঈমান আনছে না, তাদের মুক্তি হবে না। এমনিভাবে খ্রিস্টানরা এখনও হযরত ঈসা (আ.)কে আঁকড়ে ধরে আছে, তাদেরও মুক্তি হবে না। স্পষ্টত হাদীছে এসেছে নবীয়ে কারীম (সা.) ইরশাদ করেন,

وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَا يَسْمَعُ بِيْ اَحَدٌ مِّنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ يَهُوْدِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوْتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِيْ اُرْسِلْتُ بِهٖ اِلَّا كَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّارِ. (رواه مسلم في صحيحه برقم ٤٠٣)

'অর্থাৎ, ঐ সত্তার কছম যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন, এই উম্মতের ইহুদী-নাসারা যে কেউ আমার কথা জানার পরও আমার প্রতি ঈমান না এনে মৃত্যুবরণ করবে সে জাহান্নামী হবে'।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



যাহোক নবী কারীম (সা.) শেষ নবী, কিয়ামত পর্যন্ত সকল দেশের সকল মানুষের নবী, তার পরে আর কোন নবী-রাসূল আসবেন না, একথা বিশ্বাস করাও রাসূল (সা.)-এর প্রতি ঈমান রাখার অন্তর্ভুক্ত। এ বিশ্বাস ঠিক না থাকলে ঈমান ঠিক থাকবে না। তাই আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর পরে কেউ যদি নবুওয়াতের অর্থাৎ, নবী হওয়ার দাবী করে, তাহলে সে মু'মিন মুসলমান থাকে না, সে কাফের। তাকে যারা নবী বলে মেনে নিবে, তারাও মু'মিন থাকবে না, কাফের হয়ে যাবে।

রাসূল (সা.)-এর পরে যুগে যুগে বহু মানুষ নবী হওয়ার দাবী করেছে, মুসলিম উম্মাহ সর্ব সম্মতিক্রমে তাদেরকে এবং তাদের অনুসারীদেরকে কাফের বলে ঘোষণা দিয়েছেন। সর্বশেষ বিংশ শতাব্দীর শুরুতে অর্থাৎ, ১৯০১ সালে ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের গুরুদাসপুর জেলার কাদিয়ান নামক গ্রামের মীর্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী নবুওয়াতের দাবী করেছে। মুসলিম উম্মার আলেমসমাজ সর্বসম্মতিক্রমে তাদেরকে কাফের বলে ঘোষণা দিয়েছেন। গোলাম আহমদ কাদিয়ানী এবং তার অনুসারীরা অর্থাৎ, কাদিয়ানীরা মুসলমান নয়, বরং অমুসলিম বা কাফের। মীর্জা গোলাম আহমদের বাড়ি কাদিয়ান নামক গ্রামে ছিল বিধায় তাকে এবং তার অনুসারীদেরকে কাদিয়ানী বলা হয়। এখনও দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গায় কাদিয়ানীরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

আমাদের দেশেও বহু কাদিয়ানী রয়েছে। ঢাকায় বকশি বাজারে তাদের প্রধান কেন্দ্র। এই কাদিয়ানীরা মুসলমান নয়। অথচ তারা নিজেদেরকে কাদিয়ানী মুসলিম বলে পরিচয় দিয়ে থাকে, তাদের উপাসনালয়কে তারা মসজিদ বলে পরিচয় দেয়। এ কারণে বহু সরল প্রাণ সাধারণ মুসলমান তাদেরকে মুসলমানদের মধ্যকার বিভিন্ন দলের মত একটা দল মনে করে বিভ্রান্ত হচ্ছে। অনেকে তাদের অনুসারী হয়ে ঈমান হারা হচ্ছে। এজন্যই উলামায়ে কেরাম দাবী করছেন যে, কাদিয়ানীদেরকে কাফের বলে ঘোষণা দেয়া হোক, তাদের উপাসনালয়কে কাদিয়ানী উপাসনালয় নাম দেয়া হোক। যাতে তারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে পরিচয় দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে না পারে।

কিন্তু কিছু লোক উলামায়ে কেরামের দাবী যথার্থভাবে উপলব্ধি না করে বলছেন, এতে কাদিয়ানীদের জান মালের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করা হচ্ছে, তাদের ধর্মীয় অধিকার হরণ করা হচ্ছে, তাদের নাগরিক অধিকার ক্ষুণ্ন করা হচ্ছে ইত্যাদি। অথচ উলামায়ে কেরাম আদৌ এ কথা বলছেন না যে, তাদেরকে হত্যা করে দেয়া হোক বা তাদেরকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়া হোক বা তাদের উপাসনালয় বন্ধ করে দেয়া হোক। বরং উলামায়ে কেরাম শুধু এতটুকু বলছেন যে, তারা মুসলমান নয়, তাদের উপাসনালয় মসজিদ নয়, একথা সরকারীভাবে ঘোষণা করে দেয়া হোক। তারা ইসলামের নামে যেসব বইপত্র বের করেছে সেগুলো বাজেয়াপ্ত করা হোক। তারপর তারা কাদিয়ানী নামে যেভাবে ইচ্ছা তাদের ধর্ম-কর্ম পালন করুক, তাদের ধর্ম প্রচার করুক তাতে আমরা কোন বাধা দিতে যাব না। যেমন আমাদের দেশে হিন্দু-বৌদ্ধ প্রভৃতি বহু ধর্মের মানুষ তাদের ধর্মের নামে পূজা-অর্চনা করে যাচ্ছে, তাদের ধর্ম প্রচার করছে তাতে আমরা কোন বাধা সৃষ্টি করছি না। তদ্রূপ কাদিয়ানীরা তাদের ধর্মের নামে সবকিছু করুক, কিন্তু মুসলমান না হয়েও নিজেদেরকে মুসলমান পরিচয় দিয়ে মুসলমানকে বিভ্রান্ত করতে পারবে না। কাদিয়ানীরা মুসলমান নয়, কারণ তারা আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা (সা.)কে শেষ নবী বলে স্বীকার করে না। আর আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা (সা.)কে শেষ নবী বলে স্বীকার না করলে সে মুসলমান থাকে না।

পাকিস্তানের মরহুম মুফতী শফী সাহেব (রহ.) "খতমে নবুওয়াত" নামে একখানা কিতাব লিখেছেন। তার মধ্যে তিনি পাঁচশত হাদীছ এবং এক শত আয়াত উল্লেখ করেছেন। এই পাঁচশত হাদীছ এবং একশত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত যে, রাসূল (সা.) শেষ নবী। এর মধ্যে এক হাদীছে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে,

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

وَاَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ. (رواه ابو داود برقم ٤٢٥٤ والحديث صحيح)

অর্থাৎ, আমিই শেষ নবী, আমার পরে আর কোন নবী নেই।

গোলাম আহমদ কাদিয়ানী এ হাদীছের অপব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, "আমার পর আর কোন নবী নেই" এ কথাটার অর্থ হল, আমার পরে আর কোন স্বতন্ত্র নবী নেই। গোলাম আহমদ কাদিয়ানী বলেছেন আমি স্বতন্ত্র নবী নই, বরং আমি রাসূলের অনুগত একজন নবী। কখনও বলেছেন আমি স্বতন্ত্র নবী নই, বরং আমি ছায়া নবী। অতএব আমার নবী হওয়ার দাবী উক্ত হাদীছের পরিপন্থী নয়।

কিন্তু গোলাম আহমদ কাদিয়ানী যেরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন, এরূপ ব্যাখ্যাকে সঠিক বলে মেনে নিলে তেত্রিশ কোটি দেবতায় বিশ্বাসী হিন্দুদেরকেও তাওহীদপন্থী মুসলমান বলে মেনে নিতে হবে। ইসলামে বলা হয়েছে, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ অর্থাৎ, এক আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বূদ নেই। হিন্দুরা এই কালিমার বিপরীত বহু খোদায় বিশ্বাসী বলে তাদেরকে আমরা কাফের বলে থাকি। কিন্তু হিন্দুরা যদি কাদিয়ানী-র মত ব্যাখ্যা দিয়ে বলে যে, "এক আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই" এর অর্থ হল এক আল্লাহ ছাড়া কোন স্বতন্ত্র মা'বূদ নেই, ছায়া মা'বূদ থাকতে পারে। তাহলে হিন্দুদের দোষ কী? তারা তো বলতে পারে যে, আসল হল একজন পরমেশ্বর। আর অন্যান্য দেব-দেবী ও অবতাররা হল অধীনস্ত খোদার মত, ছায়া খোদার মত। কাদিয়ানীর এই ব্যাখ্যা যে অপব্যাখ্যা একজন মূর্খ মানুষও বুঝে। আপনি একজন সাধারণ মূর্খ মানুষকেও যদি জিজ্ঞাসা করেন যে, রাসূল (সা.) বলেছেন, আমি শেষ নবী, আমার পরে আর কোন নবী নেই, এর দ্বারা কী বুঝ? তাহলে সেই মূর্খ মানুষটাও বলবে যে," আর কোন নবী নেই" অর্থ কোন ভাবেই আর কেউ নবী হতে পারে না। যাহোক রাসূল (সা.)কে শুধু নবী বলে বিশ্বাস করলে চলবে না, তিনি শেষ নবী একথাও বিশ্বাস করতে হবে।

নবী-রাসূলদের প্রতি ঈমান-বিশ্বাস রাখার মধ্যে একথাও বিশ্বাস করতে হবে যে, তাঁদের কাছে ওহী আসে। তাঁরা কোন কথা নিজেদের পক্ষ থেকে বলেন না। যা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁদের নিকট ওহী আসে সেটাই তাঁরা বলেন। নবীয়ে কারীম (সা.) সম্পর্কে কুরআন শরীফে বলা হয়েছে,

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى.

অর্থাৎ, নবী নিজের খেয়াল খুশি থেকে মনগড়া কোন কথা বলে না, নিজের থেকে কোন কথা বলে না। যা সে বলে তা আমার পক্ষ থেকে বলে। (নাজম: ৩)

নবী-রাসূল মানুষ কিন্তু কেমন মানুষ? যার জীবনের প্রত্যেকটা কথা, যার জীবনের প্রত্যেকটা আচরণ আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ন্ত্রিত হয়। তাঁরা আল্লাহর শিখানো কথা বলেন, আল্লাহর নির্দেশনা অনুযায়ী প্রত্যেকটা কাজ করেন। নবী-রাসূলকে একজন মানুষ বলেও বিশ্বাস করতে হবে। যদি কেউ নবী-রাসূলকে খোদা বলে বিশ্বাস করে, তাহলে তার ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে। খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আ.)কে আল্লাহর পুত্র বলেছে। এভাবে তারা তাঁকে খোদা সাব্যস্ত করেছে। এভাবে তারা কুফরী করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ.

'অর্থাৎ, যারা ঈসা মাসীহকে খোদা বলেছে, তারা কুফরী করেছে'। তারা আল্লাহর বান্দাকে খোদা মনে করেছে তাই তারা কাফের হয়ে গেছে। (মায়িদা: ৭২)

তাই নবীকে মানুষ বলে বিশ্বাস করতে হবে। তবে তারা আমাদের মত সাধারণ মানুষ নন, বরং তাঁদের কাছে ওহী আসে, কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com



قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰى اِلَيَّ. الاية.

অর্থাৎ, হে নবী! তুমি বলে দাও আমি তোমাদের মত মানুষ, তবে (পার্থক্য এই যে) আমার নিকট ওহী প্রেরিত হয়। (কাহফ: ১১০)

অতএব কেউ যদি মনে করেন যে, রাসূল মানুষ নন, তাহলে তার ঈমান ঠিক থাকবে না। ঢাকার দেওয়ানবাগীর পীর সাহেব বলেন যে, আল্লাহ আর রাসূলের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এটা ঈমান পরিপন্থী কথা। এমনিভাবে যারা বলেন আল্লাহ পাক যেরকম সবকিছু গায়েব জানেন, রাসূলও সে রকম সবকিছু গায়েব জানেন, তারাও ঈমান-পরিপন্থী কথা বলেন। যারা এটা বলেন তারা মিলাদ শরীফে কেয়াম করার মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই এটা বলেন। তারা বলেন মিলাদের সময় রাসূলের নাম নিলে দুরূদ পাঠ করা হলে কেয়াম করতে হবে অর্থাৎ, দাঁড়াতে হবে। কারণ রাসূলের নামে দুরূদ পাঠ করা হলে তিনি জানতে পারেন, কেননা তিনি গায়েব জানেন। এভাবে গায়েব জানা যেটা আল্লাহর বিশেষ গুণ, এই গুণ তারা নবীর জন্য মেনে নিয়ে নবীকে আল্লাহর স্তরে নিয়ে যায়। গায়েব বা অদৃশ্য বিষয় জানা একমাত্র আল্লাহর গুণ- এ সম্বন্ধে কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে,

قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ. (নাম্‌ল: ৬৫)

অর্থাৎ, তুমি বলে দাও একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আসমান-যমীনের আর কেউ গায়েব জানে না।

তবে মাঝে মধ্যে নবীদেরকে দুই একটা গায়েবের বিষয় জানিয়ে দেয়া হয় মু'জিযা স্বরূপ, এটাও আমরা বিশ্বাস করি। সেই দুই চারটা ব্যতিক্রম ছাড়া নবীরা আর কোন গায়েব জানেন না।

নবীদের মু'জিযায় বিশ্বাস করাও ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। নবী-রাসূলগণ যে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত এটা প্রমাণ করার জন্য আল্লাহ পাক নবী-রাসূলদের দ্বারা অনেক অলৌকিক বিষয়ের প্রমাণ ঘটান। এ গুলোকে বলা হয় মু'জিযা। মু'জিযা শব্দটি আরবী। নবীদের দ্বারা প্রকাশিত অলৌকিক বিষয়কে মু'জিযা বলা হয়। মু'জিযা হল প্রচলিত সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম বিষয়, যা নবীদের দ্বারা আল্লাহ তা'আলা প্রকাশ করান। নবী-রাসূলদের সত্যতা প্রমাণিত করার জন্যই আল্লাহ তা'আলা এরকম অলৌকিক বিষয়ের প্রকাশ ঘটান। মু'জিযায় বিশ্বাস করাও ঈমানের অঙ্গীভূত।

যুগে যুগে নবীদের দ্বারা বহু মু'জিযা প্রকাশিত হয়েছে। যেমন বাদশাহ নমরূদ হযরত ইব্রাহীম (আ.) কে নির্মমভাবে হত্যা করার জন্য সুদীর্ঘ ছয় মাস ধরে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করে সেই আগুনে তাঁকে নিক্ষেপ করেছিল। হযরত ইব্রাহীম (আ.) দীর্ঘ চল্লিশ দিন সেই আগুনে ছিলেন, কিন্তু আগুনে তিনি মারা যাননি বরং আগুন তাঁর জন্য ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। এটা ছিল হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর মু'জিযা। হযরত মূসা (আ.) ফিরাউনের নির্যাতন থেকে বনী ইসরাঈলকে বাঁচানোর জন্য রাতের বেলায় সমস্ত বনী ইসরাঈলের লোকজনকে নিয়ে মিসর থেকে রওনা দিয়েছিলেন। পথিমধ্যে লোহিত সাগর সামনে এসে গিয়েছিল। তারা সাগরের কাছে এসে পৌঁছেছেন এরই মধ্যে টের পেয়ে ফিরাউন তার লোক-লশকরসহ সেখানে এসে পৌঁছেছে। হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ্‌র নির্দেশে লাঠি দিয়ে সমুদ্রে আঘাত করলেন, সমুদ্রের পানি ফাক হয়ে মাঝখানে রাস্তা বের হয়ে গেল, হযরত মূসা (আ.) বনী ইসরাঈলের লোকজনসহ সেই রাস্তা দিয়ে পার হয়ে গেলেন। ফিরাউন তার লোকজনসহ সেই রাস্তা দিয়ে পার হতে চাইল, তারা মাঝখানে যাওয়ার পর সাগরের পানি নিয়ে মিলে গেল। ফিরাউন তার লোক-লশকরসহ ডুবে মারা গেল, এটা ছিল হযরত মূসা (আ.)-এর মু'জিযা। হযরত মূসা (আ.)-এর হাতের লাঠি ছেড়ে দিলে সাপ হয়ে যেত। এটাও ছিল তার মু'জিযা। হযরত ঈসা (আ.)-এর দু'আয় মৃত জীবিত হয়ে যেত, তিনি কুষ্ঠরোগীর গায়ে

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

হাত বুলালে সেই রোগী ভাল হয়ে যেত, জন্মান্ধের চোখে হাত বুলিয়ে দিলে তার চোখ ভাল হয়ে যেত। এগুলো ছিল হযরত ঈসা (আ.)-এর মু'জিযা।

আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর হাতের ইশারায় চাঁদ দিখণ্ডিত হয়ে গিয়েছিল। এক সফরে নবী কারীম (সা.)-এর সঙ্গীদের কাছে পানি ছিল না, নবী কারীম (সা.) সামান্য একটু পানি একটা পাত্রে রেখে সেই পাত্রে হাত রাখলেন, তাঁর হাত মুবারকের আঙ্গুলের ফাঁক থেকে ঝর্ণার মত পানি ফুটে বের হতে থাকল। সফরসঙ্গী সকলে সেই পানি দিয়ে তাদের প্রয়োজন সেরে নিলেন। সেই সফরে প্রায় ১৪ শত লোক ছিলেন। এরকম বহু মু'জিযা নবী কারীম (সা.) থেকে প্রকাশিত হয়েছে। মে'রাজের ঘটনা ছিল রাসূল (সা.)-এর এক বিরাট মু'জিযা। রাসূল (সা.) জীবনে কারও থেকে একটা অক্ষর পর্যন্ত শিক্ষা করেননি, তা সত্ত্বেও তার যবান থেকে কুরআনের মত এক মহা জ্ঞানভাণ্ডার প্রকাশিত হয়েছে। এটা হল রাসূল (সা.)-এর সবচেয়ে বড় মু'জিযা। এই এক কুরআন তাঁর সত্য নবী হওয়ার দলীলের জন্য যথেষ্ট। এছাড়াও তাঁর নবুওয়াত সত্য, এর পক্ষে হাজার হাজার দলীল প্রমাণ রয়েছে। উলামায়ে কেরাম এসব প্রমাণগুলোকে একত্রিত করে দেখিয়েছেন যার সংখ্যা প্রায় তিন হাজারের মত দাঁড়ায়। এই সবগুলো দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল।

যাহোক নবী রাসূলদের প্রতি ঈমান-বিশ্বাস রাখার মধ্যে তাদের মু'জিযাকে বিশ্বাস করাও অন্তর্ভুক্ত। যারা কুরআন হাদীছের সুস্পষ্ট বর্ণনায় প্রমাণিত মু'জিযাকে অস্বীকার করে তাদের ঈমান থাকে না। অনেকে মু'জিযার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা খুঁজে পায় না বলে মু'জিযাকে অস্বীকার করে, কিন্তু মনে রাখা দরকার মু'জিযা আল্লাহ ঘটান। তিনি প্রচলিত বিজ্ঞানের উর্ধ্বে, তিনি বৈজ্ঞানিকের বৈজ্ঞানিক, তার পক্ষে সবকিছু সম্ভব। তাছাড়া বর্তমান বিজ্ঞান দ্বারাও অনেক মু'জিযার পক্ষে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। এখন বিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, রাসূল (সা.)-এর মে'রাজ সম্ভব ছিল। ফলে এক সময় যারা বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে মে'রাজকে অসম্ভব মনে করত, এখন তাদের মুখ চুপসে গেছে। আমাদের কথা হল বিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণিত হোক বা না হোক, কুরআন-হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত সব মু'জিযাকে আমরা বিশ্বাস করি। আমাদের নিকট বিজ্ঞান মাপকাঠি নয়, কুরআন হাদীছ মাপকাঠি। বিজ্ঞান বললে বিশ্বাস করব নতুবা বিশ্বাস করব না-এটার নাম ঈমান নয়। বরং কুরআন-হাদীছে যাকে বিশ্বাস করতে বলা হয়েছে, বিনা দ্বিধায় বিনা সন্দেহে তাতে বিশ্বাস করাই হল ঈমান। আল্লাহ পাক আমাদের সকলের ঈমানকে দুরস্ত করে দেন। আমীন!

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



## বয়ান নং ৮-এর খুতবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَكْمَلَ الْمِنَّةَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ بِاِرْسَالِ النَّبِيِّيْنَ، وَاَتَمَّهَا عَلَيْهِمْ بِاِرْسَالِ خَاتَمِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ، اَحْمَدَهٗ حَمْدَ الْحَامِدِيْنَ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهُ الْوَاحِدُ الْاَحَدُ الْمَتِيْنُ ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهُ الَّذِىْ خَتَمَ بِهِ النَّبِيِّيْنَ، وَ اَيَّدَهٗ بِالْمُعْجِزَاتِ وَالْبَرَاهِيْنِ، وَلَوْلَاهُ لَمَا خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِيْنَ ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ صَلَاةً وَّسَلَامًا دَائِمَيْنِ اِلٰى اَبَدِ الْاٰبِدِيْنَ .

اَمَّا بَعْدُ :

اَيُّهَا النَّاسُ ! اِنَّ الْاِيْمَانَ بِالرَّسُوْلِ يَتَضَمَّنُ الْاِيْمَانَ بِاَنَّ الرَّسُوْلَ بَلَّغَ مَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ . قَالَ تَعَالٰى : يٰاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ. اَلْاٰيَةُ. وَاَنَّ الرَّسُوْلَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِىْ خُطْبَتِهٖ يَوْمَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ : اَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟ اَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟ اَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟ ثَلَاثًا ، قَالُوْا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ . فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ، اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ، اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ. رَوَاهُ الْبُخَارِىْ. فَمَنْ قَالَ اِنَّ لِلْقُرْاٰنِ ثَلَاثِيْنَ جُزْءً ظَاهِرًا وَثَلَاثِيْنَ بَاطِنًا، وَالثَّانِيَةُ اَخَذَهَا الصُّوْفِيَّةُ الْبَاطِنِيَّةُ صَدْرًا عَنْ صَدْرٍ، ذَالِكَ خِلَافُ هٰذَا الْاِيْمَانِ. وَكَيْفَ كَتَمَهَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَبْعَثُ الْاَنْبِيَاءَ لِلْهِدَايَةِ، فَيَهْدِيْهِمْ بِهٖ مِنَ الضَّلَالَةِ، وَيُنْقِذُهُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْجَهَالَةِ، وَكَيْفَ اَخَذَهَا الصُّوْفِيَّةُ الْبَاطِنِيَّةُ اَحَدٌ عَنْ اَحَدٍ ، وَمَا اِسْنَادُ ذَالِكَ؟ قَالَ اِبْنُ الْمُبَارَكِ رَحِمَهُ اللّٰهُ : اَلْاِسْنَادُ مِنَ

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

الدِّيْنِ وَلَوْلَا الْاِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِيْ مُقَدَّمَةِ صَحِيْحِهٖ.

اَيُّهَا النَّاسُ! وَ اِنَّ الْاِيْمَانَ بِالْاَنْبِيَاءِ يَتَضَمَّنُ الْاِيْمَانَ بِاَنَّهُمْ اَحْيَآءٌ فِيْ قُبُوْرِهِمْ يُصَلُّوْنَ. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلْاَنْبِيَاءُ اَحْيَاءٌ فِيْ قُبُوْرِهِمْ يُصَلُّوْنَ. وَهٰذَا حَدِيْثٌ صَحَّحَهُ الْمُحَدِّثُوْنَ مِثْلَ الْبَيْهَقِيِّ وَالشَّوْكَانِيِّ وَالْعَلِيُّ الْقَارِيِّ وَالْمُنْذِرِيِّ وَغَيْرِهِمْ. وَفِيْ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اَتَيْتُ وَفِيْ رِوَايَةٍ مَرَرْتُ عَلٰى مُوْسٰى لَيْلَةَ اُسْرِيَ بِيْ عِنْدَ الْكَثِيْبِ الْاَحْمَرِ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّيْ فِيْ قَبْرِهٖ. قَالَ السَّمْهُوْدِيُّ : وَهُمْ يَعِيْشُوْنَ فِي الْقُبُوْرِ مِثْلَ الْاَحْيَاءِ فِي الدُّنْيَا ـ وَلٰكِنْ هُنَاكَ فَرْقٌ بَيْنَ الْحَيَاةِ الْبَرْزَخِيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ـ وَكَذَالِكَ الشُّهَدَآءُ، وَهُمْ اَيْضًا فِيْ قُبُوْرِهِمْ اَحْيَاءٌ. قَالَ تَعَالٰى : وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ، بَلْ اَحْيَاءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ.

اَيُّهَا النَّاسُ! وَ اِنَّ الْاِيْمَانَ بِالْاَنْبِيَآءِ يَتَضَمَّنُ الْاِيْمَانَ بِاَنَّهُمْ مَعْصُوْمُوْنَ. وَفِيْ شَرْحِ الْفِقْهِ الْاَكْبَرِ : اَلْاَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كُلُّهُمْ مُنَزَّهُوْنَ عَنِ الصَّغَآئِرِ وَالْكَبَآئِرِ وَالْقَبَآئِحِ يَعْنِيْ قَبْلَ النُّبُوَّةِ وَبَعْدَهَا . قَالَ الْعَلِيُّ الْقَارِيُّ فِي الْمِرْقَاةِ : فَلَمْ يُمْكِنْ صُدُوْرُهُ اَيْ صُدُوْرُ الذَّنْبِ مِنْهُ وَلَوْ صَغِيْرَةً قَبْلَ النُّبُوَّةِ عَلَى الصَّوَابِ. فَمَنْ ذَكَرَ اَحَدًا مِّنَ الْاَنْبِيَاءِ بِالسُّوْءِ فَهُوَ ضَالٌّ مُضِلٌّ.

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ : فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهٖ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ.

بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِي الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ، وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. اَقُوْلُ قَوْلِيْ هٰذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَاسْتَغْفِرُوْهُ، اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



বয়ান নং-৯

## নবী-রসূলদের প্রতি ঈমান প্রসঙ্গ (২য় পর্ব)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: يٰٓاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَ اِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ. وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : اَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟ اَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

নবী-রাসূলদের প্রতি কীভাবে ঈমান রাখতে হয়, সে প্রসঙ্গে আমরা আলোচনা করছিলাম। আল্লাহর পক্ষ থেকে যত নবী-রাসূল দুনিয়াতে এসেছেন তাঁদের সকলের প্রতি আমরা বিশ্বাস রাখি, তাঁরা সকলেই আল্লাহর বাণীপ্রাপ্ত ছিলেন, মানুষের হেদায়েতের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন- একথা বিশ্বাস করি। এক হাদীছে বলা হয়েছে এরকম এক লক্ষ বা দুই লক্ষ ২৪ হাজার নবী-রাসূল দুনিয়ায় এসেছেন। এই এক লক্ষ বা দুই লক্ষ কথাটা শুনে অনেকে মনে করেন যে, বিষয়টার মধ্যে হয়তো কোন মতভেদ আছে। কারও মতে পয়গম্বরদের সংখ্যা এক লক্ষ ২৪ হাজার, আর কারও মতে দুই লক্ষ ২৪ হাজার। আসলে ব্যাপারটা এরকম নয়। নবী কারীম (সা.) যেকোন একটাই নিশ্চিত করে বলেছিলেন। হয় তিনি বলেছিলেন এক লক্ষ চব্বিশ হাজার, কিংবা বলেছিলেন দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার। কিন্তু এ হাদীছের বর্ণনা কারীদের মধ্যে পরবর্তীতে এক জনের সন্দেহ হয়– তিনি কি তার উস্তাদের কাছ থেকে এক লক্ষ শুনেছিলেন না দুই লক্ষ শুনেছিলেন। ব্যাস এর পর থেকে পরবর্তী বর্ণনাকারীগণ এভাবেই বর্ণনা করতে থাকেন যে, এক লক্ষ বা দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর। এটা কোন মতভেদের বিষয় নয়, এটা একজন বর্ণনাকারীর সন্দেহ। নতুবা রাসূল (সা.) সঠিক ভাবেই যেকোন একটা সংখ্যাই বলেছিলেন। হয় বলেছিলেন ১ লক্ষ ২৪ হাজার, কিংবা বলেছিলেন ২ লক্ষ ২৪ হাজার।

যাহোক ১ লক্ষ বা ২ লক্ষ ২৪ হাজার পয়গম্বর আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছেন। আমরা তাঁদের সকলকে সত্য বলে বিশ্বাস করি। গত জুমুআয় বলা হয়েছিল সব নবীকে আমরা বিশ্বাস করি, তবে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর আগমনের পর অন্য নবীদের আনীত শরীআত রহিত হয়ে গেছে। এখন তা আর চলবে না। কারণ তারা সাবেক হয়ে গেছেন। আর নিয়ম হল পরবর্তী বার্তাবাহক বা পরবর্তী ম্যাসেঞ্জার আগমনের পর সাবেকদের কার্যকারিতা বহাল থাকে না।

খ্রিস্টান মিশনারীর লোকেরা খ্রিস্টধর্ম প্রচার করতে গিয়ে মানুষকে বোঝায় যে, খ্রিস্টধর্ম ইসলাম ধর্মের চেয়ে আগের ধর্ম, পূর্বে থেকেই এটা চলে আসছে, অতএব এটাই বেশি গ্রহণযোগ্য। কিন্তু তাদের এই যুক্তি ঠিক নয়। তাদের যুক্তি ঠিক হলে হিন্দুদের ধর্ম চলা উচিত। কারণ হিন্দুধর্ম খ্রিস্টধর্মের চেয়েও পুরাতন ধর্ম। হিন্দুরা দাবীও করে থাকে যে, আমাদের ধর্ম হল সনাতন ধর্ম, সবচেয়ে পুরাতন ধর্ম। অতএব পুরাতন হওয়াই যদি গ্রহণযোগ্য হওয়ার দলীল হয়, তাহলে খ্রিস্টধর্ম নয় বরং হিন্দুধর্মই মানতে হবে। আসলে নিয়ম হল লেটেস্ট সংস্করণ আসার পর পূর্বের সংস্করণগুলো মূল্যহীন হয়ে পড়ে। ইসলাম হল ধর্মের লেটেস্ট সংস্করণ এবং পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ। তাই ইসলাম ধর্ম আসার পর অন্যান্য ধর্ম সব অচল সাব্যস্ত হবে। এমনিভাবে আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) হলেন লেটেস্ট

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

পয়গম্বর, সর্বশেষ বার্তাবাহক। তাই এখন একমাত্র মুহাম্মাদ (সা.)-এর কথা এবং আদর্শই চলবে সাবেক পয়গম্বরদের কথা আর কার্যকরী থাকবে না। তবে তাঁরা যে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত এবং বাণীপ্রাপ্ত ছিলেন এবং নিজ নিজ যুগে অথরিটি ছিলেন, এটা আমরা বিশ্বাস করি। তাঁদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে যত কিতাব, যত সহীফা এসেছিল সেগুলোকেও আমরা বিশ্বাস করি। তবে আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) কর্তৃক আনীত কুরআন আসার পর অন্য সব কিতাবের কার্যকারিতা রহিত হয়ে গেছে।

নবী-রাসূলদের প্রতি ঈমান রাখার মধ্যে এ কথায়ও বিশ্বাস রাখতে হবে যে, নবী-রাসূলগণ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যে কিতাব এবং যা বাণীপ্রাপ্ত হয়েছেন, উম্মতের কাছে তা যথাযথ ভাবে পৌছে দিয়েছেন। তাঁরা তাদের দায়িত্ব পালনে কোন ত্রুটি করেননি। কুরআন-হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে, নবী-রাসূলগণ তাঁদের নবুওয়াতের দায়িত্ব যথাযথ পালন করেছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁদের দ্বারা বিন্দুমাত্র কোন ত্রুটি সংঘটিত হয়নি। কুরআনে কারীমে রাসূল (সা.) প্রসঙ্গে এসেছে,

يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَ اِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ.

অর্থাৎ, হে রাসূল! তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার নিকট যা নাযিল করা হয়েছে, তুমি তা পৌছে দাও, অন্যথায় তুমি তাঁর রেসালাত পৌছে দিলে না। (মায়িদাঃ ৬৭)

বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূল (সা.) লক্ষাধিক সাহাবীকে সম্বোধন করে তিন বার প্রশ্ন করেছিলেন,

اَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟ اَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟ اَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟

'অর্থাৎ, আমি কি তোমাদের কাছে (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রাপ্ত দ্বীন) পৌছে দিয়েছি? আমি কি তোমাদের কাছে পৌছে দিয়েছি? আমি কি তোমাদের কাছে পৌছে দিয়েছি'? সমবেত সাহাবাগণ উত্তরে বলেছিলেন, জি হ্যাঁ, অবশ্যই পৌছে দিয়েছেন। অতঃপর রাসূল (সা.) এ কথার উপর আল্লাহ্‌কে সাক্ষ্য রেখেছিলেন এই বলে যে,

اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ، اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ، اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ. (رواه البخاري في صحيحه برقم ٤٤٠٢)

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক।

এক শ্রেণির ভণ্ড পীর-ফকীর আছে, যারা বলেন কুরআনের ৩০ পারা যাহেরী আর ১০ পারা বাতেনী। এই বাতেনী ১০ পারা নবী কারীম (সা.) সকলকে শিক্ষা দেননি। এটা হল গোপনীয় বিদ্যা। বাতেনী পীর-ফকীরদের সিনায় সিনায় এটা চলে আসছে। তারা এমনও বলেন যে, মে'রাজে রাসূল (সা.) ৯০ হাজার কালাম লাভ করেছিলেন। এর মধ্যে উলামায়ে কেরাম কেবল ৩০ হাজার কালাম জানেন। অবশিষ্ট ৬০ হাজার কালাম এসব সূফী-ফকীরদের নিকটই রয়েছে। এটাও বাতেনী অর্থাৎ, গোপনীয় বিদ্যা, যা তারা একজন আরেকজন থেকে সিনায় সিনায় লাভ করেছেন। এইসব বাতেনী বিদ্যার মধ্যে নাকি গান-বাদ্য বৈধ হওয়ার কথা আছে, মদ, গাঁজা, ভাং, আফিম বৈধ হওয়ার কথা আছে, নারী-পুরুষ অবাধে মেলা-মেশার কথা আছে। ইত্যাদি। এইসব পীর-ফকীররা এই সব অবৈধ জিনিসগুলো বৈধ করার জন্যেই এই বাতেনী বিদ্যার ফন্দী বের করেছে। তাদের এ আকীদা নবীদের সম্বন্ধে যে বিশ্বাস রাখতে হয় তার পরিপন্থী। এর অর্থ হল নবী সবকথা উম্মতকে পৌছে দিয়ে যাননি। উম্মতকে জানিয়ে গেলে অবশ্যই সেগুলো একে অপর থেকে জানাজানির মাধ্যমে ব্যাপকতা লাভ করত, সেগুলো আর গোপনীয় থাকত না। এটা ঈমান পরিপন্থী আকীদা। ঈমানী আকীদা হল রাসূল

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



(সা.) দ্বীনের কোন কথা গোপন রাখেননি। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তিনি যা প্রাপ্ত হয়েছেন, তা সবই উম্মতের কাছে পৌছে দিয়েছেন।

তারা যে বলে এই বিদ্যা সিনায় সিনায় চলে আসছে। তাহলে আমরা প্রশ্ন করতে পারি সিনায় সিনায় চলে আসা এসব বিদ্যা তারা কীভাবে লাভ করলেন? কে কাকে কখন কীভাবে শিক্ষা দিল? তার সনদ কী? সনদ ছাড়া দ্বীনের কোন কথা গ্রহণযোগ্য নয়। সনদ ছাড়া দ্বীনের কোন কথা মেনে নেয়ার নীতি নেই। তাহলে যে যা ইচ্ছা তা দ্বীনের নামে চালিয়ে দিতে পারবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌নে মুবারক (রহ.) তাই বলেছেন,

اَلْاِسْنَادُ مِنَ الدِّيْنِ لَوْ لَا الْاِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَآءَ مَا شَآءَ. (مقدمة مسلم)

'অর্থাৎ, সনদ দ্বীনের অংশ। সনদ না থাকলে যার যেমন ইচ্ছা তেমন বলে যেত'।

এ জাতীয় পীর-ফকীরদের অনেকে অবাধ যৌনমিলনকে সিদ্ধি লাভের সহায়ক মনে করে। তারা মল, মূত্র, বীর্য, মহিলাদের মাসিকের রক্ত পর্যন্ত খায়। এতে নাকি তাদের অত্মার উন্নতি হয়। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিকা। তারা খুশি হয়ে একে অপরের স্ত্রীর সাথে যৌনমিলনে লিপ্ত হয়, এতে তাদের কেউ অসন্তোষ প্রকাশ করে না। এতে নাকি তাদের মতে আত্মশুদ্ধি হয়। তারা বলে নারীরা হল বহতা নদীর মত। নদীর মধ্যে যে কোন ময়লা-আবর্জনা পড়লে যেমন নদী নাপাক হয় না, তদ্রূপ নারীর যোনীতে পর পুরুষের বীর্য পড়লে তাও নাপাক হয় না। তারা আরও বলে নারীরা হল গঙ্গার মত। আর তাদের মিলন প্রত্যাশী পুরুষগণ হল স্নানার্থী তীর্থযাত্রী স্বরূপ। আর গঙ্গা-স্নানে তথা যৌন মিলনে কারও কোন আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে না। বাতেনী বিদ্যার বরাত দিয়ে এসব হারামকে তারা বৈধ করছে। মানুষের ঈমানকে তারা বরবাদ করছে। গান-বাদ্য হারাম, যেনা হারাম, মলমূত্র খাওয়া হারাম। মদ, গাঁজা খাওয়া হারাম। আর কোন হারামকে হালাল মনে করা কুফ্‌রী। অথচ তারা বাতেনী বিদ্যার দোহাই দিয়ে এইসব কুফরীই মানুষকে শিক্ষা দিচ্ছে।

যাহোক যে কথা বলা হচ্ছিল নবীদের প্রতি ঈমান-বিশ্বাস রাখার অর্থ এটাও যে, নবীরা তাঁদের দায়িত্ব পূর্ণভাবে পালন করে গেছেন, তাঁরা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্তবাণী সম্পূর্ণভাবে মানুষের কাছে পৌছে দিয়ে গেছেন।

নবী-রাসূলদের ব্যাপারে আর যে সব ঈমান-বিশ্বাস রাখতে হয়, তার মধ্যে একটা হল– নবী-রাসূলগণ কবরে যিন্দা। শুধু আমাদের রাসূল (সা.) নন, সমস্ত নবী-রাসূল কবরে যিন্দা। রাসূল (সা.) বলেছেন,

اَلْاَنْبِيَاءُ اَحْيَاءٌ فِيْ قُبُوْرِهِمْ يُصَلُّوْنَ. (مسند أبي يعلي برقم ٣٤٢٥ وإسناده صحيح ومسند البزار برقم ٦٨٨٨)

'অর্থাৎ, নবীগণ কবরে জীবিত, তাঁরা তাঁদের কবরে নামায পড়েন'।

আল্লামা সামহুদী বলেছেন, মানুষ যেমন দৈহিক জীবন যাপন করে, নবীগণ কবরেও হুবহু ওরকম জীবন-যাপন করেন, তবে কবরে তাদের খাদ্য-খাবারের প্রয়োজন হয় না। তাছাড়া উলামায়ে কেরাম বলেছেন, কবরের জীবন হচ্ছে বরযখী জীবন। সেটা কেমন জীবন তার বিশদ বিবরণ আমাদের জানা নেই। অতএব দুনিয়ার জীবন দিয়ে সেটা পুরোপুরি বুঝা সম্ভব নয়।

এখানে একটা প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, কবরে সমস্ত মানুষই জীবিত, নেককার হলে শান্তি ভোগ করেন, পাপী হলে শাস্তি ভোগ করে। অতএব নবীগণ কবরে জীবিত এ কথাটার কী অর্থ? এর উত্তর

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

হল সকলেই কবরে যিন্দা, কিন্তু যিন্দা থাকার ভিতরে পার্থক্য আছে! সকলের জীবনের অনুভূতি একরকম নয়। বিষয়টা একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝা যায়। যেমন আমার পুরোদেহ যিন্দা, আমার দেহের সব জায়গায় প্রাণ আছে, কোথাও মরা নয়। কিন্তু আমার দেহে প্রাণের অনুভূতি সব স্থানে একরকম নয়। যদি নখের ভিতরে একটা সূচ সামান্য ঢুকিয়ে দেয়া হয়, তাহলে যতটুকু টের পাওয়া যাবে, পায়ের গোড়ালির ভিতরে ঢুকালে সেই পরিমাণ টের পাওয়া যাবে না। এর অর্থ এই নয় যে, পায়ের গোড়ালি মরে গেছে, পায়ের গোড়ালিতেও জীবন আছে কিন্তু সেখানে প্রাণের অনুভূতি নখের মত নয়, বরং কম। দেখা গেল আমার দেহের ভিতরেও জীবনের অনুভূতির পার্থক্য আছে। এমনিভাবে সমস্ত মানুষ কবরে যিন্দা, কিন্তু সাধারণ মানুষের যিন্দা থাকা আর নবীদের যিন্দা থাকা এক পর্যায়ের নয়। নবীগণ হুবহু দুনিয়ার মত যিন্দা, তাঁদের জীবনের অনুভূতি পূর্ণাঙ্গ। আর কবরে যাদের শাস্তি হবে তাদের জীবনের উপলব্ধি থাকবে সব চেয়ে কম। জাহান্নামেও জাহান্নামীরা জীবিত থাকবে, কিন্তু তাদের জীবনের অনুভূতি থাকবে কেমন? আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى

'অর্থাৎ, তারা না মরবে না বাঁচার মত লাগবে'। (আ'লা : ১৩)

নবীগণ কবরে দুনিয়াতে যেমন যিন্দা ছিলেন হুবহু ওরকমই যিন্দা, আমাদের রাসূল (সা.)ও ওরকমই যিন্দা। এজন্যই রাসূল (সা.)-এর কবরের কাছে গিয়ে কেউ সালাম পেশ করলে দুনিয়ায় থাকতে তিনি যেভাবে সালাম শুনতেন সে ভাবেই সালাম শুনতে পান এবং সালামের জওয়াব দেন। রাসূল (সা.) কবরে যিন্দা আছেন- এ সম্পর্কে একটা ঘটনা শুনুন। ঘটনাটা ৫৫৫ হিজরীর। এক বুযুর্গ ছিলেন সাইয়্যেদ আহমদ রেফায়ী (রহ.)। তিনি রাসূল (সা.)-এর বংশের মানুষ ছিলেন। এ জন্য তাকে সাইয়্যেদ বলা হয়। তিনি হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.)-এর জামানার লোক। একবার হযরত সাইয়্যেদ আহমদ রেফায়ী রাসূল (সা.)-এর রওযার কাছে গিয়ে সালাম দিয়ে বলছেন–নানা! আপনার হাত মোবারকখানা একটু বের করে দিন, আমি ঐ মোবারক হাতে একটু চুমু দিতে চাই। হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.)ও ঐ মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। রাসূল (সা.) রওযা মোবারকের ভিতর থেকে দস্ত মোবারক বের করে দিলেন, আর সাথে সাথে সাইয়্যেদ আহমদ রেফায়ী (রহ.) সেই পবিত্র হাতে চুমু দিয়ে নিজের জীবনকে ধন্য করলেন। এ ঘটনায়ও প্রমাণ হয় নবীগণ কবরে যিন্দা।

শহীদদের সম্পর্কেও বর্ণিত আছে যে, শহীদগণও কবরে বিশেষ এক ধরনের জীবন লাভ করেন। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ بَلْ اَحْيَآءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ.

অর্থাৎ, যারা আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়ে যায় তাদেরকে তোমরা মৃত বল না। বরং তারা জীবিত কিন্তু তোমরা টের পাওনা।

যদিও শহীদদেরকেও সাধারণভাবে মৃত বলা যায়। তবে তারা অন্যান্য সাধারণ মৃতদের মত নয়। বরং কবরে তাদের জীবনের অনুভূতি অনেক প্রবল থাকে। এমনকি এই অনুভূতি তাদের জড় দেহেও প্রবেশ করে। যার ফলে অনেক শহীদের লাশ পর্যন্ত যিন্দা থাকে। কবরের মাটি তাদের জড় দেহকে খেতে পারে না। একটা ঘটনা শুনুন– যারা মুরব্বী পর্যায়ের আছেন তারা হয়তো ঘটনা জানেন। ১৯৩২ সাল মোতাবেক ১৩৫০ হিজরীর ঘটনা– দুজন সাহাবীর লাশ কবর থেকে অক্ষত অবস্থায় তোলা

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



হয়েছিল। ইরাকে বাগদাদ থেকে ৪০ মাইল দূরে সালমান পাক নামক একটা শহর আছে। এর প্রাচীন নাম ছিল মাদায়েন। এখানে হযরত সালমান ফারসী (রা.)-এর কবর আছে। এ জন্যই শহরটির নাম হয়েছে সালমান পাক। এই সালমান পাক থেকে কিছু দূরে প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান এবং হযরত জাবের বা যুবায়ের (রা.)-এর কবর ছিল। কবর দুটি ছিল দাজলা বা টাইগ্রিস নদীর কাছে। ১৯৩২ সালে এই দুটো কবর খনন করে এই দুজন সাহাবী অর্থাৎ, হযরত হুযায়ফা (রা.) এবং জাবের বা যুবায়ের (রা.)-এর লাশ সালমান পাকে স্থানান্তরিত করা হয়। ঘটনাটি এরকম– তখনকার ইরাকের বাদশাহ ছিলেন প্রথম ফয়সাল। হযরত হুযায়ফা (রা.) বাদশাহকে স্বপ্নে বললেন যে, আমার কবরে পানি প্রবেশ করেছে আর জাবেরের কবরেও আর্দ্রতা দেখা দিয়েছে। আমাদের লাশকে সরিয়ে দাজলা নদী থেকে একটু দূরে স্থানান্তরিত করা হোক। পরপর দুই রাত বাদশাহ এই স্বপ্ন দেখলেন। কিন্তু তিনি কোন পদক্ষেপ নিলেন না। তৃতীয় রাতে ইরাকের বড় মুফতী স্বপ্নে দেখলেন যে, হযরত হুযায়ফা (রা.) তাকে বলছেন বাদশাহকে পরপর দুই রাত বলে আসছি, কিন্তু তিনি এর কোন ব্যবস্থা নিচ্ছেন না। এখন তোমার কাজ তাকে এ বিষয়ে মনোযোগী করে দ্রুত ব্যবস্থা নাও।

তখন ইরাকের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন নূরী আস-সাঈদ। মুফতী সাহেব তাকে সাথে নিয়ে বাদশাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তার কাছে স্বপ্নের কথা বর্ণনা করলেন। বাদশাহ বললেন, 'আমিও পরপর দুই রাত ধরে এই একই স্বপ্ন দেখে আসছি। এখন আপনি মাযার খোলার ফতোয়া দিলে আমি করতে প্রস্তুত আছি'। তিনি ফতোয়া দিয়ে দিলেন।

সরকারীভাবে ঘোষণা হয়ে গেল কুরবানীর ঈদের দিন মাযার খোলা হবে। ইরাকী পত্র পত্রিকায় ঘোষণাটি প্রকাশিত হল। রয়টারসহ অন্যান্য সংবাদ সংস্থা সারা বিশ্বে খবর পৌঁছে দিল। এদিকে হজ্জের মৌসুম ছিল। সারা দুনিয়ায় সংবাদ পৌঁছে গেল। হাজীগণও খবরটি জানতে পারলেন। তখন অনেক মুসলিম দেশের হাজীগণ ইরাকী বাদশাহর কাছে তারবার্তা পাঠালেন যে, হজ্জের পরে মাযার খোলা হলে আমরাও ঘটনা দেখতে পেতাম। তাদের আগ্রহের ভিত্তিতে পুনরায় তারিখ নির্ধারিত হল হজ্জের দশ দিন পর ১৯শে জিলহজ্ব। ১৯শে জিলহজ্ব সোমবার দুপুর ১২টায় লক্ষ লক্ষ মানুষের উপস্থিতিতে মাযার দুটো খুলে লাশ উঠানো হল। উভয়ের লাশ সম্পূর্ণ অক্ষত ছিল। কাফন, দাড়ি, চুল পর্যন্ত অক্ষত ছিল। সকলের পক্ষে কবরের লাশ দেখা সম্ভব ছিল না। এজন্য জার্মানের একটা ফিল্মসংস্থা কবরের সামনে বড় একটা টেলিভিশন স্ক্রিনের ব্যবস্থা করেছিল। যার মাধ্যমে উপস্থিত সকল মানুষ কবর খোলা থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত সকল দৃশ্য সহজে দেখতে পেরেছিল। শহীদদের লাশ সংরক্ষিত থাকার এরকম বহু ঘটনা আছে। যাহোক আমরা আলোচনা করছিলাম যে, নবীগণ কবরে যিন্দা এই বিশ্বাসও রাখতে হবে।

নবীদের সম্পর্কে আরও যা বিশ্বাস রাখতে হয়, তার মধ্যে একটা বিশ্বাস হল নবীগণ মা'সূম বা নিষ্পাপ। শুধু আমাদের নবী (সা.) নন, বরং সমস্ত নবী নিষ্পাপ ছিলেন, নিষ্কলুষ ছিলেন- জীবনে তাঁদের দ্বারা কোন পাপ সংঘটিত হয়নি। তাঁরা নবী হওয়ার আগেও কোন পাপ করেননি, নবী হওয়ার পরেও কোন পাপ করেননি। নবীদের দ্বারা কোন পাপ হতে পারে না। তার অনেক কারণ ও যুক্তি রয়েছে। হযরত মাওলানা ক্বারী মুহাম্মদ তাইয়্যেব সাহেব (রহ.) একটা কারণ এই বলেছেন যে, হাদীছে এসেছে নবীগণকে জান্নাতের মাটি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। জান্নাত কোন গোনাহের পরিবেশ নয়, জান্নাতে কোন গোনাহ করার মনোবৃত্তি জাগ্রত হবে না। জান্নাতের মাটির মধ্যে গোনাহের কোন

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

আছর নেই। তাই জান্নাতের মাটি দ্বারা তৈরি নবীদের মধ্যেও গোনাহের মনোবৃত্তি থাকে না। এর বিপরীত দুনিয়ার মাটি দিয়ে যাদেরকে তৈরি করা হয়, তাদের ভিতরে গোনাহের মনোবৃত্তি থাকে। কারণ দুনিয়া পাপের স্থান, দুনিয়ার মাটির মধ্যে পাপের আছর রয়েছে। কেউ হয়তো ভাবতে পারে মানুষ মাটি দিয়ে তৈরি হল কি করে? মায়ের গর্ভে পিতা-মাতার শুক্র এবং ডিম্বানু মিলিত হয়ে তার দ্বারা মানুষ তৈরি হয়েছে, এর মধ্যে মাটি এলো কোত্থেকে? তাহলে শুনুন! হাদীছে এসেছে যখন মায়ের জরায়ুতে শুক্র আসে, তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন গর্ভের দায়িত্বে নিয়োজিত ফিরিশ্তাকে হুকুম দেন যে, অমুক জায়গার একটু মাটি এনে মিশিয়ে দাও। যেখান থেকে মাটি এনে মিশ্রিত করা হয়, সেই স্থানেই তার কবর হয়। অর্থাৎ, জায়গার মাটি জায়গায় ফিরে যায়। এই বর্ণনার ভিত্তিতে আমরা বিশ্বাস করি, মাটি দিয়েই মানুষকে তৈরি করা হয়েছে। যাহোক নবীদেরকে যেহেতু জান্নাতের মাটি দিয়ে তৈরি করা হয়, তাই নবীদের দ্বারা কোন পাপ সংঘটিত হয় না।

আমাদের নবী (সা.)-এর জীবন যে নিষ্পাপ ও নিষ্কলুষ ছিল, এ বিষয়ে চ্যালেঞ্জ পেশ করা হয়েছে। নবী (সা.) নবুওয়াত লাভ করার পূর্বে কেউ তাঁর জীবনে কোন দোষ-ত্রুটি দেখতে পায়নি। কেউ তাঁর কোন সমালোচনা করতে সক্ষম হয়নি। তারপর যখন তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে নবুওয়াত পাওয়ার দাবী করেছেন তখন অনেকে নানান রকম ভিত্তিহীন সমালোচনা শুরু করেছে। তখন কুরআনের আয়াত নাযিল হয়ে গেছে যে, তুমি তোমার জীবন দিয়ে চ্যালেঞ্জ পেশ কর। তুমি ওদেরকে বলে দাও!

فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهِ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ. (يونس : ١٦)

অর্থাৎ, নবুওয়াত পাওয়ার পুর্বে আমার সারাটা জীবন তোমাদের সামনে অতিবাহিত হয়েছে, তবুও কি তোমরা বুঝ না। অর্থাৎ, পারলে দেখাও যে, আমার জীবনে কোন অন্যায় করেছি, কিংবা কোন অপরাধ করেছি। কিন্তু তোমরা কেউ তা দেখাতে পারবে না। এভাবে রাসূল (সা.)-এর জীবনকে দিয়ে চ্যালেঞ্জ পেশ করা হয়েছে। দুনিয়ার কোন মানুষ এরকম চ্যালেঞ্জ পেশ করতে পারবে কি? আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পরিকল্পিতভাবে নবীদের জীবনকে নিষ্পাপ করে গড়ে তুলেছেন। তাঁদেরকে যেহেতু আদর্শ এবং মডেল বানিয়ে পাঠিয়েছেন, তাই আদর্শ এবং মডেলের ভিতরে যেন কোন ত্রুটি না থাকে, এ জন্যই আল্লাহ পাক সু-পরিকল্পিতভাবে স্বযত্নে নবীদেরকে সম্পূর্ণ নিষ্পাপ, সম্পূর্ণ নিষ্কলুষ, সম্পূর্ণ নির্ভেজাল এবং সম্পূর্ণ খাঁটি করে গড়ে তুলেছেন। নবীগণ সম্পূর্ণ নিষ্পাপ। তাই তারা সমালোচনার উর্ধ্বে। যদি কেউ কোন নবীর সমালোচনা করে তাহলে সে গোমরাহ এবং পথভ্রষ্ট। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের ঈমান-বিশ্বাসকে খাঁটি ও মজবুত করে দিন। আমাদেরকে সহীহ্ ঈমানের অধিকারী হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন!

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



## বয়ান নং ৯-এর খুতবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَكْرَمَ عَلَى الْعَالَمِيْنَ بِبَعْثَةِ الْاَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ، اَحْمَدُهٗ حَمْدَ الْحَامِدِيْنَ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهُ الْوَاحِدُ الْاَحَدُ الْمَتِيْنُ ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهُ الَّذِىْ خَتَمَ بِهِ النَّبِيِّيْنَ، وَاَيَّدَهٗ بِالْمُعْجِزَاتِ وَالْبَرَاهِيْنِ، وَلَوْلَاهُ لَمَا خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِيْنَ ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ صَلَاةً وَّسَلَامًا دَائِمَيْنِ اِلٰى اَبَدِ الْاٰبِدِيْنَ.

اَمَّا بَعْدُ :

اَيُّهَا النَّاسُ ! اِنَّ عَلَيْنَا اَنْ نُّؤْمِنَ بِالرُّسُلِ وَلَا نُفَرِّقُ بَيْنَهُمْ بِاِيْمَانٍ بِرَسُوْلٍ دُوْنَ رَسُوْلٍ. قَالَ تَعَالٰى : كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ الْاٰيَةُ. نَعَمْ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى خَتَمَ دِيْوَانَ الرِّسَالَةِ بِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَّذِىْ اَنْزَلَ عَلَيْهِ قُرْاٰنَهٗ، وَفَوَّضَ اِلَيْهِ بَيَانَهٗ، وَاَنَّ رِسَالَةَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ، وَقَدْ اَخْبَرَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِىْ مُحْكَمِ كِتَابِهٖ عَنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اَنَّهُمْ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَائَهُمْ، وَاَنَّهُمْ اَلْبَسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَكَتَمُوْا مَا يَجِدُوْنَهٗ مِنْ صِفَاتِهِ الْكَرِيْمَةِ، وَاتَّبَعُوْا اَهْوَائَهُمْ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ، وَخَوْفًا عَلٰى ذَهَابِ رِئَاسَتِهِمْ، غَيْرَ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَيَّدَ نُبُوَّتَهٗ بِالْمُعْجِزَاتِ الْبَاهِرَةِ وَالْاٰيَاتِ الظَّاهِرَةِ . وَعَدَّ عُلَمَاءُ الْاِسْلَامِ الْاٰيَاتِ الَّتِىْ تَدُلُّ عَلٰى رِسَالَتِهٖ قَرِيْبَ ثَلَاثَةِ اٰلَافٍ، وَمِنْ اَعْظَمِهَا الْقُرْاٰنُ، وَتَحَدّٰى بِهِ اللّٰهُ تَعَالٰى بِقَوْلِهٖ : اِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا شُهَدَآئَكُمْ مِنْ

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ. وَكَانَ هٰذَا الْكِتَابُ لَهُ خُلُقًا عَظِيْمًا، هَدَى اللّٰهُ بِهٖ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا.

وَاِنَّ رِسَالَةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلٰى كَافَّةِ النَّاسِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ. قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ. وَقَالَ تَعَالٰى : قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا. وَقَالَ تَعَالٰى : تَبٰرَكَ الَّذِيْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ اِلٰى قَوْمِهٖ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ اِلَى النَّاسِ عَامَّةً. (رَوَاهُ الشَّيْخَانِ) وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَا يَسْمَعُ بِيْ اَحَدٌ مِّنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ يَهُوْدِيٌّ وَّلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوْتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِيْ اُرْسِلْتُ بِهٖ اِلَّا كَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّارِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ.

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ : وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَا اٰتَيْتُكُمْ مِنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَائَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ. قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِيْ؟ قَالُوْٓا اَقْرَرْنَا. قَالَ : فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ.

بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ، وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. اَقُوْلُ قَوْلِيْ هٰذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَاسْتَغْفِرُوْهُ، اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



বয়ান নং-১০

কিতাবের প্রতি ঈমান প্রসঙ্গ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ. وَقَالَ تَعَالٰى : وَاِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا شُهَدَآئَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

আমরা ঈমান সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। মৌলিক যে ছয়টি বিষয়ে ঈমান রাখতে হয় তার মধ্যে আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং নবী-রাসূলদের প্রতি ঈমান প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ঈমানের আর একটি মৌলিক বিষয় হল আসমানী কিতাবের প্রতি ঈমান। আল্লাহর পক্ষ থেকে নবীদের কাছে ছোট বড় যত কিতাব এসেছে, সবগুলোকে আমরা সঠিক বলে বিশ্বাস করি। নবীদের নিকট যেসব ছোট কিতাব এসেছে, তাকে বলা হয় সহীফা, আর বড়গুলোকে বলা হয় কিতাব। এক বর্ণনা মতে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিভিন্ন নবীর নিকট সর্বমোট ১০০ খানা সহীফা নাযিল করা হয় এবং বড় কিতাব নাযিল হয় সর্বমোট ৪ খানা। এই চার খানার মধ্যে তাওরাত নাযিল হয় হযরত মূসা (আ.)-এর উপর। যাবূর নাযিল হয় হযরত দাউদ (আ.)-এর উপর। ইঞ্জীল নাযিল হয় হযরত ঈসা (আ.)-এর উপর এবং কুরআন নাযিল হয় আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা (সা.)-এর উপর।

কুরআন নাযিল হওয়ায় অন্যান্য আসমানী কিতাবের বিধান রহিত হয়ে যায়। কেননা কুরআন হল সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত ম্যাসেজ। আর নিয়ম হল পরের এবং চূড়ান্ত ম্যাসেজ আসার পর পূর্বের ম্যাসেজ কার্যকরী থাকে না। তাই কুরআন আসার পর পূর্বের আসমানী কিতাবসমূহের বিধান কার্যকরী থাকেনি। অতএব এখন যদি কেউ কুরআনকে বাদ দিয়ে তাওরাত, ইঞ্জীল ইত্যাদি পূর্বের কিতাব ফলো করে চলে, তাহলে তার মুক্তি হবে না। এখন একমাত্র কুরআনকেই ফলো করে চলতে হবে। আমরা সব আসমানী কিতাবের প্রতি বিশ্বাস রাখি, এর অর্থ হল সব কিতাব-ই আল্লাহর প্রেরিত কিতাব- একথা বিশ্বাস করি, এসব কিতাব-ই নিজ নিজ যুগে কার্যকরী ছিল- একথা বিশ্বাস করি। কিন্তু সর্বশেষ কিতাব কুরআন আসার পর অন্য কোন কিতাবের কার্যকারিতা বহাল থাকেনি। কুরআন আসার পর তাওরাত, ইঞ্জীল ইত্যাদি কিতাবের কার্যকারিতা থাকবে না, এজন্যই আল্লাহর পরিকল্পনা অনুযায়ী আমাদের নবীর উপরে যখন কুরআন এসেছে, এর আগেই তাওরাত, ইঞ্জীল বিকৃত হয়ে গেছে। আসল তাওরাত, ইঞ্জীল আর অবশিষ্ট থাকেনি। কারণ তার প্রয়োজনও থাকেনি। এখন দুনিয়ার কোথাও আসল তাওরাত, ইঞ্জীল নেই। আজ ইহুদী খ্রিস্টানদের কেউ আসল তাওরাত, ইঞ্জীল দেখাতে পারবে না। ইবরানী ভাষায় তাওরাত নাযিল হয়েছিল, সুরিয়ানী ভাষায় ইঞ্জীল নাযিল হয়েছিল। আজ ইহুদী, খ্রিস্টান জগত এক কপিও মূল ভাষার তাওরাত, ইঞ্জীল দেখাতে পারবে না। এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরাম চ্যালেঞ্জ পেশ করেছেন, এই চ্যালেঞ্জের জওয়াব তারা দিতে পারেনি। আসল তাওরাত, ইঞ্জীল থাকেনি, তাই তাদের পক্ষে তা দেখানো সম্ভব নয়। এখন তাওরাত, ইঞ্জীল নামে অর্থাৎ, বাইবেল নামে যা আছে, তা বিগত ইহুদী, খ্রিস্টান পণ্ডিতরাও স্বীকার করেছে যে, তারা যুগে যুগে এর মধ্যে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করেছে।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

আল্লাহ তা'আলাও এসব কিতাব বিকৃত হতে দিয়েছেন, কারণ এসব কিতাব কিয়ামত পর্যন্ত চলবে সেটা আল্লাহর মর্জি নয়। এর বিপরীত কুরআন কিয়ামত পর্যন্ত চলবে, আর কোন কিতাব আসবে না। তাই আল্লাহ তা'আলা কুরআনকে হেফাযত করার দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছেন। কুরআন কোন দিন বিকৃত হবে না-এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা দিয়ে দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে,

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ.

অর্থাৎ, এই কুরআন আমি নাযিল করেছি এবং অবশ্যই এটাকে আমি সংরক্ষণ করব, অর্থাৎ, কোনভাবে এই কুরআন বিকৃত হবে না, কেউ এটাকে বিকৃত করতে পারবে না। (হিজ্‌রঃ ৯)

আল্লাহ তা'আলা কুরআনকে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থাও করে দিয়েছেন। দুনিয়ায় লক্ষ লক্ষ হাফেজ তৈরি হয়েছে। যাদের সিনায়-সিনায় কুরআন গাঁথা রয়েছে। এখন কেউ ইচ্ছা করলেও কুরআনের একটা যের, যবর, নুক্‌তারও পরিবর্তন করতে পারবে না। কুরআনের অর্থও কেউ বিকৃত করতে পারবে না। রাসূল (সা.) কুরআনের ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন। রাসূল (সা.) থেকে ব্যাখ্যা শিখে সাহাবায়ে কেরাম ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন। তাঁদের থেকে শিক্ষা করে পরবর্তীরা ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন। এভাবে ধারাবাহিক সূত্রে কুরআন ব্যাখ্যার বিশুদ্ধ ধারা চলে আসছে। অতএব কেউ বিকৃত ব্যাখ্যা দিবে আর তা ধরা পড়বে না, তার অবকাশ থাকেনি। কিয়ামত পর্যন্ত কেউ কুরআনের শব্দ, কুরআনের অর্থ কোনটাকেই বিকৃত করতে পারবে না, বিকৃত করা সম্ভব নয়।

কুরআনের ব্যাপারে আমাদের এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে, কিয়ামত পর্যন্ত কুরআন সংরক্ষিত থাকবে, কেউ তাকে বিকৃত করতে পারবে না। যদি কেউ মনে করে এই কুরআন বিকৃত, এই কুরআন আসল আসমানী কুরআন নয়। রাসূল (সা.) যে কুরআন রেখে গেছেন, এই কুরআনে তার সবটা আসেনি, কিছু বাদ পড়ে গেছে কিংবা কিছু অতিরিক্ত এর ভিতরে ঢোকানো হয়েছে, তাহলে তার ঈমান থাকবে না।

শী'আ ধর্মের লোকেরা আমাদের এই কুরআনকে বিকৃত কুরআন মনে করে। তারা কেন এই কুরআনকে বিকৃত বলে তা বোঝার জন্য তাদের আর একটা থিওরী বুঝতে হবে। শী'আরা মনে করে রাসূল (সা.)-এর পরে প্রথম খলীফা হওয়ার যোগ্য হযরত আলী (রা.)। কারণ তিনি রাসূলের বংশের লোক, রাসূলের জামাতা। তাই প্রথম খলীফা হওয়ার অধিকার তাঁরই। তিনিই রাসূল (সা.)-এর খলীফা হওয়ার অধিক হকদার। যদিও ইসলামে এরকম রাজতন্ত্র নেই যে, আপন বংশ থেকে বা আপনজন থেকে পরবর্তী খলীফা হতে হবে। কিন্তু শী'আরা এরকম মনে করে বসেছে। এই ভুল দর্শনের উপর তাদের আরও অনেক ভুল দর্শন দাঁড় হয়েছে। তারা মনে করে হযরত আলী (রা.) প্রথম খলীফা হওয়ার যোগ্য। তাহলে অন্য যারা হযরত আলী-র পূর্বে খলীফা হয়েছেন, তাঁরা আলীর অধিকার হরণ করেছেন, আলীর প্রতি যুলুম করেছেন। যেমন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) প্রথম খলীফা এবং হযরত ওমর (রা.) দ্বিতীয় খলীফা এবং হযরত উছমান (রা.) তৃতীয় খলীফা হয়ে অন্যায় করেছেন এবং অন্যসব সাহাবীরা তাদেরকে খলীফা মেনে নিয়ে সেই অন্যায়ে শরীক হয়েছেন। অতএব তারা সকলে আলীর শত্রু। আর তাদের দ্বারাই কুরআন সংকলন হয়েছে। কুরআনের প্রথম সংকলন হয় হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর হাতে, তারপর উছমান (রা.)-এর হাতে। শী'আরা বলে কুরআনের ভিতরই এমনসব আয়াত ছিল, যাতে বুঝা যায়-আলী প্রথম খলীফা হবেন। তারা বলে হযরত আলী (রা.)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



রাসূলের আহলে বাইত বা রাসূলের পরিবারের সদস্য। আর আহলে বাইতের মর্যাদা সম্পর্কে কুরআনে একটা সারা ছিল, কিন্তু আলীর শত্রুরা যখন কুরআন সংকলন করেছে তারা পরিকল্পিতভাবে কুরআন থেকে সেইসব আয়াত ও সেই সূরাকে বাদ দিয়ে দিয়েছে। এভাবে শী'আরা এই কুরআনকে বিকৃত মনে করে।

শী'আদেরকে খাঁটি মুসলমান বলে মেনে নেয়া যায় না। যারা কুরআনকে বিকৃত মনে করে, তারা খাঁটি মুসলমান থাকতে পারে না। কুরআনকে বিকৃত মনে করা কোন মুসলমানের বিশ্বাস হতে পারে না। শী'আরা প্রথমে একটা ভুল দর্শন দাঁড় করেছে, তার ভিত্তিতে আরও অনেক ভুল দর্শন জন্ম নিয়েছে। বংশীয় লোক এবং আপনজন হলে সে পরবর্তী খলীফা হবে-এই বিশ্বাসের উপর কুরআন বিকৃতির বিশ্বাস দাঁড় হয়েছে। তাঁর ভিত্তিতেই সমস্ত সাহাবীকে যালেম এবং অপরাধী সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর যালেম ও অপরাধী সাহাবীদের দ্বারা বর্ণিত হাদীছ গ্রহণযোগ্য হতে পারে না, তাই শী'আরা হযরত আলী ও তার বংশধর ছাড়া অন্য সাহাবীদের বর্ণিত হাদীছকে গ্রহণ করেনি। ফলে এসব সাহাবীদের দ্বারা বর্ণিত হাদীছ থেকে যেসব মাসআলা-মাসায়েল দাঁড় হয়েছে, সেগুলোকেও শী'আরা মেনে নিচ্ছে না। শী'আদের আলাদা ফেকাহ দাঁড় হয়েছে। এভাবে তারা বহু ভুল দর্শন দাঁড় করেছে। একটা ভুল দর্শনের উপর যা যা দাঁড় হয়েছে, তার সবটাই ভুল। এক কবী বলেছেন,

خشت اول چوں نہد معمار کج + تاسریامی رسد دیوار کج

'অর্থাৎ, কোন রাজমিস্ত্রী যদি দেয়াল গাঁথার সময় ভিতের ইট বাঁকা করে গাথে, তাহলে সেই বাঁকা ভিতের উপর যে দেয়াল দাঁড় হবে, তা যতই উঁচু হবে বাঁকাই হবে'।

যাহোক আমরা আলোচনা করছিলাম- কুরআনের ব্যাপারে এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলা যেভাবে কুরআন নাযিল করেছেন, হুবহু সেভাবে অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় থাকবে। কুরআনের ব্যাপারে আরও যে বিশ্বাস রাখতে হবে তা হল– কুরআন আমাদের জীবনের সবকিছুর জন্য আদর্শ। কুরআনে কোন আদর্শ সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা করতে বাদ দেয়া হয়নি। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

مَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ. (আনআমঃ ৩৮)

'অর্থাৎ, এই কিতাবে আমি কোন কিছু বর্ণনা করতে ছেড়ে দেইনি, কোন কিছু বলতে বাদ দেইনি'।

কুরআনে কারীম আমাদের জন্য পূর্ণাঙ্গ আদর্শ। শুধু নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত এই কয়টা মোটা মোটা ইবাদত শিখানোর জন্যই কুরআন আসেনি। বরং আমাদের জন্ম থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত সব ক্ষেত্রের সব কিছুর আদর্শ শিখানোর জন্য কুরআন এসেছে। ঘরের বিষয়ে বাইরের বিষয়ে, পরিবারের বিষয়ে, সমাজের বিষয়ে, দেশের বিষয়ে, রাষ্ট্রের বিষয়ে, সব বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আদর্শ শিক্ষা দেয়ার জন্য কুরআন এসেছে। হাদীছ হল কুরআনের ব্যাখ্যা। রাসূল (সা.)-এর সারা জীবনের সবকথা ও কাজ হল হাদীছ। তিনি তাঁর সারা জীবনের কথা এবং কাজের মাধ্যমে তথা হাদীছের মাধ্যমে কুরআনের ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন। তাই কুরআন এবং হাদীছ হল আমাদের জন্য পূর্ণাঙ্গ আদর্শ। রাসূল (সা.) যেহেতু তাঁর সারা জীবনের কথা এবং কাজের মাধ্যমে কুরআনের ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন, তাই রাসূল (সা.) হলেন বাস্তব কুরআন। একজন হযরত আয়েশা (রা.)কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন রাসূল (সা.)-এর চরিত্র ও জীবন আদর্শ কি ছিল? হযরত আয়েশা (রা.) তাকে বললেন, 'তুমি কি কুরআন পড়নি'? সে বলল হ্যাঁ, পড়েছি। তখন হযরত আয়েশা (রা.) বললেন,

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْاٰنَ. (رواه أحمد في مسنده برقم ٢٤٦٤٥ والحديث صحيح)

'অর্থাৎ, তাঁর চরিত্র ও জীবনাদর্শ ছিল কুরআন'।

এ রেওয়ায়েতেও বোঝানো হয়েছে, রাসূল (সা.) ছিলেন জীবন্ত কুরআন। কুরআনে কারীম হল আমাদের আদর্শের থিওরী, আর রাসূল (সা.) হলেন সেই থিওরীর প্রাকটিক্যাল রূপ। তিনি হলেন বাস্তব কুরআন। তাই কুরআনকে যেমন পূর্ণাঙ্গ আদর্শ বিশ্বাস করতে বলা হবে, রাসূল (সা.)কেও আমাদের জীবনের পূর্ণাঙ্গ আদর্শ বলে বিশ্বাস করতে হবে।

যদি কেউ কুরআনে কারীমকে পূর্ণাঙ্গ আদর্শ মনে না করে, তাহলে তার ঈমান সহীহ হবে না। এমনিভাবে যদি কেউ রাসূল (সা.)কে জীবনের সব ক্ষেত্রের জন্য আদর্শ মনে না করে, তার ঈমানও অপূর্ণাঙ্গ থাকবে।

দুঃখের বিষয়, কিছু মুসলমান ভাই এ বিষয়টা হয়তো খেয়াল না করেই বলে থাকেন যে, ধর্মকর্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার, সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ধর্মকে টেনে আনা যাবে না। কেউবা বলে ধর্ম মসজিদের ভিতরে সীমাবদ্ধ থাকবে, রাজনৈতিক অঙ্গনে ধর্মকে টেনে আনা ঠিক নয়। তার অর্থ হল তারা ইসলামকে অপূর্ণাঙ্গ মনে করেন। তাদের কথায় বুঝা যায় সামাজিক, রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে কুরআন-হাদীছের কোন বক্তব্য নেই, কুরআন হাদীছ এ ব্যাপারে কোন দিক-নির্দেশনা দেয়নি। যদি এরকম বিশ্বাস নিয়েই তারা এমন কথা বলে থাকেন, তাহলে এটা তাদের ঈমানের জন্য ক্ষতিকারক। আর যদি আলেম-উলামাদের রাজনীতিকে কোনঠাসা করে রাখার কৌশল হিসেবে এরকম বলে থাকেন, দিলে-দিলে ইসলামকে পূর্ণাঙ্গই বিশ্বাস করে থাকেন, তবুও কথা হিসেবে এটা কুফরী ধরনের কথা। তাই এটা চরম অন্যায় কথা। কোন মু'মিন বিশ্বাস করতে পারে না যে, কুরআন-হাদীছে অপূর্ণাঙ্গতা রয়েছে। কোন কোন ভাই বলে থাকেন, কুরআন-হাদীছ সেকেলে যুগের বিষয়, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগে কুরআন-হাদীছ অচল। একথা স্পষ্টত কুফরী কথা। কেউ একথা বললে তার ঈমান থাকবে না। কুরআন-হাদীছকে অচল মনে করলে ঈমান থাকে না। কুরআন-হাদীছকে অপূর্ণাঙ্গ আদর্শ মনে করলে তারও ঈমান থাকে না। এমনিভাবে রাসূল (সা.)কে জীবনের জন্য পূর্ণাঙ্গ আদর্শ মনে না করলেও ঈমান ঠিক হয় না। রাসূল (সা.) আমাদের জন্য পূর্ণাঙ্গ আদর্শ। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

অর্থাৎ, রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য (সবকিছুর) উত্তম আদর্শ রয়েছে। (আহযাব: ২১)

আমাদের ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাজনৈতিক জীবন সব ক্ষেত্রের জন্য রাসূল (সা.) আদর্শ। জীবনের এমন কোন ক্ষেত্র বা এমন কোন বিষয় নেই, যে ব্যাপারে রাসূল (সা.) আদর্শ নন। অতএব কেউ যদি মনে করে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে রাসূল (সা.) আদর্শ নন, বরং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আদর্শ হল অমুক নেতা, তাহলে সে ঈমানী অবস্থান থেকে বিচ্যুত হয়ে গেল। কারণ জীবনের সব ক্ষেত্রে সে রাসূলকে আদর্শ মানছে না। অথচ আল্লাহ বলেছেন রাসূলের মধ্যে জীবনের সবকিছুর জন্য আদর্শ রয়েছে। অতএব রাসূল (সা.)কে জীবনের সব ক্ষেত্রের জন্য আদর্শ মানতে হবে। নতুবা খাঁটি মু'মিন হওয়া যাবে না। শুধু মুখে স্বীকার করলে হবে না, কাজে কর্মেও রাসূল (সা.)কে জীবনের সব ক্ষেত্রে আদর্শ মেনে নিতে হবে। রবিউল আওয়ালের অনুষ্ঠান আসলে তখন গরম গরম বক্তৃতা দিলাম যে, রাসূল (সা.) জীবনের সব ক্ষেত্রের জন্য আমাদের আদর্শ পুরুষ।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



তিনি আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের জন্যও আদর্শ, পারিবারিক জীবনের জন্যও আদর্শ, সমাজের জন্যও আদর্শ, রাষ্ট্রের জন্যও আদর্শ। এভাবে বড় বড় বক্তৃতা দিলাম, কিন্তু পরের দিন থেকেই বক্তৃতার সূর পাল্টে গেল। কিংবা একথা শুধু বক্তৃতাতেই থাকল বাস্তব জীবনে সেটা মেনে নেয়া হল না, তাহলে খাঁটি মু'মিন হওয়া যাবে না। কারণ রাসূল (সা.) এর প্রতি ঈমান-বিশ্বাস রাখার মধ্যে এ বিষয়টাও অন্তর্ভুক্ত যে, তাকে পূর্ণাঙ্গ আদর্শ হিসেবে মনে-প্রাণে বিশ্বাসও করতে হবে, মুখে স্বীকারও করতে হবে, বাস্তবে মেনেও নিতে হবে। রাসূলের আদর্শ হওয়াকে অস্বীকার করা আর কুরআনের আদর্শ হওয়াকে অস্বীকার করা একই কথা। কারণ রাসূল (সা.) হলেন বাস্তব কুরআন। কুরআন আমাদের আদর্শ-একথা অস্বীকার করলে যেমন ঈমান থাকে না, রাসূল (সা.) আমাদের আদর্শ-একথা অস্বীকার করলেও ঈমান থাকে না।

কুরআন সম্পর্কে আরও যে কথা বিশ্বাস রাখতে হবে তা হল– কুরআনের কোন কথা রাসূলের বানানো কথা নয়। বরং কুরআনের প্রত্যেকটা কথা প্রত্যেকটা অক্ষর আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। এর ভিতরে রাসূল (সা.) নিজের পক্ষ থেকে কিছুই যোগ করেননি। কুরআন শরীফে রাসূল (সা.) এবং কুরআনের এই অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে,

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى.

অর্থাৎ, সে নিজের খেয়াল খুশি থেকে নিজের মনগড়া কিছুই বলে না। এই কুরআন হল একমাত্র তা-ই, যা ওহীর মাধ্যমে পাঠানো হয়। (নাজম: ৩) অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حٰجِزِيْنَ.

'অর্থাৎ, সে যদি নিজের পক্ষ থেকে কিছু রচনা করে আমার নামে চালিয়ে দিত, তাহলে আমি তার মহা ধমনী কেটে দিতাম। তোমাদের কেউ তাকে রক্ষা করতে পারতে না'। (হাক্কা: ৪৪-৪৭)

এই আয়াতের ভিতরে বোঝানো হয়েছে কুরআনে যতকিছু বলা হয়েছে সব আল্লাহরই কথা, মুহাম্মাদের রচিত কথা নয়।

কুরআন কোন মানুষের বানানো বা মানুষের রচিত কথা নয়। আল্লাহ তা'আলা চ্যালেঞ্জ পেশ করে বলেছেন,

وَ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ وَ ادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ.

'অর্থাৎ, এই কুরআনের ব্যাপারে তোমাদের যদি সন্দেহ হয় যে, এটা মানুষের বানানো কথা হতে পারে, মানুষের রচনা হতে পারে, তাহলে তোমরাও তো মানুষ, তোমরা এই কুরআনের যে কোন একটা সূরার মত সূরা রচনা করে দেখাও। তোমরা একা না পারলে সহযোগিদেরকে ডেকে নিয়ে এক যোগে চেষ্টা করে রচনা করে দেখাও'। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا.

'অর্থাৎ, তোমরা আদৌ তা পারবে না'। (বাকারা: ২৪)

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বস্তুত আজ পর্যন্ত দুনিয়ার কেউ কুরআনের এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে কুরআনের সমকক্ষ রচনা পেশ করতে পারেনি। কেউ দুই এক বাক্য বা দুই এক লাইন লিখে এটা বলতে পারেনি যে, এই নাও কুরআনের সমমানের একটা রচনা পেশ করলাম।

এখানে দুইটা বিষয় চিন্তা করার রয়েছে। একটা হল– কুরআনে কারীম যখন নাযিল হয়েছিল, তখন সেই সমাজে আরবী ভাষাভাষী অনেক উচ্চাঙ্গের কবি সাহিত্যিক ছিল। তারা পর্যন্ত কুরআনের কোন একটা ছোট্ট সূরার মত কিছুও রচনা করে দেখাতে পারেনি। বুঝা গেল কুরআনের মত কোন কালাম তৈরি করা মানবীয় ক্ষমতার বাইরে। এটা হল কুরআনের মু'জিযা। দ্বিতীয় চিন্তা করার বিষয় হল– বিধর্মীরা ইসলামের মিশনকে ব্যর্থ করার জন্য সব যুগেই কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে থাকে। অথচ তারা কুরআনের মত কিছু রচনা পেশ করে সহজেই কুরআনকে মিথ্যা প্রমাণিত করতে পারত এবং এরূপ করতে পারলে ইসলামের মিশন ব্যর্থ হয়ে যেত। কিন্তু তারা তা করতে যায় না কেন? আসলে তারা এটা করতে পারে না। পারলে অবশ্যই তা করত।

আল্লাহ তা'আলার কুদরতের রহস্যই এমন যে, এমনিতে একজন আরবী ভাষাবিদ ভাল ভাল রচনা তৈরি করতে পারলেও যখনই কুরআনের মোকাবিলার জন্য কোন রচনা তৈরি করতে নামে, তখনই তার লেখাগুলো বাজে হয়ে যায়। ইতিহাসে এর প্রমাণ রয়েছে। ইতিহাসে এমন প্রমাণও আছে-যখন কেউ নিজের কোন রচনাকে ওহী অর্থাৎ, আল্লাহর বাণী বলে চালানোর চেষ্টা করেছে, তখনকার উলামায়ে কেরাম প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, তার লেখা কুরআনের সমমানের নয় বরং তাতে অনেক ভুল ও অসংগতি রয়েছে। বিংশ শতাব্দির শুরুতে মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী নবুওয়াতের দাবী করে বলেছিল যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার কাছে ওহী এসেছে। সে তার রচিত যেসব লেখনীকে আল্লাহর কালাম বলে দাবী করেছে, তখনকার উলামায়ে দেওবন্দ তার সেসব লেখনীর মধ্যে হাজার হাজার ভুল ধরে দিয়েছেন। তারা তার মধ্যে ভাষাগত ভুল, বাক্যগত ভুল, অলংকার শাস্ত্রগত ভুল ইত্যাদি অনেক ধরনের ভুল ধরে দিয়ে হাতে কলমে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, এটা আদৌ আল্লাহর কালাম হতে পারে না। যাহোক ইতিহাসে কেউ কুরআনের মোকাবিলা করতে পারেনি। কারণ কুরআন আল্লাহর বাণী, কোন মানুষের রচনা নয়। তাই কারও পক্ষে কুরআনের সমকক্ষ রচনা পেশ করা সম্ভব নয়। অতীতেও কেউ তা পারেনি, ভবিষ্যতেও পারবে না। কুরআন সম্পর্কে এই হল আমাদের ঈমান ও বিশ্বাস।

কুরআন যে সত্যিই আল্লাহর কালাম কোন মানুষের রচিত নয়, তার সবচেয়ে বড় দলীল হল এটা যে, কেউ কুরআন-এর সমকক্ষ রচনা পেশ করতে পারে না। এ ছাড়াও কুরআন সত্য হওয়ার আরও অনেক প্রমাণ রয়েছে। তার মধ্যে একটা প্রমাণ হল– কুরআন অনেক ক্ষেত্রে মানুষের মনের কথা বলে দিয়েছে, যা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। এটাও কুরআনের সত্য হওয়ার প্রমাণ। একটা ঘটনা শুনুন -আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই একজন মুনাফিক ছিল। সে ধোঁকা দিয়ে, প্রতারণা করে মুসলমানদেরকে ওহুদ যুদ্ধ থেকে সরাতে চেয়েছিল। যাতে মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা কম হয় এবং মুসলমানরা পরাজিত হয়ে যায়। তার ষড়যন্ত্রে পড়ে মুসলমানদের দুটো গোত্র -বনূ হারেছা এবং বনূ সালামার লোকেরা সংশয়ে পড়ে গিয়েছিল যে, এখন আমরা যুদ্ধে থাকব, না চলে যাব। এ প্রসঙ্গে আয়াত নাযিল হয়ে গেল,

اِذْ هَمَّتْ طَّآئِفَتٰنِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا وَ اللّٰهُ وَلِيُّهُمَا.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com



অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে দুটো দল যুদ্ধ থেকে সরে যাবে কি-না –এই চিন্তা-ভাবনায় লিপ্ত হয়েছিল, তবে আল্লাহ্ তাদেরকে রক্ষা করেছেন। আল্লাহ তাদের অভিভাবক।

আয়াত নাযিল হওয়ার পর খোঁজ করা শুরু হল এই দুই দল কারা। তখন উক্ত দুই গোত্রের লোকেরা স্বীকার করল যে, হ্যাঁ আমরা এরূপ চিন্তা-ভাবনা করেছিলাম। দেখা গেল – কুরআন মানুষের মনের কথা বলে দিয়েছে, যা সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

কুরআন সত্য হওয়ার আর একটা প্রমাণ হল– কুরআনে অনেক বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, যা সত্য প্রমাণিত হয়েছে। এটাও কুরআন সত্য হওয়ার আর একটা প্রমাণ। একটা ঘটনা শুনুন-একবার রাসূল (সা.)-এর দরবারে খ্রিস্টানদের একটা প্রতিনিধি দল উপস্থিত ছিল, ঐ মজলিসে কিছু ইহুদীও উপস্থিত হল। ইহুদী, খ্রিস্টানদের মধ্যে ঝগড়া শুরু হল, ঝগড়ার এক পর্যায়ে ইহুদীরা দাবী করল একমাত্র আমরাই হকপন্থী, আর কোন দল হকপন্থী নয়। আমাদের জন্যই জান্নাত নিশ্চিত, আর কারও জন্য নয়। খৃষ্টানরাও দাবী করল একমাত্র আমরাই হকপন্থী অন্য কেউ নয়। জান্নাত একমাত্র আমাদের জন্যই নিশ্চিত, আর কারও জন্য নয়। উপরন্তু ইহুদীরা দাবী করত যে, আমরা হলাম আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র। অতএব আমাদের জন্য জান্নাত সুনিশ্চিত। এরূপ দাবী করনেওয়ালা ইহুদীদেরকে বলা হয়েছিল,

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوْٓا اِنْ زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِيَآءُ لِلّٰهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ.

অর্থাৎ, হে মুহাম্মাদ! তুমি এদেরকে বলে দাও– যদি তোমরা আল্লাহর প্রিয়পাত্রই হয়ে থাকবে, মরলেই তোমাদের জন্য জান্নাত নিশ্চিত একথা যদি সত্য হয়, এটা যদি মনের কথা হয়, তাহলে মৃত্যু কামনা করে দেখাও যে, হে আল্লাহ্ আমার মৃত্যু দিয়ে দাও। এরপর আল্লাহ্ সাথে সাথে এটাও বলে দিয়েছেন যে,

وَ لَا يَتَمَنَّوْنَهٗٓ اَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ.

অর্থাৎ, কখনোই ওরা এ সাহস করবে না, ওরা মৃত্যু কামনা করবে না। এ আয়াত তাদের পড়ে শোনানো হল, কিন্তু তাদের কেউ মৃত্যু কামনা করতে সাহস পেল না। যদি তারা নিজেদেরকে সত্যপন্থী মনে করত, তাহলে একবার মুখের কথা বললেই হত যে, হে আল্লাহ্! আমাদের মৃত্যু দিয়ে দাও। তাহলে এটাই কুরআনকে মিথ্যা প্রমাণ করতে যথেষ্ট হত। কিন্তু আল্লাহ্ যে ভবিষ্যদ্বাণী করে দিয়েছেন যে, তারা মৃত্যু কামনা করবে না। আল্লাহর ভবিষ্যদ্বাণী সত্যই প্রমাণিত হয়েছে।

আর একটা ঘটনা শুনুন-নবী (সা.)-এর হিজরতের পাঁচ বছর পূর্বের ঘটনা। তখনকার দুই পরাশক্তি -রোম আর পারস্যসম্রাটের মধ্যে যুদ্ধ লাগল। যুদ্ধে পারস্যসম্রাট বিজয়ী হয়ে গেল। রোমকরা পরাজিত হল। মক্কার মুশরিকরা ছিল পারস্যের সমর্থক। কারণ পারস্যের লোকদের সাথে মক্কার মুশরিকদের মিল ছিল। পারস্য বাসীরাও মক্কাবাসীদের মত কোন আসমানী কিতাবে বিশ্বাস করত না। তাদেরও কেউ কেউ মক্কাবাসীদের মত মূর্তি পূজা করত, কেউ আগুন পূজা করত। তাই মক্কার মুশরিকরা পারস্যের লোকদেরকে নিজেদের পক্ষশক্তি মনে করত। আর মুসলমানরা তুলনামূলকভাবে রোমকদেরকে পছন্দ করত। কারণ রোমকরা ছিল খ্রিস্টান। তারা আসমানী কিতাবে বিশ্বাস করত। এদিক থেকে তারা মুসলমানদের কাছাকাছি ছিল। পারস্যের বিজয়ে মক্কার মুশরিকরা খুব খুশি হল এই

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

ভেবে যে, আমাদের পক্ষশক্তির বিজয় শুরু হল। তারা মুসলমানদেরকে বলল, 'হে মুসলমানরা, পারস্যবাসীরা যেমন রোমকদেরকে পরাজিত করেছে, সামনে আমরাও তোমাদেরকে ওরকম পরাজিত করব'। মুসলমানরা কিছুটা মনক্ষুন্ন হল। আয়াত নাযিল হয়ে গেল,

الٓمّٓ، غُلِبَتِ الرُّوْمُ، فِيْٓ اَدْنَى الْاَرْضِ وَ هُمْ مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ بَعْدُ وَ يَوْمَئِذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ.

অর্থাৎ, রোমকরা পরাজিত হয়েছে। আগামী তিন বছর থেকে নয় বছরের ভিতরে আবার রোমকরা বিজয়ী হবে। সেদিন মুসলমানরা আনন্দিত হবে। (রূম: ১-৩)

সাহাবায়ে কেরামের বিশ্বাস কেমন ছিল? আয়াত শুনে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) দৌড় দিয়ে চলে গেলেন মুশরিক নেতৃবৃন্দের কাছে। বললেন, 'তোমাদের খুশি হওয়ার কিছু নেই, কিছুদিন পরেই তোমাদের লোকেরা অর্থাৎ, পারস্যরা পরাজিত হবে, রোমকরা বিজয়ী হবে। এ ব্যাপারে আয়াত নাযিল হয়ে গেছে'। কাফেরদের নেতা উবাই ইব্নে খাল্ফ বলল, না, এটা কখনো হবে না, তাহলে বাজি ধর, বাজি ধরা হল। ঘটনা বেশ কিছু লম্বা। শেষ পর্যন্ত একশত উট বাজি ধরা হল। কথা হল - যদি আগামী নয় বছরের ভিতরে রোমকরা বিজয়ী না হয়, তাহলে আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) একশত উট দিবেন উবাই ইব্নে খাল্ফকে, আর বিজয়ী হলে উবাই ইব্নে খাল্ফ আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) কে একশত উট দিবে। এর সাত বছরের মাথায় যখন বদর যুদ্ধ হয়, তখন একদিকে বদর যুদ্ধে মুসলমানরা বিজয়ী হল, আরেক দিকে রোম পারস্যের ভিতরে যুদ্ধে রোমকরা বিজয়ী হল। তখন তো আবূ বকর (রা.) হিজরত করে মদীনায় চলে এসেছেন। আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) মক্কায় চলে গেলেন। ইতিমধ্যে উবাই ইব্নে খাল্ফ মারা গেছে। তার বংশধর থেকে তিনি একশত উট নিয়ে আসলেন। দেখা গেল –কুরআনে যা ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, তা সত্যে পরিণত হয়েছে। যদি সত্য প্রমাণিত না হত, তাহলে কুরআনকে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য এটাই যথেষ্ট ছিল। যাহোক আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) উট নিয়ে মদীনায় আসলেন। নবী (সা.) বললেন এটা তো জুয়া, এটা খাওয়া যাবে না, ছদকা করে দাও। জুয়ার মাল হারাম, যত রকম জুয়া সবই হারাম। এমনিভাবে কুরআন যে সত্য, তার আরও বহু প্রমাণ রয়েছে। আল্লাহ পাক আমাদের ঈমানকে সহীহ ও মজবূত করে দিন। আমীন!

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



## বয়ান নং ১০-এর খুতবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ نَزَّلَ الْقُرْاٰنَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيُبَيِّنَهٗ لِلنَّاسِ تَبْيِيْنًا، وَمَا تَرَكَ شَيْئًا اِلَّا فَصَّلَهٗ فِيْهِ تَفْصِيْلًا، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ شَهَادَةً مُكَمِّلَةً لِّلْاِيْمَانِ تَكْمِيْلًا، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهُ الَّذِيْ بَعَثَهٗ بِالْحَقِّ اِلَى الْخَلْقِ لِيُفَسِّرَ مَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ تَفْسِيْرًا، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ اَتَاهُمْ رَبُّهُمْ مِنْ لَّدُنْهُ فَضْلًا كَبِيْرًا.

وَبَعْدُ:

اَيُّهَا النَّاسُ! اِنَّ عَلَيْنَا الْاِيْمَانَ بِاَنَّ الْكُتُبَ السَّمَاوِيَّةَ كُلَّهَا حَقٌّ مُّبِيْنٌ، وَاَنَّ الْقُرْاٰنَ اٰخِرُ كِتَابٍ اُنْزِلَ اِلَى الْعَالَمِيْنَ، وَ اِنَّهٗ حَبْلُ اللّٰهِ الْمَتِيْنُ، وَهُوَ الْعُرْوَةُ الْوُثْقٰى، وَالْمُعْتَصَمُ الْاَقْوٰى، وَهُوَ النُّوْرُ وَالضِّيَاءُ، وَبِهِ النَّجَاةُ وَالشِّفَاءُ، وَمَنِ ابْتَغَى الْعِلْمَ فِيْ غَيْرِهٖ اَضَلَّهُ اللّٰهُ، وَمَنْ خَالَفَهٗ قَصَمَهُ اللّٰهُ، وَاِنَّ الْقُرْاٰنَ لَا تَنْقَضِيْ عَجَآئِبُهٗ، وَلَا تَتَنَاهٰى غَرَائِبُهٗ، مَنْ قَالَ بِهٖ صَدَقَ، وَمَنْ حَكَمَ بِهٖ عَدَلَ، وَمَنْ عَمِلَ بِهٖ اُجِرَ، وَاِنَّ السَّعِيْدَ مَنْ قَامَ بِتِلَاوَتِهٖ، وَتَدَبَّرَ مَوَاعِظَهٗ وَبَيِّنَاتِهٖ، وَاهْتَدٰى بِهِدَايَتِهٖ، وَاقْتَطَفَ مِنْ ثِمَارِهٖ، وَامْتَثَلَ اَوَامِرَهٗ وَاجْتَنَبَ زَوَاجِرَهٗ. وَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى تَوَلّٰى بِحِفْظِ الْقُرْاٰنِ حَرْفًا حَرْفًا وَمَعْنًى مَعْنًى لَّا يَقْدِرُ اَحَدٌ عَلٰى تَحْرِيْفِهٖ وَ تَغْيِيْرِهٖ. قَالَ تَعَالٰى: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ. وَاِنَّ الْقُرْاٰنَ فِيْهِ تِبْيَانٌ لِّكُلِّ شَيْءٍ، وَمَوْعِظَةٌ وَّ اِنْذَارٌ لِّكُلِّ حَيٍّ، قَالَ تَعَالٰى: مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ.

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

اَلَا وَاِنَّ الْاِيْمَانَ بِالْقُرْاٰنِ يَتَضَمَّنُ الْاِيْمَانَ بِاَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْتَسِبْ حَرْفًا مِنْهُ اِلَى اللّٰهِ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهٖ. قَالَ تَعَالٰى : وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى. وَقَالَ تَعَالٰى : وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ، فَمَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِيْنَ. وَاِنَّ اللّٰهَ تَحَدّٰى بِالْقُرْاٰنِ فَقَالَ : وَاِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِثْلِهٖ وَادْعُوْا شُهَدَائَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ. فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ.

وَاعْلَمُوْا اَنَّ دَلَائِلَ صِدْقِ الْقُرْاٰنِ كَثِيْرَةٌ. مِنْهَا اَنَّ الْقُرْاٰنَ صَدَرَ مِنْ لِسَانِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْاَمِيْنِ، وَلَمْ يَتَعَلَّمْ حَرْفًا مِّنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِيْنَ. وَمِنْهَا اَنَّ الْقُرْاٰنَ اَخْبَرَ بِمَا فِي الْغَيْبِ وَظَهَرَ كَمَا اَخْبَرَ، كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : الٓمّٓ غُلِبَتِ الرُّوْمُ فِيْ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ، لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ. وَمِنْهَا اَنَّ الْقُرْاٰنَ اَخْبَرَ بِمَا فِي الضَّمَائِرِ وَثَبَتَ صِدْقُهٗ. كَمَا قَالَ تَعَالٰى : اِذْ هَمَّتْ طَّآئِفَتَانِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا، وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ. وَقَالَ تَعَالٰى : قُلْ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوْا اِنْ زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِيَآءُ لِلّٰهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ. وَلَا يَتَمَنَّوْنَهٗ اَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ. اِلٰى غَيْرِ ذٰلِكَ مِنَ الدَّلَائِلِ.

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ : الٓمّٓ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



বয়ান নং -১১

## ফিরিশতাদের প্রতি ঈমান প্রসঙ্গ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: لَا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ. وَقَالَ تَعَالٰى : سَاُصْلِيْهِ سَقَرَ، وَ مَآ اَدْرٰىكَ مَا سَقَرُ، لَا تُبْقِيْ وَ لَا تَذَرُ، لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ، عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا وَقَدْ وُكِّلَ بِهٖ قَرِيْنُهٗ مِنَ الْجِنِّ وَ قَرِيْنُهٗ مِنَ الْمَلٰئِكَةِ.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

আমরা ঈমান সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। যে ছয়টা মৌলিক বিষয়ের প্রতি ঈমান রাখতে হয়, তার মধ্যে আল্লাহর প্রতি ঈমান, নবী-রাসূলদের প্রতি ঈমান এবং আসমানী কিতাবের প্রতি ঈমান এই তিনটা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আর একটি মৌলিক বিষয় হল ফিরিশতাদের প্রতি ঈমান রাখা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অসংখ্য ফিরিশতা সৃষ্টি করে দুনিয়াসহ মহাজগতের বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত করে রেখেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন জগত পরিচালনার জন্য কোন কিছুর মুখাপেক্ষী নন, তিনি তাঁর হুকুম বলে সবকিছু করতে পারেন, সবকিছু ঘটাতে পারেন, তারপরও তিনি ফিরিশতাদের তৈরি করে বিভিন্ন দায়িত্বে তাদেরকে নিয়োজিত করে রেখেছেন। এটা করেছেন তিনি মানুষকে কাজের শৃঙ্খলা শিক্ষা দেয়ার জন্য, রাজ্য পরিচালনার সিস্টেম শিক্ষা দেয়ার জন্য।

ফিরিশতাগণ নূরের তৈরি আল্লাহর এক ধরনের মাখলূক, যারা শুধু আল্লাহর হুকুম মানতে বোঝেন, আল্লাহর নাফরমানী করতে অর্থাৎ, আল্লাহর কোন হুকুম অমান্য করতে বোঝেন না। কুরআনে কারীমে ফিরিশতাদের এরূপ পরিচয় তুলে ধরে বলা হয়েছে,

لَا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ.

অর্থাৎ, তারা আল্লাহর নাফরমানী করে না, আল্লাহর কোন হুকুমের খেলাফ করে না, বরং তাদেরকে যা হুকুম দেয়া হয়, তা-ই তারা করে। (তাহরীম: ৬)

আল্লাহ পাক বিভিন্ন রকম দায়িত্বশীল ফিরিশ্তা তৈরি করে রেখেছেন। বিভিন্ন দায়িত্বে তাদেরকে নিয়োগ দিয়ে রেখেছেন। এর মধ্যে বড় ফিরিশ্তা হল চারজন। একজন হযরত জিব্রাঈল (আ.), যার প্রধান দায়িত্ব ছিল দুনিয়াতে নবী-রাসূলদের কাছে ওহী নিয়ে আসা। আরেকজন হযরত ইসরাফীল (আ.), যার প্রধান দায়িত্ব হল শিংগায় ফুঁক দেয়া। তিনি শিংগা হাতে নিয়ে অপেক্ষায় রয়েছেন। যখন আল্লাহ তা'আলা হুকুম দিবেন, তিনি শিংগায় ফুঁক দিবেন, তাতে সারা দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে, কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে। আর একজন প্রধান ফিরিশতা হলেন হযরত মীকাঈল (আ.) তার দায়িত্ব হল দুনিয়ায় মানুষের রিযিক বন্টন করা। রিযিক উৎপাদনের সাথে জড়িত হল মেঘ, বৃষ্টি ও বায়ু। এই মেঘ, বৃষ্টি ও বায়ু পরিচালনার দায়িত্ব হযরত মীকাঈল (আ.)কে দেয়া হয়েছে। আর একজন প্রধান ফিরিশতা হলেন হযরত আজরাঈল (আ.), যার দায়িত্ব হল সমস্ত প্রাণীর রূহ কব্জ করা। তিনি মানুষের এবং অন্যান্য সমস্ত প্রাণীর রূহ কব্জ করে মৃত্যু ঘটান। এই চারজন বড় ও প্রধান ফিরিশতা। তাছাড়াও আল্লাহ পাক বহু দায়িত্বে বহু ফিরিশতাকে নিয়োগ করে রেখেছেন। কিছু ফিরিশতাকে আল্লাহর আরশ বহন করার কাজে নিয়োগ করে রাখা হয়েছে। কিছু ফিরিশতাকে মানুষের আমলনামা

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

লেখার কাজে রাখা হয়েছে, কিছু ফিরিশতাকে মানুষের হেফাযতের কাজে নিয়োজিত রাখা হয়েছে। কিছু ফিরিশতাকে মায়ের গর্ভের গর্ভকে হেফাযত করার দায়িত্বে রাখা হয়েছে। এভাবে বিভিন্ন দায়িত্বে ফিরিশতাদেরকে নিয়োজিত রাখা হয়েছে। বহু ফিরিশতাকে আল্লাহর ইবাদতে নিয়োজিত রাখা হয়েছে। সপ্তম আসমানের উপর বায়তুল মা'মূর রয়েছে। পৃথিবীতে যেমন বায়তুল্লাহ আছে যেখানে মানুষ তওয়াফ করে এমনিভাবে সপ্তম আসমানের উপর হুবহু এই বায়তুল্লাহর আকৃতিতে আরেকটা ঘর আছে, সেটাকে বায়তুল মা'মূর বলা হয়। এখানে সর্বক্ষণ ফিরিশতারা তওয়াফ করতে থাকেন। রাসূল (সা.) মে'রাজে গিয়ে এই বায়তুল মা'মূর দেখে এসেছেন। তিনি বলেছেন,

وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ لَا يَعُوْدُوْنَ اِلَيْهِ. (رواه مسلم في صحيحه برقم ٤٢٩)

অর্থাৎ, সেখানে প্রতিদিন ৭০ হাজার ফিরিশতা তওয়াফ করার জন্য প্রবেশ করেন। এই ৭০ হাজার আর কোন দিন তওয়াফ করতে আসবেন না। প্রতিদিন সেখানে নতুন নতুন ৭০ হাজার ফিরিশতা তওয়াফ করতে আসেন।

এ থেকে বুঝা যায় আল্লাহ তা'আলা কত অগণিত ফিরিশতা তৈরি করে রেখেছেন। বহু সংখ্যক ফিরিশতা এমন আছেন যারা সাজদায় পড়ে আছেন, কিয়ামত পর্যন্ত তারা সাজদায় পড়ে থাকবেন। বহু সংখ্যক ফিরিশতা রুকু অবস্থায় আছেন, কিয়ামত পর্যন্ত তারা এই রুকু অবস্থায় থাকবেন। বহু সংখ্যক ফিরিশতা নামাযে দাঁড়ানোর অবস্থায় আল্লাহর গুণগানে রত আছেন, কিয়ামত পর্যন্ত তারা এই অবস্থায় থাকবেন। এভাবে আল্লাহ তা'আলা মহাকাশে ইবাদতের পরিবেশ তৈরি করে রেখেছেন। আল্লাহ ছাড়া আর কিছু নেই, আল্লাহর ইবাদত করা ছাড়া আর কিছু নেই-এরকম একটা মহাপরিবেশ তিনি সৃষ্টি করে রেখেছেন। অসংখ্য অগণিত ফিরিশতা এভাবে আল্লাহর ইবাদতে রত আছেন। এত অসংখ্য অগণিত ফিরিশতা আসমানে রয়েছে যে, রাসূল (সা.) বলেছেন,

اَطَّتِ السَّمَآءُ وَحُقَّ لَهَا اَنْ تَئِطَّ. مَا فِيهَا مَوضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ إِلَّا وَمَلَكٌ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا لِلّٰهِ.

(رواه الترمذي برقم ٢٣١٢ وقال : حسن غريب)

'অর্থাৎ, ফিরিশতাদের পদভারে আসমান মচ মচ করছে। সেখানে চার আঙ্গুল পরিমাণ জায়গাও এমন নেই যেখানে কোন সাজদারত অবস্থায় না রয়েছে'।

এখানে বোঝানো হয়েছে অসংখ্য ফিরিশতা আসমানে রয়েছে। কিছু ফিরিশতাকে আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের দারোগা হিসেবে দায়িত্ব পালন করার জন্য রেখেছেন। কাফের নেতা ওলীদ ইবনে মুগীরা সম্পর্কে কুরআন শরীফে এসেছে,

سَأُصْلِيْهِ سَقَرَ، وَ مَآ اَدْرٰىكَ مَا سَقَرُ، لَا تُبْقِىْ وَ لَا تَذَرُ، لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ، عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ.

অর্থাৎ, আমি তাকে সাকার নামক দোযখে ঢোকাবো। তুমি কি জান সাকার নামক জাহান্নামের অবস্থা কী? সেটা কাউকে অক্ষত রাখবে না, ছাড়বেও না। মানুষকে দগ্ধ করবে।এর দায়িত্বে নিয়োজিত আছে উনিশ জন ফিরিশতা। দোযখের দারোগা হিসেবে আমি ১৯ জন অর্থাৎ, এই ফিরিশতাকে নিয়োজিত করে রেখেছি। (মুদ্দাচ্ছির: ৩০)

এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর কাফের নেতারা নানারকম উপহাস করতে শুরু করল। আবূ জাহ্ল রহস্য করে বলল, 'হে কুরায়শ যুবকগণ! মুহাম্মাদের সাথী মাত্র ১৯জন তোমরাতো বিরাট বাহিনী, চিন্তা কিসের? অর্থাৎ, এই বাহিনী নিয়ে ১৯ জনকে সাবাড় করে দেয়া যাবে'। আর এক কাফের বলল, '১৯ জনের বিরুদ্ধে আমি একাই যথেষ্ট। ডান হাত দিয়ে ১০ জন আর বাম হাত দিয়ে ৯ জনের দফা শেষ

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



করে দেব'। আবুল আশাদ্দ নামক একজন বলল, আমি একা ১৭ জনের মোকাবিলা করতে পারব। তোমরা সকলে মিলে বাকী দুজনের মোকাবিলা করবে। ব্যস সব খতম করে দেব'। এভাবে তারা উপহাস করতে থাকল। অথচ তারা জানে না, ১৯ জন কেন একজন ফিরিশতাই সমস্ত কাফেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য যথেষ্ট।

এই ফিরিশতাদের শক্তি সম্পর্কে হাদীছে এসেছে,

لَهُمْ مِّثْلُ قُوَّةِ الثَّقَلَيْنِ. (الدر المنثور للسيوطي مرفوعا)

অর্থাৎ, তাদের এক এক জনের শক্তি সমস্ত জিন-ইসনানের শক্তির সমান।

ফিরিশতা এই সাড়ে তিন হাত মানুষের মত পুচকে নয়, ফিরিশতাদের আকৃতি সম্পর্কে হাদীছে যে বর্ণনা এসেছে তা মানুষের কল্পনায়ও আসতে পারে না। রাসূল (সা.) হযরত জিব্রাঈল (আ.) কে তার নিজস্ব আকৃতিতে দুইবার দেখেছেন। একবার দুনিয়ায় দেখেছেন, আরেকবার মে'রাজে গিয়ে সপ্তম আসমানের উপরে সিদ্‌রাতুল মুন্‌তাহার কাছে দেখেছেন। এই সিদ্‌রাতুল মুন্‌তাহার কাছে জান্নাতুল মা'ওয়া অবস্থিত। কুরআন শরীফে এসেছে,

وَ لَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى، عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى، عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى.

অর্থাৎ, সে জিব্রাঈলকে দ্বিতীয়বার তাঁর আসল রূপে দেখেছে সিদ্‌রাতুল মুন্‌তাহার কাছে, যেখানে জান্নাতুল মা'ওয়া অবস্থিত। (নাজম: ১৩-১৫)

রাসূল (সা.) বলেছেন, 'যখন জিব্রাঈল (আ.) তার নিজস্ব আকৃতিতে আবির্ভূত হলেন তখন–

فَسَدَّ أُفُقَ السَّمَآءِ. (رواه مسلم في صحيحه برقم ٤٦٠)

অর্থাৎ, আকাশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত পুরো জায়গা ভরে গেল'। মহাকাশ জুড়ে যার আকৃতি, সে কত বিশাল তা মানুষের কল্পনায়ও আসবে না। এই জিব্রাঈল সম্পর্কে উক্ত মুসলিম শরীফের হাদীছে আরও এসেছে,

لَهُ سِتُّ مِأَةِ جَنَاحٍ. (مسلم برقم ٤٥٢)

অর্থাৎ, তার ছয়শত ডানা।

হযরত জিব্রাঈল (আ.)-এর এক একটা ডানায় এত শক্তি যে, তিনি একটা ডানা দিয়ে কওমে লূতের গোটা বস্তি ঊর্ধ্বে তুলে নিয়ে উল্টে ফেলে দিয়েছিলেন। আল্লাহ পাক এরকম ফিরিশতাদেরকে তৈরি করেছেন। অথচ ওরা একজনই ১৯ জনের দফা শেষ করে দিতে চায়। যাহোক বলা হচ্ছিল কিছু ফিরিশতাকে জাহান্নামের দারোগা হিসেবে নিয়োজিত রাখা হয়েছে।

পূর্বে বলা হয়েছে কিছু ফিরিশতাকে মানুষের হেফাযতের কাজে নিয়োজিত রাখা হয়েছে। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

لَهُ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ.

অর্থাৎ, আল্লাহর হুকুমে মানুষের কাছে একের পর একদল ফিরিশতা আসতে থাকেন যারা তাদেরকে রক্ষা করেন।

অর্থাৎ, সবরকম আকস্মিক বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করেন। যেমন তার উপর যেন কোন দেয়াল ধ্বসে না পড়ে, কিংবা সে যেন কোন গর্তে পড়ে না যায়। এভাবে বিভিন্ন রকম বিপদ-আপদ ও প্রতিকূলতা থেকে মানুষকে রক্ষা করেন। বিভিন্ন রকম বালা-মুসীবত এবং রোগ-ব্যাধি থেকে হেফাযত

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

করেন। বিজ্ঞানীরা বলেন এই দুনিয়াতে বায়ুর পরিমণ্ডলে এত রোগ জীবাণু ছড়িয়ে আছে যার ভিতরে মানুষের বেঁচে থাকা এক বিস্ময়কর ব্যাপার। সূর্য থেকে প্রচুর ক্ষতিকর রশ্মি আসে, যার মধ্যে বহু রোগ-ব্যাধি এমনকি ক্যান্সারের জীবাণু পর্যন্ত থাকে। বিজ্ঞানীদের ভাষায় এসব রোগ জীবাণু আমাদের চতুর্পার্শে কিলবিল করছে। আল্লাহ তা'আলা এটা শোষণ করার ব্যবস্থা রেখেছেন। বায়ুর ভিতর দিয়ে শোষণ হয়ে রিফাইন হয়ে আলোক রশ্মিগুলো দুনিয়াতে আসে। এরপরেও বহু রোগ ব্যাধি বহু ক্যান্সারের জার্ম চলে আসে। যার ভিতর মানুষের বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু মানুষ বেঁচে থাকে। আল্লাহ পাক হেফাযত করার জন্য ফিরিশতাদেরকে নিয়োজিত করে রেখেছেন। তারাই হেফাযত করেন।

যদি কেউ প্রশ্ন করেন ফিরিশতারা হেফাযত করলে আমরা রোগে আক্রান্ত হই কেন? বিভিন্ন আকস্মিক দুর্ঘটনার শিকার হই কেন? হাদীছে এ প্রশ্নের জওয়াব দেয়া হয়েছে। হযরত আলী (রা.) কর্তৃক বর্ণিত রেওয়ায়েতে আছে যখন তাকদীরের ফয়সালা কার্যকরী হওয়ার থাকে এবং কাউকে বিপদ-আপদে জড়িত করার জন্য আল্লাহর নির্দেশ জারী হয়, তখন এইসব সংরক্ষণকারী ফিরিশতারা সেখান থেকে সরে যান। (রূহুল মা'আনী) যতক্ষণ তাকদীরের ফয়সালা কার্যকরী হওয়ার না হয়, ততক্ষণ মানুষের উপরে কোন বিপদও আসতে পারে না। এই সব হেফাযতকারী ফিরিশতারা হেফাযত করেন। হযরত কা'ব আহবার বলেন, যদি এই ফিরিশতাদের সংরক্ষণ ব্যবস্থা না থাকত, তাহলে জিনদের অত্যাচারে মানবজীবন অতিষ্ঠ হয়ে যেত। তারা মানুষদেরকে গারদ করে দিত। কারণ এক তো তাদের শক্তি আছে, দ্বিতীয়ত তাদেরকে আমরা দেখিনা, তাই যে কোন সময় তারা মানুষকে বিপদগ্রস্ত করতে পারত। মানুষজাতিকে ধ্বংস করার জন্য এই এক জিন জাতিই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে এই সংরক্ষণ ব্যবস্থা থাকার ফলে মানুষ রক্ষা পায়। হ্যাঁ যখন তাকদীরের ফয়সালা আসবে তখন ফিরিশতারা সরে যাবেন, তখন আল্লাহর ফয়সালা কার্যকরী হবে। সাধারণভাবে দিনের বেলায় একদল ফিরিশতা আসেন তারা এই হেফাযতের দায়িত্ব পালন করে চলে যান, রাতের বেলায় আরেক দল আসেন।

এছাড়াও মানুষকে হেফাযতের জন্য আল্লাহ পাক আরও কিছু বিশেষ ফিরিশতা রেখে দিয়েছেন। এ সম্পর্কে একটা ঘটনা শুনুন! আল্লাহ তা'আলার একটা পরিচয় হল তিনি আর-রাহমানুর রাহীম। অর্থাৎ, সব দয়ালুদের মধ্যে সবচেয়ে বড় দয়ালু। আল্লাহ পাক এই নামের সাথে এক ফিরিশতাকে নিযুক্ত করে রেখেছেন। যখন কেউ বিপদাপদে পড়ে এই নামে আল্লাহকে ডাকবে তখন এই ফিরিশতা আসমানের উপর থেকে সরাসরি তার সাহায্যে এগিয়ে আসবেন। হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.) একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী ছিলেন। তিনি একবার তায়েফ সফরে গিয়েছিলেন। তায়েফ থেকে যখন ফিরে আসেন, তখন এক ডাকুর কবলে পড়েন। ডাকু তাকে বলে, আমি তোমার মালও নিয়ে নিব, তোমাকে হত্যাও করব। তখন ঐ সাহাবী আল্লাহকে ডাক দেন ইয়া আরহামার রাহিমীন! হে দয়ালুদের মধ্যে সবচেয়ে বড় দয়ালু! সাথে সাথে জোর আওয়াজে একটা চিৎকার ভেসে আসল لَا تَقْتُلْهُ অর্থাৎ, তাঁকে হত্যা কর না! ভয়ংকার এই চিৎকার শুনে ডাকু ভয় পেয়ে যায়। সে চতুর্দিকে চেয়ে দেখে কেউ নেই। আবার সে তাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। তিনি আবার ঐ নামে আল্লাহকে ডাক দেন- ইয়া আরহামার রাহিমীন! আবার ঐ আওয়াজ ভেসে আসে- পূর্বের চেয়ে আরও জোরে শোনা যায় তাকে হত্যা কর না। আবার ডাকু চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখে কেউ নেই। সে আবার তাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। সাহাবী তৃতীয়বার ইয়া আরহামার রাহিমীন! বলে আল্লাহকে ডাক দেন। তখন স্বশরীরে এক ব্যক্তি

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



নেমে আসেন। ভয়ংকর তার আকৃতি, হাতে আগুনের বল্লম। সে ঐ বল্লম ডাকুর গায়ে নিক্ষেপ করে। ডাকুর এপার ওপার হয়ে যায়। সাহাবী জিজ্ঞেস করেন আপনি কে? আপনার পরিচয় জানতে চাই। তখন তিনি বলেন! তুমি আল্লাহর যে নাম উচ্চারণ করেছ, আমি ঐ নামে নিয়োজিত ফিরিশতা। যখন কেউ বিপদে পড়ে এই নামে আল্লাহকে ডাকে, আমি তার সাহায্যে চলে আসি। প্রথমবার তুমি যখন ডাক দিয়েছিলে, আমি সপ্তম আসমানের উপর ছিলাম। দ্বিতীয়বার যখন ডাক দিয়েছ আমি প্রথম আসমানে চলে এসেছি। তৃতীয়বার আমি দুনিয়াতে চলে এসেছি। এ থেকে বুঝা যায় ফিরিশতার গতি কি অদ্ভুত ও অকল্পনীয়। ঐ-ই সাহাবীর তিনবার ডাকের মধ্যে দুই এক মিনিট সময় লেগে থাকবে। এরই মধ্যে ফিরিশতা সপ্তম আসমানের উপর থেকে চলে এসেছেন। এরকম গতি সম্পন্ন ফিরিশতাই তো রাসূল (সা.)কে মে'রাজে নিয়ে গিয়েছিলেন, কাজেই যারা খটকা বোধ করেন যে, রাসূল (সা.) মে'রাজে গিয়েছিলেন। রাতের অল্প সময়ের ভিতরে সপ্তম আসমান এবং তারও উপর থেকে কীভাবে ঘুরে আসলেন। তাদের আর খটকা থাকার কথা নয়।

যাহোক যে কথা বলা হচ্ছিল বিপদ-আপদে মানুষকে সাহায্য করার জন্য আল্লাহর বিভিন্ন রিজার্ভ ফিরিশতা রয়েছে। যুদ্ধের ময়দানে মুসলমানদের সাহায্যের জন্যও আল্লাহ পাক ফিরিশতাদের প্রেরণ করে থাকেন। তবে যুদ্ধের ময়দানে ফিরিশতাদের সাহায্য পাওয়ার জন্য কিছু শর্ত শরায়েত রয়েছে। যেমন যোদ্ধাদের মধ্যে সবর থাকা, ময়দানে অটল থাকা, তাকওয়া পরহেযগারী থাকা ইত্যাদি। কুরআন শরীফে বলা হয়েছে, এই শর্তগুলো পূরণ হলে তাদের সাহায্যের জন্য আসমান থেকে ফিরিশতা পাঠানো হবে। বদরের যুদ্ধে ফিরিশতাদেরকে সাহায্যের জন্য পাঠানো হয়েছিল। সাহাবায়ে কেরাম ফিরিশতাদের যুদ্ধে শরীক হওয়া স্বচক্ষে দেখেছেন। হযরত সাহ্ল ইবনে হুনাইফ (রা.) বলেছেন, আমরা দেখেছি বদরের দিন আমাদের একজন কোন কাফেরকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে, তার তলোয়ার ঐ কাফের পর্যন্ত পৌঁছার আগেই তার কল্লা কেটে পড়ে গেছে।

এভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষের সাহায্যের কাজে আল্লাহর ফিরিশতাগণ নিয়োজিত রয়েছেন এবং থাকেন। ফিরিশতাগণ শুধু পার্থিব বিপদ-আপদ ও দুঃখ-কষ্ট থেকেই হেফাযত করেন না। তারা মানুষের মনে নেক কাজ করা এবং পাপ কাজ না করার চেতনা সৃষ্টি করেও মানুষের সাহায্য করে থাকেন। মানুষের মনে যে ভাল কাজের চেতনা এবং ভাল অনুভূতি সৃষ্টি হয়, এটা ফিরিশতারা তৈরি করে দেন। এর বিপরীত যে খারাপ কাজের চেতনা এবং খারাপ অনুভূতি সৃষ্টি হয় সেটা শয়তান তৈরি করে দেয়। হাদীছে এসেছে,

مَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ اِلَّا وَقَدْ وُكِّلَ بِهٖ قَرِيْنُهٗ مِنَ الْجِنِّ. (رواه مسلم برقم ٧٢٨٦)

অর্থাৎ, তোমাদের প্রত্যেকের সাথে কিছু জিন শয়তানের সহযোগী নিযুক্ত আছে (এমনিভাবে কিছু ফিরিশতাদের সহযোগীও নিযুক্ত আছে)। শয়তানের কাজ হল তাকে খারাপ কাজে উদ্বুদ্ধ করা। এক সাহাবী প্রশ্ন করেছিলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার সাথেও শয়তান নিযুক্ত আছে? রাসূল (সা.) বলেছিলেন, হ্যাঁ আছে তবে আল্লাহ আমাকে তার বিরুদ্ধে সাহায্য করেন। ফলে তার উস্কানী থেকে আমি নিরাপদ থাকি। এখানে বোঝানো হয়েছে, রাসূল (সা.) ছাড়া আর কেউ শয়তানের উস্কানী থেকে নিরাপদ নয়। আল্লাহ পাক পরীক্ষার জন্য শয়তানকে ক্ষমতা দিয়েছেন সে মানুষের রগ-রেশা দিয়ে চলতে পরে। সে মানুষের ভিতরে ঢুকে তার রগ-রেশা দিয়ে চলে তার ভিতরে নানা রকম পাপের উস্কানী দিতে পারে। হাদীছে এসেছে,

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِيْ مِنِ ابْنِ اٰدَمَ مَجْرَى الدَّمِ. (رواه البخاري في صحيحه برقم ٢٠٣٩)

অর্থাৎ, শয়তান মানুষের রক্ত চলাচলের শিরা দিয়ে চলতে পারে।

তাই শয়তান থেকে সাবধান থাকতে বলা হয়েছে। যাহোক বিভিন্ন কাজে বিভিন্ন দায়িত্বে ফিরিশতারা নিয়োজিত আছেন-এই আলোচনা করা হচ্ছিল।

কিছু ফিরিশতা এমন আছেন, যারা গর্ভের সন্তানের দায়িত্বে নিয়োজিত। একটা সন্তান যখন গর্ভে আসে তখন থেকেই তারা তাদের দায়িত্ব পালন করা শুরু করেন। এই ফিরিশতাদের প্রথম কাজ হল যখন মায়ের গর্ভে পিতার বীর্য আসে এবং মায়ের ডিম্বানুর সাথে মিলিত হয়, তখন তারা ঐ শুক্র ডিম্বের সাথে কিছু মাটি মিশ্রিত করে দেন। এজন্যই মানুষকে মাটির তৈরি বলা হয়। যে স্থান থেকে মাটি আনা হয়, সেই স্থানেই তার কবর হয়। জায়গার মাটি জায়গায় ফিরে যায়। তারপর যখন গর্ভ চার মাস হয়, তখন হাদীছে এসেছে আল্লাহ পাক বলেন,

اُكْتُبْ عَمَلَهُ وَاَجَلَهُ وَرِزْقَهُ وَشَقِيٌّ اَمْ سَعِيْدٌ. (سنن ابن ماجة برقم ٧٦ وإسناده صحيح)

অর্থাৎ, যে সন্তান গর্ভে এসেছে তার ভাগ্য লিখে দাও। সে কী আমল করবে, সে নেককার হবে, না পরহেযগার হবে, তার রিযিক কী হবে, তার মৃত্যু কখন হবে, সে ভাগ্যবান হবে না হতভাগা হবে তা লিখে দাও। সে মোতাবেক ফিরিশতারা লিখে দেন।

মানুষের ভাগ্য মানুষের সাথেই লেখা আছে। কোথায় লেখা আছে এ ব্যাপারে হাদীছে স্পষ্ট কিছু বলা হয়নি। অনেকে বলেছেন মানুষের কপালে তার ভাগ্য লিখে রাখা হয়। এ থেকেই সম্ভবত এই কথার প্রচলন ঘটেছে যে, কপালে যা লেখা আছে, কপালের লেখন না যায় খণ্ডন ইত্যাদি। এভাবে বিভিন্ন ফিরিশতাদেরকে আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন দায়িত্বে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত করে রেখেছেন। পূর্বে বলা হয়েছে, এইসব কাজ পরিচালনা করার জন্য আল্লাহ তা'আলার কোন ফিরিশতার প্রয়োজন ছিল না। তিনি হুকুম দিয়ে সবকিছু করতে পারেন। তিনি যখন কোন কিছু করতে চান, তখন শুধু বলেন হয়ে যা, ব্যাস সাথে সাথে তা হয়ে যায়। তবুও কেন ফিরিশতার মাধ্যমে এই সবকিছু করান? এর উত্তর হল এর দ্বারা মানুষকে সবকিছু একটা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে, একটা নিয়ম-শৃঙ্খলার মাধ্যমে করার শিক্ষা দিয়েছেন। অতএব এখন আমরা একথা বলতে পারব না যে, ভাগ্যে খাবার থাকলে খাব, না থাকলে খাব না। এই বলে বসে থাকলাম খাবার সামনে নিয়ে বসলাম না, খাবার প্লেটে হাতও দিলাম না, কিংবা কামাই রোজগার করতে গেলাম না, ঘরে বসে নাকে তেল দিয়ে ঘুমালাম, এটা চলবে না, আমাদেরকে এই নীতি শিক্ষা দেয়া হয়নি। বরং আমাদেরকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে, আসবাব গ্রহণ করতে শিক্ষা দেয়া হয়েছে। আল্লাহ পাক যেমন দুনিয়ার সবকিছু আসবাবের মাধ্যমে চালাচ্ছেন, আমাদেরকেও তদ্রূপ আসবাব গ্রহণ করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

এ ছাড়াও বিভিন্ন দায়িত্বে ফিরিশতাকে নিয়োজিত রাখার আরও অনেক ফায়দা আছে। যেমন যুদ্ধের ময়দানে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সাহায্য করবেন, এ কথায় আমাদের বিশ্বাস আছে, কিন্তু যখন জানব আমাদের সাথে আসবাব অর্থাৎ, ফিরিশতা আছেন, তখন আমাদের মনোবল বাড়বে। কারণ আসবাব সাথে থাকলেই মানুষের এতমীনান বৃদ্ধি পায়। এমনিভাবে যখন আমি জানব আমার সাথে হেফাযতকারী ফিরিশতা নিয়োজিত আছেন, তখন আমার মনোবল বাড়বে। রাতের অন্ধকারে পথ চলতে গেলে অনেক সময় একটা অজানা ভয় হয় যে, কীসে যেন ধরল, কী যেন একটা

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



সামনে আসল ইত্যাদি। এরকম সময় যদি কেউ মনে করে যে, আমার সাথে আল্লাহ পাকের নিয়োজিত ফিরিশতা রয়েছেন। তারা আমাকে হেফাযত করবেন, তাহলে তার মনোবল বৃদ্ধি পাবে। এভাবে বহু ফায়দা রয়েছে। আল্লাহর কোন কাজ রহস্য থেকে খালী নয়। ফিরিশতাদের সৃষ্টি এবং বিভিন্ন দায়িত্বে তাদেরকে নিয়োজিত করা কোন কিছুই রহস্য থেকে খালী নয়। একথা আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে।

এখন যদি কেউ সন্দেহ করেন যে, ফিরিশতাদেরকে আমরা দেখি না। আসলে ফিরিশতা আছে কি-না? তাহলে প্রথমত কথা হল না দেখলেও বিশ্বাস করতে হবে। ঈমানের বিষয়গুলো না দেখেই বিশ্বাস করতে বলা হয়েছে। দ্বিতীয়ত আমরা ফিরিশতাদেরকে না দেখলেও রাসূল (সা.) দেখেছেন, সাহাবায়ে কেরামও দেখেছেন। সহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে, সাহাবায়ে কেরাম হযরত জিব্রাঈল (আ.)কে দেখেছেন। পূর্বে হযরত যায়েদ ইব্নে ছাবেত (রা.)-এর ঘটনা বয়ান করা হয়েছে, তিনি ফিরিশতাকে দেখেছেন। বদরের যুদ্ধে সাহাবায়ে কেরাম ফিরিশতাদের সাহায্য করা স্বচক্ষে দেখেছেন। হাতে নাতে উপলব্ধি করেছেন। উম্মতের বহু বুযুর্গও ফিরিশতাদেরকে দেখেছেন। তাদের সাথে কথা বলেছেন। তৃতীয়ত কোন কিছু না দেখলেই বিশ্বাস করা যাবে না, এটা কোন যুক্তি হতে পারে না। দুনিয়ার কত কিছুই তো আমরা দেখি না, তারপরও আমরা বিশ্বাস করি। বাতাস আছে তা আমরা কেউ দেখি না তবুও বিশ্বাস করি। রূহ্ বা প্রাণ বলে একটা জিনিস আছে, তা আমরা কেউ দেখি না। কিন্তু দেখি না বলেই তা আমরা অস্বীকার করতে পারি না। এমনিভাবে ফিরিশতা, জিন এবং যত বিষয়ে আমাদের ঈমান রাখতে হয়, সব বিষয়গুলো আমরা না দেখলেও বিশ্বাস রাখতে হবে। এভাবে ফিরিশতাদেরকেও না দেখে তাদের প্রতি ঈমান রাখতে বলা হয়েছে। আল্লাহ পাক আমাদের ঈমানকে সহীহ করে দিন। আমীন!

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বয়ান নং ১১-এর খুতবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ الْاِنْسَانَ لِعِبَادَتِهٖ، وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ بِحِكْمَتِهٖ، وَخَلَقَ الْمَلٰئِكَةَ لِتَحْمِيْدِهٖ وَتَمْجِيْدِهٖ فِىْ كُلِّ حَالَتِهٖ. وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهُ الَّذِىْ هُوَ اَقْرَبُ اِلٰى اَحَدِهِمْ مِّنْ حَبْلِ وَرِيْدِهٖ. وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى نَبِيِّهِ الَّذِىْ هُوَ اَفْضَلُ رُسُلِهٖ وَاَكْرَمُ عَبِيْدِهٖ. وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ اخْتَارَهُمُ اللّٰهُ لِصُحْبَةِ نَبِيِّهٖ وَعِشْرَتِهٖ.

اَمَّا بَعْدُ :

اَيُّهَا النَّاسُ! اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى خَلَقَ الْمَخْلُوْقَاتِ بِاَنْوَاعٍ مُّتَعَدِّدَةٍ ، وَخَلَقَ الْمَلٰئِكَةَ مِنْ نُوْرٍ يَّتَشَكَّلُ بِاَشْكَالٍ مُّخْتَلِفَةٍ ، خَلَقَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَهُمْ لِمَا اَمَرَهُمْ يَمْتَثِلُوْنَ، وَلَا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ.

وَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى خَلَقَ الْمَلٰئِكَةَ، وَاَلْقٰى عَلٰى عَاتِقِهِمْ مَّسْئُوْلِيَّةً مُّخْتَلِفَةً، فَجَعَلَ بَعْضَهُمْ حَافِظِيْنَ حَفَظَةً، وَ بَعْضَهُمْ كَاتِبِيْنَ بَرَرَةً، وَجَعَلَ بَعْضَهُمْ عَلٰى اَبْوَابِ الْجَنَّةِ، وَبَعْضَهُمْ عَلٰى اَرْحَامِ الْحَمَلَةِ، وَجَعَلَ بَعْضَهُمْ رَاكِعِيْنَ، وَبَعْضَهُمْ سَاجِدِيْنَ. اِلٰى غَيْرِ ذَالِكَ مِنَ الْاَشْغَالِ الْمُخْتَلِفَةِ ، قَالَ تَعَالٰى: لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ. وَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا وَقَدْ وُكِّلَ بِهٖ قَرِيْنُهٗ مِنَ الْجِنِّ وَقَرِيْنُهٗ مِنَ الْمَلٰئِكَةِ. وَقَالَ تَعَالٰى: كِرَامًا كَاتِبِيْنَ يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ. وَقَالَ تَعَالٰى : سَاُصْلِيْهِ سَقَرَ، وَمَا اَدْرٰكَ مَا سَقَرُ، لَا تُبْقِىْ وَلَا تَذَرُ، لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ، عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ. وَرَاٰى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ الْمَعْمُوْرَ، فَاِذَا هُوَ يَدْخُلُهٗ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ لَّا يَعُوْدُوْنَ اِلَيْهِ. كَمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يُجْمَعُ

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



خَلْقُ اَحَدِكُمْ فِىْ بَطْنِ اُمِّهٖ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُوْنُ عَلَقَةً ، ثُمَّ يَكُوْنُ مُضْغَةً مِّثْلَ ذَالِكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللّٰهُ اِلَيْهِ الْمَلَكَ، فَيُؤْمَرُ بِاَرْبَعِ كَلِمَاتٍ فَيَقُوْلُ : اُكْتُبْ عَمَلَهٗ وَاَجَلَهٗ وَرِزْقَهٗ وَشَقِىٌّ اَمْ سَعِيْدٌ. اَلْحَدِيْثُ.

وَمِنَ الْمَلٰئِكَةِ اَرْبَعَةٌ مُّقَرَّبَةٌ شَهِيْرَةٌ، وَهُمْ جِبْرَئِيْلُ، وَمِيْكَائِيْلُ، وَاِسْرَافِيْلُ، وَعَزْرَائِيْلُ وَهُوَ مَلَكُ الْمَوْتِ. وَالدَّلَائِلُ عَلٰى وُجُوْدِ الْمَلٰئِكَةِ كَثِيْرَةٌ. وَاِنَّ الصَّحَابَةَ رِضْوَانُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ رَاَوُا الْمَلٰئِكَةَ يَوْمَ بَدْرٍ عَلَيْهِمْ عَمَائِمُ بِيْضٌ وَسُوْدٌ، وَاِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاٰى جِبْرَئِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِىْ صُوْرَتِهِ الَّتِىْ هِىَ صُوْرَتُهٗ. وَرَاٰهُ وَقَدْ سَدَّ اُفُقَ السَّمَاءِ وَلَهٗ سِتُّ مِاَةِ جَنَاحٍ. قَالَ تَعَالٰى : وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى. فَالْمَلٰئِكَةُ لَهُمْ هَيَاكِلُ عَظِيْمَةٌ وَقُوَّةٌ عَجِيْبَةٌ. وَفِى الْحَدِيْثِ – لَهُمْ مِثْلُ قُوَّةِ الثَّقَلَيْنِ. رَوَاهُ فِى الدُّرِّ مَرْفُوْعًا. وَفِىْ رِوَايَةٍ لَمَّا دَمَّرَ اللّٰهُ قَرْيَةَ لُوْطٍ نَشَرَ جِبْرَئِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ جَنَاحَهٗ فَانْتَسَفَ بِهَا اَرْضَهُمْ بِمَا فِيْهَا مِنْ قُصُوْرِهَا وَدَوَابِّهَا وَحِجَارَتِهَا وَشَجَرِهَا وَجَمِيْعِ مَا فِيْهَا ، فَضَمَّهَا فِىْ جَنَاحِهٖ ثُمَّ صَعَدَ بِهَا اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا ثُمَّ قَلَّبَهَا فَاَرْسَلَهَا اِلَى الْاَرْضِ مَنْكُوْسَةً. وَدَمْدَمَ بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ فَجَعَلَ عَالِيَهَا سَافِلَهَا ثُمَّ اَتْبَعَهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ. سُبْحٰنَ اللّٰهِ مَا اَعْجَبَ قُدْرَةَ الْمَلٰئِكَةِ!

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ : كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ . اَلْاٰيَةُ.

بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ، وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. اَقُوْلُ قَوْلِىْ هٰذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ لِىْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَاسْتَغْفِرُوْهُ، اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বয়ান নং -১২

## পরকালের প্রতি ঈমান

(১ম পর্ব- কবরের আযাব প্রসঙ্গ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِى الْاٰخِرَةِ. وَقَالَ تَعَالٰى : سَاُصْلِيْهِ سَقَرَ، وَ مَآ اَدْرٰىكَ مَا سَقَرُ، لَا تُبْقِىْ وَ لَا تَذَرُ، لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ، عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : اَلْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِّنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ اَوْ حُفْرَةٌ مِّنْ حُفَرِ النَّارِ.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

আমরা ঈমান সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। যে ছয়টি মৌলিক বিষয়ে ঈমান রাখতে হয় তার মধ্যে আল্লাহর প্রতি ঈমান, নবী-রাসূলদের প্রতি ঈমান, আসমানী কিতাবের প্রতি ঈমান এবং ফিরিশতাদের প্রতি ঈমান এই চারটি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আর একটা মৌলিক এবং গুরত্বপূর্ণ বিষয় হল পরকালের প্রতি ঈমান-বিশ্বাস রাখা। পরকালকে আরবীতে বলা হয় আখেরাত। এই আখেরাত বা পরকালের উপর ঈমান রাখার অর্থ হল ৮টা জিনিসকে বিশ্বাস করা। কবরের আযাবকে বিশ্বাস করা। শিংগায় ফুঁক দেয়ার পরে পুনরুত্থান হবে, অর্থাৎ দুনিয়ার শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত সমস্ত জিন-ইনসান ও প্রাণী হাশরের ময়দানে একত্রিত হবে–একথা বিশ্বাস করা। আল্লাহ পাক সকলের হিসাব-নিকাশ নিবেন– একথা বিশ্বাস করা। হিসাব-নিকাশের জন্য মিজান বা দাড়ি-পাল্লা অর্থাৎ, নেকী-বদী ওজন করার মাপ যন্ত্র স্থাপন করা হবে–একথা বিশ্বাস করা। জাহান্নামের উপরে পুল থাকবে, এই পুলের উপর দিয়ে সকলকে পার হতে হবে, যারা পাপী তারা পার হতে যেয়ে জাহান্নামের ভিতরে পড়ে যাবে, আর যারা নেককার তারা পার হয়ে যেতে পারবে–এ কথা বিশ্বাস করা। জান্নাতকে বিশ্বাস করা, জাহান্নামকে বিশ্বাস করা এবং হাউজে কাওছারকে বিশ্বাস করা। এই আটটা জিনিসকে বিশ্বাস করার অর্থ হল পরকালে বিশ্বাস করা।

মৃত্যুর পর থেকেই পরকাল শুরু হয়ে যায়। একজন মানুষ মৃত্যুবরণ করল, অর্থাৎ তার আখেরাত বা পরকাল শুরু হয়ে গেল। এই মৃত্যুর পর কবরের আযাব থেকে নিয়ে জান্নাত-জাহান্নাম পর্যন্ত যে বিষয়গুলো ঘটবে-যা কুরআন হাদীছে বলা হয়েছে – এই সবগুলো বিশ্বাস করাকেই এক কথায় বলা হয় আখেরাত বা পরকালে বিশ্বাস করা। এর মধ্যে সবগুলো বিষয়ই এমন-যা আমরা দেখতে পাই না। আবার কিছু বিষয় এমন আছে যা যুক্তিতেও ধরে না, তারপরেও বিশ্বাস করতে হবে। যেমন কবরের আযাব যুক্তিতে ধরে না। বলা হয়েছে কবরে সর্ব প্রথমে আযাব হল যখন মাইয়্যেতকে কবরে রাখা হবে তখন কবরের দুই পাশের মাটি তাকে এমন ভাবে চাপ দিবে যে, পাজরের এপাশের হাড় ওপাশে ঢুকে যাবে। এখানে মাটিতে কী করে চাপ দিবে– তা যুক্তিতে ধরে না। এগুলি যুক্তিতে না ধরলেও বিশ্বাস করতে হবে। ঈমানের সাথে সম্পর্কিত কোন বিষয়ে সামান্যতম সন্দেহ থাকলেও ঈমান মুকাম্মাল বা পরিপূর্ণ হয় না।

কবরে অনেক ধরনের আযাবের কথা হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। কবরের সাপের কথা বর্ণনা দিয়ে এক হাদীছে বলা হয়েছে,

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



**يسلط على الكافر في قبره تسعة وتسعون تنينا.** (رواه أحمد في مسنده برقم ١١٣٥٢ وإسناده حسن)

অর্থাৎ, কাফেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য তার কবরে ৯৯টা সাপ নিযুক্ত করে দেয়া হবে।

অন্য এক হাদীছে এই সাপ সম্বন্ধে এসেছে–

**لَوْ أَنَّ وَاحِدًا مِّنْهَا نَفَخَ بِالْأَرْضِ مَا اَنْبَتَتْ خَضِرًا.** (رواه الترمذي برقم ٢٤٦٠ وقال غريب)

অর্থাৎ, রাসূল (সা.) বলেছেন, সেই সাপের বিষ তো দূরের কথা তার নিঃশ্বাসেও এমন বিষক্রিয়া থাকবে যে, দুনিয়াতে যদি তার একটা নিঃশ্বাস পড়ত, তাহলে তার বিষক্রিয়ায় সমস্ত সবুজ গাছপালা মরে শুকিয়ে যেত। পৃথিবীর মাটি আর সবুজ গাছ পালা উৎপন্ন করতে পারত না।

এমন মারাত্মক বিষের কথা কল্পনাও করা যায় না, তবুও বিশ্বাস করতে হবে। ঈমানের বিষয়গুলো যুক্তিতে না ধরলেও বিশ্বাস করতে হবে। দেখা না গেলেও বিশ্বাস করতে হবে। কবরের আযাবও দেখা যায় না, তবুও বিশ্বাস করতে হবে। কবরের আযাব যে সত্য-একথা বিশ্বাস করানোর জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দুই একটা ঘটনা মানুষের সামনে প্রকাশ করে দেন। শায়েখ যাকারিয়া (রহ.) ফাজায়েলে আ'মাল কিতাবে একটা ঘটনা লিখেছেন– এক জায়গায় কবর দিতে যেয়ে একজনের টাকার থলি কবরের মধ্যে পড়ে যায়। কবর দিয়ে চলে আসার পর তার মনে পড়ে যে, আমার টাকার থলি তো কবরে পড়ে রয়েছে। টাকার থলি আনার জন্য লোকটা আবার যেয়ে কবর খোঁড়ে, খুঁড়ে দেখে কবরের মধ্যে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। কবর সম্পর্কে হাদীছে বলা হয়েছে,

**اَلْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِّنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ اَوْ حُفْرَةٌ مِّنْ حُفَرِ النَّارِ.** (رواه الترمذي برقم ٢٤٦٠ وقال حسن غريب)

অর্থাৎ, কবর হয় জান্নাতের একটা বাগান, কিংবা জাহান্নামের একটা গর্ত। কবরবাসী নেককার হলে তার কবরে জান্নাতের সুখ আসতে থাকে। আর বদকার হলে তার কবরে শাস্তি হতে থাকে। বোখারী, মুসলিমের হাদীছে এসেছে- কেউ মারা গেলে কবরে সকাল-বিকাল তাকে ঐ স্থান দেখানো হয়, কিয়ামতের হিসাব-নিকাশের পর সে যেখানে যাবে, সে জাহান্নামী হলে জাহান্নামের যে স্থানে সে থাকবে সেই স্থান তাকে দেখানো হয় এবং বলা হয় অবশেষে তুমি এখানেই যাবে। এটা করা হয় এজন্য, যাতে করে তার মানসিক যন্ত্রণা আরও বৃদ্ধি পায়, তার দুঃখ আরও বাড়তে থাকে। আর সে জান্নাতী হলে জান্নাতের যে স্থানে সে থাকবে, সে স্থান তাকে দেখানো হয় এবং বলা হয় যে, অবশেষে তুমি এখানেই পৌছবে। এতে করে তার আনন্দ আরও বৃদ্ধি পায়। হাদীছে বলা হয়েছে- প্রথম যখন মাইয়্যেতকে কবরে রাখা হয়, তখন মুনকার-নাকীর নামক দুইজন ফিরিশতা কবরে আসেন। মুনকার-নাকীর শব্দের অর্থ হল, অপরিচিত, অদ্ভূত ও বিকট আকৃতির। এই ফিরিশতারা এসে শোয়া থেকে তাকে উঠাবে, উঠিয়ে তাকে তিনটা প্রশ্ন করবে। এক নং প্রশ্ন مَنْ رَّبُّكَ অর্থাৎ, তোমার রব কে? দুই নং প্রশ্ন مَا دِيْنُكَ অর্থাৎ, তোমার দ্বীন-ধর্ম কী? তিন নং প্রশ্ন হল– রাসূল (সা.) কে দেখিয়ে বলা হবে مَنْ هٰذَا الرَّجُلُ অর্থাৎ এ ব্যক্তি কে? যদি সে নেককার হয়, তাহলে ঐ ফিরিশতারা যত ভয়াবহ আকৃতির হোক না কেন, তাতে সে ঘাবড়াবে না। সেসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে। সে উত্তর দিবে আমার রব হলেন আল্লাহ, আমার দ্বীন হল ইসলাম, আর এই ব্যক্তি-যাকে দেখানো হয়েছে, ইনি হলেন আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা (সা.)। এই জওয়াব দেয়া তার জন্য আছান হয়ে যাবে। আল্লাহ পাক কুরআন শরীফে বলেছেন,

**يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِى الْاٰخِرَةِ.**

'অর্থাৎ, যারা ঈমান আমলের উপরে মজবূত থাকে আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়া এবং আখেরাতে এই কালিমার উপরে অর্থাৎ, ঈমানের উপরে প্রতিষ্ঠিত রাখেন'। (সূরা ইবরাহীম : ২৭)

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

এ আয়াতের এক ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে পরকালে তাদেরকে ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখার অর্থ হল– কবরে ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখা। যার ফলে তারা আছানী-র সাথে মুনকার নাকীরের সব প্রশ্নের জওয়াব দিতে সক্ষম হবে। এ থেকে বুঝা গেল মুনকার নাকীরের প্রশ্নের জওয়াব আছান হওয়ার জন্য বেঁচে থাকতে ঈমান আমলের উপর মজবূত থাকতে হবে। হযরত শাকীক বলখী (রহ.) বলেছেন, কেউ যদি বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াত করে, তাহলে মুনকার-নাকীরের প্রশ্নের জওয়াব দেয়া তার জন্য আছান হবে। হাদীছে কবরের আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সূরা-মুলক তেলাওয়াতের কথা বলা হয়েছে। রাসূল (সা.) বলেছেন,

هِيَ الْمَانِعَةُ الْمُنْجِيَةُ تُنْجِيْهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. (رواه الترمذي برقم ٢٨٩٠ وقال حسن غريب)

'অর্থাৎ, সূরা মুলক হল রক্ষাকারী, যে ব্যক্তি এই সূরা পাঠ করবে, এ সূরা তাকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করবে'। রাসূল (সা.) নিয়মিত ঘুমানোর আগে সূরা-মুলক তেলাওয়াত করতেন। বিছানায় শুয়ে-শুয়েও তেলাওয়াত করা যেতে পারে। কিংবা ইশার পর ঘুমানোর আগে যে কোন সময় তেলাওয়াত করে নিলেও এই ফযীলত হাছিল হবে।

কবরের যে অন্ধকার, সেই অন্ধকার থেকে বাঁচার জন্যও আমল রয়েছে। সেই আমল হল নামায। হাদীছে বলা হয়েছে, الصلوة نور। অর্থাৎ, নামায হল নূর। কবরের অন্ধকার এবং হাশরের ময়দানের অন্ধকারে নামায আলো হয়ে দাঁড়াবে। এছাড়াও নামাযের অনেক ফায়দা রয়েছে। যদি ভালভাবে যত্নসহকারে নামায আদায় করা হয়, তাহলে নামাযের বিশেষ পাঁচটা ফায়দার কথা বলা হয়েছে। তার মধ্যে এটাও একটা। এক নম্বর ফায়দা হল- দুনিয়াতে রিযিকে বরকত হবে। দ্বিতীয় ফায়দা হল– কবরের আযাব মওকূফ হয়ে যাবে। তৃতীয় ফায়দা হল- আমলনামা ডান হাতে আসবে। চতুর্থ ফায়দা হল– পুলসিরাতের উপর দিয়ে বিজলির গতিতে অর্থাৎ, বিদ্যুৎ-গতিতে পার হয়ে যেতে পারবে। পঞ্চম ফায়দা হল– যদি নামায আল্লাহর কাছে কবুল হয়ে যায়, আল্লাহর পছন্দমত নামায পড়া যায়, তাহলে এই নামায বিনা হিসাবে জান্নাতে যাওয়ার ওছীলা হবে।

যাহোক বলা হচ্ছিল–নেককার ব্যক্তি, মু'মিন ব্যক্তি মুনকার নাকীরের সব প্রশ্নের জওয়াব দিতে সক্ষম হবে। আর কবরবাসী যদি মুনাফিক ও কাফের হয়, তাহলে প্রত্যেক প্রশ্নের জওয়াবে সে শুধু বলবে, ها ها لا ادر 'অর্থাৎ, হায় হায়! আমার জানা নেই'। তখন তার উপর কবরের আযাব শুরু হয়ে যাবে।

কবরের আযাব যে সত্য-এ সম্পর্কে কুরআন শরীফের সাতটা আয়াত এবং ১০ খানা হাদীছ রয়েছে। এই সাতটা আয়াত ও দশখানা হাদীছ থেকে বুঝা যায় যে, কবরের আযাব হবে। এরপরেও আমরা দেখি না এই অজুহাতে কবরের আযাবকে অস্বীকার করার অবকাশ নেই। দুনিয়াতে অনেক কিছুই আমরা দেখি না, তারপরেও বিশ্বাস করি। একদিন রাসূল (সা.) সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন, এক স্থানে দুইটা কবর ছিল। রাসূল (সা.) বললেন,

اِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِيْ كَبِيْرٍ اَمَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَكَانَ يَمْشِيْ بِالنَّمِيْمَةِ. (رواه الترمذي في سننه برقم ٧٠ وقال : حديث حسن صحيح)

'অর্থাৎ, রাসূল (সা.) বললেন, এই দুটো কবরে আযাব হচ্ছে। বাহ্যিকভাবে এমন কোন বড় গোনাহের কারণে তাদের আযাব হচ্ছে না। তবে প্রকৃতপক্ষে সেটা বড় গোনাহ। অর্থাৎ, সাধারণভাবে মানুষ সে দুটো গোনাহকে বড় গোনাহ মনে করে না, কিন্তু বাস্তবে সে দুটো বড় গোনাহ'। রাসূল (সা.)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



বললেন, 'এদের একজন পেশাবের ছিটা থেকে নিজেকে হেফাযত করত না। আরেকজন চোগলখোরী অর্থাৎ, কোটনাগিরী করত, এর কথা নিয়ে ওর কাছে, ওর কথা নিয়ে এর কাছে লাগাতো'। রাসূল (সা.) থেকে এই বর্ণনা শোনার পর ঐ দুই কবরবাসীর একজনের স্ত্রীর কাছে যেয়ে খবর নিয়ে জানা গেছে যে, তিনি খুব ভাল মানুষ ছিলেন। তিনি বকরী চরাতেন। যে পোষাকে বকরী চরাতেন সেই পোষাকেই আবার নামায পড়তেন। রসূল (সা.) যা বলেছেন তা যথার্থ বলেই প্রমাণিত হয়ে গেল। তাই শুধু নিজের পেশাব নয় গরু ছাগলসহ সব জানোয়ারের পেশাব থেকে সাবধান থাকা চাই। হোক সামান্য একটু ছিটা, তবুও তাকওয়া পরহেযগারী হল, এই ধরনের ছিটা লাগা পোষাকে নামায না পড়া।

নামায হল শাহী দরবারের আমল। তাই শাহী দরবারের সম্মান রক্ষার্থে পোষাকটাও অত্যন্ত পাক-সাফ হওয়া চাই। আমরা যদি প্রধানমন্ত্রীর দফতরে যাই, কিংবা প্রেসিডেন্ট ভবনে যাই, তাহলে কত সুন্দর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোষাকে যাই। তাহলে আল্লাহর সামনে যাওয়ার সময় কেমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোষাক হওয়া চাই? আল্লাহ রাব্বুল আলামীন-এর সামনে দাঁড়ানোর সময় মনের অবস্থাও কেমন হওয়া চাই? হযরত আলী (রা.)-এর অবস্থা ছিল যখন আযান হয়ে যেত, কাঁপতে শুরু করতেন। এই ভেবে যে, এখন মহান আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে। তিনি দুনিয়ার কোন সম্রাট নন, দুনিয়া-আখেরাত সবকিছুর পয়দা করনেওয়ালা। সেই মহান সত্তার সামনে দাঁড়াতে হবে। এই ভয়ে তিনি কাঁপতে শুরু করতেন। নামায পড়ার সময় এরকম অনুভূতি নিয়েই নামায পড়তে বলা হয়েছে। হাদীছে বলা হয়েছে,

اُعْبُدُوا اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ. (متفق عليه)

অর্থাৎ, এমন ভাবে ইবাদত করবে যেন তুমি আল্লাহর সামনে, আল্লাহ তোমাকে দেখছেন, তুমি আল্লাহকে দেখছ, তুমি আল্লাহকে না দেখলে আল্লাহ তো তোমাকে দেখছেন।

এরকম অনুভূতি নিয়ে নামায পড়তে বলা হয়েছে। যাহোক যে কথা বলা হচ্ছিল কাফের মুনাফিকরা মুনকার-নাকীরের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না। তাদের উপর কবরের আযাব শুরু হবে। তাদের কবরের সাথে জাহান্নামের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে দেয়া হবে। জাহান্নামের আগুনের তাপ এবং দুর্গন্ধ তাদের কবরে আসতে থাকবে। এর বিপরীত যারা নেককার মানুষ তারা মুনকার-নাকীরের প্রশ্নের জওয়াব দেয়ার পর জান্নাতের সাথে তাদের কবরের যোগাযোগ স্থাপন করে দেয়া হবে। জান্নাতের হাওয়া এবং ঘ্রাণ তাদের কবরে আসতে থাকবে। তাদেরকে বলা হবে,

نَمْ كَنَوْمَةِ الْعَرُوْسِ الَّذِيْ لَايُوْقِظُهُ اِلَّا اَحَبُّ اَهْلِهِ اِلَيْهِ. (رواه الترمذي برقم ١٠٧١ وقال: حسن غريب)

অর্থাৎ, এখন তুমি আরামে ঘুমাও। নতুন বিবাহ করলে নতুন দম্পতি যেমন মনের সুখ নিয়ে ঘুমায় ওরকম সুখ নিয়ে তুমি ঘুমাও। এভাবে কিয়ামত পর্যন্ত এক ঘুমে তাদের সময় পার হয়ে যাবে। যখন কবর থেকে উঠানো হবে তখন তাদের কাছে মনে হবে এই তো কেবল মাত্র নিদ্রা গেলাম, আর সাথে সাথে শিংগায় ফুঁক দেয়া হল? যদিও এর ভিতরে হাজার হাজার বছর চলে যেতে পারে।

মানুষ মরে যাওয়ার পর তার লাশ কবরস্থ করা হোক বা যেখানেই যেভাবে থাকুক, পাপী হলে তার আযাব শুরু হবে এবং নেককার হলে তার শান্তি আরম্ভ হবে। যদি লাশ কংকাল বানিয়ে মেডিকেলে রাখা হয়, কিংবা সাগরে ভাসিয়ে দেয়া হয়, কিংবা পুড়িয়ে বাতাসে উড়িয়ে দেয়া হয়, তবুও তার কবরের আযাব হবে। কবরের আযাব হওয়ার জন্য এই দেহ থাকা জরুরী নয়। মুলত কবরের আযাব হয় রূহের উপরে, দেহ সেই আযাব টের পায়। দেহ যেখানে যেভাবেই থাকুক আযাব টের পাবে। যেমন দুনিয়াতে শান্তি হয় দেহের উপরে, রূহ সেটা টের পায়, আমার দেহে যদি আঘাত করা হয়, তাহলে আমার রূহ

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বা অন্তর সেটা টের পায়, অন্তর যেখানেই থাকুক তা টের পায়। তদ্রূপ কবরের আযাব হয় রূহের উপরে, দেহ যেখানেই থাকুক সেটা টের পাবে। জাহান্নামের আযাবও মূলত হবে রূহের উপরে, দেহটা টের পাবে। জাহান্নামের আগুন সম্পর্কে বলা হয়েছে, تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ অর্থাৎ, জাহান্নামের আগুন হৃদয়ে প্রজ্জ্বলিত হবে।

কবর আযাবের ব্যাপারে আমাদের মনে কয়েকটা সন্দেহ জাগতে পারে। একটা সন্দেহ হল কবরে আযাব হলে আমরা কবরের পাশে গেলে টের পাই না কেন? এর উত্তরে প্রথম কথা হল কবরের আযাব সবকিছুতেই টের পায়, শুধু জিন, ইনসান টের পায় না। পরীক্ষা স্বরূপ জিন, ইনসানকে টের পেতে দেয়া হয় না। তাদেরকে পরীক্ষা করা হয় যে, না দেখে শুনেও তারা বিশ্বাস করে কি-না। রাসূল (সা.) বলেছেন,

يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيْهِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ. (رواه البخاري في صحيحه برقم ١٣٣٨)

'অর্থাৎ, কবরে শাস্তি দেয়ার সময় মানুষ এতজোরে চিৎকার করে যা একমাত্র জিন ও ইনসান ছাড়া নিকটের আর সবাই শুনতে পায় এবং বুঝতে পারে'।

এ জন্য অনেক সময় দেখা যায় কবরস্থানে জানোয়ার বেঁধে রাখলে তারা চিৎকার শুরু করে এবং ছোটা ছুটি আরম্ভ করে দেয়। এর বহুত প্রমাণ পাওয়া গেছে। দ্বিতীয় কথা হল– কবর একটা আলাদা জগত। আমরা যে জগতে আছি সেটাকে বলা হয় দুনিয়ার জগত। আর কবরের জগতকে বলা হয় বরযাখজগত বা আলমে বরযখ। আর স্বাভাবিক নিয়ম হল– এক জগতের জিনিস আরেক জগতে টের পাওয়া যায় না। যেমন স্বপ্নের জগত একটা আলাদা জগত। এজন্যই একজন মানুষ স্বপ্নে কত কিছু দেখে। স্বপ্নে আনন্দ ফুর্তি করে অথবা কষ্ট-যন্ত্রণা ভোগ করে, অনেক সময় কান্নাকাটি বা চিৎকার করে, অথচ তার পাশে আরেকজন শুয়ে বা জাগ্রত আছে, সে কিছুই টের পাচ্ছে না। কারণ যে স্বপ্ন দেখছে সে রয়েছে এক জগতে এবং অন্যরা রয়েছে আরেক জগতে। এই স্বপ্ন থেকে আরও প্রমাণ হয় যে, রূহের সাথে যা কিছু সংঘঠিত হয় দেহ সেটা টের পায়। মানুষ স্বপ্ন দেখে রূহ দিয়ে অর্থাৎ, রূহানী চোখ বা অন্তরের চোখ দিয়ে রূহানীভাবে সবকিছু দেখে। স্বপ্নের সবকিছু ঘটে রূহানীভাবে। কিন্তু দেহেও সেটার প্রভাব হয়ে যায়। মানুষ স্বপ্নে ভয়াবহ কিছু দেখে কেঁদে ওঠে, তার দেহেও সেই কাঁদার আছর প্রকাশ পায়। এখানে সে দেখছে তার অন্তর দিয়ে, কিন্তু দেহেও সেটার আছর প্রকাশ পাচ্ছে। এমনিভাবে কবরের আযাব হবে রূহের উপর কিন্তু দেহের উপরও তার আছর হবে। এভাবে স্বপ্ন দিয়ে কবরের আযাব বুঝা সহজ হয়।

কবরের আযাবের ব্যাপারে আমাদের মনে আরেকটা সন্দেহ এই হতে পারে যে, এই দেহ মাটিতে পঁচে গলে যাবে তখন কোন্ দেহ শাস্তি অনুভব করবে? এই সন্দেহের জওয়াবও স্বপ্ন দিয়ে বুঝা সহজ। আমরা স্বপ্নে বিভিন্ন স্থানে যাই, অনেক কিছু দেখি, ধরি, ছুই। কিন্তু সেটা এই দেহে নয়, এই চোখে নয়, এই হাত পা দ্বারা নয়। এই দেহ তো আলাদা দেহ, যেটা ঘুমিয়ে থাকে। এই দেহ নিয়ে আমরা স্বপ্ন দেখি না, বরং আলাদা একটা দেহ নিয়ে আমরা স্বপ্নে বিচরণ করি, সেই দেহের চোখ দিয়ে দেখি, সেই দেহের হাত দিয়ে ধরি, সেই দেহের পা দিয়ে চলি। সেই দেহকে বলা হয় জিছমে মিছালী বা রূপক দেহ। কবরে যে শাস্তি হবে সেটা হবে এরূপ রূপক দেহের উপর। তাই এই জড় দেহ মাটিতে পঁচে গেলেও শান্তি বা শাস্তি হতে কোন বাঁধা নেই। শাস্তি হবে ঐ রূপক দেহে, যেরকম দেহ নিয়ে মানুষ স্বপ্নে বিচরণ করে। ওরকম একটা দেহ আল্লাহ পাক তৈরি করে দিবেন। সেই দেহের উপরে সবকিছু ঘটবে। তবে হ্যাঁ, এই দেহের উপরেও সেটার আছর প্রকাশ পাবে, যদি এই দেহ অবশিষ্ট থাকে। যাদের এই দেহ

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com



অবশিষ্ট থাকবে তারা এই দেহ দিয়েই অনুভব করবে। যেমন আম্বিয়া (আ.) কবরে যিন্দা থাকেন। সম্পূর্ণ দুনিয়ার মত যিন্দা থাকেন। এমনিভাবে যাদের এই দেহ যতক্ষণ অবশিষ্ট থাকবে ততক্ষণ উপলব্ধি করবে। আর যখন এই দেহ অবশিষ্ট থাকবে না- পঁচে গলে মাটি হয়ে যাবে। তখন তার ঐ রূপক দেহের উপরেই শাস্তি বা শান্তি সীমাবদ্ধ থাকবে। তবে এ কথাও মনে রাখতে হবে মানুষের দেহ পঁচে গলে গেলেও একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না, তার ক্ষুদ্রস্ব ক্ষুদ্র অংশ হলেও থেকে যায়, সেই অংশ শান্তি বা শাস্তি উপলব্ধি করতে পারে।

আমরা যে রূপক দেহের কথা আলোচনা করলাম, যেরকম দেহ নিয়ে আমরা স্বপ্নে বিচরণ করে থাকি, স্বপ্নের বাইরেও এরকম দেহের অস্তিত্ব আছে। বুযুর্গানে দ্বীনের বিভিন্ন ঘটনা থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.), হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহ.) সহ অনেক বুযুর্গদের ঘটনা এরকম পাওয়া যায় যে, একই সময় তাঁদেরকে অনেক জায়গায় দেখা গেছে। কীভাবে দেখা গেল? তাঁদের আসল দেহ তো একটাই, বাকিগুলো কোন দেহ, যে দেহ নিয়ে তাঁরা বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছেন? সেটা হল এরকম রূপক দেহ। বুযুর্গানে দ্বীনের পক্ষে একই সময়ে বিভিন্ন জায়গায় রূপক দেহ নিয়ে বিচরণ করা সম্ভব। এটা তাদের কারামত। বুযুর্গানে দ্বীনের পক্ষে এই জড় দেহ নিয়েও মুহূর্তে যে কোন স্থানে চলে যাওয়া সম্ভব। একটা ঘটনা শুনুন! হযরত জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ.) ছিলেন মিসরের অধিবাসী। ভূমধ্যসাগরের উপকূলে মিসরের নীল নদের অনেকগুলো শাখা আছে। এই শাখাগুলোর মাঝে একটা জায়গা আছে আসয়ূত মহল্লা। তিনি এই মহল্লার অধিবাসী ছিলেন বলে তাঁকে সুয়ূতী বলা হয়। তিনি প্রতি বছর এই মহল্লা থেকে অদ্ভুত তরীকায় হজ্জ করতে যেতেন। হজ্জের একদিন পূর্বেও তাকে মিসরে দেখা যেত। কিন্তু হজ্জের সময় ঠিকই তিনি হজ্জের স্থানে উপস্থিত হয়ে যেতেন। এভাবে প্রতি বছরই তিনি হজ্জ করতেন। কীভাবে তিনি হজ্জ করতেন তা জানা গেল, একবার তিনি তার খাস খাদেমকে বললেন, 'তুমি কি আমার সাথে হজ্জে যাবে'? খাদেম বলল, 'জি হুজুর যাব'। তিনি খাদেমকে বললেন, 'চোখ বন্ধ কর'। সে চোখ বন্ধ করল। সুয়ূতী (রহ.) তার হাত ধরে ২৭ কদম হাঁটলেন। তারপর তাকে বললেন, এবার চোখ খোল। সে চোখ খুলে দেখল বায়তুল্লাহর সামনে দাঁড়ানো। হজ্জ শেষে ফেরার সময়ও এভাবে ২৭ কদম হেঁটে মিসরে চলে গেলেন। ২৭ কদমে মিসর থেকে মক্কা শরীফ, আবার ২৭ কদমে মক্কা থেকে মিসর। বুযুর্গানে দ্বীনের পক্ষে কারামত স্বরূপ এরকম অনেক কিছুই সম্ভব। বুযুর্গানে দ্বীনের পক্ষে একই সময়ে রূপক দেহ নিয়ে বিভিন্ন স্থানে গমন করাও সম্ভব। এরকম রূপক দেহের উপরেই কবরের আযাব হবে। তাই এই জড় দেহ যেখানেই যেভাবে থাকুক না কেন, পঁচে গলে মাটি হয়ে যাক, পানি হয়ে যাক, ছাই হয়ে যাক যেখানেই যে অবস্থায় থাকুক না কেন কবরের আযাব হতে পারবে। এই সমস্ত প্রশ্ন কোন প্রশ্ন নয়। আসল কথা হল কুরআন, হাদীছে কবরের আযাবের কথা এসেছে তাই আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে। আমরা দেখি না তবুও বিশ্বাস করতে হবে। যুক্তিতে ধরে না, তারপরও বিশ্বাস করতে হবে। এরই নাম হল ঈমান। না দেখে, বিনা যুক্তিতে, বিনা দ্বিধায়, বিনা সংকোচে, সম্পূর্ণভাবে মেনে নেয়াই হল ঈমান। আল্লাহ পাক আমাদের ঈমানকে মজবূত করে দিন। আমীন!

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

الْعَرُوْسِ الَّذِىْ لَا يُوْقِظُهٗ اِلَّا اَحَبُّ اَهْلِهٖ اِلَيْهِ. فَيُفْسَحُ لَهٗ فِىْ قَبْرِهٖ وَيُعْطٰى لَهٗ بِاَنْوَاعٍ مِّنْ نِعَمِ الْجَنَّةِ. وَاِنْ كَانَ مُنَافِقًا اَوْ كَافِرًا يَّقُوْلُ هَاهْ هَاهْ لَا اَدْرِىْ! فَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهٗ وَيُعَذَّبُ بِاَنْوَاعٍ مِّنَ الْعَذَابِ. وَفِى الْحَدِيْثِ اِنَّ فِى الْقَبْرِ تِنِّيْنًا لَوْ نَفَخَ اَحَدٌ مِّنْهَا فِى الْاَرْضِ مَا اَنْبَتَتْ خَضِرًا . وَاِنِ الْمَيِّتَ اِذَا عُذِّبَ فِى الْقَبْرِ يَصِيْحُ صَيْحَةً فَظِيْعَةً يَّسْمَعُهَا مَنْ يَّلِيْهِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ. وَلَا يَسْمَعُهَا الْاِنْسُ وَالْجِنُّ وَذَالِكَ لَا يَدُلُّ عَلٰى عَدَمِ وُجُوْدِ عَذَابِ الْقَبْرِ. وَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ رَجُلٍ نَامَ وَرَاٰى فِى الْمَنَامِ رُؤْيَا كَثِيْرَةً حَتّٰى يَصِيْحَ اَوْيَبْكِىَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرْحِ اَوِ التَّأَلُّمِ وَلَا يُشْعِرُ بِذَالِكَ اَحَدٌ. حَفِظَنَا اللّٰهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

وَفِى الْحَدِيْثِ اِنَّ سُوْرَةَ الْمُلْكِ هِىَ الْمَانِعَةُ الْمُنْجِيَةُ تُنْجِيْهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. رَوَاهُ الْقُرْطُبِىُّ. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ اَنَّهٗ قَالَ لِرَجُلٍ اَلَا اُتْحِفُكَ بِحَدِيْثٍ تَفْرَحُ بِهٖ؟ قَالَ بَلٰى. قَالَ : اِقْرَأْ تَبَارَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَعَلِّمْهَا اَهْلَكَ وَجَمِيْعَ وَلَدِكَ وَصِبْيَانَ بَيْتِكَ وَجِيْرَانَكَ فَاِنَّهَا الْمُنْجِيَةُ وَالْمُجَادِلَةُ تُجَادِلُ اَوْتُخَاصِمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّهَا لِقَارِئِهَا وَتَطْلُبُ لَهٗ اَنْ يُّنْجِيَهٗ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَيُنْجٰى بِهَا صَاحِبُهَا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوَدِدْتُ اَنَّهَا فِىْ قَلْبِ كُلِّ اِنْسَانٍ مِّنْ اُمَّتِىْ. رَوَاهُ ابْنُ كَثِيْرٍ فِىْ تَفْسِيْرِهٖ.

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ : يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ . وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ.

بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ، وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. اَقُوْلُ قَوْلِىْ هٰذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ لِىْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَاسْتَغْفِرُوْهُ، اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



বয়ান নং ১২-এর খুতবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْمُنْفَرِدِ بِالْخَلْقِ وَالْاِبْدَاعِ، اَلْمُسْتَقِلِّ بِالْاِيْجَادِ وَ الْاِعَادَةِ وَالْاِخْتِرَاعِ، اَلْمُثِيْبِ لِمَنِ امْتَثَلَ اَمْرَهٗ وَاَطَاعَ، وَالْمُنْتَقِمِ مِمَّنْ خَالَفَ اَمْرَهٗ وَاَضَاعَ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ فِىْ كُلِّ اَمْرٍ مُّطَاعٍ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهُ الْهَادِىْ اِلٰى سَبِيْلِ النَّجَاةِ عَنِ الضِّيَاعِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ مَا دَعَا لِلّٰهِ دَاعٍ.

اَمَّا بَعْدُ :

اَيُّهَا النَّاسُ! اِنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ حَقٌّ، وَدَلَّ عَلَيْهِ الْاٰيَاتُ الْعَدِيْدَةُ وَالْاَحَادِيْثُ الْكَثِيْرَةُ. وَالْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِّنْ رِّيَاضِ الْجَنَّةِ اَوْ حُفْرَةٌ مِّنْ حُفَرِ النَّارِ. قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَّيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ اَدْخِلُوْا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ. وَاِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا مَرَّ عَلٰى قَبْرَيْنِ فَقَالَ : اِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِىْ كَبِيْرٍ، اَمَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهٖ، وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَكَانَ يَمْشِىْ بِالنَّمِيْمَةِ. وَاَخْرَجَ الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهٗ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ، وَاِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَمِنْ اَهْلِ النَّارِ، فَيُقَالُ : هٰذَا مَقْعَدُكَ حَتّٰى يَبْعَثَكَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَفِى الْحَدِيْثِ اِذَا قُبِرَ الْمَيِّتُ يَاْتِيْهِ مَلَكَانِ اَسْوَدَانِ اَزْرَقَانِ، يُقَالُ لِاَحَدِهِمَا الْمُنْكَرُ وَالْاٰخَرُ النَّكِيْرُ، فَيُقْعِدَانِهٖ وَيَقُوْلَانِ لَهٗ مَنْ رَّبُّكَ وَمَا دِيْنُكَ وَمَنْ هٰذَا الرَّجُلُ؟ فَاِنْ كَانَ صَالِحًا يُّجِيْبُ رَبِّىَ اللّٰهُ وَدِيْنِىَ الْاِسْلَامُ وَهٰذَا الرَّجُلُ نَبِيُّنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَيَقُوْلَانِ لَهٗ نَمْ كَنَوْمَةِ

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বয়ান নং -১৩

## পরকালের প্রতি ঈমান

(২য় পর্ব- কিয়ামত ও কিয়ামতের আলামত প্রসঙ্গ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّىْ. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَتَى السَّاعَةُ : مَا الْمَسْئُوْلُ عَنْهَا بِاَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ. وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : اِذَا اتُّخِذَ الْفَيْئُ دُوَلًا وَالْاَمَانَةُ مَغْنَمًا وَالزَّكٰوةُ مَغْرَمًا وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّيْنِ وَاَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَاَتَهٗ وَعَقَّ اُمَّهٗ وَاَدْنٰى صَدِيْقَهٗ وَاَقْصٰى اَبَاهُ وَظَهَرَتِ الْاَصْوَاتُ فِى الْمَسَاجِدِ وَسَادَ الْقَبِيْلَةَ فَاسِقُهُمْ وَكَانَ زَعِيْمُ الْقَوْمِ اَرْذَلَهُمْ وَاُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهٖ وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ وَ شُرِبَتِ الْخُمُوْرُ وَلَعَنَ اٰخِرُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ اَوَّلَهَا فَارْتَقِبُوْا عِنْدَ ذَالِكَ رِيْحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَ خَسْفًا وَ مَسْخًا وَقَذْفًا وَاٰيَاتٍ تَتَابَعُ كِنِظَامٍ قُطِعَ سِلْكُهٗ فَتَتَابَعَ.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

পরকালের প্রতি কীভাবে ঈমান রাখতে হবে এ সম্পর্কে আমরা আলোচনা করছিলাম। বলা হয়েছিল পরকালের উপর ঈমান রাখার অর্থ ৮টা জিনিসের উপর ঈমান রাখা। তার মধ্যে প্রথম হল কবরে মুনকার নাকীরের সওয়াল-জওয়াব এবং কবরের আযাবে বিশ্বাস রাখা, গত জুমুআয় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় নম্বর হল কিয়ামত এবং হাশর নশরে বিশ্বাস রাখা।

এক সময় এই দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে, তারপর আবার সকলে হাশরের ময়দানে একত্রিত হবে। শিংগায় ফুঁক দেয়া হলে দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে, আবার শিংগায় ফুঁক দেয়া হলে দুনিয়ার শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত সমস্ত জিন ও ইনসান হাশরের ময়দানে উঠবে। এটাকে বলা হয় কিয়ামত এবং হাশর-নশর। হাশর অর্থ হল- একত্রিত হওয়া, সমবেত হওয়া। যখন কিয়ামত হবে তারপর সকলে হাশরের ময়দানে সমবেত হবে। এটাকে বলা হয় হাশর। আর নশর অর্থ হল- পুনরুত্থিত হওয়া। মৃত্যুর পর আবার সকলে হাশরের ময়দানে উত্থিত হবে, এটাই হল নশর বা পুনরুত্থান।

কিয়ামত কখন হবে সেটা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। রাসূল (সা.)কে প্রশ্ন করা হয়েছিল مَتَى السَّاعَةُ। অর্থাৎ, কিয়ামত কখন হবে? রাসূল (সা.) বলেছেন,

مَا الْمَسْئُوْلُ عَنْهَا بِاَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ. (متفق عليه)

'অর্থাৎ, এ বিষয়ে প্রশ্নকারী যেমন অজ্ঞ যাকে প্রশ্ন করা হয়েছে সেও তদ্রূপ'। অর্থাৎ, এ ব্যাপারে আমার জানা নেই। কুরআন শরীফে বলা হয়েছে,

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّىْ.

অর্থাৎ, হে নবী তারা তোমাকে প্রশ্ন করে কিয়ামত কখন হবে? তুমি বলে দাও কিয়ামত কখন হবে তা একমাত্র আমার রব আল্লাহ পাক জানেন, আর কেউ জানে না। (আ'রাফ: ১৮৭)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com



কিয়ামত হবে- একথা আমাদেরকে জানানো হয়েছে, কিন্তু কোন্ সময়ে হবে, সময় সম্পর্কে কাউকে জানানো হয়নি। তবে রাসূল (সা.) কিয়ামতের কিছু আলামত বা নিদর্শন বলে দিয়ে গেছেন। কিয়ামতের পূর্বে সেইসব আলামত প্রকাশ পাবে। যা দেখে বুঝা যাবে কিয়ামত আসন্ন। রাসূল (সা.) কিয়ামতের দুই ধরনের আলামত সম্পর্কে বলে গেছেন। কিছু হল ছোট ছোট আলামত। এগুলোকে বলা হয় "আলামতে ছুগরা"। আর কিছু হল বড় বড় আলামত, সেগুলোকে বলা হয় "আলামতে কুবরা"।

ছোট ছোট আলামত গুলোর মধ্যে তিরমিযী শরীফের এক হাদীছে ১৫টা আলামতের কথা বলা হয়েছে। হাদীছখানা শুরুতে আপনাদের সামনে তেলাওয়াত করা হয়েছে। এর মধ্যে একটা আলামত হল মানুষ জনগণের আমানতকে গণিমতের মালের মত লুটেপুটে খাবে। ব্যক্তিগত আমানত হোক, অথবা রাষ্ট্রীয় আমানত অর্থাৎ জনগণের আমানত, সব আমানতকে মানুষ গণিমতের মালের মত লুটেপুটে খাবে। কিয়ামতের এই আলামত প্রকাশ হয়ে গেছে।

যে বিষয়গুলোকে কিয়ামতের আলামত বলা হয়েছে, এর অর্থ হল সেগুলো জঘন্য ধরনের অপরাধ। এরকম জঘন্য অপরাধ যে, এ অপরাধ হতে থাকলে পৃথিবীকে টিকিয়ে রাখার আর কোন স্বার্থকতা নেই। কাজেই এরকম অপরাধ হতে থাকলে এই পৃথিবীকে ধ্বংস করে দেয়া উচিত। যেমন জনগণের আমানত যদি মানুষ গণিমতের মত লুটেপুটে খায়, তাহলে মানুষের মাল বা সম্পদের নিরাপত্তা উঠে গেল। আর মানুষের জান মালের নিরাপত্তা না থাকলে দুনিয়াকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থকতা কোথায়! তাই এটা জঘন্য ধরনের অপরাধ। কবীরা গোনাহ, মারত্মক ধরনের পাপ।

কিয়ামতের এ ধরনের আলামতের মধ্যে আর একটা হল মানুষ যাকাত দেয়াটাকে জরিমানার মত দণ্ড মনে করবে। মনে করবে যাকাতের বিধান দিয়ে আমাদের উপর একটা জরিমানা চেপে দেয়া হয়েছে। আহা কত টাকা যাকাতে চলে যায়। যদিও যাকাতের পরিমাণ খুব বেশি নয়- শতকরা মাত্র আড়াই টাকা হারে যাকাত দেয়া ফরয। তারপরও এতটুকু অর্থ দিতে তাদের কাছে বিরাট কষ্ট মনে হবে, দণ্ডের মত লাগবে। এটা হবে মালের প্রতি তাদের মহব্বত বেড়ে যাওয়ার কারণে। যার ফলে যাকাতের বিধান তাদের কাছে যুলুম মনে হবে। আর শরীআতের বিধানকে যুলুম মনে করা মারাত্মক পাপ। শরীআতের প্রত্যেকটা বিধানকে স্বেচ্ছায় মনের খুশিতে মেনে নেয়াই হল ঈমানের দাবী। ইসলাম অর্থই হল আত্মসমর্পন করা। ইসলাম যে বিধান দিয়েছে তার সামনে নিজেকে সোপর্দ করে দিতে হবে। বিনা দ্বিধায়, বিনা সংকোচে কোন আপত্তি ছাড়াই সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিতে হবে। এটাকেই বলা হয় ইসলাম। মানুষের মধ্যে যখন মালের মহব্বত বেশি এসে যায়, তখন যাকাতের এই সামান্য পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতেও তার কাছে কষ্টকর লাগে, দ্বীনের অন্য কাজে ব্যয় করতেও তার খুব কষ্ট লাগে। মালের প্রতি এত বেশি মহব্বত হয়ে যাওয়া তাই মারাত্মক পাপের মূল। মানুষের মধ্যে মালের প্রতি এত মহব্বত হলে গরীবের সাহায্য-সহযোগিতা বন্ধ হয়ে যায়। সহানুভূতি উঠে যায়। একে অপরের প্রতি নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে। আর এ অবস্থা হলে দুনিয়া বসবাসের উপযোগী থাকে না। তখন দুনিয়াকে শেষ করে দেয়া সমীচীন হয়ে দাঁড়ায়। তাই এটাও কিয়ামতের একটা আলামত হিসেবে গণ্য হয়েছে।

কিয়ামতের আর একটা আলামত হল- মানুষ জ্ঞান অর্জন করবে দ্বীনের জন্য নয়, বরং দুনিয়ার জন্য, সম্পদ উপার্জন করার জন্য। কোন্ জ্ঞান অর্জন করলে বেশি উপার্জন করা যাবে- সেটাই মানুষের মনোভাব হয়ে দাঁড়াবে। আর যখন এরকম মনোভাব হবে, তখন মানুষ দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করা ছেড়ে দিবে। কারণ দ্বীনী জ্ঞান অর্জন করলে অর্থাৎ, কুরআন-হাদীছের কথা শিখলে টাকা-পয়সা বেশি পাওয়া যায় না, ভাল চাকুরী পাওয়া যায় না, সরকারী পদ পাওয়া যায় না, গাড়ী-বাড়ী করা যায় না।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

টাকা-পয়সার চিন্তায় জ্ঞান অর্জন করার মনোবৃত্তি এসে গেলে দ্বীনী ইল্‌মের প্রতি আগ্রহ কমে যাবে, দুনিয়াবী ইল্‌মের প্রতি আগ্রহ বেড়ে যাবে। আর যখন দ্বীনী ইল্‌মের প্রতি আগ্রহ কমে যাবে, দ্বীনী ইল্‌মের চর্চা কমে যাবে, তখন দ্বীনের উপরে চলা কমে যাবে, মানুষের আমলও কমে যাবে, কারণ ইল্‌ম না থাকলে আমল আসবে কোথা থেকে? দ্বীনী ইল্‌ম কমে গেলে দ্বীনী ইলমের চর্চা কমে গলে সমাজে বিদ'আত, কুসংস্কার ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন ভ্রান্ত মতবাদ ও কুফরী মতবাদ ঢুকে পড়ে। মানুষ আমল হারা, ঈমান হারা হয়ে যায়। যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ মানুষকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন, সেই উদ্দেশ্য বরবাদ হয়ে যায়। আর এমন হলে দুনিয়াকে টিকিয়ে রাখার কোন স্বার্থকতা থাকে না। তাই এটাকেও কিয়ামতের আলামত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

কিয়ামতের আর একটা আলামত হল- মানুষ তার মায়ের আনুগত্য করবে না, মায়ের কথা মেনে চলবে না, বরং মেনে চলবে তার বউয়ের কথা। অর্থাৎ, বিবির কথায় চলবে, মায়ের নাফরমানী করবে। পিতার সাথে খারাপ আচরণ করবে, বন্ধু-বান্ধবের সাথে ভাল আচরণ করবে অর্থাৎ, পিতাকে দূরে সরিয়ে দিবে, আর যারা দূরের মানুষ তাদেরকে কাছে টানবে। যাদেরকে কাছে টানার তাদেরকে দূরে ঠেলবে, যারা দূরের তাদেরকে কাছে টানবে। এভাবে সব স্বাভাবিক নিয়ম, প্রাকৃতিক নিয়ম, যার ভিত্তিতে দুনিয়া সুন্দর ভাবে চলছে, তা উলট পালট করে দেয়া হবে, তখন আল্লাহও এই দুনিয়াকে উলট পালট করে দিবেন। অর্থাৎ, কিয়ামত ঘটিয়ে দিবেন।

কিয়ামতের আর একটা আলামত হল- মানুষ মসজিদের আদব-কায়দা রক্ষা করবে না, মসজিদে জোর আওয়াজে কথা বলবে। অর্থাৎ, অবস্থা এমন দাঁড়াবে যে, মানুষ মানুষের আদব তো রক্ষা করবেই না, এমনকি আল্লাহর দরবারের আদব পর্যন্ত রক্ষা করবে না। আদব একটা মৌলিক জিনিস। মাতা-পিতার সাথে আদব, গুরুজনদের সাথে আদব, উস্তাদের সাথে আদব, উলামায়ে কেরাম ও বুযুর্গানে দ্বীনের সাথে আদব, দ্বীনী মজলিসের আদব, মসজিদের আদব- এগুলো এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, এর ভিত্তিতে সবকিছুর শৃঙ্খলা ঠিক থাকে। আদব উঠে গেলে শৃঙ্খলা নষ্ট হয়ে যায়। মাতা-পিতা ও বড় ভাই-বোনদের সাথে আদব না থাকলে পরিবারের শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়ে। সমাজের মুরুব্বি ও গুরুজনদের সাথে আদব না থাকলে সামাজিক শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়ে। উস্তাদের সাথে আদব না থাকলে জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হতে হয়, আল্লাহর দরবারের আদব রক্ষা না করলে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হতে হয়। এভাবে আদব না থাকলে সব ক্ষেত্রেই বিশৃঙ্খল অবস্থা সৃষ্টি হয়। তাই দুনিয়া থেকে যখন আদব-কায়দা উঠে যাবে, তখন সব ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খল অবস্থা সৃষ্টি হবে। তখন দুনিয়াকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থকতা থাকবে না। এজন্যই মসজিদে জোর আওয়াজে কথা বলা, অর্থাৎ সবচেয়ে বেশি আদব রক্ষার স্থান আল্লাহর দরবার তথা মসজিদের আদব উঠে যাওয়াকে কিয়ামতের আলামত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

কিয়ামতের আর একটা আলামত হল- সমাজের নেতা হবে পাপী লোকেরা। অর্থাৎ, ফাসেক, ফাজের ও পাপীরা হবে বড় বড় নেতা। সমাজের নেতৃত্ব থাকবে পাপীদের হাতে। জনগণের প্রতিনিধি হবে সবচেয়ে নিকৃষ্ট গোছের লোকেরা। অর্থাৎ, যারা জনগণের প্রতিনিধি হওয়ার যোগ্য নয় তারা হবে জনগণের প্রতিনিধি। এরকম লোকদের হাতে নেতৃত্ব গেলে, এরকম লোকেরা জনপ্রতিনিধি হলে দেশ এবং সমাজের কী দুর্দশা হয়, জনগণের কী দুর্গতি হয়, তা আর ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই, আজকের সমাজ তা হাড়ে-হাড়ে টের পাচ্ছে। এক কথায় এরকম হলে মানুষের সুখ-শান্তি সব বরবাদ হয়ে যায়। মানুষের বেঁচে থাকার স্বার্থকতাই শেষ হয়ে যায়। এজন্যই এটাকে কিয়ামতের, অর্থাৎ দুনিয়া বরবাদ হওয়ার আলামত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এক হাদীছে রাসূল (সা.) স্পষ্টত বলেছেন,

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. (صحيح البخاري برقم ٥٩)

'অর্থাৎ, যখন অযোগ্য লোকের হাতে নেতৃত্ব চলে যাবে তখন আর দুনিয়াতে বেঁচে থেকে কী লাভ, কিয়ামতের-ই অপেক্ষা কর'। আরেক হাদীছে এরকম পরিস্থিতি সম্পর্কে বলা হয়েছে,

فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا. (سنن الترمذي برقم ٢٢٣٦ وقال : غريب)

অর্থাৎ, তখন মাটির উপরে থাকার চেয়ে মাটির ভিতরে চলে যাওয়াই ভাল অর্থাৎ, বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই ভাল।

কিয়ামতের আর একটা আলামত হল– এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে যে, মানুষকে সম্মান করতে হবে তার অনিষ্টের ভয়ে। সম্মান করতে মনে চাইবে না, কিন্তু না করলে তো অসুবিধার ভয়। এই ভয়ে সম্মান দেখানো হবে। যেমন মাস্তানদেরকে মানুষ বাহ্যিকভাবে সম্মান দেখায়, খাতির করে। অথচ মনে মনে তাকে অভিশাপ দিতে থাকে, সামনে বলে ভাই কেমন আছেন, ভাল তো? অথচ মনে মনে বলে বদমাইশটা মরলেই ভাল হত। সমাজে অপরাধীদের অপরাধের দৌরাত্ম বেড়ে গেলেই এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়, তখন মানুষ ভয়ে তাদেরকে সম্মান দেখাতে বাধ্য হয়। এরকম পরিবেশ সৃষ্টি হলে সম্মানী লোকের সম্মান নষ্ট হয়, অপরাধ প্রশ্রয় পায়। যখন পৃথিবীর অবস্থা এরকম উল্টো হয়ে যাবে, তখন সেই পৃথিবীকে আর টিকিয়ে রাখার যৌক্তিকতা থাকবে না। তাই এটাকেও কিয়ামতের একটা আলামত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

কিয়ামতের আর একটা আলামত হল– গান-বাদ্যের প্রচলন বেশি হবে। গায়ক গায়িকাদের সংখ্যা বেড়ে যাবে, বাদ্য-যন্ত্রের ব্যবহার বেড়ে যাবে, গান-বাদ্যের ব্যাপক প্রচলন ঘটবে। আর যে কোন পাপের ব্যাপক প্রচলন ঘটলে অবস্থা এমন হয় যে, মানুষ আর সেটাকে পাপই মনে করে না। গান-বাদ্যের ব্যাপারে অনেকের মনোভাব এখন এমন হয়েছে যে, তারা এটাকে পাপই মনে করছে না। একজন তো দুঃসাহসের সাথে বলেই ফেলেছে কোন্ কিতাবে লিখা আছে গান-বাজ্‌না হারাম? এই কথা যে বলেছে, তাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় আপনি কিতাবের বরাত শুনতে চান, কয়টা কিতাবের নাম জানেন? কোনো কিতাবের নাম শুনলে কি বুঝবেন, সেটা কোন্ পর্যায়ের কিতাব? তাহলে শুনুন আবূ দাউদ, ইবনে মাজা, সহীহ ইবনে হিব্বান প্রভৃতি হাদীছের কিতাবে গান-বাদ্য নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে হাদীছ রয়েছে। গান-বাদ্য গোনাহে কবীরা। আর কোন গোনাহকে গোনাহ মনে না করা আরও জঘন্য অপরাধ।

কিয়ামতের আর একটা আলামত হল– ব্যাপকভাবে মদ পান করা হবে। অর্থাৎ, নেশার ব্যাপক প্রচলন ঘটবে। ব্যাপক হারে মানুষ নেশায় অভ্যস্ত হয়ে পড়বে। নেশার হার বেড়ে গেলে কীভাবে সমাজ রসাতলে যায় তা আমরা ইত্যবসরে বুঝতে শুরু করেছি।

কিয়ামতের আর একটা আলামত হল–মানুষ আগের যুগের ধর্মীয় ব্যক্তিদের সমালোচনা করতে থাকবে। ইদানিং এ বিষয়টা আমরা দেখতে পাচ্ছি। এখন কিছু লোক আইম্মায়ে মুজতাহিদীন যেমন– ইমাম আবূ হানীফা (রহ.), ইমাম শাফেঈ (রহ.), ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.), ইমাম মালেক (রহ.) প্রমুখ মনীষীদের সমালোচনা শুরু করেছে। অথচ হাজার বছর বেশি সময় ধরে মুসলিম উম্মাহ তাদের গবেষণা করা মাসআলা মাসায়েলের উপরে আমল করে আসছে। কেউ তাঁদের বিরুদ্ধে কোন কথা বলেনি। কিন্তু ইদানিং এক শ্রেণির লোক বের হয়েছে, যারা এইসব ইমামদের সমালোচনা করে সমাজকে তাঁদের থেকে বিচ্ছিন্ন করছে। তাঁরা কুরআন-হাদীছ ভাল বুঝতেন না, তাদের কথা কেন মেনে চলতে হবে– ইত্যাদি কথা বলে নতুন বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। অথচ হাজার বছর যাবত লক্ষ-লক্ষ

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

উলামায়ে কেরাম অতিবাহিত হয়েছেন এবং এখনও রয়েছেন; তাঁদের সামনে কুরআন-হাদীছ ছিল এবং রয়েছে। তাঁরা কুরআন-হাদীছের ভিত্তিতে বলে আসছেন এবং মেনে আসছেন যে, এই সব ইমামগণের গবেষণা করা মাসআলা-মাসায়েল যা ফেকাহর কিতাবে, ফতোয়ার কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে এবং সে অনুযায়ী উম্মত আমল করে আসছে, সেগুলো কুরআন-হাদীছ সম্মত। অথচ এক শ্রেণির মানুষ আজ তাদের বিরুদ্ধে বলা শুরু করেছে। এটাও কিয়ামতের একটা আলামত। আর এক শ্রেণির লোক সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা করেন। অথচ সাহাবায়ে কেরাম সমালোচনার ঊর্ধ্বে। সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা করা নিষেধ। হাদীছে এসেছে– নবী কারীম (সা.) বলেছেন, তোমরা কাউকে সাহাবাদের সমালোচনা করতে দেখলে বলবে তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র লা'ণত বা অভিশাপ হোক।

যাহোক এগুলো হল কিয়ামতের ছোট ছোট আলামত। যখন এই আলামতগুলো প্রকাশ পেয়ে যাবে, তখন বুঝা যাবে কিয়ামত আসন্ন। তখন দুনিয়া আস্তে আস্তে ধ্বংসের দিকে এগুতে থাকবে। এছাড়াও বিভিন্ন হাদীছে কিয়ামতের আরও অনেকগুলো ছোট ছোট আলামতের কথা বলা হয়েছে। যেমন, ঘূর্ণীঝড় বেড়ে যাবে, ভূমিকম্প বেড়ে যাবে, মানুষের মন বিকৃত হয়ে যাবে, চেহারা বিকৃত হয়ে যাবে এবং একের পর এক দুর্ঘটনা বেড়েই যেতে থাকবে, এমনভাবে মানুষের উপর বিপদ আসতে থাকবে, যেমন একটা মালার সুতা কেটে দেয়া হলে ঐ মালার দানাগুলো একের পর এক লাগাতার পড়তে থাকে। এরকম মানুষের উপরে বিপদ মুসীবত ও ফিতনা একের পর এক নিরবচ্ছিন্নভাবে আসতে থাকবে।

এগুলো হল কিয়ামতের ছোট ছোট আলামত। এরপর প্রকাশ পেতে শুরু করবে একে একে কিয়ামতের বড় বড় আলামতগুলো। সমস্ত দুনিয়ায় খ্রিস্টানদের রাজত্ব হয়ে যাবে, মুসলমানদের উপরে চরমভাবে যুলুম নির্যাতন হতে থাকবে। দাজ্জালের আবির্ভাব হবে। দাজ্জাল হবে ইহুদী বংশের একজন। যার ডান চোখ কানা হবে, আর বাম চোখ টেরা হবে। তার কপালে লেখা থাকবে- কাফ-ফা-র অর্থাৎ, কাফের। প্রত্যেক মুসলমান তার কপালের এই লেখা দেখতে পাবে। আল্লাহ পাক মানুষকে চরমভাবে পরীক্ষা নেয়ার জন্য তার হাতে এমন ক্ষমতা দিয়ে দিবেন, সে যা বলবে তা-ই হবে। সে একটা ফসলহীন ভূমিকে বলবে তুমি ফসল উৎপাদন করে দাও! সাথে সাথে ফসল গজাবে। সে নিজেকে খোদা বলে দাবী করবে। সে মৃত মানুষকে জীবিত করে দেখাবে। মানুষকে চরমভাবে পরীক্ষা করার জন্য এটা করা হবে। এ অবস্থায় ইমাম মাহ্‌দীর আগমন হবে। তিনি রাসূল (সা.)-এর বংশের অর্থাৎ, সাইয়্যেদ বংশীয় হবেন। তাঁর নাম এবং তাঁর মাতা-পিতার নামও হবে রাসূল (সা.)- এর ন্যায় অর্থাৎ, মুহাম্মাদ ইব্‌নে আব্দুল্লাহ। তাঁর আবির্ভাব হবে, মক্কা শরীফে। বায়তুল্লায় তাওয়াফ করা অবস্থায় মানুষ তাঁকে আবিষ্কার করবে। ঐ সময় গায়েব থেকে আওয়াজ আসবে যে, هٰذَا خَلِيْفَةُ اللّٰهِ الْمَهْدِيُّ فَاطِيْعُوْهُ অর্থাৎ, এ-ই হল আল্লাহর খলীফা মাহ্‌দী।

মানুষ তাঁর অনুসরণ করবে। ইতিমধ্যে হযরত ঈসা (আ.) আগমন করবেন। তিনি আসমানে যিন্দা আছেন। তিনি আসমান থেকে দুনিয়ায় আগমন করবেন। তিনি নিজ হাতে দাজ্জালকে হত্যা করবেন। তিনি কোথায় দাজ্জালকে হত্যা করবেন তাও হাদীছে বর্ণিত আছে। তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসে অবতরণ করবেন। ফজরের নামায আদায় করবেন। নামায পড়ার পর হাতে বর্ষা নিয়ে দাজ্জালকে ধাওয়া করবেন এবং বাবে লূদ নামক স্থানে তাকে হত্যা করবেন। হাদীছে পরিষ্কারভাবে এ বর্ণনা রয়েছে। কোন গোজামিলের কথা নয়। এমনই ঘটবে, নতুবা কুরআন-হাদীছ মিথ্যা প্রমাণিত হবে। আজ পর্যন্ত কুরআন-হাদীছের কোন কথা মিথ্যা প্রমাণিত হয়নি। এটাও সত্য প্রমাণিত হবে। ইহুদী-খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে জেহাদ শুরু হবে। সর্বত্র মুসলমানদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। ইনসাফ এবং শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com



এরপর এক সময় ইয়াজুজ-মা'জুজ বের হবে। এরপর মক্কা শরীফের সাফা পাহাড় ফেটে একটা প্রাণী বের হবে, যার নাম দাব্বাতুল আরদ। এ সম্পর্কে কুরআন শরীফে বলা হয়েছে,

وَ اِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ الْاَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ اَنَّ النَّاسَ كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا لَا يُوْقِنُوْنَ.

অর্থাৎ, অর্থাৎ, যখন কিয়ামত সমাগত হবে, তখন আমি তাদের সামনে ভূগর্ভ থেকে একটা প্রাণী বের করব, সে মানুষের সাথে কথা বলবে। (নাম্‌ল: ৮২)

এই প্রাণীটি মু'মিনদের চেহারাকে উজ্জ্বল করে দিবে এবং কাফেরদের মুখমণ্ডলে কুফরের চিহ্ন এঁকে দিবে। তারপর এক সময় পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদয় হবে। এখন সূর্য পূর্ব দিক থেকে উদিত হচ্ছে, তখন পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। পশ্চিম দিক থেকে উদিত হয়ে মধ্য আকাশ পর্যন্ত এসে আবার পশ্চিম দিকে যেয়ে অস্ত যাবে। আমরা দেখেছি বাচ্চারা লাটিম ঘুরায়। লাটিম এক দিকে ঘোরে। ঘুরতে ঘুরতে যখন তার ঘোরা প্রায় শেষের দিকে যায়, তখন কিছুটা উল্টো ঘুরানী দেয়। একটু উল্টো দিকে ঘুরে আবার কিছুক্ষণ ঠিকমত ঘোরে। তারপর তার ঘোরা একেবারেই শেষ হয়ে যায়। ঠিক সূর্যের ঘুরানীটাও অনুরূপ হবে। বিজ্ঞানীরাও নাকি বলেন যে, দুনিয়ার ঘুরানীর সব থেকে ভাল উপমা হল লাটিমের ঘুরানী। যে নিজের অক্ষ রেখার উপরেও ঘোরে, আবার তার কক্ষপথেও ঘোরে। এভাবে আরও কয়েকটা আলামত প্রকাশ পাবে। তারপর এক সময় শিংগায় ফুঁক দিয়ে কিয়ামত সংঘঠিত করে দেয়া হবে। কিয়ামত সংঘটিত হবে সম্পূর্ণ কাফেরদের উপর। যখন আল্লাহ বলার কেউ থাকবে না তখনই কিয়ামত সংঘটিত হবে। কারণ তখন দুনিয়াকে ধরে রাখার আর কোন স্বার্থকতাই অবশিষ্ট থাকবে না। হাদীছে এসেছে,

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى لَا يُقَالَ فِى الْاَرْضِ اَللّٰهُ اَللّٰهُ. (رواه مسلم برقم ٣٩٢)

অর্থাৎ, যতক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়াতে আল্লাহ আল্লাহ বলার লোক থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত কেয়ামত কায়েম হবেনা।

কিয়ামত সংঘটিত হবে কীভাবে, এরপরে মানুষ কীভাবে হাশরের ময়দানে সমবেত হবে, কীভাবে বিচার হবে, এ সব বিষয়ে কুরআন হাদীছে বিশুদ্ধভাবে বিবরণ দেয়া হয়েছে। ইনশাআল্লাহ এ সম্পর্কে সামনে আলোচনা করা হবে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে সহীহ্ ঈমান নসীব করুন। আমীন!

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বয়ান নং ১৩-এর খুতবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ وَرِثَ الْاَرْضَ وَمَنْ عَلَیْهَا وَاِلَیْهِ یَرْجِعُ کُلُّ مَوْجُوْدٍ، وَهُوَ تَعَالٰی رَحِیْمٌ وَّدُوْدٌ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِیْکَ لَهٗ الْوَاحِدُ الْاَحَدُ الْمَعْبُوْدُ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَیِّدَنَا وَنَبِیَّنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهُ الَّذِیْ خَصَّهٗ بِالْمَقَامِ الْمَحْمُوْدِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی عَبْدِکَ وَرَسُوْلِکَ مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الرُّحَمَاءِ فِیْمَا بَیْنَهُمْ وَهُمُ الرُّکَّعُ السُّجُوْدُ.

اَمَّا بَعْدُ :

اَیُّهَا النَّاسُ! اَلَا وَاِنَّ مِنْ شُعَبِ الْاِیْمَانِ اَنْ یُّؤْمِنَ الْعَبْدُ بِیَوْمِ الْقِیَامَةِ وَالْحَشْرِ وَالْمِیْزَانِ، وَالصِّرَاطِ وَالْجَنَّةِ وَالنِّیْرَانِ. وَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی جَعَلَ الدُّنْیَا دَارَ الْفَنَآءِ، وَجَعَلَ الْاٰخِرَةَ دَارَ الْبَقَآءِ. وَاِذَا نُفِخَ فِی الصُّوْرِ تَقُوْمُ الْقِیَامَةُ، وَذَالِکَ یَوْمٌ عَظِیْمٌ کُرْبُهٗ، شَدِیْدٌ هَوْلُهٗ، تَقْشَعِرُّ بِهِ الْاَبْدَانُ، وَیَشِیْبُ فِیْهِ الْوِلْدَانُ ، وَلَا یُغْنِیْ حَمِیْمٌ عَنْ حَمِیْمٍ، وَلَا یَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ اِلَّا مَنْ اَتَی اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِیْمٍ.

وَمَتٰی تَقُوْمُ السَّاعَةُ لَا یَعْلَمُهَا اَحَدٌ ، وَذَالِکَ فِیْ خَمْسٍ لَّا یَعْلَمُهُنَّ اِلَّا اللّٰهُ. قَالَ تَعَالٰی : یَسْئَلُوْنَکَ عَنِ السَّاعَةِ اَیَّانَ مُرْسٰهَا، قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّیْ، لَا یُجَلِّیْهَا لِوَقْتِهَا اِلَّا هُوَ، ثَقُلَتْ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ، لَا تَاْتِیْکُمْ اِلَّا بَغْتَةً، یَسْئَلُوْنَکَ کَاَنَّکَ حَفِیٌّ عَنْهَا، قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ. وَ سُئِلَ النَّبِیُّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَتٰی السَّاعَةُ ؟ قَالَ : مَا الْمَسْئُوْلُ عَنْهَا بِاَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ. وَلٰکِنْ بَیَّنَ النَّبِیُّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اَمَارَاتِهَا. مِنْهَا اَنْ تَلِدَ الْاَمَةُ رَبَّتَهَا، وَاَنْ تَرٰی الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ یَتَطَاوَلُوْنَ فِی الْبُنْیَانِ. وَعَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : اِذَا

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



اتُّخِذَ الْفَیْئُ دُوَلًا، وَالْاَمَانَةُ مَغْنَمًا، وَالزَّکٰوةُ مَغْرَمًا، وَتُعُلِّمَ لِغَیْرِ الدِّیْنِ، وَاَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَاَتَهٗ وَعَقَّ اُمَّهٗ، وَاَدْنٰی صَدِیْقَهٗ وَاَقْصٰی اَبَاهُ، وَظَهَرَتِ الْاَصْوَاتُ فِی الْمَسَاجِدِ، وَسَادَ الْقَبِیْلَةَ فَاسِقُهُمْ، وَکَانَ زَعِیْمُ الْقَوْمِ اَرْذَلَهُمْ، وَاُکْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهٖ، وَظَهَرَتِ الْقَیْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، وَشُرِبَتِ الْخُمُوْرُ، وَلَعَنَ اٰخِرُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ اَوَّلَهَا، فَارْتَقِبُوْا عِنْدَ ذَالِکَ رِیْحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَّخَسْفًا وَّمَسْخًا وَّقَذْفًا وَّاٰیَاتٍ تَتَابَعُ کَنِظَامٍ قُطِعَ سِلْکُهٗ فَتَتَابَعَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِیُّ. وَقَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : اِذَا وُسِّدَ الْاَمْرُ اِلٰی غَیْرِ اَهْلِهٖ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. هٰذِهٖ مِنْ عَلَامَاتِ الْقِیَامَةِ الصُّغْرٰی.

وَمِنْ عَلَامَاتِ الْقِیَامَةِ الْکُبْرٰی نُزُوْلُ عِیْسَی ابْنِ مَرْیَمَ، وَخُرُوْجُ الْمَهْدِیِّ، وَخُرُوْجُ الدَّجَّالِ، وَخُرُوْجُ یَاْجُوْجَ وَمَاْجُوْجَ، وَخُرُوْجُ دَآبَّةِ الْاَرْضِ، قَالَ تَعَالٰی : وَ اِذَا وَقَعَ عَلَیْهِمُ الْقَوْلُ اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ الْاَرْضِ تُکَلِّمُهُمْ اَنَّ النَّاسَ کَانُوْا بِاٰیٰتِنَا لَا یُوْقِنُوْنَ. وَمِنْ عَلَامَاتِهَا الْکُبْرٰی طُلُوْعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا. قَالَ تَعَالٰی : هَلْ یَنْظُرُوْنَ اِلَّا اَنْ تَاْتِیَهُمُ الْمَلٰٓئِکَةُ اَوْ یَاْتِیَ رَبُّکَ اَوْ یَاْتِیَ بَعْضُ اٰیَاتِ رَبِّکَ. یَوْمَ یَاْتِیْ بَعْضُ اٰیَاتِ رَبِّکَ لَا یَنْفَعُ نَفْسًا اِیْمَانُهَا لَمْ تَکُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ کَسَبَتْ فِیْ اِیْمَانِهَا خَیْرًا.

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ : اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ، وَیُنَزِّلُ الْغَیْثَ ، وَیَعْلَمُ مَا فِی الْاَرْحَامِ، وَمَا تَدْرِیْ نَفْسٌ مَّا ذَا تَکْسِبُ غَدًا، وَمَا تَدْرِیْ نَفْسٌ بِاَیِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ، اِنَّ اللّٰهَ عَلِیْمٌ خَبِیْرٌ.

بَارَکَ اللّٰهُ لَنَا وَلَکُمْ فِی الْقُرْاٰنِ الْعَظِیْمِ، وَنَفَعَنَا وَاِیَّاکُمْ بِالْاٰیَاتِ وَالذِّکْرِ الْحَکِیْمِ. اَقُوْلُ قَوْلِیْ هٰذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ لِیْ وَلَکُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِیْنَ وَاسْتَغْفِرُوْهُ، اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ.

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বয়ান নং -১৪

## পরকালের প্রতি ঈমান

(৩য় পর্ব- হাশর-নশর, হিসাব-নিকাশ ও হাউজে কাওছার প্রসঙ্গ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: وَ نُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَ مَنْ فِى الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِيْ ظِلِّهٖ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّهٗ: اِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِيْ عِبَادَةِ اللّٰهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهٗ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ اِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتّٰى يَعُوْدَ اِلَيْهِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِى اللّٰهِ اِجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ اِمْرَاَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَ جَمَالٍ فَقَالَ اِنِّيْ اَخَافُ اللّٰهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَاَخْفَاهَا حَتّٰى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهٗ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهٗ.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

আমরা ঈমান সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। পরকালে ঈমান রাখা বলতে ৮টা জিনিসের প্রতি ঈমান রাখা বোঝায়। এর মধ্যে কবরে মুনকার-নাকীরের ছওয়াল-জওয়াব, কবরের আযাব ও কিয়ামতের আলামত সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। কিয়ামতের ছোট বড় সব আলামত প্রকাশ পাওয়ার পর কিয়ামত সংঘটিত হবে। শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, সমস্ত জিন-ইনসান মারা যাবে, দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে। আবার শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে তখন সকলে পুনরায় জীবিত হয়ে হাশরের ময়দানে একত্রিত হবে। নেককার মানুষের আমলনামা ডান হাতে আসবে, বদকারের আমলনামা বাম হাতে এসে পড়বে। হিসাব-নিকাশ হবে। পুলসিরাত পার হতে হবে। কেউ পুলসিরাত পার হতে পেরে জান্নাতে পৌঁছবে, আর কেউ পার হতে না পেরে জাহান্নামে পড়ে যাবে। এই সবকিছুর প্রতি ঈমান বিশ্বাস রাখার অর্থ হল– পরকালে ঈমান-বিশ্বাস রাখা। শিংগায় ফুঁক দেয়ার জন্য হযরত ইসরাফীল (আ.)কে নিযুক্ত রাখা হয়েছে। তিনি শিংগায় ফুঁক দিলে সমস্ত দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে। কেমন হবে এই শিংগা তা যথার্থভাবে আল্লাহ পাকই জানেন। হাদীছে সে সম্বন্ধে সামান্য একটু বর্ণনা পাওয়া যায়। এই শিংগার ভিতরে অসংখ্য ছিদ্র থাকবে। প্রত্যেকটা ছিদ্রে আল্লাহ তা'আলা যত জিন-ইনসান পয়দা করেছেন সকলের রূহ থাকবে। যখন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে এর আওয়াজের প্রচণ্ডতায় সব রূহ বেহুশ হয়ে যাবে। আল্লাহ পাক বলেন,

وَ نُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَ مَنْ فِى الْاَرْضِ. (الزمر : ٦٨)

'অর্থাৎ, শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে তখন আসমান-যমীনের সকলে হুশ হারা হয়ে যাবে'। এটা হল প্রথমবার ফুঁক দেয়ার পরের অবস্থা। যখন দ্বিতীয়বার ফুঁক দেয়া হবে তখন সকলে মারা যাবে। তারপর তৃতীয়বার ফুঁক দেয়া হবে, তখন সকলে আবার জীবিত হয়ে হাশরের ময়দানে উঠবে।

দেখা গেল ফুঁকের ভিতরে অর্থাৎ আওয়াজের ভিতরে এত শক্তি। দুনিয়াতেও আমরা দেখতে পাই প্রচণ্ড জোরে প্লেন ইত্যাদির আওয়াজ হলে ঘরের জানালার কাঁচ ইত্যাদি সব ভেঙ্গে যায়। এতে প্রমাণ হয়– আওয়াজের ভিতরে সবকিছু ভেঙ্গে দেয়ার অর্থাৎ, ধ্বংস করার ক্ষমতা আছে। আবার এই শিংগার

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



আওয়াজেই সব কিছু পুনরায় যিন্দা হয়ে উঠবে। একই আওয়াজে বা একই ফুঁ-র ভিতরে দুইরকম আছর অর্থাৎ, দুইরকম প্রভাব দেখা যাচ্ছে। এরও প্রমাণ রয়েছে। আমরা মুখ দিয়ে দুইরকম ফুঁ দিতে পারি। ঠাণ্ডা ফুঁ এবং গরম ফুঁ। কোথাও পুড়ে গেলে বা গরম কিছু ঠাণ্ডা করার জন্য আমরা ফুঁ দেই, তখন আমাদের মুখ থেকে ঠাণ্ডা ফুঁ বের হয়। আবার যখন গরম করার দরকার হয় তখন মুখের ফুঁ দিয়ে গরম করা যায়। তখন এমনভাবে মুখের বাতাস বের করা হয় যা হয় গরম। শীতের সময় লেপ মুড়ি দিয়ে মুখ থেকে গরম বাতাস বের করে তাড়াতাড়ি গরম করে নেয়া যায়। দেখা গেল একই মুখের ফুঁ-র ভিতরে দুইরকম প্রভাব। তাই আল্লাহ পাকের পক্ষেও একই শিংগার আওয়াজে একবার ভাঙ্গা আর একবার গড়া অর্থাৎ, বিপরীতমুখী দুইরকম কাজ করা সম্ভব।

এগুলো মানুষের বের করা যুক্তি। কুরআন-হাদীছে এসব যুক্তি বলে দেয়া হয়নি। কুরআন হাদীছে বলা হয়েছে তাই বিশ্বাস করতে হবে। যুক্তিতে ধরলেও বিশ্বাস করতে হবে, যুক্তিতে না ধরলেও বিশ্বাস করতে হবে। যারা কুরআন-হাদীছকে এভাবে বিশ্বাস করে তারা বিনা দ্বিধায়, বিনা সংকোচে এটা বিশ্বাস করে। তাদের মনে কিয়ামত হওয়া এবং মরার পরে আবার যিন্দা হওয়া সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন জাগে না। আর যারা অবিশ্বাসী, তাদের মনে নানান প্রশ্ন দেখা দেয়, কাফেরদের এরকম সন্দেহের উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

عَاِذَا مِتْنَا وَ كُنَّا تُرَابًا وَّ عِظَامًا عَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ. (الصافات : ١٦)

'অর্থাৎ, আমরা মরে যখন পঁচে গলে সব মাটি হয়ে যাব, মাটির সাথে মিশে যাব, তার পরেও আবার আমাদেরকে যিন্দা করা হবে'? এটা কীভাবে সম্ভব? আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন,

قُلِ الَّذِيْ فَطَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ. (الاسراء : ٥١)

'হে নবী তুমি ওদেরকে বলে দাও! প্রথমবার যিনি সৃষ্টি করেছিলেন তিনিই আবার সৃষ্টি করে পুনরুত্থিত করবেন'।

এ আয়াতে বোঝানো হয়েছে প্রথমবার তিনি যখন সৃষ্টি করেছিলেন তখন তার সামনে কোন নমুনাই ছিল না। নমুনা ছাড়াই যখন প্রথমবার সৃষ্টি করতে পেরেছেন, তখন দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা তো আরও সহজ। কাজেই প্রথমবার যিনি সৃষ্টি করতে পেরেছেন দ্বিতীয়বার তিনি সৃষ্টি করতে পারবেন না এরকম সন্দেহেরই অবকাশ নেই। তা ছাড়া মানুষ মরে পঁচে গলে, মাটি হয়ে গেলেও তার দেহের অংশ বিলীন হয়ে যায় না। তার দেহের অংশগুলো যেখানেই যেভাবে থাকুক না কেন আল্লাহ পাক হুকুম দিবেন তখন সব অংশগুলো একত্রিত হয়ে যাবে। একটা ঘটনা শুনুন! একবার হযরত ইব্রাহীম (আ.) আল্লাহর কাছে আবেদন করলেন-হে আল্লাহ! তুমি কীভাবে মরা মানুষকে আবার যিন্দা করবে, কীভাবে পুনরুজ্জীবিত করবে তা আমাকে একটু দেখাও। কুরআন শরীফে এসেছে তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন,

فَخُذْ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَاْتِيْنَكَ سَعْيًا.

'অর্থাৎ, তুমি চারটা পাখি নাও। পাখিগুলোকে পোষমানাও। তারপর সেগুলো যবাই করে কেটে কেটে টুকরা টুকরা কর। সবগুলোকে মিশ্রিত কর। মিশ্রিত করে চারটা ভাগ করে চারটা পাহাড়ে রেখে আস। তারপর এক একটার নাম ধরে ডাক। সেগুলো তোমার কাছে দৌড়ে দৌড়ে আসবে'। (বাকারা: ২৬০)

হযরত ইব্রাহীম (আ.) তাই করলেন। চারটা পাখি নিলেন- একটা মোরগ, একটা কবুতর, একটা ময়ূর ও একটা কাক- এই চারটা পাখি নিলেন। সবগুলোকে যবাই করলেন। যবাই করে টুকরা টুকরা করলেন। সবগুলোর রক্ত-মাংস মিশ্রিত করলেন। মাথাগুলো নিজের কাছে রাখলেন, বাকীগুলো চারটা

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

ভাগ করে চারটা পাহাড়ের উপরে রেখে আসলেন। এবার ডাক দিলেন– ময়ূর! দেখলেন ময়ূরের অংশগুলো দৌড়ে আসতে থাকল। দৌড়ে এসে একত্রিত হয়ে যিন্দা ময়ূর হয়ে গেল। এভাবে তিনি চারটা পাখি-র যিন্দা হওয়ার দৃশ্য স্বচক্ষে দেখলেন। আল্লাহ পাক বোঝালেন এভাবেই মানুষ মরে যেখানেই তার অংশগুলো থাকুক না কেন, যে অবস্থায়-ই থাকুক না কেন, যখন আমি ডাক দিব, তখন সব একত্রিত হয়ে এভাবে যিন্দা হয়ে যাবে। হাশরের ময়দানের ভয়াবহতা কী তার চিত্র তুলে ধরে কুরআন শরীফে সূরা হজ্জের শুরুতে বলা হয়েছে,

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ اَرْضَعَتْ وَ تَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَ تَرَى النَّاسَ سُكٰرٰى وَ مَا هُمْ بِسُكٰرٰى وَ لٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ. (حج : ١-٢)

অর্থাৎ, হে লোকেরা! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর। নিশ্চয় কিয়ামতের প্রকম্পন এক মহাবিষয়। যেদিন দুধ দায়িনী মা তার দুধের শিশুকে ভুলে যাবে। গর্ভধারিনীদের গর্ভপাত হয়ে যাবে। মানুষকে দেখবে হুশ হারা যেন মাতাল। অথচ তাদের কেউ মাতাল নয়, কিন্তু আল্লাহর শাস্তি বড় কঠিন, বড় ভয়াবহ যার ফলে তাদেরকে এরকম হুশ হারা মনে হবে। রাসূল (সা.) একদিন বললেন,

يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً.

'অর্থাৎ, তোমরা হাশরের ময়দানে উঠবে উলঙ্গ অবস্থায়। উলঙ্গ পায়ে, খতনাহীন অবস্থায়'। তখন হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, 'পুরুষ-মহিলা একত্রিতভাবে উলঙ্গ হয়ে উঠবে, একে অপরকে দেখবে, এটা কি শরমের ব্যাপার হবে না'? রাসূল (সা.) বললেন,

اَلْاَمْرُ اَشَدُّ مِنْ اَنْ يَّنْظُرَ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ. (صحيح مسلم برقم ٧٣٧٧ وصحيح البخاري برقم ٦٥٢٧)

'অর্থাৎ, তখন এমন ভয়াবহ অবস্থা হবে যে, একজন আরেকজনের দিকে তাকানোর চিন্তা পর্যন্ত আসবে না'।

কিয়ামতের ময়দানে প্রত্যেকেই বলতে থাকবে ইয়া নাফছী! ইয়া নাফছী! অর্থাৎ, হায় আমার কী উপায় হবে! হায় আমার কী উপায় হবে! প্রত্যেকে নিজেকে নিয়ে এরকম ব্যস্ত থাকবে।

আবূ দাউদ শরীফের এক হাদীছে এসেছে– হযরত আয়েশা (রা.) রাসূল (সা.)কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার পরিবারের কথাও কি আপনার মনে থাকবে না? রাসূল (সা.) বলেছিলেন– তিনটা ক্ষেত্র এমন হবে, যখন কেউ কারও কথা মনে রাখতে পারবে না।

সেই তিনটা ক্ষেত্রের একটা হল– যখন কিয়ামতের ময়দানে আমলনামা ছেড়ে দেয়া হবে। কিয়ামতের দিন প্রত্যেকের আমলনামা উড়িয়ে দেয়া হবে। যারা নেককার তাদের আমলনামা সামনের দিক থেকে এসে তাদের ডান হাতে পড়বে। আর যারা বদকার তাদের পেছন দিক থেকে বাম হতে এসে পড়বে। তাদের বাম হাত পেছনের দিকে উল্টানো থাকবে। ঐ পেছন দিক থেকে আমলনামা উড়ে এসে বাম হাতে লেগে যাবে। এমন না যে, আমি ইচ্ছা করলেই ডান হাত দিয়ে ধরতে পারব। এটা এমন একটা মুহূর্ত হবে, যখন প্রত্যেকেরই পেরেশানী থাকবে যে, আমার আমলনামা ডান হাতে আসবে, না বাম হাতে আসবে। এই পেরেশানীর মুহূর্তে কারও কথা কারও স্মরণ থাকবে না।

সেই তিনটা ক্ষেত্রের আরেকটা হল– যখন মানুষের আমল ওজন হবে। তখন প্রত্যেকের ভিতরে পেরেশানী থাকবে যে, আমার নেকী-র পাল্লাটা ভারী হয়, না বদীর পাল্লা ভারী হয়। তখন কারও কথা কারও স্মরণ হবে না।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



সেই তিনটা ক্ষেত্রের আরেকটা হল– পুলসিরাত পার হওয়ার সময়। ময়দানে হাশরের চতুর্দিকে জাহান্নাম দিয়ে ঘেরা থাকবে। জান্নাতে যেতে হলে এই জাহান্নামের উপর দিয়ে পার হয়ে যেতে হবে। এই জাহান্নামের উপরে যে পুল স্থাপন করা হবে সেটাকে বলা হয় পুলসিরাত। আরবীতে বলে সিরাত। এটা এমন পুল, হাদীছে বলা হয়েছে, অর্থাৎ, চুলের চেয়ে চিকন, তলোয়ারের চেয়ে ধারালো। এই পুল পার হয়ে যেতে হবে। রাসূল (সা.) বলেছেন,

فِيْهِ خَطَاطِيْفُ وَكَلَالِيْبُ وَحَسَكٌ. (رواه مسلم برقم ٤٧٢ والبخاري برقم ٧٤٣٩)

'অর্থাৎ, জাহান্নামের ভিতর বড় বড় কাঁটা এবং লোহার আংটা থাকবে। পাপীরা পার হওয়ার সময় সেই আংটা তাদেরকে টান দিয়ে ভিতরে ফেলে দিবে'।

এখান থেকে যখন মানুষ পার হতে থাকবে, তখন এত পেরেশানী থাকবে যে, কারও কথা কারও স্মরণ রাখার অবকাশ থাকবে না। এইসব পেরেশানী-র মুহূর্তে প্রত্যেক মানুষ নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকবে। কারও কথা কারও মনে থাকবে না। মা তার সন্তানের কথা ভুলে যাবে, স্বামী-স্ত্রী একজন আরেকজনের কথা ভুলে যাবে, বন্ধু-বান্ধব একে অপরের কথা ভুলে যাবে। সকলের মুখে থাকবে শুধু ইয়া নাফছী, ইয়া নাফছী অর্থাৎ, হায় আমার কী উপায় হবে!! হায় আমার কী উপায় হবে!!!

হাশরের ময়দানের একটা কঠিন মুহূর্ত হবে– যখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বিচার কাজ শুরু করবেন না, ময়দানে হাশরের ভয়াবহ অবস্থার ভিতরে মানুষ থাকবে, আল্লাহ পাক প্রচণ্ড ক্রোধের অবস্থায় থাকবেন। এক হাদীছে এসেছে- আল্লাহ জাল্লা শানুহু বলতে থাকবেন,

اَنَا الْمَلِكُ، اَيْنَ مُلُوْكُ الْاَرْضِ؟ (صحيح البخاري ٤٨١٢ وصحيح مسلم ٧٢٢٧)

'অর্থাৎ, আজ আমিই সম্রাট, পৃথিবীর সম্রাটরা কোথায়'? আরেক হাদীছে এসেছে- আল্লাহ বলবেন,

اَيْنَ الْجَبَّارُوْنَ اَيْنَ الْمُتَكَبِّرُوْنَ؟ (صحيح مسلم ٧٢٢٨)

'অর্থাৎ, দুনিয়ার সেই প্রতাপশালীরা কোথায়? দুনিয়ায় যারা বড়ায়ী দেখাতো তারা কোথায়'?

অর্থাৎ আজ আমিই সম্রাট, আমিই সমস্ত প্রতাপের অধিকারী, দুনিয়ার প্রতাপশালী সম্রাটরা আজ কোথায়? যারা ক্ষমতার দাপট দেখাতো, অহংকার দেখাতো, তারা আজ কোথায়? কোথায় গেল তাদের দাপট, কোথায় গেল তাদের বড়ায়ী? এক দিকে আল্লাহ জাল্লা শানুহু এরকম ক্রোধের মধ্যে থাকবেন, অন্যদিকে মানুষ ময়দানে হাশরের কষ্টে এমন অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে যে, তাদের মনে হবে বিচার হয়ে যেখানে যাই যাব, এই কষ্ট আর সহ্য হয় না! তারা নবীদের কাছে ছুটে যাবে। প্রথমে হযরত আদম (আ.)-এর কাছে ছুটে যাবে। যেয়ে বলবে আপনি প্রথম নবী। আল্লাহ পাক নিজ হাতে আপনাকে সৃষ্টি করেছিলেন, আপনি আল্লাহর কাছে একটু সুপারিশ করুন যেন আমাদের বিচার কাজ শুরু করা হয়। ময়দানে হাশরের এই কষ্ট তো আমাদের আর বরদাশ্‌ত হচ্ছে না! হযরত আদম (আ.) বলবেন, আজ আল্লাহ এত রাগান্বিত আছেন, এরকম রাগান্বিত কোনদিন হননি, আর কোনদিন হবেনও না। আজ আমার পক্ষে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করা সম্ভব নয়। তোমরা নূহ (আ.)-এর কাছে যাও। মানুষ হযরত নূহ (আ.)-এর কাছে ছুটে যাবে। তিনিও একই জওয়াব দিয়ে দিবেন। হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর কাছে যাওয়া হবে। তিনিও একই জওয়াব দিয়ে দিবেন। হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে হযরত ঈসা (আ.)-এর কাছেও যাওয়া হবে। তারাও অপারগতা প্রকাশ করবেন যে, আমাদের পক্ষে সুপারিশ করা সম্ভব নয়। সর্বশেষে রহমাতুল্‌লিল আলামীন, শাফীউল মুযনিবীন, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে যাওয়া হবে। তিনি রাজী হবেন। রাসূল (সা.) বলেন, আমি আল্লাহর আরশের পায়ার নীচে সেজদায় লুটিয়ে

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

পড়ব, আর আল্লাহর প্রশংসা করতে থাকব। এমন প্রশংসা করব, যে প্রশংসা এখন আমার জানা নেই। আল্লাহ পাক তখন আমাকে শিখিয়ে দিবেন। প্রশংসা করতে করতে আল্লাহ পাক নরম এবং দয়া পরবশ হবেন এবং বলবেন,

يَا مُحَمَّدُ! ارْفَعْ رَأْسَكَ وَسَلْ تُعْطَهْ وَقُلْ يُسْمَعْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ. (صحيح البخاري ٤٤٧٦ ومسلم ٥٠٠)

অর্থাৎ, হে মুহাম্মাদ! মাথা তোল, তুমি যা আবেদন করবে তোমাকে তা দেয়া হবে, বল শোনা হবে, যা সুপারিশ করবে তোমার সুপারিশ মঞ্জুর করা হবে।

রাসূল (সা.) প্রথম সুপারিশ করবেন যে, বিচার কাজ শুরু করে দেয়া হোক। এর পরে একে একে তার উম্মতের জন্য বিভিন্ন ভাবে সুপারিশ করবেন। কিছু লোকের জন্য এরকম সুপারিশ করবেন যে, হে আল্লাহ বিনা হিসেবে তাদেরকে জান্নাতে পৌছে দেয়া হোক। কিছু উম্মতের জন্য এরকম সুপারিশ করবেন যে, তাদের নেকীও আছে বদীও আছে, এখন বদীর শাস্তি ভোগ করার জন্য তাদেরকে কিছু দিনের জন্য হলেও জাহান্নামে যেতে হবে, নবী (সা.) তাদের জন্য সুপারিশ করবেন, শুরুতেই তাদেরকে মাফ করে দিয়ে জান্নাতে পৌছে দাও। আল্লাহ পাক সুপারিশ কবুল করবেন। কিছু উম্মত এরকম হবে যে, তাদের শুধু লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা ছাড়া অর্থাৎ, শুধু ঈমান আছে, এছাড়া আর কোন নেক আমল নেই, রাসূল (সা.) তাদের জন্যও সুপারিশ করবেন। এক পর্যায়ে তাদেরও নাজাতের ব্যবস্থা করে দেয়া হবে। এভাবে উম্মতের জন্য তিনি বিভিন্ন ভাবে সুপারিশ করবেন। তাঁর সুপারিশ কবুল করা হবে।

কিয়ামতের ময়দানে রাসূল (সা.)-এর সুপারিশ পাওয়া একটা বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হবে। যারা মহব্বতের সাথে রাসূল (সা.)-এর সুন্নাতের উপরে আমল করে, তারা রাসূল (সা.)-এর সুপারিশ লাভ করতে পারবে।

কিয়ামতের ময়দানে যতগুলো ভয়াবহ অবস্থা, যতগুলো ভয়াবহ পরিস্থিতি হবে, তার প্রত্যেকটা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বিশেষ বিশেষ আমল বলে দেয়া হয়েছে। প্রথম যে ভয়াবহ অবস্থা হবে, মানুষ হুশ হারা হয়ে যাবে, সম্বিত হারা হয়ে যাবে– এই অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য একটা আমলও বলে দেয়া হয়েছে। যারা দুই ঈদের রাতে ইবাদত করে হাদীছে এসেছে কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থায় তাদের কোন পেরেশানী আসবে না। ময়দানে হাশরের একটা ভয়াবহ অবস্থা হল মানুষ প্রচণ্ড পিপাসায় কাতর হয়ে পড়বে। তখন যারা রাসূল (সা.)-এর সুন্নাতের উপরে মহব্বতের সাথে আমল করেছিল, তাদেরকে রাসূল (সা.) হাউজে কাউছারের থেকে পানি পান করাবেন। হাদীছে এসেছে,

مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ. (صحيح مسلم برقم ٦١٢٩)

অর্থাৎ, যে একবার এই হাউজে কাউছারের শরবত পান করবে তার আর কখনও পিপাসা লাগবে না।

এই হাউজে কাউছারের পানি পান করতে পারবে ঐ সব লোক, যারা রাসূল (সা.)-এর সুন্নাত মোতাবেক যিন্দেগী চালায়। যারা বিদআত, কুসংস্কারের অনুসরণ করে তারা হাউজে কাউছার থেকে বঞ্চিত হবে। হাদীছে এসেছে রাসূল (সা.) বলেছেন, কিছু মানুষ কিয়ামতের ময়দানে আমার হাউজে কাউছারের দিকে আসতে থাকবে কিন্তু ফিরিশতারা তাদেরকে তাড়িয়ে দিতে থাকবে, হটিয়ে দিতে থাকবে। তাদেরকে আমার কাছে আসতে দিবে না। আমি বলব, এরা আমার উম্মত, এরা আমার উম্মত। কেন এদেরকে তাড়িয়ে দেয়া হচ্ছে? তখন বলা হবে, আপনি জানেন না এরা আপনার সুন্নাতের তরীকা ছেড়ে দিয়ে বিদ্আত, কুসংস্কারের অনুসরণ করত। আপনার সুন্নাতের সাথে এদের মহব্বত তো ছিল না, মহব্বত ছিল বিদ্আত কুসংস্কারের সাথে। রাসুল (সা.) বলেন, 'তখন আমি রাগান্বিত হয়ে বলব,

www.maktabatulabrar.com



سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِيْ. (صحيح البخاري ٦٥٨٣ وصحيح مسلم ٦١٠٩)

অর্থাৎ, যারা আমার মতাদর্শ ছেড়ে দিয়ে আমার সুন্নাত তরীকা ছেড়ে দিয়ে, নতুন মতাদর্শ আবিষ্কার করেছে' অর্থাৎ, বিদআত কুসংস্কার আবিষ্কার করেছে তাদেরকে তাড়িয়ে দাও, তাদেরকে হটিয়ে দাও।

দেখাগেল হাউজে কাউছারের পানি পান করতে গেলেও রাসূলের মহব্বত লাগবে। বিদআত কুসংস্কার ছেড়ে সুন্নাত তরীকা মোতাবেক চলতে হবে।

ময়দানে হাশরের আরেকটা ভয়াবহ অবস্থা হবে যা পূর্বেও বলা হয়েছে যে, আমলনামা আমার ডান হাতে আসবে, না বাম হাতে আসবে। আমলনামা ডান হাতে আনার জন্য বিশেষভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামায যত্নের সাথে পড়তে বলা হয়েছে। যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামায যত্নের সাথে আদায় করবে সে পাঁচটা পুরস্কার লাভ করবে। দুনিয়াতে তার রিযিকে বরকত হবে, কবরের আযাব মওকুফ হবে, ময়দানে হাশরে আমলনামা তার ডান হাতে আসবে, বিদ্যুতের গতিতে পুলসিরাত পার হয়ে যাবে। আর পঞ্চম পুরস্কার হল, সে বিনা হিসেবে জান্নাতে চলে যেতে পারবে।

ময়দানে হাশরের আর একটা ভয়াবহ অবস্থা হল- যখন সূর্য মানুষের খুব কাছে চলে আসবে। প্রচণ্ড গরমে এবং পেরেশানীতে মানুষের এত পরিমাণ ঘাম ছুটবে যে, হাদীছে এসেছে কারও কারও ঘাম তাদের পায়ের টাখনু-গীরা পর্যন্ত হয়ে যাবে। কারও কারও হাটু পর্যন্ত হয়ে যাবে। কারও কারও মুখ পর্যন্ত হয়ে যাবে। এই গরম থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর আরশের ছায়ার প্রয়োজন হবে। তখন সাত শ্রেণির মানুষ আল্লাহর আরশের নীচে ছায়া লাভ করতে পারবে। হাদীছে এসেছে,

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِيْ ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّهُ: اِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَفِيْ عِبَادَةِ اللّٰهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ اِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتّٰى يَعُوْدَ اِلَيْهِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِى اللّٰهِ اِجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ اِمْرَاَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَ جَمَالٍ فَقَالَ اِنِّيْ اَخَافُ اللّٰهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَاَخْفَاهَا حَتّٰى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ.

(صحيح البخاري برقم ٦٦٠ وصحيح مسلم برقم ٢٤٢٧)

অর্থাৎ, সাত শ্রেণির মানুষ কিয়ামতের দিন আল্লাহর ছায়ায় আশ্রয় পাবে, যেদিন সেই ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না। এখানে এক ব্যাখ্যা অনুযায়ী আল্লাহর আরশের ছায়াকে বোঝানো হয়েছে। সেই সাত শ্রেণির মানুষ হল ন্যায়-পরায়ণ সম্রাট, যৌবন কালে যারা ইবাদত করে, মসজিদ থেকে বের হওয়ার পর আবার মসজিদে আসা পর্যন্ত যাদের অন্তর মসজিদের সাথে লাগানো থাকে, যারা আল্লাহর ওয়াস্তে গোপনে সদরে সর্বাবস্থায় একে অপরকে ভালবাসে, নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে যাদের চোখ থেকে অশ্রু ঝরে, আল্লাহর ভয়ে যারা সুন্দরী নারীর অপকর্মের আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করে, আর যারা কোন রকম নাম শোহরতের উদ্দেশ্য ছাড়া সম্পূর্ণ ইখলাস নিয়ে দান-সদকা করে। কিয়ামতের ময়দানে আরেকটা ভয়াবহ পরিস্থিতি হবে, যাদের হিসাব কড়াকড়ি নেয়া হবে। যাদের হিসাব কড়াকড়ি নেয়া হবে, তাদের বাঁচার কোন উপায় থাকবে না। হাদীছে এসেছে,

مَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابَ يَهْلِكُ. (صحيح البخاري برقم ١٠٣ وصحيح مسلم برقم ٧٤٠٩)

অর্থাৎ, যার কড়াকড়ি হিসাব নেয়া হবে তার ধ্বংস অনিবার্য। কাজেই হিসাব সহজ করার উপায় করতে না পারলে বাঁচার কোন উপায় থাকবে না। কীভাবে হিসাব সহজ করা যাবে, তাও হাদীছে বর্ণিত

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.
Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

হয়েছে। হিসাব সহজ হওয়ার অর্থ হল আল্লাহর সামনে আমলনামা পেশ হবে, তখন আল্লাহ তা'আলা ভিতরের কিছু না দেখেই ব্যাস বলে পার করে দিবেন। অর্থাৎ, যত পাপ আছে কোনোটাই ধরবেন না।

হাদীছে এসেছে- এক ব্যক্তিকে আল্লাহ পাক ডাকবেন। ডেকে তাকে তার আমলনামার পাপগুলো দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করবেন- বান্দা এগুলো করছিলে কি? সে মনে মনে ভাববে আমার বাঁচার কোন উপায় নেই, আমার তো জাহান্নাম অনিবার্য। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, 'যাও তোমাকে মাফ করে দিলাম। দুনিয়াতে তুমি আমার বান্দাদের পাপের কথা জেনেও, দোষের কথা জেনেও সেটা গোপন করতে, আমিও আজ তোমার দোষ গোপন করে দিব। যাও তোমাকে মাফ করে দিলাম'। তাই হাদীছে বলা হয়েছে,

مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ. (صحيح مسلم ٧٠٢٨)

অর্থাৎ, দুনিয়াতে যে মানুষের দোষ জেনেও গোপন করে রাখবে, প্রকাশ করবে না, আল্লাহ পাকও দুনিয়ায় এবং পরকালে তার দোষ-ত্রুটি গোপন করে দিবেন।

বান্দার সাথে বান্দার মোয়ামালা যেমন হয়, তার সাথে আল্লাহর মোয়ামালাও তেমন হয়। এ থেকে বুঝা যায় সহজে হিসাব পাওয়ার একটা পন্থা হল মানুষের দোষ-ত্রুটি জানলে সেটা গোপন করে যাওয়া। তাহলে আল্লাহও তার পাপ চেপে যাবেন, সহজে সে পার হয়ে যাবে।

হাশরের ময়দানে যখন আমলনামা ওজন করা শুরু হবে সেটা হবে এক প্রচণ্ড পেরেশানীর মুহূর্ত। তখন যারা বেশি বেশি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর আমল করত, এই লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-র ওজন সবচেয়ে বেশি হবে। একটা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ যদি আল্লাহর মর্জি মোতাবেক হয়ে যায়, একটা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ যদি আল্লাহর কাছে কবুল হয়ে যায়, তাহলে এই এক লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর ওজন সাত আসমান-যমীনের চেয়ে বেশি হয়ে যাবে। তবে ফরয কর্তব্যে যদি অবহেলা হয়, তাহলে মাফ নেই। ফরয কর্তব্য ঠিকমত পালন করার পর এই সমস্ত নফল আমল সাধ্যমত করে রাখতে হবে। হতে পারে এইসব আমলের যে কোন একটার ওছীলায় আল্লাহ পাক আমার নাজাতের ফয়সালা করে দিবেন। আল্লাহ পাক হাশরের ময়দানে আমাদের নাজাতের ব্যবস্থা করুন। আমীন!

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



## বয়ান নং ১৪-এর খুতবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ وَرِثَ الْاَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَاِلَيْهِ يَرْجِعُ كُلُّ مَوْجُوْدٍ، وَهُوَ تَعَالٰى رَحِيْمٌ وَّدُوْدٌ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ اَلْوَاحِدُ الْاَحَدُ الْمَعْبُوْدُ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ اَلَّذِىْ خَصَّهُ بِالْمَقَامِ الْمَحْمُوْدِ وَالْحَوْضِ الْمَوْرُوْدِ ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الرُّحَمَاءِ فِيْمَا بَيْنَهُمْ وَهُمُ الرُّكَّعُ السُّجُوْدُ.

اَمَّا بَعْدُ :

اَيُّهَا النَّاسُ! اَلَا وَاِنَّ مِنْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ اَنْ يُّؤْمِنَ الْعَبْدُ بِالْحَشْرِ وَالْحَوْضِ وَالْحِسَابِ. وَ اِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ اِجْمَعُوْنَ، ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ. اَلَا وَاِنَّ الْحَشْرَ شَاْنُهُ شَدِيْدٌ، وَفِى الصَّحِيْحَيْنِ ـ اِنَّ النَّاسَ مَحْشُوْرُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا. وَلٰكِنَّ الْاَمْرَ اَشَدُّ مِنْ اَنْ يَّنْظُرَ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ.

فَتَمَسَّكُوْا بِكِتَابِ اللّٰهِ الَّذِىْ فِيْهِ الْعِصْمَةُ وَالنَّجَاةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ، وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ، لِكُلِّ امْرِءٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ، وَحَافِظُوْا عَلٰى اَدَاءِ كُلِّ مَامُوْرٍ، وَخُذُوْا مِنْ دُنْيَاكُمْ لِيَوْمِ الْبَعْثِ وَالنُّشُوْرِ، وَاحْذَرُوا الْوُقُوْفَ بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ بِرَاْسٍ مَنْكُوْسٍ وَقَلْبٍ مَكْسُوْرٍ، فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ. وَفِى الْحَدِيْثِ ـ تَدْنُو الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاشْتَدَّ حَرُّهٗ وَ هَوْلُهٗ. وَعَطِشَ النَّاسُ عَطَشًا شَدِيْدًا. وَقَدْ اَعْطَى اللّٰهُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْحَوْضَ الْكَوْثَرَ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَا يَظْمَاُ بَعْدَهٗ اَبَدًا. فَاتَّصِفُوْا بِصِفَاتٍ يُظِلُّ اللّٰهُ النَّاسَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَيُوَفِّقُ لِلشُّرْبِ

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বয়ান নং -১৫

## পরকালের প্রতি ঈমান

### (৪র্থ পর্ব- আমলনামা, মীযান ও পুলসিরাত প্রসঙ্গ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّ لَا كَبِيْرَةً اِلَّآ اَحْصٰهَا وَ وَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا وَ لَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا. وَقَالَ تَعَالٰى : وَ نَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا وَ اِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا وَ كَفٰى بِنَا حٰسِبِيْنَ. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : كَلِمَتَانِ حَبِيْبَتَانِ اِلَى الرَّحْمٰنِ، خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيْلَتَانِ فِي الْمِيْزَانِ، سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

আমরা ঈমান সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। আখেরাতের প্রতি অর্থাৎ, পরকালের প্রতি কীভাবে ঈমান রাখতে হয়, এ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হচ্ছিল। কিয়ামতের দিন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন-এর পক্ষ থেকে, সমস্ত মানুষের আমলনামা উড়িয়ে দেয়া হবে। যারা নেককার তাদের ডান হাতে এবং যারা বদকার তাদের বাম হাতে আমলনামা এসে পড়বে। এই আমলনামা এমন অদ্ভুত আমলনামা যে, মানুষের জীবনের কোনোকিছু তার মধ্যে লিপিবদ্ধ হতে বাকি থাকে না। কিয়ামতের দিন আমলনামা হাতে আসার পর প্রত্যেকেই বুঝবে আল্লাহর থেকে কোনোকিছু গোপন করা সম্ভব হয়নি। কুরআন শরীফে এসেছে তখন মানুষ আশ্চর্য হয়ে বলবে,

مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّ لَا كَبِيْرَةً اِلَّآ اَحْصٰهَا وَ وَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا وَ لَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا. (কাহ্‌ফ: ৪৯)

অর্থাৎ, কি অদ্ভুত আমলনামা আমার জীবনের ক্ষুদ্র-বৃহৎ কোন বিষয় বাদ যায়নি। তারা যা কিছু করেছে সবকিছু তাতে মওজুদ পাবে। তোমার প্রতিপালক কারও প্রতি অবিচার করেন না।

এখানে চিন্তার বিষয় হল– একজন মানুষ জীবনে যত কিছু করে, সেই সব যদি লিখতে হয় তাহলে কত বিশাল খাতাপত্র দরকার। একজনের আমলনামা লিখতেই তো টনকে টন কাগজের দরকার হয়। একজন মানুষ এত বিশাল আমলনামা এক হাতে বহন করবে কী করে? আগের যুগে মানুষের এরকম প্রশ্ন জাগত। কিন্তু ইদানিং বুঝে আসছে-লিখতে কাগজেরই দরকার হয় না। ক্যাসেটের ফিতার ভিতরে লেখা থাকে, কম্পিউটারের ডিস্কে লেখা থাকে। কিসের ভিতরে লেখা থাকে? বলা যায় হাওয়ার ভিতরেই থাকে। বিজ্ঞানের যত উন্নতি হচ্ছে ইসলামের অনেক বিষয় বুঝা সহজ হয়ে যাচ্ছে। অনেক বিষয়ের সন্দেহ দূর হয়ে যাচ্ছে। যেমন এক যুগে মানুষের আমল ওজন হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ হত যে, আমল কোন বস্তু নয় দেখা যায় না, ছোঁয়া যায় না। সেটা আবার কীভাবে ওজন হবে? কিন্তু এখন বুঝে আসছে যে, যা ধরা ছোঁয়া যায় না বস্তু নয়– এমন জিনিসও মাপা যায়, যেমন আলো মাপা যায়। যাহোক যাদের ডান হাতে আমলনামা আসবে তারা খুশিতে বাগ বাগ হয়ে যাবে যে, আমার জীবনের কোন ক্ষুদ্র নেকীও বাদ পড়েনি সব লিখে রাখা হয়েছে। যে খুশিতে তার আমলনামা মানুষকে দেখাতে থাকবে এবং বলতে থাকবে,

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



مِنْ ذٰلِكَ الْحَوْضِ، وَلَا نُعَدُّ مِمَّنْ يَقُوْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيْ شَأْنِهِمْ : سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِيْ. وَفِي الْحَدِيْثِ ـ سَبْعَةٌ يُّظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِيْ ظِلِّهٖ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّهٗ : اِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِيْ عِبَادَةِ اللّٰهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهٗ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ اِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتّٰى يَعُوْدَ اِلَيْهِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللّٰهِ اِجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ اِمْرَاَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ اِنِّيْ اَخَافُ اللّٰهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَاَخْفَاهَا حَتّٰى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهٗ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهٗ. (متفق عليه)

وَقَدْ اِسْتَبْعَدَ بَعْضُ النَّاسِ اَلْبَعْثَ وَالنُّشُوْرَ بَعْدَ اَنْ صَارُوْا عِظَامًا وَّرُفَاتًا. وَقَالُوْا مَنْ يُّحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ؟ قَالَ تَعَالٰى : قُلِ الَّذِيْ فَطَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ. فَالْخَلْقُ الثَّانِيْ اَهْوَنُ مِنَ الْخَلْقِ اَوَّلَ مَرَّةٍ. وَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَحْيٰى رَجُلًا مِنْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ فِيْ زَمَانِ مُوْسٰى، وَاَمَاتَ نَبِيًّا مِّنْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ ثُمَّ بَعَثَهٗ، وَسَاَلَ اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَبَّهٗ اَرِنِيْ كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتٰى؟ قَالَ : فَخُذْ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءً ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَاْتِيْنَكَ سَعْيًا. وَقَدْ اَرْشَدَ سُبْحَانَهٗ اِلَى الْاِسْتِدْلَالِ بِهٰذِهِ الْاُمُوْرِ، عَلٰى كَمَالِ قُدْرَتِهٖ عَلَى الْبَعْثِ وَالنُّشُوْرِ. فَلَا تَغُرَّنَّكُمْ هٰذِهِ الْوَسَاوِسُ وَالشُّكُوْكُ فِي الصُّدُوْرِ.

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ : وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهٗ بِيَمِيْنِهٖ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا، وَيَنْقَلِبُ اِلٰى اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا.

بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِي الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ، وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. اَقُوْلُ قَوْلِيْ هٰذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَاسْتَغْفِرُوْهُ، اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

هَاؤُمُ اقْرَءُوْا كِتٰبِيَهْ اِنِّىْ ظَنَنْتُ اَنِّىْ مُلٰقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِىْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ.

অর্থাৎ, এই দেখুন আমার আমলনামা। আমার বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহর কাছে সবকিছুর হিসাব নিকাশ হবে, আমি আমার বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করেছি। তার কোন দুঃখ থাকবে না। (হাক্কা: ১৯-২১)

আর যারা পাপী যাদের আমলনামা বাম হাতে আসবে, তারা দুঃখে বলতে থাকবে,

يٰلَيْتَنِىْ لَمْ اُوْتَ كِتٰبِيَهْ وَ لَمْ اَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يٰلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَآ اَغْنٰى عَنِّىْ مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّىْ سُلْطٰنِيَهْ.

অর্থাৎ, হায় আফসূস যদি এই আমলনামা আমার হাতে দেয়াই না হত! আমার হিসাব যদি আমি না-ই জানতাম!! দুনিয়ার জীবন যদি আমার শেষ জীবন হত, এই জীবনের সম্মুখীন যদি আমাকে না হতে হত! আমার কোন কিছুই তো কাজে আসল না, কত ধন-সম্পদ ছিল তা কোন কাজে আসল না, কত ক্ষমতা ছিল কিছুই তো কাজে আসল না! এভাবে সে বিলাপ করতে থাকবে এবং আল্লাহর কাছে আবেদন করতে থাকবে,

فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مُوْقِنُوْنَ. (السجدة: ١٢)

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আর একটি বার দুনিয়ায় যাওয়ার সুযোগ দাও, আমি ভাল মানুষ হয়ে যাব। একটি বার অন্তত আমায় সুযোগ দাও।

হাদীছে এসেছে–

إِنِّي قَضَيْتُ أَنَّهُمْ لا يَرْجِعُونَ. (صحيح ابن حبان برقم ٧٠٢٢ وإسناده جيد)

অর্থাৎ, আল্লাহ বলবেন, আমার পক্ষ থেকে আগেই সিদ্ধান্ত হয়ে আছে যে, দুনিয়ায় দ্বিতীয়বার আর কাউকে পাঠানো হবে না। এ সিদ্ধান্ত তো তোমরা জেনেছ, জেনে শুনেও তোমরা পাপের যিন্দেগী বানিয়েছ। অতএব আজ কোন উপায় নেই।

আমাদের আমলনামা লেখার জন্য আল্লাহ পাক সদা জাগ্রত, সদা সতর্ক লেখকদল নিয়োজিত করে রেখেছেন। আমরা যা কিছুই করি না কেন সেই ফিরিশতারা সবকিছু লিখে রাখছেন। সেই ফিরিশতাদেরকে বলা হয় কিরামান কাতিবীন। "কাতিবীন" শব্দের অর্থ লেখকদল, আর "কিরামান" শব্দের অর্থ হল সম্মানিত, অতএব "কিরামান কাতিবীন" অর্থ সম্মানিত লেখকগণ। অনেকে মনে করেন কিরামান এক ফিরিশতার নাম, কাতিবীন আরেক ফিরিশতার নাম। কিরামান ফিরিশতা থাকেন ডান দিকে, আর কাতিবীন ফিরিশতা থাকেন বাম দিকে। এটা ভুল ধারণা। কিরামান কাতিবীন এর অর্থ হল সম্মানিত লেখকগণ। তারা সংখ্যায় অনেক। প্রত্যেকের সাথে দুইজন করে থাকেন-এমন কথা নয়। তাদেরকে সম্মানিত বলার কারণ হল তারা আমাদের সংগে সম্মান পাওয়ার আচরণ করেন। মানুষ যখন কোন গোনাহের কাজের ইরাদা করে তখন তারা সাথে সাথে গোনাহ লেখেন না। এমনকি গোনাহ করার পরেও কিছুক্ষণ সময় দেয়া হয় দেখি তওবা করে কি-না। এর বিপরীত মানুষ কোন নেক কাজের ইরাদা করলেই অর্থাৎ, মনে মনে নেক কাজের ইচ্ছা করলেই সাথে সাথে একটা নেকী লিখে দেন। আর সেই নেক কাজ করা সম্পন্ন হলে দশগুণ ছওয়াব লিখে দেন। আল্লাহর ফয়সালাতেই এরকম করা হয়। তবুও কিরামান কাতিবীন ফিরিশতাগণ আমাদের সাথে এই আচরণ করেন। এ জন্যই তারা আমাদের থেকে সম্মান পাওয়ার যোগ্য। তাই তাদেরকে কিরামান কাতিবীন বা সম্মানিত লেখকদল বলা হয়।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



যাহোক আমরা যা কিছু করি তা লিখে রাখার জন্য সর্বক্ষণ ফিরিশতা নিয়োজিত আছেন। আল্লাহ পাক লিখে না রাখলেও জানেন। তারপরও লিখে রাখার জন্য ফিরিশতা নিয়োজিত রাখা হয়েছে, যাতে কেউ তার কৃত পাপকে অস্বীকার করতে না পারে। তাছাড়া লেখক নিয়োজিত থাকা মানুষের ঈমান আমলের চেতনা সৃষ্টি হওয়ার জন্য ভাল। কারণ আমাদের যদি মজবূত বিশ্বাস থাকে যে, আমরা যা কিছুই করছি তা সব লিখে রাখা হচ্ছে। আল্লাহর কাছে আমরা কোনোকিছুই গোপন করতে পারব না। এই একটা বিশ্বাসই আমাদেরকে ঈমান আমলের উপর মজবূত রাখবে। জীবনকে ভাল রাখা এবং ভাল করার জন্য এই একটা বিশ্বাসই যথেষ্ট। এজন্যই ঈমানকে আমলের বুনিয়াদ বলা হয়। কোন মানুষের ঈমান যখন মজবূত হয়ে যায়, তখন তার দ্বারা কোন অন্যায় কাজ, কোন পাপ কাজ হতে পারে না। বরং নেকীর কাজ হয়। আমার যদি ঈমান-বিশ্বাস থাকে যে, আমি আল্লাহর থেকে কোন কিছুই গোপন করতে পারব না, আল্লাহর কাছে আমাকে সবকিছুর হিসাব দিতে হবে, এই বিশ্বাস যদি জাগ্রত থাকে, এই বিশ্বাস যদি মজবূত থাকে, তাহলে আমার দ্বারা কীভাবে পাপ হতে পারে? এই বিশ্বাস একেবারেই থাকে না বা মজবূত থাকে না বলেই আমার দ্বারা পাপ হয়।

এই আমলনামার লেখা অনুযায়ী যদি হিসেব দিতে হয় অর্থাৎ, পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসেব দিতে হয়, তাহলে রক্ষা পাওয়া দুস্কর হবে। হাদীছে ইরশাদ হয়েছে,

مَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابَ عُذِّبَ. (صحيح البخاري ٦٥٣٦)

অর্থাৎ, যার পুঙ্খানুপুঙ্খ পাই টু পাই হিসেব নেয়া হবে, তার ধ্বংস অনিবার্য হয়ে দাঁড়াবে। সে শাস্তিতে পড়ে যাবে। আল্লাহর কাছে এরকম হিসেব যেন দিতে না হয়, বরং বিনা হিসেবে যেন জান্নাতে যাওয়া যায়, তার জন্য দু'আ করা চাই।

বিনা হিসেবে জান্নাত পাওয়ার জন্য যেসব আমলের কথা কুরআন হাদীছে বলা হয়েছে সেসব আমল করা চাই। কুরআন-হাদীছ থেকে জানা যায় কয়েক শ্রেণির মানুষ বিনা হিসেবে জান্নাত লাভ করতে পারবে। এক শ্রেণির মানুষ রাসূল (সা.)-এর সুপারিশে বিনা হিসেবে জান্নাতে যাবে। রাসূল (সা.) বিভিন্নভাবে উম্মতের জন্য সুপারিশ করবেন, তার মধ্যে কিছু লোকের জন্য বিনা হিসেবে জান্নাতে যাওয়ার সুপারিশ করবেন। তাদের কোন হিসেব-ই নেয়া হবে না। আমরা যেন এই কাতারে পৌঁছতে পারি, তার চেষ্টা করতে হবে। এর চেষ্টা হল রাসূল (সা.)-এর কাছের মানুষ মহব্বতের মানুষ হয়ে যেতে হবে। যে যত বেশি সুন্নাতের প্রতি যত্নবান হবে, সুন্নাতের সাথে যার যত বেশি মহব্বত হবে, সে তত বেশি রাসুল (সা.)-এর মহব্বতের মানুষ হবে। সে তত বেশি সুপারিশ লাভ করতে পারবে।

কিয়ামতের দিন উলামায়ে কেরামকেও সুপারিশ করার ক্ষমতা দেয়া হবে, হাফেজদেরকেও সুপারিশ করার ক্ষমতা দেয়া হবে, তারা আপনজনকে সুপারিশ করে জান্নাতে নিতে পারবেন। আমরা এ লাইনেও ব্যবস্থা করে রাখি। সন্তানকে হাফেজ, আলেম বানাই। সন্তানকে হাফেজ-আলেম বানাতে না পেরে থাকলে নাতী- পোতাদেরকে হাফেজ-আলেম বানাই। হাফেজ-আলেমের পিতা-মাতা না হতে পেরে থাকলে, হাফেজ-আলেমের দাদা-দাদী, নানা-নানী হওয়ার চেষ্টা করি। যেন তাদের বংশধর হিসেবে সুপারিশ পেয়ে জান্নাত লাভ করতে পারি!

আরেক শ্রেণির লোক বিনা হিসেবে জান্নাতে যেতে পারবে। তারা হল ঐসব লোক, যারা যত্নের সাথে তাহাজ্জুদের নামায পড়েন। কুরআন শরীফে খাঁটি ও নিষ্ঠাবান মু'মিনদের একটা বিশেষ গুণ বলা হয়েছে,

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ.

অর্থাৎ, তাদের পার্শ্ব বিছানা থেকে আলাদা থাকে। (সাজদা: ১৬)

অধিকাংশ মুফাস্‌সিরের মতে এখানে ঐসব লোকদেরকে বোঝানো হয়েছে, যারা তাহাজ্জুদের নামায পড়েন। ইবনে কাছীরের এক রেওয়ায়েতে আছে হাশরের ময়দানে আল্লাহর পক্ষ থেকে এ সব লোককে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেয়া হবে এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদেরকে বিনা হিসেবে জান্নাতে পৌঁছে দিবেন।

আরেক শ্রেণির লোক বিনা হিসেবে জান্নাতে যাবে। তারা হল পূর্ণাঙ্গ তাওয়াক্কুলের অধিকারী লোক। এক হাদীছে এসেছে- রাসূল (সা.) একদিন বললেন, 'আমার উম্মতের কিছু লোক বিনা হিসেবে জান্নাতে পৌঁছে যাবে'। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করেছেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা কারা? রাসূল (সা.) বললেন,

هُمُ الَّذِيْنَ لَايَرْقُوْنَ وَلَايَسْتَرْقُوْنَ وَلَا يَتَطَيَّرُوْنَ وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ. (صحيح مسلم برقم ٥٤٩)

এ হাদীছের সারার্থ হল- তারা ঐ সমস্ত লোক, আল্লাহর উপরে যাদের চরম তাওয়াক্কুল থাকে। যারা আল্লাহর উপরে তাওয়াক্কুল করে চলে, সব ক্ষেত্রে আল্লাহর উপর ভরসা করে চলে।

তবে এখানে একটা বিষয় উল্লেখ করতে হয়। তা হল তাওয়াক্কুলের অর্থ একথা নয় যে, আমি চেষ্টা করব না। চেষ্টা না করেই আল্লাহর উপর ভরসা করে বসে থাকব। বরং চেষ্টা করার সাথে সাথে আল্লাহর উপর ভরসা রাখতে হবে। যেমন এক হাদীছে এসেছে– এক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন ইয়া রাসূলুল্লাল্লাহ! উট বেঁধে আল্লাহর উপর ভরসা করব, নাকি ছেড়ে দিয়ে ভরসা করব? রাসূল (সা.) বললেন,

اِعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ. (رواه الترمذي في السنن برقم ٢٥١٧ وقال غريب)

'অর্থাৎ, তুমি আগে উট বেঁধে রাখ, তারপর আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল কর'।

উট ছেড়ে দিয়ে একথা বলবে না যে, আল্লাহর উপর ভরসা। আল্লাহর ইচ্ছা হলে আমার উট হারাবে, না হয় থাকবে। এ হাদীছে বোঝানো হয়েছে তোমার সাধ্য অনুযায়ী তুমি চেষ্টা করবে– এরপরে আল্লাহর উপরে ভরসা করবে। দ্বীনী আমলের ক্ষেত্রে আমল বর্জন করে একথা বলা যাবে না যে, নামায, রোযা করার দরকার কি আল্লাহর ফয়সালা হলে জান্নাতে যাব, নতুবা যেতে পারব না। এরূপ করা যাবে না। এটা আল্লাহর উপরে ভরসা করা নয়, আল্লাহর উপর ভরসা করার অর্থ হল– আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী আমল করে তারপরে আল্লাহর উপর ভরসা করা। যারা আল্লাহর উপরে পূর্ণ তাওয়াক্কুল করেন, অর্থাৎ আল্লাহর উপর নিজেকে চরমভাবে ন্যস্ত করে দেন, আল্লাহর উপরে নিজেকে পূর্ণাঙ্গভাবে সোপর্দ করে দেন, নিজের সবকিছুকে আল্লাহর মর্জির উপরে সম্পূর্ণ ছেড়ে দেন। তাদেরকে আল্লাহ বিনা হিসেবে জান্নাত দিবেন। আল্লাহ বলবেন ওর হিসেব নিব কী? ওতো আমাকে ছাড়া কিছুই বুঝত না, আমাকে ছাড়া কিছুই জানত না, ওতো আমার পাগল ছিল। কজেই ওর আর হিসেব নিব কী? যাও বিনা হিসেবে জান্নাতে চলে যাও।

কিয়ামতের দিন আরও বিভিন্ন আমলের ওছীলায় আল্লাহ পাক মানুষকে নাজাত দিয়ে দিবেন। হাদীছে এমনও এসেছে এক ব্যক্তি একটা পীপাসার্ত কুকুরকে পানি পান করিয়েছিল, যার ফলে আল্লাহ পাক তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তাই কবি বলেছেন,

رحمت حق بہانہ می جوید+بہانئی جوید

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



'অর্থাৎ, আল্লাহর রহমত ক্ষমা করার বাহানা তালাশ করে যে, কোন বাহানায় ক্ষমা করে দেয়া যায় কি-না'। পাকড়াও করার জন্য, শাস্তি দেয়ার জন্য অজুহাত খোঁজে না। যার জন্য আল্লাহর রহমত জোস মেরে উঠবে এক একটা ওছীলায় তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে।

যার জন্য আল্লাহর রহমতে জোস উঠবে, তার পাপই শুধু ক্ষমা করা হবে না। বরং তার পাপের বদলে নেকী লিখে দেয়া হবে। হাদীছে এক ব্যক্তি সম্পর্কে এসেছে- কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক তাকে কাছে ডাকবেন। ডেকে তার আমলনামা দেখিয়ে তার জীবনের ছোট ছোট যত গোনাহ আছে সেগুলো তার সামনে তুলে ধরে বলবেন, 'বান্দা এগুলো করেছিলে'? সে মনে মনে ভাববে হায়রে আমার উপায় নেই! তখন আল্লাহ পাক বলবেন, 'যাও! আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম এবং তোমার এইসব গোনাহের বদলে এত পরিমাণ নেকী দিয়ে দিলাম'। তখন লোকটা বলবে আমার তো বড় বড় পাপ আছে, সেগুলো তো দেখানো হল না। মনে মনে ভাববে সেগুলো দেখানো হলে সেগুলোরও বদলা পেতাম। রাসূল (সা.) বললেন, 'তখন আল্লাহ পাক হেসে দিবেন যে, দেখ বান্দা কত লোভী'!

হাদীছে আরও কিছু লোক সম্পর্কে এসেছে কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক যাদের ব্যাপার দেখে হাসবেন। সর্বশেষে যাকে জান্নাতে পাঠানো হবে, সে হল সবচেয়ে নিম্নমানের মু'মিন। সে জাহান্নামের দিকে মুখ করা অবস্থায় থাকবে। আল্লাহ পাক তাকে বলবেন বান্দা তুমি কী চাও? সে বলবে–জাহান্নামের দিক থেকে আমার মুখটা ফিরিয়ে জান্নাতের দিকে করে দাও। এতটুকু হলেই আমার জন্য যথেষ্ট। আর আমি কিছুই চাই না। আল্লাহ বলবেন যদি এতটুকু করে দেই আর কিছু চাইবে না তো? সে বলবে না, আর কিছু আমার দাবী থাকবে না। তখন তার মুখটা জান্নাতের দিকে ঘুরিয়ে দেয়া হবে। জান্নাতের নাজ নেয়ামত দেখে তার ভিতরে লোভ জাগতে থাকবে। তখন সে বলবে হে আল্লাহ! আমার আর এতটুকু দাবী যে, জান্নাতের দরজার কাছে আমাকে পৌঁছিয়ে দেয়া হোক। এরপর আমার আর কোন দাবী থাকবে না। আল্লাহ বলবেন তুমি কি অংগিকার করেছিলে না যে, তোমার আর কোন দাবী থাকবে না? সে বলবে হে আল্লাহ! আমি তোমার বঞ্চিত মাখলূক হতে চাই না। তখন তাকে জান্নাতের দরজার কাছে পৌঁছিয়ে দেয়া হবে। জান্নাতের দরজার কাছে যাওয়ার পর জান্নাতের নাজ নেয়ামত আরও ভালভাবে দেখতে পাবে, জান্নাতের ঘ্রাণ পেতে থাকবে, তখন তার ভিতরে আরও লোভ জাগতে থাকবে। বার বার আল্লাহর দিকে তাকাতে থাকবে, দেখি আরেকবার আবেদন করার সুযোগ দেয়া হয় কি-না। আল্লাহ বলবেন বান্দা! কী চাও? সে বলবে আমাকে একটু ভিতরে ঢোকার অনুমতি দেয়া হোক, এর বেশি আমি আর কিছু চাই না। রাসূল (সা.) বলেন, 'আল্লাহ পাক তখন হেসে দিবেন যে, বান্দা বড়ই লোভী'!

যাহোক আল্লাহর রহমতে বিভিন্ন আমলের ওছীলায় আল্লাহর মেহেরবানীতে জান্নাত পাওয়ার কথা বলা হচ্ছিল। আমরা যতটুকু আমল করি, এই আমল আমাদেরকে জান্নাতে পৌঁছানোর জন্য যথেষ্ট নয়। আল্লাহর যত নাজ-নেয়ামত আমরা ভোগ করি, এই নাজ-নেয়ামতের তুলনায় আমাদের ইবাদত আমল খুবই নগন্য। তাই আমলের বদলায়, আমলের বড়ায়ী দেখিয়ে, আমলের দোহাই দিয়ে আমরা জান্নাতে যেতে পারব না। জান্নাতে যেতে পারব আল্লাহর রহমতে, আল্লাহর দয়ায়। আমল শুধু ওছীলা, শুধু আমলের জোরে মানুষ জান্নাতে যেতে পারবে না। তাই আল্লাহর কাছে দু'আ করা চাই। তিনি যেন আমাদের জন্য জান্নাতে যাওয়ার কোন ওছীলা করে দেন। আমাদের জন্য যেন রহমতের ফয়সালা করেন।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

হিসাব-নিকাশের জন্য আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের ময়দানে দাঁড়িপাল্লা বা ওজনের যন্ত্র স্থাপন করবেন। দাঁড়িপাল্লা বা ওজনের যন্ত্রকে আরবীতে বলা হয় মীযান। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَ نَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَ اِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا.

'অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন আমি ইনসাফের মীযান বা ন্যায়-বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করব। কারও প্রতি যুলুম করা হবে না। যদি কোন আমল সরিষার পরিমাণও হয় তবুও তা (ওজনের জন্য) উপস্থিত করব'। (আম্বিয়াঃ ৪৭)

হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত সকলের আমল এতে ওজন করা হবে। ভাল-মন্দ ছোট-বড় সমস্ত আমল ওজন দেয়া হবে।

ইমাম তিরমিযী (রহ.) হযরত আয়েশার রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সামনে বসে বলল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার দু'টি ক্রীতদাস আমাকে মিথ্যাবাদী বলে, কাজ-কারবারে কারচুপি করে এবং আমার নির্দেশ অমান্য করে। এর বিপরীতে আমি মুখেও তাদেরকে গালি-গালাজ করি এবং হাতে মারপিটও করি। আমার ও এই গোলামদ্বয়ের ইনসাফ কীভাবে হবে'? রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তাদের নাফরমানী, কারচুপি এবং ঔদ্ধত্য ওজন করা হবে। এরপর তোমার গালি-গালাজ ও মারপিট ওজন করা হবে। তুমি যে শাস্তি দাও যদি তাদের অপরাধের তুলনায় কম হয়, তবে অবশিষ্টটুকু তোমার অনুগ্রহ বলে গণ্য হবে। আর যদি অপরাধের তুলনায় শাস্তি বেশি হয়, তবে তোমার বাড়াবাড়ির প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে। লোকটি একথা শুনে অন্যত্র সরে গেল এবং কান্না জুড়ে দিল। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তুমি কি কোরআনের এই আয়াত পাঠ করনি وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ লোকটি আরজ করল, 'এখন তো তাদেরকে আযাদ করে এই হিসেবের কবল থেকে নিষ্কৃতি লাভ করা ছাড়া আমার আর গত্যন্তর নেই'। (কুরতুবী)

মুস্তাদরাক কিতাবে বর্ণিত আছে রাসূল (সা.) বলেন, 'কিয়ামতের দিন আমল ওজন করার জন্য এত বিরাট ও বিস্তৃত দাঁড়িপাল্লা বা ওজনের যন্ত্র স্থাপন করা হবে যে, তাতে আকাশ পৃথিবীকে ওজন করতে চাইলেও এগুলোর সংকুলান হয়ে যাবে'। (মাযহারী)

ছোট-বড় সব নেকী-বদী ওজন হওয়ার পর যাদের নেকীর পাল্লা ভারী হবে, তারা হবে জান্নাতী, আর যাদের পাপের পাল্লা ভারী হবে, তাদেরকে জাহান্নামে যেতে হবে। তবে ঈমান থাকলে পাপের শাস্তি ভোগ করার পর তারা জান্নাতে যেতে পারবে। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَهُوَ فِىْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ وَ اَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ.

অর্থাৎ, যার নেকের পাল্লা ভারী হবে, সে সুখী জীবন-যাপন করবে, আর যার নেকের পাল্লা হালকা হবে তার ঠিকানা হল হাবিয়া নামক দোযখ। (কারিআহ : ৬-৯)

অতএব মুক্তি পাওয়ার জন্য নেকীর পাল্লা ভারী করার চেষ্টা করতে হবে। ফরয ওয়াজিব হুকুম আহকাম পালন করার সাথে হাদীছে বেশ কিছু এমন আমলের কথা বলা হয়েছে দাঁড়িপাল্লায় যার ওজন খুব বেশি হবে তারমধ্যে একটা হল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-র ওজন সবচেয়ে বেশি হবে। রাসূল (সা.) বলেছেন, 'আল্লাহর নামের তুলনায় কোন বস্তুই ভারী হতে পারে না'। (মাযহারী) তাই বেশি বেশি এই

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



কালিমা পাঠ করা চাই। বোখারী শরীফের শেষ হাদীছে এসেছে–سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ বাক্য দুটিও দাঁড়িপাল্লায় অত্যন্ত ভারী হবে এবং এ বাক্য দুটি আল্লাহর কাছে অত্যন্ত প্রিয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত আছে- রাসূল (সা.) বলতেন, "সুবহানাল্লাহ" বললে আমলের দাঁড়িপাল্লার অর্ধেক ভরে যায় আর "আল-হামদুলিল্লাহ" বললে বাকি অর্ধেক পূর্ণ হয়ে যায়। (মাআরিফুল কুরআন) তাই বেশি বেশি সুবহানাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ পাঠ করা চাই। আর এক হাদীছে এসেছে- সৎ চরিত্র এবং মৌনতা অর্থাৎ, বিনা প্রয়োজনে কথা না বলা- এ দুটিও ওজনে অনেক ভারী। এভাবে নেকীর পাল্লা ভারী করার জন্য বিভিন্ন আমলের কথা বলা হয়েছে। মুক্তি পাওয়ার জন্য এসব আমলও করা চাই।

যাহোক দাঁড়িপাল্লায় ওজনের মাধ্যমে হিসাব-নিকাশের পালা শেষ হওয়ার পর পুলসিরাত পার হতে হবে। পুলসিরাত পার হয়ে জান্নাতে যেতে হবে। পুলসিরাত হল সিরাতে মুসতাকীমের প্রতীকী পুল। দুনিয়াতে যদি আমরা সিরাতে মুসতাকীমের উপরে অর্থাৎ, সঠিক পথের উপর টিকে থাকি, তাহলে কিয়ামতের দিনও পুলসিরাতের উপর টিকে থাকতে পারব। পুলসিরাত পার হতে পারব। কিয়ামতের দিন এই সিরাতে মুসতাকীমকেই অন্যরূপ দিয়ে পুলসিরাত বানিয়ে দেয়া হবে। যারা দুনিয়াতে সিরাতে মুসতাকীম-এর উপরে টিকে আছে। তারা আখেরাতেও পুলসিরাতের উপরে টিকে থাকতে পারবে। যারা সিরাতে মুসতাকীমের উপর দিয়ে সারা জীবন পরিচালিত হয়েছে, কিয়ামতের দিন পুলসিরাতের উপর দিয়ে পুরো পথ পার হয়ে যেতে পারবে। যে দুনিয়াতে সিরাতে মুসতাকীম-এর উপর যেভাবে চলেছে, পরকালে পুলসিরাতের উপর দিয়ে সে ঐভাবে অতিক্রম করে যাবে। হাদীছে এসেছে মানুষের আমল অনুযায়ী কেউ বিদ্যুৎ গতিতে পুলসিরাত পার হয়ে যাবে, কেউ দ্রুতগামী ঘোড় সওয়ারের মত পার হয়ে যাবে, কেউ দৌড়ে পার হবে, কেউ হেঁটে পার হবে, কেউ হামাগুড়ি দিয়ে পার হবে। অর্থাৎ, দুনিয়াতে সিরাতে মুসতাকীমের উপর যে যেভাবে চলছে, পুলসিরাতের উপরেও সেভাবে চলতে পারবে। আর যারা দুনিয়াতে সিরাতে মুসতাকীম থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে, তারা কিয়ামতের দিন পুলসিরাত থেকে বিচ্যুত হয়ে জাহান্নামে পতিত হবে। সিরাতে মুসতাকীম থেকে বিচ্যুত হয়ে যাওয়ার অর্থই হল জাহান্নামে পড়ে যাওয়া। কারা বিদ্যুৎ গতিতে পুলসিরাত পার হতে পারবে? যারা পাঁচ ওয়াক্ত নামায যত্নের সাথে আদায় করে, তারা কিয়ামতের দিন বিদ্যুৎ গতিতে পুলসিরাত পার হয়ে যেতে পারবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে বিদ্যুৎ গতিতে পুলসিরাত পার হয়ে জান্নাতে পৌছার তাওফীক দান করুন। আমীন!

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বয়ান নং ১৫-এর খুতবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ حَبَّبَ اِلٰی قُلُوْبِنَا الْاِیْمَانَ، وَکَرَّهَ اِلَیْنَا الْکُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْیَانَ، اَحْمَدُهٗ حَمْدًا کَثِیْرًا طَیِّبًا یَمْلَأُ الصَّحَائِفَ وَ الْمِیْزَانَ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِیْکَ لَهٗ شَهَادَةً تُنَجِّیْنَا مِنْ صِرَاطِ النِّیْرَانِ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَیِّدَنَا وَنَبِیَّنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهُ النَّذِیْرُ لِاَهْلِ الطُّغْیَانِ، وَ الْبَشِیْرُ لِاَهْلِ الْعِرْفَانِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی عَبْدِکَ وَرَسُوْلِکَ مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِاِحْسَانٍ.

اَمَّا بَعْدُ :

اَیُّهَا النَّاسُ! اَلَا وَاِنَّ مِنْ شُعَبِ الْاِیْمَانِ، اَنْ یُّؤْمِنَ الْعَبْدُ بِصَحَائِفِ الْاَعْمَالِ وَالصِّرَاطِ وَالْمِیْزَانِ. یَوْمَ یَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِیْنَ، یُعْطَی الْکِتَابُ بِیَمِیْنِ الصَّالِحِیْنَ وَ بِشِمَالِ الطَّالِحِیْنَ، فَاَمَّا مَنْ اُوْتِیَ کِتَابَهٗ بِیَمِیْنِهٖ فَیَقُوْلُ : هَآؤُمُ اقْرَؤُوْا کِتَابِیَهْ، اِنِّیْ ظَنَنْتُ اَنِّیْ مُلٰقٍ حِسَابِیَهْ، فَهُوَ فِیْ عِیْشَةٍ رَّاضِیَةٍ، فِیْ جَنَّةٍ عَالِیَةٍ. وَاَمَّا مَنْ اُوْتِیَ کِتَابَهٗ بِشِمَالِهٖ فَیَقُوْلُ : یَا لَیْتَنِیْ لَمْ اُوْتَ کِتَابِیَهْ، وَلَمْ اَدْرِ مَا حِسَابِیَهْ، یَا لَیْتَهَا کَانَتِ الْقَاضِیَةَ، مَا اَغْنٰی عَنِّیْ مَالِیَهْ، هَلَکَ عَنِّیْ سُلْطَانِیَهْ. خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ ثُمَّ الْجَحِیْمَ صَلُّوْهُ، ثُمَّ فِیْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُکُوْهُ، اِنَّهٗ کَانَ لَا یُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظِیْمِ. فَمَا الْجَوَابُ اِذَا نُشِرَتِ الْاَوْرَاقُ، وَقُلِّدَتِ الْاَعْنَاقُ، وَظَهَرَتِ الْحَقَائِقُ، وَاُوْضِحَتِ الدَّقَائِقُ! اِذَا کَانَ شَاْنُ صَحَائِفِ الْاَعْمَالِ عَجِیْبًا جِدًّا، وَجَدَ النَّاسُ فِیْهَا کُلَّ شَیْءٍ مِنْ اَعْمَالِ حَیَاتِهِمْ مَوْجُوْدًا، وَ یَقُوْلُ النَّاسُ : مَالِ هٰذَا الْکِتٰبِ لَا یُغَادِرُ صَغِیْرَةً وَّلَا کَبِیْرَةً اِلَّا اَحْصٰهَا، وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا، وَلَا یَظْلِمُ رَبُّکَ اَحَدًا. وَیَسْتُرُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ یَوْمَئِذٍ مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا فِی الدُّنْیَا. قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ :



مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللّٰهُ فِی الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَةِ، وَاللّٰهُ فِیْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا کَانَ الْعَبْدُ فِیْ عَوْنِ اَخِیْهِ.

وَیُوْضَعُ الْمِیْزَانُ لِحِسَابِ حَسَنَاتِ النَّاسِ وَاَوْزَارِهِمْ . قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی : وَنَضَعُ الْمَوَازِیْنَ الْقِسْطَ لِیَوْمِ الْقِیٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَیْئًا، وَاِنْ کَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَیْنَا بِهَا، وَکَفٰی بِنَا حَاسِبِیْنَ. وَقَالَ تَعَالٰی : فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِیْنُهٗ فَهُوَ فِیْ عِیْشَةٍ رَّاضِیَةٍ، وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِیْنُهٗ فَاُمُّهٗ هَاوِیَةٌ، وَمَا اَدْرٰکَ مَا هِیَهْ؟ نَارٌ حَامِیَةٌ. وَاَرْشَدَ النَّبِیُّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اِلٰی اَعْمَالٍ تَثْقُلُ فِی الْمِیْزَانِ. مِنْهَا کَلِمَةُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ. وَمِنْهَا مَا قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : کَلِمَتَانِ حَبِیْبَتَانِ اِلَی الرَّحْمٰنِ ، خَفِیْفَتَانِ عَلَی اللِّسَانِ، ثَقِیْلَتَانِ فِی الْمِیْزَانِ، سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِیْمِ.

وَیُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَیْنَ ظَهْرَانَیْ جَهَنَّمَ. وَاِنَّهٗ اَدَقُّ مِنَ الشَّعْرَةِ وَاَحَدُّ مِنَ السَّیْفِ. فَیَمُرُّ النَّاسُ سَرِیْعًا اَوْ بَطِیْئًا عَلٰی حَسَبِ اَعْمَالِهِمْ. یَمُرُّ بَعْضُهُمْ کَالْبَرْقِ، وَبَعْضُهُمْ کَمَرِّ الرِّیْحِ، وَبَعْضُهُمْ کَمَرِّ الطَّیْرِ وَشَدِّ الرِّحَالِ. تَجْرِیْ بِهِمْ اَعْمَالُهُمْ. وَالنَّبِیُّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ عَلَی الصِّرَاطِ یَقُوْلُ : یَا رَبِّ! سَلِّمْ سَلِّمْ، حَتّٰی تَعْجِزَ اَعْمَالُ الْعِبَادِ، حَتّٰی یَجِیْئَ الرَّجُلُ فَلَا یَسْتَطِیْعُ السَّیْرَ اِلَّا زَحْفًا. قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : وَفِیْ حَافَتَیِ الصِّرَاطِ کَلَالِیْبُ مُعَلَّقَةٌ مَامُوْرَةٌ تَاْخُذُ مَنْ اُمِرَتْ بِهٖ، فَمَخْدُوْشٌ نَاجٍ وَمَکْدُوْسٌ فِی النَّارِ.

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ : وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰی لَهَا سَعْیَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِکَ کَانَ سَعْیُهُمْ مَّشْکُوْرًا.

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.
Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বয়ান নং - ১৬

## পরকালের প্রতি ঈমান

(৫ম পর্ব-জান্নাত ও জাহান্নাম প্রসঙ্গ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِلْغٰوِيْنَ. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : فِى الْحَدِيْثِ الْقُدْسِيِّ: اَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِيْنَ مَالَا عَيْنٌ رَاَتْ، وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَاخَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

আমরা ঈমান সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। পরকালের প্রতি ঈমান সম্বন্ধে আলোচনা করছিলাম। পরকালের প্রতি ঈমান রাখার মধ্যে একটি মৌলিক বিষয় হল জান্নাত ও জাহান্নামের প্রতি ঈমান রাখা।

জান্নাত হল আল্লাহ্‌র নেক বান্দাদের পুরস্কারের জন্য তৈরি করা এক অকল্পনীয় নাজ-নেয়ামতের স্থান। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নেক বান্দাদের জন্য জান্নাতে এমনসব নাজ-নেয়ামত তৈরি করে রেখেছেন যা কোনো চোখ দেখেনি, কোন কান শোনেনি, কারও অন্তরে তার পূর্ণ ধারণাও আসতে পারে না। এইসব মহা নেয়ামতের স্থান হল জান্নাত বা বেহেশ্‌ত। এর কিছুটা বিবরণ দিয়ে এক হাদীছে কুদছীতে বলা হয়েছে,

اَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِيْنَ مَالَا عَيْنٌ رَاَتْ، وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَاخَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ.

(صحيح البخاري برقم ٣٢٤٤ وصحيح مسلم برقم ٧٣١٠)

অর্থাৎ, আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি এমনসব নাজ-নেয়ামত, যা কোন চোখ দেখেনি, কোন কান শোনেনি, না কোন মানুষের অন্তরে তার কল্পনাও আসতে পারে।

চিন্তা করে দেখুন মানুষ কত আকাশ-কুসুম কল্পনা করতে পারে। তারপরও বলা হচ্ছে জান্নাতের নাজ নেয়ামত এত উন্নত মানের যে, মানুষ কল্পনা করেও তার কুল-কিনারা করতে পারবে না। কুরআন শরীফেও বলা হয়েছে,

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ اُخْفِىَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ.

অর্থাৎ, কেউই জানে না তাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর কী লুকায়িত রাখা হয়েছে। (সাজদা: ১৭)

জান্নাতের কোনোকিছুই কল্পনা করা যায় না। জান্নাতের হুরগণ এত সুন্দরী যে হাদীছে বলা হয়েছে,

يُرٰى مُخُّ سُوْقِهِنَّ مِنْ وَّرَاءِ الْعَظْمِ وَاللَّحْمِ. (صحيح البخاري برقم ٣٢٥٤)

অর্থাৎ, তাদের সৌন্দর্যের কারণে তাদের পায়ের গোছার গোশত হাড় ভেদ করে ভিতরের হাড়ের মগজ পর্যন্ত দেখা যাবে। এমন সৌন্দর্যের কথা মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। অন্য এক হাদীছে এসেছে,

وَلَوْ اَنَّ امْرَاَةً مِنْ نِّسَاءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ اِطَّلَعَتْ اِلَى الْاَرْضِ لَاَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا. (صحيح البخاري برقم ٦٥٦٨)

অর্থাৎ, জান্নাতের একজন নারী যদি দুনিয়ায় উকি মেরে তাকাতো, তাহলে আসমান-যমীনের মধ্যবর্তী সবকিছু উজ্জ্বল হয়ে যেত। সুবহানাল্লাহ্‌! এমন সৌন্দর্য কেউ কল্পনাও করতে পারে কি?

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



এমনিভাবে জান্নাতের সবকিছুই অকল্পনীয়। জান্নাতের নহর সম্পর্কে বলা হয়েছে,

عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ يُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِيْرًا. (الدهر: ٦)

অর্থাৎ, জান্নাতের নহর এমন হবে যে, মানুষ. তা চালনা করতে পারবে। রেওয়ায়েতে এসেছে, জান্নাতী মানুষের হাতে ছড়ি থাকবে, সে যেখানে যাবে, ছড়ির ইশারায় নহর সে দিকে চলতে থাকবে। এমন নহরের কথা কেউ কল্পনাও করতে পারে না, যা হাতের ইশারায় এখানে সেখানে গমন করবে।

জান্নাতের গাছ সম্পর্কে বলা হয়েছে,

اِنَّ فِى الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِى ظِلِّهَا مِاْةَ عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا. (صحيح البخاري ٣٢٥١ ومسلم ٧٣١٦)

অর্থাৎ, জান্নাতে এমন বৃক্ষ আছে, একজন দ্রুতগামী আরোহী একশত বছর সায়ের করেও যার ছায়া অতিক্রম করতে পারবে না।

সুবহানাল্লাহ! এমন মহা বিশাল গাছের কথাও কেউ কল্পনা করতে পারে না। এইসব গাছগুলো সম্পর্কে এক হাদীছে এসেছে– বান্দা যখন একবার সুবহানাল্লাহ পড়ে, তার জন্য জান্নাতের একটা গাছ বরাদ্দ হয়ে যায়। অর্থাৎ এত পরিমাণ জায়গাসহ তার জন্য বরাদ্দ হয়ে যায়। আল-হামদু লিল্লাহ, আল্লাহু আকবার পাঠ করলেও একেকটা গাছ তার জন্য বরাদ্দ হয়ে যায়।

জান্নাতের একটা গাছ যদি এত জায়গা নিয়ে বিস্তৃত হয়ে থাকে, তাহলে জান্নাতের সমস্ত এরিয়া কত বিশাল! হাদীছে বলা হয়েছে, সবচেয়ে নিম্নস্তরের জান্নাতী যে হবে, তার জন্য জান্নাতে দশ দুনিয়ার পরিমাণ জায়গা দেয়া হবে। এক যুগে অনেকের কাছে এটা অবিশ্বাস্য মনে হয়েছে যে, এত জায়গা কোথায়? বিধর্মীরা বলেছে এগুলো কাল্পনিক কথা! এগুলো মুসলমানদের অন্ধবিশ্বাস! কিন্তু সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা যে তথ্য দিচ্ছে তার কারণে এখন আর এটাকে অন্ধবিশ্বাস বলে মনে হচ্ছে না। এখন বিজ্ঞানীদের কথায়ও মনে হচ্ছে যে, উর্ধ্ব জগতে এত বিশাল জায়গা রয়েছে যা কল্পনা করেও শেষ করা যাবে না। উর্ধ্ব জগতে এত জায়গা রয়েছে যে, সর্বনিম্ন জান্নাতীকে দশ দুনিয়া পরিমাণ জায়গা কেন এরচেয়েও বেশি জায়গা দিলেও তা ফুরাবে না।

বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত সবচেয়ে দূরের যে নক্ষত্র আবিষ্কার করেছে, সেটাকে বলা হয় কোয়াসার। বিজ্ঞানীদের হিসেবে এটা এক হাজার কোটি আলোকবর্ষ দূরে। আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে এক লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল, অর্থাৎ প্রায় তিন লক্ষ কিলোমিটার। অতএব এক হাজার কোটি আলোকবর্ষ দূরে থাকার অর্থ হল– কোন দিন যদি এমন যানবাহন আবিষ্কার করা সম্ভব হয়, যা আলোর গতির মত প্রতি সেকেন্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল বেগে চলতে সক্ষম, আর সেই যানবাহনে চড়ে কেউ যদি দুনিয়া থেকে রওনা দেয়, তাহলে সেই কোয়াসার পর্যন্ত পৌঁছতে তার সময় লাগবে ১ হাজার কোটি বছর। আরও একটা কথা জানা দরকার – কুরআন শরীফে বলা হয়েছে,

اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ نِ الْكَوَاكِبِ. (الصافات : ٦)

অর্থাৎ, এইসব গ্রহ-নক্ষত্র দ্বারা আমি প্রথম আসমানকে সজ্জিত করেছি। (সাফফাত: ৬)

অতএব এই কোয়াসারসহ সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্র প্রথম আসমানের নীচে, এর উপরে যেয়ে প্রথম আসমান। প্রথম আসমান পুরষ হল দুনিয়া থেকে নিয়ে প্রথম আসমানের নীচ পর্যন্ত যত দূরত্ব এতখানি। এরপর দ্বিতীয় আসমানের মধ্যবর্তী ফাকা স্থান। এই ফাকা স্থানের দূরত্ব হল দুনিয়া থেকে নিয়ে প্রথম আসমানের উপর পর্যন্ত যত দূরত্ব ততখানি। এইভাবে ডবল ডবল হারে বাড়তে বাড়তে দ্বিতীয় আসমান, তৃতীয় আসমান, চতুর্থ আসমান, পঞ্চম আসমান, ষষ্ট আসমান ও সপ্তম আসমান। সপ্তম আসমানের উপরে হল জান্নাত। তাহলে এখন চিন্তা করে দেখুন – প্রথম আসমানের নীচে যদি

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

এত জায়গা হয়, তাহলে সপ্তম আসমান পর্যন্ত কত জায়গা? সেই সপ্তম আসমানের উপরে জান্নাতে কত জায়গা? মানুষ কোনদিন হিসেব করেও বের করতে পারবে না জান্নাতে কত জায়গা আছে। অতএব সর্বনিম্ন জান্নাতীকে দশ দুনিয়া পরিমাণ জায়গা কেন, যদি দশ হাজার দুনিয়া পরিমাণও দেয়া হয়, তবুও জান্নাতের জায়গা ফুরাবে না। জান্নাতের জায়গা অফুরন্ত।

জান্নাতের জায়গা যেমন অফুরন্ত, জান্নাতের নাজ-নেয়ামতও অফুরন্ত। জান্নাতের নাজ-নেয়ামত ভোগ করার সুযোগও থাকবে অফুরন্ত। জান্নাতে মানুষকে নাজ-নেয়ামত ভোগ করার অফুরন্ত সুযোগ দেয়া হবে, অবাধ স্বাধীনতা দেয়া হবে। জান্নাতে মানুষ যা চাইবে, তা পাবে। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

وَ لَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْٓ اَنْفُسُكُمْ وَ لَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ.

অর্থাৎ, পরকালে জান্নাতে তোমাদের জন্য থাকবে যা তোমাদের মনে চায়। জান্নাতে একটা পাখি উড়ে যেতে থাকবে, আর কোন জান্নাতী মনে মনে ভাববে– যদি এই পাখিটার গোশত খেতে পারতাম, সাথে সাথে পাখিটা ভুনা হয়ে প্লেটে করে তার সামনে হাজির হয়ে যাবে। কুরআন শরীফে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে,

وَ لَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ.

অর্থাৎ, তাদের জন্য থাকবে পাখির গোশত, যা তাদের মনে চাইবে। (ওয়াকিয়াহ: ২১)

এভাবে সে যা চাইবে, তা পাবে। এর চেয়ে আর অবাধ স্বাধীনতা কী হতে পারে যে, সে যা চাইবে তা-ই পাবে? এই অবাধ স্বাধীনতা পাওয়া যাবে কীসের বিনিময়ে? দুনিয়াতে নিজের উপর শরীআতের নিয়ন্ত্রণ লাগিয়ে চলতে হবে, তাহলে পরকালে নিয়ন্ত্রণ মুক্ত অবাধ স্বাধীনতা, অবাধ খুশি পাওয়া যাবে। দুনিয়াতে মু'মিনের জীবন তাই শরীআতের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখতে হবে। দুনিয়াতে তারা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকবে, তাহলে আখেরাতে নিয়ন্ত্রণ মুক্ত জীবন লাভ করতে পারবে। তখন যা ইচ্ছা তাই করতে পারবে। আর দুনিয়াতে যারা শরীআতের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে, আখেরাতে তাদের উপর চরম কঠিন নিয়ন্ত্রণ আসবে। শিকলে বেঁধে তাদেরকে জাহান্নামের নিয়ন্ত্রণে রাখা হবে। দুনিয়াতে একটু নিয়ন্ত্রণ মেনে চললে আখেরাতে বাঁধা-বন্ধনহীন আনন্দ-ফূর্তির সুযোগ পাওয়া যাবে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে তাওফীক দান করেন। আমরা যেন আল্লাহ্‌র হুকুমের ভিতরে নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন করতে পারি, যেন আখেরাতে অফুরন্ত অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীন জীবন যাপন করতে পারি, অবাধ সুখ-শান্তি লাভ করতে পারি। আমীন!

জান্নাতের এই বিশাল জায়গা, এইসব গাছপালা ইত্যাদি নাজ-নেয়ামত আগে থেকেই তৈরি করে রাখা হয়েছে। এমন নয় যে, এখন কিছুই নেই, পরে সব তৈরি করা হবে। আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সর্বসম্মত মত হল জান্নাত-জাহান্নাম এখনই সৃষ্টরূপে বিদ্যমান আছে। এমন নয় যে, পরবর্তীতে তা সৃষ্টি করা হবে। কুরআন শরীফে বলা হয়েছে,

وَ سَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَ الْاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ.

অর্থাৎ, তোমরা ধাবমান হও স্বীয় প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে এবং সেই জান্নাতের দিকে যার বিস্তৃতি আসমান ও যমীনের ন্যায়; অর্থাৎ মহা বিশাল, যা প্রস্তুত রাখা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য। (আলে ইমরান: ১৩৩)

পূর্বে যে হাদীছে কুদছীটি উল্লেখ করা হয়েছে, তার মধ্যে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, اَعْدَدْتُ অর্থাৎ, আমি প্রস্তুত রেখেছি। এ শব্দটি থেকেও স্পষ্টত বুঝা যায় যে, জান্নাতের নেয়ামতরাজি পূর্বাহ্নেই সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



যদি কেউ মনে করেন হিসাব-নিকাশের পর মানুষ জান্নাতে যাবে, এর এত পূর্বে এসব সৃষ্টি করে রাখা ফায়দাহীন। এর উত্তর হল আগেই সৃষ্টি করে রাখা ফায়দাহীন নয়। বর্তমানেও সেখানে হুর গেলমানদের অবস্থান রয়েছে। আগে সৃষ্টি করে রাখার মধ্যে যেসব মেহমানদের জন্য তা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে, তাদের গুরুত্ব বোঝায়। নিয়ম হল যত বেশি গুরুত্বপুর্ণ মেহমান হয়, তার জন্য যোগাড় গোছাল তত আগে থেকেই শুরু হয়। এ ছাড়া আগে সৃষ্টি করে রাখার মধ্যে আরও কোন হেকমত নিহিত থাকতে পারে যা আমাদের বোধগম্য নয়। আল্লাহ্‌র সৃষ্টির হেকমত সম্বন্ধে এমনিতেই জিজ্ঞাসা করার অধিকার নেই। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْئَلُوْنَ.

অর্থাৎ, তিনি যা করেন সে বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা যাবে না, বরং তাদেরকে অর্থাৎ মানুষকে প্রশ্ন করা হবে। (আম্বিয়া: ২৩)

জান্নাত কোন কল্পিত বিষয় নয়, বরং তার বাস্তব অস্তিত্ব রয়েছে। অস্তিত্বশীল হিসেবেই তা মওজুদ রয়েছে এবং অনন্তকাল বিদ্যমান থাকবে। জান্নাত কোন কল্পিত বিষয় নয়। মে'রাজে নবী কারীম (সা.)কে জান্নাত দেখানো হয়েছিল। নবী কারীম (সা.) জান্নাত স্বচক্ষে দেখে এসে জান্নাতের বর্ণনা দিয়েছেন। তার বর্ণনার মধ্যে একটা বর্ণনা এরূপ – রাসূল (সা.) বলেন, আমাকে জান্নাতের এমন সুন্দর ঘরের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

فَاِذَا فِيْهَا جَنَابِذُ اللُّؤْلُؤِ وَاِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ. (صحيح البخاري برقم ٣٣٤٢ وصحيح مسلم برقم ٤٣٣)

অর্থাৎ, যে ঘরগুলোর গম্বুজ বড় বড় মুক্তা দিয়ে তৈরি। আর সেই জান্নাতের মাটি হল মেশ্‌ক আম্বরের, আগেই বলা হয়েছে জান্নাতের সবকিছুই কল্পনাতীত। মুক্তার গম্বুজ হতে পারে আর মেশ্‌ক আম্বরের মাটি হতে পারে, এটাও কল্পনাতীত বিষয়।

জান্নাতের অবস্থান এখন কোথায় এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। তবে অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মতে জান্নাত আকাশসমূহের উপর। মে'রাজে নবী কারীম (সা.) হযরত জিব্রাঈল (আ.)কে সপ্তম আসমানের উপর সিদরাতুল মুনতাহার কাছে দেখেছিলেন। এই বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَ لَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى، عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى، عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى.... الاية.

'অর্থাৎ, আর সে তাকে (জিব্রাঈলকে) দেখেছিল সিদরাতুল মুনতাহা-র কাছে; যার নিকট জান্নাতুল মা'ওয়া অবস্থিত'। (নাজ্‌ম: ১৩-১৫)

এই সিদ্‌রাতুল মুনতাহার কাছে রাসূল (সা.) হযরত জিব্রাঈল (আ.) কে তার আসল রূপে দেখেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন জিব্রাঈল (আ.)-এর ছয়শত ডানা আছে। তিনি এত বড় যেন মহাকাশের দুই প্রান্ত পর্যন্ত ভরে গেছে।

যাহোক এ আয়াত দ্বারা স্পষ্টত জানা গেল যে, সিদরাতুল মুনতাহার কাছে জান্নাত। আর সিদরাতুল মুনতাহা যে সপ্তম আসমানের উপর, তা বহু সহীহ হাদীছে এসেছে। অতএব বুঝা গেল জান্নাত আসমান সমূহের উপর।

সিদ্‌রাতুল মুনতাহা শব্দের মধ্যে 'সিদ্‌রাতুন' শব্দের অর্থ বরই গাছ, আর 'মুনতাহা' অর্থ সর্বশেষ স্টেশন। এই জায়গাটা হল সর্বশেষ স্টেশন। এটাকে 'সিদরাতুল মুনতাহা' বা সর্বশেষ স্টেশন বলার কারণ হল– দুনিয়া থেকে যত ফিরিশতারা উপরের দিকে যান, তারা ঐ পর্যন্ত যেতে পারেন, এর উপরে

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

আর যেতে পারেন না। তাই মে'রাজে এখান থেকে যখন রাসূল (সা.)কে আরও উর্ধ্বে আল্লাহর দরবার পর্যন্ত নেয়া হয়েছিল, তখন হযরত জিব্রাঈল (আ.) নবী কারীম (সা.)কে বলেছিলেন, 'এবার আপনি একাই যাবেন, আমার পক্ষে আর উপরে যাওয়া সম্ভব নয়'। কবির ভাষায়,

اگرایک سر موئے برترپرم+فروغ تجلی بسوزدپرم

অর্থাৎ, আর যদি একবার ডানা মেরেও উপরে যেতে যাই, তাহলে আল্লাহর তাজাল্লীতে আমার ডানা পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে! রাসূল (সা.) বলেছেন, এই সিদ্‌রাতুল মুন্‌তাহা-র যে বরই গাছ, এই বরই গাছের এক একটা বরই হল হাজারের মটকার মত। তখনকার যুগে হাজার নামক জায়গায় বড় বড় মটকা তৈরি হত। গ্রাম দেশে এখনও এরকম বড় বড় মটকা দেখা যায়। এরকম মটকার মত একেকটা বরই হবে। রাসূল (সা.) বলেন, তার একেকটা পাতা হল হাতির কানের মত। অনেকে ভাবতে পারেন মটকার মত এতবড় বরই মানুষ খাবে কী করে? তখন মানুষের মুখটাও অনেক বড় হবে। এখন সাড়ে তিন হাত মানুষের গাল যদি তিন চার ইঞ্চি চওড়া হয়, তাহলে জান্নাতের মানুষ যারা ৬০ হাত লম্বা হবেন তাদের গাল কত চওড়া হবে? অন্তত চার পাঁচ হাত চওড়া তো হবেই। কাজেই ঐ রকম বড় বরই না হলে তো টের-ই পাওয়া যাবে না। যাহোক যা বলা হচ্ছিল, সপ্তম আসমানের উপর এই সিদরাতুল মুনতাহার কাছে হল জান্নাত। সপ্তম আসমান হল জান্নাতের ফ্লোর, আর সপ্তম আসমানের উপর আল্লাহ্‌র আরশ হল জান্নাতের ছাদ। এক হাদীছে নবী কারীম (সা.) জান্নাতুল ফিরদাউসের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন,

وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمٰنِ. (صحيح البخاري برقم ٢٧٩٠)

'অর্থাৎ, তার উপরে হচ্ছে দয়াময় আল্লাহ্‌র আরশ'।

যাহোক এই সিদ্‌রাতুল মুন্‌তাহার পাশে আছে জান্নাত। রাসূল (সা.) বলেছেন, আমাকে জান্নাতের সব স্তর ঘুরিয়ে দেখানো হয়েছে। সাধারণ মুসলমানরা কোন স্তরে থাকবেন, বিশেষ বিশেষ মু'মিনরা কোন স্তরে থাকবেন সব দেখানো হয়েছে। রাসূল (সা.) বলেন–একটা সাধারণ ঘর দেখিয়ে আমাকে বলা হয়েছে–এটা হল সাধারণ মু'মিনদের জান্নাত। বুঝা গেল– বিশেষ মু'মিনদের জান্নাত আরও উন্নত মানের। রাসূল (সা.) বলেছেন, 'আমাকে আরও একটা জান্নাত দেখানো হয়েছে, যেটা এর চেয়ে আরও উন্নত মানের ছিল। আমাকে বলা হয়েছে-এটা হল শহীদদের জন্য'। যারা আল্লাহর রাস্তায় জেহাদে শরীক হয়ে শহীদ হয়ে যায়, তাদের জন্য এই মর্যাদার স্তর রাখা হয়েছে। রাসূল (সা.) বলেছেন, 'আমাকে আরও একটা সুন্দর ঘর দেখিয়ে বলা হয়েছে এটা হল আপনার ঘর, এখানে আপনাকে রাখা হবে। আমি বলেছি আমাকে এখানে ঢুকতে দেয়া হোক'। তখন বলা হয়েছে আপনার দুনিয়ার সময় এখনও রয়ে গেছে। রাসূল (সা.) বলেছেন, 'জান্নাতে আমি বেলালের খড়মের আওয়াজ শুনেছি। বেলাল দুনিয়াতে যে খড়ম নিয়ে চলে, তার যে আওয়াজ, সেই আওয়াজ আমি শুনতে পেয়েছি'। বেলাল (রা.) শুনে খুশিতে কেঁদে ফেলেছেন। রাসূল (সা.) আরও বলেছেন, 'জান্নাতে আমি এক সুন্দরী মহিলা দেখেছি। জিজ্ঞাসা করেছি এ কার মহিলা? বলা হয়েছে ওমরের মহিলা। আমি ওমরের শরমে তার সাথে কথা বলিনি যে, ওমর আবার কী মনে করবে যে, আমার লোকের সাথে হুজুর কথা বলেছেন। সে আবার আর্তমর্যাদায় আঘাত বোধ করে কি-না'। হযরত ওমর (রা.) শুনে কেঁদে দিয়ে বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার ব্যাপারেও আমার আত্মমর্যাদায় আঘাত বোধ হতে পারে'? এভাবে রাসূল (সা.)কে জান্নাতের বিভিন্ন স্তর দেখানো হয়েছে।

এতক্ষণ জান্নাত সম্পর্কে কিছু কথা বলা হল। জান্নাতকে বিশ্বাস করা ঈমানের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এমনিভাবে জাহান্নাম বা দোযখকে বিশ্বাস করাও ঈমানের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। জান্নাত হল আল্লাহ্‌র নেক বান্দাদের পুরস্কারের জন্য তৈরি করা এক অকল্পনীয় নাজ-নেয়ামতের স্থান। আর জাহান্নাম বা দোযখ হল পাপীদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য তৈরি করা এক অকল্পনীয় আযাবের স্থান।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



জান্নাতের নাজ-নেয়ামত যেমন অকল্পনীয়, জাহান্নামের শাস্তি এবং সেই শাস্তির উপকরণও অকল্পনীয়। জাহান্নামের মধ্যে রাখা হয়েছে আগুন। সেই আগুনের তেজও অকল্পনীয়। হাদীছে এসেছে জাহান্নামের আগুনের তেজ দুনিয়ার আগুনের চেয়ে সত্তর গুণ বেশি। আল্লাহ আমাদেরকে এই আগুন থেকে হেফাযত করুন। সেই আগুনের মধ্যে রয়েছে সাপ, বিচ্ছু ইত্যাদি। সেই সাপ বিচ্ছুর বিষও অকল্পনীয়। আল্লাহ আমাদেরকে এ থেকে হেফাযত করুন। জাহান্নামে পাপীদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য তাদের দেহ এত বড় করে দেয়া হবে যে, হাদীছে এসেছে -তাদের একেকটা দাঁত হবে ওহুদ পাহাড়ের মত, তাদের গায়ের চামড়া পুরু হবে তিন দিন সফর করার মত দুরত্ব পরিমাণ, তাদের এক কাধ থেকে আরেক কাধ পর্যন্ত দুরত্ব হবে তিন দিন সফর করার মত দূরত্ব পরিমাণ। এত বড় বিশাল দেহের কথাও কেউ কল্পনা করতে পারে না। জাহান্নামের মধ্যে থাকবে এক ধরনের গাছ, যার ফল হবে বিষাক্ত কাঁটা যুক্ত। জাহান্নামীরা এই ফল আহার করবে। এই গাছের নাম যাক্কুম গাছ। আগুনের মধ্যে গাছ বাঁচতে পারে এটাও কল্পনা করা যায় না। কুরআন শরীফে যাক্কুম গাছ সম্পর্কে বলা হয়েছে,

إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوْمِ، طَعَامُ الْأَثِيْمِ.

অর্থাৎ, যাক্কুম বৃক্ষ হবে পাপীদের খাবার। (দুখান: ৪৩-৪৪) আল্লাহ আমাদেরকে এ থেকে হেফাযত করুন।

জাহান্নাম এখন কোথায়? এ ব্যাপারে অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মত হল জাহান্নাম যমীনের নীচে অবস্থিত। তবে ঠিক নির্দিষ্ট কোথায় এ ব্যাপারে স্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায় না বলে নিশ্চিত করে কিছু না বলে এর জ্ঞান আল্লাহ্‌র উপরই ন্যস্ত করতে হবে। তবে কোন জায়গায় তা নিশ্চিত করে বলা না গেলেও জাহান্নাম এখন আসমানের নীচে দুনিয়াতেই রয়েছে একথা নিশ্চিত। দুনিয়ার কোন এক জায়গায় ক্ষুদ্র আকারে সংকুচিত অবস্থায় জাহান্নামকে রাখা হয়েছে। কিয়ামতের দিন এটাকে বিস্তৃত করে সপ্তম আসমানের নীচ পর্যন্ত পুরো স্থানকে জাহান্নামে পরিণত করে দেয়া হবে। হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী সাহেব (রহ.) লিখেছেন জাহান্নাম এখন কোথায়- এ সম্পর্কে হাদীছে বলা হয়েছে,

إِنَّ جَهَنَّمَ تَحْتَ الْأَرْضِ السَّابِعَةِ. (رواه الحاكم في المستدرك برقم ٨٩٤٣)

অর্থাৎ, যমীনের সপ্তম স্তরের নীচে জাহান্নাম রয়েছে।

কীভাবে রয়েছে তা আল্লাহ পাকই ভাল জানেন। ইউরোপ থেকে একবার চেষ্টা করা হয়েছিল যে, মাটি খুড়ে সরাসরি প্রাচ্যের সাথে একটা সংক্ষিপ্ত রাস্তা করা যায় কি-না। তারা চেষ্টা করে দেখল যমীন খুড়ে চার মাইল পর্যন্ত নীচে যাওয়া যায়, এরপর আর নীচে যাওয়া যায় না। এর নীচে আর তারা খুড়তে পারে না। এর নীচে এমন শক্ত পাথরের স্তর আসে, যা পৃথিবীর কোন শক্তিশালী মেশিন দিয়েও কাটা সম্ভব নয়। কয়েক জায়গায় এরকম খোড়ার চেষ্টা করে একই অবস্থা দেখা গেল। তারা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখেছে– এর ভিতরে মারাত্মক ধরনের কোন দাহ্য পদার্থ রয়েছে, যা একটা কঠিন পাথরের আবরণ দিয়ে ঘেরা। হতে পারে এখানেই আল্লাহ পাক জাহান্নামকে রেখেছেন। কিংবা যদি এটা নাও হয়, তবুও যেভাবেই হোক জাহান্নামকে দুনিয়ার সপ্তম স্তরের নীচে রাখা হয়েছে। কিয়ামতের দিন এটাকে বিস্তৃত করে দেয়া হবে। সপ্তম আসমানের নীচ পর্যন্ত পুরো এলাকা জাহান্নামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

জাহান্নামের সাতটি স্তর বা সাতটা দরজা থাকবে। এটাকেই বলা সাত দোযখ। একেক স্তরের শাস্তির ধরন হবে একেক রকম। অপরাধ অনুসারে যে যে স্তরের উপযোগী হবে তাকে সে স্তরে নিক্ষেপ করা হবে। এই সাতটা স্তরের নাম হল – জাহান্নাম, লাযা, হুতামা, সায়ীর, সাকার, জাহীম ও হাবিয়া। কুরআন শরীফে সবগুলো সম্পর্কে বর্ণনা এসেছে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে হেফাযত করুন। আমীন!

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

## বয়ান নং ১৬-এর খুতবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ تَعَالٰى وَهُوَ الْكَرِيْمُ الْجَبَّارُ، وَنَعُوْذُ بِهٖ مِنْ حَالِ اَهْلِ النَّارِ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ شَهَادَةً تُبَلِّغُنَا دَارَ الْقَرَارِ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ سَيِّدُ الْاَتْقِيَاءِ الْاَبْرَارِ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً وَّسَلَامًا دَائِمَيْنِ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَاٰنَاءَ النَّهَارِ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الْبَرَرَةِ الْاَخْيَارِ.

اَمَّا بَعْدُ :

اَيُّهَا النَّاسُ! اِنَّ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ حَقٌّ، وَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى خَلَقَ لِلْجَنَّةِ اَهْلًا خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِيْ اَصْلَابِ اٰبَائِهِمْ، وَخَلَقَ لِلنَّارِ اَهْلًا خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِيْ اَصْلَابِ اٰبَائِهِمْ. خَلَقَ الْجَنَّةَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ، وَخَلَقَ النَّارَ لِلْمُنَافِقِيْنَ وَالْكَافِرِيْنَ. اَلَا وَاِنَّ الْاِيْمَانَ بِاللّٰهِ هُوَ مِفْتَاحُ الْجِنَانِ، فَصَدِّقُوْا اِيْمَانَكُمْ بِاَعْمَالِكُمْ لِلنَّجَاةِ عَنِ النِّيْرَانِ. وَاتَّقُوا اللّٰهَ عِبَادَ اللّٰهِ! فَاِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ، وَنَكَالَ الْمُجْرِمِ فِي الْجَحِيْمِ كُلَّ يَوْمٍ يَزِيْدُ، وَدَارَ غَضَبِ اللّٰهِ تُنَادِيْ بِاَعْدَائِهٖ هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ، هٰذَا وَقَدْ اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ غَيْرَ بَعِيْدٍ.

وَاعْلَمُوْا اَنَّ الْجَنَّةَ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ، قَالَ تَعَالٰى : وَسَارِعُوْا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ. وَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَعَدَّ فِيْهَا مِنَ النَّعِيْمِ وَالْحُوْرِ وَالْغِلْمَانِ، مَا لَا تَخْطُرُ بِعُقُوْلِ الْاِنْسَانِ، وَفِي الْحَدِيْثِ الْقُدْسِيِّ : اَعْدَدْتُّ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِيْنَ مَا لَا عَيْنٌ رَاَتْ، وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَقَالَ فِي الْقُرْاٰنِ : فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ. وَقَالَ اَيْضًا : وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ. نُزُلًا مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ. وَقَالَ تَعَالٰى : عَيْنًا

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



يَّشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ يُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِيْرًا. وَقَالَ تَعَالٰى : وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ، وَحُوْرٌ عِيْنٌ كَاَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُوْنِ، جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ. وَقَدْ بَيَّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحْوَالَ الْجَنَّةِ الْعَجِيْبَةَ، مِنْهَا اَنَّ فِي الْجَنَّةِ لَحُوْرًا يُرٰى مُخُّ سُوْقِهِنَّ مِنْ وَّرَاءِ الْعَظْمِ وَاللَّحْمِ. وَاَنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَّسِيْرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِأَةَ عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا. وَاَنَّ الْجَنَّةَ فِيْهَا جَنَابِذُ اللُّؤْلُؤِ وَ تُرَابُهَا الْمِسْكُ. وَهٰذَا الشَّاْنُ وَالْحَالُ، لَا تَفْهَمُهُ الْعُقُوْلُ وَالْبَالُ، فَتَهَيَّاُوْا لَهَا قَبْلَ اَنْ يَّجِيْءَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خِلَالٌ.

اَيُّهَا النَّاسُ ! وَاِنَّ النَّارَ–اَعَاذَنَا اللّٰهُ مِنْهَا –اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِيْنَ. وَفِي النَّارِ اَنْوَاعٌ مِّنَ الْعَذَابِ الْغَرَامِ، يَتَحَيَّرُ مِنْهَا الْعُقُوْلُ وَالْاَفْهَامُ، قَالَ تَعَالٰى : اِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّوْمِ، طَعَامُ الْاَثِيْمِ، كَالْمُهْلِ يَغْلِيْ فِي الْبُطُوْنِ، كَغَلْيِ الْحَمِيْمِ، خُذُوْهُ فَاعْتِلُوْهُ اِلٰى سَوَاءِ الْجَحِيْمِ، ثُمَّ صُبُّوْا فَوْقَ رَاْسِهٖ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ، ذُقْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ. وَفِيْ اٰيَةٍ اُخْرٰى – وَمِنْ وَرَائِهٖ جَهَنَّمُ وَيُسْقٰى مِنْ مَّآءٍ صَدِيْدٍ، يَتَجَرَّعُهٗ وَلَا يَكَادُ يُسِيْغُهٗ وَيَاْتِيْهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، وَمِنْ وَّرَائِهٖ عَذَابٌ غَلِيْظٌ.

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ : اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيْهَا، اُولٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ. اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ. جَزَائُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا. رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ. ذَالِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهٗ.

بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِي الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ، وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. اَقُوْلُ قَوْلِيْ هٰذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَاسْتَغْفِرُوْهُ، اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বয়ান নং -১৭

## তাকদীরের প্রতি ঈমান

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: وَكُلُّ شَيْئٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ. وَقَالَ تَعَالٰى : وَمَا تَشَآءُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : لَا تَقُوْلُوْا لَوْ، فَاِنَّ لَوْ تَفْتَحُ اَبْوَابَ الشَّيْطَانِ.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

আমরা ঈমান সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। পূর্বে বলা হয়েছিল মৌলিক ৬টা বিষয়ের প্রতি ঈমান রাখতে হয়। তার মধ্যে আল্লাহর প্রতি ঈমান, আল্লাহর প্রেরিত নবী-রাসূলদের প্রতি ঈমান, আল্লাহর প্রেরিত আসমানী কিতাবের প্রতি ঈমান, ফিরিশতাদের প্রতি ঈমান এবং পরকালের প্রতি ঈমান এই পাঁচটা বিষয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। ৬ষ্ট বিষয় হল তাকদীরের প্রতি ঈমান রাখা। সাধারণভাবে আমরা বলি তাকদীর অর্থ ভাগ্য। কিন্তু তাকদীর অর্থ শুধু ভাগ্য নয়। তাকদীরের অর্থ অনেক ব্যাপক। তাকদীর-এর অর্থ পরিকল্পনা, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন-এর পরিকল্পনা। দুনিয়ার শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত যা কিছু হয়েছে এবং হবে এই সবকিছুর ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার যে মহা পরিকল্পনা, সেই মহা পরিকল্পনাকে বলা হয় তাকদীর। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সবকিছু সৃষ্টি করার আগে সবকিছুর পরিকল্পনা করে রেখেছেন। সবকিছুর নকশা তৈরি করে রেখেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন লওহে মাহ্ফূজকে তৈরি করে, কলম তৈরি কলমকে বলে দিয়েছেন সব লিখে রাখ! কলম জিজ্ঞাসা করেছে: مَاذَا اَكْتُبُ অর্থাৎ, হে আল্লাহ! কী লিখব? আল্লাহ তা'আলা বলেছেন اُكْتُبِ الْقَدْرَ অর্থাৎ, আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সবকিছুর তাকদীর লিখে রাখ। সে অনুযায়ী কলম আদি-অন্তের সবকিছু লিখে রাখে। এই যে লিখে রাখা হয়েছে এই যে সবকিছুর নকশা এঁকে রাখা হয়েছে, এটাকেই বলা হয় তাকদীর। তাকদীরে বিশ্বাসের অর্থই হল আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সবকিছু সৃষ্টি করার আগে সবকিছু জানেন, সেভাবে লিখে রেখেছেন এবং সেভাবেই সবকিছু ঘটছে এবং ঘটবে। তাকদীরে বিশ্বাসের মধ্যে লওহে এবং কলমে বিশ্বাস করার কথাও তাই এসে যায়। লওহ অর্থ ফলক। সবকিছু যে ফলকে লিখে রাখা হয়েছে সেটাই লওহ। আর লিখে রাখা হয়েছে বিশেষ এক কলম দিয়ে। সেটা হল কলম।

তাকদীরে বিশ্বাস করার মধ্যে একথাও রয়েছে যে, আল্লাহ পাকই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। ভাল-মন্দ সবকিছুই আল্লাহ পাকের সৃষ্টি। আল্লাহ তা'আলা সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। এমনকি আমাদের মনে যে ইচ্ছা জাগে, এই ইহাও আল্লাহর সৃষ্টি। এটাও তাকদীর বা আল্লাহর পরিকল্পনা অনুযায়ী হয়ে থাকে। কুরআনে পাকে ইরশাদ হয়েছে,

وَمَا تَشَآءُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ. (দাহর : ৩০)

অর্থাৎ, আল্লাহর ইচ্ছা না হলে তোমাদের ইচ্ছাও হতে পারে না। এই ইচ্ছাকেও আল্লাহ তৈরি করেন।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। ভাল হোক, মন্দ হোক সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা তিনি। এরকম নয় যে, ভালটা একজন সৃষ্টি করেছেন মন্দটা আরেকজন সৃষ্টি করেছেন। যেমন হিন্দুদের ধারণা হল, ভাল সব কিছু করে লক্ষী দেবী, আর খারাপটা করে শনি দেবতা। এভাবে তারা ভাল ও মন্দের দুই

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



খোদা সাব্যস্ত করেছে। আমাদের ইসলামে খোদার ক্ষেত্রে এরকম ভাগা ভাগী নেই বরং সবকিছু আল্লাহ করেন। ভালটাও তিনি করেন, খারাপটাও তার হুকুমে হয়ে থাকে। ভাল, মন্দ সবটাই আল্লাহর এখতিয়ারে। কিন্তু আমাদের কথার মধ্যে এই আদব থাকতে হবে যে, ভাল কিছু হলে বলব আল্লাহ করেছেন, কিন্তু খারাপ কিছু ঘটলে বলব না যে, আল্লাহ এটা করেছেন। যেমন, আমার সন্তান সুস্থ হয়ে গেল, ভাল হয়ে গেল তাহলে বলব আল্লাহ পাক সুস্থ করে দিয়েছেন বা আল্লাহ পাকের রহমতে ভাল হয়ে গেছে। কিন্তু সন্তান অসুস্থ হলে বলব না যে, আল্লাহ পাক অসুস্থ করে দিয়েছেন। অর্থাৎ, খারাপটাকে সরাসরি আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত করব না। এটা হল কথার আদব। কিন্তু করেন সবটাই আল্লাহ। ভালটাও আল্লাহ করেন, খারাপটাও যা ঘটে তাও আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে হয় না। হিন্দুদের বিশ্বাস হল ভালটা করে লক্ষী দেবী, আর খারাপটা করে শনি দেবতা। সম্ভবত এ থেকেই এরকম কথার প্রচলন ঘটেছে যে, আমাদের সন্তান ভাল কিছু করলে আমরা বলি কি সুন্দর লক্ষী ছেলে আমার। আর খারাপ কিছু হলে বলি কপালে শনি লেগেছে! এগুলো হিন্দুয়ানী বিশ্বাসের কথা। মুসলমানদের এসব কথা বলা উচিত নয়। মুসলমানদের কথা হবে মুসলমানদের ঈমান-আকীদার স্টাইলে। হিন্দুদের আকীদা-বিশ্বাসের স্টাইলে মুসলমানদের কথা হতে পারে না। অন্য কোন ধর্মের আকীদা-বিশ্বাসের স্টাইলেও মুসলমানদের কথা হতে পারে না। অথচ অনেক কথাই আমরা সেরকম বলে থাকি। যেমন মাতা-পিতাকে বা উস্তাদ মুরব্বীকে অনেকে বলে পরম পূজনীয়। "পূজনীয় শব্দের অর্থ হল যার পূজা করা হয় বা যে পূজা পাওয়ার যোগ্য। মুসলমানরা পূজা করে না। কাজেই মুসলমানরা একথা বলতে পারবে না। মুসলমানরা পরম পূজনীয় বলতে পারে না তারা বলবে মুহতারাম বা সম্মানিত বা শ্রদ্ধেয় ইত্যাদি।

যাহোক আমাদের বিশ্বাস হল ভাল-মন্দ সবটা আল্লাহ করেন। আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে কিছুই হয় না এবং যা কিছুই আল্লাহ করেন সবটার মধ্যে কল্যাণ নিহিত রয়েছে। যা কিছুই হয়, সবটার উপর রাজী-খুশি থাকতে হবে। তাকদীরে বিশ্বাসের মধ্যে এ বিষয়টাও রয়েছে যে, যা কিছু আল্লাহ করেন মঙ্গলের জন্য করেন, ভালোর জন্য করেন। কাজেই যা কিছু আমার ঘটবে তার প্রতি আমার রাজী-খুশি থাকা উচিৎ। এরই অর্থ হল তাকদীরের প্রতি রাজী-খুশি থাকা।

তাকদীরের প্রতি রাজী-খুশি থাকা ছাড়া মানুষের কোন উপায়ও নেই। তাকদীরের প্রতি রাজী-খুশি থাকার ভিতরেই হচ্ছে শান্তি। দুনিয়ায় মানুষের বিপদ-আপদ, কষ্ট-ক্লেশ কিছু না কিছু হয়ই। এক্ষেত্রে একমাত্র শান্তনার উপায় হল একথা বিশ্বাস করা যে, এই বিপদ-আপদ, কষ্ট-ক্লেশ যা কিছুই হচ্ছে আল্লাহর ফয়সালায় হচ্ছে। এর ভিতরেই আমার জন্য মঙ্গল রয়েছে। এভাবে চিন্তা করলে বিপদ-আপদ থাকা সত্ত্বেও কোন টেনশন থাকবে না, কোন মানসিক পেরেশানী আসবে না। আমার আপনজন কেউ অসুস্থ হয়ে গেলে ডাক্তার দেখানো সুন্নাত, তাই আমি ডাক্তার দেখালাম, রোগ ভাল হল না, মারা গেল। তখন আমার তত পেরেশানী হবে না বরং কিছুটা শান্তনা পাব এই কথা চিন্তা করে যে, আল্লাহর ইচ্ছাতেই এটা হয়েছে, এরই মধ্যে আমার মঙ্গল রয়েছে। কিন্তু তখন যে অমুসলমান, যে তাকদীরে বিশ্বাস করে না, তার শান্তনার কোন পথ নেই। সে হয়তো মনে মনে ভাববে যে, আমি ডাক্তার নির্বাচন করতে ভুল করেছি। কিংবা ডাক্তারের ভুলের কারণে মারা গেছে। ডাক্তার যদি ঠিকমত ঔষধ নির্বাচন করত, তাহলে ভাল হয়ে যেত। কিংবা ঔষধ হয়তো ঠিকমত খাওয়ানো হয়নি। এই সব নানান রকম টেনশনে সে ভুগতে থাকবে। কিন্তু মুসলমান টেনশনে ভুগবে না। সে ভাববে আমার চেষ্টা করার করেছি, ফয়সালা তো আল্লাহ পাকের হাতে। তাঁর যেটা ইচ্ছা সেটাই হয়েছে এবং যা হয়েছে এর ভিতরেই মঙ্গল। কাজেই আমি এতেই রাজি!

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

কেউ প্রশ্ন করতে পারেন-যদি মুসলমান তাকদীরে রাজী-খুশিই থাকবে, তাহলে কেউ মারা গেলে মুসলমান কান্নাকাটি করে কেন? এ প্রশ্নের উত্তর হল তাকদীরে রাজী-খুশি থাকা আর কান্নাকাটি করা দুটো ভিন্ন ভিন্ন জিনিস। দুটোর মধ্যে কোন সংঘর্ষ নেই। মন থেকে আমি বিশ্বাস করব যে, আল্লাহ পাক যা করছেন এর ভিতরেই মঙ্গল। কিন্তু আমার মনে তো একটা কষ্ট এসেছে, ঐ কষ্টের বহিঃপ্রকাশ হল কান্নাকাটি। কান্নাকাটি তাকদীরে অখুশি থাকার বহিঃপ্রকাশ নয়; বরং এটা হল মনের কষ্টের বহিঃপ্রকাশ, এটা হল নিজের দুর্বলতার বহিঃপ্রকাশ। এক বুযুর্গ ক্ষুধায় কাঁদছিলেন। ক্ষুধা লেগেছে কান্না শুরু করেছেন। মুরীদরা বলল হুজুর! আপনি আমাদেরকে ধৈর্যের ওয়াজ করেন, এখন আপনি শিশুর মত কাঁদছেন! ক্ষুধায় কান্না-কাটি করা তো শিশুর কাজ। বুযুর্গ বললেন আহাম্মক! আল্লাহ আমাকে ক্ষুধার্থ রেখেছেন, এখন আমি কান্নাকাটি করে প্রকাশ করছি যে, আমি দুর্বল বান্দা। আমার দুর্বলতা দেখে আল্লাহ বলবেন যে, আমার বান্দা দুর্বল ওর প্রতি আমি দয়া করব না কেন? আমি তো আল্লাহর রহমতকে টেনে নেয়ার জন্য এটা করছি। আল্লাহর কাছে আমার অক্ষমতা ফুটিয়ে তোলার জন্য এটা করছি। বুযুর্গদের প্রত্যেকটা কাজের পেছনে কত সুন্দর চিন্তা-চেতনা থাকে! কাজেই বিপদ-আপদ বা কষ্ট-ক্লেশ আসলে যদি কান্না-কাটি হয়, দুঃখ প্রকাশ হয়, সেটা তাকদীরে বিশ্বাসের পরিপন্থী হবে না।

যারা তাকদীরে বিশ্বাস না করে, তারা বিপদ-আপদ ও কষ্ট-ক্লেশের কারণে টেনশনে ভোগে, অশান্তিতে ভোগে। এমনকি আত্মহত্যা পর্যন্ত করে। যেমন একজন মানুষ আয় উপার্জনের খুব চেষ্টা করেও প্রয়োজন মত উপার্জন করতে পারল না, বিবির দাবী-দাওয়া আদায় করতে পারল না, সন্তানের দাবী-দাওয়া পূরণ করতে পারল না, তখন সে নিজেকে দায়ী করতে থাকে এই ভেবে যে, আমি এত চেষ্টা করেও পারলাম না, আমি ব্যর্থ! যাহ! আমার এই ব্যর্থ জীবন রেখে কী হবে? এই ভেবে আত্মহত্যা করে। কিন্তু যার তাকদীরে বিশ্বাস আছে সে আত্মহত্যার দিকে কোনদিন যাবে না। তার মনে শান্তি থাকবে। কারণ সে মনে করবে আমার চেষ্টা করার দায়িত্ব, আমি করেছি, চূড়ান্তভাবে তো সেটাই হবে যেটা আল্লাহর ফয়সালা। আমি ফলাফল নির্ধারণ করতে পারি না। আমি চেষ্টা করতে পারি, কিন্তু ফলাফল আল্লাহর হাতে। ফলাফল সেটাই হবে যেটা আল্লাহ দাঁড় করাবেন। আমি ফলাফল দাঁড় করাতে পারি না। আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করেছি, কাজেই আমি ব্যর্থ নই। সে নিজেকে ব্যর্থ মনে করবে না, সে নিজেকে দায়ী মনে করবে না। কাজেই সে ভাববে আমি আত্মহত্যা কেন করব? আমার কোন দোষ নেই, আমার কোন ব্যর্থতা নেই। তাই আত্মহত্যার মনোভাব তার ভিতরে আসবে না। এ হল তাকদীরে বিশ্বাসের একটা বড় ফায়দা।

তাকদীরে বিশ্বাস করলে কীভাবে মনে শান্তি আসে- তার একটা ঘটনা শুনুন-হযরত জুন্নুন মিসরী একজন বড় বুযুর্গ ছিলেন। একজন তাকে জিজ্ঞাসা করল হুজুর! মনের দিক থেকে আপনার কেমন শান্তি? তিনি বললেন সাংঘাতিক শান্তি! কারণ দুনিয়ায় যা কিছু হচ্ছে সব আমার মর্জি মোতাবেক হচ্ছে। লোকটা বলল হুজুর! খুব অদ্ভুত কথা বললেন! দুনিয়ায় কারও কাছ থেকে এমন কথা শুনিনি যে, সব কিছু তার মর্জি মোতাবেক হয়। বরং কিছু না কিছু প্রত্যেকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হয়ে থাকে। অথচ আপনি বলছেন আপনার মর্জির বাইরে কিছুই হয় না? সবকিছুই আপনার মর্জি মোতাবেক হচ্ছে। তখন জুন্নুন মিসরী (রহ.) বললেন, আমি আমার মর্জি আল্লাহর মর্জির ভিতরে বিলীন করে দিয়েছি। তাই আল্লাহর মর্জি মোতাবেক যা কিছুই ঘটছে আমি মনে করি সেটা আমার মর্জি মোতাবেকই হচ্ছে। কারণ আল্লাহর যা মর্জি, আমারও তা-ই মর্জি। এভাবে তাকদীরে বিশ্বাস থাকলে মানুষ মনের দিক থেকে শান্তি লাভ করতে পারবে, কোন মানসিক কষ্ট তার থাকবে না। তাকদীরে বিশ্বাসকে বাদ দিয়ে দুনিয়ায় এমন কোন ব্যবস্থা নেই যা মানুষকে মনের প্রতিকূল অবস্থায়ও এরকম শান্তি দিতে পারে। একমাত্র তাকদীরে বিশ্বাসই

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com



সর্বাবস্থায় মনে শান্তি দিতে পারে। তাছাড়া আল্লাহর সাথে কারও মহব্বত হয়ে গেলেও সর্বাবস্থায় মনে শান্তি থাকবে। সুখে থাকুক, দুঃখে থাকুক সর্বাবস্থায় মনে শান্তি থাকবে। কারণ দিলের ভিতরে মজা এসে গেলে বাহ্যিক দুঃখ-কষ্টের প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপ থাকে না। কবি একথাটিকে খুব সুন্দরভাবে বলেছেন,

الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو + ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو

'অর্থাৎ, দিলের ভিতরে মজা ঢুকে গেলে সর্বাবস্থায় মজা লাগে; মনোবাঞ্ছা পূরণ হোক বা না হোক'।

এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে- তাকদীরে বিশ্বাসের অর্থ এ নয় যে, যা কিছু হবে আল্লাহর পরিকল্পনা মোতাবেকই হবে। কাজেই আমার কিছু করার দরকার নেই। আমার আয় উপার্জন করার দরকার নেই, ভাগ্যে থাকলে রুযী এসেই যাবে। কাজেই হাত পা গুটিয়ে ঘরে বসে থাকি। এরকম নীতি শরীআতে দেয়া হয়নি বরং আমাদেরকে চেষ্টা করার হুকুমও দেয়া হয়েছে। আমি আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী চেষ্টা করব, এরপর আল্লাহর উপর ভরসা করব। আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী কাজ না করে অর্থাৎ, আমার দায়িত্বের কাজ না করে আল্লাহর উপর ভরসা করে বা তাকদীরের উপর ভরসা করে বসে থাকব, এর নাম তাকদীরে বিশ্বাস নয়, এর নাম আল্লাহর উপর ভরসা করা নয়। তাকদীরে বিশ্বাসের অর্থ হল আমার দায়িত্বের কাজ করার পর চূড়ান্তভাবে আল্লাহর ইচ্ছায় যা ঘটবে তার উপর আমি রাজী-খুশি থাকব এবং মনে করব সবকিছুই আল্লাহ করছেন, আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে কিছুই হচ্ছে না। এটাকেই অন্য ভাষায় এভাবে বলা যায়, যা কিছু হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়, অন্য কোন কিছু থেকে হয় না।

আমরা অনেক সময় এমন এমন কথা বলে ফেলি, বা এরকম কিছু ধারণা পোষণ করি, যা তাকদীরে বিশ্বাসের পরিপন্থী হয়ে যায়। যেমন, আমি কোথাও রওনা দিলাম। ঘর থেকে বের হয়েই দেখলাম একজন মেথর। ব্যস মনে করলাম আজকের যাত্রাটা খারাপ। এরকম মনে করার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আমার ব্যাপারে আল্লাহর ভাল ফয়সালা থাকলেও মেথর তা-উল্টে দিবে এবং আমার অমঙ্গল হবে। অথচ তাকদীরের ফয়সালা কেউ উল্টাতে পারে না। মেথরের কোন ক্ষমতা নেই, ক্ষমতা আল্লাহর। যা করবেন আল্লাহ করবেন, যা হবে আল্লাহর ফয়সালায় হবে। তাই মেথর দেখে যাত্রা খারাপ মনে করা যাবে না। করলে সেটা তাকদীরে বিশ্বাসের পরিপন্থী হবে।

অনেকে মনে করে থাকে হাতের তালু চুলকাচ্ছে, পয়সা আসবে। কিংবা চোখ ফড়কাচ্ছে কী বিপদ যেন হবে! এগুলো তাকদীরে বিশ্বাসের পরিপন্থী।

অনেককে দেখা যায় কথা বলছে কিংবা খাচ্ছে ইতিমধ্যে জিহ্বায় কামড় লাগল, ব্যস মনে করল কে যেন আমার কথা মনে করছে। এটা ভিত্তিহীন। জিহ্বায় কামড় লাগার সাথে অন্যের মনে করার কী সম্পর্ক আছে?

অনেককে দেখা যায় সকাল বেলায় কেবল মাত্র দোকান খুলেছে, প্রথম খরিদ্দার এসেই বাকী চেয়েছে, ব্যস সে মনে করল প্রথমেই বাকী দিলে সারাদিন ফাঁকী যাবে। এটা তাকদীরে বিশ্বাসের পরিপন্থী। বাকীর সাথে ফাঁকীর সম্পর্ক নেই। নগদ বা বাকীর কোন ক্ষমতা নেই। লাভ হবে না লোকসান হবে সেটা আল্লাহর ফয়সালার ভিত্তিতে হবে। আমরা মনে করি শুরুতেই বাকী দিলে সারাদিন লোকসান হবে। অথচ শুরুতেই আল্লাহর এক বান্দার উপকারের নিয়তে বাকী দিলে তার বরকতে আল্লাহ তা'আলা তাকে বেশি লাভবান করতে পারেন।

গ্রামদেশে একটা কুসংস্কার আছে বাড়ির উপর দিয়ে হলুদ পাখি উড়ে গেল, সে তার ভাষায় ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল, ব্যস মানুষে মনে করল এবার কুটুম আসবে, আত্মীয় স্বজন বেড়াতে আসবে। ঐ পাখি কি গায়েব জানে? সে কি ভবিষ্যৎ জানে? না জানলে সে কি করে খবর দিতে পারে যে, মেহমান

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

আসছে? এটা ভিত্তিহীন ধারণা। আমরা এমন বহুবার দেখেছি, ঐ পাখি ডেকে যায়, কিন্তু কোন কুটুম আসে না। আবার ডাকা ছাড়াই ঝাঁকে ঝাঁকে মেহমান চলে আসে। পাখি ডাকা না ডাকার ভিত্তিতে মেহমান আসা না আসা, ঘটে না। যা কিছু ঘটে আল্লাহর ফয়সালাতেই ঘটে। আল্লাহ পাক সবকিছুই নির্ধারিত করে রেখেছেন এবং সে অনুযায়ীই সব কিছু ঘটে। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ. (الرعد: ٨)

অর্থাৎ, আল্লাহর নিকট সবকিছুর পরিকল্পনা রয়েছে এবং সেই পরিকল্পনা মোতাবেক সবকিছু ঘটছে। এই পরিকল্পনার বাইরে কোন কিছু ঘটছে না।

তাকদীরের ফয়সালায় রাজী-খুশি থাকতে হবে। কারণ আল্লাহ পাক আমাদের সৃষ্টিকর্তা, আমাদের লালন-পালনকর্তা, আমাদের সবকিছুর যোগানদাতা। অতএব তাঁর ফয়সালায় যদি আমি রাজী-খুশি না থাকি, তাহলে তিনি অসন্তুষ্ট হবেন। দুনিয়াতে যারা আমাদের অধীনস্ত যেমন- আমাদের ছেলে-মেয়েরা আমাদের অধীনস্ত, আমাদের স্ত্রীরা আমাদের অধীনস্ত, আমাদের চাকর-চাকরানীরা আমাদের অধীনস্ত, তারা যদি আমাদের ফয়সালা না মানে, তাহলে আমাদের ভিতরে কেমন রাগ সৃষ্টি হয়? আমরা প্রত্যেকে তখন এই মুডে এসে যাই যে, আমি সিদ্ধান্ত করলাম, আমি ফয়সালা করলাম, আর সে তাতে রাজী নয়, সে নিজের খেয়াল-খুশি মত করতে চায়? আমার অধীনস্ত হয়েও নিজের খেয়াল-খুশিকে প্রাধান্য দিতে চায়? এত বড় কথা! এভাবে আমরা মনে মনে রাগান্বিত হই। তাহলে আল্লাহ পাক কেন রাগান্বিত হবেন না। দুনিয়াতে আমরা যেমন চাই আমাদের অধীনস্তরা আমাদের ফয়সালায় রাজী-খুশি থাকুক, আমাদের পরিকল্পনায় সন্তুষ্ট থাকুক। আল্লাহ পাকও চান যে, আমার বান্দারা আমার ফয়সালায় রাজী-খুশি থাকুক। আমার পরিকল্পনায় অর্থাৎ, তাকদীরে সন্তুষ্ট থাকুক।

যদি আমরা তাকদীরে রাজী-খুশি না থাকি, কিছুই করতে পারব না, তাকদীরকে ডিঙাতে পারব না। বরং উল্টো আমাদের পেরেশানী বাড়বে, টেনশন বাড়বে, মনে শান্তি আসবে না। তাকদীরে বিশ্বাস না করলে, তাকদীরে রাজী-খুশি না থাকলে অনেক ক্ষেত্রে নিজের কোন কাজের জন্য নিজেকে দায়ী মনে হবে। মনে হবে- হায়রে এরকম কেন করলাম! যদি এরকম না করতাম, বরং ঐ রকম করতাম, তাহলে এই অসুবিধাটা হত না। যদি ঐরকম করতাম, তাহলে ঐরকম হত। এভাবে "যদি" "যদি" দিয়ে চিন্তা চলতে থাকবে আর নিজের কাজের জন্য নিজেকে দায়ী মনে হতে থাকবে এবং মনের যন্ত্রণা বাড়তে থাকবে। হাদীছে তাই অতীত কাজের জন্য এরকম "যদি" ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

فَلَا تَقُلْ لَوْ... فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ. (صحيح مسلم برقم ٦٩٤٥ مختصرا)

অর্থাৎ, তোমরা "যদি" বলবে না। অর্থাৎ, এভাবে বলবে না যে, যদি এই করতাম, তাহলে এই হত, ঐ করলে ঐ হত ইত্যাদি। কারণ এই "যদি" কথাটি শয়তানের দুয়ার খুলে দিবে। এভাবে শয়তান ঈমান-পরিপন্থী চেতনা ঢোকানোর সুযোগ পাবে। যেমন একজনের কোন রুগী চিকিৎসা সত্ত্বেও মারা গেল। এখন সে যদি মনে মনে বলে যদি ঐ ডাক্তারের কাছে না যেয়ে অমুক ডাক্তারের কাছে যেতাম বা ঐ হাসপাতালে রুগী না নিয়ে যদি অমুক হাসপাতালে নিতাম, তাহলে আমার রুগী হয় তো ভাল হয়ে যেত। তাহলে এরকম ভাবার বা এরকম বলার অর্থ হল-আল্লাহর ফয়সালায় যেটা ঘটে গেছে আমি ঐরকম করলে এরকম ঘটত না। এটা হল তাকদীর বিরোধী চেতনা, ঈমান বিরোধী চেতনা। তাই এরকম ক্ষেত্রে মুসলমান "যদি" শব্দ ব্যবহার করতে পারবে না। এখানে কোন যদি টদি নেই। বরং যা হয়েছে আল্লাহর ইচ্ছায় হয়েছে-এরকম মেনে নেয়ার মধ্যেই মনে-প্রাণে শান্তি এবং এটাই তাকদীরের চেতনা। এটাই ঈমানের চেতনা।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



তাকদীরে বিশ্বাস না করলে ঈমান থাকে না। এক যুগে কিছু মানুষ এমন গিয়েছে যারা বলত যে, তাকদীর বলতে কিছু নেই। বরং মানুষ চেষ্টা করলে হয়, চেষ্টা না করলে হয় না। এরকম এক লোক এক বুযুর্গের কাছে এসে বলল, 'তাকদীর বলতে কিছু নেই, মানুষই নিজের ইচ্ছায় সবকিছু করতে পারে। বুযুর্গ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন তুমি সবকিছুই করতে পার? বলল, হ্যাঁ সবই তো আমরা করি। বুযুর্গ বললেন, ঠিক আছে তোমার একটা পা উঁচু কর! লোকটা একটা পা উঁচু করল। বুযুর্গ বললেন, আরেক পা উঁচু কর? এক সাথে উভয় পা উঁচু করে থাকতে হবে। লোকটা বলল এটা তো পারি না। বুযুর্গ বললেন- তাহলে সবকিছু পার কী করে? মানুষ সবকিছু করতে পারে না। যতটুকু আল্লাহর ইচ্ছা ততটুকু পারে, তার বাইরে পারে না। আবার মানুষ কিছুই করতে পারে না এটাও ঠিক নয়। মানুষের ইচ্ছা শক্তির কোনই দখল নেই-এরকম ধারণাও ঠিক নয়। কাজেই যদি কেউ বলে আমরা ভাগ্যের হাতের পুতুল, তাহলে তার একথা বলা ঠিক নয়। মানুষ পুতুল নয়। পুতুলের কোন কিছু করার সাধ্য নেই, কিন্তু মানুষের অনেক কিছু করার সাধ্য আছে। সাধ্য না থাকলে আল্লাহ মানুষকে কোন হুকুম দিতেন না। কুরআন শরীফে বলা হয়েছে,

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا.

অর্থাৎ, আল্লাহ সাধ্যের বাইরে কাউকে কোন হুকুম দেন না। (বাকারাঃ ২৮৬)

মানুষের যতটুকু সাধ্য আছে, আল্লাহ ততটুকুই হুকুম দিয়েছেন। পুতুলের কোন সাধ্য নেই, সে নিজের ইচ্ছায় কিছুই করতে পারে না। কিন্তু মানুষকে তো আল্লাহ ইচ্ছা শক্তি দিয়েছেন। সে পুতুল নয়। তার ক্ষমতার বাইরে কোন কিছুর হুকুম আল্লাহ পাক দেননি। তাকদীরের বিশ্বাসের ভিতরে এই বিষয়টাও রয়েছে যে, আমাকে যা হুকুম দেয়া হয়েছে সেটা করার ক্ষমতা আমার রয়েছে। আমার সাধ্যের বাইরে কোন হুকুম আমাকে দেয়া হয়নি। কজেই যে হুকুম আমাকে দেয়া হয়েছে, সেটা আমাকে করতে হবে, তাকদীরের বাহানা করে সে হুকুম আমি ছাড়তে পারব না।

দেখা গেল সঠিক ঈমান থাকলে মানুষ আমল থেকে দূরে সরে না, বরং সঠিক ঈমান মানুষকে আমলের দিকে টেনে আনে। ঈমানী চেতনাটাই এমন, যা মানুষকে সঠিক আমলের পথে পরিচালিত করে। আমার সঠিক ঈমান থাকবে, তাহলে আমার আমল সঠিক আসবে। ঈমান সঠিক থাকবে না, তাহলে আমল সঠিক থাকবে না। তাই ঈমানকে বলা হয়েছে আমলের বুনিয়াদ। কুরআন শরীফে ইরশাদ হয়েছে,

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍۢ بِقِيْعَةٍ.

এ আয়াতে বোঝানো হয়েছে, ঈমান হল সমস্ত আমলের বুনিয়াদ। ঈমান যদি ঠিক না থাকে তাহলে আমল ঠিক হবে না। এজন্যেই কাফেরদের আমল গ্রহণযোগ্য নয়। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, কাফেরদের অর্থাৎ, যাদের ঈমান নেই তাদের আমল হল মরুভূমীর মরিচিকার মত। দূরের থেকে দেখলে মনে হবে কত পানি! কিন্তু কাছে আসলে দেখা যাবে কিছুই না। তদ্রূপ দুনিয়াতে কাফেররা মনে করবে কত কিছু করছি, কিন্তু আসল সময়ে দেখা যাবে তাদের কোন আমলের মূল্য নেই। সারকথা ঈমান হল আমলের বুনিয়াদ।

এতদিন আমরা ঈমান সম্পর্কে যা আলোচনা করলাম, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এভাবে ঈমান দুরস্ত করার তাওফীক দান করেন এবং ঈমানের ভিত্তিতে আমাদের আমলকে দুরস্ত করে দেন। আমীন!

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বয়ান নং ১৭-এর খুতবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ قَدَّرَ الْاُمُوْرَ وَقَضَاهَا، وَعَلٰی مَا سَبَقَ عِلْمُهٗ بِهَا اَمْضَاهَا، وَكَمَا قَدَّرَ مَبْدَأَهَا قَدَّرَ مُنْتَهَاهَا، اَحْمَدُهٗ حَمْدًا يَّدُوْمُ وَلَا يَتَنَاهَا، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَا فِیْ اَدْنَی الْاُمُوْرِ وَلَا فِیْ اَقْصَاهَا، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهُ الَّذِیْ اَرْسَلَهٗ اِلٰی كَافَّةِ النَّاسِ اَدْنَاهَا وَاَقْصَاهَا، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ مَا بَقِیَ لِنَفْسِ الْاِنْسَانِ هُدَاهَا.

اَمَّا بَعْدُ :

اَيُّهَا النَّاسُ ! اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی خَلَقَ كُلَّ شَیْءٍ فَسَوَّاهُ، وَقَدَّرَ مَا اَرَادَهٗ فِیْ حُكْمِهٖ وَاَمْضَاهُ، فَلَا رَادَّ لِمَا قَضَاهُ، وَلَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَاهُ. وَفِی الْحَدِيْثِ ـ اِنَّ مَا اَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِّيُخْطِئَكَ، وَاِنَّ مَا اَخْطَاَكَ لَمْ يَكُنْ لِّيُصِيْبَكَ. وَهٰذَا هُوَ الْاِيْمَانُ بِالْقَدْرِ وَالْقَضَآءِ. اَلَا وَاِنَّ عَلٰی كُلِّ بَشَرٍ اَنْ يُّؤْمِنَ بِالْقَضَآءِ وَالْقَدَرِ. عَنْ عَلِیٍّ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتّٰی يُؤْمِنَ بِاَرْبَعٍ ـ يَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ، بَعَثَنِیْ بِالْحَقِّ، وَيُؤْمِنَ بِالْمَوْتِ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَيُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِیُّ وَابْنُ مَاجَةَ . وَفِی الْحَدِيْثِ اِنَّ اَوَّلَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ الْقَلَمَ وَاَمَرَهٗ اَنْ يَّكْتُبَ الْقَدَرَ، فَقَالَ الْقَلَمُ مَاذَا اَكْتُبُ؟ قَالَ اُكْتُبِ الْقَدَرَ، فَكَتَبَ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ. فَيَكُوْنُ كُلُّ شَیْءٍ كَذَالِكَ . فَكُلُّ شَیْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ وَاٰجَالٍ، وَهُوَ تَعَالٰی عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ. وَهُوَ تَعَالٰی يُحِيْطُ كُلَّ شَیْءٍ عِلْمًا وَقَدْرًا، وَلَا يَخْرُجُ عَنْ عِلْمِهٖ شَیْءٌ صَغِيْرًا كَانَ اَوْ كَبِيْرًا. قَالَ تَعَالٰی : وَمَا تَسْقُطُ مِنْ

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



وَّرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِیْ ظُلُمَاتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَّلَا يَابِسٍ اِلَّا فِیْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ. وَقَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ شَیْءٍ بِقَدَرٍ حَتَّی الْعَجْزِ وَالْكَيْسِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَقَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَتَبَ اللّٰهُ مَقَادِيْرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ اَنْ يَّخْلُقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِخَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ قَالَ وَكَانَ عَرْشُهٗ عَلَی الْمَآءِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

فَاِنْ قَالَ اَحَدٌ اِذَا كَانَ كُلُّ شَیْءٍ بِقَدَرٍ فَمَا الْفَائِدَةُ فِی الْعَمَلِ؟ اُجِيْبَ بِمَا اَجَابَ بِهِ النَّبِیُّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِیْ حَدِيْثٍ. عَنْ عَلِیٍّ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ اِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهٗ مِنَ النَّارِ وَمَقْعَدُهٗ مِنَ الْجَنَّةِ. قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اَفَلَا نَتَّكِلُ عَلٰی كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ؟ قَالَ : اِعْمَلُوْا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِّمَا خُلِقَ لَهٗ. اَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ، وَاَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ. ثُمَّ قَرَأَ فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰی وَاتَّقٰی، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰی. اَلْاٰيَةَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَاعْلَمُوْا اَنَّ اُمُوْرَ الْقَدَرِ وَالْقَضَآءِ لَا يَنْكَشِفُ عِنْدَ اَحَدٍ حَقَّ الْاِنْكِشَافِ. فَلِاَجْلِ ذَالِكَ مُنِعَ عَنِ الْخَوْضِ فِیْ ذَالِكَ. وَقَدْ قَالَ عَلِیٌّ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ بَيَانًا لِحَالِ الْقَدَرِ : بَحْرٌ عَمِيْقٌ لَا تَلِجْهُ. وَطَرِيْقٌ مُّظْلِمٌ لَّا تَسْلُكْهُ، وَسِرٌّ مِّنْ اَسْرَارِ اللّٰهِ لَا تُفَتِّشْهُ.

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ : اِنَّا كُلَّ شَیْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ.

بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِی الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ، وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. اَقُوْلُ قَوْلِیْ هٰذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ لِیْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَاسْتَغْفِرُوْهُ، اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বয়ান নং -১৮

## আসবাব বা বস্তুর ক্ষমতা প্রসঙ্গ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: قُلْنَا يَا نَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّسَلَامًا عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا عَدْوٰى وَلَا طِيَرَةَ وَلَا هَامَةَ.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

গত জুমুআয় আমরা তাকদীরে বিশ্বাস রাখা সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম। তাকদীরে বিশ্বাস রাখার অর্থ হল- আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অনাদিকালেই সবকিছুর পরিকল্পনা করে রেখেছেন, সবকিছুর রূপ-রেখা নির্ধারণ করে রেখেছেন। সে অনুযায়ী সবকিছু হচ্ছে এবং হবে। বিন্দু মাত্র তার ব্যতিক্রম হবে না, হতে পারবে না। এ থেকে বুঝা যায় দুনিয়ার আসবাব বা বস্তুর নিজস্ব কোন ক্ষমতা নেই। বস্তুর নিজস্ব ক্ষমতা থাকলে ব্যতিক্রম হতে পারত। বস্তুর মধ্যে যে ক্ষমতা দেখা যায়, সেটা তার নিজস্ব ক্ষমতা নয় আল্লাহর দেয়া ক্ষমতা। তাই আল্লাহর পরিকল্পনার বাইরে বস্তু কিছু করতে পারে না। তাহলে প্রশ্ন হতে পারে– যদি আসবাব বা বস্তুর মধ্যে নিজস্ব কোন ক্ষমতা না থাকে, তাহলে আমরা আসবাব গ্রহণ করব কেন? তাকদীরে যা আছে তাতো হবেই, আসবাব গ্রহণ করার প্রয়োজন কী? এ প্রশ্নের উত্তর হল- আমরা আসবাব গ্রহণ করব এই নিয়তে এবং এই কারণে যে, আমাদের প্রতি আসবাব গ্রহণ করার হুকুম আছে। কিন্তু আসবাব গ্রহণ করার পরও চূড়ান্ত ভাবে সেটাই হবে যেটা আল্লাহ পাক ফয়সালা করে রেখেছেন। অতএব একথা বলা যাবে না যে, আমাদের কিছু করার দরকার নেই, আয়-উপার্জনও করার দরকার নেই, তাকদীরে থাকলে আয়-উপার্জন হয়ে যাবে। খাওয়ারও দরকার নেই, তাকদীরে থাকলে খাওয়া হয়ে যাবে। এমনকি ভাত গালে তোলারও দরকার নেই, নছীবে থাকলে ভাত অটোমেটিক গালে উঠে যাবে। এরকম বলা যাবে না। কারণ আয়-উপার্জন করা, খাওয়া-দাওয়া এগুলো হল আসবাব, আর আমাদের প্রতি আসবাব গ্রহণ করার হুকুম আছে। আয়-উপার্জন করা ফরয করে দেয়া হয়েছে। দেহকে রক্ষা করার জন্য খাদ্য-খাবার এবং প্রয়োজনীয় আরাম গ্রহণ করার হুকুম দেয়া হয়েছে। হাদীছে ইরশাদ হয়েছে,

فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. (صحيح البخاري برقم ١٩٧٥)

অর্থাৎ, তোমার উপর তোমার দেহেরও হক বা অধিকার রয়েছে। অর্থাৎ, তোমার দেহকে রক্ষা করার জন্য যা যা করা দরকার সেটা করা তোমার কর্তব্য।

খাওয়া দাওয়া, চিকিৎসা, ঘুম ইত্যাদি দেহকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয়। অতএব এগুলো করা আমাদের দায়িত্ব। এগুলো আমরা করব আমাদের দায়িত্ব হিসেবে, কিন্তু এগুলো করার পরও হবে সেটাই, যেটা আল্লাহ পাক ফয়সালা করে রেখেছেন। যেমন আমি অসুস্থ; এখন আমি চিকিৎসা করাব এই হিসেবে যে, এটা আমার কর্তব্য, চিকিৎসা করানো সুন্নাত। কিন্তু এই চিকিৎসায় আমার রোগ সারবে কি-না, আমি সুস্থ হব কি-না, সেটা আল্লাহ পাক যা ফয়সালা করে রেখেছেন তা-ই হবে। চিকিৎসা করালেই রোগ সেরে যাবে তার নিশ্চয়তা নেই। অনেক সময় দেখা যায় দুই জন লোকের একই রোগ হয়েছে, দুই জনেই একই ঔষধ গ্রহণ করেছে, তারপরও একজন ভাল হচ্ছে, আর একজন ভাল হচ্ছে না। একজন রোগ থেকে সুস্থ হচ্ছে, আর একজন সুস্থ না হয়ে দুনিয়া থেকে চলে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে যার ব্যাপারে আল্লাহর যা ফয়সালা তা-ই হচ্ছে। কিন্তু তাই বলে চিকিৎসা করাতে হবে না-তা নয়। চিকিৎসা

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com



করাতে হবে দায়িত্ব-কর্তব্য হিসেবে। কিন্তু চিকিৎসায় রোগ সারতেও পারে, নাও সারতে পারে। সারা, না সারা নির্ভর করে আল্লাহর ফয়সালার উপর। অর্থাৎ, ঔষধের আছর হওয়া না হওয়া নির্ভর করে আল্লাহর ফয়সালার উপর। এ থেকে বুঝা যায় যে, আসবাবের নিজস্ব কোন ক্ষমতা নেই। আসবাবের ক্ষমতা কার্যকারী হবে তখন, যখন আল্লাহর ফয়সালা হবে। ফয়সালা না হলে কার্যকরী হবে না।

এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে। তা হল বাহ্যিক ভাবে আমরা দেখতে পাই আসবাবের মধ্যে আছর আছে। খেলে পেট ভরে, আগুনে হাত দিলে হাত পুড়ে যায় ইত্যাদি। এটা আল্লাহ পাক স্বাভাবিক নিয়মে একেক বস্তুর মধ্যে একেক ধরনের আছর রেখে দিয়েছেন। নতুবা মূল ক্ষমতা আল্লাহর হাতে। ফয়সালা আল্লাহর হাতে। আল্লাহ পাক মাঝে মাঝে দু'চারটা জিনিস এমন ব্যতিক্রম ঘটিয়ে দেন যে, বস্তু থাকা সত্ত্বেও তার আছর হয় না। এভাবে আল্লাহ পাক আমাদেরকে দেখান যে, মূলত আসবাবের মধ্যে মূল ক্ষমতা নয়, বরং মূল ক্ষমতা আল্লাহর হাতে। আল্লাহর ফয়সালা হলেই আসবাব কাজ করতে পারে, নতুবা আসবাব কাজ করতে পারে না। যেমন আগুনের মধ্যে পোড়ানোর ক্ষমতা আছে। কিন্তু আল্লাহ পাক এটাও দেখিয়েছেন যে, আগুনেও পোড়াতে পারে না। হযরত ইব্রাহীম (আ.)কে আগুনে ফেলা হয়েছিল। কিন্তু আগুন তাঁকে পোড়াতে পারেনি। ঘটনাটি একটু গোড়ার থেকে বলছি। বাবেল শহরের সম্রাট নমরূদ এবং তার লোকজন ছিল মূর্তি পূঁজারী। হযরত ইব্রাহীম (আ.) তাদেরকে বিভিন্নভাবে মূর্তি পূঁজার অসারতা বোঝালেন। তিনি তাদেরকে বোঝালেন তোমরা কেন নিজের হাতে গড়া মূর্তির পূঁজা কর? এই মূর্তির হাতে কোন ক্ষমতা নেই, সে কিছুই বুঝে না। কেন এমন অথর্ব মূর্তির পূঁজা করতে হবে! কিন্তু তারা কিছুতেই বুঝল না। অবশেষে একদিন হযরত ইব্রাহীম (আ.) তাদেরকে হাতে নাতে বোঝানোর জন্য একটা কৌশল অবলম্বন করলেন। তিনি সকলের অগোচরে তাদের মূর্তির ঘরে ঢুকে ছোট ছোট সব মূর্তিগুলো ভেঙ্গে ফেললেন। যে কুড়াল দিয়ে ভাঙ্গলেন, সেই কুড়ালটা বড় মূর্তির হাতে বা কাঁধে ঝুলিয়ে রাখলেন। পরে লোকজন পূঁজার ঘরে এসে দেখে দেবতাগুলোর একি দশা! কে করতে পারে এটা? একমাত্র ইব্রাহীমই করতে পারে। কারণ সে-ই মূর্তি পূঁজার বিরুদ্ধে বলে। ইব্রাহীম (আ.)কে ডাকা হল। ইব্রাহীম (আ.) বললেন যে, কুড়াল তো বড়টার কাঁধে ঝুলানো আছে, এখন তার কাছেই জিজ্ঞাসা করা হোক কে বাকিগুলোকে ভেঙ্গেছে? অবস্থা দেখে বুঝা যাচ্ছে বড় মূর্তিটাই এই কাজ করেছে। তারা বলল মূর্তির কি কোন বুঝ আছে? মূর্তির কি কোন ক্ষমতা আছে? সেকি করে ভাঙ্গবে? হযরত ইব্রাহীম (আ.) বললেন, 'আমি তো তোমাদেরকে এটাই বোঝানোর চেষ্টা করেছি যে, এরা কিছুই বুঝে না, এদের কোন ক্ষমতা নেই। অতএব এদের পূজা করা বোকামী'। কুরআন শরীফে বলা হয়েছে,

ثُمَّ نُكِسُوْا عَلٰى رُءُوْسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هٰؤُلَاءِ يَنْطِقُوْنَ.

অর্থাৎ, তখন তাদের মাথা নত হয়ে গেল। এ কথার তো কোন জওয়াব নেই। তারা বলল ইব্রাহীম তুমি তো জান এরা কোন কথা বলতে পারে না। (আম্বিয়াঃ ৬৫)

যাহোক তারা সিদ্ধান্ত নিল আমাদের দেবতাগুলোর অবমাননা করা হয়েছে, তাই ইব্রাহীমকে আর রাখা যাবে না। তাকে শেষ করে দিতে হবে। নমরূদ ও তার সম্প্রদায়ের লোকেরা সিদ্ধান্ত নিল তাকে আগুনে জ্বালিয়ে মারা হবে। এক মাস যাবত নমরূদের লোকজন এক স্থানে লাকড়ী জমা করল। এক সপ্তাহ ধরে তাতে আগুন জ্বালানো হল। আগুনের এত তীব্র শিখা হল, এত তীব্র তাপ সৃষ্টি হল যে, উপর দিয়ে কোন পাখি উড়ে গেলে পুড়ে যেত। হযরত ইব্রাহীম (আ.)কে সেই আগুনে ফেলানো হবে। আগুনের ধারে কাছেও কেউ যেতে পারছে না, কীভাবে ফেলবে। শয়তান বুদ্ধি শিখিয়ে দিল যে,

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

اِضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ. (الشعراء : ٦٣)

অর্থাৎ মূসা তোমার হাতে যে লাঠি আছে, সেই লাঠি দিয়ে সমুদ্রের উপর আঘাত কর! তিনি আঘাত করলেন। পানি ফাঁক হয়ে রাস্তা বের হয়ে গেল। দুই পাশের পানি এরকম খাড়া হয়েছিল, মনে হচ্ছিল যেন দুই পাশে বিরাট উঁচু পাহাড়। তার মাঝখান দিয়ে পথ। হযরত মূসা (আ.) ও তাঁর লোকজন নদীর মাঝখানে চলে গেলেন। ফিরাউন নিজেকে খোদা বলে দাবী করত। সে বলল, 'আমার জন্য এই রাস্তা হয়েছে'। ফিরাউন তার লোকজন নিয়ে নদীর ভিতরে সেই রাস্তায় নেমে গেল। মূসা (আ.) তাঁর লোকজনসহ ওপারে চলে গেলেন। এ সময় ফিরাউন তার লোকজনসহ মাঝখানে ছিল। আল্লাহর হুকুমে পানি মিলে গেল। ফিরাউন তার লোকজনসহ পানিতে ডুবে মারা গেল। মূসা (আ.)-এর লোকজন বলল, 'আসল পাপীটা অর্থাৎ ফিরাউন মরেছে কি-না, আমরা তো দুশ্চিন্তা মুক্ত হতে পারছি না'। আল্লাহ পাক সাগরকে হুকুম দিলেন। সাগরের পানি ফিরাউনের লাশ কূলে নিক্ষেপ করল। তারা ফিরাউনের মরা লাশ দেখতে পেল। এই ঘটনার মধ্যে আল্লাহ তা'আলা দেখালেন যে, পানির মধ্যে ডোবানোর যে ক্ষমতা, এটা তার নিজস্ব ক্ষমতা নয়, এটা আমার দেয়া ক্ষমতা। আমার যখন ফয়সালা হয়, তখন সে ডোবায়, আর যার ব্যাপারে ফয়সালা না হয় তাকে ডোবাতে পারে না।

এভাবে অনেক বস্তুর মধ্যে আমরা যে আছর বা ক্ষমতা দেখতে পাই, আল্লাহ পাক মাঝে মাঝে সে আছর তুলে নিয়ে আমাদেরকে দেখান যে, এটা সেই বস্তুর নিজস্ব ক্ষমতা নয়। আবার অনেক সময় যে বস্তুর মধ্যে আমরা যে ক্ষমতা দেখতে পাই না, আল্লাহ পাক সেই বস্তুর মধ্যে সেই ক্ষমতা দিয়ে দেন। হযরত মূসা (আ.) ও তার লোকজন ঐ নদী পার হয়ে সিনাই এলাকায় গেলেন। সেটা ছিল মরুভূমি। সেখানে খাবারও নেই, পানিও নেই। মূসা (আ.)-এর লোকজন আবেদন করল- আমাদের জান বাঁচানোর জন্য পানির ব্যবস্থা করা হোক। হযরত মূসা (আ.)-এর সামনে ছিল একটা পাথরের চাকা। আল্লাহ বললেন, 'হে মূসা! তুমি পাথরের উপরে আঘাত কর'! তিনি লাঠি দিয়ে পাথরের উপরে আঘাত করলেন। সাথে সাথে পাথর ফেটে পানি বের হওয়া শুরু করল। বনী ইসরাঈলদের ১২টা গোত্র ছিল। ঐ পাথর থেকে ১২টা গোত্রের জন্য ১২টা ঝর্ণা ফুটে বের হল। একটা পাথরের চাকা থেকে পানি বের হওয়া, পাথরের মধ্যে পানি বের হওয়ার আছর বা গুণ নেই, কিন্তু আল্লাহ পাক সেটা প্রকাশ করে দেখালেন। হযরত ইব্রাহীম (আ.) বায়তুল্লাহ নির্মাণ করার সময় একটা পাথরের উপর দাঁড়িয়েছেন। প্রয়োজনে পাথরটা উপরে উঠেছে, আবার প্রয়োজনে নীচু হয়েছে। সেই পাথরটা এখনও বায়তুল্লাহর সামনে রাখা আছে। পাথরটাকে বলা হয় মাকামে ইব্রাহীম। একটা পাথর আপনা আপনি উঁচু নীচু হতে পারে এই ক্ষমতা পাথরের মধ্যে নেই। আল্লাহ পাক এটা প্রকাশ করে দেখিয়েছেন যে, কোন কিছুর ক্ষমতা তার নিজস্ব ক্ষমতা নয়। আমি যখন যেরকম ক্ষমতা দেই, সেরকম ক্ষমতা হয়। আমি পাথরের মধ্যে ঐ ক্ষমতা দিয়েছি, তাই পাথর প্রয়োজনে উঁচু নীচু হয়েছে।

এভাবে আল্লাহ পাক অসংখ্য ঘটনায় দেখিয়েছেন যে, যার ভিতরে যে আছর বা ক্ষমতা নেই, তার থেকে সেটা প্রকাশ পায়। আবরাহা বাদশা তার বিরাট হাতি বাহিনী নিয়ে ইয়ামান থেকে এসেছিল মক্কা শরীফে বায়তুল্লাহকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্যে। আল্লাহ পাক তাদেরকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাখি দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। আল্লাহ পাক ঝাঁকে ঝাঁকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাখি প্রেরণ করেছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম এই পাখি দেখেছেন। এটা রাসূল (সা.)-এর জন্মের মাত্র ৬০দিন আগের ঘটনা। রাসূল (সা.)-এর হাতে যারা মুসলমান হয়ে সাহাবী হয়েছেন, তাদের মধ্যে ঐ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী অনেকে ছিলেন। পাখিগুলো আবরাহার বাহিনীর উপরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাথর নিক্ষেপ করেছিল। প্রত্যেক পাখির ঠোঁটে একটা পাথর ছিল, দুই পায়ে দুটো পাথর ছিল। বুটের মত ছোট ছোট পাথর ছিল। পাখিগুলো এক একটা পাথর এক এক

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



মিনজানিক অর্থাৎ এক ধরনের নিক্ষেপ করার যন্ত্র বা চরকা বানানো হোক। চরকা বানিয়ে চরকা দিয়ে দূরের থেকে তাকে নিক্ষেপ করা হোক। হযরত ইব্রাহীম (আ.)কে চরকায় উঠানো হয়েছে। সমস্ত ফিরিশতা, দুনিয়ার সমস্ত মাখলূক স্তম্ভিত হয়ে গেছে আল্লাহর বন্ধুর এ-কী বিপদ! ফিরিশতারা বলছেন হে আল্লাহ! তোমার খলীলের সাথে, তোমার হাবীবের সাথে এ কী করা হচ্ছে? আল্লাহ পাক ফিরিশতাদেরকে তাঁর সাহায্যে এগিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। ফিরিশতারা এসে বললেন হে ইব্রাহীম! আমরা আপনার সাহায্যের জন্য এসেছি। হযরত ইব্রাহীম (আ.) বললেন, 'আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট'। শেষ পর্যন্ত হযরত জিব্রাঈল (আ.) এসে বললেন, 'আপনার কোন সাহায্যের প্রয়োজন আছে কি? বান্দা হাজির'! হযরত ইব্রাহীম (আ.) বললেন, 'সাহায্যের প্রয়োজন আছে, তবে আপনার নয়। যিনি আসল তিনি সাহায্য করবেন'! এটা ছিল আল্লাহর উপর চরম পর্যায়ের তাওয়াক্কুল। যাহোক হযরত ইব্রাহীম (আ.)কে সেই অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হল। কুরআন শরীফে এসেছে আল্লাহ পাক আগুনকে বললেন,

قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِىْ بَرْدًا وَّ سَلٰمًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ.

'অর্থাৎ, হে আগুন! তুমি ইব্রাহীমের জন্য ঠাণ্ডা এবং শান্তিদায়ক হয়ে যাও'। (আম্বিয়াঃ ৬৯)

অর্থাৎ, ঠাণ্ডা হও তবে এত ঠাণ্ডা নয় যে, আমার হাবীব ইব্রাহীমের কষ্ট হবে, বরং শান্তিদায়ক ঠাণ্ডা হয়ে যাও। হযরত ইব্রাহীম (আ.)কে সাতদিন ঐ অগ্নিকুণ্ডে ফেলে রাখা হল। হযরত ইব্রাহীম (আ.) বলেছেন দুনিয়াতে আমি ঐ সাতদিন যত আরামে ছিলাম এত আরামে আর কখনো থাকিনি। আল্লাহ পাক এই ঘটনা দ্বারা প্রমাণ করিয়ে দিলেন যে, আগুনের ভিতর পোড়ানোর ক্ষমতা তার নিজস্ব ক্ষমতা নয়, আমি আগুনের মধ্যে স্বাভাবিক পোড়ানোর ক্ষমতা দিয়ে রেখেছি তাই সে পোড়ায়। আবার যখন আমি সে ক্ষমতা তুলে নেই, পোড়াতে পারে না। বুঝা গেল কোন আসবাবের নিজস্ব কোন ক্ষমতা নেই।

পানির মধ্যে স্বাভাবিকভাবে ডোবানোর ক্ষমতা আছে। পানিতে পড়লে মানুষ ডুবে যায়, কিন্তু এই ক্ষমতা তার নিজস্ব ক্ষমতা নয়। হযরত মূসা (আ.)-এর ঘটনায় আল্লাহ পাক সেটা প্রমাণ করেছেন। হযরত মূসা (আ.) মিসর থেকে রওনা দিয়েছেন। ফিরাউনের যুলুম নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে তিনি তাঁর অনুসারী বনী ইসরাঈলকে নিয়ে রাতের অন্ধকারে মিসর থেকে শাম-দেশে অর্থাৎ ফিলিস্তিনে যাওয়ার জন্য রওনা দিয়েছেন। মিসর থেকে সিনাই এলাকা হয়ে ফিলিস্তিন এলাকায় যেতে হবে। মাঝখানে লোহিত সাগরের একটা শাখা রয়েছে যেটাকে সুয়েজ উপসাগর বলে। রাতের বেলায় তিনি তার লোকজন নিয়ে রওনা দিলেন। ভোর বেলায় লোহিত সাগরের এই শাখার কাছে চলে আসলেন। ফিরআউন টের পেয়ে তার সৈন্য বাহিনীসহ ধাওয়া করেছে। যখন হযরত মূসা (আ.)-এর লোকজন এই সাগরের কাছে এসে গেছে তখন পেছন দিকে তাকিয়ে দেখেন ফিরাউনের বাহিনীকে দেখা যাচ্ছে। মূসা (আ.)-এর লোকজন মূসা (আ.)কে বললেন,

اِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ. (শুআরাঃ ৬১)

'অর্থাৎ, আমরা তো ধরা পড়ে গেছি হুজুর! আর তো কোন উপায় নেই'! হযরত মূসা (আ.) বললেন,

كَلَّا اِنَّ مَعِىَ رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ. (الشعراء : ٦٢)

'অর্থাৎ, কখনও নয় অবশ্যই আমার সাথে আমার প্রতিপালক রয়েছেন। তিনি সহসা আমাকে পথ দেখাবেন'। হযরত মূসা (আ.) বোঝাতে চাইলেন যে, আমি আল্লাহর হুকুমে তোমাদেরকে নিয়ে রওনা দিয়েছি। অবশ্যই আল্লাহ পাক মুক্তির পথ বের করে দিবেন। আল্লাহর নবীর মজবূত বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহর হুকুম পালন করেছি আল্লাহ বলেছেন রওনা দিতে। এখন তিনিই আমাদেরকে রক্ষা করবেন। রক্ষা করার কী সূরত, তা আল্লাহ পাক জানেন। আল্লাহ পাক হুকুম দিলেন–

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

সৈন্যের মাথার উপর ছেড়ে দিয়েছে। পাথরকণাটা সৈন্যের শরীর ভেদ করে হাতির শরীর ভেদ করে নীচ দিয়ে বের হয়ে গেছে। এভাবে তাদেরকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। একটা পাথর কণার এই ক্ষমতা কেউ কল্পনাও করতে পারে না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা ঐ পাথর কণাগুলোর মধ্যে এমন ক্ষমতা দিয়ে দিয়েছেন। একেকটা পাথর কণা শক্তিশালী বুলেটের মত কাজ করেছে। আল্লাহ পাক দেখিয়েছেন কোন কিছুর ক্ষমতা তার নিজস্ব ক্ষমতা নয়। যার মধ্যে আমি যে ক্ষমতা দেই, তার মধ্যে সেই ক্ষমতা এসে যায়। আবার যখন কোন একটা দেয়া ক্ষমতা তুলে নেই, তখন সেই ক্ষমতার প্রকাশ হতে পারে না। আল্লাহ পাক দুনিয়াতে এরকম বহু ঘটনা দেখিয়েছেন। দেখিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, আসবাব বা বস্তুর ক্ষমতা তার নিজস্ব ক্ষমতা নয়। কজেই আমাদের আকীদা-বিশ্বাস এই থাকতে হবে যে, কোন বস্তুর মধ্যে নিজস্ব এবং স্বয়ংক্রিয় কোন ক্ষমতা নেই। এই আকীদা শিক্ষা দিয়ে হাদীছে বলা হয়েছে,

لَا عَدْوٰى وَلَا طِيَرَةَ وَلَاهَامَةَ. (صحيح البخاري برقم ٥٧٥٧)

অর্থাৎ, রোগ সংক্রমণের ধারণা ঠিক নয়, পাখি দিয়ে ভাগ্য নির্ধারণ করার ধারণা ঠিক নয় এবং পেঁচা সংক্রান্ত ধারণাও ঠিক নয়। এ হাদীছে তিনটি বিষয়ের কথা বলা হয়েছে।

**এক নম্বর হল–** রোগের মধ্যে সংক্রমণের নিজস্ব ক্ষমতা নেই। এক সাহাবী প্রশ্ন করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা তো দেখি উটের পালের মধ্যে একটার খোস-পাঁচড়া হয়, তা থেকে পালের সবগুলোর খোস-পাঁচড়া হয়ে যায়। যেমন আমরাও দেখি এক এলাকায় একজন লোক তথাকথিত সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে আরও বহু লোক তাতে আক্রান্ত হয়ে যায়। সাহাবী এরকমই প্রশ্ন করলেন। রাসূল (সা.) জওয়াবে বললেন,

فَمَنْ اَجْرَبَ الْاَوَّلَ؟ (سنن ابن ماجة برقم ٨٦)

'অর্থাৎ, প্রথম উটের খোস-পাঁচড়া কোথা থেকে এসেছে'? সেটা তো কোন আক্রান্ত উটের সংস্পর্শে যায়নি, তাহলে তার রোগটা কোথা থেকে আসল? তারটা যেমন আল্লাহর ফয়সালায় হয়েছে, বাকীগুলোরটাও তেমনিভাবে আল্লাহর ফয়সালায় হয়েছে। তবে হ্যাঁ যখন কোন এলাকায় অনেক লোককে আক্রান্ত করার আল্লাহর ইচ্ছা থাকে, তখন প্রথম একজনের হয়, তারপর অন্যদের হয়। এটা আল্লাহর ফয়সালাক্রমেই হয়ে থাকে। রোগের নিজস্ব ক্ষমতায় নয়।

তবে বাহ্যিকভাবে আমাদের কাছে মনে হয় একজন থেকে আরেকজনের মধ্যে রোগ ছড়ায়। এভাবে আমাদের ঈমান নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই হাদীছে এটাও বলে দেয়া হয়েছে যে, কোন এলাকায় ব্যাপকভাবে যদি মহামারী দেখা দিয়ে থাকে, তাহলে অন্য এলাকার লোকজন সেখানে যাবে না। কেন যাবে না? কারণ গেলে যদি আল্লাহর ফয়সালায় সে আক্রান্ত হয়, তখন তার মনে হবে আমি সেই এলাকায় গিয়েছি বলেই আক্রান্ত হয়েছি, এভাবে তার ঈমান নষ্ট হয়ে যেতে পারে, তাই সে সেখানে যাবে না। তার ঈমানকে রক্ষা করার জন্য যাবে না। এমনিভাবে আক্রান্ত এলাকার লোকও অন্য এলাকায় যাবে না। এজন্য যাবে না যে, সে যদি অন্য এলাকায় যায়, আর সেখানকার লোকেরা আল্লাহর ফয়সালায় আক্রান্ত হয়, তাহলে সেখানকার লোকদের ধারণা হবে যে, ঐ এলাকার অমুক লোকটা আমাদের এখানে এসেছিল বলে আমরা আক্রান্ত হয়েছি, এভাবে তাদের ঈমান নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আল্লাহর ফয়সালায় সব হয়, এই বিশ্বাসও আমাকে রাখতে হবে, সাথে সাথে আমার কোন পদক্ষেপ দ্বারা আমার বা অন্য কারও ঈমান নষ্ট না হয় সেদিকেও খেয়াল রাখতে বলা হয়েছে।

**হাদীছে দ্বিতীয় নম্বর কথা** বলা হয়েছে– وَلَا طِيَرَةَ

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com



অর্থাৎ, পাখি দ্বারা ভাগ্য নির্ধারণ করাও ঠিক নয়। আগের যুগের মানুষ কোন কাজ করার পূর্বে একটা পাখি ছেড়ে দিত। পাখিটা ডান দিকে গেলে সুলক্ষণ মনে করত, আর বাম দিকে গেলে কুলক্ষণ মনে করত। হাদীছে এ ধারণাকে খণ্ডন করা হয়েছে। অথবা হাদীছের এ কথাটার অর্থ হল কুলক্ষণ বলে কিছু নেই। আমরা অনেকে অনেক ধরনের কুলক্ষণ গ্রহণ করে থাকি। যেমন অনেক সময় দেখা যায় কুকুর লম্বা টান দিয়ে হু করে ডাকতে থাকে, আমরা তখন বলি বোধ হয় দেশে কোন বিপদ বা মহামারী আসছে। দেশে কোন বিপদ বা মহামারী আসছে কি-না তা কুকুরে জানবে কী করে? ওকি গায়েব জানে? আল্লাহ পাক কি ওকে গায়েব জানান? কুকুর হয়তো নিজস্ব কোন দুঃখের কারণে করুণ সুরে কাঁদছে আর আমরা কুলক্ষণ মনে করলাম যে, কোন বিপদ আসছে। এ ধরনের কুলক্ষণ গ্রহণ করা নিষেধ।

**হাদীছে তৃতীয় কথা** বলা হয়েছে– وَلَا هَامَةَ

অর্থাৎ, ভুতুম-পেঁচা সংক্রান্ত ধারণা ঠিক নয়। আগের যুগের মানুষের ধারণা ছিল এবং এখনও অনেকের ধারণা এরকম যে, ভুতুম পেঁচা ডাকলে ব্যাপক হারে মানুষের মৃত্যু ঘটে। হাদীছে এ ধারণাকে ভুল বলা হয়েছে। এক কবি বলেছেন,

ایں حسینان شہرنے بستیاں اجاڑا کردیا + یوم سالہ مفت بدنام ہوگیا

'অর্থাৎ, শহরের এই সুন্দরী নারীরা যেনা করে শহরকে উজাড় করল, আর খামাখা এই বেচারা ভুতুম-পেচার ঘাড়ে সব দোষ চাপানো হল'।

যাহোক আলোচনা চলছিল যে, বস্তুর নিজস্ব কোন ক্ষমতা নেই। বস্তুর মাধ্যমে আল্লাহ সবকিছু ঘটান-একথা সত্য, কিন্তু ক্ষমতাটা বস্তুর নিজস্ব নয়, ক্ষমতাটা আল্লাহর দেয়া। বস্তুর ঐ ক্ষমতা কার্যকরী হবে তখন, যখন আল্লাহর ফয়সালা হবে। তাকদীরে বিশ্বাস করার অর্থ হল আল্লাহর পরিকল্পনা এবং ফয়সালা মোতাবেকই সবকিছু হয়। আল্লাহর পরিকল্পনা এবং ফয়সালার বাইরে বস্তু কিছু করতে পারে না।

সবশেষে একটা কথা মনে রাখতে হবে- তাহল তাকদীর হচ্ছে আল্লাহর এক মহা পরিকল্পনা, এক অসীম পরিকল্পনা। আমাদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে এটা পুরাপুরী ঢুকানো যাবে না। তাকদীর নিয়ে তাই বেশি ঘাটাঘাটি করা ঠিক নয়। এক লোক হযরত আলী (রা.)-এর মত বিজ্ঞ লোককে তাকদীর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছিলেন,

طَرِيْقٌ مُظْلِمٌ لَا تَسْلُكْهُ.

'অর্থাৎ, তাকদীর হল এক অন্ধকারাচ্ছন্ন পথ, এই অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে তুমি চলো না, কোন দিশা খুঁজে পাবে না'। লোকটা আবার জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছিলেন,

بَحْرٌ عَمِيْقٌ لَا تَلِجْهُ.

অর্থাৎ, তাকদীরের বিষয় হল এক গভীর সমুদ্র, এর মধ্যে তুমি ডুব দিও না। এর কোন তলা তুমি খুঁজে পাবে না। লোকটা আবার জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছিলেন,

سِرُّ اللّٰهِ قَدْ خَفِيَ عَلَيْكَ فَلَا تُفَتِّشْهُ. (تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي)

'অর্থাৎ, তাকদীর হল আল্লাহর একটা রহস্য। এই রহস্য তুমি উদঘাটন করতে যেও না'। এ রহস্য আল্লাহ পাক কারও সামনে উন্মোচিত করেন না। আদি থেকে নিয়ে অন্ত পর্যন্ত সবকিছুর মহা পরিকল্পনা হল তাকদীর। এমন মহা বিষয় আমাদের বুঝে না আসাই স্বাভাবিক। তাই তাকদীর নিয়ে ঘাটাঘাটি না করে বরং আমাদের কর্তব্য হল তাকদীরে বিশ্বাস করা এবং সাধ্যমত আমল করে যাওয়া। আল্লাহ পাক আমাদের ঈমান ও আমলকে দোরস্ত করে দিন। আমীন!

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

قَالُوْا لَنَا هٰذِهٖ، وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّطَّيَّرُوْا بِمُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗ ، اَلَا اِنَّمَا طٰٓئِرُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ.

وَاعْلَمُوْا اَنْ لَّا تَاثِيْرَ فِيْ نَفْسِهٖ لِشَيْئٍ مِّنَ الْاَشْيَاءِ، اِلَّا اِذَا اَرَادَهُ اللّٰهُ وَقَضَاهُ، فَلَا تَاثِيْرَ فِى الْمَاءِ، وَلَا لِلنَّارِ وَالْهَوَاءِ، وَلَا لِشَيْئٍ مِّنَ الْاَشْيَاءِ سِوَاهُ. وَقَدِ اشْتَهَرَتْ قِصَّةُ مُوْسٰى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَمَنْ مَّعَهٗ مِنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ وَعُبُوْرُهُمْ مِنَ الْبَحْرِ بَعْدَ اَنْ صَارَ الْبَحْرُ مُنْفَلِقًا، وَصَارَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ مَّعَهٗ غَرْقًا، قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى حِيْنَئِذٍ : اِضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ. وَقِصَّةُ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِى النَّارِ وَعَدَمِ تَحْرِيْقِهٖ اِيَّاهُ ،قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى حِيْنَئِذٍ : يَا نَارُ كُوْنِىْ بَرْدًا وَّسَلَامًا عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ. وَقَدْ اَرْشَدَ اللّٰهُ سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى بِالْاِسْتِدْلَالِ بِهٰذِهِ الْاُمُوْرِ عَلٰى اَنْ لَّا تَاثِيْرَ لِشَيْئٍ مِّنَ الْاَشْيَآءِ اِلَّا اِذَا اَرَادَهُ اللّٰهُ وَقَضَاهُ.

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ : قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ، فَمَا لِهٰؤُلَآءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ حَدِيْثًا.

بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ، وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. اَقُوْلُ قَوْلِىْ هٰذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ لِىْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَاسْتَغْفِرُوْهُ، اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



## বয়ান নং ১৮-এর খুতবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ شَمَلَتْ قُدْرَتُهٗ كُلَّ مَقْدُوْرٍ، وَجَرَتْ مَشِيَّتُهٗ فِىْ خَلْقِهٖ بِتَصَارِيْفِ الْاُمُوْرِ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَهُوَ الْمُتَصَرِّفُ فِى الصُّدُوْرِ، اَحْمَدُهٗ وَهُوَ الْمَحْمُوْدُ الْمَشْكُوْرُ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهُ الَّذِىْ شَهَادَتُهٗ مَامُوْرٌ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اِلٰى يَوْمِ الْبَعْثِ وَالنُّشُوْرِ .

اَمَّا بَعْدُ :

اَيُّهَا النَّاسُ ! اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى خَلَقَ كُلَّ شَيْئٍ بِقُدْرَتِهٖ، وَاَوْدَعَ فِى الْاَشْيَاءِ قُوَّةً بِحِكْمَتِهٖ، فَتَاثِيْرُ الْاَشْيَاءِ لَيْسَ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهٖ، بَلْ هُوَ بِاِرَادَةِ اللّٰهِ وَتَقْدِيْرِهٖ. وَلَا مُؤَثِّرَ فِى الْكَائِنَاتِ غَيْرُهٗ، وَلَا مُسَبِّبَ الْاَسْبَابِ سِوَاهُ، وَلَا مَحِيْدَ عَمَّا قَضَاهُ اللّٰهُ وَلَا مَفَرَّ، وَلَا عَدْوٰى وَلَا طِيَرَةَ وَلَا هَامَّةَ وَلَا صَفَرَ. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا عَدْوٰى وَلَا طِيَرَةَ وَلَا هَامَّةَ وَلَا صَفَرَ ، فَقَالَ اَعْرَابِيٌّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مَا بَالُ الْاِبِلِ تَكُوْنُ فِى الرَّمْلِ كَاَنَّهَا الظِّبَاءُ ، فَيُخَالِطُهَا الْبَعِيْرُ الْاَجْرَبُ فَيُجْرِبُهَا؟ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَمَنْ اَجْرَبَ الْاَوَّلَ؟ اَخْرَجَهُ الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ. فَلَا تَشَائَمُوْا بِالْاَيَّامِ وَالسِّنِيْنَ وَالشُّهُوْرِ ، وَلَا تَنْسِبُوا النَّفْعَ وَالضُّرَّ اِلَّا اِلٰى مَنْ اِلَيْهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ. لَمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ شَهْرًا مَشْئُوْمًا، وَلَا وَقْتًا مِّنَ الْاَوْقَاتِ مَذْمُوْمًا، وَاِنَّمَا الشُّئُوْمُ فِى ارْتِكَابِ الْمَعَاصِىْ، وَالْجَزَاءُ عَلَيْهَا يَوْمَ يُؤْخَذُ بِالْاَقْدَامِ وَالنَّوَاصِىْ. وَمَا اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ، وَمَا بِكُمْ مِّنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ. وَقَدْ رَدَّ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلٰى مَنْ تَطَيَّرُوْا بِمُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗ وَقَالَ : فَاِذَا جَآئَتْهُمُ الْحَسَنَةُ

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বয়ান নং -১৯

## মাতা-পিতার জন্য সন্তানের করণীয়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: وَ قَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّ لَا تَنْهَرْهُمَا وَ قُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : رِضَى الرَّبِّ فِىْ رِضَى الْوَالِدِ وَسَخَطِ الرَّبِّ فِيْ سَخَطِ الْوَالِدِ. وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ: اَلْجَنَّةُ تَحْتَ اَقْدَامِ الْاُمَّهَاتِ.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

আমরা ঈমান সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেছি। ইবাদত সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। (দেখুন ১ম খণ্ড) ঈমান এবং ইবাদত এ দুটো হল আল্লাহর হক। অর্থাৎ, এগুলো সরাসরি আল্লাহর জন্যই করা হয়। আল্লাহর হকের পরে বান্দার হক। মানুষের জন্য আমাদের যা কিছু করণীয় আছে সেগুলো হল বান্দার হক। যেমন-মানুষের সাথে কথা-বার্তা, আচার-আচরণ, উঠা-বসা, চলা-ফেরা ইত্যাদি ক্ষেত্রে যা করণীয়, সেগুলো হল মানুষের হক বা মানুষের অধিকার। আল্লাহর হক আদায় করা যেমন ফরয, বান্দার হক আদায় করাও তেমন ফরয। ঈমান-ইবাদতকে তথা আল্লাহর হককে আমরা গুরুত্বপূর্ণ মনে করি, কিন্তু বান্দার হক আদায় করাও যে গুরুত্বপূর্ণ, এটাও যে ফরয-এই উপলব্ধি আমাদের মধ্যে আসে না। শুধু নামায রোযা করলাম, যাকাত দিলাম, হজ্জ করলাম, ঈমানের কথা বললাম, ঈমানের উপরে চললাম, আর মনে করলাম আমি কামেল মু'মিন হয়ে গেছি, পূর্ণাঙ্গ মুসলমান হয়ে গেছি, আমার কামিয়াবী নিশ্চিত। অথচ মানুষের সাথে আমার ব্যবহার ভাল নয়, আমি মানুষের অধিকার আদায় করি না, তাহলে আমার ধারণা ভুল। শুধু আল্লাহর হক আদায় করে আমি পূর্ণাঙ্গ মুসলমান হতে পারব না। পূর্ণাঙ্গ মুসলমান এবং কামেল মু'মিন হওয়ার জন্য বান্দার হকও আদায় করতে হবে। কারণ এটাও ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

বান্দার হকের মধ্যে সবচেয়ে গুরুরূপূর্ণ হক হল মাতা-পিতার হক। কুরআনে কারীমে বহু আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নিজের হকের কথা উল্লেখ করার সাথে সাথে পিতা-মাতার হকের কথাও উল্লেখ করেছেন। দুটো কথাকে পাশাপাশি এক সাথে উল্লেখ করেছেন। যেমন এক আয়াতে বলেছেন,

وَ قَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا.

'অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদের জন্য বিধান দিয়েছেন যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করবো, আর মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে'। (বানী ইসরাঈল: ২৩)

পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার অর্থ হল পিতা-মাতার হক বা তাদের অধিকার আদায় করা। এই আয়াতে আল্লাহ পাক দুটো কথাকে পাশাপাশি উল্লেখ করেছেন। একটা হল আল্লাহর ইবাদত কর। এটা হল আল্লাহর হক। তারপর বলা হয়েছে মাতা-পিতার হক আদায় কর। এ দুটো কথাকে পাশাপাশি বলার উদ্দেশ্য হল একথা বোঝানো যে, আল্লাহর হক আদায় করা যেমন গুরুরূপূর্ণ, পিতা-মাতার হক আদায় করাও তার কাছাকাছি গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহর হক আদায় না করলে যেমন নাজাত পাওয়া যাবে

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



না, পিতা-মাতার হক আদায় না করলেও নাজাত পাওয়া যাবে না। আল্লাহর হক আদায় না করলে যেমন আল্লাহ নারাজ হবেন, পিতা-মাতার হক আদায় না করলেও আল্লাহ নারাজ হবেন। হাদীছে রাসূল (সা.) এমনই বলেছেন। ইরশাদ হয়েছে,

رِضَى الرَّبِّ فِىْ رِضَى الْوَالِدِ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِيْ سَخَطِ الْوَالِدِ. (رواه الترمذي في سننه برقم ١٨٩٩)

অর্থাৎ, পিতার সন্তুষ্টির মধ্যেই আল্লার সন্তুষ্টি। পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যে আল্লাহর অসন্তুষ্টি। আর এক হাদীছে মায়ের খেদমতে থাকার কথা বলে তার কারণ হিসেবে বলা হয়েছে,

فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا. (رواه النسائي في السنن برقم ٣١٠٤)

অর্থাৎ, মায়ের দুই পায়ের নিচে হচ্ছে জান্নাত।

এ দুই হাদীছ মিলালে বুঝা যায় পিতা-মাতাকে অসন্তুষ্ট রেখে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা যাবে না। পিতা-মাতার খেদমত এবং আনুগত্য ছাড়া জান্নাত লাভ করা যাবে না। পিতা-মাতার হক বা অধিকার তাই অনেক বড়। সমস্ত মানুষের মধ্যে মাতা-পিতার অধিকার সবচেয়ে বড়।

পিতা-মাতা আমাদের দুনিয়াতে আসার ওছীলা। তারা না হলে আমরা দুনিয়াতে আসতে পারতাম না। তারা যে আদর-যত্ন করে আমাদের লালন-পালন করেছেন, ঐ আদর-যত্ন না থাকলে আমরা বেঁচে থাকতে পারতাম না, এই পর্যায় আসতে পারতাম না। তাই পিতা-মাতার অনুগ্রহের কোন বদলা হতে পারে না। আমাদের প্রতি পিতা-মাতার যে ভালবাসা, সেই ভালবাসার কোন বদলা হতে পারে না। সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার ভালবাসা অকৃত্রিম ভালবাসা, নিঃস্বার্থ ভালবাসা। এরকম অকৃত্রিম ও নিঃস্বার্থ ভালবাসা আর দ্বিতীয়টি নেই। স্বামী-স্ত্রী একজন আরেকজনকে ভালবাসে, এক বন্ধু আরেক বন্ধুকে ভালবাসে, এক ভাই আরেক ভাইকে ভালবাসে, এই সব ভালবাসার মধ্যে কোন না কোনভাবে স্বার্থ থাকে। তাই যখনই স্বার্থ নষ্ট হয়ে যায়, প্রেম ভালবাসা এবং বন্ধুত্বও নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু সন্তান পিতা-মাতার সাথে যত খারাপ ব্যবহার করুক তবুও পিতা-মাতার স্নেহ-ভালবাসা বহাল থাকে। পিতা-মাতার ভালবাসা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ভালবাসা। অকৃত্রিম ভালবাসা। এই ভালবাসার বদলা দেয়া সম্ভব নয়। এই ভালবাসার কোন বদলা হয় না। তাই পিতা-মাতার হক কত বড় তা ভাষা দিয়ে বোঝানো কঠিন। মোটামুটিভাবে বোঝানোর জন্য বলা হয় আল্লাহর হকের পরেই পিতা-মাতার হক। পিতা-মাতার হক, পিতা-মাতার আনুগত্য, পিতা-মাতার খেদমত তাই এত গুরুরূপূর্ণ।

মাতা-পিতার হক এবং তাদের খেদমত বলতে কী বুঝায়? মাতা-পিতার সম্মান করা, তাদের হুকুমের আনুগত্য করা, কথা কাজ ও আচরণে কোনভাবে তাদেরকে কষ্ট না দেয়া। যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা আল্লাহর কোন হুকুমের বিরুদ্ধে কিছু না বলবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের কথা মানতে হবে। তবে মাতা-পিতা যদি এমন কোন হুকুম করেন, যে হুকুম মানলে আল্লাহর নাফরমানী হবে, অর্থাৎ, গোনাহ হবে, সে হুকুম মান্য করা যাবে না। কারণ হাদীছে এসেছে,

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِيْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ. (رواه أحمد في مسنده برقم ١٠٩٥ وإسناده صحيح على شرط الشيخين)

অর্থাৎ, আল্লাহ জাল্লা শানুহুর নাফরমানী হয় এমন কোন বিষয়ে কারও কথা মানা যাবে না।

অতএব দুর্ভাগ্যবশত যদি কোন পিতা-মাতা বলেন যে, নামায পড়তে পারবে না, তাহলে সে হুকুম মানা যাবে না। কারণ সে হুকুম মানলে গোনাহ হবে। যদি বলে দাঁড়ি রাখতে পারবে না, সে হুকুমও

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

মানা যাবে না। কারণ তাতে গোনাহ হবে। মাতা-পিতার কোন গোনাহের হুকুম মানা যাবে না। যতক্ষণ গোনাহ না হবে, ততক্ষণ তাদের কথা মানতে হবে। যদি এমন হয় যে, তাদের কথা মানতে গেলে বা তাদের খেদমত করতে গেলে এমন একটা আমল ছুটে যায় যাতে গোনাহ হয় না, তবে একটা ফযীলত ছুটে যায়, তাহলেও তাদের খেদমতে থাকতে হবে। যেমন মাতা-পিতার খেদমতের প্রয়োজনে যদি জামাআত ছাড়তে হয়, জামাআতে নামায পড়তে গেলে যদি তাদের কষ্ট হয়, তাহলে জামাআত ছাড়ার হুকুম। যদিও জামাআতে নামায পড়ার অনেক ফযীলত। এরকম অবস্থায় পিতা-মাতার খেদমত করে ঘরে নামায পড়েও সে জামাআতের ফযীলত পেয়ে যাবে। এমনিভাবে পিতা-মাতার খেদমতের প্রয়োজনে, পিতা-মাতার কষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে আগে ভাগে মসজিদে গিয়ে বড় হুজুরের বয়ান শুনাও ছাড়তে হবে, চিল্লায় যাওয়া এবং গাশতে যাওয়াও ছাড়তে হবে। যদিও বয়ান শুনা, চিল্লায় যাওয়া, গাশতে যাওয়া অনেক ফায়দার কাজ। কিন্তু পিতা-মাতার খেদমতের প্রয়োজনে এগুলো সাময়িক বন্ধ রেখে তাদের কাছে খেদমতের জন্য থাকতে হবে। নফল কাজের চেয়ে, নফল আমলের চেয়ে পিতা-মাতার খেদমতের গুরুত্ব শরীআতে বেশি। বোখারী শরীফের হাদীছে এসেছে– এক সাহাবী রাসূল (সা.)-এর কাছে আসলেন। এসে বললেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! জেহাদের অনেক ফযীলত শুনেছি, আমি জেহাদে যেতে চাই। জেহাদের ছওয়াব অর্জন করতে চাই, আল্লাহকে রাজী-খুশি করতে চাই। রাসূল (সা.) জিজ্ঞাসা করলেন,

لَكَ وَالِدَانِ؟ قَالَ نَعَمْ

'অর্থাৎ, তোমার পিতা-মাতা আছেন কী'? তিনি বললেন, 'জী হ্যাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ! পিতা-মাতা আছেন'। রাসূল (সা.) বললেন,

فَفِيْهِمَا فَجَاهِدْ. (صحيح البخاري برقم ٥٩٧٢ وصحيح مسلم برقم ٦٦٦٨)

'অর্থাৎ, তাহলে তাদের খেদমত করে জেহাদ কর। অর্থাৎ, ময়দানের জেহাদ ছেড়ে তাদের খেদমত কর'।

এ হাদীছে বোঝানো হয়েছে- নফল জেহাদের চেয়ে পিতা-মাতার খেদমতের গুরুত্ব বেশি। পিতা-মাতার খেদমতের প্রয়োজনে জেহাদ, এমনিভাবে নফল আমল ছেড়ে দিতে হবে। মুসনাদে আহমদের এক রেওয়ায়েতে এসেছে-একবার এক জেহাদের প্রস্তুতি চলছিল। সকলে নাম লেখাচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি এসে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি জেহাদে যেতে চাই'। সে তার জেহাদে যাওয়ার স্পৃহা বোঝানোর জন্য বলল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! জেহাদে যাওয়ার জন্য আমি মাতা-পিতাকে ছেড়ে রেখে চলে এসেছি। যদিও তারা কাঁদছিলেন'। রাসূল (সা.) বুঝলেন সে মাতা-পিতার সম্মতি ছাড়াই তাদের কাছ থেকে অনুমতি না নিয়েই চলে এসেছে, তাই তার চলে আসার সময় তারা কাঁদছিলেন। রাসূল (সা.) বললেন,

اِرْجِعْ فَاضْحِكْهُمَا كَمَا اَبْكَيْتَهُمَا. (رواه أحمد في مسنده برقم ٦٩٠٩ وإسناده حسن)

'অর্থাৎ, তাহলে ফিরে যেয়ে তাদেরকে হাসাও, যেমন কাঁদিয়ে এসেছ। এইসব হাদীছ থেকে বোঝা যায় মাতা-পিতার খেদমত নফল আমলের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যদিও নফল আমল করতে জযবা বোধ হয়। জামাআতে নামায পড়তে যাওয়া, দ্বীনের রাস্তায় বের হয়ে যাওয়া, জেহাদে বের হয়ে যাওয়া-এগুলোর প্রতি বেশি জযবা বোধ হয়। কিন্তু পিতা-মাতার খেদমতের প্রয়োজন থাকলে এই

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



জযবাকে ত্যাগ করতে হবে। এটাই হল শরীআত। জযবার উপর নয় বরং শরীআতের উপর আমল করতে হবে। একটা ঘটনা শুনুন! ঘটনাটি হযরত ওয়ায়েজ করনী (রহ.)-এর ঘটনা। হাদীছেও এ ঘটনা এসেছে। হযরত ওয়ায়েছ করনী রাসূল (সা.)-এর যুগে ইয়ামানে বসবাস করতেন। তিনি রাসূল (সা.)কে দেখেননি। রাসূল (সা.)-এর খেদমতে আসার জন্য তার মন ছটফট করছিল। একবার রাসূলের কাছে আসতে পারলে সাহাবীর মর্যাদা পেয়ে যাবেন। একজন সাহাবীর মর্যাদা এত বড় যে, সাহাবী ছাড়া আর যত মুসলমান আছে, সব মুসলমানকে যদি এক পাল্লায় রাখা হয় তাহলেও একজন সাহাবীর মর্যাদার সমান হবে না। এটা অত্যন্ত আবেগের বিষয় ছিল। কিন্তু আসতে পারছিলেন না বৃদ্ধা মায়ের কারণে। মায়ের খেদমতের প্রয়োজন ছিল। রাসূলের কাছে আসতে গেলে মায়ের খেদমতের ত্রুটি হয়। তিনি রাসূল (সা.)-এর কাছে চিঠি লিখলেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার এই অবস্থা। আমার খুব মনে চায় আপনার দরবারে আসতে, আপনাকে এক নজর দেখতে!! আমি সাহাবী হতে চাই!! কিন্তু আমার মায়ের খেদমতের জন্য আসতে পারছি না। আসলে আমার মায়ের কষ্ট হয়। এখন আমার কী করণীয়? রাসূল (সা.) বললেন, 'তোমার মায়ের খেদমত করতে থাক'। তিনি তাই করতে থাকলেন। রাসূলের খেদমতে আসার আবেগকে বর্জন করে মায়ের খেদমত করতে থাকলেন। কারণ, রাসূলের কথাই ছিল শরীআত। তিনি আবেগকে বর্জন করে শরীআতের উপর আমল করলেন। এর কারণে তার মার্যাদা এত বেড়ে গেল যে, রাসূল (সা.) হযরত ওমর (রা.)কে বলেছিলেন, 'হে ওমর! একদিন ওয়ায়েছ করনী নামের একজন লোক ইয়ামান থেকে মদীনায় আসবে। তার চেহারার গঠন এরকম হবে'। সে যখন আসবে তখন তার কাছে অনুনয় বিনয় করে দু'আ চাইবে। কারণ তার দু'আ কবুল হবে। হযরত ওমর (রা.)-এর মত বড় সাহাবী, যিনি চার খলীফার একজন। তাকে শিখানো হচ্ছে তার কাছে দু'আ চেয়ে নেয়ার কথা। এটা কত বড় মর্যাদার কথা! এরপর থেকে হযরত ওমর (রা.) যখনই শুনতেন ইয়ামান থেকে কোন কাফেলা এসেছে, তিনি ছুটে যেতেন তাদের কাছে। জিজ্ঞাসা করতেন তাদের মধ্যে ওয়ায়েছ করনী নামের কোন লোক এসেছে কি-না। একদিন তাকে পেয়ে গেলেন। রাসূল (সা.) যেমন গঠনের কথা বলেছিলেন, ঠিক তেমনই তাকে পেলেন, পেয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলেন, আর বললেন আপনি আমার জন্য দু'আ করুন। ওয়ায়েছ করনী আশ্চার্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি খলীফা হয়ে আমার কাছে দু'আ চাচ্ছেন আমার এমন কী মর্যাদা হয়ে গেল? তখন হযরত ওমর (রা.) বললেন, 'রাসূল (সা.) আপনার ব্যাপারে এই এই বলে গেছেন'। শুনে হযরত ওয়ায়েছ করনী (রহ.) খুশিতে কেঁদে দিলেন। তিনি নিজের আবেগ ছেড়ে দিয়ে রাসূল (সা.)-এর কথায় অর্থাৎ, শরীআতের উপর আমল করেছেন, তাই তার এত মর্যাদা হয়েছে। আমরা হলে তো মানতাম না। আমরা হলে আবেগের ঠেলায় মনে করতাম আমি সাহাবী হতে চাই। মায়ের খেদমতে একটু ত্রুটি হলে কী আছে? কিন্তু আবেগের নাম ইসলাম নয়। বরং আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল যা বলেন সেটা আবেগবিরোধী হলেও সেটার উপর আমল করার নাম হল ইসলাম। তাই মাতা-পিতা অসুস্থ থাকলে, তাদের খেদমতের প্রয়োজন থাকলে, জামাআতে নামায পড়ার আবেগ ছাড়তে হবে, জেহাদে যাওয়ার আবেগ ছাড়তে হবে, চিল্লায় যাওয়ার আবেগ ছাড়তে হবে, গাশতে যাওয়ার আবেগ ছাড়তে হবে, এটাই ইসলাম। জযবা বা আবেগের নাম ইসলাম নয়। এরকম মুহূর্তে এসব নফল আমলের চেয়ে মাতা-পিতার খেদমতের দ্বারাই বেশি ফযীলত অর্জন করা যাবে।

সন্তানের জন্য মাতা-পিতার মধ্যে অনেক ধরনের ফযীলত রাখা হয়েছে। মহব্বতের নজরে মাতা-পিতার দিকে একবার তাকালে এক হজ্জ ওমরার ছওয়াব রাখা হয়েছে। মাতা-পিতার সন্তুষ্টির

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

মধ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি রাখা হয়েছে! মাতা-পিতার পায়ের নীচে অর্থাৎ, তাদের খেদমত ও আনুগত্যের ভিতরে সন্তানের জান্নাত রাখা হয়েছে।

এগুলো হল পরকালের ফযীলত। পিতা-মাতার খেদমতের মধ্যে দুনিয়াবী ফায়দাও রয়েছে। যারা মাতা-পিতার খেদমত করে, তারা দুনিয়াতে খুব সুখ-শান্তিতে থাকে। যারা পিতা-মাতার খেদমত করে, দুনিয়ায় তাদের রিযিকে বরকত হয়। এর বিপরীত যারা পিতা-মাতার খেদমতে ত্রুটি করে, দুনিয়াতে তাদের অশান্তি আসে, আয় রোজগারে বরকত উঠে যায়। আমাদের কাছে এরকম বহু ঘটনা আছে। অনেকে এসে বলেন হুজুর! খুব টেনশনে আছি, পেরেশানিতে আছি, জীবনে কোন বরকত নেই, সব জায়গায় বে-বরকতী। এদের অনেকের ক্ষেত্রে আমরা খুঁজে পেয়েছি যে, পিতা-মাতার সাথে তাদের সুসম্পর্ক নেই। পিতা-মাতার খেদমতে তাদের ত্রুটি আছে। কিংবা যতদিন তারা বেঁচে ছিলেন, তাদের খেদমতে তারা ত্রুটি করেছিল। তাই পিতা-মাতার খেদমতে ত্রুটি করায় দুনিয়া আখেরাত সব জায়গায় ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। এমনকি মৃত্যুর সময়ও ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়।

ফকীহ আবুল লাইছ সমরকন্দী বর্ণনা করেছেন, রাসূল (সা.)-এর যুগে একজন লোক ছিলেন, নাম আলকামা। মৃত্যুর সময় তার আশে পাশের লোকজন তাকে কালিমা পড়ানোর জন্য খুব চেষ্টা করল। কিন্তু তার মুখ দিয়ে কালিমা বের হচ্ছিল না। তার বিবি রাসূল (সা.)-এর কাছে সংবাদ নিয়ে গেলেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আলকামার এই অবস্থা! কোনভাবেই তার মুখ থেকে কালিমা বের হচ্ছে না। রাসূল (সা.) হযরত বেলাল (রা.)কে পাঠিয়ে দিলেন যে, তার অবস্থা দেখে আস। তিনি দেখে খবর পাঠালেন যে, তার অবস্থা হল কোনভাবেই তার মুখ থেকে কালিমা বের হচ্ছে না। রাসূল (সা.) জিজ্ঞাসা করলেন তার মাতা-পিতা আছেন? বললেন পিতা মারা গেছেন, মাতা আছেন, খুব বৃদ্ধা। রাসূল (সা.) তার মায়ের কাছে খবর পাঠালেন যদি আপনার পক্ষে আমার কাছে আসা সম্ভব হয়, তাহলে আসবেন নতুবা আমি আপনার কাছে আসব। তার মাতা খুব বৃদ্ধা ছিলেন, চলা-ফেরা করতে কষ্ট হত। তিনি খুব কষ্ট স্বীকার করে রাসূল (সা.)-এর কাছে আসলেন। রাসূল (সা.) জিজ্ঞাসা করলেন আপনার পুত্র আলকামা কেমন? তিনি বললেন, খুব ভাল, খুব নামাযী, খুব তাহাজ্জুদ গোজার, প্রচুর নফল রোযা রাখে, প্রচুর দান খয়রাত করে, তার আমল অনেক ভাল। রাসূল (সা.) জিজ্ঞাসা করলেন আপনার সাথে সম্পর্ক কেমন? তখন তিনি বললেন আমি তার প্রতি সন্তুষ্ট নই। কারণ, সে আমার খেদমত করে না, আমার কথার চেয়ে বিবির কথাকে প্রাধান্য দেয়। তখন রাসূল (সা.) বললেন,

سَخَطُ اُمِّهٖ حَجَبَ لِسَانَهٗ عَنْ شَهَادَةِ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ. (تنبيه الغافلين)

'অর্থাৎ, এই যে মায়ের অসন্তুষ্টি, এ কারণে তার মুখ থেকে কালিমা বের হচ্ছে না'। সে এখন বেঈমান হয়ে মারা যাবে। রাসূল (সা.) হযরত বেলালকে বললেন, 'বেলাল! লাকড়ী জমা কর! আলকামাকে সেই লাকড়ী দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়া হবে'। একথা শুনে আলকামার মা চিৎকার করে উঠলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! না এটা করবেন না, আমার সন্তান আগুনে জ্বলবে আমি বরদাশ্‌ত করতে পারব না। দেখা গেল মায়ের দরদ কখনো ফুরায় না। মায়ের দরদের কোন তুলনা হয় না। পিতার চেয়ে মায়ের দরদ অনেক বেশি। এজন্য খেদমতের ক্ষেত্রে পিতার চেয়ে মায়ের হক বেশি। হাদীছে এসেছে এক সাহাবী রাসূল (সা.)কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, مَنْ اَبَرُّ؟ অর্থাৎ, ভাল ব্যবহার সবচেয়ে বেশি করব কার সাথে? রাসূল (সা.) বলেছিলেন, 'اُمَّكَ অর্থাৎ, তোমার মায়ের সাথে'। সাহাবী জিজ্ঞাসা করেছিলেন

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



তারপর? রাসূল (সা.) বলেছিলেন, তোমার মায়ের সাথে। সাহাবী জিজ্ঞাসা করেছিলেন তারপর? রাসূল (সা.) বলেছিলেন, তোমার মায়ের সাথে। সাহাবী আবার প্রশ্ন করলেন তারপর? এবার চতুর্থ বারে গিয়ে রাসূল (সা.) বললেন, পিতার সাথে।

এ হাদীছ থেকে বুঝা যায় খেদমত এবং ভাল ব্যবহারের ক্ষেত্রে পিতার চেয়ে মাতার হক তিনগুণ বেশি। কারণ সন্তানের প্রতি পিতার চেয়ে মায়ের দরদ অনেক বেশি। তাই রাসূল (সা.) যখন বললেন আলকামাকে আগুনে জ্বালিয়ে দিব তখন তার মা চিৎকার দিয়ে উঠলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! না, এটা করবেন না। আমার কলীজার টুকরাকে আমার চোখের সামনে আগুনে জ্বালাবেন, আমি মা হয়ে তা কি করে সহ্য করব? রাসূল (সা.)-এর উদ্দেশ্য ছিল অন্য রকম। রাসূল (সা.) বললেন, 'আপনি যদি আলকামার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন, তাহলে ও জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে, সেটা কী করে সহ্য করবেন? সেই আগুন থেকে তাকে বাঁচানোর একমাত্র উপায় হল তাকে মাফ করে দেয়া, আপনার সন্তুষ্ট হয়ে যাওয়া'। তখন আলকামার মা বলে উঠলেন আসমানের খোদাকে সাক্ষী রেখে বলছি, আপনাকে সাক্ষী রেখে বলছি, এই উপস্থিত সকলকে সাক্ষী রেখে বলছি- আমি আলকামাকে মাফ করে দিলাম। রাসূল (সা.) বললেন, 'বেলাল গিয়ে দেখ এখন কি অবস্থা'? হযরত বেলাল (রা.) যেয়ে ঘরে ঢুকেছেন, সাথে সাথে শুনতে পেলেন আলকামার মুখ থেকে বের হচ্ছে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। এই অবস্থায় তার ইন্তেকাল হল। এ ঘটনা থেকে বুঝা গেল মায়ের অসন্তুষ্টি মৃত্যুর সময় মুখ থেকে কালিমা উচ্চারণ হতে দেয় না। আলকামার ঘটনা সম্পর্কিত এই রেওয়ায়েত সহীহ কি-না কিছু সন্দেহ রয়েছে। তবে ইতিহাসে এমন অনেক ঘটনা পাওয়া যায়, যাতে দেখা যায় পিতা-মাতার অসন্তুষ্টির কারণে মৃত্যুর সময় মুখ থেকে কালিমা বের হয়নি। যাহোক যা আলোচনা চলছিল মাতা-পিতার খেদমতের ফায়দা দুনিয়াতেও পাওয়া যায়, মৃত্যুর সময়ও পাওয়া যায় এবং পরকালেও পাওয়া যায়।

আমরা আমাদের পিতা-মাতার খেদমতে ত্রুটি করব, আমাদের সন্তানাদিও আমাদের খেদমতে ত্রুটি করবে। আমরা পিতা-মাতার খেদমতে ত্রুটি করব না, আমাদের সন্তানরাও আমাদের খেদমতে ত্রুটি করবে না।

আমরা যারা পিতা-মাতার খেদমতে ত্রুটি করেছি এখন পিতা-মাতা দুনিয়াতে নেই, তাদের কি উপায়? তাদের উপায়ও হাদীছে বলে দেয়া হয়েছে। এক নম্বর উপায় হল- পিতা-মাতার জন্য দু'আ করা। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর পিতা-মাতার জন্য দু'আ করার কথা বলা হয়েছে। কী বলে দু'আ করতে হবে তাও আল্লাহ তা'আলা শিখিয়ে দিয়েছেন,

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا. (الاسراء: ٢٤)

অর্থাৎ, হে আমার রব! হে আমার প্রতিপালক! আমার মাতা-পিতার প্রতি রহম কর, ছোট বেলায় যেমন আদর-সোহাগ করে তারা আমাদের লালন-পালন করেছিলেন। তারা এখন তোমার দরবারে আছে, তাদেরকেও তুমি ওরকম আদর-যত্ন করে রাখ। দু'আর কত সুন্দর ভাষা আল্লাহ পাক শিক্ষা দিয়েছেন।

মৃত মাতা-পিতাকে খুশি করার জন্য আর একটা করণীয় হল তাদের জন্য ঈছালে ছওয়াব করতে থাকা। নফল নামায পড়ে, কুরআন তেলাওয়াত করে, দান সদকা করে তাদের রূহে ছওয়াব পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা। যখন তারা ছওয়াব পেতে থাকবেন, যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে জানিয়ে দেয়া

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

হবে যে, তোমার অমুক সন্তান তোমার জন্য এই হাদিয়া পাঠাচ্ছে। তাতে তারা খুশি হয়ে যাবেন। এভাবে মৃত মাতা-পিতাকে খুশি করানো যায়।

মাতা-পিতার জন্য আর একটা করণীয় হল তাদের বন্ধু বান্ধব, তাদের ঘনিষ্ঠজনদের সঙ্গেও তাদের মত সু-ব্যবহার ও খেদমত করতে থাকা। হাদীছে আছে এটার দ্বারাও মাতা-পিতা সন্তুষ্ট হবেন।

মৃত মাতা-পিতার জন্য আর একটা করণীয় হল যদি তাদের অনাদায়ী কোন ঋণ থাকে, তাহলে সাধ্যমত তা আদায়ের ব্যবস্থা করা। ঋণের কারণে মানুষের আমল ঝুলন্ত থাকে, কবুল হয় না, তার আত্মার শান্তির ফয়সালা মওকূফ হয়ে থাকে। তাই মাতা-পিতার যে কোন রকম ঋণ থাকুক, মানুষের ঋণ হোক, বা আল্লাহর ঋণ হোক, সব ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহর ঋণ থাকলে তা দেয়ার অর্থ হল তাদের নামায অনাদায়ী থাকলে তার ফিদইয়া দেয়া, হজ্জ অনাদায়ী থাকলে বদলী হজ্জ করানোর ব্যবস্থা করা, যাকাত অনাদায়ী থাকলে তা আদায় করা ইত্যাদি। সন্তানের যদি সাধ্য থাকে, তাহলে এগুলো করা দ্বারাও মৃত পিতা-মাতাকে সন্তুষ্ট করানো যায়। আর যতক্ষণ তারা দুনিয়াতে বেঁচে আছেন, ততক্ষণ সাধ্যমত তাদের খেদমত করতে থাকা। বিশেষভাবে বৃদ্ধ বয়সে তাদের খেদমতের প্রয়োজন বেশি হয়, এই সময়ে তাদের খেদমতের প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে বলা হয়েছে। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ.

অর্থাৎ, মাতা-পিতার উভয়কে অথবা একজনকে যদি বৃদ্ধ অবস্থায় পাও, তাহলে তাদের খুব খেদমত কর। কোনভাবে তাদেরকে কষ্ট দিও না। একটা কথা দ্বারাও কখনও কষ্ট দিবে না। অনেক সময় দেখা যায় মাতা-পিতা বার্ধক্যে উপনীত হলে এক কথা বারবার বলতে থাকেন। এতে সন্তান ত্যক্ত বিরক্ত হয়ে বলতে পারে উপ! কী যন্ত্রণায় পড়লাম! কী প্যাচাল পাড়া শুরু করলেন! আল্লাহ তা'আলা বলেছেন মুখ থেকে এরকম উপ-ও বলতে পারবে না। তাদেরকে ধমক দিতে পারবে না, তাদের সাথে নরমে সম্মান রক্ষা করে কথা বলবে।

পিতা-মাতার খেদমত করলে ইল্‌মেও বরকত হয়। ইমাম গাযালী (রহ.)-এর ঘটনা তার প্রমাণ। হযরত ইমাম গাযালী (রহ.) ইসলামী ইতিহাসের একজন বড় আলেম ব্যক্তি, বড় দার্শনিক ব্যক্তি। তিনি ইসলামী ইতিহাসের শীর্ষস্থানীয় আলেমদের একজন। তার সম্পর্কে প্রসিদ্ধ আছে যে, দীর্ঘ দিন তিনি মায়ের খেদমতে থাকার কারণে ইল্‌ম চর্চা করতে পারেননি। আল্লাহ পাক এর ওছীলায় তাকে এত ইল্‌ম দিয়েছেন যে, ইসলামী ইতিহাসের শীর্ষস্থানীয় আলেমদের তালিকায় চলে এসেছেন। আল্লাহ তা'আলা তার ইলমে বরকত দিয়েছেন। এভাবে আল্লাহ পাক পিতা-মাতার খেদমতের মধ্যে সব ধরনের ফায়দা নিহিত রেখেছেন। আল্লাহ পাক আমাদেরকে সহীহ সমঝ দান করেন। মাতা-পিতার খেদমতের তাওফীক দান করেন। আমীন!

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



## বয়ান নং ১৯-এর খুতবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْكَبِيْرِ الْمُتَعَالِ، اَلَّذِىْ جَعَلَ بِرَّ الْوَالِدَيْنِ مِنْ اَفْضَلِ الْاَعْمَالِ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَلَا مِثْلَ لَهٗ وَلَا مِثَالَ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهُ الَّذِىْ اِخْتَصَّهٗ بِمَزِيْدِ الْفَضْلِ وَالْكَمَالِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ صَلَاةً وَّسَلَامًا دَائِمَيْنِ بِلَا زَوَالٍ.

اَمَّا بَعْدُ :

عِبَادَ اللّٰهِ ! عَلَيْكُمْ بِبِرِّ الْاُمَّهَاتِ وَالْاٰبَاءِ، وَالْاِحْسَانِ اِلَيْهِمَا فِى الشِّدَّةِ وَالرَّخَاءِ، وَفِى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، وَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى كَلَّفَ الْاِنْسَانَ بِالتَّكَالِيْفِ الشَّرْعِيَّةِ الْغَرَّاءِ، وَجَعَلَ مِنْهَا بِرَّ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرِبَاءِ، وَقَرَنَ حُقُوْقَ الْوَالِدَيْنِ بِحَقِّهٖ، وَشُكْرَهُمَا بِشُكْرِهٖ، وَاَمَرَ بِمُرَاعَاةِ الْحُقُوْقِ جَمِيْعَ خَلْقِهٖ، وَجَعَلَ عُقُوْقَهُمَا مِنْ كَبَائِرِ الْاِثْمِ وَعِصْيَانِهٖ. قَالَ تَعَالٰى: وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ، وَّلَا تَنْهَرْهُمَا، وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ، وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا. وَفِىْ اٰيَةٍ اُخْرٰى ـ وَاِنْ جَاهَدَاكَ عَلٰى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا. فَلَا تَجُوْزُ اِطَاعَةُ الْوَالِدَيْنِ فِى الْمَعَاصِىْ، لِاَنَّ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ.

اَيُّهَا النَّاسُ! وَقَدْ دَلَّ كَثِيْرٌ مِّنَ الْاٰيَاتِ الْقُرْاٰنِيَّةِ وَالْاَحَادِيْثِ النَّبَوِيَّةِ عَلٰى اَنَّ بِرَّ الْوَالِدَيْنِ جَمَعَ مِنَ الْخَيْرِ اَكْمَلَهٗ، وَمِنَ الْاِحْسَانِ اَجْمَلَهٗ، وَمِنَ الْمُرُوْءَةِ اَرْفَعَهَا، وَمِنَ الْخَيْرَاتِ اَنْفَعَهَا. قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رِضَى الرَّبِّ فِىْ رِضَى الْوَالِدِ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِىْ سَخَطِ الْوَالِدِ. وَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

وَسَلَّمَ : اَلْجَنَّةُ تَحْتَ اَقْدَامِ الْاُمَّهَاتِ. وَالْاَحَادِيْثُ فِيْ فَضَائِلِ الْاِحْسَانِ بِالْوَالِدَيْنِ كَثِيْرَةٌ. عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ : اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسْتَشِيْرُهُ فِى الْجِهَادِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَكَ وَالِدَانِ؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ : اَلْزِمْهُمَا، فَاِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ اَقْدَامِهِمَا. رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. كَذَا فِيْ مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ. وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَاَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّ الْعَمَلِ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ؟ قَالَ اَلصَّلَاةُ عَلٰى وَقْتِهَا، قُلْتُ : ثُمَّ اَيٌّ ؟ قَالَ : بِرُّ الْوَالِدَيْنِ، قُلْتُ ثُمَّ اَيٌّ؟ قَالَ: اَلْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ.

وَاعْلَمُوْا اَنَّ الْاُمَّ اَقْدَمُ فِى الْخِدْمَةِ مِنَ الْوَالِدِ وَالْوَالِدُ اَقْدَمُ فِى التَّعْظِيْمِ مِنَ الْوَالِدَةِ. عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مَنْ اَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صُحْبَتِيْ؟ قَالَ: اُمُّكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ اُمُّكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ اُمُّكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ : اَبُوْكَ. رَوَاهُ فِى جَامِعِ الْاُصُوْلِ.

اَيُّهَا النَّاسُ! وَاعْلَمُوْا مَنْ بَرَّ اَبَائَهُ يَبُرُّهُ اَبْنَائُهُ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بُرُّوْا اٰبَائَكُمْ تَبُرَّكُمْ اَبْنَائُكُمْ، وَعِفُّوْا تَعِفَّ نِسَائُكُمْ. رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِى الْاَوْسَطِ.

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ : وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، وَاِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ.

بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ، وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. اَقُوْلُ قَوْلِيْ هٰذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَاسْتَغْفِرُوْهُ، اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



বয়ান নং -২০

## সন্তানের জন্য পিতা-মাতার করণীয় (১ম পর্ব)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : اَلْعِلْمُ فِي الصِّغَرِ كَالنَّقْشِ فِى الْحَجَرِ. وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

পিতা-মাতার জন্য সন্তানের কী করণীয়– এ সম্পর্কে গত জুমুআয় আলোচনা করা হয়েছিল। পিতা-মাতার আনুগত্য করা, জানে-মালে তাদের খেদমত করা, তাদের সামনে নরমে কথা বলা, নম্র আচরণ করা, কথা বা আচরণে কোনভাবে তারা কষ্ট না পায় এভাবে চলা এবং যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর হুকুমের খেলাফ না হয়, গোনাহের কথা না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের কথা এবং নির্দেশ মেনে চলা-এগুলো হল সন্তানের কর্তব্য। এগুলি মাতা-পিতার হক। শরীআতে একদিকে পিতা-মাতার হকও রয়েছে, অন্য দিকে সন্তানের হকও রয়েছে। শুধু সন্তানই পিতা-মাতার জন্য করবে, পিতা-মাতা সন্তানের জন্য করবে না-এরকম নয়। তাহলে শরীআতের বিধান ব্যালেন্স হারা হয়ে যাবে। উভয় দিকেই বিধান রাখা হয়েছে, উভয় পক্ষেরই করণীয় রয়েছে। সন্তানেরও করণীয় আছে, পিতা-মাতারও করণীয় আছে। সন্তানেরও যেমন করণীয়, পিতা-মাতারও তেমন করণীয়। বরং হাদীছ থেকে বুঝা যায় সন্তানের জন্য পিতা-মাতার করাটা বেশি গুরুত্ব রাখে। কেননা তারা যদি তাদের করণীয় কাজ না করেন, অর্থাৎ, যেভাবে সন্তানকে গড়ে তোলা কর্তব্য, যেভাবে সন্তানকে লালন-পালন করা কর্তব্য সেভাবে না করেন, তাহলে সন্তান থেকে তাদের যা পাওয়ার তারা তা পাবেন না। অর্থাৎ, পিতা-মাতা করলে সন্তান করবে, নতুবা সন্তান করবে না। অতএব পিতা-মাতার করাটাই হল বুনিয়াদী বিষয়।

একবার হযরত ওমর (রা.)-এর কাছে একজন লোক আসলেন। হযরত ওমর (রা.) তখন খলীফা ছিলেন। সেই লোকটা তার ছেলেকে নিয়ে খলীফার দরবারে এসে বললেন হে খলীফা! আমার এই সন্তান আমার কথা মানে না, আমার অধিকার আদায় করে না। হযরত ওমর (রা.) ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করলেন- তোমার পিতার অভিযোগ সত্য কি? ছেলেটা উল্টো প্রশ্ন করল যে, হে খলীফা! পিতা-মাতার জন্য সন্তানের যেমন কর্তব্য আছে, সন্তানের জন্যেও কি পিতা-মাতার কোন কর্তব্য আছে? হযরত ওমর (রা.) বললেন, 'হ্যাঁ আছে'। তখন হযরত ওমর (রা.) তিনটা কর্তব্যের কথা উল্লেখ করলেন। এক নং কর্তব্য পিতা- একটা ভাল মায়ের ব্যবস্থা করবে। এটা বললেন এজন্য যে, ভাল মায়ের গর্ভে ভাল সন্তান হয়। তাই ভাল সন্তান চাইলে তার জন্য একটা ভাল মায়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

দুনিয়াতে অভিজ্ঞতায়ও দেখা গেছে অধিকাংশ বুযুর্গ এবং অলি আউলিয়াদের বংশ ভাল এবং তারা ভাল মায়ের সন্তান। এই হযরত ওমর (রা.)-এর জীবনেও এরকম ঘটনা ঘটেছে। যখন তিনি খলীফা ছিলেন, তাঁর নিয়মিত অভ্যাস ছিল তিনি রাতের বেলায় বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ঘুরে দেখতেন মানুষের কী অবস্থা। রাতের অন্ধকারে নির্জন মুহূর্তে মানুষের আসল চরিত্র ফুটে ওঠে। মানুষের প্রকৃত অবস্থা এবং পারিবারিক আসল অবস্থা, মনের আসল কথা এই সময়ে জানা যায়। তাই তিনি মানুষের দ্বীনী,

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

ঈমানী এবং জাগতিক আসল অবস্থা জানার জন্য রাতের বেলায় বিভিন্ন এলাকা ঘুরে ঘুরে দেখতেন। একবার এক ভোর রাতে তাহাজ্জুদের পরে তিনি বের হয়েছেন। একটা বাড়ির কাছে যেয়ে শুনছেন এক মা তার মেয়েকে ডেকে বলছেন যে ওঠো, তাড়াতাড়ি ওঠো, ভোর হয়ে গেছে, দুধ দহন করতে হবে, দুধ বিক্রি করতে হবে, তারপর খাবার জোগাড় করতে হবে, তাড়াতাড়ি ওঠো! আমাদের টাকা পয়সার প্রয়োজন অনেক, তাই দুধের মধ্যে একটু পানি মিশ্রিত করে দিতে হবে, তাহলে পয়সা বেশি আসবে। তখন মেয়ে বলছে মা, খলীফা ওমরের তো ঘোষণা যে, দুধের ভিতরে কেউ পানি মিশাতে পারবে না, মিশালে তাকে শাস্তি দেয়া হবে। মা বলল এখন রাতের অন্ধকার, খলীফা তো জানতেই পারবেন না। আমরা দুধে পানি মিশ্রিত করলাম কি-না। মেয়ে বলল খলীফা না জানলেও আল্লাহ তা'আলা জানবেন। খলীফার শাস্তি থেকে বাঁচলেও আল্লাহর শাস্তি থেকে বাঁচা যাবে না। হযরত ওমর (রা.) নীরবে দাঁড়িয়ে সব কথা শুনলেন। পরের দিন তিনি ঐ মেয়েকে দরবারে ডেকে আনলেন। ডেকে এনে দরবারীদের সামনে নিজের ছেলের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে দিলেন। পরবর্তীতে এই মেয়ের বংশে ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (রহ.)-এর জন্ম হয়েছে, যাকে ওমরে ছানী বা ২য় ওমর বলা হয়। তিনি সাহাবী ছিলেন না কিন্তু সম্পূর্ণ সাহাবীর চরিত্রে উত্তীর্ণ ছিলেন। যার জীবনের কোন একটা আচরণ সম্পর্কে কেউ কোন দিন সমালোচনা করতে পারেনি। এমন মহান ব্যক্তিত্ব ঐই মেয়ের গর্ভে জন্ম নেন। তাই বলা হচ্ছিল ভাল সন্তান চাইলে, ভাল মায়ের ব্যবস্থা করতে হয়। দেখা গেল আমি ভাল সন্তান চাইলে সন্তানের জন্মের আগ থেকে আমাকে তার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। মায়ের চিন্তা-চেতনা, মায়ের স্বভাব-চরিত্র সবকিছুর প্রভাব পড়ে সন্তানের মধ্যে। যেমন মা হবে, তেমন সন্তান হবে। মা যেরকম চিন্তা-ভাবনা করে, সানের ভিতরে ওরকম চিন্তা-চেতনা আসে।

হযরত থানভী (রহ.) একটা বাস্তব ঘটনা বয়ান করেছেন, এক নতুন দম্পতি অর্থাৎ, স্বামী-স্ত্রী দুইজনে স্থির করল যে, আমরা একটা ভাল সন্তান চাই। তাই এখন থেকে আমরা কোন খারাপ কাজ করব না, কোন খারাপ চিন্তা করব না, খারাপ কিছু মনে স্থান দিব না। যাতে আমরা একটা ভাল সন্তান লাভ করতে পারি। সিদ্ধান্ত মোতাবেক তারা জীবন চালাতে থাকল। এক সময় তাদের একটা ছেলে সন্তান হল। ছেলেটা কিছু বড় হয়েছে। ছেলেকে সাথে নিয়ে পিতা একদিন কোথাও যাচ্ছিলেন। যাওয়ার পথে রাস্তার পাশে ছিল একটা বরই গাছ। ছেলেটা ঐ গাছ থেকে একটা বরই ছিড়ে খেল। তখন পিতা চিন্তা করলেন, এতো পরের মাল চুরি করে খাওয়া। এই চুরির মনোবৃত্তি তার ভিতরে কোত্থেকে আসল! ঘরে ফিরে বিবিকে জিজ্ঞাসা করলেন- সত্য কথা বল! সন্তান গর্ভে থাকা অবস্থায় তোমার ভিতরে এরকম চুরির চিন্তা এসেছিল কি-না? বিবি বলল হ্যাঁ সন্তান গর্ভে ছিল, এ সময় আমাদের পাশের বাড়ির বরই গাছ থেকে মালিকের অগোচরে একটা বরই ছিড়ে খেয়েছিলাম। এ কারণেই হয়তো সন্তানের ভিতরে এর প্রভাব পড়েছে।

মানুষের মন-মানসিকতা গঠনের পিছনে অনেক কিছু দায়ী, অনেক কিছু উৎস আছে। তার ভিতরে মাতা-পিতার চিন্তা-চেতনাও একটা। মাতা-পিতার চিন্তা-চেতনা এবং মন-মানসিকতা যেমন, তাদের সন্তানও তেমন গড়ে ওঠে। চিন্তা-চেতনা এবং মন-মানসিকতা গঠনের পেছনে মানুষের খাদ্য পানিয়েরও আছর আছে। এ জন্য নিজের যেমন হালাল মাল খাওয়া কর্তব্য, সন্তানকেও হালাল মাল দ্বারা লালন-পালন করা কর্তব্য।

সন্তানকে লালন-পালন করা যে ফরয, এই ফরয আদায় হবে না যদি সন্তানকে হালাল মাল দ্বারা লালন-পালন করা না হয়। কারণ হালাল মাল দ্বারা লালন-পালন করলে সন্তানের ভিতরে ভাল চেতনা

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com



সৃষ্টি হবে। নতুবা তার ভিতরে গোনাহের চেতনা সৃষ্টি হবে। হারাম মালের আছর খারাব হয়। শরীআতে যত খাদ্য খাবারকে হারাম করা হয়েছে, তা হারাম করার একটা প্রধান কারণ হল তার ভিতরে খারাপ প্রভাব রয়েছে। শুকর, কুকুর খাওয়াকে হারাম করা হয়েছে। কারণ তাদের ভিতরে চারিত্রিক খারাবী রয়েছে। তাদের ভিতরে বেহায়ায়ী এবং নির্লজ্জতা রয়েছে। যারা এগুলো খায় তারাও এরকম নির্লজ্জ হয়ে যায়। পশ্চিমা বিশ্বের যারা শুকর খায়, তারা এমন নির্লজ্জ হয়ে যায় যে, মানুষের সামনে রাস্তায়, পার্কে শুকর, কুকুরের মত নির্লজ্জভাবে যৌন কর্মে লিপ্ত হয়। তারা এরকম নির্লজ্জ কেন হয়? কারণ নির্লজ্জ হওয়ার মত খাদ্য-খাবার তারা গ্রহণ করে। এছাড়াও আরও অনেক কারণ রয়েছে।

যাহোক মানুষের চিন্তা-চেতনা এবং মন-মানসিকতা গঠনের পেছনে খাদ্যের বিরাট প্রভাব আছে। হযরত মাওলানা ইয়াকূব নানুতুবী (রহ.) যিনি এক সময় দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি একবার এক দাওয়াতে গিয়েছিলেন। কয়েক লোকমা খাওয়ার পরেই তাঁর মনে সাড়া জাগে যে, খাদ্যটা বোধ হয় হালাল নয়। আল্লাহর পক্ষ থেকে বুযুর্গানে দ্বীনের অন্তরে এরকম অনুভূতি জাগ্রত হয়ে থাকে। তিনি মেজবানকে অর্থাৎ, ঘর ওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি এই খাদ্য-খাবার কীভাবে সংগ্রহ করেছেন? খবর নিয়ে জানতে পারলেন, এই খাবার হালাল উৎস থেকে আসেনি। ইয়াকূব নানুতুবী (রহ.) তখন খাবার বন্ধ করে দিলেন, আর এক লোকমাও গ্রহণ করলেন না। ইয়াকূব নানুতুবী নিজে বয়ান করেছেন, এরপর ঐ যে এক দুই লোকমা খেয়েছি, তার কারণে দুই মাস পর্যন্ত মনের মধ্যে গোনাহের চেতনা জাগ্রত হতে থাকত এবং মনের ভিতর গোনাহের অন্ধকার অনুভব হত।

যখন গোনাহের চেতনা ভিতরে আসে তখন বুযুর্গানে দ্বীন টের পান যে, ভিতরে অন্ধকার, তাদের অস্বস্তি বোধ হতে থাকে। হাদীছেও এসেছে মানুষ যখন গোনাহ করে গোনাহের কারণে একটা কালো দাগ পড়তে থাকে। এভাবে গোনাহ করতে করতে, কালো দাগ পড়তে পড়তে এক সময় কলব সম্পূর্ণ অন্ধকার হয়ে যায়, বুযুর্গানে দ্বীন ঐ অন্ধকার টের পান। ঐ অন্ধকারের কারণে তারা অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন। আমরা ঐ অন্ধকার টের পাই না। কারণ আমরা সবসময় থাকিই অন্ধকারের ভিতরে, আলোর ভিতরে থাকিই না, তাই অন্ধকারের কষ্ট বোধ করি না। যারা সবসময় আলোর ভিতরে থাকেন, অন্ধকারে তাদের কষ্ট বোধ হয়। যেমন শহরের মানুষ সবসময় বিদ্যুতের আলোর মধ্যে থাকে, সবসময় আলো ঝল-মলে পরিবেশের মধ্যে থাকে। এ কারণে একটু সময়ের জন্যেও বিদ্যুৎ চলে গেলে অন্ধকারে তাদের দারুণ অস্বস্তি বোধ হয়। কিন্তু যে সব গ্রামের মানুষ কোন দিন বিদ্যুতের মুখ দেখেনি, তারা সবসময়-ই অন্ধকারে থাকতে অভ্যস্ত, অন্ধকারে থাকা তাদের কাছে কোনই কষ্টকর লাগে না। একটা চেরাগ জ্বালালেই তাদের কাছে মনে হয় অনেক আলোকিত। অন্ধকারে তারা কোন অস্বস্তি বোধ করে না। কারণ অন্ধকারের মধ্যেই তারা সবসময় থাকে। এভাবেই গোনাহ করলে কলবে যে অন্ধকার সৃষ্টি হয়, বুযুর্গানে দ্বীন সেই অন্ধকারে খুব অস্বস্তি বোধ করেন। কারণ তারা ঐ অন্ধকারে থাকতে অভ্যস্ত নন। তারা সবসময় অন্তরকে পরিষ্কার রাখেন, আলো ঝলমলে রাখেন।

যাহোক যে কথা বলা হচ্ছিল মন-মানসিকতা গঠনের ক্ষেত্রে খাদ্য খাবারেরও প্রভাব রয়েছে। সন্তানের মন-মানসিকতা গঠনের ক্ষেত্রে মাতা-পিতার মন-মানসিকতারও প্রভাব থাকে। তাই ভাল সন্তান চাইলে দ্বীনদার মেয়েকে বিবাহ করতে হবে। ভাল মন-মানসিকতা এবং ভাল চিন্তা-চেতনা সম্পন্ন মেয়েকে বিবাহ করতে হবে। এর গুরুত্ব শরীআতে অনেক। হাদীছে তাই বিবাহ করার সময় মেয়ের দ্বীনদারীর দিকটাকে প্রাধান্য দিতে বলা হয়েছে। হাদীছে বলা হয়েছে মানুষ বিবাহ করে চারটা জিনিস দেখে। মেয়ের রূপ সৌন্দর্য দেখে, তার বংশ দেখে, তার ধন-সম্পদ দেখে ও দ্বীনদারী দেখে। তবে

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

দ্বীনদারীর বিষয়টাকে তোমরা প্রাধান্য দিবে। আমরা যদি এই দিকটাকে প্রাধান্য দিতাম, তাহলে সমাজের মেয়েরাও দ্বীনদার হত। পিতা-মাতাও মেয়েকে দ্বীনদার বানানোর চেষ্টা করত। তারা ভাবত মেয়েকে দ্বীনদার বানালে ভাল ঘরে যেতে পারবে। এখন আমরা যেরকম মেয়ে সন্ধান করি, সমাজের পিতা-মাতারাও তাদের মেয়েদেরকে সেরকম বানায়। এখন পিতা-মাতারা মেয়েদেরকে গান শিখান, স্মার্ট বানান, বে-পর্দা বানান, কারণ আমরা তো ওরকমই চাই। সমাজ যেরকম চায় সমাজের পিতা-মাতারা তাদের মেয়েদেরকে সেরকমই গড়ে তোলেন।

যাহোক হযরত ওমর (রা.) এক নম্বরে বললেন সন্তানের একটা হক হল তার ভাল মায়ের ব্যবস্থা করতে হবে। দ্বিতীয় নম্বর হকের কথা বললেন– সন্তানের ভাল নাম রাখতে হবে। ভাল নামেরও ভাল প্রভাব হয়ে থাকে। এজন্যেই ইসলাম ভাল অর্থপূর্ণ নাম রাখতে বলেছে। ভাল নামের ভাল আছর হয়, খারাপ নামের খারাপ আছর হয়। রাসূল (সা.)-এর কাছে এমন কেউ যদি আসতেন যার নামের অর্থ খারাপ, তিনি তার ঐ নাম পরিবর্তন করে একটা ভাল অর্থপূর্ণ নাম রেখে দিতেন। হযরত থানভী (রহ.) বয়ান করেছেন যে, একটা ছেলের নাম ছিল কালীমুল্লাহ। তার পিতা আমার কাছে এসে বলল যে, হুজুর! আমার ছেলেটা প্রায়ই অসুস্থ থাকে। আমি তার নাম পরিবর্তন করে সালীমুল্লাহ রেখে দিলাম। কালীম শব্দের অর্থ হল আহত, এই শব্দের ভিতরে অসুস্থতার ইংগিত আছে। আর সালীম শব্দের অর্থ নিরাপদ, সুস্থ। হযরত থানভী (রহ.) বলেন সালীমুল্লাহ নাম রাখার কিছু দিন পরেই ছেলেটা সুস্থ হয়ে গেল। নামের এরকম আছর হয়ে থাকে।

নামের আছর হওয়ার আর একটা ঘটনা শুনুন! ঘটনাটি শী'আদের– শী'আরা হযরত আলী (রা.)-এর অতি ভক্ত। তারা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) এবং হযরত ওমর ফারুক (রা.)-এর প্রতি চরম বিদ্বেষী। কারণ তারা মনে করে প্রথম খলীফা হওয়ার যোগ্য ছিলেন হযরত আলী (রা.)। যেহেতু তিনি রাসূলের পরিবারের, রাসূলের বংশের মানুষ। কাজেই খলীফা হবেন তিনি। আবূ বকর, ওমর (নাউযু বিল্লাহি মিন যালিক) যুলুম করে তার খেলাফতের হক ছিনিয়ে নিয়েছে। এজন্য তারা আবূ বকর, ওমরের প্রতি চরম খেপা। এবার মূল ঘটনা শুনুন। এক শী'আর দুটো গাধা ছিল। সে তার একটা গাধার নাম রাখল আবু বকর, আর একটা গাধার নাম রাখল ওমর। ঘটনাক্রমে ঐ দুটো গাধার একটা ঐ মালিক শী'আকে এমন জোরে লাথি দিল যে, এক লাথিতেই শেষ। পরে অনুসন্ধান করে জানা গেল ওটা ছিল ঐ গাধা যার নাম রাখা হয়েছিল ওমর। সম্ভবত ওমর নামের কারণে তার ভিতরে ওমরী মেজাযের আছর পড়ে থাকবে। যাহোক নামের দ্বারা আছর হয়ে থাকে। তাই সন্তানের ভাল নাম রাখতে বলা হয়েছে।

আমাদের সমাজে একটা বড় দোষ রয়েছে। তা হল আমরা অনেকেই তো ভাল নাম রাখি না, ইংরেজী নাম রাখি, বাংলা নাম রাখি, বা ইংরেজী, বাংলা, আরবী, ফার্সী মিলিয়ে জগা খিচুড়ি স্টাইলের নাম রাখি। যারা একটু ভাল নাম রাখি, তারাও সেই ভাল নাম শিকায় তুলে রাখি। ভাল নাম কাগজে কলমে রেখে একটা বাজে ডাক নাম দিয়ে তাকে ডাকতে থাকি। এমন করলে ভাল নাম রাখার ফায়দা পাওয়া যাবে না। ভাল নাম রাখার ফায়দা তখনই পাওয়া যাবে যদি সেই নামে তাকে ডাকা হয়। যাহোক শরীআতে ভাল নাম রাখতে বলা হয়েছে। এটা সন্তানের একটা অধিকার।

এরপর তৃতীয় নম্বরে হযরত ওমর (রা.) বললেন, 'সন্তানের আর একটা অধিকার হল– পিতা-মাতা তাকে কুরআন কিতাব শিক্ষা দিবে। কুরআন কিতাব বলতে কুরআন শরীফ পড়া শিখানো, এটা তো আছেই। এছাড়াও জন্মের শুরু থেকেই যেন তার ভিতরে দ্বীন-ইসলামের চেতনা আসে এ ধরনের কথাবার্তা শিখাতে হবে। দ্বীনের কথা শিখাতে হবে, আল্লাহ, আল্লাহর রাসূলের কথা শিখাতে হবে।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com



সন্তানকে সর্বপ্রথম যে কথা শিখানো উত্তম তা হল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এভাবে জীবনের শুরুতে তার ভিতরে আল্লাহ, আল্লাহর রাসূলের কথা ঢুকিয়ে দেয়া হবে। জন্মের শুরু থেকেই যেন তার মধ্যে আল্লাহ, আল্লাহর রাসূলের কথা এবং দ্বীনের জরুরী ইবাদতের কথা তার ভিতরে প্রবেশ করে, এজন্য যখন কোন সন্তান জন্ম গ্রহণ করবে, সাথে সাথে তার ডান কানে আযানের শব্দগুলো এবং বাম কানে ইকামতের শব্দগুলো শোনানো সুন্নাত রাখা হয়েছে। এখন যদিও সে বুঝে না কিন্তু তার মনের মধ্যে এই কথাগুলোর আছর পড়বে। সে বুঝুক আর না বুঝুক আছর হবেই। এজন্য সুন্নাত রাখা হয়েছে ছেলে হোক মেয়ে হোক, সবার ডান কানে আযানের শব্দগুলো এবং বাম কানে ইকামতের শব্দগুলো শুনাতে হবে। সন্তানের শিশু বয়স থেকেই পদে পদে আল্লাহ, আল্লাহর রাসূলের কথা তাদেরকে শিখাতে হবে। ছোট বয়সে যে কথাগুলো, যে চেতনাগুলো তার ভিতরে ঢুকবে, সেটা পাথরে অংকন হওয়ার মত স্থায়ী হয়ে থাকবে। হযরত হাসান বসরী (রহ.) বলেছেন,

اَلْعِلْمُ فِي الصِّغَرِ كَالنَّقْشِ فِى الْحَجَرِ. (المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي)

অর্থাৎ, ছোট বয়সে ইলম শিখা পাথরের অংকনের মত।

অর্থাৎ, ছোট বয়সে কোন কথা শিখলে পাথরের দাগের মত সেটা স্থায়ী হয়ে থাকবে। এজন্যই ছোট বাচ্ছাদেরকে অল্প বয়স থেকেই সাধ্যমত দ্বীন শিখানো কর্তব্য। হযরত ওমর (রা.) তাই বললেন এটা সন্তানের হক। তিনি মোট তিনটা হকের কথা বললেন। তখন ঐ ছেলেটা বলল, 'মহামান্য খলীফা! আপনি সন্তানের তিনটা হকের কথা বলেছেন– ভাল মায়ের ব্যবস্থা করা, ভাল নাম রাখা আর কুরআন কিতাব শিক্ষা দেয়া। তাহলে শুনুন আমার মা হল সিন্ধুর এক বান্দী, পিতা আমার নাম রেখেছেন হাফ্‌ল, হাফ্‌ল শব্দের অর্থ হল চামচিকা। আর আমাকে মোটেও কুরআন শিক্ষা দেননি, সম্ভবত তার পিতা অর্থ না বুঝেই হাফ্‌ল নাম রেখেছিল। আমরাও তো কত শব্দ না বুঝে নাম রাখি। হযরত ওমর (রা.) ছেলেটির কথা শুনে তার পিতাকে ধমক দিয়ে দরবার থেকে বের করে দিলেন যে, তুমি বলছ সান্তান তোমার অধিকার আদায় করে না, তুমিই তো সন্তানের অধিকার আদায় করনি। তুমি যদি সন্তানের অধিকার আদায় করতে, তাহলে তোমার সন্তানও তোমার অধিকার আদায় করত। এ থেকে বুঝা যায় সন্তানের হক আদায় করা হল বুনিয়াদী বিষয়। আমি যদি সন্তানের অধিকার আদায় করি, তাহলে সন্তান আটোমেটিক এমনভাবে গড়ে উঠবে যে, সে আমার আনুগত্য করবে, আমার খেদমত করবে। শরীআত যেভাবে সন্তানকে গড়ে তুলতে বলেছে, সেভাবে যদি আমরা সন্তানকে গড়ে তুলি, তাহলে আশা করা যায় সন্তান আমাদের অবাধ্য হবে না। আমরা সন্তানের জন্য করলে সন্তানও আমাদের জন্য করবে। মাতা-পিতাদের এ কথাটা মনে রাখতে হবে, আর সন্তানদেরও মনে রাখতে হবে তারা যদি পিতা-মাতার জন্য না করে, তাহলে তাদের সন্তানও তাদের জন্য করবে না। একটার সাথে আর একটা সম্পর্কিত। একটা থেকে আরেকটা বিচ্ছিন্ন নয়।

এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে। সন্তানের জন্য আমরা যা করব, তা সন্তান থেকে পাওয়ার আশায় নয়' বরং আমরা সন্তানের জন্য করব আমাদের দায়িত্ব হিসেবে। সন্তানকে দ্বীনদার বানানো, ইসলামী তরীকায় গড়ে তোলা পিতা-মাতার উপর ফরয। এটা কোন হালকা বিষয় নয়, এটা ফরয পর্যায়ের দায়িত্ব। হাদীছে ইরশাদ হয়েছে,

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. (صحيح البخاري ٨٩٣ وصحيح مسلم ٤٨٢٨)

অর্থাৎ, তোমাদের প্রত্যেকেই যিম্মাদার, প্রত্যেককেই তার অধীনস্তদের সম্পর্কে জবাবদিহী করতে হবে।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

সন্তান পিতা-মাতার অধীনস্ত, তাই সন্তান সম্পর্কে পিতা-মাতাকে জবাবদিহী করতে হবে। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত সম্পর্কে যেমন জবাবদিহী করতে হবে, সন্তানকে আমি সহীহ তরীকায় লালন-পালন করেছি কি–না, এজন্যও জবাবদিহী করতে হবে। কাজেই সন্তান লালন-পালন করতে হবে দায়িত্ব পালনের অনুভূতি নিয়ে। যদি এই দায়িত্ব পালনে আমাদের ত্রুটি হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেই। আর যদি আমার তেমন কোন ত্রুটি না থাকে, তারপরও আমার সন্তান অবাধ্য হয়ে যায়, তাহলে বুঝতে হবে এটা পরীক্ষা স্বরূপ হচ্ছে বা গোনাহ মাফ হওয়ার জন্য হচ্ছে। আল্লাহর নবী হযরত নূহ (আ.)-এর সন্তানও পিতাকে মানেনি। শেষ পর্যন্ত কাফেরদের সাথে পানিতে ডুবে মরেছে, তবুও পিতার কথা মানেনি। এটা নবীর মর্যাদাকে বুলন্দ করার জন্যই ছিল। নতুবা আল্লাহর নবী সন্তানকে ভাল বানানোর চেষ্টায় ত্রুটি করেছেন তা তো হতে পারে না। হযরত নূহ (আ.)-এর এই ঘটনা থেকে এটাও শিক্ষণীয় যে, আমরা সন্তানকে ভাল বানানোর চেষ্টা করব, কিন্তু চূড়ান্তভাবে আল্লাহর ফয়সালা যা তা-ই হবে। আমরা চেষ্টা করলেই হয়ে যাবে তা জরুরী না। আল্লাহর নবীর চেষ্টা সত্ত্বেও যখন হয়নি তখন আমাদের চেষ্টায় হয়ে যাবে তা চিন্তা করা ভুল। তবে আমাদের চেষ্টা করতে থাকা কর্তব্য। তাই আমরণ চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। আর আল্লাহর কাছে দু'আ করতে হবে। আল্লাহ্ই ফয়সালার মালিক।

সন্তানকে দ্বীনদার বানানোর জন্য দিলের মধ্যে ছটফটানী থাকতে হবে। সন্তান আগুনে পুড়ে যেতে থাকলে তা থেকে বাঁচানোর জন্য যেমন ছটফটানী আসে, তারচেয়ে বেশি ছটফটানী আসতে হবে। কারণ দুনিয়ার আগুনের চেয়ে জাহান্নামের আগুন অনেক অনেক বেশি ভয়াবহ। সন্তানকে দ্বীনদার বানাতে না পারলে তারা সেই আগুনে দগ্ধ হবে। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا. (তাহরীমঃ ৬)

অর্থাৎ, হে মু'মিনরা! তোমরা নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবারকে আগুন থেকে বাঁচাও।

এ আয়াতে আল্লাহ পাক আগুন থেকে বাঁচাও কথাটা বলে এরকম একটা চেতনা জাগ্রত করে দিতে চান যে, তোমাদের সন্তানাদি আগুনের দিকে দৌড়াচ্ছে, আগুনে পুড়ে তোমাদের চোখের সামনে দগ্ধ হতে থাকবে। এরকম মুহূর্তে সন্তানকে বাঁচানোর জন্য ভিতরে যেমন তড়পানির সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক, জাহান্নামের আগুন থেকে সন্তানকে বাঁচানোর জন্য যেন ঐরকম তড়পানি সৃষ্টি হয়। এরকম মনোভাব নিয়ে সন্তানকে দ্বীনের দিকে আনার চেষ্টা করতে হবে। এই পর্যায়ের চেষ্টা যখন আসবে, এরকম চেতনা তড়পানি যখন আসবে, তখন ইনশাআল্লাহ আমাদের সন্তান ভাল হবে। যদি ভাল নাও হয় আমাদের চেষ্টা আমরা করে যাব। আল্লাহ পাক আমাদেরকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিবেন, আল্লাহর কাছে আমরা নাজাত পেয়ে যাব। আমাদের নাজাতের জন্যই সন্তানের নাজাতের ফিকির করতে হবে। আমি শুধু আমার নাজাতের ফিকির করব তা নয়, আমি নিজের নাজাতের ফিকিরও করব, অন্যদের নাজাতের ফিকিরও করব। যে যত বেশি কাছের তার প্রতি আমার দায়িত্ব বেশি, তার নাজাতের ফিকিরও আমাকে বেশি করতে হবে।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে সহীহ সমঝ দান করুন। আমাদের সন্তানদেরকে নেককার পরহেযগার হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন!

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



## বয়ান নং ২০-এর খুতবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا، وَهَدَانَا بِهٖ صِرَاطًا سَوِيًّا، اَحْمَدُهٗ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا وَاِنَّهٗ كَانَ بِنَا حَفِيًّا، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ شَهَادَةً جَلِيًّا وَّخَفِيًّا، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهُ الَّذِىْ هَدَانَا اِلٰى تَرْبِيَةِ الْغُلَامِ لِيَكُوْنَ رَضِيًّا وَّزَكِيًّا، وَلَا يَكُوْنَ شَقِيًّا وَّعَصِيًّا، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ بُكْرَةً وَّعَشِيًّا.

اَمَّا بَعْدُ :

اَيُّهَا النَّاسُ! عَلَى الْاٰبَاءِ وَالْاُمَّهَاتِ اَنْ يُّحْسِنُوْا تَرْبِيَةَ اَوْلَادِهِمْ، وَيُحَافِظُوْا عَلٰى مَا فِيْهِ صَلَاحُهُمْ دُوْنَ فَسَادِهِمْ، وَيُمَرِّنُوْهُمْ عَلٰى اِصْلَاحِ اَمْرِ مَعَاشِهِمْ وَمَعَادِهِمْ، فَاِنَّ الْاَوْلَادَ رَعِيَّةُ اَبَوَيْهِ، وَكُلُّ النَّاسِ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ. اَخْرَجَ الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ ، فَالْاِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِىْ اَهْلِهٖ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ، وَالْمَرْاَةُ رَاعِيَةٌ فِىْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِىَ مَسْئُوْلَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِىْ مَالِ اَبِيْهِ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ.

اَيُّهَا النَّاسُ! وَاِنَّ مِنْ اَهَمِّ حُقُوْقِ الْاَوْلَادِ ثَلَاثَةٌ، اَنْ يَّسْتَنْجِبُوْا اُمَّهَاتِهِمْ، وَاَنْ يُّحْسِنُوْا اَسْمَائَهُمْ، وَاَنْ يُّعَلِّمُوْهُمْ كِتَابَ اللّٰهِ. فَعَلِّمُوا الْاَوْلَادَ كِتَابَ اللّٰهِ، وَاحْمِلُوْهُمْ عَلٰى اَدَاءِ فَرَائِضِ اللّٰهِ، وَكُفُّوْهُمْ عَنِ الْمُخَالَفَاتِ وَالْمَفَاسِدِ، وَاسْلُكُوْا اَحْسَنَ الْوَسَائِلِ وَالْمَقَاصِدِ، وَزَوِّجُوْهُمْ عِنْدَ بُلُوْغِهِمْ

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

وَاِدْرَاكِهِمْ خَوْفًا اَنْ يَّقَعُوْا شَقَائَهُمْ وَهَلَاكَهُمْ. اَخْرَجَ الْاِمَامُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مُرُوْا اَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ اَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ، وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ اَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِعِ.

اَيُّهَا النَّاسُ! وَمِنْ تَعَالِيْمِ الْقُرْاٰنِ تَعْلِيْمُهُمُ الْفَرَائِضَ وَالسُّنَنَ، وَاهْتَمُّوْا بِتَعْلِيْمِهَا فِى الصِّغَرِ، لِاَنَّ الْعِلْمَ فِى الصِّغَرِ كَالنَّقْشِ فِى الْحَجَرِ. وَمَنْ لَمْ يَهْتَمَّ بِذَالِكَ فِى الصِّغَرِ، يَثْقُلُ عَلَيْهِمْ ذَالِكَ فِى الْكِبَرِ. وَاهْتَمُّوْا بِتَادِيْبِ الْاَوْلَادِ، فَاِنَّ اَحْسَنَ النِّحْلَةِ اِلَى الْاَوْلَادِ التَّادِيْبُ الْحَسَنُ.

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ : يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، عَلَيْهَا مَلٰئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ.

بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ، وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. اَقُوْلُ قَوْلِىْ هٰذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ لِىْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَاسْتَغْفِرُوْهُ، اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



বয়ান নং -২১

## সন্তানের জন্য পিতা-মাতার করণীয় (২য় পর্ব)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: اِنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَ اَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدَهٗ مِنْ نُحْلٍ اَفْضَلَ مِنْ اَدَبٍ حَسَنٍ.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

সন্তানের জন্য পিতা-মাতার কী করণীয়, এ সম্পর্কে গত জুমুআয় কিছু কথা আলোচনা করা হয়েছিল। পিতা-মাতার জন্য সন্তানের যেমন করণীয়, সন্তানের জন্যেও পিতা-মাতার তেমন করণীয় রয়েছে, বরং বেশি করণীয় রয়েছে। আমি সন্তানের জন্য না করলে, সন্তান আমার জন্য করবে না। আমি সন্তানের জন্য করলে, সন্তান আমার জন্য করবে-এটাই হল নিয়ম। সন্তান থেকে পেতে হলে সন্তানের জন্য আমাকে করতে হবে। এমনিভাবে আমার সন্তান থেকে আমি পেতে চাইলে আমার পিতা-মাতার জন্য আমাকে করতে হবে। আমি পিতা-মাতার জন্য যদি করি, তাহলে আমার সন্তান আমার জন্য করবে। আমার পিতা-মাতার সাথে আমি যেমন করব, আমার সন্তান আমার জন্য তেমন করবে। হযরত ছাবেত বুনানী (রহ.) একজন বড় বুযুর্গ ছিলেন। তিনি একটা ঘটনা বয়ান করেছেন। একটা ছেলে তার পিতাকে মারছিল। ঐ স্থানে উপস্থিত লোকজন ছেলেটাকে তিরস্কার করে বলছিল, পিতার গায়ে হাত তুলছ কেন? তখন ঐ পিতা বললেন-তোমরা ওকে কিছু বল না। আমি এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমার পিতার গায়ে হাত তুলেছিলাম, তাই আল্লাহ পাক আমাকে তার শাস্তি দিচ্ছেন, আমার সন্তানও এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমার গায়ে হাত তুলছে। কাজেই ওকে তিরস্কার কর না, এটা আমার কাজের প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে। বুঝা গেল আমরা আমাদের পিতা-মাতার সাথে দুর্ব্যবহার করলে আমাদের সন্তানও আমাদের সাথে দুর্ব্যবহার করবে। আবার সন্তানকে ঠিকমত না গড়লেও তারা আমাদের সাথে দুর্ব্যবহার করবে। তাদেরকে মানুষ বানালে তারা আমাদের সাথে মানুষের মত আচরণ করবে। তাই পিতা-মাতার উপর সন্তানের জন্য করার দায়িত্ব ও গুরুত্ব বেশি।

সন্তানের শারীরিক, মানসিক সব রকম পরিচর্যা করা আমাদের দায়িত্ব। সন্তানের শরীরিক লালন-পালন করা যেমন দায়িত্ব, তাদের মানসিক পরিচর্যাও তেমন দায়িত্ব। শারীরিক লালন-পালন করা দায়িত্ব-এটা আমরা সকলেই বুঝি যে, পিতা-মাতা হলে সন্তানকে লালন-পালন করতে হয়, খাদ্য-খাবার দিতে হয়, যত্ন করতে হয়, আদর সোহাগ করতে হয়, এগুলো আমাদের দায়িত্ব।

এই দায়িত্ব আমরা পালনও করি। কিন্তু এই দায়িত্ব পালন করার তরীকা আমরা বুঝি না। সন্তান লালন-পালন করার নিয়ত কী রাখতে হবে তাও জানি না। সন্তান লালন-পালন করতে হবে এই নিয়তে যে, সন্তানকে লালন-পালন করা আমাদের উপর ওয়াজিব। এর দ্বারা আমরা ওয়াজিব দায়িত্ব পালন করার ছওয়াব পাব। আমাদের নিয়ত সহীহ না থাকার কারণে আমরা ছওয়াব থেকে বঞ্চিত থেকে যাই। আমরা সন্তানদের লালন-পালন করছি, কিন্তু এই লালন-পালন করা দ্বারা আমাদের যিম্মাদারী আদায় হচ্ছে, ফলে আমরা ছওয়াব পাব এই চিন্তা আমাদের থাকছে না। আমরা সন্তানকে

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

আদর-সোহাগ করছি, কিন্তু কেন করছি? এই আদর- সোহাগ করা যে সুন্নাত, এর বিনিময়ে আমরা সুন্নাত পালন করার ছওয়াব পাব, এই নিয়ত আমাদের থাকে না। বাচ্চাদেরকে আদর-সোহাগ করা সুন্নাত। রাসূল (সা.) বাচ্চাদেরকে আদর-সোহাগ করতেন। রাসূল (সা.) বাচ্চাদেরকে কেমন আদর-সোহাগ করতেন তার একটা ঘটনা শুনুন! একবার তিনি মেম্বরে দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছেন। এই সময় তাঁর মেয়ের ঘরের নাতী হযরত হাসান, হুসাইন (রা.) মসজিদের ভিতরে হাজির হয়ে গেল। তারা দুজনে ছুটাছুটি করছিল। রাসূল (সা.) খুতবা রেখে মেম্বর থেকে নেমে তাদেরকে কোলে তুলে নিলেন, বুকের সাথে জড়িয়ে ধরলেন, আর বললেন,

إِنَّ الْوَالِدَ مُبْخِلَةٌ مُجْبِنَةٌ. (سنن ابن ماجة، وفي الزوائد إسناده صحيح)

'অর্থাৎ, নিশ্চয় সন্তান মানুষকে বখীল বানিয়ে দেয়, কাপুরুষ বানিয়ে দেয়।'

অর্থাৎ, এদের চিন্তায় মানুষ সম্পদ ব্যয় করতে চায় না, শুধু সঞ্চয় করে রাখতে চায়। এদের চিন্তায় মানুষ জেহাদে যেতে চায় না, চিন্তা করে যদি মরে যাই, তাহলে এই বাচ্চা-কাচ্চাদের কী হবে? তাই বাচ্চা-কাচ্চা মানুষকে কাপুরুষ বানিয়ে দেয়। রাসূল (সা.) বলেন, 'আল্লাহ সত্যই বলেছেন যে,

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَ أَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ.

অর্থাৎ, এই সম্পদ এবং এই সন্তান হল পরীক্ষা।' (তাগাবুন: ১৫)

যাহোক রাসূল (সা.)-এর আমল থেকে প্রমাণিত হল যে, বাচ্চাদের প্রতি স্নেহ, এবং বাচ্চাদের আদর সোহাগ করা সুন্নাত। রাসূল (সা.) বাচ্চাদেরকে এরকম আদর-সোহাগ করতেন। একবার শিশু হুসাইনকে মসজিদের ভিতরে পিঠের উপরে চড়িয়ে নিজে ঘোড়ার মত হয়ে মসজিদে হেটেছেন। এর চেয়ে আদর-সোহাগের বহিঃপ্রকাশ আর কী হতে পারে? যাহোক বাচ্চাদেরকে আদর-সোহাগ করা সুন্নাত। বাচ্চাদেরকে আদর-সোহাগ করতে হবে সুন্নাতের উপর আমল করার নিয়তে। বাচ্চাদেরকে আদর-সোহাগ করার সহীহ নিয়ত আমরা জানি না। বাচ্চাদেরকে লালন-পালন করার সহীহ তরীকাও আমরা জানি না। বাচ্চাদের লালন-পালন হালাল মাল দ্বারা হওয়া চাই। যদি আমরা হালাল মাল দ্বারা বাচ্চাদের লালন-পালন না করি, বরং হারাম মাল দ্বারা করি, তাহলে আমাদের যিম্মাদারী আদায় হবে না, উল্টো গোনাহ হবে। হারাম মালের দ্বারা তাদেরকে লালন-পালন করলে তাদের ভিতরে খারাপ আছর হবে। তাদের মন-মানসিকতা, তাদের চিন্তা-চেতনা খারাব হয়ে গড়ে উঠবে। গত জুমুআয় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছিল।

তাছাড়া হারাম মাল দ্বারা তাদেরকে লালন-পালন করলে তারা হারামকে হালাল বুঝতে শিখবে। এভাবে তাদের মনে কু-শিক্ষা প্রবেশ করবে, এই কু-শিক্ষার জন্য পিতা-মাতার পাপ হবে। রাসূল (সা.) বাচ্চাদের লালন-পালনের ক্ষেত্রে এ বিষয়টার প্রতিও স্বযত্ন খেয়াল রাখতেন। আমরা বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এ বিষয়টার প্রতি অতটা খেয়াল রাখি না, মনে করি ওরা বাচ্চা মানুষ, নাবুঝ মানুষ, ওরা হালাল হারাম কী বুঝে? আমরা মনে করি ওদের ক্ষেত্রে শরীআত নেই। কিন্তু ওরা নাবুঝ হতে পারে, আমরা ওদের মুরব্বী আমরা নাবুঝ নই। ওদের দায়িত্ব হিসেবে কিছু করণীয় না থাকলেও আমাদের দায়িত্ব হিসেবে অনেক কিছু করণীয় আছে। একটা হাদীছ শুনুন! রাসূল (সা.) রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন। রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে তাঁর কাছে যাকাত, সদকার মাল আসত। তিনি এসব যাকাত-সদকা গরীবদের মাঝে বন্টন করে দিতেন। নিজের জন্য, নিজের পরিবারের জন্য এসব সদকা গ্রহণ করতেন না। রসূল (সা.)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



ছিলেন বনূ হাশেম গোত্রের লোক। আর বনূ হাশেমের জন্য যাকাত, ফিতরা খাওয়া জায়েয ছিল না। কারণ যাকাত ফিতরা হল মালের ময়লা। আল্লাহ তা'আলা নবীকে এবং নবীর পরিবারকে মালের ময়লা থেকে হেফাযত করেছেন। একবার কিছু যাকাতের মাল আসল। তার ভিতরে কিছু খেজুর ছিল। শিশু হাসান (রা.) ঘুরতে ঘুরতে এসে সেখান থেকে একটা খেজুর তুলে মুখে দিল। অমনি রাসূল (সা.) চিৎকার দিয়ে বলে উঠলেন,

كَخْ كَخْ! اِرْمِ بِهَا، اَمَا عَلِمْتَ اِنَّا لَانَاْكُلُ الصَّدَقَةَ. (صحيح مسلم برقم ٢٥٢٢)

আমাদের বাংলা ভাষায় এ কথাটার অর্থ করলে এরকম অর্থ হয়- থুথু থুথু, ফেলে দাও! ফেলে দাও! জান না এটা সদকার মাল? আমরা সদকার মাল খেতে পারি না, ফেলে দাও!

রাসূল (সা.) এতটা লক্ষ্য রেখেছেন। আমরা হলে বলতাম ওতো নাবুঝ, ওর জন্য আবার হালাল-হারাম কী? আমাদের এই ধারণা ভুল। বাচ্চা থাকতেই, ছোট থাকতেই ওদের মন-মানসিকতা সঠিকভাবে গড়ে তুলতে হবে। আমরা যদি বাচ্চাদের মন-মানসিকতা এরকম গড়ে তুলি, পদে পদে তাদেরকে টোকা দেই যে, এটা করা যাবে না, এটা করা নিষেধ, তাহলে শিশু বয়সেই তাদের মনে ভাল-মন্দের চেতনা বদ্ধমূল হতে থাকবে। শিশু বয়সেই তাদেরকে শেখাতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে তারা ঠিক হয়ে যায়। শিশুদের শেখাতে হবে এখনকার জন্য নয়, ভবিষ্যতের জন্য। রাসূল (সা.) বাচ্চাদেরকেও পদে পদে এভাবে শেখাতেন। বাচ্চাদেরকে শেখানোর আর একটা ঘটনা শুনুন! রাসূল (সা.)-এর একজন স্ত্রী ছিলেন উম্মে সালামা। উম্মে সালামার আগে আরেক ঘরে বিবাহ ছিল। যখন রাসূল (সা.)-এর সাথে বিবাহ হয়, তখন আগের ঘরের একটা বাচ্চা ছিল। তার নাম ছিল উমার ইবনে আবী সালামা। এই আমর ইবনে আবী সালামা (রা.) বয়ান করেছেন যে, আমি তখন ছোট, একদিন সবাই খেতে বসেছি, তখন অভ্যাস ছিল পরিবারের সকলে এক সঙ্গে বড় বর্তনে বসে খেতেন। হযরত উমার ইবনে আবী সালামা বলেন আমরা এরকম একটা বর্তনে খাচ্ছিলাম। আমি আমার সামনে থেকে নয় বরং বড় বর্তন ছিল এদিক সেদিক থেকে নিচ্ছিলাম। আমার হাত এদিক ওদিক ঘুরছিল। তখন রাসূল (সা.) বললেন,

يَا غُلَامُ! سَمِّ اللّٰهَ، وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ. (صحيح البخاري ٥٣٧٦ وصحيح مسلم ٥٣٨٨)

অর্থাৎ, হে বাচ্চা, শোন! সব সময় নিজের সামনের থেকে খাবে।

অন্যের সামনে থেকে নিবে না, এতে লোভ প্রকাশ পায়, যে দিকে ভালটা এবং বড়টা দেখে সেটা নিতে মনে চায়, এতে মনের লোভ প্রশ্রয় পায়। বিশেষভাবে বাচ্চাদের এই মনোভাব দেখা যায় যে, মাছের বড় পিচটা আমার চাই, মাথাটা আমার চাই, মুরগির রানটা আমার চাই, ইত্যাদি। এরূপ মুহূর্তে বাচ্চাদেরকে বোঝানো উচিৎ, তাদেরকে নিষেধ করা উচিৎ, যাতে তাদের মধ্যে লোভ বাড়তে না পারে। হয়তো বাচ্চারা সবটা মানবে না, তারপরও বলতে থাকলে বোঝাতে থাকলে ধীরে ধীরে বুঝ পয়দা হতে থাকবে।

রাসূল (সা.) বাচ্চাদেরকে পদে পদে শিক্ষা দিতেন। যেমন আমর ইবনে আবী সালামাকে শিক্ষা দিয়েছেন। হযরত ইকরাশ ইবনে যুওয়ায়েব বলেন, 'ছোট থাকতে রাসূল (সা.) আমাকেও এরকম একদিন শিখিয়েছেন যে, নিজের সামনে থেকে খাবে, অন্যের সামনে থেকে নিবে না'। এরপর আরেক দিনের ঘটনা হল- এক প্লেটে অনেক ধরনের খাবার ছিল, কয়েক রকমের খেজুর ছিল। যেমন আমরা

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বড় খাঞ্চায় এক সাথে অনেক ধরনের ফল-ফ্রুট দিতে পারি। এক পাশে আঙ্গুর, আরেক পাশে আম, আরেক পাশে পেপে, আরেক পাশে এটা সেটা ইত্যাদি। হযরত ইকরাশ বলেন, 'রাসূল (সা.) আমাকে ঐ একদিন যে বলেছেন নিজের সামনে থেকে খেতে, সে অনুযায়ী আজও আমি শুধু নিজের সামনে থেকেই খাচ্ছিলাম। যার কারণে অন্যান্য ফল খেতে পারছিলাম না। রাসূল (সা.) বুঝতে পেরে বললেন তোমাকে যে বলেছিলাম নিজের সামনে থেকে খাবে, এটা হল যদি পুরো খাঞ্চায় এক রকমের খাবার থাকে। আর বিভিন্ন রকমের খাবার থাকলে বিভিন্ন দিকে হাত দিয়ে নিতে পার'। এভাবে পদে পদে বাচ্চাদেরকে শিখাতে হবে। পদে পদে বাচ্চাদেরকে তা'লীম দিতে হবে। এটাই হল সন্তানের জন্য পিতা-মাতার সবচেয়ে ভাল এবং সবচেয়ে বড় কিছু করা। আমরা সন্তানের জন্য অনেক কিছু করে যাওয়ার এবং অনেক কিছু রেখে যাওয়ার চিন্তা করি, টাকা-পয়সা রেখে যাব, ব্যাংক-ব্যালেন্স রেখে যাব, জমি-জমা, গাড়ি-বাড়ি করে দিয়ে যাব ইত্যাদি চিন্তা করি। এগুলো করে যাওয়া নাজায়েয নয় যদি হালাল মাল দ্বারা করে যাওয়া সম্ভব হয়, তাহলে তা মন্দ নয় বরং ভাল। হাদীছে এসেছে, রাসূল (সা.) বলেন,

إِنَّكَ إِنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِّنْ أَنْ تَذَرَ هُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ. (صحيح البخاري ١٢٩٥ ومسلم ٤٢٩٦)

'অর্থাৎ, তোমার বাচ্চাদেরকে যদি তুমি এমনভাবে রেখে যেতে পার, তোমার মৃত্যুর পর যেন অন্যের কাছে তাদেরকে হাত পাততে না হয় এটা ভাল, এটা তোমাদের জন্য উত্তম'।

কিন্তু এটা হালাল মাল দ্বারা হতে হবে, যদি হালাল মাল দ্বারা না হয়, হারাম মাল দ্বারা, হারাম উপার্জন দ্বারা হয়, তাহলে তাতে পাপ হবে। ক্ষতি হবে। বাচ্চাদের জন্য হারাম পন্থায় কিছু করে যাব, তাহলে এই হারামের কারণে ওদের যিন্দেগীতে বে-বরকতী আসবে, এর কারণে ওরা বিভ্রান্ত হবে, ইবাদত বন্দেগী থেকে বিচ্যুত হবে, এমনকি এর কারণে জাহান্নামী হয়ে যেতে পারে। তাহলে দেখা গেল হারাম মাল রেখে গেলে আমারও দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানের ক্ষতি, সন্তানেরও দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানের ক্ষতি। তাই বলা হচ্ছিল সন্তানের জন্য রেখে যাওয়া ভাল, যদি হালাল পন্থায় সেটা হয়। এটা তো ভাল, কিন্তু সন্তানের জন্য আমার সবচেয়ে ভাল করা হল সন্তানকে যদি আমি আদব শিক্ষা দিয়ে যেতে পারি, সন্তানকে যদি আমি মানুষ করে গড়ে তুলে যেতে পারি। এটাই হল সন্তানের জন্য আমার রেখে যাওয়া সবচেয়ে উত্তম উপহার। নবী কারীম (সা.) বলেছেন,

مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ نُحْلٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ. (رواه الترمذي برقم ١٩٥٢ حديث مرسل)

'অর্থাৎ, মাতা-পিতা সন্তানের জন্য যা রেখে যায় বা যা উপহার দেয়, তার মধ্যে সবচেয়ে ভাল রেখে যাওয়া এবং ভাল উপহার হল উত্তম আদব'।

অর্থাৎ, যদি তাদেরকে আদব কায়দা এবং শরীআত শিক্ষা দিতে পারি, এটাই হল সন্তানের জন্য আমার সবচেয়ে ভাল কিছু করে যাওয়া। যদি আমি সন্তানের জন্য এটা করে যেতে পারি, মাল আসবাব কিছু না করে যেতে পারি, তাহলে আমার কোন আফসুস নেই যে, হায়রে সন্তানের জন্য কিছুই করে যেতে পারলাম না! কিংবা সন্তানরাও আফসুস করতে পারবে না যে, বাপ মরে গেল আমাদের জন্য কিছুই রেখে গেল না! সন্তানদের বুঝা উচিৎ পিতা-মাতা আমাদের জন্য যে আদব তা'লীম রেখে গিয়েছেন, আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, আমাদেরকে ভাল করে গড়ে তুলেছেন, এটাই তো আমাদের

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



বড় পাওয়া। এটাই তো আমাদের জন্য পিতা-মাতার রেখে যাওয়া সবচেয়ে উত্তম উপহার। নবী কারীম (সা.) হাদীছে আমাদেরকে এই শিক্ষাই দিয়েছেন। বাচ্চাদেরকে পদে পদে দ্বীনী তা'লীম দেয়ার বিষয়ে ফিকির রাখতে হবে। এটাই হল বাচ্চাদের জন্য সবচেয়ে বড় করা। হ্যাঁ এর সাথে যদি হালাল উপার্জন থেকে তাদের জন্য কিছু করে যাওয়া সম্ভব হয়, তাহলে সেটা উত্তম।

সন্তানের জন্য যা কিছুই করতে হবে হালাল মাল দিয়ে করতে হবে, জায়েয তরীকায় করতে হবে, তাদের শারীরিক লালন-পালনও হালাল মাল দ্বারা হতে হবে। অন্যথায় তাদের দ্বীনী চেতনা গড়ে উঠবে না। হারাম খাবার খেলে গোনাহের চেতনা সৃষ্টি হয়, খারাব চেতনা সৃষ্টি হয়। বাচ্চাদের চিন্তা-চেতনা যেন খারাপ না হতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। এ জন্যই সন্তানকে অন্য মহিলার দুধ পান করাতে হলে সে মহিলা দ্বীনদার কি-না দেখে নিতে বলা হয়েছে। কেননা দুধের মাধ্যমে তার চিন্তা-চেতনা এবং স্বভাব-চরিত্র ঐ বাচ্চার মধ্যে আসবে। সাধারণভাবে জননীদেরকে হুকুম দেয়া হয়েছে, তাঁরা তাদের সন্তানদেরকে দুধ পান করাবে। এই হুকুমের ভিতরে ফায়দা রয়েছে। দুনিয়ারও ফায়দা রয়েছে, আখেরাতেরও ফায়দা রয়েছে। এখন আমরা বুঝছি যে মায়েরা সন্তানদেরকে স্তনের দুধ পান করায় না, তাদের নাকি স্তন ক্যান্সার হয়, তাদের স্তন ক্যান্সারের ঝুকি বেড়ে যায়। শরীআতের হুকুম পালন করলে এই ঝুকি আর থাকত না। দেখা গেল শরীআত পালন করলে দুনিয়ারও ফায়দা, আখেরাতেরও ফায়দা। সন্তান মায়ের দুধ পান করবে এর মাধ্যমে মায়ের অংশ তার ভিতরে চলে যাবে। এভাবে তাদের মধ্যে একটা জোড় সৃষ্টি হয়ে যাবে। মা ও সন্তানের মধ্যে মহব্বতের সম্পর্ক গড়ে উঠবে। শুধু তা-ই নয়, এই দুধ পান করানোর মাধ্যমে মা ও সন্তানের মধ্যে চিন্তা-চেতনা ও স্বভাব-চরিত্রের ঐক্য গড়ে উঠবে। কারণ এই দুধের মাধ্যমে মায়ের চিন্তা-চেতনা ও স্বভাব-চরিত্র সন্তানের মধ্যে প্রবেশ করবে। এজন্যই বলা হয়েছে, কোন মা যদি নিজের সন্তানকে দুধ পান করাতে না পারে এমতাবস্থায় অন্য কোন মহিলার দুধ পান করাতে হয়, তাহলে দ্বীনদার মহিলা দেখে, ভাল স্বভাব-চরিত্রের মহিলা দেখে, ভাল মন-মানসিকতার মহিলা দেখে তার দুধ পান করাতে হবে। যেনতেন মহিলার দুধ পান করানো শরীআতের নিয়ম নয়। কারণ স্বভাব-চরিত্র এবং মন-মানসিকতা সৃষ্টির পেছনে দুধের ভূমিকা থাকে।

একবার আমাদের দেশে একটি দৈনিক পত্রিকায় একটা খবর এসেছিল যে, একটা মেয়ের হাত ও পায়ের নখগুলো কুকুরের মত লম্বা লম্বা হয়ে গেছে এবং স্বভাবটাও কুকুরের মত হয়ে গেছে। মাঝে মধ্যেই সে কুকুরের মত হাত পা গুটিয়ে ঘন ঘন শরীর চুলকায়। এই মেয়েটির ইতিহাস এরকম– মেয়েটির মায়ের কোন সন্তান বাঁচত না। গ্রামের কেউ তাকে পরামর্শ দিয়েছিল এবার বাচ্চা হলে তাকে কুকুরের দুধ পান করিয়ে দিও, তাহলে সে বাঁচবে। গ্রামদেশে বাচ্চা বাঁচানোর অনেক কুসংস্কার আছে। একটা কুসংস্কার এরকমও আছে যার ছেলে সন্তান বাঁচে না, সে ছেলে হলে ছেলেকে মেয়ের মত বানিয়ে ফেলে, অর্থাৎ, তাকে মেয়ের পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করায় কিংবা মেয়ের মত তার কান ফুঁটিয়ে দেয়। মনে করে এরূপ করলে ছেলে বাঁচবে। যেন সে ছেলে থাকল না, মেয়ে হয়ে গেল। এভাবে যেন আল্লাহকে বা আযরাঈলকে ধোকা দিল, তারা যেন বুঝতে ভুল করে। যাহোক বাচ্চাকে বাঁচানোর একটা কুসংস্কার হিসেবে ঐ মেয়েটাকে এক ফোটা কুকুরের দুধ পান করানো হয়েছিল। এর কারণে তার শারীরিক মানসিক এতটা পরিবর্তন এসে যায়। এ ঘটনায় দুধের মাধ্যমে স্বভাব-চরিত্রের আছর হয় কি হয় না তা আমরা চাক্ষুশভাবে দেখতে পেলাম।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

যে কথা বলা হচ্ছিল-বাচ্চাদের স্বভাব-চরিত্র যেন সুন্দর ও সঠিকভাবে গড়ে ওঠে সেদিকে গুরুত্ব দিতে হবে। অর্থাৎ, প্রত্যেকটা পদে পদে মানসিক লালন-পালনের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এ কারণেই বাচ্চাদের খেলার সাথী কে হবে, কার সঙ্গে তারা খেলা-ধূলা করে, তার প্রতিও খেয়াল রাখতে হবে। কারণ যাদের সঙ্গে তারা খেলা-ধূলা করবে, যাদের সাথে মেলামেশা হবে, তাদের স্বভাব-চরিত্র ওদের ভিতরে আসবে। ছেলে যদি মেয়েদের সঙ্গে খেলা-ধূলা করে, তাহলে তার মধ্যে মেয়েলী স্বভাব আসতে পারে। মেয়ে যদি ছেলেদের সঙ্গে খেলাধূলা করে, তাহলে মেয়ের লজ্জাভাব কমে যাবে। পরপুরুষের সাথে মেলামেশার মনোবৃত্তি সৃষ্টি হবে। বে-পর্দা-র মনোভাব সৃষ্টি হতে থাকবে। প্রত্যেকটা পদে পদে বাচ্চার মন-মানসিকতা গঠনের দিকে খেয়াল রাখতে হবে। প্রত্যেকটা কথার ক্ষেত্রেও খেয়াল রাখতে হবে- আমি বাচ্চার সাথে যে কথা বলব, সেই কথার দ্বারা ভাল আছর হবে না খারাপ আছর হবে। একদিন এক মহিলা রাসূল (সা.)-এর দরবারে উপস্থিত ছিল। মহিলার বাচ্চাটা মহিলার কোলে আসছিল না। মহিলা বাচ্চাটাকে কোলে নেয়ার চেষ্টা করছিল এই বলে যে, আস আস, আমার কোলে আস। কিন্তু বাচ্চাটা কোলে আসছিল না, দৌড়াদৌড়ি করছিল। তখন মহিলাটি বলল কোলে আস, তোমাকে একটা ভাল খাবার দেব। সাথে সাথে বাচ্চাটা কোলে চলে গেল। রাসূল (সা.) জিজ্ঞাসা করলেন- তুমি যে ওকে বললে কোলে আস একটা ভাল খাবার দেব, তোমার নিয়ত কী ছিল? আসলেই খাবার দেয়ার নিয়ত ছিল কি-না? মহিলাটি বলল হ্যাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার কাছে খেজুর আছে, ওটা দেয়ার নিয়ত ছিল। রাসূল (সা.) বললেন, তাহলে দাও। যদি তোমার ওটা দেয়ার নিয়ত না থাকত, তাহলে এটা তোমার মিথ্যা বলা হতো এবং বাচ্চাকে ধোকা শিক্ষা দেয়া হতো। ঐ বাচ্চা শিখত যে, এরকম ধোকা দেয়া যায়, মানুষকে একটা লোভ দিয়ে নিজের স্বার্থ উদ্ধার হয়ে গেলে পরে না দিলেও চলবে। তাই হাদীছে বলা হয়েছে,

وَلَا يَعِدُ الرَّجُلُ صَبِيَّهُ ثُمَّ لَا يَفِى لَهُ. (سنن ابن ماجة برقم ٤٦ وإسناده قابل للتحسين)

অর্থাৎ, বাচ্চাদেরকে এমন ওয়াদা করবে না, যে ওয়াদা পূরণ করার নিয়ত নেই।

যেমন বলা হল- বাবা তুমি এটা কর তোমাকে বেড়াতে নিয়ে যাব, কিংবা তোমাকে চকলেট কিনে দেব, আইসক্রিম কিনে দেব, ইত্যাদি। কিন্তু পরে যখন কাজ উদ্ধার হয়ে গেল বাচ্চাকে আর সেটা দেয়া হল না। এভাবে বাচ্চাকে মিথ্যা শিক্ষা দেয়া হয়, ধোকা শিক্ষা দেয়া হয়, প্রতারণা শিক্ষা দেয়া হয়। এভাবে প্রত্যেকটা পদে পদে নবী কারীম (সা.) বাচ্চাদের মন-মানসিকতা গঠনের দিকে লক্ষ্য রেখেছেন এবং বাচ্চাদেরকে এভাবে লালন-পালন করতে শিক্ষা দিয়েছেন। বাচ্চাদেরকে লালন-পালন করার সময় তাদের মন-মানসিকতা গঠনের পর্যায়ে এতটা সুক্ষ্ম বিষয়ও খেয়াল রাখতে হয় যে, নবী কারীম (সা.) বলেছেন,

رَحِمَ اللّٰهُ وَالِدًا اَعَانَ وَلَدَهُ عَلٰى بِرِّهِ. (المقاصد الحسنة عن ابى الشيخ فى الثواب وسنده ضعيف)

'অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা ঐ মাতা-পিতাকে রহম করবেন যারা বাচ্চার নেক কাজ করার ক্ষেত্রে, নেক মানসিকতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করবে'।

এ হাদীছের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে– এমন কোন বিষয়ে বাচ্চাকে হুকুম দেয়া মোনাছেব নয়, যে ক্ষেত্রে মনে হতে পারে যে, হয়তো বাচ্চা এই হুকুম মানবে না। এরকম বিষয়ে হুকুম দেয়া বাচ্চার বে-আদব হওয়ার কারণ হতে পারে। কারণ আমি বুঝছি সে মানবে না, তারপরও হুকুম দিলাম হুকুম

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



দেয়ার পর দেখা গেল সে মানল না, তাহলে ঐ বাচ্চার ভিতরে পিতা-মাতার হুকুম অমান্য করার দুঃসাহস বাড়তে থাকবে। আজকে একটা অমান্য করল, সামনে আরও দুটো অমান্য করবে, পরে চারটা অমান্য করবে। এভাবে বাচ্চার পক্ষে পিতা-মাতার হুকুম অমান্য করাটা খুবই স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়াবে। এভাবে খারাপ মানসিকতা গড়ে উঠবে। একটা উদাহরণ দেয়া যাক। যেমন ছুটির সময় বাচ্চারা একটু খেলা-ধুলা করতে চায়। তখন তাদের পড়া-শুনা করার মন থাকে না। ছুটি দেয়াও হয় একটু পড়া-শোনার বিরতির জন্য। তখন যদি আমরা বাচ্চাদেরকে পড়া-শোনার জন্য চাপ দেই, খেলা-ধূলা একেবারে বন্দ রাখতে বলি, তাহলে হতে পারে বাচ্চারা এই আদেশ মানবে না এটাই স্বাভাবিক ব্যাপার। এরকম আদেশ না দেয়া উচিৎ। এতে করে বাচ্চাদের মধ্যে পিতা-মাতার আদেশ অমান্য করার একটা মনোবৃত্তি গড়ে উঠতে পারে।

বাচ্চাদের লালন-পালনের ব্যাপারে শরীআতে এত সুন্দর সুন্দর কথা বলা হয়েছে। মাতা-পিতাকে খেয়াল করতে হবে, কোন কথায় বাচ্চার মধ্যে কী আছর হবে। শুধু কথা নয় মাতা-পিতার আচরণও বাচ্চার মনে প্রভাব ফেলে থাকে। বাচ্চাদের সামনে এমন সব আচরণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে, যা বাচ্চাদের মনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

ফেকাহ্-র কিতাবে বলা হয়েছে যে, মাতা-পিতা একটা দুধের শিশুর সামনেও নিজেরা কোন যৌন কথা-বার্তা, কোন যৌন আচরণে লিপ্ত হবে না। দুধের শিশু যদিও এসব কিছুই বোঝে না, কিন্তু যা কিছু তার সামনে করা হবে, তার মনে তার একটা চিত্র পড়তে থাকবে। যখন ভবিষ্যতে বড় হবে, তখন ঐ চিত্রগুলো তার মন-মানসিকতার ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলবে। শিশুদের মনে একবার যে চিত্র অংকিত হয়, সেই চিত্র কোনদিন মুছে না। সে এখন না বুঝলেও এই চিত্র ভবিষ্যত জীবনে তার মানসিকতার উপর প্রভাব ফেলবে। কাজেই একটা দুধের শিশুর সামনেও যদি সে জাগ্রত থাকে, তাহলে পিতা-মাতাকে এ সমস্ত কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে। এভাবে বাচ্চাদের লালন-পালনের ক্ষেত্রে পদে পদে খেয়াল রাখতে বলা হয়েছে। সতর্ক পদক্ষেপ নিতে বলা হয়েছে। যাতে করে বাচ্চাদের সুন্দর জীবন গড়ে উঠে। বাচ্চাদের সুন্দর জীবন গড়ে তুলতে পারলেই বাচ্চাদের জন্য পিতা-মাতার করণীয় দায়িত্ব আদায় হবে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে তাওফীক দান করুন। আমীন!

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বয়ান নং ২১-এর খুতবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نَبِیًّا، وَهَدَانَا بِهٖ صِرَاطًا سَوِیًّا، اَحْمَدُهٗ حَمْدًا كَثِیْرًا طَیِّبًا وَاَنَّهٗ كَانَ بِنَا حَفِیًّا، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِیْكَ لَهٗ شَهَادَةً جَلِیًّا وَخَفِیًّا، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَیِّدَنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهُ الَّذِیْ هَدَانَا اِلٰی تَرْبِیَةِ الْغُلَامِ لِیَكُوْنَ رَضِیًّا وَّزَكِیًّا، وَلَا یَكُوْنَ شَقِیًّا وَّعَصِیًّا، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ بُكْرَةً وَّعَشِیًّا.

اَمَّا بَعْدُ :

اَیُّهَا النَّاسُ! عَلَی الْاٰبَاءِ وَالْاُمَّهَاتِ تَرْبِیَةُ اَوْلَادِهِمْ جِسْمًا وَّخُلُقًا وَذِهْنًا. فَمَنْ اَرَادَ اَنْ یَّكُوْنَ وَلَدُهٗ صَالِحًا وَبَرًّا بِوَالِدَیْهِ، فَعَلَیْهِ اَنْ یَّتَّخِذَ الْاِجْرَاءَاتِ قَبْلَ وِلَادَتِهٖ، فَیَسْتَنْجِبَ اُمَّهٗ، لِیَكُوْنَ الْوَلَدُ مُتَاثِّرًا مِنْ اَفْكَارِ اُمِّهٖ، وَیَاْكُلَ الْاٰبَاءُ وَالْاُمَّهَاتُ مِنَ الطَّیِّبَاتِ، وَیُوْكِلَهُمْ مِنَ الرِّزْقِ الْحَلَالِ، قَالَ تَعَالٰی : یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنَ الطَّیِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا. وَ لَا فَرْقَ بَیْنَ الصَّغِیْرِ وَالْكَبِیْرِ فِیْ اَكْلِ الطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، وَكَذَالِكَ لَا فَرْقَ بَیْنَهُمْ فِیْ صُحْبَةِ الصَّالِحِیْنَ فَقَالَ تَعَالٰی : یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِیْنَ. عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: اَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ تَمْرَةً مِّنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَجَعَلَهَا فِیْ فِیْهِ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : كَخْ كَخْ! اِرْمِ بِهَا ، اَمَا عَلِمْتَ اَنَّا لَا نَاْكُلُ الصَّدَقَةَ ؟ فَعُلِمَ بِذَالِكَ اَنْ لَّا فَرْقَ بَیْنَ الصَّغِیْرِ وَالْكَبِیْرِ فِیْ اَكْلِ الطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ. فَیُوْكِلُوْهُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ، وَیُلْبِسُوْهُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ، وَیَتْرُكُوْا لَهُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ. وَاعْلَمُوْا اَنْ تَرْكَ الْاَمْوَالِ لِلْاَوْلَادِ مِنَ الْحَسَنَاتِ، اِذَا كَانَ ذَالِكَ بِحُسْنِ النِّیَّاتِ. قَالَ

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



النَّبِیُّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : اِنَّكَ اِنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ اَغْنِیَاءَ خَیْرٌ مِّنْ اَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً یَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ. اَلْحَدِیْثُ.

وَعَلَی الْاٰبَاءِ وَالْاُمَّهَاتِ اَنْ یَّعْتَنُوْا بِالْاَوْلَادِ اِعْتِنَاءً خَاصًّا لِیَكُوْنَ رُفَقَائُهُمْ صَالِحِیْنَ دُوْنَ طَالِحِیْنَ، لِاَنَّ الصُّحْبَةَ مُؤَثِّرَةٌ فِیْ تَكْوِیْنِ الْاَذْهَانِ وَالْاَخْلَاقِ. وَعَلَی الْاٰبَاءِ وَالْاُمَّهَاتِ اَنْ یُّؤَدِّبُوْهُمْ تَاْدِیْبًا حَسَنًا وَلَا یَذْهَلُوْا عَنِ التَّرْبِیَةِ فِی الصِّغَرِ، بَلْ یَهْتَمُّوْا بِهَا فِی الصِّغَرِ اِهْتِمَامًا كَثِیْرًا، كَمَا كَانَ النَّبِیُّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَهْتَمُّ بِهَا. عَنْ اَبِیْ حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ اَبِیْ سَلَمَةَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْاَسَدِ رَبِیْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كُنْتُ غُلَامًا فِیْ حَجْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَتْ یَدِیْ تَطِیْشُ فِی الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : یَا غُلَامُ! سَمِّ اللّٰهَ، وَكُلْ بِیَمِیْنِكَ، وَكُلْ مِمَّا یَلِیْكَ. فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِیْ بَعْدُ. رَوَاهُ فِیْ جَامِعِ الْاُصُوْلِ. وَعَلَی الْاٰبَاءِ وَالْاُمَّهَاتِ اَنْ لَّا یَعِدُوْهُمْ بِمَا لَا یُوْفُوْنَ، فَیَعْلَمُ بِذَالِكَ الْاَوْلَادُ التَّسَامُحَ فِیْ خِلَافِ الْمِیْعَادِ. وَهٰكَذَا عَلَی الْاٰبَاءِ وَالْاُمَّهَاتِ اَنْ یُّعِیْنُوْا اَوْلَادَهُمْ عَلَی الْبِرِّ. قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : رَحِمَ اللّٰهُ وَالِدًا اَعَانَ وَلَدَهٗ عَلٰی بِرِّهٖ.

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ : یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا قُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِیْكُمْ نَارًا وَّ قُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَیْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا یَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَاۤ اَمَرَهُمْ وَیَفْعَلُوْنَ مَا یُؤْمَرُوْنَ.

بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِی الْقُرْاٰنِ الْعَظِیْمِ، وَنَفَعَنَا وَاِیَّاكُمْ بِالْاٰیَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِیْمِ. اَقُوْلُ قَوْلِیْ هٰذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ لِیْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِیْنَ وَاسْتَغْفِرُوْهُ، اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ.

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বয়ান নং -২২

## সন্তানের জন্য পিতা-মাতার করণীয় (৩য় পর্ব)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: اِنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَ اَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، وَ اللّٰهُ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مُرُوْا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلٰوةِ وَهُمْ اَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ، وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ اَبْنَاءُ عَشْرٍ.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

গত দুই জুমুআয় আলোচনা করা হয়েছিল, সন্তানের জন্য পিতা-মাতার কী করণীয় এবং কীভাবে সন্তানকে গড়ে তুলতে হয়। সন্তানের প্রতি স্নেহ, বাৎসল্য কম বেশি সব পিতা-মাতার থাকে। এই হিসেবে সন্তানকে সবাই আদর-যত্নে লালন-পালন করেন। এই লালন-পালন করার সাথে সাথে যদি নিয়ত এটাও থাকে যে, সন্তান লালন-পালনের মাধ্যমে আমরা শরীআত পালন করছি, রাসূল (সা.)-এর তরীকার উপর আমল করছি, তাহলে সন্তান লালন-পালনের দ্বারা ছওয়াবও পাওয়া যাবে।

সন্তানের শারীরিক মানসিক সব ধরনের পরিচর্যা করা পিতা-মাতার দায়িত্ব। সন্তানের শারীরিক পরিচর্যা বলতে বোঝায় তার খাদ্য-খাবার দেয়া, তার দেহের যত্ন নেয়া, তার শরীরের কোন অসুবিধা থাকলে তা দূর করা ইত্যাদি। শরীআতে নিয়ম করা হয়েছে-সন্তানের যত রকম দৈহিক অসুবিধা বিপদ-আপদ, বালা-মুসীবত হতে পারে, সেগুলো দূর করার উদ্যোগ নিতে হবে। আকীকার বিধান এজন্যই দেয়া হয়েছে। আকীকার দ্বারা সন্তানের শারীরিক আপদ-বালা দূর হয়ে থাকে। তাই সন্তানের জন্মের সাথে সাথে অল্প দিনের ভিতরেই আকীকার উদ্যোগ নিতে হয়। আকীকা করাকে সুন্নাত করা হয়েছে। সাত দিনের দিন এটা করা উত্তম। আকীকা এজন্য করতে হয় যাতে সন্তানের উপর যত রকম দৈহিক আপদ-বালা আসতে পারে, যত রোগ-ব্যাধি হতে পারে, আকীকার ওছীলায় সেগুলো যেন দূর হয়ে যায়। এরপরেও আল্লাহ পাক হেকমত মনে করলে, আল্লাহর কোন রহস্য নিহিত থাকলে রোগ-ব্যাধি হতে পারে। তবে সেই রোগ-ব্যাধি হওয়া দ্বারা এটা বোঝাবে না যে, আকীকা অনর্থক। হাদীছে বলা হয়েছে আকীকা দ্বারা সন্তানের আপদ-বালা দূর হয়ে যায়- একথা আমরা বিশ্বাস করি। ছেলের বেলায় আকীকা ডাবল দেয়ার নিয়ম করা হয়েছে। অর্থাৎ, বকরী দিলে দুইটা আর গরু হলে দুই অংশ। একটা দিলেও আকীকা হয়ে যায়, তবে দুটো দেয়া উত্তম। আর মেয়ের বেলায় একটার নিয়ম রাখা হয়েছে।

ছেলের বেলায় দুটো আর মেয়ের বেলায় একটা কেন? অনেকে এর রহস্য বুঝতে ভুল করেন। কেউ কেউ তো বলেই ফেলেছেন, সব জায়গায়-ই মেয়েদের অধিকার খাটো করে রাখা হয়েছে। অথচ তারা চিন্তা করে দেখে না যে, আকীকা হল দৈহিক আপদ-বালা দূর করার জন্য। কাজেই ছেলে ও মেয়ের মধ্যে যার জীবনে আপদ-বালার সম্ভাবনা বেশি, তার আকীকার পরিমাণ বেশি হওয়াই যুক্তি সংগত। সাধারণত মানুষের দৈহিক আপদ-বালা এসে থাকে বাইরে ঘোরা ফেরা করার কারণে। যে বাইরে বের না হয় তার কোন এ্যাকসিডেন্ট বা দুর্ঘটনা হওয়ার সম্ভাবনা কম। বাইরে যার কাজ নেই,

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



বাড়ির বাইরের অঙ্গনে যাকে যেতে হয় না, তার বিপদ- আপদও কম। এখন কথা হল পুরুষ হলে তার বাইরের দায়িত্ব বেশি, তাকে বাইরে যেতে হবে বেশি, এ কারণে তার দুর্ঘটনার সম্ভাবনাও বেশি । এর বিপরীত বাইরের দায়িত্ব মেয়েদের কম, তাই তাদের দৈহিক আপদ-বালা ঘটার সম্ভাবনাও কম। এর ভিত্তিতেই ছেলের ক্ষেত্রে আকীকার পরিমাণ ডাবল এবং মেয়ের ক্ষেত্রে সিঙ্গেল করা হয়েছে। এভাবে মেয়েদের প্রতি বৈষম্য বা অবিচার করা হয়নি। যে গাড়ির এ্যাকসিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, তার ইন্সুরেন্সে প্রিমিয়ামের অংকটাও বড় হয়। যার এ্যাকসিডেন্টের সম্ভাবনা কম তার প্রিমিয়ামও ছোট। এ কারণে সে বলতে পারবে না যে, আমার প্রতি অবিচার করা হচ্ছে কেন? আমার প্রিমিয়ামও বেশি করে ধরা হোক। এরূপ বললে সেটা তার বোকামী হবে। বুঝা যাবে সে ইন্সুরেন্সের স্বরূপই বুঝো না যে, নিয়ম হল যার এ্যাকসিডেন্টের সম্ভাবনা বেশি, যার দূর্ঘটনার সম্ভাবনা বেশি, তার প্রিমিয়ামের অংকটাও বড় হয়। আকীকা হল আল্লাহর দরবারে একটা ইন্সুরেন্স করার মত যে, আমার সন্তানের যেন বিপদ-আপদ না হয় এই উদ্দেশ্যে সদকা স্বরূপ আমি এই দিয়ে রাখলাম।

ইসলামী বিধি-বিধানের হাকীকত না বুঝলে অনেক অভিযোগ দেখা দিতে পারে, বুঝলে কোন অভিযোগ থাকে না। বরং বুঝলে ভক্তি এবং মুগ্ধতায় মাথা নত হয়ে আসে। যারাই ইসলামের ব্যাপারে অভিযোগ উত্থাপন করেন, মুখ খোলেন, ইসলামী বিধানের মূল রহস্য তারা বোঝেন না বলেই এরকম হয়ে থাকে। ইসলামী বিধি-বিধানের ব্যাপারে অভিযোগ আসবে কী করে? ইসলামী বিধি-বিধান আমার আপনার ক্ষুদ্র জ্ঞান এবং মেধা থেকে আসেনি, বরং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন -যিনি সমস্ত মেধা ও জ্ঞানের সৃষ্টিকর্তা- তাঁর পক্ষ থেকে এসেছে। অতএব ইসলামের কোন বিধান অযৌক্তিক হতে পারে না। ইসলামের কোন বিধান ত্রুটিপূর্ণ হতে পারে না, ইসলামের কোন বিধানে কোন বৈষম্য থাকতে পারে না। বরং সম্পূর্ণ ব্যালেন্স রক্ষা করে পূর্ণ ভারসাম্যতা এবং যৌক্তিকতার ভিত্তিতে যেখানে, যতটুকু, যেভাবে বিধান দেয়া সংগত, সেভাবে দেয়া হয়েছে। এর ভিতরে কোন অভিযোগ উত্থাপনের কোন অবকাশ নেই। কোন সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কোনটা অযৌক্তিক হওয়ার কোন অবকাশ নেই। কোনটা বাস্তবতা বিরোধী হওয়ার কোন অবকাশ নেই। সব বিধি-বিধান যথাযথভাবে সম্পূর্ণ উপযোগী করে মানুষকে দেয়া হয়েছে। অতএব কেউ যদি না বুঝে অভিযোগ উত্থাপন করে, তাহলে সেজন্য তার অজ্ঞতাই দায়ী।

যাহোক আকীকা সম্পর্কে বলা হচ্ছিল-আকীকার বিধান হল সন্তানের দৈহিক আপদ-বালা দূর করার জন্য। যতভাবে সন্তানের বিপদ-আপদ আসতে পারে, এইসব কিছুকে সাধ্যমত ঠেকানোর উদ্যোগ নেয়া পিতা-মাতার দায়িত্ব। ফেকাহ্-র কিতাবে আছে-সন্তানাদিকে সাতার শিখানোও পিতা-মাতার দায়িত্ব। যে সব দেশ পানির দেশ, যেখানে পানির উপর দিয়ে চলাচল করতে হয়, সে সমস্ত দেশে পিতা-মাতার দায়িত্ব সন্তানকে সাতার শিখানো। কারণ এভাবেও তার একটা বিপদ আসতে পারে। পিতা-মাতার অবর্তমানে কিংবা সে বালেগ হয়ে যাওয়ার পর সে যেন জীবিকা নির্বাহ করতে পারে-এরকম যে কোন একটা পেশা সন্তানকে শিখিয়ে দেয়া দায়িত্ব। যাতে সে অনাহারে কষ্ট না পায়, যাতে সে বিপদগ্রস্ত না হয়। যেমন চাষাবাদ শিখিয়ে দেয়া, নৌকা চালানো শিখিয়ে দেয়া, জাহাজ চালানো শিখিয়ে দেয়া, গাড়ি চালানো শিখিয়ে দেয়া যার উপরে নির্ভর করে সে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে। এরকম যে একটা কিছু শিখিয়ে দেয়া পিতা-মাতার দায়িত্ব। এটা হল দুনিয়াবী বিষয় শিক্ষা দেয়ার দায়িত্ব।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

দুনিয়াবী বিষয়ের সাথে সাথে দ্বীনী বিষয় শিক্ষা দেয়াও পিতা-মাতার দায়িত্ব। আমরা প্রথমটা বুঝি, দ্বিতীয়টা বুঝতে চাই না। সন্তান জন্ম নেয়ার পরপরই মাথার ভিতরে কত চিন্তা আসে, কয়দিন পরে একে ভর্তি করাব, কোন নার্সারিতে ভর্তি করাব, কোন কেজী স্কুলে ভর্তি করাব, বাংলা মিডিয়ামে ভর্তি করাব, না ইংলিশ মিডিয়ামে ভর্তি করাব ইত্যাদি কত চিন্তা মাথার ভিতরে ঘোরে, কিন্তু এই সন্তানকে দ্বীনদার বানাতে হলে কাকে উস্তাদ বানাতে হবে, কার কাছ থেকে দ্বীন শিখাতে হবে, কীভাবে সুন্দর করে তাকে দ্বীনী তা'লীম দেয়া যাবে- এই চিন্তাগুলো আমাদের ভিতরে আসে না। অথচ এই চিন্তাটাই বেশি আসা দরকার ছিল। শরীআত তো এটাকেই বড় করে দেখে। এ জন্যই সন্তানের জন্মের শুরু লগ্নেই দায়িত্ব দেয়া হয়েছে সন্তানের কানে আযান ইকামতের শব্দ শোনাও। ডান কানে আযানের শব্দ শোনাও, বাম কানে ইকামতের শব্দ শোনাও। এটা এ জন্য যে, জীবনের শুরুতেই আল্লাহ, আল্লাহর রাসূলের কথা, সবচেয়ে বড় ইবাদত-নামাযের কথা তার মস্তিষ্কের ভিতরে ঢুকে যাক। যদিও এখন সে আযান ইকামতের কথাগুলোর কোন কিছু বুঝবে না, কিন্তু তার একটা আছর তার মস্তিষ্কে পড়বে এবং এর ভিত্তিতে তার মন-মানসিকতা দ্বীনী আলোকে গড়ে উঠবে।

সন্তানের দ্বীনী শিক্ষার দিকটাকে গুরুত্ব দেয়ার কারণেই সাত বছর বয়স হলেই সন্তানকে নামাযের হুকুম দিতে বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِيْنَ. (سنن ابي داؤد ٤٩٥ قال الألباني : حسن صحيح)

অর্থাৎ, তোমাদের সন্তানের বয়স সাত বছর হলে তাদেরকে নামাযের হুকুম দাও, আর দশ বছর হলে মার দিয়ে হলেও নামায পড়াও। আর তখন থেকে তাদের বিছানা পৃথক করে দাও।

এখানে লক্ষ করার বিষয় হল– সাত বছর বয়সে নামায ফরয হয় না, ফরয তো হয় বলেগ হওয়ার পরে। তারপরও এখন নামাযের আদেশ দেয়া এজন্য, যাতে করে এখন থেকেই বালেগ হওয়ার আগ পর্যন্ত সে নামাযে পুরো অভ্যস্ত হয়ে যেতে পারে। এখন থেকে যদি শুরু করা না হয়, তাহলে বালেগ হওয়ার পর সে নিয়মিত নামাযী হতে পারবে না। অভ্যস্ত হতেই বহু বছর লেগে যাবে। এভাবে তার অনেক নামায কাযা হয়ে যাবে, গোনাহগার হতে থাকবে। সেটা যেন না হয়, তাই ছোট থাকতেই অভ্যস্ত করানোর জন্য সাত বছর বয়স থেকে নামাযের হুকুম দিতে বলা হয়েছে এবং দশ বছর থেকে শাসন করে নামায পড়াতে বলা হয়েছে। শুধু নামাযের ব্যাপারে নয়, সব ধরনের দ্বীনী আমলের ব্যাপারে সন্তানকে ছোট বয়স থেকেই তা'লীম দিতে হবে। সন্তানদের হাতে দান-সদকা করাতে হবে, যাতে তার মধ্যে দান-সদকার চেতনা এবং অভ্যাস গড়ে ওঠে। আমি ফকীরকে ভিক্ষা দিব, কিংবা গরীবকে যাকাত দিব, সেটা আমার সন্তানের হাত দিয়ে দেওয়ালে তার মধ্যে দান করার একটা মনোবৃত্তি গড়ে উঠবে। উলামায়ে কেরাম সন্তান লালন-পালন করার নীতির মধ্যে বলেছেন, আমি কোন খাদ্য-খাবার ঘরে এনেছি, এখন সকলের মাঝে সেটা বন্টন করে দিতে হবে, আমি আমার বাচ্চার হাতে যদি বন্টন করাই, তাহলে তার ভিতরে অন্যকে দেয়ার চেতনা সৃষ্টি হবে। সে যদি নিজের জন্য বড়টা রাখতে চায়, তাহলে তাকে বুঝাতে হবে যে, সব সময় নিজের হককে ছোট করে দেখা ভাল। তোমার ভাই বোনকে তুমি বড়টা দাও, নিজে ছোটটা নাও। সে না মানলেও বলতে থাকতে হবে, তার কানে দ্বীনী চেতনার কথা পড়তে থাকবে। দ্বীনের কোন কথা আছর থেকে খালি যায় না, কিছু না কিছু আছর হবেই।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com



আমরা যত ওয়াজ-নসীহত করি বা শুনি, অনেকে বলেন এত ওয়াজ-নসীহত হয়, আমল তো আসে না, তাহলে এইসব ওয়াজ-নসীহতে কী ফায়দা? অবশ্যই ফায়দা আছে। আমলে না আসলেও ফায়দা আছে। এখন আমলে আসার জন্য যে পরিমাণ আছর হওয়ার দরকার ছিল, হয়তো সেই পরিমাণ আছর না হওয়ার কারণে এখন আমল আসছে না। কিন্তু এখন একটু না একটু আছর হচ্ছেই। এভাবে ওয়াজ-নসীহতের কথা শুনে কেউ যদি ভুলেও যায়, তবুও ফায়দা আছে, ফায়দা থেকে খালি নয়। যেমন আমরা কোন খাদ্য-খাবার খেয়ে যদি ভুলে যাই-মনে না থাকে কী খেয়েছি তাতে কি খাদ্যের আছর থাকবে না? বিশেষ বিশেষ খাবার ছাড়া আমরা কয়টা খাবারের কথাই বা মনে রাখতে পারি! অনেক খাবারের কথাই আমাদের মনে নেই কি খেয়েছি, আমাদের দেহে কি সেসব খাদ্যের প্রভাব থেকে যায়নি? দ্বীনী কথা হল রূহানী খাদ্য। যখনই এই খাদ্য গ্রহণ করা হবে, অর্থাৎ দ্বীনী কথা শুনা হবে সেটা ফায়দা থেকে খালি যাবে না, ভুলে গেলেও ফায়দা থেকে খালি যাবে না। খাদ্য- খাবার খেলে যেমন কিছু না কিছু ফায়দা হয়-ই, তদ্রূপ দ্বীনের কথা শুনলেও কিছু না কিছু ফায়দা হবেই। হতে পারে আজকে একটু ফায়দা হল, আগামী কাল আরেকটু কথা শুনলে আরেকটু ফায়দা হবে, এভাবে শুনতে শুনতে ফায়দা জমা হতে হতে আস্তে আস্তে বড় আকার হয়ে যাবে। ছোট সন্তান হয়তো সব কথা বুঝবে না বা সব কথা মানবে না, তবুও বলতে থাকব। ধীরে ধীরে হলেও তার ভিতরে আছর হতে থাকবে।

বাচ্চাদের দ্বারা খাদ্য-খাবার বন্টন করানোর সময় তাদেরকে শিখাতে হবে, যেন তারা সবার ভিতরে ইনসাফ রক্ষা করে বন্টন করে। এভাবে তাদের ভিতরে ইনসাফের মনোভাব গড়ে উঠবে। এখন যদি সে বে-ইনসাফী করা শিখে, তাহলে হতে পারে বড় হলেও সে বে-ইনসাফী করবে। আমরা যখন বাচ্চাদের মধ্যে কোন কিছু বন্টন করব, তখনও যেন ইনসাফ রক্ষা করে বন্টন করি। তাদেরকে যা কিছু দিব, তার ভিতরও যেন ইনসাফ রক্ষা হয়। তাই পিতা-মাতা যখন সন্তানদেরকে কাপড়-চোপড়, জুতা-স্যান্ডেল দিবে, একই মানের দিবে, যাতে কোন বাচ্চা এটা বুঝতে না পারে যে, আমারটা একটু নিম্নমানের, আমাকে একটু খারাপটা দেয়া হয়েছে। আমার প্রতি অবিচার করা হয়েছে, আমাদের মাঝে বৈষম্য করা হচ্ছে ইত্যাদি। এরূপ করলে বাচ্চাদের মনে বে-ইনসাফীর আছর পড়বে। এক বাচ্চাকেই সব সময় বড় মাছের মাথাটা দিব, একজনকেই সব সময় মুরগির রানটা দিব এটা বে-ইনসাফী। আমি খাবারের মালিক, মালিক হিসাবে আমি যাকে যেটা ইচছা দিতে পারি, কিন্তু সেরূপ করলে সন্তানের ভিতরে বে-ইনসাফীর মনোভাব গড়ে উঠতে পারে, যে কম পেল তার মন ছোট হয়ে যেতে পারে। তাই এটা করা যাবে না।

যা হোক সবভাবে সন্তানদের ভিতরে ইনসাফ রক্ষা করা পিতা-মাতার উপর জরুরী। এমনকি শরীআতে এই বিধানও দেয়া হয়েছে- কোন পিতা-মাতা যদি তাদের জীবদ্দশায় সন্তানদেরকে সম্পদ দিয়ে যেতে চায় যেমন অনেকে উইল করে দিয়ে যায় বা মৌখিকভাবে বলে দিয়ে যায়, তাহলে সব সন্তানকে সমান দিয়ে যাবে। ছেলে হোক, মেয়ে হোক সকলকে সমান দিবে। এ অবস্থায় ইসলামী শরীআতের ওয়ারাছাতের যে আইন, সে আইন এখানে চলবে না। সে আইনে ছেলে মেয়ের ডবল পায়, মেয়ে-ছেলের অর্ধেক পায়। জীবদ্দশায় কোন মাতা-পিতা সন্তানদেরকে সম্পদ দিয়ে যেতে চাইলে তখন এই আইন চলবে না। এ আইন চলবে তাদের মরার পরে সম্পদ বন্টন হওয়ার বেলায়। আমি যত দিন বেঁচে আছি আমি আমার সম্পদের মালিক, মালিক হিসেবে যাকে ইচ্ছা যতটুকু ইচ্ছা, আমি

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

দিয়ে যেতে পারি। তাতে আল্লাহ আমাকে ধরবেন না। কিন্তু তার পরেও বলা হয়েছে জীবদ্দশায় দিয়ে যেতে হলে ছেলে মেয়ে সব সন্তানকে সমান দেয়া উত্তম। এরূপ করলে তাদের কারও মনে বে-ইনসাফীর আছর পড়বে না। হ্যাঁ এতটুকু অবকাশ আছে যদি কোন সন্তান আয়-উপার্জনে অক্ষম হয়, যেমন সে পঙ্গু বা অন্ধ বা যে কোন ভাবে বিকলাঙ্গ, যার ফলে সে কাজ কাম করে খেতে পারবে না, উপার্জন করতে পারবে না, এরকম সন্তানকে বেশি দেয়া যায়। তাও অন্য সন্তানদেরকে বুঝিয়ে দেয়া চাই যে, এ কারণে তাকে বেশি দেয়া হচ্ছে। কোন সন্তান যদি দ্বীনী লাইনে, দ্বীনী কাজে ব্যস্ত থাকে, যেমন আলেম বা তালেবে ইল্‌ম থাকে যে সে সর্বদা দ্বীনের কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে ততটা আয় উপার্জন করতে সময় পাবে না, তাকেও একটু বেশি দেয়া যায় এবং এটাও অন্য সন্তানদেরকে বুঝিয়ে দেয়া চাই যে, তাকে দ্বীনের কাজের খাতিরে একটু বেশি দেয়া হচ্ছে। যাতে দ্বীনের আযমত, গুরুত্ব তাদের মনে আসে।

এগুলো হল দুনিয়ার ব্যাপারে সন্তানের জন্য করণীয়। দ্বীনী ব্যাপারেও সন্তানের জন্য করণীয় আছে এবং দ্বীনী ব্যাপারের গুরুত্বটা অনেক বেশি। প্রত্যেকটা পদে পদে খেয়াল রাখতে হবে, যেন সন্তানের মন মানসিকতা, সন্তানের চিন্তা-চেতনা দ্বীনের অনুকূলে গড়ে ওঠে। বুযুর্গানে দ্বীন তাদের সন্তানের চিন্তা-চেতনার দিকে কতটা খেয়াল রাখতেন, তার একটা ঘটনা শুনুন! হযরত মাওলানা যাকারিয়া (রহ.) যার লেখা ফাযায়েলে আ'মাল সারা দুনিয়ায় মসজিদে মসজিদে তা'লীম হয়। তিনি তার নিজের জীবনী নিজেই লিখে গেছেন। তার ভিতরে একটা ঘটনা এরকম লিখেছেন যে, আমার পিতা আমার দিকে এতটা খেয়াল রাখতেন যে, একদিন তিনি খাওয়ার পরে একটু বিশ্রাম নেয়ার জন্য বালিশ চেয়েছেন। আমার একটা বালিশ ছিল খুব সুন্দর, আমি বললাম আব্বা আমার বালিশটা আপনাকে এনে দেই? এই বলে বালিশটা নিয়ে আসলাম। এনে বললাম আব্বা, এটা আমার বালিশ। একথা বলার সাথে সাথে তিনি আমাকে স্বজোরে একটা চড় মেরে দিলেন। আমি তখন বুঝতে পারিনি, কেন আমাকে চড় মারলেন। এরপর তিনি বললেন, 'তুমি যে বলেছ, আমার বালিশ, এ কথার কারণে তোমার আমিত্ব প্রকাশ পেয়েছে। এজন্যই তোমাকে এতটুকু শাসন করে দিলাম'। হযরত মাওলানা যাকারিয়া (রহ.) বলেন, 'এভাবে আমার পিতা পদে পদে আমাকে শাসন করেছেন। এমনকি নামাযে দাঁড়ালে নামাযের পরে আমাকে জিজ্ঞাসা করতেন তুমি কার কাছে দাঁড়িয়েছিলে, তোমার ডানে কে ছিল, বামে কে ছিল? পরপর দুই তিনদিন একই জনের সঙ্গে দাঁড়ানোর কথা শুনলে আমাকে শাসাতেন যে, ওর সাথে তোমার এত খাতির কেন? এভাবে আমি কার সঙ্গে কী পরিমাণ উঠা-বসা করি, তার প্রতি খেয়াল রাখতেন'। এটা খেয়াল রাখা খুব বেশি জরুরী। আজ আমাদের সন্তান, আমাদের যুব সমাজ যে এতটা খারাপ হচ্ছে, এমনকি কিশোররা পর্যন্ত খারাপ হয়ে যাচ্ছে, তার একটা বড় কারণ হল তাদের সঙ্গদোষ। খারাপ ছেলেদের সঙ্গে মিশে তারা খারাপ হয়ে যাচ্ছে, আমরা এদিকে খুব একটা খেয়াল দিচ্ছি না। তাদেরকে ভাল বানাতে চাইলে এদিকে খেয়াল দিতে হবে। মাঝে মধ্যে তাদেরকে বুযুর্গদের খেদমতে নিয়ে যেতে বলা হয়েছে।

ফেকাহ্-র কিতাবে সন্তান লালন-পালন করার যে নিয়ম-নীতি বলা হয়েছে, তার ভিতর এটাও একটা বিষয় যে, মাঝে মধ্যে তাদেরকে বুযুর্গদের কাছে, ভাল মানুষের কাছে আসা-যাওয়ার অভ্যাস করাতে হবে। তাহলে বুযুর্গদের কথা-বার্তা, উঠা-বসা, চলা-ফেরা দেখে তাদের মধ্যে আছর হতে থাকবে। এটা মনে করা যাবে না যে, নাবালেগ বাচ্চা, এখন এতটার প্রয়োজন কী? এখন-ই তো গড়ার

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



সময়, যখন তারা বালেগ হয়ে যাবে, তখন তাদের রগ মোটা হয়ে যাবে। তখন তারা নিজের ইচ্ছায় চলবে, তখন আমাদের ইচ্ছা মত আর চলবে না। যতদিন নাবালেগ থাকে, ততদিন-ই তাদেরকে গড়া সম্ভব। তার মন-মানসিকতা কেমন গড়ে উঠবে, তাকে আমি কেমন বানাতে পারব, সে কোন মেজাযের হবে, কোন গতির হবে–এটা নির্ধারণ করার সময়, বালেগ হওয়ার আগ পর্যন্ত। বালেগ হওয়ার পর লাইনে আনা কঠিন হয়ে যায়। কথায় বলে– কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ, পাকলে করে টাশ টাশ!

তাই বাচ্চা বয়সেই বেশি শাসন করার প্রয়োজন। বাচ্চাকে যেমন আদর-স্নেহ করতে হবে, শাসনও করতে হবে। তবে শাসন অর্থ গরুর মত পেটানো নয়। শাসনেরও মাসআলা রয়েছে। আমরা অনেকে স্কুল কলেজে পড়াই বা মাদ্রাসায়, মসজিদে, মক্তবে পড়াই, কিন্তু শাসন করার মাসআলা জানি না। বাচ্চাদেরকে কতটুকু মারধর করা যাবে তার মাসআলা জানি না। ফাতাওয়ায়ে শামীতে মাসআলা লেখা হয়েছে, কোন উস্তাদ, কোন পিতা-মাতা তার সন্তানকে এমনভাবে মারতে পারবে না যে, হাত পা ভেঙ্গে যাবে, বা চামড়া ফেটে যাবে, গায়ে দাগ পড়ে যাবে। বাচ্চাদেরকে শাসনের স্বার্থে একটু আধটু মারধরেরও প্রয়োজন আছে, কিন্তু ব্যালেন্স হারা হয়ে মারধর করা যাবে না। বাচ্চাদেরকে একেবারেই শাসন করা যাবে না, যতই অন্যায় করুক কোন বকুনী পর্যন্ত দেয়া যাবে না-এটাও ব্যালেন্স ছাড়া নীতি।

ইদানিং পাশ্চাত্যে বাচ্চাদেরকে গায়ে হাত দেয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এমনকি উস্তাদ মুখে একটা বকুনীও দিতে পারে না। আমেরিকার একজন উস্তাদের মুখে আমি নিজে শুনেছি যে, তাদের অবস্থা হল কোন বকুনী দেয়াও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। মারধর তো দূরের কথা, বকুনীও দিতে পারবে না। ফলে ছেলেরা এমনভাবে উস্তাদের মাথায় চড়ে যায়, আর উস্তাদের এমন অসহায় অবস্থা হয়ে দাঁড়ায়, যেন উস্তাদ একটা অবলা গাধার মত, ছেলেরা তার দুই কান ধরে দুই দিকে টানছে, কেউ লেজ ধরে টানছে, কেউ দুই হাত পা ধরে টানছে, এই অবস্থা, অথচ উস্তাদ কিছুই বলতে পারছে না। এটা সম্পূর্ণ ব্যালেন্স হারা অবস্থা।

ইসলামের কোন নীতি ব্যালেন্স হারা নয়। প্রয়োজনে শাসন করতে হবে, কিন্তু শাসন করতে যেয়ে মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়া যাবে না। নিয়মের মধ্যে থাকলেই ফায়দা। অস্বাভাবিক মারধর করলে বাচ্চারা জেদী হয়ে যায়। এতে করে তাদের সংশোধন তো হয়ই না, বরং উল্টো বে-আড়া হয়ে যায়।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে সঠিক বুঝ দান করুন। আমাদের বাচ্চাদেরকে সঠিকভাবে গড়ে তোলার তাওফীক দান করুকন। আল্লাহ তা'আলা বাচ্চাদের ভাল হওয়ার জন্য দু'আ করতেও শিক্ষা দিয়েছেন,

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا. (فرقان: ٧٤)

অর্থাৎ, হে আল্লাহ আমাদেরকে এমন সন্তান ও পরিবার দান কর যারা আমাদের জন্য শান্তির উপকরণ হবে। আমীন!

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বয়ান নং ২২-এর খুতবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا، وَهَدَانَا بِهٖ صِرَاطًا سَوِيًّا، اَحْمَدُهٗ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا، وَاَنَّهٗ كَانَ بِنَا حَفِيًّا، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ شَهَادَةً جَلِيًّا وَّخَفِيًّا، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهُ الَّذِیْ هَدَانَا اِلٰى تَرْبِيَةِ الْغُلَامِ لِيَكُوْنَ رَضِيًّا وَّزَكِيًّا، وَلَا يَكُوْنَ شَقِيًّا وَّعَصِيًّا، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ بُكْرَةً وَّعَشِيًّا.

اَمَّا بَعْدُ :

اَيُّهَا النَّاسُ ! نَحْنُ نَتَذَاكَرُ حُقُوْقَ الْاَوْلَادِ عَلَى الْاٰبَاءِ وَالْاُمَّهَاتِ. وَلِلْاَوْلَادِ حُقُوْقٌ جِسْمَانِيًّا وَّرُوْحَانِيًّا. وَمِنَ الْحُقُوْقِ الْجِسْمَانِيَّةِ تَدْبِيْرُ مَعَاشِهِمْ وَالْمُحَافَظَةُ عَلٰى مَا فِيْهِ صَلَاحُ اَجْسَامِهِمْ دُوْنَ فَسَادِهِمْ. وَمِنْ هٰذَا النَّوْعِ مِنَ الْحُقُوْقِ اَدَاءُ الْعَقِيْقَةِ، كَیْ تَنْزَاحَ عَنِ الْاَوْلَادِ الْمُصِيْبَةُ وَالْبَلِيَّةُ. عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرِ الضَّبِّیْ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : مَعَ الْغُلَامِ (اَیْ مَعَ وَلَادَتِهٖ) عَقِيْقَةٌ ، فَاَهْرِيْقُوْا عَنْهُ دَمًا، وَاَمِيْطُوْا عَنْهُ الْاَذٰى. رَوَاهُ الْبُخَارِیْ. وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : اَلْغُلَامُ رَهِيْنَةٌ بِعَقِيْقَتِهٖ. وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : عَنِ الْغُلَامُ شَاتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ، وَلَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ اَوْ اِنَاثًا. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ وَالتِّرْمِذِیُّ وَقَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ. وَمِنَ الْحُقُوْقِ الرُّوْحَانِيَّةِ اَنْ يُّحْسِنُوْا تَرْبِيَةَ اَوْلَادِهِمْ، وَيُحَافِظُوْا عَلٰى مَا فِيْهِ صَلَاحُ دِيْنِهِمْ وَ مَعَاشِهِمْ وَمَعَادِهِمْ ، فَاِنَّ الصَّغِيْرَ رَعِيَّةُ اَبَوَيْهِ، وَكُلُّ النَّاسِ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ. اَخْرَجَ الْبُخَارِیُّ وَمُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِیَ

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِیَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ، فَالْاِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِیْ اَهْلِهٖ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ، وَالْمَرْاَةُ رَاعِيَةٌ فِیْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِیَ مَسْئُوْلَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِیْ مَالِ اَبِيْهِ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ. وَمِنْ هٰذَا النَّوْعِ اَيْضًا مَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : مُرُوْا اَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ اَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ، وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ اَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِی الْمَضَاجِعِ.

وَعَلَى الْاٰبَاءِ وَالْاُمَّهَاتِ اَنْ يَّدْعُوْا لِاَوْلَادِهِمْ لِيَكُوْنُوْا صَالِحِيْنَ وَبَارِّيْنَ بِاٰبَائِهِمْ وَاُمَّهَاتِهِمْ. وَمِنْ نَوْعِ هٰذِهِ الْاَدْعِيَةِ مَا جَائَتْ فِی الْقُرْاٰنِ وَالسُّنَّةِ : رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا. وَ رَبِّ هَبْ لِیْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ. وَ اَللّٰهُمَّ اصْلِحْ لِیْ فِیْ ذُرِّيَّتِیْ اِنِّیْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّیْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ. اِلٰى غَيْرِ ذَالِكَ مِنَ الْاَدْعِيَةِ الْمَاثُوْرَةِ.

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ : يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَاۤ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ.

بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِی الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ، وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. اَقُوْلُ قَوْلِیْ هٰذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ لِیْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَاسْتَغْفِرُوْهُ، اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বয়ান নং -২৩

## অধীনস্তদের জন্য গুরুজনদের করণীয়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْئَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَ الْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

সন্তানের ব্যাপারে পিতা-মাতার কী কী করণীয়, সন্তানকে দ্বীনদার বানানোর জন্য পিতা-মাতার কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিৎ, এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছিল। শুধু সন্তানকে নয়; বরং যিনি পরিবারের কর্তা ও মুরুব্বী থাকবেন, পরিবারের সকলকে দ্বীনদার বানানোর জন্য চেষ্টা করা তার কর্তব্য। হাদীছে এসেছে– দাসী, বাদীকে দ্বীনী কথা শিক্ষা দেয়াও ছওয়াবের কাজ। ইমাম বুখারী (রহ.) এই হাদীছ বয়ান করার পরে বলেছেন ঘরের দাসী-বাদী, ঘরের চাকর-চাকরানীকে শিখানো যদি দায়িত্ব হয়, তাহলে নিজের স্ত্রী, সন্তানাদি, নিজের মা-বোনকে শিখানো তো অবশ্যই দায়িত্ব হবে। দাসী-বাদী, চাকর-চাকরানীকে শিখানো দায়িত্ব হলে ছেলে-মেয়ে ভাই-বোন, স্ত্রী, পুত্র-পরিজনকে শিখানো কেন দায়িত্ব হবে না?

ঘরের সকলকে শিখাতে হলে ঘরে তা'লীমের ব্যবস্থা করতে হবে। রাসূল (সা.) বিবিদের ঘরে নিয়মিত তা'লীম করতেন। রাসূল (সা.)-এর পুরো জীবন ছিল রুটিনবদ্ধ জীবন। এই রুটিন অনুসারে প্রতিদিন মাগরিবের নামাযের পর তিনি বিবিদের ঘরে তা'লীম করতেন। তাঁর বিবি ছিল একাধিক। তাই একেক দিন একেক বিবির ঘরে তা'লীম করতেন। নিয়ম ছিল এরকম-যে বিবির ঘরে যে রাতে থাকার পালা পড়ত, ঐ বিবির ঘরে ঐ দিন তা'লীম করতেন। সে তা'লীম শুধু উক্ত বিবি-ই শুনতেন না, অন্যান্য বিবিরাও আসতেন এবং বাইরের আগ্রহী মহিলারাও সেখানে শরীক হতেন। রাসূল (সা.) এভাবে পরিবারের তা'লীমের উদ্দেশ্যে নিয়মিত ঘরে তা'লীমের ব্যবস্থা করেন। এই তা'লীম দেয়াটা রাসূল (সা.)-এর নিয়মিত রুটিনের বিষয় ছিল।

রাসূল (সা.)-এর পুরো জীবনটাই ছিল রুটিনবদ্ধ, আমাদের মত এরকম এলোমেলো নয়। তিনি ফজরের নামায মসজিদে আদায় করার পর চাশত পর্যন্ত মসজিদে অবস্থান করতেন। এ সময় সাহাবায়ে কেরামকে বিভিন্ন কথা বলতেন, ওয়াজ-নসীহত করতেন, কেউ স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চাইলে তার ব্যাখ্যা দিতেন। চাশ্‌ত পর্যন্ত এভাবে থাকতেন। এরপর বাজার পরিদর্শনের জন্য যেতেন। কেউ মালে ভেজাল দেয় কি-না, কেউ মাপে ক্রটি করে কি-না, ব্যবসা বাণিজ্যের শরীআত সম্মত আইন-কানুন রক্ষা করে কি-না, এগুলো পরিদর্শন করতেন। এরপর ঘরে ফিরে আসতেন। ঘরের কোন কাজ করার থাকলে বিবিদের সাথে সেই কাজে শরীক হতেন। এরকম নয় যে, ঘরের কাজ শুধু বিবিই করবে। প্রয়োজনে বিবির সঙ্গে স্বামীও শরীক হবে। প্রয়োজন না থাকলে ভিন্ন কথা। প্রয়োজন থাকলে ঘরের কাজে শরীক হওয়া কোন অসম্মানের বিষয় নয়। রাসূল (সা.) আল্লাহর নবী হয়ে ঘরের কাজ করতে পারলে আমরা কেন পারব না? যাহোক এভাবে যোহরের নামায পর্যন্ত তিনি ঘরে কাটাতেন।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



যোহরের নামাযের পরে খাওয়া-দাওয়া থাকলে সেরে বিশ্রাম করতেন। এরপর আসরের নামায, মাগরিবের নামায, এভাবে প্রত্যেকটা কাজ রুটিন মোতাবেক করেছেন। রাসূল (সা.)-এর জীবন ছিল রুটিনবদ্ধ জীবন, এলোমেলো জীবন নয়। মানুষের জীবনে রুটিন থাকলে জীবনে বরকত হয়, তার কোন কাজ ছুটে যায় না। অলসতা কম আসে, সময় নষ্ট হয় না। যাদের কোন রুটিন নেই, তাদের সময়ের মূল্য কমে যায়, অহেতুক সময় কেটে যায় বা এক কাজে প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত সময় অপচয় হয়ে যায়।

যাহোক যে কথা বলছিলাম– রাসূল (সা.) ঘরে তা'লীম করতেন। শুধু বিবিদেরকে নয়, ঘরের চাকর- চাকরানীদেরকে পর্যন্ত তা'লীম দেয়ার দায়িত্ব রাখা হয়েছে। তারা সহীহ শুদ্ধভাবে কুরআন শরীফ পড়তে না পারলে সহীহ শুদ্ধভাবে পড়া শিখানো দায়িত্ব। যদি নামায, রোযা, করতে না জানে, ধর্ম-কর্ম করতে না বুঝে, সেটা শিখানো দায়িত্ব। বিশেষ করে ছেলে-মেয়েদেরকে দ্বীন শিখানো অবশ্যই দায়িত্ব। আমরা এ দায়িত্ব অনুভব করি না। ছেলে-মেয়ে এবং পরিবারকে দ্বীন শিখানোর চিন্তা আমাদের মধ্যে আসে না। দুনিয়ার বিদ্যা শিখানোর চিন্তা খুব আসে, স্কুল-কলেজে পড়ানোর চিন্তা খুব আসে, কিন্তু তাদেরকে দ্বীন শিখানোর কোন চিন্তা ভিতরে আসে না। ছেলে-মেয়েদের দুনিয়া নষ্ট হতে থাকলে আমাদের খুব পেরেশানী হয়, কিন্তু তাদের দ্বীন ধর্ম এবং আখেরাত নষ্ট হতে থাকলে আমাদের তেমন কোন পেরেশানী বোধ হয় না। আমাদের কাছে অনেক গার্জিয়ান পেরেশান হয়ে আসেন যে, হুজুর! আমার ছেলের লেখা-পড়ার প্রতি কোন মনোযোগ নেই। পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করতে পারে না, স্কুলে যেতে চায় না, কোন তাবীজ দেয়া যায় কি-না, কিংবা কোন পরামর্শ দিন। কিন্তু এরকম গার্জিয়ান খুব কম দেখা যায়, যারা পেরেশান হয়ে ছুটে আসে যে, হুজুর! ছেলে-মেয়ে নামায পড়ে না, নামায পড়াতে পারি না, ধর্ম-কর্মের প্রতি মনোযোগ নেই, এখন কী করা যায়? বুঝা গেল সন্তানের দুনিয়া হোক এ ব্যাপারে আমরা যতটা ফিকির করি, তাদের আখেরাত হোক সে ব্যাপারে ততটা ফিকির করি না। অথচ তাদেরকে দুনিয়া না শিখালে আমি আল্লাহর কাছে আটকে যাব না। কোন রকম জীবিকা অর্জন করতে পারে এমন যে কোন একটা পেশা শিখিয়ে দিলে দুনিয়ার ব্যাপারে আমার দায়িত্ব শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু আমার অধীনস্তদেরকে পুরোপুরি দ্বীনের উপর উঠানো আমার যিম্মাদারী। প্রত্যেকটা পদে পদে তাদেরকে দ্বীনের তা'লীম দেয়া আমার যিম্মাদারী। এই যিম্মাদারী আদায় না করলে আল্লাহর কাছে আমি আটকে যাব, এই বোধ আমাদের মধ্যে আসছে না। এই বোধ আসলে সন্তানকে দ্বীন শিখানোর গুরুত্ব ভিতরে আসত।

সন্তানকে দুইভাবে তা'লীম দেয়ার কথা বলা হয়েছে। একটা আয়াতের মধ্যে আল্লাহ পাক সেই দুটো পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে,

وَ أْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَيْهَا.

অর্থাৎ, তোমরা পরিবারকে নামায ইত্যাদি দ্বীনী বিষয়ের কথা বল এবং নিজেও ঐ সমস্ত আমলের উপর অটল থাক। (তাহা: ১৩২)

এখানে দুইভাবে তাদেরকে শিক্ষা দেয়ার কথা বলা হয়েছে– এক হল মুখে বলে শিক্ষা দেয়া, আরেকটা হল নিজে আমল করে তাদেরকে শিক্ষা দেয়া। বললে যেমন তাদের শিক্ষা হবে, আমল দেখেও তাদের শিক্ষা হবে, বরং আমল দেখে শিক্ষা বেশি হবে। আমি যদি শুধু মুখে তাদেরকে বলি নিজে আমল না করি, তাহলে তারা আমল করতে উদ্বুদ্ধ হবে না। আমার আমল দেখলে তারা আমল

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

করতে উদ্বুদ্ধ হবে। আমি যদি তাদেরকে সত্য কথা বলার জন্য আদেশ দেই। আর নিজে সত্য কথা না বলি, তাহলে তাদের মধ্যে আমার কথার আছর কম হবে। এমনিভাবে আমি নামাযের জন্য বলব, কিন্তু নিজে নামায পড়ব না, আমি ভাল হওয়ার জন্য বলব, কিন্তু নিজে ভাল থাকব না, তাহলে তাদের মনে আমার কথার আছর কম হবে। তাই সন্তানাদি এবং পরিবারকে মুখে বলার মাধ্যমে যে শিক্ষা হবে আমলের মাধ্যমে সেই শিক্ষা বেশি হবে। আমি খুব ভালভাবে নামায পড়ব, তাহলে সন্তানের ভিতরে এটার আছর ভাল হবে। আমি সত্যভাবে চলব, সত্য কথা বলব, গোনাহের কাজ বর্জন করব, তাহলে সন্তান ও পরিবার তা দেখে শিখবে।

দ্বীনের কথা বলা, দ্বীনের দাওয়াত দেয়া সব ক্ষেত্রেই এই দুটো তরীকা। মুখে বলার মাধ্যমে দাওয়াত হবে, আমলের মাধ্যমেও দাওয়াত হবে। সাহাবায়ে কেরামের দাওয়াত মুখের মাধ্যমে যেমন ছিল, আমলের মাধ্যমেও ছিল, বরং ঐতিহাসিকরা লিখেছেন, সাহাবায়ে কেরাম বিভিন্ন অঞ্চলে দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে যেতেন, তাঁরা মুখে কিছু বলার আগেই তাঁদেরকে দেখে মানুষ মুসলমান হয়ে যেত। তারা সাহাবায়ে কেরামের কথা-বার্তা, আচার-আচরণ, আখলাক-চরিত্র ও আমল দেখে ভাবত-এরা যে ধর্মের কথা আমাদেরকে বলতে এসেছেন, সেই ধর্ম মানুষকে এত সুন্দর বানায়, এত সুন্দর আখলাক, এত সুন্দর চরিত্র ওয়ালা বানায়! আমাদেরকে এ ধর্ম আর ব্যাখ্যা করে বোঝানোর দরকার নেই। এভাবে তারা সাহাবায়ে কেরামকে দেখেই মুসলমান হয়ে যেত। সাহাবায়ে কেরামের আমলই দাওয়াত হয়ে দাঁড়াত।

তাই বলা হচ্ছিল মুখে বলে যেমন দাওয়াত হয়, আমলের দ্বারাও দাওয়াত হয়। মুখে বলে দাওয়াত দিলে যেমন ছওয়াব হয়, আমলের মাধ্যমে দাওয়াত দিলেও ঐ পরিমাণ ছওয়াব হবে। আমার মুখের কথা দ্বারা কেউ যদি একটা নেক কাজ করে, তাহলে আমার যে পরিমাণ ছওয়াব হবে, আমার কোন নেক আমল দেখেও কেউ যদি সেরূপ নেক আমল শুরু করে তাহলেও আমার ঐ পরিমাণ ছওয়াব হবে। মুখের দাওয়াত আর আমলের মাধ্যমে দাওয়াত উভয়টাই দাওয়াত। এমনিভাবে মুখের তা'লীম আর আমলের মাধ্যমে তা'লীম উভয়টাই তা'লীম। তাই সন্তান ও পরিবারকে মুখে বলে যেমন শিক্ষা দিতে হবে আমল করেও শিক্ষা দিতে হবে। বরং আমলের মাধ্যমে শিক্ষাটা বেশি আসবে। আমি মুখে বলে হয়তো ইসলামী লেবাস-পোষাক গ্রহণ করাতে পারলাম না, কিন্তু তারা যদি আমার ইসলামী লেবাস-পোষাক দেখে, তাহলে দেখতে দেখতে এক সময় ইসলামী লেবাস-পোষাকের গুরুত্ব তাদের মনে আসবে। আস্তে আস্তে তারাও এটা গ্রহণ করতে শুরু করবে। আমাকে যেমন দেখবে তারাও তেমন শিখবে। ভাল দেখলে ভাল শিখবে। এর জন্য আমার ছওয়াব হবে। খারাপ দেখলে খারাপ শিখবে, তার জন্য আমার গোনাহ হবে, আমলের মাধ্যমে খারাপটা শিখানোর দায়-দায়িত্ব আমার উপর বর্তাবে। তারা যদি আমাকে দেখে– আমি ডিস খুলে নিয়ে পড়ে আছি, আজে বাজে জিনিস দেখছি, তাহলে তারাও এরূপ করবে, করতে শিখবে, মুখে না বললেও শিখবে। আর আমলের মাধ্যমে এই খারাপটা শিখানোর গোনাহ আমার উপরে বর্তাবে।

বাচ্চারা গার্জিয়ানদের সব কিছু ফলো করে। পিতা-মাতা, বড় ভাই-বোন সকলেরটা ফলো করে। তারা বড়দেরটা দেখে দেখে শেখে। এ জন্য ফেকাহর কিতাবে সন্তান লালন-পালন করার যেসব নীতি লেখা হয়েছে, তার ভিতরে এটাও লেখা হয়েছে যে, প্রথম সন্তানকেই আগে ভাল বানাতে হবে। কারণ পরের সন্তানগুলো প্রথম জনকে দেখেই চলবে। প্রথমজনের দেখাদেখি তারা সবকিছু করবে। আগের

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



নৌকা যে দিকে চলবে, পিছনের নৌকাও সে দিকেই চলবে। তাই ছোটদেরকে ভাল বানাতে হলে বড়দের আগে ভাল হওয়া দরকার। মাতা-পিতাকে বড় ভাই-বোনকে দেখেই ছোটরা শিখবে। বড়দের নামায, রোযা, তাকওয়া, পরহেযগারী, দাড়ি, টুপি, লেবাস-পোষাক যেমন হবে, ছোটদেরটাও ওরকমই হবে।

দাড়ির কথাটা অনেকটা ইচ্ছা করেই বললাম। কারণ শরীআতে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। অথচ আমরা এটাকে গুরুরূপূর্ণ মনে করি না। আল-হামদুলিল্লাহ আমাদের মধ্যে অনেক ভাই আছেন যারা পাঁচ ওয়াক্তের নামায তো পড়েনই, অনেকে তাহাজ্জুদের নামায পড়েন, এশরাকের নামায পড়েন, চাশতের নামায পড়েন, আওয়াবীনের নামায পড়েন, রোযা রাখেন, হজ্জ ওমরা করেন, দান-সদকা করেন, এভাবে অনেক নেক আমল তারা করেন, কিন্তু দাড়ি রাখার গুরুত্ব তারা বুঝছেন না। দাড়ি সম্পর্কে একটা ধারণা প্রচলিত আছে যে, দাড়ি রাখা হল সুন্নাত। অথচ এ ধারণা ভুল। দাড়ি রাখা সুন্নাত নয়, বরং দাড়ি রাখা ওয়াজিব। হযরত ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফিয়ী, ইমাম মালেক, ইমাম আহমদসহ সব ইমামই বলেছেন দাড়ি রাখা ওয়াজিব এবং কমপক্ষে এক মুষ্ঠি পরিমাণ রাখা ওয়াজিব। দাড়ি সেভ করা বা এক মুষ্ঠির কম রেখে ছাঁটা হারাম। যারা প্রকাশ্যে এরকম হারাম কাজ করেন, তাদেরকে শরীআতের পরিভাষায় ফাসেক বলা হয়। তাহলে দাড়ি সেভ করা বা এক মুঠের কম রাখা দ্বারা ফল এই দাঁড়াল যে, নামায, রোযা, হজ্জ, ওমরা, দান-সদকা ইত্যাদি অনেক কিছু করেও ফাসেকের খাতা থেকে নাম কাটাতে পারলাম না। কারও চেহারার দিকে তাকিয়ে মাসআলা বলে কাউকে লজ্জা দেয়া উদ্দেশ্য নয়। বরং মাসআলাটির গুরুত্ব তুলে ধরা উদ্দেশ্য। গুরুত্ব বুঝে আস্‌লে আমলের দিকে খেয়াল বাড়বে, হয়তো এর ওছীলায় এক সময় আমল করার তাওফীক নসীব হবে। কিন্তু যদি এর গুরুত্বই না বুঝি, এরকম একটা ওয়াজিবকে সুন্নাত অর্থাৎ, হালকা পর্যায়ের বিষয় মনে করে বসে থাকি, তাহলে হয়তো কখনও আমল আসবে না।

যাহোক আমাদের অধীনস্তদেরকে অর্থাৎ, আমাদের ছেলে-মেয়ে, ছোট ভাই-বোন সকলকে তা'লীম বা শিক্ষা দেয়া আমাদের দায়িত্ব। মুখে বলার মাধ্যমেও তা'লীম হবে, আমলের মাধ্যমেও তা'লীম হবে। এ তা'লীম দেয়া আমাদের এমন দায়িত্ব যে, কিয়ামতের দিন এ সম্বন্ধে আমাদেরকে জবাবদিহী করতে হবে। কারণ আমার সন্তান এবং আমার পরিবার আমার অধীনস্ত, আর প্রত্যেককে তার অধীনস্তদের ব্যাপারে জবাবদিহী করতে হবে। হাদীছে ইরশাদ হয়েছে।

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

অর্থাৎ, তোমাদের প্রত্যেকেই তত্ত্বাবধায়ক, আর যার তত্ত্বাবধানে যারা আছে তাদের ব্যাপারে তাকে জবাবদিহী করতে হবে। রাসূল (সা.) একথাটার আরও বিশদ বিবরণ দিয়ে বলেছেন,

فَالْاَمِيْرُ الَّذِيْ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ فَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. (صحيح مسلم برقم ٤٨٢٨)

অর্থাৎ, যিনি আমীর তথা রাষ্ট্রপ্রধান, তিনি রাষ্ট্রের সকলের তত্ত্বাবধায়ক। তাদের সম্পর্কে তাকে জবাবদিহী করতে হবে।

রাষ্ট্রপ্রধানকে জনগণের জান মালের নিরাপত্তার ব্যাপারে জবাবদিহী করতে হবে, তার অধীনস্ত কোন মানুষ না খেয়ে মারা গেল কি-না, তার জবাবদিহী করতে হবে। তার অধীনস্তদেরকে দ্বীনের উপর চালানোর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে কি-না, সে ব্যাপারে জবাবদিহী করতে হবে। বুঝা গেল যতবড়

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

পদ হবে তার দায়িত্বও তত বড়। পদ সহজ বিষয় নয়। হযরত ওমর (রা.) যখন খলীফা ছিলেন, তাঁর দায়িত্বের চিন্তায় তার ঘুম আসত না। মানুষের আসল অবস্থা জানার জন্য তিনি রাতের অন্ধকারে ঘুরে ঘুরে সকলের খোঁজ নিতেন। তিনি বলতেন আমার রাষ্ট্রের অধীনে, আমার সীমানার মধ্যে কোন একটা কুকুর যদি না খেয়ে মারা যায়, সে ব্যাপারেও অবশ্যই আমাকে জবাবদিহী করতে হবে। একবার তিনি রাতের বেলায় বের হয়েছেন, একটা মরুভূমিতে গিয়েছেন, দেখলেন একটা তাবুর ভিতরে একজন মা হাড়ির ভিতরে পাথর জ্বালাচ্ছে। তার বাচ্চারা ক্ষুধায় কান্না-কাটি করছে, আর মা তাদেরকে বোঝাচ্ছেন এই তো রান্না হচ্ছে, তোমরা একটু শান্ত হও। বাচ্চারা মনে করছে সত্যিই রান্না হচ্ছে, এখনই খাবার প্রস্তুত হয়ে যাবে। হযরত ওমর (রা.) পেরেশান হয়ে গেলেন। দৌড়ে চলে আসলেন। বায়তুল মালের দরজা খুলে আটার বস্তা বের করে নিজের ঘাড়ে নিয়ে সেই তাবুর দিকে ছুটতে শুরু করলেন। খাদেম বলল, 'হুজুর! বস্তাটা আমার ঘাড়ে দিন'! হযরত ওমর (রা.) বললেন, 'না, এটা আমারই দায়িত্ব। এ ব্যাপারে আমাকেই জবাবদিহী করতে হবে, এ বস্তা ওমরের ঘাড়ে থাকতে হবে'। বস্তা ঘাড়ে নিয়ে মহিলার কাছে গিয়ে তাকে বস্তাটা দিলেন। আটা পেয়ে আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে মহিলা বলল, 'বাবা! তুমি যদি এ দেশের খলীফা হতে, তাহলে কত ভাল হতো, তাহলে দেশের মানুষের শান্তি হতো'। বুঝা গেল পদ এত সহজ বিষয় নয়। মানুষ পদের দায়িত্বের দিকে খেয়াল করে না। বরং পদকে নিজের দুনিয়া গোছানোর সুযোগ হিসেবে দেখে থাকে। তাই মানুষ এখন পদ চেয়ে নেয়, বরং পয়সা খরচ করে নেয়। আগের যুগে বুযুর্গানে দ্বীনের অবস্থা এরকম ছিল তাদেরকে কোন পদ না নেয়ার জন্য পিটানো হতো, তার পরও তারা পদ নিতেন না। হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহ.)কে দেশের প্রধান বিচারপতি বানাতে চাওয়া হয়েছিল। তিনি রাজী হননি। তাকে জেল খানায় আটকে রাখা হয়েছে, জল্লাদ দিয়ে প্রহার করা হয়েছে, তারপরও তিনি সে পদ গ্রহণ করেননি। তিনি বলেছেন, 'এ পদ অনেক দায়িত্বপূর্ণ পদ, অনেক নাজুক পদ। একজনের ব্যাপারেও যদি আমি সামান্য অন্যায় বিচার করে ফেলি, তাহলে আমি আবূ হানীফাকে কিয়ামতের দিন সে ব্যাপারে জবাবদিহী করতে হবে। আমি এত বড় নাজুক পদ নিতে পারব না'!

কেউ প্রশ্ন করতে পারেন- তাহলে বড় বড় সাহাবীরা কীভাবে খলীফা হলেন, রাষ্ট্রপ্রধান হলেন? অনেক বড় বড় আলেম অনেক রাষ্ট্রীয় পদ গ্রহণ করেছেন, তারা কেন তা গ্রহণ করলেন? এ প্রশ্নের জওয়াব হল তারা পদের লোভে পদ গ্রহণ করেননি বরং দায়িত্ববোধ থেকে গ্রহণ করেছেন। তারা প্রত্যেকে চিন্তা করেছেন আমি দায়িত্ব না নিলে এমন লোকের হাতে এ দায়িত্ব যাবে, যাতে রাষ্ট্রের মানুষের দুর্ভোগ বৃদ্ধি পাবে। এভাবে মানুষের সুবিধার স্বার্থে তারা দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, নিজের স্বার্থ হাছিলের জন্য নয়। হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কাহিনী আমরা অনেকে জানি। আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনি জেনেছিলেন সামনে সাত বৎসর দুর্ভিক্ষ আসবে। সেই সাত বৎসর দুর্ভিক্ষের সময় কীভাবে মানুষের দুর্দশা লাঘব করা যাবে তার চিন্তা, পরিকল্পনা হযরত ইউসুফ (আ.)-এর মস্তিষ্কে দিয়ে দেয়া হয়েছিল। তখন তিনি মিসরের রাষ্ট্রপ্রধানকে বলেছিলেন যে, রাষ্ট্রের অর্থ ভাণ্ডারের দায়িত্ব আমাকে দেয়া হোক, অর্থাৎ, আমাকে অর্থমন্ত্রীর পদ দেয়া হোক। এভাবে তিনি পদ চেয়ে নিয়েছিলেন। এখানে মুফাসসিরীনে কেরাম বলেছেন তিনি কেন এই পদ চেয়ে নিলেন? কারণ তিনি বুঝেছিলেন দুর্ভিক্ষের সাত বছর সারা দেশে কীভাবে খাদ্য বন্টন করতে হবে, কীভাবে মানুষের দুর্দশা লাঘব করতে হবে, তা তো আল্লাহ পাক একমাত্র আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন, আর কেউ তা জানে না। অতএব আমি যদি এই

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com



পদ গ্রহণ না করি, তাহলে অন্য কেউ সঠিকভাবে পরিস্থিতি সামাল দিতে পারবে না। এটা বুঝে তিনি দায়িত্ব চেয়ে নিয়েছিলেন। নিজের সম্মানের জন্য, বড়াই দেখানোর জন্য, টু-পাইস কামানোর জন্য পদ চেয়ে নেননি। এমনিভাবে সাহাবায়ে কেরাম বুযুর্গানে দ্বীন যারাই কোন পদ গ্রহণ করেছেন। এরকম চিন্তা থেকেই পদ গ্রহণ করেছেন। পদের মোহে পদ গ্রহণ করেননি।

প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সবচেয়ে বড় মুহাদ্দিছ ছিলেন। সবচেয়ে বেশি হাদীছ তাঁর মুখস্থ ছিল। হাদীছের কিতাবে যত সাহাবী থেকে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি হাদীছ তাঁর থেকে বর্ণিত হয়েছে। তাঁকে মদীনার গভর্ণর বানাতে চাওয়া হয়েছিল। কোনোভাবে তিনি রাজী হননি। চাপ প্রয়োগ করা হয়েছে, তবুও রাজী হননি। শেষ পর্যন্ত বলেছেন, আমি দায়িত্ব নিতে পারি, তবে আমার একটা শর্ত আছে। আমরা হলে কী শর্ত দিতাম? বিরাট অংকের বেতন ভাতার শর্ত দিতাম। কিন্তু হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) কী শর্ত দিলেন! তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল বলুন আপনার শর্ত কী? হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) ঐ সময় মসজিদে নববীর মুয়াজ্জিন ছিলেন। এতবড় মুহাদ্দিছ সাহাবী হয়েও তিনি আযান দিতেন। তিনি বললেন আমি গভর্ণরের পদ নিতে পারি কিন্তু এই আযানের পদ আমার থেকে নিতে পারবেন না। মানুষ আশ্চর্য হয়ে গেল! বুঝা গেল চাপের মুখে মানুষের স্বার্থের কথা চিন্তা করে তিনি গভর্ণরের পদ নিতে রাজী হয়েছেন তবে এই পদের প্রতি তার কোন মোহ ছিল না। দুনিয়ার পদের প্রতি তার মোহ ছিল না, কিন্তু আখেরাতের পদের প্রতি মোহ ছিল। এজন্যই তিনিই মুয়াজ্জিনের পদ রাখতে চেয়েছেন। মুয়াজ্জিনী পদ হল আখেরাতের পদ। কারণ আখেরাতে এই পদের মর্যাদা অনেক। কিয়ামতের দিন মুয়াজ্জিনের গর্দান সবচেয়ে বেশি উঁচু থাকবে। ময়দানে হাশরে তাদেরকে দেখে চেনা যাবে এরা হল মুয়াজ্জিন সম্প্রদায়। বিশেষ মর্যাদার প্রতীক হিসেবে তাদের গর্দান উঁচু থাকবে। মুয়াজ্জিনের পদের এত মর্যাদা যে, স্বয়ং হযরত আলী (রা.) যখন খলীফা, তখন তিনি একদিন আফসূস করে বলেছিলেন যে, জীবনে একটা বড় ভুল করেছি। হায় আফসূস রাসূল (সা.) যিন্দা থাকতে তাঁর কাছ থেকে আমার হাসান, হুসাইনের জন্য মসজিদে নববীর মুয়াজ্জিনের পদটা যদি চেয়ে রাখতাম! আমরা তো ইমাম মুয়াজ্জিনকে কোন সম্মানজনক পদাধিকারী মনে করি না। কিন্তু রাসূলের খলীফা আফসূস করেছেন যে, আমার ছেলে মসজিদের মুয়াজ্জিন হতে পারল না! তারা সব কিছুর বিচার করতেন পরকালের ভিত্তিতে। আর আমরা বিচার করি দুনিয়ার ভিত্তিতে। যাহোক বলা হচ্ছিল বুযুর্গানে দ্বীন দুনিয়ার পদ নিতে চাইতেন না। কারণ পদের দায়িত্ব অনেক বড়। পদ যতবড়, দায়িত্ব ততবড়। সবচেয়ে বড় পদ যার অর্থাৎ যিনি রাষ্ট্রপ্রধান, তার দায়িত্বও সবচেয়ে বড়। রাষ্ট্রের সকলের ব্যাপারে তাকে জবাবদিহী করতে হবে। রাষ্ট্রের কেউ বে-নামাযী ছিল কি-না, তাকে নামাযী বানানোর জন্য চেষ্টা করা হয়েছিল কি-না, সমাজের বিদআত কুসংস্কার দূর করা হয়েছিল কি-না, সমাজের মানুষকে আমর বিল মা'রূফ নাহী আনিল মুনকার করা হয়েছিল কি-না, অর্থাৎ তাদেরকে ভাল কাজের কথা বলা হয়েছিল কি-না, মন্দ কাজের থেকে বারণ করা হয়েছিল কি-না ইত্যাদি সব ব্যাপারে তাকে জবাবদিহী করতে হবে। মানুষ নিজের একার ব্যাপারে জবাবদিহী করতে যেয়েই হিম শিম খেয়ে যাবে। সেখানে শুধু নিজের নয়, শুধু নিজের পরিবারের নয়, শুধু নিজের গ্রাম-মহল্লার নয়, গোটা রাষ্ট্রের সমস্ত মানুষের ব্যাপারে যদি জবাবদিহী করতে হয়, তাহলে কী উপায় হবে তা চিন্তাও করা কঠিন। যদি কেউ এভাবে চিন্তা করত, তাহলে বড় পদ নিতে চাইত না। দায়িত্বের চিন্তা নেই, তাই পদের জন্য মানুষ লালায়িত হয়।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

যাহোক অধীনস্তদের ব্যাপারে কার দায়িত্বের পরিধি কতটুকু তার বিশদ বিবরণ দিতে গিয়ে রাসূল (সা.) প্রথম রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্বের কথা উল্লেখ করলেন। তারপর বললেন,

وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلٰى اَهْلِ بَيْتِهٖ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ.

'অর্থাৎ, পরিবারের কর্তা পরিবারের তত্ত্বাবধায়ক। তার বিবি, তার ছেলে-মেয়ে, তার ছোট ভাই-বোন তথা পরিবারের সকলে তার অধীনস্ত, তাদের প্রত্যেকের ব্যাপারে তাকে জবাবদিহী করতে হবে'।

আমি পরিবারের জন্য গাড়ি-বাড়ি করে যেতে পারলাম কি-না, তাদের জন্য ব্যাংক-ব্যালেন্স রেখে যেতে পারলাম কি-না, তাদেরকে স্কুল কলেজের ডিগ্রি দিয়ে যেতে পারলাম কি-না, এসব ব্যাপারে আমাকে জবাবদিহী করতে হবে না, কিন্তু তাদের দ্বীনের ব্যাপারে আমাকে জবাবদিহী করতে হবে। আমি তাদেরকে কুরআন পড়া শিখিয়েছি কি-না, নামায, রোযা শিখিয়েছি কি-না, দ্বীনের জরুরী মাসআলা-মাসায়েল শিখিয়েছি কি-না, এসব ব্যাপারে আমাকে জবাবদিহী করতে হবে। এভাবে রাসূল (সা.) বলেছেন, বিবিরও দায়িত্ব আছে, সেও ঘরের তত্ত্বাবধায়ক। ঘরের সন্তানাদিকে দেখা এবং স্বামীর অগোচরে তার মালামাল ইত্যাদি ঘরের সবকিছুর দেখাশুনা করা ও হেফাযত করা তার দায়িত্ব। এ বিষয়ে তাকে জবাবদিহী করতে হবে। এরপরে রাসূল (সা.) বলেছেন,

فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ. (صحيح مسلم برقم ٤٨٢٨)

'অর্থাৎ, এভাবে তোমাদের প্রত্যেকে তত্ত্বাবধায়ক। যার তত্ত্বাবধানে, যার কর্তৃত্বে যারা আছে, তাদের ব্যাপারে তাকে জবাবদিহী করতে হবে'।

আমি অফিসের বস, তাহলে অফিসে যারা আমার অধীনস্ত, তাদের ব্যাপারে আমাকে জবাবদিহী করতে হবে। এই জবাবদিহীতা থেকে বাঁচার জন্য আমার অধীনস্ত লোকদেরকে নামাযের কথা বলতে হবে, দ্বীনের উপরে চলার জন্য বলতে হবে, অন্তরের জযবা নিয়ে, মনের দায়িত্ববোধ নিয়ে তাদেরকে বলতে হবে, এরপরে যদি তারা না মানে, তার জন্য আমি দায়ী হব না। কিন্তু দায়িত্ববোধ নিয়ে বলতে হবে। যিনি কোন এলাকার এম পি, চেয়ারম্যান, তাকে তার এলাকার লোকজনের ব্যাপারে জবাবদিহী করতে হবে। যিনি কোন এলাকার মেম্বর বা কমিশনার, তাকেও তার এলাকার লোকদের ব্যাপারে জবাবদিহী করতে হবে। সারকথা যার ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বের পরিধি যতটুকু, তাকে সেই পরিমাণে জবাবদিহী করতে হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে সহীহ বুঝ দান করুন। আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



বয়ান নং ২৩-এর খুতবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ شَرَعَ لَنَا اَحْكَامًا فِىْ كُلِّ الْاُمُوْرِ، وَشَرَعَ حُقُوْقًا فِيْمَا بَيْنَ الْاَمِيْرِ وَالْمَامُوْرِ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ شَهَادَةً مُتَوَقِّرَةً بِشَرْحِ الصُّدُوْرِ، اَحْمَدُهٗ حَمْدًا كَثِيْرًا وَهُوَ الْمَحْمُوْدُ الْمَشْكُوْرُ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ شَهَادَةَ اُولِىْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدَنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اِلٰى اَنْ يُّبْعَثَ مَنْ فِى الْقُبُوْرِ.

اَمَّا بَعْدُ :

اَيُّهَا النَّاسُ! اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى خَلَقَ شَيْئٍ بِقُدْرَتِهٖ، وَشَرَعَ اَحْكَامًا وَحُقُوْقًا بِحِكْمَتِهٖ، وَفَضَّلَ بَعْضَ النَّاسِ عَلٰى بَعْضٍ فِى الْمَنَاصِبِ وَالْمَعِيْشَةِ، وَشَرَعَ حُقُوْقًا فِيْمَا بَيْنَهُمْ بِالْعَزِيْمَةِ. قَالَ تَعَالٰى : وَاعْبُدُوْا اللّٰهَ وَلَاتُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ. بَيَّنَ تَعَالٰى فِىْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ حُقُوْقًا فِيْمَا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ، مِنْهَا الْحُقُوْقُ فِيْمَا بَيْنَ الْاُمَرَاءِ وَالْمَامُوْرِيْنَ، فَمَنْ يَّلِى عَلَى النَّاسِ اَمِيْرٌ وَعَلٰى مَنْ يَّلِيْهِ مَامُوْرٌ. وَلِكُلٍّ مِّنْهُمْ حُقُوْقٌ عَلٰى اٰخَرَ يُسْئَلُ عَنْهَا يَوْمَ الْعَرْضِ وَالنُّشُوْرِ. اَخْرَجَ الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ، فَالْاِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِىْ اَهْلِهٖ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِىْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِىَ مَسْئُوْلَةٌ

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِيْ مَالِ اَبِيْهِ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

وَمِنْ اَهَمِّ حُقُوْقِ الْمَامُوْرِ عَلَى الْاَمِيْرِ اَنْ يُّعَلِّمَهُمُ الْوُضُوْءَ وَالْغُسْلَ وَالصَّلَاةَ وَالتِّلَاوَةَ وَغَيْرَ ذَالِكَ مِنَ الْاُمُوْرِ الدِّيْنِيَّةِ ، وَيَاْمُرَهُمْ بِطَاعَةِ اللّٰهِ وَيَنْهَاهُمْ مِنْ عِصْيَانِهِ، وَيَحُثَّهُمْ عَلٰى اِمْتِثَالِ الْمَامُوْرِ وَاجْتِنَابِ الْمَحْظُوْرِ. خُصُوْصًا يُعَلِّمُ الرَّجُلُ اَهْلَ بَيْتِهِ وَمَا مَلَكَتْ يَمِيْنُهُ. وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُ اَزْوَاجَهُ خَاصَّةً، وَيُعَلِّمُهُنَّ خَاصَّةً، وَيَعِظُهُنَّ خَاصَّةً، وَكَانَ يَقُوْلُ فِيْ اٰخِرِ اللَّيْلِ اَيْقِظُوْا صَوَاحِبَ الْحُجَرِ، يَا رُبَّ كَاسِيَةٍ فِى الدُّنْيَا عَارِيَةٌ فِى الْاٰخِرَةِ! وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُثُّ النَّاسَ عَلٰى تَعْلِيْمِ الْمَمَالِيْكِ. وَفِى الْحَدِيْثِ مَرْفُوْعًا : ثَلَاثَةٌ لَهُمْ اَجْرَانِ، رَجُلٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اٰمَنَ بِنَبِيِّهٖ وَاٰمَنَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوْكُ اِذَا اَدّٰى حَقَّ اللّٰهِ تَعَالٰى وَحَقَّ مَوَالِيْهِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ اَمَةٌ فَاَحْسَنَ تَاْدِيْبَهَا وَعَلَّمَهَا فَاَحْسَنَ تَعْلِيْمَهَا ثُمَّ اَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا . رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ . فَاِذَا كَانَ هٰكَذَا الْاِعْتِنَاءُ بِالْاِمَاءِ فِيْ تَعْلِيْمِ الْفَرَائِضِ وَالسُّنَنِ، فَالْاِعْتِنَاءُ بِالْحَرَائِرِ فِيْ ذَالِكَ اَكَدُ.

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ : وَاْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، لَا نَسْاَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى.

بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ، وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. اَقُوْلُ قَوْلِىْ هٰذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ لِىْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَاسْتَغْفِرُوْهُ، اِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com



বয়ান নং -২৪

## স্বামী স্ত্রীর অধিকার (১ম পর্ব)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَ لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. وَقَالَ تَعَالٰى : وَ عَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّ يَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَايَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، اِنْ كَرِهَ مِنْهَا شَيْئًا رَضِيَ مِنْهَا بِاٰخَرَ.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

পিতা-মাতা এবং সন্তানাদির অধিকার কী? অর্থাৎ একজনের জন্য আরেকজনের করণীয় কী এ সম্পর্কে গত কয়েক জুমুআয় আলোচনা করা হয়েছে। একটা পরিবার গড়ে ওঠে পিতা-মাতা, সন্তানাদি, স্বামী-স্ত্রী এবং ভাই-বোনের সমন্বয়ে। অতএব শুধু পিতা-মাতা এবং সন্তানাদির অধিকার পালিত হলেই পরিবারে শান্তি আসবে না। স্বামী তার স্ত্রীর জন্য যা করণীয় তা যদি না করে, এমনিভাবে ভাই-বোন একে অপরের জন্য যা করণীয় তা যদি না করে, তাহলে পরিবারে শান্তি আসবে না। পরিবারের সকলকেই তাদের দায়িত্ব সমানভাবে পালন করতে হবে, তাহলেই পারিবারে শান্তি আসবে। ইসলাম দুনিয়া আখেরাত সব জগতেরই শান্তির জন্য এসেছে। ইসলামের বিধি-বিধান পালন করলে দুনিয়াতেও শান্তি হবে, আখেরাতেও শান্তি হবে। কিন্তু এই শান্তির জন্য পূর্ণাঙ্গভাবে ইসলামকে মানতে হবে। আংশিক মান্য করলে পূর্ণাঙ্গ ফায়দা পাওয়া যাবে না। পরিবারে শান্তি আনতে হলেও পরিবারের সকলকে ইসলামী বিধি-বিধান মান্য করতে হবে অর্থাৎ, পরিবারের সকলকে একজনের প্রতি আরেকজনের যা করণীয় তা করতে হবে, স্বামী-স্ত্রী, ভাই-বোন সকলকেই একজনের প্রতি আরেকজনের যা করণীয় তা করতে হবে। তাহলে পরিবারে শান্তি আসবে। প্রধানত স্বামী-স্ত্রীকে একজনের প্রতি আরেক- জনের যা করণীয় তা করতে হবে। কারণ স্বামী-স্ত্রী হল পরিবারের মূল ভিত্তি। আগে ভিত দোরস্ত হওয়া চাই। অতএব স্বামী এবং স্ত্রীকে একে অপরের অধিকার আদায় করতে হবে।

স্বামী-স্ত্রী দুই জনেরই একজনের উপর অন্য জনের অধিকার রয়েছে। এ বিষয়টা আলোচনায় আসতে গেলেই পুরুষরা চায় স্বামীদের অধিকারটা আগে আলোচনা হোক, স্ত্রীদেরটা পরে আলোচনা হোক। আবার মহিলারা চায় স্ত্রীদের অধিকারগুলো আগে আলোচনা হোক, স্বামীদেরটা পরে আলোচনা হোক। এই মনোভাব খুব খারাপ। এই মনোভাবের অর্থ হল প্রত্যেকেই নিজের অধিকারকে বড় করে দেখতে চায়, দায়িত্বকে বড় করে দেখতে চায় না। এর অর্থ হল নিজের অধিকারের ব্যাপারে সচেতন, কিন্তু দায়িত্বের ব্যাপারে সচেতন নয়। অথচ নিজের অধিকার নয় বরং দায়িত্বের ব্যাপারে বেশি সচেতন হওয়া চাই। আমরা অধিকারের ব্যাপারে সচেতন কিন্তু দায়িত্বের ব্যাপারে সচেতন নই। এটাই হল আমাদের সমাজে অশান্তির মূল কারণ। আমাদের সমাজে যত অশান্তি হচ্ছে, তার সিংহভাগ এ কারণেই হচ্ছে। সকলেই নিজের অধিকারকে দেখছে, নিজের দায়িত্ব কী তা দেখছে না। অথচ ইসলাম আমদেরকে শিক্ষা দিয়েছে– আমরা যেন দায়িত্ব সচেতন হই। আর অধিকারের ব্যাপারে নমনীয় হই। এক হাদীছে নবী কারীম (সা.) বলেছেন,

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِيْ أَثْرَةً وَأُمُوْرًا تُنْكِرُوْنَهَا. قَالُوْا فَمَاذَا تَأْمُرُنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ أَدُّوْا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ وَسَلُوا اللّٰهَ حَقَّكُمْ. (صحيح البخاري برقم ٧٠٥٢)

অর্থাৎ, একটা যমানা আসবে, যখন তোমাদের যে অধিকার তা অন্যেরা দিবে না, তোমরা নিজেদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ! তখন আমাদের কী করণীয় থাকবে? রাসূল (সা.) বললেন, তোমাদের যা দায়িত্ব কর্তব্য তা পালন করে যাবে, আর তোমাদের অধিকার আল্লাহ থেকে চেয়ে নিবে। এখানে লক্ষণীয় হল– রাসূল (সা.) একথা বলেননি যে, তোমাদের অধিকার আদায় না হলে তার জন্য অধিকার সচেতন হবে, আন্দোলনে নামবে ইত্যাদি। বরং অধিকারের বিষয়ে সোচ্চার না হয়ে দায়িত্ব পালন করে যেতে বলেছেন। আমাদের সমাজে যত রকম আন্দোলন হয়, মিছিল হয়, মিটিং হয় ঘেরাও হয়, ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া হয় এসব কীসের জন্য হয়? আমরা নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলন করি। শ্রমিক তার অধিকার আদায়ের জন্য মলিকদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে, কিন্তু শ্রমিক তার দায়িত্ব ঠিকমত পালন করছে না। অর্থাৎ, দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে তার কোন মাথা ব্যাথা নেই, শুধু অধিকার আদায়ের জন্য সোচ্চার হচ্ছে, সকলেরই এই অবস্থা। কেউ দায়িত্বের ব্যাপারে সচেতন হচ্ছে না, শুধু অধিকারের জন্য সোচ্চার হচ্ছে। এর থেকেই যত গণ্ডগোলের সূত্রপাত হচ্ছে, ফ্যাসাদের সূত্রপাত হচ্ছে। অথচ ইসলাম বলেছে তোমার অধিকারের ব্যাপারে তুমি নমনীয় থাক, দায়িত্বের ব্যাপারে যত্নবান হও। আমরা এই নীতির উপর উঠে আসছি না। আমরা দায়িত্বের জন্য যত্নবান হচ্ছি না। মহিলাদের ব্যাপারেও দেখা যায় আমরা তাদের জন্য কী করণীয়, সে ব্যাপারে যত্নবান হই না বরং আমাদের জন্য তাদের কী করণীয় অর্থাৎ, আমাদের অধিকার কী তা ষোলকলায় আদায় করতে চাই। আমরা স্বামীরা চাই স্ত্রীরা আমাদের কথা মেনে চলবে, আমাদের খেদমত করবে, আমাদের কথায় উঠা-বসা করবে। কিন্তু তাদের জন্য আমাদের কী করণীয়, তা আমরা করতে চাই না। সম্ভবত মহিলাদের অধিকারকে খাটো করে দেখার বিষয়টা অনেক পুরাতন। এজন্যই কুরআন হাদীছেও মহিলাদের অধিকারের কথা বেশি করে বলা হয়েছে, পুরুষের অধিকারের কথা কম করে বলা হয়েছে। কুরআন শরীফে স্বামী-স্ত্রীর অধিকার সংক্রান্ত যে আয়াতগুলো রয়েছে, তার অধিকাংশটাই মহিলাদের অধিকার বিষয়ক। রাসূল (সা.)ও বিশেষ বিশেষ ভাষণে নারীদের অধিকারের কথা ফলাও করে বলতেন। বিদায় হজ্জের ভাষণেও তিনি নারীদের অধিকারের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। বিদায় হজ্জের ভাষণ ছিল বড় মজলিসে রাসূল (সা.)-এর জীবনের শেষ ভাষণ। তিনি বলেছিলেনও আগামী বছর হয়তো তোমাদের সাথে আর আমার দেখা হবে না। আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, আমার সময় শেষ। এই শেষ মুহূর্তে এক লক্ষ বা সোয়া লক্ষ সাহাবা উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের সম্মুখে দেয়া এই ভাষণে তিনি বিশেষ বিশেষ গুরুরূপূর্ণ কয়েকটা কথা বলে গেছেন। তার ভিতরে একটা বলেছেন,

فَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَآءِ خَيْرًا. (صحيح البخاري برقم ٥١٨٥)

'অর্থাৎ, খুব খেয়াল করে শুনে রাখ, নারীদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করার নির্দেশ দিচ্ছি, নারীদের অধিকার আদায় করার নির্দেশ দিচ্ছি, তোমরা এই নির্দেশ গ্রহণ কর'। রাসূল (সা.) আরও বলেছেন,

فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ. (صحيح البخاري برقم ٥١٨٥)

'অর্থাৎ, জেনে রাখ- মহিলাদেরকে পাজড়ের বাঁকা হাড় থেকে তৈরি করা হয়েছে'।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



অর্থাৎ পাঁজড়ের হাড় যেমন স্বাভাবিকভাবে বাঁকা, অনুরূপ মহিলাদের ভিতরেও স্বভাবগত কিছু বক্রতা থাকে। নবী কারীম (সা.) বোঝাতে চাচ্ছেন যে, মহিলাদের মধ্যে কিছুটা বক্রতা থাকলেও তাদের ভিতরে কিছুটা ভুল-ত্রুটি থাকলেও, তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করবে। যদি কেউ প্রশ্ন করেন, তাদের মধ্যে স্বভাবগত বক্রতা রাখা হল কেন? এর জওয়াব হল- হয়তো এর মধ্যেই কোন কল্যাণ রয়েছে। যেমন তারা ত্যাড়ামী করবে আর পুরুষ তাদের এসলাহ করতে থাকবে, এতে করে এসলাহের ছওয়াব পেতে থাকবে। এসলাহ না হলে তাদের ত্যাড়ামীর কারণে যে কষ্ট আসবে, তাতে সবর করলে আল্লাহর কাছে মর্যাদা বাড়তে থাকবে। যাহোক তাদের স্বভাবগত যে বক্রতা রয়েছে সেটা থাকাই ভাল, তার মধ্যেই আল্লাহ কল্যাণ রেখেছেন। তাই এ বক্রতা সোজা করতে যাওয়া ভাল নয়। যেমন বাঁকা হাড় বাঁকা থাকাই ভাল। বাঁকা হাড়কে যদি সোজা করা হয়, তাহলে সেই হাড়ের সৌন্দর্য থাকে না বা তা একেবারে অকেজো হয়ে যায়। কেউ যদি চায় পাঁজড়ের সব বাঁকা হাড়গুলো সোজা করে ফেলি, তাহলে সেটা হবে বোকামী। সোজা করতে গেলে ভেঙ্গে যাবে। তখন সেগুলো একেবারেই অকেজো হয়ে পড়বে। তাই বাঁকাটা বাঁকা থাকতে দেয়াই ভাল। অনুরূপভাবে মহিলাদেরকে মহিলাদের স্বভাবে ছেড়ে দেয়াই ভাল। রাসূল (সা.) তাই বলেছেন,

فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ. (صحيح البخاري برقم ٥١٨٥)

'অর্থাৎ, যদি তুমি সোজা করতে চাও, তাহলে ভেঙ্গে যাবে। আবার যদি মনে কর সোজা যখন হবেই না তখন চেষ্টা করে লাভ কী? তাহলে একেবারেই বাঁকা থেকে যাবে একটুও সোজা হবে না'।

তাই কিছুটা চেষ্টা করার পর যতটুকু সোজা হয়, তা নিয়েই চলতে থাক। এ হাদীছে নারীদেরকে শাসন করার ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা গ্রহণ করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। তা হল একেবারে শাসন করা ছেড়ে দিবে না, আবার পুরো সোজা কোনোদিন হবে না তাও মনে রাখতে হবে। আল্লাহর রাসূল (সা.)ও তো বিবিদেরকে পুরোপুরি নিজের মেজায মত আনতে পারেননি। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এবং হযরত ওমর (রা.)-এর জীবনীতেও পাওয়া যায় স্ত্রীদের সাথে তাদের ঝগড়া ঝাটি লেগেছে। আল্লাহর নবী ও খোলাফায়ে রাশেদীনের বিবিদেরকে যদি তারা পুরো সোজা করতে না পেরে থাকেন, তাহলে আমরা তা কীভাবে পারব? তাই রাসূল (সা.) বলেছেন, 'ওরা একদম সোজা হবে না, তবে একেবারে ছেড়েও দিবে না, বরং সব সময় বোঝাতে থাকবে, নসীহত করতে থাকবে, আর ভাল ব্যবহার করতে থাকবে, এরপরও যতটুকু বাঁকা থেকে যাবে, সেই অবস্থাতেই তার থেকে যা পাওয়ার উসূল করে নিতে থাকবে। যা ফায়দা হাছিল করার তাদেরকে ঐ অবস্থায় রেখেই তা হাছিল করা যাবে। অতএব তাদের কোন দোষ-ত্রুটি থেকে গেলে সেটার জন্য মন খারাপ না করা। কারণ তাদের দোষ ত্রুটি থাকাই স্বাভাবিক। তদুপরি এই দোষ-ত্রুটি থাকার মধ্যেই হয়তো আল্লাহ পাক কোন কল্যাণ রেখেছেন। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

وَ عَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا.

অর্থাৎ, নারীদের সঙ্গে তোমরা ভাল ব্যবহার করবে। যদি নারীদের কিছু অপছন্দনীয় লাগে, তাহলে মনে রেখ হতে পারে তোমরা একটা বিষয়কে অপছন্দ করবে, অথচ তার মধ্যেই আল্লাহ তা'আলা প্রচুর কল্যাণ রাখবেন। (নিছা: ১৯)

এ আয়াতে আল্লাহ পাক একথা বলেননি যে, তাদের মধ্যে খারাপ কিছু দেখলে, তোমার মনপুত নয় এমন কিছু দেখলে, শাসন করে ধমক দিয়ে, মার দিয়ে সোজা করে ফেল। বরং আল্লাহ বলেছেন যদি

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

এরকম কিছু দেখ, তাহলে মনে করবে হয়তো ওর ভিতরেই তোমার জন্য কোন কল্যাণ রয়েছে। এ আয়াতে নারীদের দোষ-ত্রুটিকে সহনশীলতার সাথে দেখতে বলা হয়েছে। এ জন্য মন খারাপ না করতে বলা হয়েছে।

অনেক সময় স্ত্রীর দোষ-ত্রুটি দেখে মন খারাপ হতে পারে, তার চেহারা ছবি, চলা ফেরা পছন্দ না হলেও মন খারাপ হতে পারে। এ ক্ষেত্রেও ঐ কথাটি মনে রাখতে হবে যে, হয়তো ওর ভিতরেই আল্লাহ কোন কল্যাণ রেখেছেন। এরূপ চিন্তা করলে মন খারাপ হওয়াটা কমে যাবে। এই মন খারাপ হওয়া ভাব দূর করার আর একটা উপায় হল তার গুণগুলো দেখা। তার মধ্যে বহু দোষ-ত্রুটি থাকলেও কিছু না কিছু গুণও অবশ্যই আছে। সেই গুণগুলো দেখে তার প্রতি মুগ্ধ হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। আমাদের স্বভাব হল আমরা একজনের শুধু দোষগুলো দেখি, তার গুণগুলো দেখি না। যার কারণে তার সম্পর্কে আমাদের মন খারাপ হয়ে যায়। মনের মিল ছুটে যায়। অথচ তার গুণগুলো দেখলে সে কারণে মন শান্তনা পেত। একজন মানুষ যত খারাপই হোক না কেন, তার মধ্যে কোন না কোন গুণও অবশ্যই থাকবে। কথায় বলে ঘড়ি যদি একেবারে অচলও হয়, তবুও অন্তত দিনে রাতে দুইবার টাইম ঠিক দিবে। যেমন একটা ঘড়ির কাটা ১২টার উপরে এসে বন্ধ হয়ে আছে, তাহলে এ ঘড়ি দুপুর ১২টায় এবং রাত ১২টায় এই দুইবার ঠিক টাইম দিবে। বুঝা গেল অচল জিনিসের মধ্যেও কিছু কিছু ফায়দা অবশ্যই আছে। অচল জিনিসের ভিতরেও ভালাইয়ের দিক আছে। তাই কোন নারীর যত দোষ-ত্রুটি থাকুক, তার অনেক গুণও থাকবে। সেই গুণগুলো দেখে তার প্রতি মুগ্ধ হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। এটাই হল বিবিকে ভাল না লাগার ক্ষেত্রে মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসা। আপনার স্ত্রীকে আপনার ভাল লাগে না, মন খারাপ, তার এই দোষ, সেই দোষ, তাকে আপনি সহ্য করতে পারছেন না, তাহলে তার কী কী গুণ আছে চিন্তা করে বের করুন এবং সেগুলোর ভিত্তিতে তার প্রতি মুগ্ধ থাকার চেষ্টা করুন। দেখবেন আপনার মন ঠিক হয়ে যাবে। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন,

لَا يَفْرُكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً اِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا اٰخَرَ. (رواه مسلم برقم ٣٧٢١)

'অর্থাৎ, কোন স্বামী যেন তার স্ত্রীর প্রতি রুষ্ঠ হয়ে না থাকে। স্ত্রীর কোন কিছু অপছন্দনীয় লাগলে তার এমন কিছু বিষয় থাকবে যা তার ভাল লাগবে'।

হিন্দুস্থানের একজন প্রসিদ্ধ বুযুর্গ ছিলেন হযরত মির্জা মাজহার জানেজানা (রহ.)। তিনি খুব নাজুক মেজাযের লোক ছিলেন। এমন সুক্ষ্ম নাজুক মেজাযের যে, বিছানার চাদরে একটা ভাঁজ পড়ে থাকলেও বলতেন, আমার মাথায় ব্যথা শুরু হয়েছে, এই ভাঁজটা সোজা কর। একজন লোক তার কাছে এসেছিলেন মুরীদ হতে সকাল বেলা নাস্তার সময় হওয়াতে মির্জা সাহেব তাকে নাস্তার জন্য হালুয়া আর রুটি খেতে দিলেন। খাওয়া শেষে মির্জা মাজহার জানেজানা যাচাই করে দেখলেন, মেহমান কয়টা রুটি খেয়েছে এবং সেই হিসেবে যতটুকু হালুয়া খাওয়া উচিৎ ছিল, তার চেয়ে বেশি খেয়েছে কি-না। যাচাই করে দেখলেন রুটির তুলনায় হালুয়া বেশি খাওয়া হয়েছে। তখন তিনি বললেন, ওর মেজাযের ভিতরে ব্যালেন্স নেই, ওকে আমি মুরীদ বানাতে পারব না। তাকে বিদায় করে দিলেন। এত সুক্ষ্ম মেজাযের ছিলেন তিনি। আল্লাহ পাক মানুষকে এসলাহ করার জন্য অনেক রকম ব্যবস্থা করেন। এরকম নাজুক মেজাযের এসলাহের জন্য আল্লাহ তা'আলা মাজহার জানেজানাকে দিয়েছিলেন পূর্ণাঙ্গ ত্যাড়া মেজাযের এক স্ত্রী। মুরীদরা বার বার বলেছেন হুজুর! আপনার পারিবারিক জীবন তো সারাক্ষণই অশান্তির মধ্যে কাটছে। বিবির সাথে খটা-খটি লেগেই থাকে। এই আপদ কি দূর করে দেয়া যায় না? মির্জা মাজহার

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com



জানেজানা (রহ.) জওয়াবে বলেছেন, 'আল্লাহ পাক হয়তো এর ভিতরেই আমার কল্যাণ রেখেছেন। এর দ্বারাই আমার এসলাহের ব্যবস্থা করেছেন। আমার মেজায তো বেশি নাজুক, তাই ওর মত ত্যাড়া মেজায বিবিকে দিয়ে আল্লাহ পাক আমার চিকিৎসা করাচ্ছেন। আরেকটি বিষয় হল আমার বিবির মধ্যে একটা বিশেষ গুণ আমি খুঁজে পেয়েছি। সে আমাকে ছাড়া আর কারও কথা ভাবে না। আমার বিশ্বাস যদি আমি কোন দিন কোন কারণে জেলে যাই, আর এর মধ্যেই দশ-বিশ বছর আঁটকে থাকি, তবুও সে আমার ঘর থেকে বের হয়ে যেতে পারবে না, এই গুণ তো আমার ভিতরে নেই। যখন আমি তার এই গুণের কথা চিন্তা করি, তার প্রতি মুগ্ধ হয়ে যাই যে, আমার সামান্য চারটে ডাল-ভাত খায়, সেই আমার জন্যে তার এত ফিকির।

হযরত থানভী (রহ.) বলেছেন, এই বিবিরা সামান্য একটা কথার ভিত্তিতে সবকিছু ছেড়ে দিয়ে স্বামীর সাথে চলে আসে। সেই কথাটা হল– তাকে বলা হয় অমুকের ছেলের সাথে তোমাকে বিবাহ দিলাম, আর সে বলে কবুল করলাম। ব্যাস এতটুকু কথার পরই সে তার মা-বাপ, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন সব ছেড়ে দিয়ে তোমার কাছে চলে আসে। তোমার কথায় উঠা-বসা করে, তোমার মনোরঞ্জনের চেষ্টা করে, তোমাকে ছাড়া আর কারও চিন্তা করে না। এ বিষয়টা চিন্তা করলে বিবির প্রতি মুগ্ধ হওয়ার জন্য তার মধ্যে আর কোন গুণ থাকার দরকার হয় না। অন্য কোন গুণ থাকলে তো সোনায় সোহাগা। যদি গুণের চেয়ে দোষের পরিমাণ বেশি থাকে, তাহলে মনে করতে হবে যে, আল্লাহ পাক এর মধ্যে কোন না কোন ভাবে আমার ফায়দা রেখেছেন। অন্তত এতটুকু ফায়দা তো হবেই যে, তার উল্টা-পাল্টা দেখে, তার দোষ-ত্রুটি দেখে রাগ আসতে চাইবে, তখন সবর করার সুযোগ সৃষ্টি হবে। প্রতিদিন এরকম হতে হতে সবরের গুণ স্বভাবে পরিণত হয়ে যাবে। আর যদি সত্যিকারভাবে কারও ভিতর সবরের গুণ এসে যায়, তাহলে সে জান্নাতে চলে যেতে পারবে। নবী কারীম (সা.) বলেছেন,

اَلصَّبْرُ ثَوَابُهُ اَلْجَنَّةُ. (البيهقي في شعب الإيمان برقم ٣٦٠٨)

'অর্থাৎ, সবরের পুরস্কার হল জান্নাত'।

ঘরের বিবি উল্টা-পাল্টা হলে এই সবরের গুণ অর্জন করা সহজ হয়। আয়াতের বর্ণনা ভঙ্গি থেকে বুঝা যায় স্ত্রী যেমনই হোক, সর্বাবস্থায় ধৈর্য ধারণপূর্বক তার সাথে ভাল ব্যবহার বজায় রাখতে হবে। এজন্যই বলছিলাম ইসলাম নারীদের অধিকারকে অনেক বড় করে দেখেছে। কারণ সমাজ নারীদের অধিকারের ব্যাপারে সব সময়ই অবহেলা করে থাকে। এই অবহেলা করার পরিণামেই আজ নারীরা তাদের অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলনে নেমে পড়েছে। অথচ ইসলাম নারীদেরকে যেভাবে মূল্যায়ন করেছে, সেভাবে যদি নারীদের সাথে আচরণ করা হত, নারীরা যদি ইসলামকে ভাল করে বুঝত, তাহলে তারা আন্দোলন করে ইসলাম থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করত না, বরং পুরোপুরি ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করতে চাইত।

ইসলামে নারীদেরকে তো রাণীর মত রাখা হয়েছে। নারী শব্দকে উল্টিয়ে দিলে হয় রাণী। আমরা তাদের সাথে আমাদের বর্তমান ব্যবহারকে উল্টিয়ে দিলে অর্থাৎ, যথাযথ ব্যবহার করলে প্রকৃত পক্ষেই তারা রাণী হয়ে যাবে। তারা থাকবে রাণীর হালে। তাদের ভরণ-পোষণ দিবে স্বামী, তাদের ইজ্জত-আব্রু হেফাযতের দায়িত্ব নিবে স্বামী, তাদের জীবনের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিবে স্বামী, তাদের মনোরঞ্জনের দায়িত্ব স্বামীর, সবকিছুই স্বামীর দায়িত্ব। তাদের কোন ঝুক্কি ঝামেলা নেই। সংসার চালানোর কোন পেরেশানী তাদের করতে হবে না। তাহলে কেন তারা রাণীর হালে থাকবে না? কেন তারা অধিকার

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

আদায়ের জন্য আন্দোলন করবে? কীসের জন্য তারা আন্দোলন করবে? তারা আন্দোলন করছে চাকুরীর জন্য, কিন্তু তাদের চাকুরীর প্রয়োজন কী? মানুষ চাকুরী করে ভরণ-পোষণের জন্য। অথচ তাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব স্বামীকে দিয়ে দেয়া হয়েছে। তারা চাকুরী ছাড়াই ঘরে বসে ভরণ-পোষণ পাবে। তাহলে তাদের চাকুরীর কী প্রয়োজন? অতএব কীসের জন্য তারা আন্দোলন করছে?

মহিলারা মনে করছে চাকুরী তাদের অধিকার। অথচ চাকুরী করা অধিকার নয়। এটা হল দায়িত্ব। দায়িত্ব আর অধিকার এই দুটোর মধ্যে তারা পার্থক্য বুঝছে না। তাদের ভরণ-পোষণ হল তাদের অধিকার। চাকুরী ছাড়াই এ অধিকার তাদেরকে দিয়ে রাখা হয়েছে। তাদের ঘাড়ে চাকুরী করার দায়িত্ব চাপানো হয়নি। এটা তাদের জন্য আছানী করা হয়েছে, এভাবে উপার্জনের পেরেশানী থেকে তাদেরকে মুক্তি দেয়া হয়েছে। এটা তাদের প্রতি করুণা করা হয়েছে। অথচ তারা বুঝছে এভাবে তাদের প্রতি জুলুম করা হয়েছে। তারা উল্টো বুঝছে। আমাদের কর্তব্য তাদেরকে সঠিকভাবে তাদের বিষয়টা বোঝানো। ইসলাম নারীদেরকে যে অধিকার দিয়েছে, সে সম্পর্কে তাদেরকে সঠিকভাবে বুঝালে তারা ইসলামের ছায়াতলে ফিরে আসতে আগ্রহী হবে। আমরা তাদেরকে সঠিকভাবে বিষয়টা বুঝাই না, তাদের অধিকার আদায়ে অবহেলা করি, তাই তারা না বুঝের মত অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলন করে। কুরআন হাদীছে নারীদের অধিকারের কথা কত স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ.

অর্থাৎ, তোমাদের উপর নারীদের অধিকার আছে। যেমন তাদের উপর স্বামীদের অধিকার আছে।

এ আয়াতের বর্ণনাভঙ্গি থেকে বুঝা যায় পুরুষরা যেহেতু মনে করে অধিকার শুধু আমাদের, নারীদের কোন অধিকার নেই, তাই আল্লাহ বলেছেন, 'তোমাদের যেমন অধিকার আছে তাদেরও অধিকার আছে', তাদের অধিকারকে খাটো করে দেখ কেন? তাদের অধিকারের দিকে নজর দেওনা কেন? এ আয়াতে নারী-পুরুষ উভয়ের অধিকার সমান–একথা বলা হয়েছে। এরপর বলা হয়েছে,

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

অর্থাৎ, নারীদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব আছে। (বাকারা: ২২৮)

যেহেতু পুরুষদেরকে সমাজ অঙ্গনে কাজ করতে হবে, রাষ্ট্রীয় অঙ্গনে কাজ করতে হবে, তাই তাদের দৈহিক ক্ষমতা, মানসিক ক্ষমতা, তাদের বুদ্ধিমত্তা তুলনামূলকভাবে বেশি দেয়া হয়েছে। তদুপরি পুরুষরা পরিবারের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব বহন করে। এসব কিছুর কারণে পুরুষের কর্তৃত্ব এসে যায়, শ্রেষ্ঠত্ব এসে যায়। এভাবে কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে পুরুষ উপরে, কিন্তু অধিকারের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ উভয়ে সমান। নারীর উপর পুরুষের কর্তৃত্ব থাকার যে কারণ বলা হল এটাই আল্লাহ পাক কুরআন শরীফে উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে,

اَلرِّجَالُ قَوَّمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّ بِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ.

অর্থাৎ, পুরুষগণ নারীদের উপর কর্তৃত্ব করবে, কারণ আল্লাহ কতককে কতকের উপর অর্থাৎ, পুরুষকে নারীর উপর দৈহিক, মানসিক, মেধাগত শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। তদুপরি পুরুষরা নারীদের ভরণ-পোষণের জন্য ব্যয় করে থাকে। (নিছা: ৩৪)

পুরুষদের কর্তৃত্বের কথা শুনলেই নারীরা মনে করে তাদের অধিকার খাটো হয়ে গেল। কিন্তু পূর্বেও বলা হয়েছে অধিকার আর দায়িত্ব-কর্তৃত্ব এক জিনিস নয়। নারীদের অধিকারকে কোথাও খাটো করে

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



দেখা হয়নি, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের অধিকারকে এমন বড় করে দেখা হয়েছে যে, তারা তা শুনলে খুশিতে টগবগ করে উঠবে। যেমন, স্ত্রীর মনোরঞ্জনের দায়িত্ব স্বামীর। স্ত্রীর মনের খুশি ও চাহিদার দিকে স্বামীকে লক্ষ রাখতে হবে। তাই যদি স্ত্রী চায় যে, শ্বশুর শাশুড়ির সঙ্গে একান্নভুক্ত থাকতে আমার ভাল লাগে না, আমি স্বামীকে নিয়ে ভিন্ন হয়ে যেতে চাই তাহলে স্বামীকে তা-ই করতে হবে। স্ত্রীর এরকম চাওয়ার ও বলার অধিকার রয়েছে। এখন কেউ যদি মনে করে, তাহলে শ্বশুর-শাশুড়ির খেদমত করবে কে? এক্ষেত্রে ফেকাহ-র কিতাবে মাসআলা লেখা হয়েছে শ্বশুর-শাশুড়ির খেদমত করার দায়িত্ব পুত্রবধুর নয়, বরং পুত্রের। ছেলে তার মা-বাপের খেদমত করবে। ছেলের উপর মা-বাপের খেদমত করা ওয়াজিব। ছেলের বধুর উপর সেটা ওয়াজিব নয়। ছেলের বধু যদি করে তাহলে সেটা তার অনুগ্রহ। না করলে তাকে সে জন্য জবরদস্তী করা যাবে না। এই মাসআলা শুনলে শ্বশুর শাশুড়ীদের ক্ষোভ লাগবে যে, তাহলে কি আমাদের অধিকার-ই নেই? অবশ্যই আপনাদের অধিকার রয়েছে, কিন্তু আপনাদের ছেলের উপরে, তার বউয়ের উপরে নয়। আপনি পিতা বা মাতা হিসেবে আপনার সন্তানের উপরে আপনার হক রয়েছে। সন্তানের উপরে ওয়াজিব আপনার খেদমত করা। কিন্তু সন্তানের বধু অর্থাৎ, পুত্র-বধুর সেটা দায়িত্ব নয়। সে যদি করে, তাহলে সেটা তার নফল কাজ হবে। তার জন্য আপনি কৃতজ্ঞ থাকবেন। কিন্তু স্বেচ্ছায় না করলে জবরদস্তী করতে পারবেন না।

এমনিভাবে স্বামীর ঘরের কাপড় চোপড় পরিষ্কার করাও স্ত্রীর দায়িত্ব নয়। করলে সেটা তার অনুগ্রহ। স্বামীর রান্না-বান্না করে দেয়াও স্ত্রীর অনুগ্রহ। সে চাইলে স্বামীকে বলে দিতে পারে তোমার মা-বাবা আছে, ভাই-বোন আছে তাদের রান্না-বাড়ার দায়িত্ব আমার নয়, আমি করতে পারব না। এমনকি স্ত্রী যদি খান্দানী মহিলা হয় –যারা রান্না-বান্না করতে অভ্যস্ত নয়– তাদের উপর স্বামীর জন্যও রান্না-বান্না করে দেয়া ওয়াজিব নয়। এরকম স্ত্রীর জন্য স্বামী চাকর-চাকরাণীর ব্যবস্থা করে দিবে। যেহেতু সে খান্দানী মহিলা, সে রান্না-বান্নায় অভ্যস্ত নয়, এটা জেনেই তাকে বিবাহ করেছে, কাজেই তার মনের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে, তার সাধ্যের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। স্ত্রীদের প্রতি এতটা লক্ষ্য রাখতে বলা হয়েছে যে, তারা আত্মীয়-স্বজনের কাছে যেতে চাইলে যেতে দিতে হবে, তাদের মনের মনোরঞ্জনের জন্যই এটা করতে হবে। তাদের মনোরঞ্জনের জন্য একাকী নির্জনে তাদের সঙ্গে (স্বামীদেরকে) কিছু সময় দিতে হবে।

রাসূল (সা.) হযরত আয়েশা (রা.)-এর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করেছেন। বিবি আয়েশার মনোরঞ্জনের জন্যই এটা করেছেন। স্বামীর দায়িত্ব স্ত্রীর মনোরঞ্জন করা। স্বামী যদি স্ত্রীর কাছে সর্বক্ষণ সময় দিতে না পারে তাহলে স্ত্রীর কাছে এমন কোন মহিলার আসা যাওয়া বা রাখার ব্যবস্থা করবে, যার দ্বারা স্ত্রী একাকিত্বের কষ্ট থেকে মুক্তি পায়।

এভাবে নারীদের জন্য ইসলাম এমনসব অধিকার রেখেছে, যা জানলে নারী সমাজ খুশিতে টগবগ করে উঠবে। ইসলাম নারীকে অনেক অধিকার দিয়েছে। কিছু দায়িত্বও দিয়েছে। স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই একে অপরের উপর অধিকারও রয়েছে, একের জন্য অপরের করণীয়ও রয়েছে। ইনশাআল্লাহ এ সম্পর্কে আগামীতে আরও আলোচনা করা হবে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে বলার ও জানার তাওফীক দান করুন। আমীন!

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বয়ান নং ২৪-এর খুতবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰی وَجَعَلَ الْحُبَّ وَالْمَوَدَّةَ فِی الْقُلُوْبِ، وَشَرَعَ لِلْاَزْوَاجِ حُقُوْقًا اَدَانُهَا مَطْلُوْبٌ وَمَرْغُوْبٌ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِیْكَ لَهٗ شَهَادَةً صَادِرَةً مِنْ عَمِیْقِ الْقُلُوْبِ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَیِّدَنَا وَنَبِیَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهُ الْمُخْبِرُ مِنْ عَلَّامِ الْغُیُوْبِ، وَهُوَ الْحَبِیْبُ الْمَحْبُوْبُ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ مَا تَعَاقَبَ الطُّلُوْعُ وَالْغُرُوْبُ.

اَمَّا بَعْدُ :

اَیُّهَا النَّاسُ ! اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی خَلَقَ النَّاسَ ذُكْرَانًا وَّاُنْثٰی وَجَعَلَهُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِیَتَعَارَفُوْا، وَخَلَقَ مِنْ اَنْفُسِ الْاِنْسَانِ اَزْوَاجًا لِّیَسْكُنُوْا، وَجَعَلَ بَیْنَهُمْ مَوَدَّةً وَّرَاْفَةً لِیَتَحَابُّوْا. قَالَ تَعَالٰی : وَمِنْ اٰیَاتِهٖ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْا اِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. وَلِهٰذِهِ السُّكُوْنَةِ وَالْمَوَدَّةِ، تَلْزَمُ مُرَاعَاةُ الْحُقُوْقِ فِیْمَا بَیْنَ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ . فَاَدُّوْا حُقُوْقَ زَوْجَاتِكُمْ، وَلَا تَلْتَفِتُوْا اِلٰی عَدَمِ مَبَالَاتِهِنَّ حُقُوْقَكُمْ. وَاسْتَوْصُوْا بِهِنَّ خَیْرًا یَكُنْ خَیْرًا لَّكُمْ. وَتَذَكَّرُوْا مَا قَالَ نَبِیُّكُمْ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِیْ اَثَرَةً وَاُمُوْرًا تُنْكِرُوْنَهَا. قَالُوْا فَمَاذَا تَاْمُرُنَا یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ : تُؤَدُّوْنَ الْحَقَّ الَّذِیْ عَلَیْكُمْ وَتَسْاَلُوْنَ اللّٰهَ الَّذِیْ لَكُمْ.

اَلَا یَا عِبَادَ اللّٰهِ ! اِنَّ النِّسَاءَ رَعِیَّةٌ لَّكُمْ، وَكُلُّ رَاعٍ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِیَّتِهٖ. قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِیَّتِهٖ، فَالْاِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِیَّتِهٖ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِیْ اَهْلِهٖ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



رَعِیَّتِهٖ. اَلْحَدِیْثُ. رَوَاهُ الْبُخَارِیُّ وَمُسْلِمٌ. فَلَا تَغْفُلُوْا عَنْ اِصْلَاحِ النِّسْوَةِ، وَاَمْسِكُوْا فِیْ ذَالِكَ عَنِ الشِّدَّةِ، فَاِنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضَلْعٍ. فَاِنْ ذَهَبْتَ تُقِیْمُهٗ كَسَرْتَهٗ وَاِنْ تَرَكْتَهٗ لَمْ یَزَلْ اَعْوَجَ. فَلَا تَتَكَاسَلُوْا وَلَا تَشَدَّدُوْا، بَلْ اِبْتَغُوْا بَیْنَ ذَالِكَ سَبِیْلًا. وَلَا تَنْسَوْا عَنْ حُقُوْقِهِنَّ. فَلَهُنَّ مِنَ الْحُقُوْقِ عَلَیْكُمْ مِثْلَ الَّتِیْ لَكُمْ عَلَیْهِنَّ. قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی : وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِیْ عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ. نَعَمْ اِنَّ لِلْاَزْوَاجِ تَفَوُّقًا فِی الْعَقْلِ وَالْحِلْمِ وَقُوَّةِ الْجِسْمِ وَغَیْرِ ذَالِكَ، فَعَلَی الزَّوْجَةِ مُرَاعَاةُ ذَالِكَ. وَاَشَارَ اِلَیْهِ تَعَالٰی فِیْ قَوْلِهٖ : وَلِلرِّجَالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ، وَاللّٰهُ عَزِیْزٌ حَكِیْمٌ. وَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی : اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَی النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰی بَعْضٍ وَّبِمَا اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ. فَالصَّالِحَاتُ قٰنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ. وَعَلَیْكُمْ اَیُّهَا الْاَزْوَاجُ اَلصَّبْرُ لِمَا اَصَابَكُمْ مِنَ الْاَذٰی عَنْهُنَّ، فَاِنَّمَا الصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ . وَعَلَیْكُمُ التَّسَامُحُ اِذَا مَا رَاَیْتُمْ فِیْهِنَّ مِنَ الْقُصُوْرِ وَ الْمَعَائِبِ ، نَظْرًا اِلٰی مَا فِیْهِنَّ مِنَ الْمَحَاسِنِ . قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : لَا یَفْرُكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، اِنْ كَرِهَ مِنْهَا شَیْئًا رَضِیَ مِنْهَا بِاٰخَرَ.

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ : وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ، فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰی اَنْ تَكْرَهُوْا شَیْئًا وَّیَجْعَلَ اللّٰهُ فِیْهِ خَیْرًا كَثِیْرًا.

بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِی الْقُرْاٰنِ الْعَظِیْمِ، وَنَفَعَنَا وَاِیَّاكُمْ بِالْاٰیَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِیْمِ. اَقُوْلُ قَوْلِیْ هٰذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ لِیْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِیْنَ وَاسْتَغْفِرُوْهُ، اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ.

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বয়ান নং -২৫

## স্বামী-স্ত্রীর অধিকার (২য় পর্ব)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰىهُ اللّٰهُ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَآ اٰتٰىهَا. وَقَالَ تَعَالٰى: وَ الّٰتِىْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَ اهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَ اضْرِبُوْهُنَّ. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَوْ كُنْتُ اٰمِرُ اَحَدً اَنْ يَّسْجُدَ لِاَحَدٍ لَاَمَرْتُ الْمَرْاَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

গত জুমুআয় স্বামী-স্ত্রীর অধিকার কী, স্বামী-স্ত্রীর একে অপরের জন্য কী করণীয় এ সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করা হয়েছিল। স্ত্রীর অধিকারের মধ্যে একটা বিশেষ বিষয় হল– তার ভরণ-পোষণ দেয়া স্বামীর দায়িত্ব। এটা যে স্বামীর দায়িত্ব, তা আমরা সকলেই জানি বুঝি। কিন্তু আমরা অনেকে জানি না যে, হালাল উপার্জন দ্বারা ভরণ-পোষণ না দিলে এ দায়িত্ব আদায় হবে না। হালাল জীবিকা দ্বারাই পরিবারের ভরণ-পোষণ হতে হবে। হারাম জীবিকা দ্বারা পরিবারের ভরণ-পোষণ দিলে দুই রকম গোনাহ হয়। এক হল পরিবারের ভরণ-পোষণের যে দায়িত্ব ছিল, হারাম দ্বারা ভরণ-পোষণ দিলে সে দায়িত্ব পালন হবে না, কাজেই গোনাহ হবে। হারাম দ্বারা যত ভালই খাওয়াই, যত ভালই পরিধান করাই, যত আরাম দায়ক বাসস্থানেই রাখি, কিন্তু তাতে আমার দায়িত্ব আদায় হবে না। স্ত্রীর অধিকার ছিল হালাল জীবিকা দ্বারা ভরণ-পোষণ পাওয়ার, যাতে সে হারামে পতিত না হয়। হারাম দ্বারা তার জীবিকা দেয়ায় তার এই অধিকার আমি নষ্ট করলাম। এ হল এক গোনাহ্। আরেক গোনাহ হল আমি যে হারাম উপার্জন করলাম তার গোনাহ্। কাজেই স্ত্রী এবং পরিবারের চাহিদা মেটানোর জন্য, তাদের হরেক রকম দাবী মেটানোর জন্য অবৈধ পন্থায় জীবিকা উপার্জন করা, হারাম তরীকায় আয় উপার্জন করার অবকাশ নেই। শরীআত কোনোভাবে তার অনুমতি দিবে না। যদি আমার সচ্ছলতা না থাকে তাহলে তাদের সব বৈধ দাবীও পূরণ করা আমার উপর জরুরী নয়, যা থাকবে তা-ই ব্যয় করব। এটাই আমার কর্তব্য। সাধ্যের বাইরে কোন চাপ নেই। কুরআনে কারীমে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন,

لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰىهُ اللّٰهُ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَآ اٰتٰىهَا.

'অর্থাৎ, যার সচ্ছলতা যেমন, সে তেমন ব্যয় করবে। যার জীবিকা সীমিত, আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন সে তা-ই ব্যয় করবে। আল্লাহ কাউকে যা দিয়েছেন, তার বাইরে কোন চাপ দেন না'। (তালাক: ৭)

এ আয়াত থেকে বুঝা যায়- সাধ্য অনুযায়ী পরিবারের জন্য ব্যয় করতে হবে। সাধ্যের বাইরে আল্লাহ চাপ দেন না। সাধ্যের ভিতরে যতটুকু সম্ভব দিতে হবে। সাধারণভাবে পরিবারের যতটুকু না হলে নয় ততটুকু দেয়ার সাধ্য আল্লাহ পাক দিয়েই থাকেন। এরকম খুব কম দেখা যায় যে, কেউ হালাল পথে থাকলে এবং আল্লাহর কাছে চাইলে আল্লাহ তাকে একেবারেই অক্ষম করে রাখেন। তবে হ্যাঁ নিত্য প্রয়োজনের বাইরে ডজন ডজন শাড়ী দিতে হবে, নানান রকম অলংকারপাতি দিতে হবে, এতটা না-ও হতে পারে। যারা হালাল উপায়ে থাকতে চায়, তাদের অধিকাংশের ক্ষেত্রেই দেখা যায় আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়াতে মোটামুটি চালিয়ে নেন, খুব বেশি সম্পদ দেন না। তাদের জন্য আখেরাতেই সব জমা রাখেন।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



তবে দুই একজন ব্যতিক্রম হয় তাদেরকে আল্লাহ পাক দুনিয়াতেও অনেক সম্পদ দিয়ে থাকেন। যাহোক যে অবস্থায়ই হোক পরিবারের প্রয়োজনের অতিরিক্ত দাবী দাওয়া পূরণ করা গৃহকর্তার দায়িত্ব নয়। প্রত্যেক ঈদ আসলে নতুন-নতুন কাপড়-চোপড় দিতে হবে, বিবাহ-শাদী ইত্যাদি অনুষ্ঠান আসলে নতুন-নতুন কাপড়-চোপড়, নতুন-নতুন গয়না-সাজনা দিতে হবে এটাও দায়িত্ব নয়। বরং এই মানসিকতাই ভাল নয় যে, নতুন নতুন অনুষ্ঠান আসলেই প্রত্যেকবার নতুন-নতুন শাড়ী-গয়না চাই। আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি বেড়াতে গেলে প্রত্যেকবার আমার নতুন-নতুন সেট চাই, এই মানসিকতাই ভাল নয়। নারীদের মনোভাব এই থাকতে হবে যে, আমার সাজ-গোজ যা কিছু করার আমি ঘরে করব, যা কিছু দেখানোর স্বামীকে দেখাব, বাইরের লোককে নয়। কিন্তু সাধারণত দেখা যায় মহিলাদের মানসিকতা হল এর উল্টো। ঘরে স্বামীর কাছে থাকে বিধবার মত আর বাইরে যাওয়ার সময় সাজ-গোজের বাহার কে দেখে! যেন বাইরের লোকদেরকে সৌন্দর্য দেখানোর জন্য যাচ্ছে। অথচ কুরআন শরীফে এটা নিষেধ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

وَ لَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى.

অর্থাৎ, তোমরা জাহিলী যুগের নারীদের মত সৌন্দর্য প্রদর্শনের জন্য বের হয়ো না। (আহ্যাব: ৩৩)

বুঝা গেল বাইরে সাজ-গোজ করে যাবে না। বাইরে যাবে সিম্পল। যাতে পর পুরুষের নজর পড়ে গেলেও পরপুরুষের নজর খারাপ না হয়। কিন্তু মহিলারা চলছে উল্টো। তারা বাইরে খুব সাজ-গোজ করে যায়, যার ফলে পরপুরুষের নজর খারাপ হয়। আবার ঘরে সাজ-গোজ না করার কারণে স্বামী ঘরে এসে দেখে বিবির রূপসৌন্দর্য কিছুই নেই, তখন বাইরে যেয়ে অন্য নারীদের রূপসৌন্দর্যের প্রতি সে আকর্ষণবোধ করে। এভাবে স্বামীরও নজর খারাপ হয়।

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অধিকার হল- স্ত্রী স্বামীর উদ্দেশ্যে ঘরে সাজ-গোজ করে থাকবে। স্বামীর এই অধিকার খুব শক্ত অধিকার। এমনকি ফেকাহ্র কিতাবে মাসআলা বলা হয়েছে– যত কারণে স্বামী স্ত্রীকে মারধর করতে পারে, তার ভিতরে এটাও একটা। স্ত্রী যদি ঘরে সাজ-গোজ করে না থাকে, তাহলে স্বামী এর জন্য স্ত্রীকে মার দিতে পারে। স্বামীর মনোরঞ্জন বৈবাহিক জীবনের একটা বড় উদ্দেশ্য। স্ত্রী ঘরে সাজ-গোজ করে না থাকলে স্বামীর মনোরঞ্জনে ব্যাঘাত ঘটবে, এভাবে বৈবাহিক জীবনের একটা বিরাট ক্ষতি সাধিত হবে। তাই শরীআত এ বিষয়টাকে শক্ত করে দেখেছে। স্বামী স্ত্রীকে আরও যেসব কারণে মার দিতে পারে, তার মধ্যে রয়েছে যদি স্ত্রী শরীআত সম্মতভাবে না চলে। স্বামী পর্দায় চলতে বলে অথচ সে পর্দায় চলে না, স্বামী নামায পড়তে বলে, রোযা রাখতে বলে, অথচ সে নামায পড়ে না, রোযা রাখে না, তাহলেও স্বামী তাকে মার দিতে পারবে। কিন্তু আমাদের সমাজে দেখা যায়, এসব কারণে কোন স্বামী কোন স্ত্রীকে মারে না। মারে যতসব আজে বাজে কারণে। যেখানে মারার কথা বলা হয়নি, সেখানে মারে। তরকারীতে লবণ একটু কম হল কেন, মার দিয়ে বসে, টাইম মত রান্না হল না কেন মার দিয়ে বসে। শরীআতের খেলাফ করার কারণে তাকে মার দেয় না, বরং শরীআত না মানার জন্য চাপ দেয়। বন্ধু-বান্ধবের সামনে যাওয়ার জন্য, তাদের সাথে কথা-বার্তা বলার জন্য চাপ দেয়। না মানলে স্ত্রীকে মার দেয়। যার কারণে এসব মারে ভাল ফল হয় না বরং খারাপ ফল হয়। যদি শরীআত মানানোর জন্য মার দেয়া হতো, তাহলে স্ত্রীর মনে খারাপ আছর পড়ত না; বরং সে ভাবত আমি নামায পড়ি না, তাই আমাকে মার দিয়েছে, কোন খারাপ উদ্দেশ্যে মার দেয়নি, আমার ভালর জন্যই তিনি এটা করেছেন, এতে করে আরও মহব্বত বাড়তো। ঘরে সাজ-গোজ না করার কারণে মার দিলেও তার মন খারাপ হতো না। সে ভাবত আমার খারাপের জন্য তো এটা করা হয়নি। দেখা গেল শরীআত যেখানে মারার

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

অনুমতি দেয়নি, সেখানে মারলে খারাপ আছর হয়, আর শরীআত যেখানে মারার অনুমতি দিয়েছে, সে মারের দ্বারা খারাপ আছর হয় না বরং ভাল আছর হয়।

তবে এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে। তা হল যেসব ক্ষেত্রে স্ত্রীকে মারার অনুমতি দেয়া হয়েছে, এই মারার অর্থ গরুপেটা করা নয়, এটা হল সামান্য চড়-থাপ্পড় বা রশি দিয়ে কিংবা কাপড় পেচিয়ে তার দ্বারা বা মেসওয়াক দ্বারা হালকা একটু আঘাত করা, যাতে তার আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগে এবং তার সংশোধন হয়ে যায়। কিন্তু অনেকে এটা না বুঝে বলে যে, ইসলাম নারীকে নির্যাতন করার অনুমতি দিয়েছে। যাহোক যে কথা বলছিলাম নারী সাজ-সজ্জা করবে ঘরে। বাইরের জন্য সাজ-সজ্জা করবেই না। কাজেই বাইরের অনুষ্ঠানে যাওয়ার সাজের জন্য নতুন নতুন শাড়ী গয়না দিতে হবে এর প্রশ্নই উঠবে না, এটা পুরুষের কোন দায়িত্বই নয়।

নারীদের বাইরে যাওয়ার ব্যাপারে আরও একটা কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে। তাহল প্রয়োজন হলে তারা বাইরে যেতে পারবে, কিন্তু অবশ্যই শরীআত সম্মত পর্দা করে যেতে হবে। পর্দা করা ফরয। আমরা অনেক ভাই আছি যারা দ্বীনদার বলে পরিচিত। তারা নামায পড়ি, রোযা রাখি, হজ্জ করি, যাকাত দেই, আরও অনেক দ্বীনদারির কাজ করি। কিন্তু বিবিকে পর্দায় রাখা ফরয, এ বিষয়টাকে আমরা অমান্য করে চলেছি। বিবি পর্দা লঙ্ঘন করলে ফরয তরকের কারণে তার যেমন কবীরা গোনাহ হবে, আমি স্বামী বা গার্জিয়ান হয়ে তাকে এটা করতে দিলে আমার কবীরা গোনাহ হতে থাকবে। আমরা দ্বীনদার হওয়ার দাবী করি, কিন্তু এই বিষয়টা আমরা জানি না, অনেকে বুঝতেই চাই না। আল্লাহ পাক আমাদেরকে সহীহ বুঝ নসীব করুন।

বিনা প্রয়োজনে মহিলাকে বাইরে যেতে দেয়া বন্ধ করতে হবে। শরীআত সম্মত প্রয়োজন থাকলে তারা বাইরে যাবে, আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে যাওয়ার অধিকার তাদের আছে, প্রয়োজনে সেখানে যাবে, কিন্তু মার্কেটে ঘোরা, পার্কে ঘোরা, এই অধিকার তাদেরকে দেয়া হয়নি। যেখানে গেলে তাদের দ্বীনী মন-মানসিকতা নষ্ট হবে, দ্বীনের চেতনা নষ্ট হবে, পর্দা লঙ্ঘন হবে, সেখানে যাওয়ার অধিকার তাদেরকে দেয়া হয়নি। সেখানে যাওয়া বন্ধ করে দিতে হবে। এই নিয়ম পালন করলে এত রূপ-চর্চা করার জন্য, এত সাজ-সজ্জা করার জন্য এত দাবী তাদের থেকে উঠবে না। নানান রকম শাড়ী দাও, নানান রকম গয়না দাও, এসব দাবী কমে আসবে। বাইরে নানা রকম অনুষ্ঠানে যাওয়া থেকেই তাদের মধ্যে বিভিন্ন চাহিদা সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যেয়ে তারা দেখে অনেকের বিবিরা নতুন নতুন দামী দামী শাড়ী পরে এসেছে, নানা রকম গয়না পরে এসেছে। কত জাক-জমক করে এসেছে। এসব দেখে তাদের ভিতরে ঐসব পাওয়ার জযবা সৃষ্টি হয়। তাদের মনে স্টান্ডার্ড বাড়ানোর চিন্তা ঢোকে। অনেক সময় বেদ্বীন লোকদের পরিবেশে যেয়ে বদ দ্বীনী চেতনাও তাদের মধ্যে ঢুকে পড়ে। তখন ঘরে এসে স্বামীর কাছে, গার্জিয়ানের কাছে নানান রকম বায়না ধরতে থাকে। স্বামীকে, গার্জিয়ানকেও তারা বিভ্রান্ত করে ফেলে।

এ জন্য শরীআতে নিয়ম রাখা হয়েছে- পরিবারের সদস্যদেরকে দ্বীনদার বানাতে চাইলে, দ্বীনদার রাখতে চাইলে, দ্বীনদার মানুষের কাছে তাদেরকে বেশি বেশি পাঠাতে হবে, বে-দ্বীন লোকদের কাছে, বে-দ্বীন লোকদের পরিবেশে তাদেরকে পাঠানো থেকে বিরত থাকতে হবে। আমি গরীব হয়ে থাকলে আমার বিবিদেরকে, আমার পরিবারের সদস্যদেরকে ধনীদের কাছে, ধনীদের বাসায় বেশি পাঠানো ঠিক নয়। কারণ তাদের কাছে গেলে ওদের মনে হবে আমাদের অনেক কিছু নেই, আমাদের বাপ, আমাদের স্বামী আমাদেরকে এগুলো দেয়নি। এদের কতকিছু আছে আমাদের কিছুই নেই। এভাবে একদিকে তাদের মনে স্টান্ডার্ড বাড়ানোর চিন্তা ঢুকতে থাকবে, আর একদিকে স্বামীর প্রতি বা গার্জিয়ানের প্রতি না

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com



শুকরী আসতে থাকবে। এমনিতেই স্বামীর না শুকরী করার একটা স্বভাব মহিলাদের মধ্যে আছেই, এর পরেও যদি এরকম পরিবেশে যায়, তাহলে না শুকরীর মাত্রা আরও বাড়তে থাকবে। এমনিতেই নাচুনে বুড়ি তারপর যদি পায় ঢোলের বাড়ি।

মহিলাদের না শুকরীর মনোভাব প্রসঙ্গে এক হাদীছে এসেছে, একবার রাসূল (সা.) মহিলাদের এক মজলিসে ওয়াজ করছিলেন। ওয়াজের এক পর্যায়ে বললেন,

يَامَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ، فَإِنِّيْ رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ.

'অর্থাৎ, হে মহিলারা! তোমরা বেশি বেশি করে দান-সদকা কর। কারণ জাহান্নামে দেখেছি তোমাদের মহিলাদের সংখ্যা বেশি। দান-সদকার কারণে তোমাদের পাপ মোচন হবে। এভাবে তোমরা জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাবে'। তখন এক বুদ্ধিমতী মহিলা জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা নারীরা জাহান্নামে সংখ্যায় বেশি থাকব, তার কারণ কী? তখন রাসূল (সা.) বললেন,

تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ. (صحيح البخاري برقم ١٤٦٢)

'অর্থাৎ, তার বিশেষ দুটো কারণ- এক হল তোমরা বেশি বেশি অভিশাপ দাও। আর এক হল তোমরা স্বামীর না শুকরী কর'।

বাস্তবেও আমরা দেখতে পাই মহিলাদের মধ্যে এই দুটো বদ-অভ্যাস খুব বেশি। এক হল তারা মানুষকে খুব বেশি অভিশাপ দেয়। কথায় কথায় অভিশাপ দেয়। এমনকি যে সন্তানকে তারা এত বেশি আদর করে, কথায় কথায় তাদেরকেও অভিশাপ দেয়। তুই মর, তোর মওত হয় না? আজরাঈল তোকে চোখে দেখে না? তোর কলেরা হোক, যক্ষা হোক, মরতে পারিস না? এইসব ভাষায় অভিশাপ দিতে থাকে। এরকম অভিশাপ দেয়া মহিলাদের একটা বদ-অভ্যাস। আর একটা বদ-অভ্যাস হল- স্বামীর না শুকরী করা। একজন স্বামী সারা জীবন তার স্ত্রীকে পছন্দসই কাপড়-চোপড় দিবে, এরপর কোন একবার যদি আর্থিক টানা-টানি বা কোন কারণে এমন কিছু দিল যা স্ত্রীর পছন্দ হল না, ব্যস বলে বসবে জীবনে কোনোদিন পছন্দসই কিছু দিলে না, সারা জীবন এই রকম বাজে জিনিস দাও, যা কোন মানুষের রুচিতে ধরে না। অথচ সারা জীবন সে বলে এসেছে খুব সুন্দর হয়েছে, খুব পছন্দ হয়েছে! এই একবারের কারণে সবটার না শুকরী করবে। রাসূল (সা.)ও হাদীছে বলেছেন,

لَوْ اَحْسَنْتَ اِلٰى اِحْدٰهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَاَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَاَيْتُ خَيْرًا مِّنْكَ قَطُّ. (صحيح البخاري ٢٩)

'অর্থাৎ, সারা জীবন যদি তাদের কারও প্রতি ভাল সবকিছু কর, তারপর একবার কোন কিছু তার মনপুত না হয়, তাহলে বলে বসবে জীবনে কোনোদিন তোমার থেকে ভাল কিছু পেলাম না'।

এই না শুকরীর মনোভাব থেকে আল্লাহর নেয়ামতের না শুকরী পয়দা হবে। মানুষের না শুকরী করার মনোভাব থেকে আল্লাহ পাকের না শুকরী করার মনোভাব এসে যাবে। বান্দা আমাকে সারা জীবন কী দিল তা দেখলাম না বরং একবার কী দিল না তাই দেখলাম এ থেকে এই অভ্যাস আসবে যে, আল্লাহ আমাকে কত নেয়ামত দিয়েছেন, সেগুলো দেখব না, বরং শুধু কী দেননি সেটা দেখব। এর থেকেই আল্লাহর না শুকরী আসবে। এভাবে বান্দার না শুকরী করলে আল্লাহর না শুকরী এসে যায়। হাদীছে এসেছে,

لَايَشْكُرُ اللّٰهَ مَنْ لَّا يَشْكُرُ النَّاسَ. (سنن ابي داؤد برقم ٤٨١٣ والحديث صحيح)

অর্থাৎ, যে মানুষের শোকর আদায় না করে, সে আল্লাহর শোকরও আদায় করতে পারে না।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

না শুকরী করা মারাত্মক গোনাহ, কবীরা গোনাহ্। আল্লাহর না শুকরী করাও কবীরা গোনাহ, বান্দার না শুকরী করাও কবীরা গোনাহ্। যাহোক রাসূল (সা.) বললেন, 'তোমাদের মহিলাদের ভিতরে দ্বিতীয় দোষ হল মহিলাদের ভিতরে না শুকরীর স্বভাব আছে'। এমতাবস্থায় তাদেরকে যদি আমরা ধনী লোকদের পরিবেশে পাঠাই, বিলাসী দুনিয়াদার লোকদের পরিবেশে পাঠাই, তাহলে ওদের নায-নেয়ামত দেখে মহিলাদের মধ্যে আরও অভাববোধ সৃষ্টি হবে, না শুকরির মনোভাব আরও বেড়ে যাবে। আস্তে আস্তে বলতে শুরু করবে, এটা দাও, ওটা দাও। যখন স্বামী-গার্জিয়ান সেগুলো দিতে পারবে না, তখন আরও শক্ত কথা বলবে, আস্তে আস্তে স্বামীর নাফরমান হয়ে উঠবে, স্বামীর মাথায় চড়ে বসবে। এভাবে পরিবারে অশান্তি সৃষ্টি হবে।

পরিবারের কর্তাকে লক্ষ রাখতে হবে কোনভাবেই যেন স্ত্রী বা ছেলে-মেয়ে কেউ মাথায় চড়ে যেতে না পারে। পারিবারিক শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্যই এটা খেয়াল রাখতে হবে। যদি স্ত্রী বা ছেলে-মেয়ে মাথায় চড়ে যায়, তাহলে এক দিকে পরিবারের শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট হবে, আরেক দিকে তাদেরকে বে-আদব বানানো হবে। স্ত্রীকে বে-আদাব বানানো যাবে না। স্বামীর সাথে স্ত্রীর শুধু মহব্বত ভালবাসার সম্পর্ক নয়, আদব তা'যীমের সম্পর্ক থাকতে হবে। স্বামী স্ত্রীকে মহব্বত করবে, ভালবাসবে, স্ত্রীও স্বামীকে মহব্বত করবে ভালবাসবে। সাথে সাথে স্ত্রী স্বামীর সম্মানও রক্ষা করবে। এটা স্বামীর অতিরিক্ত প্রাপ্য। স্ত্রীকে স্বামীর আদব সম্মান রক্ষা করে চলতে হবে। স্ত্রীর কাছে স্বামীর এতটা আদব সম্মান প্রাপ্য যে, রাসূল (সা.) এক কথায় বলেছেন,

لَوْ كُنْتُ اٰمِرُ اَحَدًا اَنْ يَّسْجُدَ لِاَحَدٍ لَاَمَرْتُ الْمَرْاَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا. (سنن الترمذي برقم ١١٥٩، حسن غريب)

অর্থাৎ, আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকে সাজদা করা জায়েয নেই। কোন মানুষ কোন মানুষকে সাজদা করতে পারবে না। যদি কোন মানুষকে হুকুম দিতাম অন্য কোন মানুষকে সাজদা করার, তাহলে একমাত্র স্ত্রীকে হুকুম দিতাম সে তার স্বামীকে সাজদা করবে।

এ হাদীছের দিকে তাকালে বুঝা যায়-আল্লাহ, আল্লাহর রাসূলের পরে স্ত্রীর কাছে সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধা পাবে স্বামী। কাজেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে শুধু মহব্বত ভালবাসার সম্পর্ক নয়। স্ত্রী স্বামীর আদব তা'যীমও রক্ষা করে চলবে। এ জন্যেই স্ত্রীর প্রতি হুকুম হল, সে তার স্বামীর নাম ধরে ডাকতে পারবে না। তবে প্রয়োজন হলে নাম বলতে পারবে। গ্রাম দেশের মহিলাদের মত নয় যে, প্রয়োজন হলেও নাম বলবে না। বরং বলবে অমুকের বাপ, আমাদের বাড়ির উনি, এরকম নয়। নাম বলা নিষেধ নয়, নাম ধরে ডাকা নিষেধ। নাম বলা আর নাম ধরে ডাকা এক কথা নয়। স্বামীর নাম ধরে ডাকা নিষেধ, কারণ এটা স্বামীর আদবের খেলাফ। স্বামী স্ত্রীর মুরুব্বী। তাই মুরব্বী হিসেবে স্বামীর আদব রক্ষা করতে হবে।

সব মুরুব্বীদের সাথেই আদব রক্ষা করতে হবে। বয়সের মুরুব্বী, হোক বা ইল্‌মের মুরুব্বী হোক, বা দ্বীনী মুরুব্বী হোক কারও নাম ধরে ডাকা নিষেধ। স্ত্রীরাও এরকম স্বামীর নাম ধরে ডাকতে পারবে না। যখন স্বামীর সাথে এক সাথে হাটবে বা চলবে, পিছনে পিছনে থাকবে। যেমন মুরুব্বীদেরকে সামনে রেখে হাটতে হয়। যিনি আমার বয়সে মুরুব্বী কিংবা ইল্‌ম কালামে মুরুব্বী, চলার সময় তাকে আমি সামনে রাখব, আমি পিছনে থাকব। মুরুব্বীদের সাথে যেমন রুক্ষস্বরে কথা বলা যায় না, জোর আওয়াজে কথা বলা যায় না, ঝাঝালো সুরে কথা বলা যায় না। স্বামীর সাথেও স্ত্রী এগুলো করতে পারবে না। স্বামীর সাথে ঝাঝালো সুরে কথা বলতে পারবে না। চড়া গলায় কথা বলতে পারবে না। মাথা উঁচু

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com



করে কথা বলতে পারবে না। এগুলো হল ইসলামের শিক্ষা দেয়া আদব। স্ত্রীকে এই সমস্ত আদব রক্ষা করতে বলা হয়েছে। এগুলো দ্বারাই পারিবারিক শৃঙ্খলা রক্ষা পাবে।

ইসলাম পারিবারিক শৃঙ্খলা রক্ষার শিক্ষাও দিয়েছে। স্ত্রী স্ত্রীর মত চলবে, ছেলে-মেয়ে ছেলে-মেয়ের মত চলবে, যার যেমন খুশি সে তেমন চলবে-ইসলাম এরকম পরিবারের কথা বলেনি। পরিবারের ছোটরা বড়দের আদব তা'যীম রক্ষা করবে, স্ত্রীও স্বামীর আদব-তা'যীম রক্ষা করে চলবে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসাও থাকবে, আদব-তা'যীমও থাকবে। ভালবাসা আর আদব-তা'যীম-এই দুটোর ভিতরে সমন্বয় করে চলতে হবে। স্বামী স্ত্রীকে আদর করবে ভালবাসবে, তবে ভালবাসায় এতটা ডুবে যাবে না যে, স্ত্রীকে শাসনই করতে পারবে না। আদর স্নেহ করবে, ভালবাসবে আবার শাসনও করবে। আবার স্ত্রীও স্বামীকে ভালবাসবে সাথে সাথে আদব তা'যীমও রক্ষা করে চলবে। দুটোর ভিতরে সমন্বয় করে চলবে। স্ত্রীকে এত ভালবাসা কাম্য নয় যে, তাকে শাসন-ই করতে পারবে না। ভালবাসার সাথে সাথে শাসনও করতে বলা হয়েছে। স্ত্রীকে শাসন করাও স্বামীর কর্তব্য। যাতে সে বে-লাইন হয়ে না যায়, যাতে সে বে-আদব হয়ে না যায়।

স্ত্রীকে কীভাবে শাসন করতে হবে, তার পদ্ধতিও কুরআন শরীফে বলে দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

وَ الّٰتِیْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَ اهْجُرُوْهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَ اضْرِبُوْهُنَّ.

অর্থাৎ, তোমরা যে সমস্ত নারীদের অবাধ্য হওয়ার ও মাথায় চড়ে যাওয়ার আশংকা কর, যখন এরকম পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে যায়, তখন তোমরা তাদেরকে শাসন কর।

এ আয়াতে শাসন করার তিনটা পদ্ধতি বলে দেয়া হয়েছে। এক নম্বর-তাদেরকে উপদেশ দিয়ে বুঝাও। একটু অন্যায় করলেই সাথে সাথে ধরে মার পিট শুরু করে দিবে এই শিক্ষা দেয়া হয়নি। বরং প্রথম নম্বরে তাদেরকে ভাল কথা বলে, উপদেশ দিয়ে ভাল বানানোর চেষ্টা করতে বলা হয়েছে। দ্বিতীয় নম্বরে বলা হয়েছে উপদেশের পদ্ধতিতে কাজ না হলে, তাদের সাথে মেলামেশাটা বন্ধ করে দাও, এক বিছানায় থেকেও তাকে আলাদা করে দাও অর্থাৎ, এক বিছানায় থাক, কিন্তু অন্য দিকে পিঠ ফিরিয়ে শুয়ে থাক। অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে শুয়ে থাক, তাহলে তার আত্মমর্যাদাবোধ থাকলে তার আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগতে পারে, এভাবে তার সংশোধন হয়ে যেতে পারে। স্বামী তার স্ত্রী সম্পর্কে বুঝতে পারবে যে, এভাবে তার সংশোধন হওয়া সম্ভব কি-না। এভাবে যদি কাজ না হয় তৃতীয় নম্বরে বলা হয়েছে তাদেরকে কিছুটা মারধর করে সংশোধন করার চেষ্টা কর। মুফাসসিরীনে কেরাম বলেছেন, এই আয়াতে যে তিনটা পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে, যে সিরিয়ালে বলা হয়েছে, সে ভাবেই করতে হবে। প্রথম পর্যায়ে উপদেশ, দ্বিতীয় পর্যায়ে বিছানায় ত্যাগ, তৃতীয় পর্যায়ে যেয়ে মার হবেরূ পূর্বেও বলা হয়েছে এই মার অর্থ গরুপেটা করা নয়। নারীদের প্রতি নির্যাতন করার অনুমতি ইসলামে দেয়া হয়নি। এরকম নির্যাতনের পর্যায়ে মার নয়। কী রকম মার হবে সে সম্পর্কেও হাদীছে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। হাদীছে বলা হয়েছে,

وَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ. (رواه الترمذي في سننه برقم ٣٠٨٧ وقال حسن صحيح)

অর্থাৎ, এরকম মার যে শরীরে কোন দাগ পড়তে পারবে না। খুব জোরে মার দিতে পারবে না। রাসূল (সা.) বলেছেন,

لَا يَجْلِدُ اَحَدُ كُمْ اِمْرَاَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِيْ اٰخِرِ الْيَوْمِ. (صحيح البخاري ٥٢٠٤)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বয়ান নং ২৫-এর খুতবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى وَجَعَلَ الْحُبَّ وَالْمَوَدَّةَ فِى الْقُلُوْبِ، وَشَرَعَ لِلْاَزْوَاجِ وَالزَّوْجَاتِ حُقُوْقًا اَدَائُهَا مَطْلُوْبٌ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ شَهَادَةً صَادِرَةً مِنْ عَمِيْقِ الْقُلُوْبِ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ الْمُخْبِرُ مِنْ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ، وَهُوَ الْحَبِيْبُ الْمَحْبُوْبُ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ مَا تَعَاقَبَ الطُّلُوْعُ وَالْغُرُوْبُ.

اَمَّا بَعْدُ :

اَيُّهَا النَّاسُ! اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى شَرَعَ لِلْاَزْوَاجِ حُقُوْقًا فِيْمَا بَيْنَهُمْ، فَتَلْزَمُ مُرَاعَاتُهَا لِاِقَامَةِ السُّكُوْنَةِ وَالطَّمَانِيْنَةِ فِى الْاُسْرَةِ. فَعَلَى الْاَزْوَاجِ اَنْ يُّصْلِحُوْا اَحْوَالَهُنَّ، لِاَنَّهُنَّ رَعِيَّةٌ لَّهُمْ وَكُلُّ رَاعٍ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ، وَعَلَيْهِمْ اَنْ لَّا يَتَكَاسَلُوْا وَلَا يُشَدِّدُوْا فِى اِصْلَاحِهِنَّ، بَلْ يَبْتَغُوْا بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيْلًا. فَاِنْ لَمْ تَصْلُحْ وَنَشَزَتْ فَلْيَمْتَثِلُوْا مَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَالّٰتِىْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ، فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا، اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا. وَلٰكِنَّ الضَّرْبَ ضَرْبٌ غَيْرُ مُبَرِّحٍ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : لَا يَجْلِدُ اَحَدُكُمْ اِمْرَاتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِىْ اٰخِرِ الْيَوْمِ. وَعَلَيْكُمْ اَيُّهَا الْاَزْوَاجُ الْاِنْفَاقُ لَهُنَّ بِقَدْرِ وُسْعِكُمْ . قَالَ تَعَالٰى : لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهٖ، وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتَاهُ اللّٰهُ ، لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَآ اٰتَاهَا. وَلَا يُبَالُوْنَ لِعَدَمِ شُكْرِهِنَّ : فَاِنَّ ذَالِكَ عَادَتُهُنَّ الْمُسْتَمِرَّةُ. قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



'অর্থাৎ, তোমাদের কেউ দাসী-বাদীকে যেরকম মারে, বিবিকে সে রকম মারবে না। রাতের বেলায় তার কাছে যেয়ে আবার কীভাবে ঘুর ঘুর করবে তাও মনে রেখ'। কত সুন্দরভাবে রাসূল (সা.) কথাটা বলেছেন। এখন যে রাগের চোটে বে-সামাল হয়ে মারবে, রাতের বেলায় আবার তার কাছে মাথা নত করতে হবে। তখন শরম লাগবে না? এগুলো স্বরণ রেখে মার, তাহলে ব্যালেন্স থাকবে। মারের ক্ষেত্রে যেন ব্যালেন্সহারা হয়ে না যায়, বে-সামাল হয়ে না যায়- এ জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মার দেয়ার কথা বলার পর বলেছেন,

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا.

'অর্থাৎ, মনে রাখবে অবশ্যই আল্লাহ সুমহান, সমুচ্চ। তিনি অনেক বড়'।

এখানে বোঝানো হচ্ছে যে, তোমার উপরে আল্লাহ আছেন, তোমাকে যে শাসন করার কর্তৃত্ব দেয়া হল, এই কর্তৃত্ব পেয়ে তুমি লাগামহীন হয়ে যাবে না, বে-সামাল হয়ে যাবে না। মনে রাখবে তোমার উপরেও আরেকজন কর্তৃত্বকারী আছেন। তোমার অধীনস্থের ক্ষেত্রে বে-সামাল হয়ে জুলুম বাড়াবাড়ি করলে তোমার উপর ওয়ালাও তোমাকে শাস্তি দিতে পারেন। মানুষের ভিতরে ব্যালেন্স আনার উপায় হল এই যে, মনে করবে আমার চেয়ে উপর ওয়ালা একজন আছেন। এটা মনে রাখলে মানুষ বে-সামাল হতে পারবে না। আমরা আমাদের অধীনস্থদেরকে বিভিন্ন অপরাধের কারণে শাস্তি দেই, ধমকানী দেই, শাসানী দেই, ছাত্রদেরকে ছেলে- মেয়েদেরকে শাসন করি, মারধর দেই, এইসব ক্ষেত্রে এটা মনে রাখতে হবে যে, আমার উপর ওয়ালা একজন আছেন, আমি যদি বে-ইনসাফী করি, আমার উপরওয়ালা তার প্রতিশোধ নিতে পারেন। আল্লাহর বান্দার সাথে আমি বাড়াবাড়ি করলে আল্লাহও আমার সাথে কঠোরতা করতে পারেন। আল্লাহ পাকের নিয়মই এরকম। আল্লাহর বান্দার সাথে আমি যেমন করব, আল্লাহ পাকও আমার সাথে তেমন করবেন। আল্লাহর বান্দাকে আমি ক্ষমা করলে, আল্লাহও আমাকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহর বান্দার প্রতি আমি রহম করলে আল্লাহও আমার প্রতি রহম করবেন। আল্লাহর বান্দার দোষ গোপন করলে আল্লাহও আমার দোষ গোপন করবেন। মোটকথা বান্দার সাথে বান্দার মু'আমালা যেমন হবে, ঐ বান্দার সাথে আল্লাহর মু'আমালাও তেমন হবে। তাই রাগের মাথায় বে-সামাল না হওয়া চাই। হালকা চড়-থাপ্পড় বা হালকা মার দিতে বলা হয়েছে। যে সমস্ত মহিলাদের মধ্যে সামান্যতম আত্মমর্যাদা থাকে, এতটুকু হলেই তারা সংশোধন হয়ে যাবে।

ইসলামী তরীকায় মারধর হলে সংশোধন হয়। ইসলামের তরীকার বাইরে বেশি মারধর হলে সংশোধন হবে না, বরং আরও বাঁকা হয়ে যাবে। আমার ছাত্র, আমার ছেলে-মেয়ে আমার অধীনস্থ যতটুকু অপরাধ করেছে, তার থেকে যদি বেশি শাস্তি দেই, তাহলে তারা ভাল হবে না, বরং বিগড়ে যাবে। তাদের ভিতরে জিদ সৃষ্টি হবে যে, আমি এতটুকু অন্যায় করলাম, আমাকে এত বেশি শাস্তি দিল কেন? যতটুকু অন্যায় ততটুকু শাস্তি দেয়া হলে এরকম জিদ আসতে পারে না বরং তাতে তার ভিতরে নমনীয়তা আসবে। তার ভিতরে অনুশোচনা আসবে যে, আমার অপরাধ হয়েছে, আমার ভুল হয়েছে, তাই আমাকে মার খেতে হয়েছে। কিন্তু বাড়াবাড়ি করলে অনুশোচনা আসবে না বরং জিদ পয়দা হবে। শরীআতে প্রত্যেকটা আমল যেভাবে করতে বলা হয়েছে, সেভাবে করলেই ফায়দা হয়, অন্যথায় ফায়দা হয় না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে সহীহ বুঝ দান করুন। ইনশাআল্লাহ এ সম্পর্কে আগামী জুমুআয় আরও কিছু আলোচনা করা হবে। আল্লাহ তা'আলা তাওফীক দান করুন। আমীন!

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বয়ান নং -২৬

## সুন্নাতের উপর আমল করার গুরুত্ব ও ফায়দা (১ম পর্ব)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ اَحَبَّ سُنَّتِيْ فَقَدْ اَحَبَّنِيْ وَمَنْ اَحَبَّنِيْ كَانَ مَعِيْ فِى الْجَنَّةِ.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

শরীআত আমাদেরকে যত ধরনের বিধি-বিধান দিয়েছে, তার মধ্যে কিছু আছে ফরয, ওয়াজিব, কিছু আছে সুন্নাত, মুস্তাহাব ইত্যাদি। এর মধ্যে ফরয, ওয়াজিবের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। সুন্নাত, মুস্তাহাবের গুরুত্ব ফরয ও ওয়াজিবের মত নয়। যেমন নামাযের মধ্যে কিছু আছে ফরয, কিছু ওয়াজিব, কিছু সুন্নাত ও মুস্তাহাব। ফরয ছুটে গেলে নামাযই হয় না। ওয়াজিবও ইচ্ছাকৃতভাবে ছাড়লে নামায হয় না। সুন্নাত ছুটে গেলে নামায হয়ে যায়, তবে নামায সুন্দর হয় না। এ জন্য কেউ কেউ সুন্নাতকে হালকা দৃষ্টিতে দেখেন। মনে করেন যে, ফরয ওয়াজিব আদায় হলেইতো সারে, সুন্নাত রক্ষা না করলেওতো চলে। এভাবে সুন্নাতকে হালকা করে দেখা হলে সুন্নাত তো ছুটবেই, ধীরে ধীরে ফরয, ওয়াজিবও ছুটতে শুরু করবে। ফরয, ওয়াজিবকে পরিপূর্ণভাবে আদায় করার স্বার্থে সুন্নাত, মুস্তাহাবের প্রতিও গুরুত্ব দিতে হবে। একজন মানুষ যখন মুস্তাহাব ছাড়া শুরু করে, আস্তে আস্তে তার সুন্নাতও ছুটে যায়। যখন সুন্নাত ছাড়া শুরু করে, আস্তে আস্তে তার ফরয ওয়াজিবও ছুটতে শুরু করে। একটা উদাহরণ শুনুন। জামাআতের সাথে নামায পড়া সুন্নাতে মুআক্কাদা। অর্থাৎ, একটা গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। যদি কেউ ঘরে নামায পড়ে নেয়, তাহলেও নামায হয়ে যাবে। এখন যদি কেউ মনে করে জামাআতে নামায পড়া সুন্নাত, ঘরে একাকী নামায পড়লেও তো হয়ে যায়, এভাবে সে জামাআতে যাওয়াকে হালকা মনে করে জামাআতে যাওয়া বাদ দিয়ে ঘরে নামায পড়তে থাকে, তাহলে আস্তে আস্তে তার নামায ছুটা শুরু হবে। প্রথমে ওয়াক্তমত নামায হবে না, একটু দেরীতে হবে। জামাআতের সময় নির্ধারিত থাকে, তাই যারা জামাআতে যেতে অভ্যস্ত, তাদের মনে তাড়া থাকে যে, ঠিক সময়মত আমাকে পৌঁছুতে হবে। এভাবে সে সময়মত মসজিদে পৌঁছে যায়। কিন্তু যে লোক ঘরে নামায পড়বে, তার মনে সময়ের কোন তাড়া থাকবে না। পড়ছি-পড়ছি করেই বিলম্ব হয়ে যাবে। এভাবে আস্তে আস্তে মাকরূহ ওয়াক্তে, শেষ ওয়াক্তে যেয়ে নামায পড়া শুরু করবে। মাঝে মধ্যে অলসতা এসে গেলে বা শরীরটা একটু ভাল না লাগলে নামায কাযাও হতে শুরু করবে। মনে করবে কাযা পরের ওয়াক্তে পড়ে নেব। এভাবে পরে পরে করতে করতে কাযা নামাযও অনেক জমা হয়ে যাবে। এক পর্যায়ে নফসে ধোঁকা আসবে যে, কত কাযা নামায রয়ে গেছে, এত নামাযতো আর এখন পড়া সম্ভব নয়। আচ্ছা ভবিষ্যতে পড়ে নেব। মাঝে মধ্যে মনে হবে আমিতো আর নিয়মিত নামাযী নই, সব সময়তো আর নামায পড়ি না, এই মনে করে মাঝে মধ্যে নামায পড়বে, মাঝে মধ্যে পড়বে না। এভাবে পিছনে সরতে সরতে এক পর্যায়ে সে বে-নামাযী হয়ে যাবে। এমনকি এরকম লোক পিছনে সরতে সরতে শেষ পর্যন্ত বে-ঈমান হয়ে যায়। এভাবে একটা সুন্নাত ছাড়লে আস্তে আস্তে ফরয, ওয়াজিব ছুটে যায়, বে-ঈমান পর্যন্ত হয়ে যায়। তাই ফরয-ওয়াজিবকে যথাযথভাবে আদায় করার স্বার্থে সুন্নাত মুস্তাহাবকে আঁকড়ে ধরতে হবে। সুন্নাত যখন আদায় হবে, ফরযতো আদায় হবেই। সুন্নাত ছাড়ব, তাহলে ফরযও ছুটে যাবে।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ اَحْسَنْتَ اِلٰى اِحْدٰهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَاَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَاَيْتُ خَيْرًا مِنْكَ قَطُّ. وَاعْلَمُوْا اَنَّ الْكُفْرَانَ مِنْ مَعَاصِى اللّٰهِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَشْكُرُ اللّٰهَ مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ. وَلِاَجْلِ ذَالِكَ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَاِنِّيْ رَاَيْتُكُنَّ اَكْثَرَ اَهْلِ النَّارِ. فَقَالَتْ اِمْرَاَ ةٌ مِّنْهُنَّ جَزْلَةٌ فَمَا لَنَا اَكْثَرَ فِيْهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! قَالَ : تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ. فَاَدِّيْنَ شُكْرَ اَزْوَاجِكُنَّ اَيُّهَا النِّسَاءُ وَعَظِّمْنَهُمْ وَتَذَكَّرْنَ مَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : لَوْ كُنْتُ اٰمُرُ اَحَدًا اَنْ يَّسْجُدَ لِاَحَدٍ لَاَمَرْتُ الْمَرْاَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا. وَعَلَيْكُنَّ اَيُّهَا الزَّوْجَاتُ اِطَاعَةُ اَزْوَاجِكُنَّ، فَتُطِعْنَ اِطَاعَةً مَا لَمْ تَكُنْ مَعْصِيَةً، لِاَنْ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ. وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ وَاحْفَظْنَ فُرُوْجَكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى، وَاَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكَاةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ. اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا.

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ : وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ.

بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ، وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. اَقُوْلُ قَوْلِىْ هٰذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ لِىْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَاسْتَغْفِرُوْهُ، اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

আরেকটা উদাহরণ শুনুন, নামাযের মধ্যে রুকূ করার সুন্নাত তরীকা হল- মাথা, কোমর, পিট এক বরাবর থাকবে। আর মাথা, কোমর, পিট বরাবর করতে গেলে রুকু একটু ধীরে-সুস্থে করতে হয়, তাড়াহুড়া করে করলে মাথা, কোমর, পিঠ বরাবর করা যায় না। দেখা গেল এই সুন্নাতটা পালন করলে, রুকু হয় ধীরে সুস্থে এভাবে প্রত্যেকটা সুন্নাত আদায় করতে গেলে অটোমেটিক নামাযের ভিতর ধীর-স্থিরতা এসে যায়, এতমিনান এসে যায়। সুন্নাত তরীকা ছেড়ে দিলে নামাযের স্থিরতা, এতমিনান শেষ হয়ে যাবে, ওয়াজিব ছুটে যাবে। যেমন রুকূর সুন্নাত ছাড়লে কোমর, পিট, মাথা সোজা করতে হচ্ছে না, কোন রকম একটু ঝুঁকেই আবার তাড়াতাড়ি উঠে যাওয়া হচ্ছে। এভাবে রুকূর ভিতরে যেটা ওয়াজিব ছিল অর্থাৎ, ধীর-স্থিরভাবে রুকু করা, সেই ওয়াজিব ছুটে যাচ্ছে। এভাবে সুন্নাত হল স্থির হয়ে সাজদা করা, দুই সাজদার মাঝখানে স্থির হয়ে বসা, রুকু এবং সাজদার মাঝখানে স্থির হয়ে দাঁড়ানো, এই ওয়াজিবগুলোও ছুটতে শুরু করবে। বুঝা গেল সুন্নাতের ব্যাপারে গাফিলতি করলে ওয়াজিব ছুটতে থাকবে। আর ইচ্ছাকৃতভাবে যদি কেউ ওয়াজিব ছেড়ে দেয়, তাহলে তার নামায হয় না। দেখা গেল সুন্নাত ছাড়ার কারণে শেষ পর্যন্ত পুরো ফরয বরবাদ হয়ে যায়।

সুন্নাতের উপর আমল করার অনেক ফায়দা রয়েছে। তার ভিতরে একটা বড় ফায়দা হল- সুন্নাতের উপরে মজবুতির সাথে আমল করলে ফরয-ওয়াজিব ছুটতে পারে না। প্রত্যেক মানুষকে ফরয, ওয়াজিবের হিসাব কড়াকড়িভাবে দিতে হবে। ফরয, ওয়াজিবের হিসেবে আটকা পড়লে মুক্তি পাওয়া যাবে না। এই ফরয, ওয়াজিব পরিপূর্ণভাবে আদায় করা এবং পরিপূর্ণভাবে রক্ষা করার জন্যই সুন্নাতকে মজবুতির সাথে আঁকড়ে থাকতে হবে। এ হিসেবে সুন্নাতের উপর আমল-ই মুক্তির উপায় হয়ে দাঁড়াবে।

সুন্নাতের উপর আমলের আরও বহু ফায়দা রয়েছে। সুন্নাতের উপর আমল করলে ঐ আমলের ভিতরে কোন গলদ তরীকা ঢুকতে পারবে না। সুন্নাত তরীকা ছেড়ে দিলে গলদ তরীকা সেই স্থান দখল করবে। যেমন- সুন্নাত তরীকায় রুকূ না করলে রুকূ হয়ে যাবে গলত তরীকায়, সুন্নাত তরীকায় সাজদা না করলে সাজদা হয়ে যাবে গলদ তরীকায়। শুধু নামাযের ক্ষেত্রে নয়; বরং সব আমলের ক্ষেত্রেই এমন। যেখানে সুন্নাত তরীকা অর্থাৎ, সহীহ তরীকা ছেড়ে দেয়া হবে, সেখানে গলদ তরীকা স্থান পাবে। সেই গলত তরীকা হতে পারে বিদআত কুসংস্কার, হতে পারে মাকরূহ, হারাম। সুন্নাত ছাড়লে বিদআত চলে আসবে। আবার এভাবেও বলা যায় 'যেখানে বিদআত চলে আসবে, সেখান থেকে সুন্নাত বিসর্জিত হয়ে যাবে'। নবী কারীম (সা.) হাদীছে ইরশাদ করেন,

مَا ابْتَدَعَ قَوْمٌ بِدْعَةً فِيْ دِيْنِهِمْ اِلَّا نَزَعَ اللّٰهُ مِنْ سُنَّتِهِمْ مِثْلَهَا ثُمَّ لَايُعِيْدُهَا اِلَيْهِمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (سنن الدارمي ٩٩)

'অর্থাৎ, কোন সম্প্রদায় তাদের ধর্মের কোন ক্ষেত্রে বিদআতকে প্রশ্রয় দিলে, অর্থাৎ বিদআত পন্থায় কোন কাজ করলে আল্লাহ তা'আলা সেই জায়গার সুন্নাতটাকে তুলে নেন। অনন্তর কিয়ামত পর্যন্ত আর সেই সুন্নাতকে প্রত্যানীত করেন না'।

এখানে বোঝানো হয়েছে একবার যখন বিদআতি তরীকায় কোন আমল শুরু হয়ে যায়, তখন সেখানে আবার সুন্নাত তরীকাকে ফিরিয়ে আনা কঠিন হয়ে যায়। গলত তরীকায় আমল শুরু করলে, বিদআতি পন্থায় আমল শুরু করলে তার খারাপ আছরে কলবের ভিতরে এত অন্ধকার এসে যায় যে, সেখানে আর হেদায়েতের আলো ফুটে ওঠে না। যেমন হাড়ি একবার কালো হয়ে গেলে সেই কালো হাড়ির উপর আলো পড়লে আলো চক চক করে না। বিদআত হল অন্ধকার, এর বিপরীত সুন্নাত হল নূর। কলব থেকে সুন্নাতের নূর সরে গেলে সেই স্থানে বিদআতের অন্ধকার ছেয়ে পড়ে। এরকম

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



অন্ধকারাচ্ছন্ন অন্তরে হেদায়েতের আলো ফুটে ওঠে না। যেমন পরিষ্কার ঝক ঝকে আয়নার উপর আলো পড়লে চক চক করে ওঠে। এজন্যই বিদআতে জড়িত মানুষ সহজে সুন্নাতের দিকে ফিরে আসতে পারে না। তাই আমরা দেখি যারা কোন বিদআতে লিপ্ত, তাদেরকে অনেক বোঝানো হয় যে, এটা বিদআত, এটা করা ঠিক নয়, এটা রাসূল (সা.)-এর যুগে ছিল না, সাহাবায়ে কেরামের যুগে ছিল না, আদর্শ যুগে ছিল না অতএব এটা করা বিদআত। এভাবে খুব বলা হয়, খুব বোঝানো হয়, কিন্তু তারা সে বিদআত ছাড়তে পারে না। শবে বরাতের হালুয়া-রুটি করা বিদআত, এটা আমরা কয়জনে ছাড়তে পেরেছি? অনেকেই পারিনি। জন্মবার্ষিকী পালন করা বিদআত, মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা বিদআত, প্রচলিত মিলাদ অনুষ্ঠান আমরা করি, তাও রাসূল (সা.)-এর যুগে, সাহাবাদের যুগে, আদর্শ যুগে ছিল না। বহুবার আমরা এগুলো শুনেছি, তবুও আমরা ছাড়তে পারছি না। কারণ, পূর্বে বলা হয়েছে, কেউ গলদ তরীকায় আমল শুরু করলে তার কলবের অবস্থা এমন বিকৃত হয়ে যায় যে, সে আর সহীহ তরীকায় সহজে ফিরে আসতে পারে না। ইনশাআল্লাহ যখন কেউ সুন্নাতকে আঁকড়ে থাকবে, তার ভিতরে বিদআত ঢুকতে পারবে না। যেখানে বিদআত ঢুকে যায়, সেখানে সুন্নাত ঢোকানো কঠিন হয়ে পড়ে।

সুন্নাতের উপর আমল করার একটা বড় ফায়দা এটাও যে, সুন্নাতের উপরে আঁকড়ে থাকলে কোন গলদ তরীকা ভিতরে ঢুকতে পারে না। যেমন মসজিদে আসার, মসজিদে প্রবেশ করার, মসজিদে থাকার এবং মসজিদ থেকে বের হওয়ার অনেকগুলো সুন্নাত এবং আদব রয়েছে। এগুলো পালন করাই হল সহীহ তরীকা। এগুলো পালন না করলে মসজিদে আসা থেকে শুরু করে বের হওয়া পর্যন্ত যে তরীকা আমরা গ্রহণ করব তা হবে গলদ তরীকা।

মসজিদ হল শাহী দরবার। শাহী দরবারে আসা যাওয়ার স্পেশাল নিয়ম-কানূন থাকে। মসজিদে আসা যাওয়ার স্পেশাল নিয়ম-কানূন অর্থাৎ আদব-সুন্নাত রয়েছে। যখন আমি মসজিদে আসব, পারলে ঘর থেকে উযূ করে আসব। মসজিদে যেয়ে উযূ করার চেয়ে ঘর থেকে উযূ করে যাওয়া উত্তম। কারণ আমি শাহী দরবারে যাচ্ছি। আর শাহী দরবারে যেতে হলে ঘর থেকেই পরিপাটি হয়ে যেতে হয়। আমি প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করতে যাই বা প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করতে যাই, তাহলে কি আমি ঘর থেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে পরিপাটি হয়ে যাব, না ঐ রাজভবনে যেয়ে পরিপাটি হব? এখানে আমরা সকলেই বুঝি যে, প্রধানমন্ত্রী বা প্রেসিডেন্টের দরবার হল শাহী দরবার। এখানে যেতে হলে ঘর থেকে আগেই ফিট-ফাট হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। আমি শাহী দরবারে যাচ্ছি। এই মনোভাব নিয়ে যখন ঘর থেকে বের হব, তখন আমার হাটা এবং চলার ভঙ্গির মধ্যেও বিশেষ আছর এসে যাবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন-এর শাহী দরবারে যাচ্ছি। মনের ভিতরে এরকম চিন্তা থাকলে হাটা চলার মধ্যে বিনয়ের ভঙ্গী ফুটে উঠবে, দৃষ্টি নত হয়ে আসবে, মনের মধ্যে খোদাভীতি জাগ্রত হবে। মানুষ বিভিন্ন কাজের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে রওয়ানা হয়। যে রকম কাজের উদ্দেশ্যে বের হয়, হাটা চলার ভঙ্গির ভিতরে সেরকম প্রভাব ফুটে উঠে। কেউ যদি নাচ-গান দেখতে রওনা দেয়, তাহলে তার হাটা চলার এক ভঙ্গী হয়, তার চাহনী, তার কথা-বার্তা, তার সবকিছুর একটা বিশেষ ভঙ্গী হয়। যখন ব্যবসা বাণিজ্য করতে বাজারে যায় বা চাকুরী করতে অফিসে যায়, তখন চলা-ফেরার ভিতরে আরেক রকম ভাব-ভঙ্গী হয়, শাহী দরবারে যাওয়ার সময় আরেক রকম ভঙ্গী হয়। তাই বলা হয়েছে মসজিদে আসার সময় বিনয়ের ভঙ্গীতে আসবে, মাথা নত করে চলবে, গাম্ভীর্যের সাথে চলবে, কোন হাসি-তামাশা, ক্রীড়া-কৌতুক করতে-করতে আসবে না, সম্পূর্ণ এতমিনানের সাথে ধীর-স্থির ভাবে মসজিদে আসবে। আমরা শাহী দরবারে যাচ্ছি, এই চিন্তা ভিতরে থাকলে এসব আমল এমনিতেই এসে যাবে।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

অনেক সময় আমরা দেখি জামাআত শুরু হয়ে গেছে, তখন আমরা দৌড় দিয়ে আসি, যেন সেই রাকআত ফেল না হয়ে যায়, এটা সহীহ তরীকা নয়। সম্পূর্ণ এতমিনানের সাথে ধীরে-সুস্থে আসতে হবে। কোন রাকআত ছুটে যায় যাক, তবুও তাড়াহুড়া করে ছুটে যাওয়া নিয়ম নয়। তাড়াহুড়া করলে মনের ভিতরে ব্যস্ততা এসে যাবে, অস্থিরতা এসে যাবে, আর নামাযের ভিতরে সেটার প্রভাব পড়বে।

যখন মসজিদে প্রবেশ করব। তখন সুন্নাত তরীকা হল– প্রথমে বাম পায়ের জুতা/স্যান্ডেল খুলব, তারপর ডান পায়ের জুতা/স্যান্ডেল খুলব। এখানে আমরা অনেকে ভুল করি। আমরা প্রথমে ডান পায়ের জুতা খোলি। জুতা পরিধান করার সময় নিয়ম হল– প্রথমে ডান পায়ে পরিধান করা, তারপরে বাম পায়ে পরিধান করা, আর খোলার সময় তার বিপরীত অর্থাৎ, প্রথমে বাম পায়েরটা খোলা, তারপরে ডান পায়েরটা খোলা। তাই মসজিদে প্রবেশ করার সময় প্রথমে বাম পায়ের জুতা/স্যান্ডেল খুলব, তারপর ডান পায়েরটা খুলব। প্রথমে বাম পায়ের জুতা/স্যান্ডেল খুলেই বাম পা মসজিদে ঢুকিয়ে দিব না, বরং বাম পায়ের জুতা/স্যান্ডেল খুলে বাম পা তার উপর রাখব তরপর ডান পায়েরটা খুলব। তারপর প্রথমে ডান পা দিয়ে বিসমিল্লাহ বলে দুরূদ-সালাম পাঠ করে মসজিদে প্রবেশের দু'আ পড়ে মসজিদে প্রবেশ করব। আমরা সহজে আমল করার জন্য বলে থাকি যে, বিসমিল্লাহ, দুরূদ-সালাম এবং দু'আ এই তিনটাকে এক সাথে এভাবে পড়া যায়– বিসমিল্লাহি ওয়াস্সালাতু-ওয়াস্সালামু আলা রাসূলিল্লাহি, আল্লাহুম্মাফ তাহ্লী আবওয়াবা রাহমাতিক। মসজিদে প্রবেশ করার সময় মাথা নীচু করে, বিনয়ের ভঙ্গীতে, মনের ভিতরে আল্লাহর ভয় জাগ্রত রেখে প্রবেশ করতে বলা হয়েছে। এভাবে মসজিদে আসলে এবং এভাবে মসজিদে প্রবেশ করলে তারপরে যে নামাযটা হবে, সেটা হবে এতমিনানের নামায, সেটা হবে ভাব-গাম্ভীর্যপূর্ণ নামায, সেটা হবে বিনয় এবং খুশু খুযূ ওয়ালা নামায। আর মনের এইভাব না নিয়ে তাড়াহুড়া করে দৌড় দিয়ে এসে নামাযে দাঁড়ালে সেই নামাযে এতমিনান আসবে না, ভাব-গাম্ভীর্য, বিনয়, খুযূ কিছুই আসবে না। দেখা গেল প্রত্যেকটা সুন্নাত তরীকার ভিতরে বহু ফায়দা রয়েছে।

মসজিদে প্রবেশ করার পর যেখানে জায়গা পাই দাঁড়িয়ে যাব। যারা আগে মসজিদে আসবেন, তাদের কর্তব্য হল কাতারের ফাঁকগুলো পূর্ণ করে নিবেন, সামনে ফাঁক রেখে পেছনে বসবেন না। একান্তই কোন ফাঁক থেকে গেলেও যারা পরে আসবেন তারা মানুষের ঘাড়ের উপর দিয়ে চলাচল করে সামনে অগ্রসর হবেন না। মানুষের ঘাড়ের উপর দিয়ে টপকে চলাচল করা নিষেধ। কোন নামাযীর সামনে দিয়ে চলাও নিষেধ। আমরা অনেকেই এ বিষয়টাকে তেমন একটা গ্রাহ্য করে চলি না। বিশেষকরে জুমুআর নামাযের পরে দেখা যায়– কেউ কেউ নামায পড়ছেন, অথচ তার সামনে দিয়ে অনেকে সমানে চলাচল করছেন। এই মাসআলাটা খুব ভাল করে খেয়াল করে শুনি– একজন ব্যক্তি নামায পড়ছেন, তখন তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করা অর্থাৎ, এ পাশ থেকে ওপাশে যাওয়া বা ওপাশ থেকে এ পাশে আসা নিষেধ এবং কঠোরভাবে নিষেধ। একমাত্র যিনি নামাযী ব্যক্তির বরাবর সামনে আছেন, তিনি যেকোনো একদিকে সরে যেতে পারেন। এটা নামাযের সামনে দিয়ে অতিক্রম নয় বরং এটা হল সরে যাওয়া। কিন্তু অতিক্রম করা যাবে না। অর্থাৎ, এ পাশ থেকে ওপাশে যাওয়া বা ওপাশ থেকে এ পাশে আসা– এরকম আসা-যাওয়া করা যাবে না। হাদীছে বলা হয়েছে যদি কেউ জানত নামাযী ব্যক্তির সামনে দিয়ে অতিক্রম করা কত গোনাহ, তাহলে সে চল্লিশ দিন দাঁড়িয়ে থাকতে হলেও দাঁড়িয়ে থাকত, তবুও নামাযী ব্যক্তির সামনে দিয়ে অতিক্রম করত না। নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করা গোনাহে কবীরা, ছোট খাট গোনাহ নয়। নামাযী ব্যক্তি আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে কথোপকথন করছে, আল্লাহর সাথে তার বিনিময় হচ্ছে। এ অবস্থায় তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করা একটা বিরাট

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com



ব্যাঘাত ঘটানোর মত। তাই এটা বড় গোনাহ, ছোট গোনাহ নয়। তবে হ্যাঁ মাসআলার বিস্তারিত বিবরণ জেনে রাখলে সুবিধাও রয়েছে। যদি নামাযী ব্যক্তির সামনে জায়গা থাকে, তাহলে তার অনেক আগে থেকে অতিক্রম করা যায়। অনেক আগে থেকে দ্বারা বোঝানো হয় তিন কাতার। অর্থাৎ, তিন কাতার সামনে থেকে এপাশ ওপাশ করতে পারে। যে কাতারে কেউ নামায পড়ছে সেই কাতার, তারপরের আরেক কাতার, তারপরে আরেক কাতার এই তৃতীয় কাতারের পর থেকে অতিক্রম করা যাবে। কারণ হল নামাযী যখন সুন্নাত তরীকায় নামায পড়েন, তখন দাঁড়ানো অবস্থায় সাজদার স্থানে তার নজর থাকে। সাজদার স্থানে নজর দিলে হালকা আবছা দৃষ্টি আরও কিছুদূর সামনে যায়। তিন কাতার পর্যন্ত এরকম দৃষ্টি যায়। এরপর আর কোনভাবেই দৃষ্টি যায় না। তাই তিন কাতারের সামনে দিয়ে কেউ অতিক্রম করলে তাতে নামাযীর কোন ব্যাঘাত হয় না। কিন্তু এই তিন কাতার পরিমাণের ভিতর দিয়ে কেউ অতিক্রম করলে নামাযীর মন ঐ দিকে চলে যায়। যে মন আল্লাহর দিকে ছিল সেটা বান্দার দিকে ফিরে গেল। এর কারণ ঘটল অতিক্রমকারী। তাই এতে অতিক্রমকারীর পাপ হবে।

যাহোক মসজিদে প্রবেশ করার পর নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রম না করা। মসজিদে ঢুকে সালাম দেয়া; যারা নামায পড়ছেন তাদেরকে নয়; বরং যারা নামায না পড়ছেন, তাদেরকে সালাম দেয়া। এতটুকু শব্দে সালাম দেয়া, যাতে নামাযী ব্যক্তির নামাযে ব্যাঘাত না ঘটে। যদি সুন্নাত পড়তে হয় বা জামাআত দাঁড়িয়ে যায়, তাহলে ঐ নামায-ই পড়ে নেয়া। নতুবা প্রথমে দুই রাকআত দুখুলুল মসজিদ পড়ে নেয়া মসজিদের হক। বসার আগে পড়ে নেয়া উত্তম। কেউ কেউ আছে মসজিদে প্রবেশ করার পর প্রথমে একটু বসে নেয়, তারপরে উঠে নামায পড়া শুরু করে, এটা গলদ তরীকা। সহীহ তরীকা হল অর্থাৎ, মুস্তাহাব হল– না বসেই নামায পড়ে নেয়া। এই দুই রাকআতকে বলা হয় তাহিয়্যাতুল মসজিদ বা দুখুলুল মসজিদ। মসজিদের সম্মানার্থে এই নামায পড়া হয়। তাই যুক্তিতেই বলে যে, মসজিদে প্রবেশ করা মাত্রই এ নামায পড়তে হবে। প্রবেশ করে আগে বসে নিলাম তারপর এ নামায পড়লাম, তাহলে মসজিদের সম্মানে পড়া হল না। তাই মুস্তাহাব তরীকা হল মসজিদে প্রবেশ করেই না বসে প্রথমে দুই রাকআত 'দুখুলুল মসজিদ' পড়ে নিতে হবে। মসজিদে প্রবেশ করার সময়ই এই নিয়ত করে নিতে হবে যে, যতক্ষণ আমি মসজিদে আছি এ'তেকাফের নিয়তে আছি, তাহলে যতক্ষণ থাকব এ'তেকাফের ছওয়াব হতে থাকবে। মসজিদে দ্বীনী এবং মাসআলাগত কথা ব্যতীত কোন দুনিয়াবী কথা-বার্তা না বলা। উঁচু স্বরে কথা না বলা। কারও সাথে ঝগড়াঝাটি, কথা কাটা-কাটি না করা। মোটকথা যতক্ষণ মসজিদে থাকব, এটা আল্লাহর ঘর, শাহী দরবার- একথা মনে রেখে আদব-তা'যীমের সাথে বিনয় এবং গাম্ভীর্যের সাথে থাকতে হবে।

মসজিদ থেকে যখন বের হব, বের হওয়ারও সুন্নাত তরীকা আছে। মসজিদ আল্লাহর ঘর, শাহী দরবার, আল্লাহর বিশেষ রহমতের স্থান, তাই মসজিদে থাকা অবস্থায় শয়তানের ওয়াছ-ওয়াছা কম হয়। যখন আমরা মসজিদ থেকে বের হয়ে যাই, বের হওয়ার সাথে সাথে শয়তান আর শয়তানের বাহিনী প্রবলভাবে আক্রমণ শুরু করে। তারা মসজিদের বাইরে আক্রমণের জন্য অপেক্ষায় থাকে। এজন্য দু'আ শিক্ষা দেয়া হয়েছে। বের হওয়ার আগে মসজিদের পাশে যেয়ে এই দু'আ পড়তে হবে–

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ اِبْلِيْسَ وَجُنُوْدِهٖ. (الأذكار للنووي)

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! ইবলীস ও তার বাহিনী থেকে তোমার কাছে পানাহ চাই।

এই আরবি দু'আটি মুখস্থ করা খুব কঠিন নয়, ছোট দু'আ তবুও না পারলে নিজের ভাষায় বলি হে আল্লাহ! শয়তান ও তার বাহিনীর আক্রমণ থেকে আমাকে হেফাযতে রাখ। এরপর–

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ.

বলে প্রথমে বাম পা বের করব। বাম পা বের করেই বাম পা জুতো/স্যান্ডেলের ভিতরে ঢুকাব না। যেহেতু জুতো পরিধান করার সময় সুন্নাত হল- প্রথমে ডান পা ঢোকানো। আবার মসজিদ থেকে বের হওয়ার সুন্নাত হল বাম পা বের করা। তাই বাম পা বের করেই সে পা জুতো/স্যান্ডেলের উপর রাখব। তারপর ডান পা বের করব। এরপরে প্রথমে ডান পায়ে জুতো/স্যান্ডেল পরিধান করব, তারপর বাম পায়ে জুতো/স্যান্ডেল পরিধান করব। এই হল মসজিদ থেকে বের হওয়ার সুন্নাত তরীকা।

যতক্ষণ মসজিদের ভিতরে থাকি ঐ থাকার ভিতরে যদি আযান হয়, আযানের জওয়াব দিতে হবে। যদি মসজিদে প্রবেশের আগে আযান হয়ে যায়, তবুও আযানের জওয়াব দিতে হবে। আযানের জওয়াবের কথা বিশেষভাবে এজন্য বলছি যে, আযানের জওয়াবে আমাদের বেশ কিছু ভুল হয়ে থাকে। খুব খেয়াল করে শুনি- আযানের মধ্যে মুআয্যিন সাহেব যে যে শব্দ বলবেন, আমরাও জওয়াবে সেই সেই শব্দ বলব। শুধু হাইয়্যা আলাস্সালাহ, হাইয়্যা আলাল ফালাহ্, এই দুটোর জওয়াব ব্যতিক্রম। যখন মুআয্যিন সাহেব বলবেন হাইয়্যা আলাসসালাহ্, আমরা জওয়াবে বলব– লা হাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। হাইয়্যা আলাল ফালাহ-র জওয়াবেও বলব– লা হাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। এছাড়া ফজরের আযানে যখন মুআয্যিন সাহেব বলবেন– আস্সালাতু খাইরুম্ মিনান্নাউম, তার জওয়াবে বলব– সদাকতা অবাররাতা। এই আযানের তিনটি শব্দ হাইয়্যা আলাস সালাহ, হাইয়্যা আলাল ফালাহ্, আস্সালাতু খাইরুম মিনান্নাউম- এই তিন শব্দের জওয়াব এই। এছাড়া মুআয্যিন সাহেব আযানের অন্যান্য শব্দ যা বলবেন আমরাও জওয়াবে সেই সেই শব্দই বলব। অর্থাৎ, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার-এর জওয়াব হবে আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর জওয়াব হবে আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ-এর জওয়াব হবে আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। হাদীছে পরিষ্কার বলা হয়েছে,

فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ الْمُؤَذِّنُ. (صحيح البخاري ٦١٠ وصحيح مسلم ٨٧٤)

অর্থাৎ, মুআয্যিন যে শব্দ বলবে তোমরাও অনুরূপ বলবে।

অতএব যখন মুআয্যিন সাহেব আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ বলবেন, তখন আমরা জওয়াবে বলব আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। কেউ কেউ এর জওয়াবে বলেন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। এটা ঠিক নয়। যদি কেউ মনে করেন রাসূল (সা.)-এর নাম আসলে দুরূদ পড়া হবে না কেন? এটার সমাধান আছে। যখন মুআয্যিন সাহেব আযানের শেষ শব্দ বলবেন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, তখন জওয়াবে বলব– লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এরপর দুরূদ শরীফ পড়ে নিতে হবে। দুরূদ শরীফ এখানে এসে গেল। আহকামে যিন্দেগী কিতাবে ছক করে দেখানো হয়েছে আযান ইকামতের কোন্ কোন্ শব্দের জওয়াবে কোন্ কোন্ শব্দ বলতে হবে। যাহোক আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ-র জওয়াবে দুরূদ শরীফ নয় বরং আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ বলতে হবে। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর জওয়াবে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে দুরূদ শরীফ পড়ে তারপরে আযানের দু'আ পড়তে হবে–

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَانِ الَّذِيْ وَعَدْتَّهُ. (رواه البخاري في صحيحه برقم ٦١٠ وسنن النسائي برقم ٦٨٠)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



আযানের এই দু'আ এক ধরনের মোনাজাত। এর মধ্যে আল্লাহর কাছে দু'আ চাওয়া হয়। তবে এ সময় হাত উঠানো নেই। মনে রাখতে হবে আল্লাহ্র কাছে আমরা অনেক ক্ষেত্রে অনেক কিছু দু'আ চাই, কিন্তু সব দু'আ চাওয়ার সময় হাত উঠানোর নিয়ম নেই। যেমন মসজিদে ঢোকার সময় আমরা দু'আ পড়ি আল্লাহুম্মাফ তাহলী আবওয়াবা রাহমাতিক। এর অর্থ হল হে আল্লাহ, আমার জন্য তোমার রহমতের দু'আর খুলে দাও। এটাওতো একটা দু'আ অর্থাৎ, মোনাজাত, কিন্তু এখানেতো হাত তুলি না। মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় দু'আ পড়ি আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা মিন ফাদলিক। এর অর্থ হল– হে আল্লাহ, তোমার কাছে অনুগ্রহ কামনা করি। এটাও একটা মোনাজাত, কিন্তু এখানে হাত তুলি না। এমনিভাবে ঘর থেকে বের হওয়ার সময় দু'আ, ঘরে ঢুকতে দু'আ, পেশাব-পায়খানায় ঢুকতে-বের হতে দু'আ, কিন্তু এসব দু'আর সময় হাত তোলা হয় না। দু'আ মানেই হাত তুলে হতে হবে তা নয়। হাত তোলা হয় সেই সমস্ত জায়গায়, যেখানে হাত তোলার কথা হাদীছে বলা হয়েছে। আযানের পরে হাত তোলার কথা হাদীছে বলা হয়নি। এটা পরিষ্কার করে এজন্য বললাম যে, অনেক ভাই আযানের দু'আ পড়ার সময় হাত তুলে থাকেন এবং এটা নিয়ে বিতর্কও করে থাকেন যে, আল্লাহর কাছে দু'আ করব হাত তুলব না কেন? অথচ সব দু'আতেই হাত তুলতে হয় না।

যাহোক সুন্নাতের উপর আমল করার ফায়দা বয়ান করা হচ্ছিল। সুন্নাতের উপরে আমল করার সবচেয়ে বড় ফায়দা হল এর দ্বারা নবী কারীম (সা.)-এর সাথে মহব্বতের সম্পর্ক কায়েম হয়ে যায়। আর নবী কারীম (সা.)-এর সাথে মহব্বত গড়ে উঠলে নবী কারীম (সা.)-এর সাথে জান্নাতে যাওয়ার সৌভাগ্য হাছিল হয়। হাদীছে ইরশাদ হয়েছে,

مَنْ اَحَبَّ سُنَّتِيْ فَقَدْ اَحَبَّنِيْ وَمَنْ اَحَبَّنِيْ كَانَ مَعِيْ فِى الْجَنَّةِ. (مشكاة عن الترمذي)

অর্থাৎ, আমার সুন্নাত তরীকার সাথে যার মহব্বত হয়ে গেল, আমার সাথে তার মহব্বত হয়ে গেল- আর আমার সাথে যার মহব্বত হয়ে যাবে, সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।

তাই নবী কারীম (সা.)-এর সাথে জান্নাতে থাকার সৌভাগ্য হাছিল করতে হলে জীবনের সর্বক্ষেত্রে সুন্নাতকে কায়েম করতে হবে। সুন্নাতী যিন্দেগী গড়ে তুলতে হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সুন্নাতী যিন্দেগী গড়ে তোলার তাওফীক নসীব করুন, রাসূলের মহব্বত নসীব করুন। সুন্নাতের আশেক হওয়ার তাওফীক নসীব করুন। আমীন! ইনশাআল্লাহ সুন্নাতের উপর আমল করার গুরুত্ব ও ফায়দা সম্পর্কে আগামী জুমুআয় আরও কিছু কথা রাখা হবে।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বয়ান নং ২৬-এর খুতবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْمُنْفَرِدِ بِالْخَلْقِ وَالْاِبْدَاعِ، اَلْمُسْتَقِلِّ بِالْاِيْجَادِ وَالْاِخْتِرَاعِ، اَلْمُثِيْبِ لِمَنِ امْتَثَلَ اَمْرَهٗ وَاَطَاعَ، وَالْمُنْتَقِمِ مِمَّنِ ابْتَدَعَ فِيْ اَمْرِهٖ وَاَضَاعَ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ فِيْ كُلِّ اَمْرٍ مُّطَاعٍ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهُ الْهَادِيْ اِلٰى سَبِيْلِ السُّنَّةِ وَهُوَ سَبِيْلُ النَّجَاةِ عَنِ الضِّيَاعِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اِلٰى يَوْمِ الْوَدَاعِ.

اَمَّا بَعْدُ :

اَيُّهَا النَّاسُ! اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى بَعَثَ رَسُوْلَهٗ وَخَتَمَ بِشَرِيْعَتِهِ الشَّرَائِعَ وَالْاَدْيَانَ، وَاَوْضَحَ مَا شَرَعَهٗ مِنَ الدِّيْنِ وَاَبَانَ، فَالْعِصْمَةُ وَالنَّجَاةُ لِمَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ بِمَا فِي الْقُرْاٰنِ وَالسُّنَّةِ مِنْ اَهْلِ الْاِسْلَامِ وَالْاِيْمَانِ، وَلَا يَتَّبِعُ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، فَقَدْ وَصَّاكُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْ كِتَابِهٖ بِالتَّوْحِيْدِ وَالْعِبَادَاتِ، وَ وَصَّاكُمْ نَبِيُّهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّمَسُّكِ بِسُنَّتِهٖ وَالْاِبْتِعَادِ عَنِ الْبِدْعَاتِ وَالْمُحْدَثَاتِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا ابْتَدَعَ قَوْمٌ بِدْعَةً فِيْ دِيْنِهِمْ اِلَّا نَزَعَ اللّٰهُ مِنْ سُنَّتِهِمْ مِّثْلَهَا ثُمَّ لَا يُعِيْدُهَا اِلَيْهِمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ، كَذَا فِي الْمِشْكَاةِ) وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى جَعَلَ اِطَاعَتَهٗ فِيْ اِطَاعَةِ رَسُوْلِهٖ، قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَمَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ. فَمَنْ لَّمْ يُطِعْ سُنَّةَ نَبِيِّهٖ فَهُوَ فِي الضَّلَالَةِ، فَضْلًا عَنْ اَنْ يَّكُوْنَ مِنْ اَهْلِ الْوَلَايَةِ وَالْكَمَالَاتِ، اِلَّا اِذَا تَابَ وَغَفَرَ لَهٗ غَافِرُ الذَّنْبِ وَالزَّلَّاتِ. قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : تَرَكْتُ فِيْكُمْ اَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا،

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ رَسُوْلِهٖ. وَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ اَحَبَّ سُنَّتِيْ فَقَدْ اَحَبَّنِيْ وَمَنْ اَحَبَّنِيْ كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ.

عِبَادَ اللّٰهِ! عَلَيْكُمْ بِاتِّبَاعِ السُّنَّةِ فِيْ كُلِّ شُعْبَةٍ مِّنْ شُعَبِ الْحَيَاةِ، وَاتَّبِعُوْا سُنَنَ الدُّخُوْلِ فِي الْمَسْجِدِ وَالْخُرُوْجِ مِنْهُ، فَقُوْلُوْا عِنْدَ الدُّخُوْلِ بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَقُوْلُوْا عِنْدَ الْخُرُوْجِ مِنْهُ بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ. وَاَجِيْبُوْا عَنِ الْاَذَانِ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ الْمُؤَذِّنُ اِلَّا قَوْلَهٗ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، فَقُوْلُوْا فِيْ جَوَابِهِمَا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ. ثُمَّ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُوْلُوْا : اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَانِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَانِ الَّذِيْ وَعَدْتَهٗ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ.

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ : قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ، وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ. قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ.

بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِي الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ، وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. اَقُوْلُ قَوْلِيْ هٰذَا وَاسْتَغْفِرُ اللّٰهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَاسْتَغْفِرُوْهُ، اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বয়ান নং -২৭

## সুন্নাতের উপর আমল করার গুরুত্ব ও ফায়দা (২য় পর্ব)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ. وَفِى الْحَدِيْثِ يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِاُنَاسٍ اَحْدَثُوْا وَيُعْرَضُوْنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْحَوْضِ فَيَقُوْلُ سُحْقًا لِّمَنْ غَيَّرَ بَعْدِيْ.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

সুন্নাতের উপর আমল করার গুরুত্ব ও ফায়দা সম্পর্কে গত জুমুআয় কিছু বিষয় আলোচনা করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল সুন্নাতের উপর গুরুত্বের সাথে আমল করলে মানুষের ফরয ওয়াজিব সুন্দরভাবে রক্ষা পায়। সুন্নাত, মুস্তাহাবের প্রতি অবহেলা করলে আস্তে আস্তে ফরয ওয়াজিবগুলোও ছুটে যায়। সুন্নাত তরীকা ছেড়ে দিলে বিদআত কুসংস্কার এসে পড়ে, গলদ তরীকা এসে পড়ে। সবচেয়ে বড় ফায়দা হল সুন্নাতের উপর গুরুত্বের সাথে আমল করলে রাসূল (সা.)-এর সাথে মহব্বত পয়দা হয়। আর রাসূল (সা.)-এর সাথে মহব্বত পয়দা হলে আল্লাহ তা'আলার সাথেও মহব্বত পয়দা হয়। কাজেই রাসূল (সা.)-এর সাথে মহব্বতের সম্পর্ক গড়তে হলে, আল্লাহর সাথে মহব্বত ভালবাসার সম্পর্ক গড়তে হলে, সুন্নাত তরীকার অনুসরণ করতে হবে। কুরআনে কারীমে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে,

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ.

অর্থাৎ, হে নবী! তুমি মানুষদেরকে বলে দাও! যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাসতে চাও, তাহলে আমার অনুসরণ কর।

অর্থাৎ, সুন্নাত তরীকা অনুসরণ কর। আমার অনুসরণ করলে আমার সাথে ভালবাসা সৃষ্টি হবে, তখন আল্লাহ তা'আলাও তোমাদেরকে ভালবাসবেন। দেখা গেল সুন্নাত তরীকার উপর আমল করলে রাসূলের মহব্বত অর্জন হয়, আল্লাহর মহব্বত অর্জন হয়। আর আল্লাহ, আল্লাহর রাসূলের সাথে যদি মহব্বত পয়দা হয়ে যায়, তাহলে কিয়ামতের দিন নাজাত পাওয়া সহজ হয়ে যাবে, জান্নাতে যাওয়া সহজ হয়ে যাবে। এজন্য রাসূল (সা.) বলেছেন,

مَنْ اَحَبَّ سُنَّتِيْ فَقَدْ اَحَبَّنِيْ وَمَنْ اَحَبَّنِيْ كَانَ مَعِيْ فِى الْجَنَّةِ. (مشكاة عن الترمذي)

অর্থাৎ, যে আমার সুন্নাতকে ভালবাসল সে যেন আমাকে ভালবাসল। আর যে আমাকে ভালবাসল সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।

এর বিপরীত যারা সুন্নাতের সাথে মহব্বত পয়দা করবে না, রাসূল (সা.)-এর তরীকার সাথে মহব্বত পয়দা করবে না; বরং বিদআত, রছম, কুসংস্কার ইত্যাদি রাসূল (সা.)-এর তরীকা বিরোধীপন্থা অনুসরণ করবে তাদের সম্পর্কে হাদীছে এসেছে কিয়ামতের দিন যখন মাথার কাছে সূর্য চলে আসবে, মানুষ পিপাসায় ছটফট করতে থাকবে, এই অবস্থায় রাসূল (সা.) হাউজে কাওছার থেকে তার উম্মতকে পানি পান করাবেন। এই হাউজে কাওছারের পানি এমন হবে হাদীছে এসেছে,

مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَايَظْمَأُ بَعْدَه اَبَدًا. (صحيح ابن حبان برقم ٦٤٥٢ وإسناده صحيح على شرط مسلم)

অর্থাৎ, রাসূল (সা.) বলেন আমার এ হাউজে কাওছার থেকে যে একবার পানি পান করবে, তারপর আর কখনও পিপাসায় তাকে কষ্ট দিবে না। মু'মিনরা কাতারে কাতারে, দলে দলে রাসূল (সা.)-এর কাছে

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



গিয়ে পানি পান করবেন। হাদীছে এসেছে, কিছু লোক রসূল সা.-এর সামনে আসবে, রসূল সা. তাদেরকে চিনবেন কিন্তু তাদেরক সামনে থেকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। রসূল সা. বলবেন এরা আমার উম্মত। কিন্তু তাকে বলা হবে,

إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا بَدَّلُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ بَدَّلَ بَعْدِي. (صحيح البخاري برقم ٧٠٥٠)

অর্থাৎ, আপনি জানেন না এরা আপনার পরে ধর্মে কি কি বিকৃতি ঘটিয়েছে। রসূল সা. বলেন, তখন আমি বলব, 'যারা আমার পরে ধর্মে বিকৃতি ঘটিয়েছে তাদেরকে আমার সামনে থেকে হটিয়ে দাও'।

সুন্নাতের সাথে তাদের কোন মহব্বত ছিল না, তারা বিদআত, কুসংস্কার ও মনগড়া পদ্ধতির উপরে চলত, তারা রাসূল (সা.)-এর সুন্নাত তরীকার অনুসরণ করত না, এ জন্যই তাদের প্রতি রাগান্বিত হয়ে রাসূল (সা.) বলবেন- এদেরকে আমার সামনে থেকে তাড়িয়ে দেয়া হোক। এজন্যই বলা হয়েছে সুন্নাত তরীকার উপর আমল করা ছাড়া নাজাতের উপায় নেই। কেউ যদি মনে করে যে, সুন্নাত করলে ছওয়াব আছে না করলে তো এমন কোন মারাত্মক গোনাহ নেই। বিশেষ জরুরী হল ফরয, ওয়াজিব, কাজেই ফরয, ওয়াজিব মানলেই চলে। যদি কেউ এরকম মনে করে, তাহলে তার কোন উপায় নেই। "কোন রকম সারলেই চলে" তার এই মনে করাটা মারাত্মক ভুল। সুন্নাতের উপর আমল করা ছাড়া নাজাতের উপায় থাকবে না।

সুন্নাত তরীকা বলতে শুধু উযূ, গোসল, নামায এবং আযান-ইকামতের সুন্নাত নয়, রাসূল (সা.) শুধু এই কয়েকটা বিষয়েরই সুন্নাত তরীকা শিক্ষা দিতে আসেননি। বরং যিন্দেগীর সব ক্ষেত্রের সুন্নাত তরীকা তিনি শিখিয়ে গেছেন। যিন্দেগীর সব ক্ষেত্রে রাসূলের শিখানো সেই সুন্নাত তরীকা বাস্তবায়ন করতে হবে, তাহলে রাসূল (সা.)-এর সাথে আমাদের মহব্বত হবে, তখন আমরা রাসূল (সা.)-এর সাথে জান্নাতে যেতে পারব।

সুন্নাতকে হালকা করে দেখার অবকাশ নেই, বরং সুন্নাতকে আযমত ও মহব্বতের দৃষ্টিতে দেখতে হবে। আমরা অনেক সুন্নাতকে সুন্নাত জানা সত্ত্বেও আমল করি না। সেটাকে হালকা করে দেখি, বা অবজ্ঞা করি। রাসূল (সা.)-এর সামনে যদি কেউ সুন্নাতকে হালকা করে দেখত বা অবজ্ঞা করত, তাহলে তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে যেতেন। মুসলিম শরীফে হযরত সালামা ইবনুল আকওয়া' (রা.) থেকে বর্ণিত একটি রেওয়ায়েতে এসেছে- এক ব্যক্তি রাসূল (সা.)-এর সামনে বাম হাত দিয়ে পানি পান করল। সুন্নাত হল ডান হাত দিয়ে পানি পান করা। যে কোন খাদ্য-খাবার হোক, যে কোন পানীয় হোক সব ডান হাত দিয়ে মুখে তুলা সুন্নাত। কিন্তু ঐ ব্যক্তি বাম হাত দিয়ে মুখে পানি তুলল। রাসূল (সা.) তাকে বললেন, كُلْ بِيَمِيْنِكَ অর্থাৎ, ডান হাত দিয়ে পান কর, মজলিসের ভিতরে মানুষের সামনে তার ভুল ধরা হল, এজন্য লোকটার অহংকারে লাগল যে, আমাকে মানুষের সামনে এভাবে অপমান করা হল। অনেক সময় আমাদেরও এরকম হয় যে, কেউ আমাদের ভুল ধরলে আমরা রাগ হয়ে যাই। আমাদের অহংকারে আঘাত লাগে। এর অর্থ হল আমরা নিজেদেরকে ভুলের উর্ধ্বে মনে করি। তাই ভুল ধরা হলে অসম্মানবোধ করি। ভিতরে অহংকার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। সেই অহংকারের কারণে আমরা ঐ আমল ছেড়েও দেই। ভাল কথা হলেও সেটা মানি না। অহংকার মানুষকে নেক আমল থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। এমনকি মানুষকে কাফের পর্যন্ত বানিয়ে দেয়। ইবলিস শয়তান কাফের হয়ে গিয়েছিল, তার কারণ ছিল এই অহংকার। আল্লাহ তা'আলা তাকে হুকুম দিয়েছিলেন আদমকে সাজদা কর! তখন তার ভিতরে অহংকার এসে গেল যে, আমি আগুনের তৈরি, আগুনের স্বভাব হল উপরের দিকে থাকা, আর আদম মাটির তৈরি, মাটির স্বভাব হল নিচের দিকে যাওয়া। তাই আমি আদমকে সাজদা করতে পারি না, আমি নীচের দিকে যেতে পারি না। কিন্তু সে চিন্তা করল না, এটা তো আল্লাহর হুকুমের সামনে অহংকার, এটাতো আল্লাহর হুকুমের বিপরীত যুক্তি দাঁড় করানো। আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধে যুক্তি দাঁড় করানো কুফরী। যারা এরকম করে, তারা

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

মুসলমান থাকতে পারে না। আল্লাহর যুক্তি কি আমার যুক্তির চেয়ে খাটো? আল্লাহর মেধা কি আমার মেধার চেয়ে দুর্বল? আমি কি আল্লাহর চেয়ে বেশি বুদ্ধি রাখি? আল্লাহ, আল্লাহর রাসূলের বিরুদ্ধে যুক্তি দাঁড় করার অর্থই হল আমি আল্লাহ, আল্লাহর রাসূলের চেয়ে বেশি বুঝি। তাহলে আল্লাহকে মানা হল কোথায়? ইবলিস আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধে যুক্তি দাঁড় করেছিল। তার ভিতর অহংকার এসে গিয়েছিল। এ কারণে সে কাফের হয়ে গেল। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ. (بقرة: ٣٤)

'অর্থাৎ, সে অস্বীকার করল, তার মধ্যে অহংকার এসে গেল এবং সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল'।

এই অহংকারের কারণে মানুষ অনেক সময় কথা অমান্য করে। হক কথা, ভাল কথা হওয়া সত্ত্বেও অহংকারের কারণে মানতে পারে না। রসূল (সা.)-এর সামনে যে ব্যক্তি বাম হাত দিয়ে পানি পান করেছিল আর রসূল (সা.) বলেছিলেন, 'ডান হাত দিয়ে পান কর'। সম্ভবত লোকটা মোনাফেক ছিল, সে মানল না বরং উল্টো বলল– لَا اَسْتَطِيْعُ 'অর্থাৎ, আমি ডান হাত দিয়ে খেতে পারি না'। বোঝাতে চাইল যে, আমার ডান হাতে একটু অসুবিধা আছে। আসলে তার ডান হাতে কোন অসুবিধা ছিল না। নিজের ভুলকে মেনে নেয়ার মত বিনয় তার মধ্যে ছিল না, বরং ছিল অহংকার। তাই আল্লাহর রাসূলের সামনে মিথ্যা কথা বলল। আল্লাহ কি তার রাসূলকে আসল কথাটা জানিয়ে দিতে পারেন না? তিনি জানিয়ে দিলেন। রাসূল (সা.) বললেন,

لَا اسْتَطَعْتَ، مَا مَنَعَهُ اِلَّا الْكِبْرُ. قَالَ فَمَا رَفَعَهَا اِلٰى فِيْهِ. (رواه مسلم برقم ٥٣٨٧)

'অর্থাৎ, তোমার যেন ডান হাত দিয়ে খাওয়ার শক্তি কোন দিন না হয়'। তিনি আরও বললেন, 'আসলে অহংকারই তার জন্য বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে'। তারপর সে আর কোনদিন তার হাত মুখ পর্যন্ত তুলতে পারেনি।

রাসূল (সা.) রহমতের নবী, দয়ার নবী, যার চেয়ে বেশি দয়া আর কারও হতে পারে না। এরকম দয়ার নবী হওয়া সত্ত্বেও তিনি বদ'দুআ করলেন। কারণ সে একটা সুন্নাতকে অবজ্ঞা করেছিল, যার কারণে রাসূলের ভিতরে রাগ এসে গেছে। রাগ এসে যাওয়ায় তিনি তার জন্য বদ'দুআ করেছেন। এরপরে হাদীছে বলা হয়েছে, ঐ লোকটা জীবনে আর কোন দিন ডান হাত তার মুখ পর্যন্ত উঠাতে পারেনি।

এ হাদীছ থেকে বুঝা গেল কোন সুন্নাতকে অবজ্ঞা করলে রাসূল (সা.)-এর এরকম রাগ এসে যেত। কারণ সুন্নাত অবজ্ঞা করার জিনিস নয়, মহব্বত করার জিনিস। সাহাবায়ে কেরাম তাবিঈনের সামনেও কোন সুন্নাত পরিত্যাগ হতে দেখা গেলে, কোন বিদআত হতে দেখা গেলে, তারা রাগান্বিত হয়ে যেতেন। তিরমিযী শরীফের রেওয়ায়েতে আছে– হযরত মুজাহিদ বলেন, একবার আমি হযরত ইব্নে ওমর (রা.)-এর সাথে এক মসজিদে প্রবেশ করলাম। সেখানে আযান হয়ে গিয়েছিল। আযানের পর আবার নামাযের এ'লান করা সুন্নাতের খেলাফ, বিদআত। আযানের পর সেই মসজিদের মুআয্যিন আবার নামাযের এ'লান করল। হযরত মুজাহিদ (রহ.) বলেন, তখন হযরত ইব্নে ওমর (রা.) অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে বললেন,

اُخْرُجْ بِنَا مِنْ عِنْدِ هٰذَا الْمُبْتَدِعِ، فَخَرَجَ وَلَمْ يُصَلِّ فِيْهِ. (سنن الترمذي ١٩٨)

'অর্থাৎ, সুন্নাত বর্জনকারী এই বিদআতীর এখান থেকে আমাকে অন্যত্র নিয়ে চল'। তিনি সেখান থেকে বের হয়ে গেলেন, সেখানে নামায পড়লেন না।

আর একটা ঘটনা শুনুন। ঘটনার আগে একটা মাসআলা শুনুন। আযানের সুন্নাত তরীকা হল প্রথম দুই আল্লাহু আকবার এক শ্বাসে বলা এবং আকবার শব্দের রা-তে সাকিন দিয়ে উচ্চারণ করা। দ্বিতীয় দুই আল্লাহু আকবারও এভাবে বলা। শেষের দুই আল্লাহু আকবারও এভাবে বলা। আর বাকী সব বাক্যগুলো

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা শ্বাসে বলা। আযানের প্রত্যেকটা শব্দে তাজবীদের নিয়মানুযী যেখানে যতটুকু টান দেয়ার সেটাকে ততটুকু টান দেয়া, তার চেয়ে বেশি টান না দেয়া। এটাই আযানের সুন্নাত তরীকা। কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেক মুআযযিন সাহেবই যতক্ষণ দম থাকে ততক্ষণ টানতে থাকেন। আমরাও অনেকে এরকম আযান পছন্দ করি, কারণ শুনতে ভাল লাগে। কিন্তু আমাদের ভাল লাগানোর জন্য এভাবে টানতে থাকলে আওয়াজের মধ্যে ঢেউ এবং চড়াই-উৎরাই হতে থাকে, অনেক সময় গানের সুরও এসে যায়। অথচ আযানের মধ্যে এরকম ঢেউ ও চড়াই এবং গানের সুর নিষিদ্ধ। বোখারী শরীফের রেওয়ায়েতে এসেছে, একবার এক মুআযযিন প্রসিদ্ধ তাবিয়ী হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহ.)-এর সামনে এভাবে গানের সুরে আওয়াজের মধ্যে ঢেউ দিয়ে আযান দিল। তখন হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহ.) রাগান্বিত হয়ে বললেন,

اَذِّنْ اَذَانًا سَمْحًا وَاِلَّا فَاعْتَزِلْنَا. (باب رفع الصوت بالنداء)

'অর্থাৎ, গানের সুর ও ঢেউ দেয়া ছাড়া, আওয়াজের মধ্যে চড়াই উৎরাই ছাড়া সরলভাবে আযান দাও, নতুবা আমাদের থেকে দূর হয়ে যাও'!

এসব রেওয়ায়েত থেকে বুঝা যায় সাহাবায়ে কেরাম ও তাবিয়ীন কোন সুন্নাত বর্জন হতে দেখলে বা কোন সুন্নাতের প্রতি অবজ্ঞা-অবহেলা হতে দেখলে রাগান্বিত হয়ে উঠতেন। কারণ সুন্নাত তুচ্ছ জানার বিষয় নয়, সুন্নাত অবজ্ঞা ও অবহেলা করার বিষয় নয়। বরং সুন্নাত গুরুত্ব ও মহব্বতের সাথে, যত্নের সাথে আমল করার বিষয়।

আমরা অনেক সময় এমন এমন কথা বলে থাকি যা কোন সুন্নাতকে অবজ্ঞা করা বোঝায়। যেমন– কেউ বলল ডান হাত দিয়ে খেতে হবে বাম দিয়ে খাওয়া যাবে না, এই সমস্ত ছোট ছোট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিস নিয়ে মোল্লা মৌলভীরা বাড়াবাড়ি করে আমাদেরকে পিছিয়ে রাখছে। পাশ্চাত্য জগত কত অগ্রসর হয়ে গেছে, তারা বাম হাত দিয়ে খায়, বাম হাতে খেলে কী অসুবিধা? এরূপ বলা দ্বারা সুন্নাতকে অবজ্ঞা করা হয়। পাশ্চাত্য জগত কী বাম দিয়ে খেয়ে অগ্রসর হয়েছে? বাম হাত দিয়ে খেলে উন্নতি হয় -এর পেছনে কেউ কোন যুক্তি দেখাতে পারবেন কি? কেউ কেউ মনে করছে পাশ্চাত্য জগতে পর্দা ব্যবস্থা না থাকায় তারা নারী-পুরুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে উন্নতি করছে। আর মোল্লা-মৌলভীরা আমাদেরকে পর্দার ফতোয়া দিয়ে পিছিয়ে দিচ্ছে। এটাও যুক্তিহীন কথা। যারা এরকম বলে, তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করি, পর্দা ব্যবস্থা তুলে দিলে কীভাবে উন্নতি হবে তার ব্যাখ্যা দিতে পারবেন কি? পর্দাহীন থাকলে উন্নতি হবে-এর পশ্চাতে কি যুক্তি আছে? উন্নতি হয় দায়িত্বশীল হয়ে কাজ করলে, দায়িত্বে অবহেলা না করলে, কাজে ফাঁকি না দিলে, অসদুপায় অবলম্বন না করলে। পাশ্চাত্য জগত উন্নতি করছে এসব গুণের কারণে, পর্দাহীনতার কারণে নয়। এক শ্রেণির লোক ইসলামের পর্দা ব্যবস্থা থেকে মুসলমানদেরকে সরানোর জন্য এরকম অপপ্রচার করছে যে, পর্দা প্রথার কারণে মুসলমানরা পিছিয়ে আছে। নারীদেরকে উলঙ্গ করে রাখলে কাজের উন্নতি হবে কীভাবে? তাতে তো কাজের চিন্তা আরও নষ্ট হবে। কামের চিন্তা বাদ দিয়ে আকামের চিন্তা আসতে থাকবে। সততার সাথে কাজ করুন, দায়িত্ব-নিষ্ঠার সাথে কাজ করুন, কাজের ফাঁকি বন্ধ করুন, ব্যক্তিস্বার্থ বর্জন করুন, তাহলে উন্নতি আসবে। উন্নতির জন্য ইসলাম এই নীতি শিখিয়েছিল। পাশ্চাত্য জগত এই নীতি গ্রহণ করে উন্নতি করেছে। আমরা এটা না করে ওদের অপসংস্কৃতির অনুসরণ করে মনে করছি, এটাই উন্নতির পথ। যাহোক যেকথা বলা হচ্ছিল– কেউ কেউ বলে হুজুররা সুন্নাত মুস্তাহাব –এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিস নিয়ে বাড়াবাড়ি করে। এরূপ বললে সুন্নাতকে অবজ্ঞা করা হয়। এগুলো বাড়াবাড়ি নয়। নিষ্ঠার সাথে ধর্মের কাজ করা বাড়াবাড়ি নয়। ধর্মের কাজ নিষ্ঠার সাথেই করতে হয়। মহব্বতের সাথেই করতে হয়, ভক্তির সাথেই করতে হয়।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

সুন্নাতের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন এত জঘন্য অপরাধ যে, এর কারণে আল্লাহর নবী বদ দু'আ করেছেন। কত বড় অপরাধ হলে রহমতের নবী হয়েও তিনি বদ দু'আ করতে পারলেন। আমরা যেভাবে সুন্নাত সমূহের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করি, তাতে মনে হয় আমরা যদি ঐ যুগে থাকতাম, তাহলে না জানি কতবার নবীর বদ দু'আর তলে পড়তাম। আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করেছেন।

অনেক সময় আমাদের মনে হতে পারে আমরা এই খারাপ যুগে এসেছি, এখন কত রকম ফেতনা, কত রকম অশ্লীলতার বিস্তার ঘটেছে। এখন ধর্ম-কর্ম পালন করা যায় না। রাসূলের যুগে থাকলে আমরা অনেক ভাল হতে পারতাম। কিন্তু এমন সম্ভাবনাও আছে যে, সেই যুগে থাকলে রাসূলের বদ দু'আরও পাত্র হতাম। আমাদের স্বভাবের মধ্যে যে পরিমাণ তেড়ামী, তাতে রাসূলের বদ দু'আর তলে পড়ার সম্ভাবনাও প্রচুর ছিল। রাসূলের যুগে থেকে যেমন আবূ বকর ওমর হয়েছে, আবূ জাহেল, আবূ লাহাবওতো হয়েছে। তাই আল্লাহ পাকই ভাল জানেন কাকে কোন্ যুগে পাঠানো ভাল। তাকদীর সম্পর্কে বিশ্বাসের মধ্যে একথাও আছে যে, আল্লাহ পাক যাকে যে যুগে পাঠানো ভাল, তাকে সে যুগে পাঠান- এই বিশ্বাস রাখতে হবে। রাসূলের যুগে কেউ কোন তেড়ামী করলে সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে তালিকা এসে যেত যে, এটা মোনাফেকদের তালিকাভুক্ত। আমাদেরকে এই যুগে পাঠিয়ে হয়ত আল্লাহ পাক আমাদের জন্য সুযোগ রেখে দিয়েছেন। আমরা কতকিছু করি, এরপরেও প্রকাশ্যে সিলমোহর লাগে না। একবার যদি রাসুলের মাধ্যমে বদদু'আ এসে যেত, তাহলে দুনিয়া আখেরাত নিশ্চিত বরবাদ হয়ে যেত। আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে আল্লাহ পাক আমাদের জন্য যেটা করেছেন ভালই করেছেন।

যাহোক রাসূল (সা.)-এর বদদু'আ থেকে বুঝা গেল, কোন সুন্নাতের সাথে অবহেলা করা, কোন সুন্নাতের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা জঘন্য অপরাধ। সুন্নাতের সাথে অবজ্ঞা বা অবহেলা করা নয় বরং মহব্বতের সাথে আমল করা চাই।

শুধু আযান-ইকামত এবং নামাযের সুন্নাত নয়, শুধু উযূ গোসলের সুন্নাত নয়, জীবনের সব ক্ষেত্রের জন্য সুন্নাত রয়েছে, এমনকি জুতা-স্যান্ডেল পরিধান করা এবং এস্তেঞ্জার বা পেশাব-পায়খানার ক্ষেত্রেও সুন্নাত রয়েছে। মুস্তাহাব-আদব সহকারে এস্তেঞ্জা বা পেশাব-পায়খানার প্রায় পঁয়ত্রিশটা সুন্নাত তরীকা রয়েছে। খাদ্য খাবার খাওয়া এবং পানাহার করার প্রায় পঞ্চাশটা সুন্নাত আমল রয়েছে। ঘুম-পড়ার বা নিদ্রার প্রায় পঁয়ত্রিশটা সুন্নাত রয়েছে। এমনিভাবে ঘর থেকে বের হওয়া, ঘরে প্রবেশ করা, মসজিদে প্রবেশ করা, মসজিদ থেকে বের হওয়া, চলা-ফেরা, উঠা-বসা, পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি সবকিছুর বিস্তারিত সুন্নাত তরীকা রয়েছে। আমার লেখা আহকামে যিন্দেগী কিতাবে এই সমস্ত বিষয়ের সুন্নাতসমূহ বিস্তারিতভাবে লিখে দেয়া হয়েছে। যাতে কেউ চাইলে এগুলো জেনে আমল করতে পারেন।

একদিনে যাবতীয় সুন্নাত আমলে আনা যাবে না। তবে অভ্যাস করলে ধীরে ধীরে আমলে এসে যায় এবং একসময় এমন একটা পর্যায় আসে যখন দৈনিক শত-শত বরং হাজার-হাজার সুন্নাত আমল হতে থাকে অথচ তাতে কোন কষ্টবোধ হয় না।

বুযুর্গানে দ্বীন যারা আমল করে থাকেন এবং যাদের আমলের অভিজ্ঞতা আছে, তারা বলেছেন কেউ যদি তিনটা সুন্নাতের উপরে যত্নের সাথে আমল শুরু করে, তাহলে এই তিনটা সুন্নাতের বরকতে বাকী প্রায় সব সুন্নাতগুলোর উপর আমল করা তার জন্য আছান হয়ে যায়। এই তিনটা সুন্নাত হল– সমস্ত ভাল কাজ বিসমিল্লাহ বলে শুরু করা, সমস্ত ভাল কাজ ডান দিক থেকে শুরু করা এবং বেশি বেশি সালাম করা। ইনশাআল্লাহ আগামী জুমুআয় এই তিনটা সুন্নাত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে জানার এবং আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



বয়ান নং ২৭-এর খুতবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْمُنْفَرِدِ بِالْخَلْقِ وَالْاِبْدَاعِ، اَلْمُسْتَقِلِّ بِالْاِيْجَادِ وَالْاِخْتِرَاعِ، اَلْمُثِيْبِ لِمَنِ امْتَثَلَ اَمْرَهٗ وَاَطَاعَ، وَالْمُنْتَقِمِ مِمَّنِ ابْتَدَعَ فِيْ اَمْرِهٖ وَاَضَاعَ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ فِيْ كُلِّ اَمْرٍ مُّطَاعٍ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهُ الْهَادِيْ اِلٰى سَبِيْلِ السُّنَّةِ وَهُوَ سَبِيْلُ النَّجَاةِ عَنِ الضِّيَاعِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اِلٰى يَوْمِ الْوَدَاعِ.

اَمَّا بَعْدُ :

اَيُّهَا النَّاسُ! اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى بَعَثَ رَسُوْلَهٗ وَخَتَمَ بِشَرِيْعَتِهِ الشَّرَائِعَ وَالْاَدْيَانَ، وَاَوْضَحَ مَا شَرَعَهٗ مِنَ الدِّيْنِ وَاَبَانَ، فَالْعِصْمَةُ وَالنَّجَاةُ لِمَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ بِمَا فِي الْقُرْاٰنِ وَالسُّنَّةِ مِنْ اَهْلِ الْاِسْلَامِ وَالْاِيْمَانِ، وَلَا يَتَّبِعُ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، فَقَدْ وَصَّاكُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْ كِتَابِهٖ بِالتَّوْحِيْدِ وَالْعِبَادَاتِ، وَ وَصَّاكُمْ نَبِيُّهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّمَسُّكِ بِسُنَّتِهٖ وَالْاِبْتِعَادِ عَنِ الْبِدْعَاتِ وَالْمُحْدَثَاتِ. وَقَدْ وَرَدَ الْوَعِيْدُ الشَّدِيْدُ عَلٰى مَنْ تَرَكَ السُّنَّةَ وَاشْتَغَلَ بِالْبِدْعَةِ، وَفِي الْحَدِيْثِ يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِاُنَاسٍ اَحْدَثُوْا وَيُعْرَضُوْنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْحَوْضِ فَيَقُوْلُ سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِيْ.

وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى جَعَلَ حُبَّهٗ فِيْ حُبِّهٖ، قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ، وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ. وَ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : مَنْ اَحَبَّ سُنَّتِيْ فَقَدْ اَحَبَّنِيْ وَمَنْ

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

اَحَبَّنِىْ كَانَ مَعِىْ فِى الْجَنَّةِ. فَمَنْ لَّمْ يَكُنْ عَاشِقًا لِّسُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْسَ مِنْ عُشَّاقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَاِنِ ادَّعٰى مِاَةَ دَعْوَةٍ.

عِبَادَ اللّٰهِ! عَلَيْكُمْ بِاِتِّبَاعِ السُّنَّةِ فِىْ كُلِّ شُعْبَةٍ مِّنْ شُعَبِ الْحَيَاةِ، وَكَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْضَبُ عَلٰى مَنْ تَرَكَ السُّنَّةَ وَاسْتَخَفَّهَا. وَفِى الْحَدِيْثِ ـ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْاَكْوَعِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، اَنَّ رَجُلًا اَكَلَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِمَالِهٖ، فَقَالَ : كُلْ بِيَمِيْنِكَ، قَالَ : لَا اَسْتَطِيْعُ، قَالَ : لَا اسْتَطَعْتَ، مَا مَنَعَهٗ اِلَّا الْكِبْرُ. فَمَا رَفَعَهٗ اِلٰى فِيْهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَكَذَا الصَّحَابَةُ رِضْوَانُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْنَ كَانُوْا يَغْضَبُوْنَ عَلٰى مَنْ تَرَكَ السُّنَّةَ وَاشْتَغَلَ الْبِدْعَةَ. رُوِىَ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ مَسْجِدًا وَقَدْ اُذِّنَ فِيْهِ، وَنَحْنُ نُرِيْدُ اَنْ نُّصَلِّىَ فِيْهِ، فَثَوَّبَ الْمُؤَذِّنُ، فَخَرَجَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَقَالَ : اُخْرُجْ بِنَا مِنْ عِنْدِ هٰذَا الْمُبْتَدِعِ. كَذَا فِى التِّرْمِذِىْ فِىْ بَابِ مَا جَآءَ فِى التَّثْوِيْبِ فِى الْفَجْرِ. وَكَذَا التَّابِعُوْنَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ كُلُّهُمْ يَغْضَبُوْنَ عَلٰى مَنْ تَرَكَ السُّنَّةَ. رُوِىَ ـ اَنَّ رَجُلًا اَذَّنَ فَطَرَبَ وَتَنَغَّمَ فِيْهِ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ : اَذِّنْ اَذَانًا سَمْحًا، وَاِلَّا فَاعْتَزِلْنَا. كَذَا فِى الْبُخَارِىْ فِىْ بَابِ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالنِّدَآءِ.

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ : قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ، وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ، وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. اَقُوْلُ قَوْلِىْ هٰذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ لِىْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَاسْتَغْفِرُوْهُ، اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



বয়ান নং -২৮

## বিশেষ ৩টি সুন্নাতের আমল

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ، وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ. وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ: كُلُّ اَمْرٍ ذِىْ بَالٍ لَّا يُبْدَاُ فِيْهِ بِسْمِ اللّٰهِ فَهُوَ اَقْطَعُ.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আধা অক্ষরে মুসলমান নয় বররূপূর্ণাঙ্গ মুসলমান হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। একজন মানুষের জীবনের সবকিছু যখন ইসলামের তরীকা অনুযায়ী ইসলামের হুকুম-আহকাম অনুযায়ী হয়ে যায়, তখন সে হয় পূর্ণাঙ্গ মুসলমান। একজন মানুষের উঠা-বসা, চলা-ফেরা, খাওয়া-দাওয়া, চাল-চলন, আচার-আচরণ, চাকুরী-বাকরী, ব্যবসা-বাণিজ্য, লেবাস-পোষাক ইত্যাদি সবকিছু যখন ইসলাম অনুযায়ী হবে, তখন সে হবে পূর্ণাঙ্গ মুসলমান। কিছু ইসলাম অনুযায়ী হল, কিছু সমাজের প্রচলিত রীতি-নীতি অনুযায়ী হল, কিছু নিজের খেয়াল-খুশিমত হল অর্থাৎ, ইসলামের কিছু মানল আর কিছু মানল না, তাহলে সে পূর্ণাঙ্গ মুসলমান নয়।

ইসলাম অর্থই হল নিজেকে সোপর্দ করে দেয়া। নিজেকে ইসলামের কাছে সম্পূর্ণরূপে সোপর্দ করে দিতে হবে। আমার কোনোকিছু নিজস্ব ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী, নিজস্ব খেয়াল-খুশি অনুযায়ী চালাতে পারব না। সবকিছু ইসলামের কাছে সোপর্দ করে দিতে হবে, তাহলে আমি খাঁটি অর্থে মুসলমান, পূর্ণাঙ্গ অর্থে মুসলমান।

জীবনের সবকিছু ইসলামের আলোকে ঢেলে সাজানো বেশ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। একদিনে এটা করা যায় না। একদিনে সব আমল এসে যায় না। একটা, দুইটা, পাঁচটা করে আমল করতে করতে আস্তে-আস্তে নিজেকে অভ্যস্থ করে তুলতে হয়। এভাবে আমল বাড়াতে বাড়াতে একদিন এরকম সময় আসে, যখন জীবনের সবকিছুই ইসলাম অনুযায়ী হয়ে যায়।

বুযুর্গানে দ্বীন কুরআন-হাদীছের আলোকে এবং অভিজ্ঞতার আলোকে বলেছেন, তিনটা আমল এমন আছে অর্থাৎ, তিনটা সুন্নাত এমন আছে, যদি কেউ যত্নের সাথে এই তিনটা সুন্নাত পালন করতে থাকে, তাহলে এই সুন্নাতের বরকতে তার জীবনে অন্যান্য অনেক সুন্নাত আস্তে আস্তে এসে যায়, অন্যান্য অনেক সুন্নাত আমল করা তার জন্য সহজ হয়ে যায়।

এক নম্বর হল– প্রত্যেকটা ভাল কাজ বিস্‌মিল্লাহ দ্বারা শুরু করা। হাদীছে এসেছে,

كُلُّ أَمْرٍ ذِي بالٍ لا يُبْدأُ فِيهِ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَهُوَ أَقْطَعُ. (قال النووي في كتاب الأذكار : حديث حسن)

অর্থাৎ, যত ভাল কাজ, যত গুরুরূপূর্ণ কাজ রয়েছে, সেগুলো করার সময় শুরুতে বিসমিল্লাহ পাঠ করা না হলে তা বরকতহীন হয়ে যায়।

প্রত্যেকটা ভাল কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা সুন্নাত। খারাপ কাজ বা গোনাহের কাজ করলে তার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা যাবে না। কোন মুসলমান খারাপ করতে পারে, এটা কল্পনাও করা যায়

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

না। তাই বলা যায় মুসলমান যা করবে, সব ভালই করবে। অতএব মুসলমান তার প্রত্যেকটা কাজ বিসমিল্লাহ দ্বারা শুরু করবে, তাহলে সেই কাজে বরকত হবে। যখন খানা খাবে বিস্‌মিল্লাহ বলে শুরু করবে, তাহলে খানার ভিতরে বরকত আসবে। যখন পান করবে, বিসমিল্লাহ বলে পান করা শুরু করবে, তাহলে তার ভিতরে বরকত আসবে।

পানাহারের বরকত এমন জিনিস যা এক কথায় বোঝানো কঠিন। একটা উদাহরণ সহকারে বুঝা যায়। যেমন– একজন মানুষ অনেক দামি জিনিস, অনেক দামি খাবার খেল, কিন্তু তার তৃপ্তি হল না, কিংবা সেই খাদ্য তার স্বাস্থ্যের অনুকূলে আসল না, বরং সেটা তার রোগ-ব্যাধির কারণ হয়ে দাঁড়াল, সেটা তার পেটের অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়াল, তার স্বাস্থ্যের অবনতির কারণ হয়ে দাঁড়াল। এর অর্থ হল, তাদের খাদ্যে বরকত হয়নি। এর বিপরীত একজন মানুষ যা কিছুই খায়, তার তৃপ্তি এসে যায়, তার স্বাস্থ্যের খুব উপকারে আসে, তার শারীরিক শান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এর অর্থ হল, তার খাবারে বরকত হয়। এই বরকত জোর করে আনা যায় না, যদি আল্লাহ পাক না দেন। একজন লোক খুব কোরমা পোলাও খাচ্ছে, কিন্তু এত কিছু খেয়েও সে তৃপ্তি পাচ্ছে না, আরেকজন লোক শাক-ভাত খেয়েও মনে তৃপ্তি পাচ্ছে, এটা হল বরকত। আল্লাহ পাকই এই বরকত দান করছেন। বিসমিল্লাহ বলে খানা শুরু করলে আল্লাহ পাক তার ভিতরে বরকত দান করেন।

এমনিভাবে প্রত্যেক কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলে নিলে তাতে বরকত আসবে। পোষাক পরিধান করবে বিসমিল্লাহ বলে পরিধান করবে, যখন খুলবে বিসমিল্লাহ বলে খুলবে, তাহলে তাতে বরকত হবে। ঘর থেকে বের হবে বিস্‌মিল্লাহ্ বলে বের হবে, তাহলে ঐ বের হওয়ার ভিতরে বরকত হবে। যখন প্রবেশ করবে বিসমিল্লাহ বলে প্রবেশ করবে, প্রবেশ করার মধ্যে বরকত হবে। আমরা যে কোন ভাল কাজ উপলক্ষে ঘর থেকে বের হব, বিসমিল্লাহ বলে বের হলে সেই কাজে বরকত হবে। এ ব্যাপারে আমাদের মধ্যে নানান রকম কুসংস্কার আছে। কিছু কিছু বিষয় এমন আছে– বের হওয়ার সময় সেগুলো ঘটলে আমরা মনে করি আমাদের যাত্রা অশুভ হয়ে যায়, যে উদ্দেশ্যে বের হয়েছি তা নষ্ট হয়ে যায়। যেমন– ঘর থেকে বের হওয়া মাত্রই একটা হোঁচট খেলাম বা হাঁচি আসল, ব্যস মনে করলাম আমার যাত্রা অশুভ! কিংবা বের হয়েই একটা মেয়ে মানুষের মুখ দেখলাম, কিংবা কালো হাড়ি বা কালো কলসী দেখলাম, ব্যস মনে করলাম আজকে আমার যাত্রা অশুভ! এগুলি কুসংস্কার। আমি বিস্‌মিল্লাহ বলে বের হব, আমার যাত্রা ভাল হবে, আমার বের হওয়ার মধ্যে বরকত হবে। বিস্‌মিল্লাহ বললাম না তাহলে আমার বের হওয়ার মধ্যে বরকত হবে না। হোচট খাওয়া, হাচি আসা, মেয়ে মানুষ দেখা বা কাল কিছু দেখা ইত্যাদির দ্বারা যাত্রা অশুভ হয় –এগুলো হিন্দুয়ানী ধারণা। এই উপমহাদেশে হিন্দুদের সংস্পর্শে থাকার কারণে তাদের থেকে মুসলমানদের মধ্যে এই সমস্ত কুসংস্কার ঢুকেছে। এই হলে যাত্রা শুভ হয়, এই হলে যাত্রা অশুভ হয়, অমুক সময় যাত্রা শুভ, অমুক সময় যাত্রা অশুভ, অমুক সময় যাত্রা নাস্তি ইত্যাদি হিন্দু সমাজের ধারণা। ইসলামে অশুভ সময় বলে কোন ধারণা নেই। সব সময়ই শুভ। বিস্‌মিল্লাহ বলে কাজ করলে যে সময়েই করা হোক না কেন তাতে বরকত হবে, সেটা শুভ হবে। কোন সময়কে অশুভ মনে করা যাবে না। হাদীছে ইরশাদ হয়েছে,

لَا تَسُبُّوْا الدَّهْرَ، فَإِنَّ اللّٰهَ هُوَ الدَّهْرُ. (صحيح مسلم برقم ٦٠٠٣)

'অর্থাৎ, তোমরা সময়কে গালি দিও না, সময়কে খারাপ বল না, সময়তো আল্লাহ তাআলা কর্তৃক পরিচালিত'।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



কাজেই ইসলামে "কোন সময় খারাপ" বলে কোন ধারণা নেই। হিন্দুদের লিখিত পঞ্জিকায় দেখা যায় অমুক দিন বিবাহ নাস্তি, অর্থাৎ, অমুক দিনে বিবাহ নেই। অমুক দিনক্ষণে যাত্রা নাস্তি, ইত্যাদি। হিন্দুদের পঞ্জিকায় এসব লেখা দেখে আস্তে-আস্তে মুসলমানদের পঞ্জিকায়ও এগুলো লেখা শুরু হয়েছে। একসময় গ্রাম্য কিছু লোকের সব বিদ্যার মূল ছিল পঞ্জিকা। পঞ্জিকা পড়ে-পড়ে তারা এগুলো শিখেছে, আর তার থেকেই এসব কথার প্রচলন ঘটে গেছে যে, অমুক-অমুক দিন বিবাহ করা যাবে না, অমুক-অমুক দিন যাত্রা করা যাবে না। ইত্যাদি। ইসলামে বিবাহের কোন দিনক্ষণ নেই, যে কোন দিন বিবাহ দিতে পারে, যে কোন মাসে বিবাহ হতে পারে, যখন ইচ্ছা তখন বিবাহ হতে পারে। হ্যাঁ এতটুকু কথা রয়েছে যে, শাওয়াল মাসে বিবাহ করা উত্তম এবং মসজিদে বিবাহ পড়ানো উত্তম।

এখনও অনেক মানুষকে দেখা যায় বিবাহ শাদীর প্রোগ্রাম করার সময় পঞ্জিকায় খুঁজতে শুরু করে যে, কোন দিন শুভ, কোন দিন অশুভ। অথচ ইসলামে সবদিন শুভ। অশুভ দিন বলে কোন ধারণা ইসলামে নেই বরং ইসলামে বলা হয়েছে প্রত্যেকটা কাজ বিস্‌মিল্লাহ বলে শুরু কর, তাহলে তোমার কাজ বরকতের হবে, তোমার কাজ শুভ হবে। বিস্‌মিল্লাহ বলে শুরু কর, তাহলে তোমার যাত্রাও শুভ হবে, বিবাহ-শাদীও শুভ হবে, সবকিছুই শুভ হবে। আর বিসমিল্লাহ দ্বারা শুরু না করলে সেটা বরকতহীন হয়ে যাবে, সেটা অশুভ হবে, চাই যত পঞ্জিকা দেখে আর জ্যোতিষীদের থেকে যাচাই করেই কর না কেন। বিস্‌মিল্লাহর মধ্যেই বরকত, বিসমিল্লাহ ছাড়া বরকত নেই।

আমরা যে কোন কাজ করি, বিসমিল্লাহ বলে শুরু করলেই তাতে বরকত। আমি বিস্‌মিল্লাহ বলে পড়া শুরু করব, তাহলে পড়ার ভিতরে বরকত আসবে। পড়ার মধ্যে বরকত কী, তা আমরা অনেকেই বুঝতে পারি। কেউ অনেকক্ষণ ধরে পড়েও তার মনের মধ্যে গাঁথে না, এটা হল বরকতহীনতা। এর বিপরীত একজন অল্প সময় পড়েও তার মনের মধ্যে সব কথা গেঁথে যায়, এটা হল বরকত। অল্প সময়ে অনেক সময়ের কাজ হয়ে যায়, এটা হল সময়ের বরকত। দুইজন কাঠুরিয়া কাঠ ফাঁড়ছিল। একজন আরেকজনকে বলল, ভাই চলুন নামাযের সময় হয়ে গেছে, নামায পড়ে আসি। নামায পড়লে আল্লাহ তা'আলা কাজে বরকত দিবেন। সে জওয়াব দিল কাজ না করলে আবার বরকত কী? এত নামায পড়লে আমি কাঠ ফাঁড়ব কখন? পয়সা না হলে পরিবারকে খাওয়াব কী? তুমি যাও নামায পড়ে আস। সে নামাযে গেল না, কাঠ ফাঁড়তে থাকল। আরেকজন নামায পড়তে গেল। দেখা গেল যে নামাযে গেল না, সে কাঠে কোপ দিচ্ছে কিন্তু কাঠ ফাঁড়ছে না, কাঠের সাথে কুড়াল লেগে থাকছে বা কুড়াল ছিটকে পড়ছে। সে কোপ দিয়েই যাচ্ছে, কিন্তু কাষ্ঠ আর বের হচ্ছে না। আরেকজন নামায পড়ে এসে কোপ দিতে শুরু করল, কোপ দিচ্ছে আর ফটাফট ফেঁড়ে যাচ্ছে। দেখা গেল নামাযীর কাজে বরকত হল, আর বে-নামাযীর কাজে বরকত হল না। বিস্‌মিল্লাহর ভিতরে কী বলা হয়, যার কারণে কাজে বরকত হয়? তাহলে শুনুন -বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম-এর অর্থ হল আমি বা আমরা আল্লাহ্‌র নামের সাহায্য কামনা করে এই কাজ শুরু করছি। বিস্‌মিল্লাহর মধ্যে আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করা হয়, আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করা হয়। আর যখন প্রত্যেকটা কাজে আল্লাহর নামের সাহায্য কামনা করে কাজ শুরু করা হয়, তখন আল্লাহ পাক দেখেন যে, বান্দা প্রত্যেকটা পদে-পদে আমার সাহায্য কামনা করছে, তাকে সাহায্য করার তো আর কেউ নেই। এভাবে আল্লাহ পাক তাকে সাহায্য করার জন্য উদ্বুদ্ধ হয়ে যান। আল্লাহর রহমত তাকে সাহায্য করার জন্য উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। তার প্রত্যেকটা পদে পদে আল্লাহর নুসরত, আল্লাহর সাহায্য আসে। আর যখন কারও কোন বিষয়ে আল্লাহর সাহায্য আসে, তখন

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

ঐ কাজে সে সফল হয়। অতএব বিসমিল্লাহ দ্বারা শুরু করার অর্থ হল– আল্লাহ্‌র সাহায্য ও রহমতকে সাথে নিয়ে কাজটা শুরু করলাম। এর বিপরীত বিসমিল্লাহ ছাড়া শুরু করলাম এর অর্থ হল– আল্লাহর সাহায্যের চিন্তা বাদ দিয়ে আমি নিজের উপর নির্ভর করেই কাজ শুরু করলাম, যেন আমিই কাজটা করে ফেলতে পারব। অথচ আল্লাহ্‌র সাহায্য ছাড়া বান্দা কোন কাজ চূড়ান্ত করতে পারে না।

প্রত্যেকটা কাজ বিস্‌মিল্লাহ দিয়ে শুরু করলে আর একটা ফায়দা এই হয় যে, প্রত্যেকটা পদে-পদে আল্লাহকে স্মরণ হয়। আমরা জীবনে যত কাজ করি, সবকাজ যদি বিসমিল্লাহ্‌ দ্বারা শুরু করি, তাহলে প্রতিদিন শত-শত বার, হাজার-হাজার বার আল্লাহকে স্মরণ হবে। এভাবে পদে-পদে আল্লাহকে স্মরণ করার অভ্যাস গড়ে উঠবে। পদে-পদে আল্লাহ থেকে সাহায্য চাওয়ার মনোভাব গড়ে উঠবে। তাই বিস্‌মিল্লাহ দ্বারা প্রত্যেকটা কাজ শুরু করি। এমনকি জুতা পরিধান করার সময়ও বিস্‌মিল্লাহ বলে পরিধান করি, পোষাক পরিধান করার সময় এবং খোলার সময়ও বিস্‌মিল্লাহ বলি, খেত-খামার, ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্রয়-বিক্রয় সবকিছু বিস্‌মিল্লাহ বলে শুরু করি, তাহলে সবকিছুতে বরকত হতে থাকবে। যখন বিক্রেতা প্রথম মাল বিক্রি করবে এবং প্রথম পয়সা হাতে আসবে, বিস্‌মিল্লাহ বলে সেটা গ্রহণ করবে। তাহলে আল্লাহ পাক ঐ পয়সার ভিতরে বরকত দান করবেন। রিক্স ওয়ালারা প্রথম ভাড়ার পয়সা বিস্‌মিল্লাহ বলে গ্রহণ করবে, তাহলে তার ইনকামে বরকত হবে। কিন্তু দেখা যায় অনেক রিক্সওয়ালা প্রথম ভাড়াটা পেয়ে কপালে ঠেকায়, রিক্সর হ্যান্ডেলে ঠেকায় এবং রিক্সর হ্যান্ডেলে চুমু খায়। আমি অনেক রিক্সওয়ালাকে জিজ্ঞেস করেছি রিক্সর হ্যান্ডেলে ঠেকান কেন? রিক্সয় চুমু দেন কেন? একজন জওয়াব দিয়েছে যে, এই রিক্সই তো আমাকে দিচ্ছে। আমি বলেছি রিক্স কি খোদা? রিক্স দেনেওয়ালা নয়, দেনেওয়ালা আল্লাহ পাক। রিক্স একটা বোধ-সোধহীন যন্ত্র, ওর কোন বোধ নেই, ওর কোন জ্ঞান নেই, ও দিতে পারে না। ওকে সালাম করে কী হবে? আল্লাহ আপনাকে দিবেন। আল্লাহ পাকই দেনেওয়ালা, আল্লাহ পাকই বরকত দেনেওয়ালা। কাজেই আল্লাহর নামে বিস্‌মিল্লাহ বলে পয়সাটা গ্রহণ করবেন, তাতেই বরকত হবে। রিক্সয় সালাম দেয়া, হ্যান্ডেলে চুমু দেয়া এগুলো বরকত অর্জন করার পদ্ধতি নয়।

আমরা জীবনের অনেক ক্ষেত্রে গলদ পদ্ধতি ধরে বসে থাকি। অনেক দোকানদারকে দেখা যায়, যখন প্রথম দোকান খোলে, তখন বাকি দেয় না। বলে কেবল দোকান খুললাম, এখনই বাকি দেয়া যায় না। শুরুতেই বাকি দিলে সারা দিন ফাঁকি যাবে। অথচ বাকি দিলে ফাঁকি হয় না, ফাঁকি হয় বিস্‌মিল্লাহ না বললে। বিসমিল্লাহ বললে বরকত হবে। বিস্‌মিল্লাহ বলে বাকি দিলেও আল্লাহ পাক বরকত দিতে পারেন, কারণ বাকি দেয়াতেও ছওয়াব আছে। যেহেতু বাকি দিলে একজনের উপকার করা হয়। যাহোক প্রথমে বাকি দিলে সারা দিন ফাঁকি যাবে বা সারাদিন বে-বরকতী হবে –এই ধারণা ঠিক নয়। বে-বরকতী হবে বিস্‌মিল্লাহ ছাড়লে। এটাই হাদীছের শিক্ষা। তাই জীবনের প্রত্যেকটা পদে-পদে বিস্‌মিল্লাহ থাকতে হবে। প্রত্যেকটা কাজ বিসমিল্লাহ দ্বারা শুরু করতে হবে। এটা এমন একটা সুন্নাত, যে সুন্নাতের উপর আমল করলে অন্যান্য অনেক সুন্নাতের উপর সহজে আমল আসবে।

দ্বিতীয় সুন্নাত হল– প্রত্যেকটা ভাল কাজ ডান দিক থেকে শুরু করা। এই সুন্নাতের উপর আমল করলেও অন্যান্য অনেক সুন্নাতের উপর আমল করা আছান হয়ে যাবে। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন–

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِيْ تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُوْرِهِ وَشَانِهِ كُلِّهِ.

(صحيح البخاري ١٦٨)



'অর্থাৎ, নবী কারীম (সা.) জুতো/স্যান্ডেল পরিধান করা, চুল আচড়ানো, উযূ গোসল করা ইত্যাদি সবসময় ডান দিক থেকে শুরু করা পছন্দ করতেন'।

নবী (সা.)-এর মাথায় বাবরী ছিল। তিনি বাবরীর মাঝখান থেকে শিথি করতেন। আগে ডান দিকে করতেন, পরে বাম দিকে করতেন। তাই চুল আচড়ানোর সময় এবং শিথি করার সময় আগে ডান দিক পরে বাম দিক করা সুন্নাত। মহিলারাও আগে ডান দিকে পরে বাম দিকে চুল আঁচড়াবেন। যখন জামা পরিধান করা হবে, তখন প্রথমে ডান হাত, পরে বাম হাত ঢোকানো সুন্নাত। পায়জামা পরিধান করার সময়ও আগে ডান পা পরে বাম পা ঢোকানো সুন্নাত। জুতা পরিধান করার সময়ও আগে ডান পা পরে বাম পা ঢোকানো সুন্নাত। উযু করার সময়ও আগে ডান হাত পরে বাম হাত, আগে ডান পা পরে বাম পা ধোয়া সুন্নাত। গোসল করার সময়ও আগে ডান দিকে পরে বাম দিকে পানি ঢালা সুন্নাত। এভাবে সমস্ত ভাল কাজ ডান দিক থেকে শুরু করা সুন্নাত।

কিছু কিছু কাজ এমন আছে, যা ভাল, তবে তুলনামূলকভাবে খারাপ। যেমন বাথরুমে যাওয়া। পেশাব-পায়খানা হয়ে গেলে স্বাস্থ্যের উপকার হয়, শরীর সুস্থ থাকে। এ হিসেবে বাথরুমে বা পেশাবখানায় প্রবেশ করা খারাপ কাজ নয়। তবে স্থানটা নাপাকীর স্থান, এ হিসেবে তুলনামুলকভাবে স্থানটা খারাপ। তাই এখানে প্রবেশ করার সময় বাম পা দিয়ে প্রবেশ করা সুন্নাত এবং বের হওয়ার সময় ডান পা দিয়ে বের হওয়া সুন্নাত। মনে রাখতে হবে, যে আমল শুরু হবে ডান দিক থেকে, সেটা শেষ করতে হবে বাম দিক থেকে। আর যে আমল শুরু হবে বাম দিক থেকে সেটা শেষ হবে ডান দিক থেকে। যেমন– জামা পরিধান করলাম ডান হাত আগে দিয়ে, যখন জামা খুলব তখন আগে বাম হাতেরটা খুলব। পায়জামা পরিধান করব প্রথমে ডান পা পরে বাম পা, খোলার সময় আগে বাম পায়েরটা খুলব পরে ডান পায়েরটা খুলব। জুতা পরিধান করার সময় প্রথমে ডান পা পরে বাম পা, খোলার সময় প্রথমে বাম পা পরে ডান পা।

যাহোক জীবনের প্রত্যেকটা পদে-পদে প্রত্যেকটা ভাল কাজ ডান দিক থেকে শুরু করা সুন্নাত। ডানের ভিতরে আল্লাহ পাক বরকত রেখেছেন। ডান হাত দিয়ে আহার করলে তার মধ্যে বরকত, ডান হাত দিয়ে পান করলে তার মধ্যে বরকত। বাম হাত দিয়ে পানাহার করলে তার মধ্যে বরকত থাকবে না। হাদীছে এসেছে নবী (সা.) বলেন,

لَايَأْكُلْ اَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ وَلَايَشْرَبْ بِشِمَالِهِ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ.

(رواه الترمذي برقم ١٧٩٩ وقال : حسن صحيح)

'অর্থাৎ, তোমাদের কেউ যেন বাম হাত দিয়ে খাবার না খায়, বাম হাত দিয়ে পান না করে। কারণ শয়তান বাম হাতে খায় বাম হাতে পান করে'।

হাদীছের এই স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে আমরা অনেকে বাম হাতে পানাহার করি। অনেকে বাম হাতে পানাহার করাকে ফ্যাশন মনে করে। বাম হাতে পানি খায়, বাম হাতে চা পান করে আর মনে করে খুব ফ্যাশন হচ্ছে। কিন্তু এটা কিসের ফ্যাশন? বাম হাতে খেলে কি সুন্দর দেখায়? ডান হাতে খেলে কি অসুন্দর দেখায়? কিন্তু মানুষ বাম হাতে খাচ্ছে আর মনে করছে এর ভিতরে কী যেন একটা মুড আছে, কী যেন একটা সৌন্দর্য আছে। এর মধ্যে কোন ভাল মুড নেই, আছে শুধু শয়তানের মুড। কারণ শয়তানই এই মুডে পানাহার করে। আর কোন মুমিনের কাছে শয়তানের মুড সুন্দর মনে হতে

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.
Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

পারে না। মুমিনের কাছে সেটাই সুন্দর লাগবে, সেটাই পছন্দনীয় লাগবে, যেটা নবী কারীম (সা.) পছন্দ করতেন। নবী কারীম (সা.) প্রত্যেকটা কাজ ডান দিক থেকে শুরু করা পছন্দ করতেন। ডান হাতে পানাহার করা পছন্দ করতেন। এটাই সুন্নাত।

দেখা যাবে জীবনে আমরা যত ভাল কাজ করি, সব যদি ডান দিক থেকে শুরু করি তাহলে প্রতিদিন আমাদের হাজার-হাজার সুন্নাতের উপর আমল হচ্ছে। আর এই হাজার-হাজার সুন্নাতের উপর আমলের বরকতে আরও বহু সুন্নাতের উপর আমল করা আছান হয়ে যাবে। তাই বলা হয়েছে তিনটা এমন সুন্নাত রয়েছে, যেগুলোর উপর আমল করলে অন্যান্য অনেক সুন্নাত অটোমেটিক এসে যায়। অন্যান্য অনেক সুন্নাতের উপর আমল করা সহজ হয়ে যায়। তার ভিতরে একটা হল বিস্‌মিল্লাহ দ্বারা প্রত্যেকটা কাজ শুরু করা। আর একটা হল প্রত্যেকটা কাজ ডান দিক থেকে শুরু করা।

তৃতীয় আর একটা সুন্নাত হলঃ বেশি বেশি সালাম করা। এটাও এমন একটা সুন্নাত, যার উপর আমল করলে অন্যান্য আরও বহু সুন্নাতের উপর আমল করা আছান হয়ে যাবে। প্রতিদিন শত-শত বরং হাজার-হাজার মানুষের সাথে আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হয়। যদি এই শতবার, হাজার-হাজার বার আমরা সালাম দেই, তাহলে প্রতিদিন শুধু সালামের দ্বারাই শত-শত বরং হাজার-হাজার সুন্নাত আমল হয়ে যাবে। আর এই সুন্নাতের বরকতে জীবনে আরও বহু সুন্নাতের আমল আসতে থাকবে। হাদীছে তাই বেশি বেশি করে সালাম দিতে বলা হয়েছে। নবী কারীম (সা.) বলেছেন,

اَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ. (صحيح مسلم برقم ٢٠٣ وسنن الترمذي برقم ٢٤٨٥وقال : حديث صحيح)

'অর্থাৎ, তোমরা নিজেদের মধ্যে সালামের বিস্তার ঘটাও'।

বেশি বেশি সালাম দিলেই সালামের বিস্তার ঘটবে। সালামের ব্যাপক প্রচলন ঘটাতে বলা হয়েছে, সালামের বিস্তার ঘটাতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ বেশি বেশি করে সালাম দিতে বলা হয়েছে। এক মুসলমান আর এক মুসলমানের সাথে দেখা সাক্ষাৎ হলে সালাম দেয়ার যে নিয়ম রাখা হয়েছে, এ নিয়ম যে কত সুন্দর নিয়ম, তা ব্যাখ্যা করে শেষ করা যায় না। সালামের মধ্যে শান্তির দু'আ করা হয়। "আস্‌সালামু আলাইকুম"-এর অর্থ হল আপনাদের শান্তি হোক। আল্লাহ আপনাদেরকে শান্তি দান করুন, রহমত দান করুন। সালামের মাধ্যমে শান্তির দু'আ করা হয়, এর চেয়ে ভাল দু'আ আর কী হতে পারে? ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মে পারস্পরিক অভিবাদনের জন্য এত সুন্দর বাক্য আর নেই। কেউ কেউ বলে গুড মর্নিং বা গুড ইভিনিং, যার বাংলা হল শুভ সকাল বা শুভ সন্ধা। এ কথাটার অর্থ অস্পষ্ট। সকাল সুন্দর বা বিকাল সুন্দর এ কথাটার কী অর্থ? এর অর্থ কী এই যে, আজকের সকালটা খুব ফ্রেশ, আকাশটা খুব ফ্রেশ, বৃষ্টি বাদল নেই, মেঘ নেই ইত্যাদি। যদি এই অর্থ হয়, তাহলে দেখা সাক্ষাতের সময় এটা বললে কার কী লাভ হবে? আর যদি উদ্দেশ্য হয়, আপনার সকালটা সুন্দর হোক তাহলে বিকালটার কী দোষ? বিকালটা কি সুন্দর হবে না? কিংবা বিকালে বলা হয়, বিকালটা সুন্দর হোক তাহলে সকালটার কী দোষ, সকালটা কি সুন্দর হবে না? আর সকাল-বিকাল সুন্দর হোক এই সুন্দর কথাটাওতো অস্পষ্ট। কিন্তু ইসলামী সালামের অর্থ হল- আপনাদের শান্তি হোক। শান্তির চেয়ে বড় কিছু কাম্য নেই। আমরা সবকিছুতে শান্তি চাই, জীবনের সব ক্ষেত্রে শান্তি চাই। দুনিয়াতেও শান্তি চাই, আখেরাতেও শান্তি চাই। প্রত্যেকটা পদে-পদে শান্তি চাই। সালামের মধ্যে এরই দু'আ করা হয়। তাই এর চেয়ে উত্তম দু'আ আর হতে পারে না।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



সালাম যেহেতু একটা সুন্দর দু'আ, তাই সালামের বাক্য "আস্‌সালামু আলাইকুম" অত্যন্ত সুন্দরভাবে উচ্চারণ করা চাই, শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করা চাই। নতুবা অর্থ বিগড়ে যেতে পারে, অর্থের মধ্যে বিকৃতি ঘটে যেতে পারে। আমরা অনেকে শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করি না। কেউ কেউ বলে সালামালাইকুম। এতে অর্থ বিগড়ে যায়। কেউ কেউ বলে সামু আলাইকুম। এতে অর্থ চরমভাবে বিকৃত হয়ে যায়। এতে অর্থ হয়ে যায় তোমার মৃত্যু হোক (নাউযু বিল্লাহি মিন যালিক)। দেখুন সালামের বাক্যটা অশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করার কারণে কীভাবে অর্থ বিকৃত হয়ে যায়, দু'আর পরিবর্তে বদ-দু'আ হয়ে দাঁড়ায়। তাই শুদ্ধভাবে সালাম উচ্চারণ করা চাই। অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় হামযাটা পরিষ্কার উচ্চারণ করে আস্‌সালামু আলাইকুম বলা চাই।

কোন মুসলমান যখন সালামের অর্থ বুঝে অন্তর থেকে সালাম দিবেন, আর যিনি সালাম গ্রহণ করবেন তিনি অর্থ বুঝে সালাম গ্রহণ করবেন, তখন উভয়ের মধ্যে মহব্বত সৃষ্টি হবে। যিনি সালাম গ্রহণ করবেন তিনি বুঝবেন যে, ইনি আমার কত কল্যাণকামী যে, আমার জন্য শান্তি কামনা করছেন! তখন জওয়াব দেয়ার সময় তার মুখ থেকে আবেগের সাথে, যত্নের সাথে সালামের জওয়াব বের হয়ে আসবে। যিনি সালাম দিবেন তিনিও বুঝবেন যে, আমি তার জন্য দু'আ করছি। তার মুখ থেকেও আবেগের সাথে যত্নের সাথে সালাম বের হবে। আমরা যারা সালাম দেই, তারা সালাম বুঝে দেই না, এজন্য সালাম বলার মধ্যে কোন আবেগ থাকে না, সালাম উচ্চারণের মধ্যেও কোন যত্ন থাকে না। আবার যারা সালাম নেই তারাও বুঝে নেই না, এজন্য সালামের জওয়াব দেয়ার মধ্যেও কোন আবেগ, কোন যত্ন থাকে না। তাই সালাম দেয়ার সময়ও সুন্দর করে দেয়া হয় না, জওয়াবটাও সুন্দর করে দেয়া হয় না।

সালাম দেয়ার তরীকার মধ্যেও আমাদের ভুল হয়। যাকে সালাম দেয়া হবে, তাকে সালাম শুনিয়ে দিতে হবে। অর্থাৎ, এতটুকু জোরে সালাম দিতে হবে, যেন তিনি শুনতে পান। যদি এতদূরে থাকেন যে, সে পর্যন্ত আমার আওয়াজ পৌছবে না, তাহলে একমাত্র সেই ক্ষেত্রে তাকে বুঝানোর জন্য হাত দিয়ে ইশারা করার নিয়ম আছে। এছাড়া আর কোথাও হাত তোলার নিয়ম নেই। কিন্তু আমাদের অনেকেরই এমন অভ্যাসই হয়ে গেছে যে, সালাম দিতে গেলেই হাত উঠে যায়। অনেকে হয়ত মনেই করেন যে, সালাম দিতে হলেই হাত তুলতে হয়। তাই কাছে এসে সালাম দেয়ার সময়ও হাত তুলে ইশারা করে সালাম দেন। অথচ এখানে হাত তোলার নিয়ম নেই। যেটার নিয়ম নেই সেটাকে আমরা নিয়মে পরিণত করে ফেলেছি। এভাবে ইসলামের প্রত্যেকটা আমলের সহীহরূপ বিকৃত হয়ে যায়। তাই সালামের সময় বিনা প্রয়োজনে হাত উঠানোর বদ-অভ্যাস বর্জন করা চাই। যিনি সালাম দিবেন, তার জওয়াব দেয়ার সময় যথাসম্ভব এতটুকু জোরে জওয়াব দিতে হবে যাতে সালাম দেনেওয়ালা জওয়াব শুনতে পান। সালাম দেনেওয়ালা সালামের মধ্যে যতটুকু বলবেন জওয়াবে অন্তত অতটুকু বলতেই হবে। যেমন– আস্‌সালামু আলাইকুম বললে তার জওয়াবে ওয়া আলাইকুমুস্‌সালাম অন্তত এতটুকু জওয়াব দিতেই হবে। পারলে জওয়াবের মধ্যে আরও একটু বেশি করে শব্দ যোগ করে দেয়া উত্তম। যেমন বললাম ওয়া আলাইকুমুস্‌সালাম ওয়ারাহমাতুল্লাহ। যদি সালাম দেনেওয়ালা বলেন, আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ, তাহলে তার জওয়াবে "ওয়া আলাইকুমুস্‌সালাম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ্" এভাবে একটু বেশি করে বলা উত্তম হবে। এভাবে সহীহ-শুদ্ধ করে সহীহ তরীকায় পারস্পরিক সালাম দিতে থাকলে এবং বেশি হারে সালামের বিস্তার ঘটাতে থাকলে

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

এমন একটা সুন্নাতের উপর আমল হবে, যে সুন্নাতের বরকতে আরও অনেক সুন্নাতের উপর আমল করা আছান হয়ে যাবে।

তাই সালাম বেশি বেশি হারে দেয়া চাই। পরিচিত অপরিচিত সকলকে সালাম দেয়া চাই। আমাদের কারও কারও দোষ আছে অপরিচিতকে সালাম দেই না। আবার কারও কারও দোষ আছে খুব কাছের মানুষকে সালাম দেয় না। যেমন অনেকে বিবিকে সালাম দিতে শরম বোধ করে। বিবির সাথে সব শরম ভেঙ্গে ফেলে, অথচ সালাম দিতে শরম লাগে। অনেকের মা-বাপকে সালাম দিতে শরম লাগে। বিবির জন্য সবচেয়ে বড় এই দু'আ অর্থাৎ সালাম করতে পারলাম না। মাতা-পিতার জন্য সবচেয়ে বড় এই দু'আ অর্থাৎ সালাম করতে পারলাম না, এটা কত বড় বোকামী। যদি কারও শরম থেকেও থাকে। দুই চার দিন সালাম করলেই শরম ভেঙ্গে যাবে। ঘরে ঢুকে বিবি, মাতা-পিতা সকলকে সালাম করা চাই। এমনকি বলা হয়েছে যদি ঘরে কেউ না থাকে ঘর খালি থাকে, তবুও ঘরে যেয়ে সালাম দিতে হবে। এরকম অবস্থায় বলতে হবে আস্সালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল বাইত। এর অর্থ হল হে ঘরবাসীরা, তোমাদেরকে সালাম। ঘরে ফিরিশতারা থাকতে পারে,, জিনরা থাকতে পারে, তারা তো সালাম পাওয়ার যোগ্য। তাই তাদের উদ্দেশ্যে এভাবে সালাম দেয়ার নীতি রাখা হয়েছে। খালি ঘরে ঢুকলেও সালাম দিতে হবে। মসজিদে ঢুকে মসজিদে মুসল্লী থাকলে তাদেরকে সালাম দিতে হবে। কেউ যদি নামাযে লিপ্ত থাকেন, তাহলে যারা নামায পড়ছেন না, তাদেরকে সালাম দিতে হবে। তবে এরকম মুহূর্তে এত জোরে সালাম দিব না, যাতে নামাযীর নামাযে ব্যাঘাত হয়। যাহোক মসজিদে যেয়েও সালাম দিতে হবে। এমনকি মসজিদে যদি কেউ না থাকে অর্থাৎ, মসজিদ খালি দেখা যায়, তবুও সালাম দিতে হবে। এরকম মুহূর্তে সালামের বাক্য হল- আস্সালামু আলাইনা ওয়া'আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহীন। এই সালাম হবে ফিরিশতা ও নেককার জিনদের উদ্দেশ্যে। এভাবে সব স্থানে ব্যাপকভাবে সালামের প্রচলন ঘটাতে হবে।

সারকথা কুরআন হাদীছের আলোকে বুযুর্গানে দ্বীন বলেছেন, 'আমরা যদি তিনটা সুন্নাতের উপর আমল করি, প্রত্যেকটা ভাল কাজ বিস্মিল্লাহ বলে শুরু করি, প্রত্যেকটা ভাল কাজ ডান দিক থেকে শুরু করি, আর বেশি বেশি করে পরস্পরে সালাম দেই, তাহলে এই তিনটা সুন্নাতের বরকতে অন্যান্য অনেক সুন্নাতের আমল আসতে থাকবে, অন্যান্য সুন্নাতসমূহের উপর আমল করা আছান হয়ে যাবে'। আল্লাহ পাক আমাদেরকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



বয়ান নং ২৮-এর খুতবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْمُنْفَرِدِ بِالْخَلْقِ وَالْاِبْدَاعِ، اَلْمُسْتَقِلِّ بِالْاِيْجَادِ وَالْاِخْتِرَاعِ، اَلْمُثِيْبِ لِمَنِ امْتَثَلَ اَمْرَهٗ وَاَطَاعَ، وَالْمُنْتَقِمِ مِمَّنِ ابْتَدَعَ فِيْ اَمْرِهٖ وَاَضَاعَ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ فِيْ كُلِّ اَمْرٍ مُّطَاعٍ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهُ الْهَادِيْ اِلٰى سَبِيْلِ السُّنَّةِ وَهُوَ سَبِيْلُ النَّجَاةِ عَنِ الضِّيَاعِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اِلٰى يَوْمِ الْوَدَاعِ.

اَمَّا بَعْدُ :

اَيُّهَا النَّاسُ! اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى جَعَلَ اِطَاعَتَهٗ فِى اِطَاعَةِ الرَّسُوْلِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحُبَّهٗ فِىْ حُبِّهٖ، فَعَلَى النَّاسِ اِتِّبَاعُ سُنَّتِهٖ، فِىْ كُلِّ شُعْبَةٍ مِّنْ شُعَبِ حَيَاتِهٖ . يَقُوْلُ الصُّلَحَاءُ : مَنِ اهْتَمَّ بِثَلَاثٍ سُنَنٍ وَعَمِلَ بِهَا يَسْهَلُ عَلَيْهِ امْتِثَالُ اَكْثَرِ السُّنَنِ. وَهِىَ بِدَايَةُ كُلِّ ذِىْ بَالٍ مِنَ الْاُمُوْرِ بِبِسْمِ اللّٰهِ ، وَالتَّيَامُنُ فِىْ كُلِّ خَيْرٍ، وَاِفْشَآءُ السَّلَامِ.

وَكَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْدَأُ كُلَّ شَيْئٍ بِبِسْمِ اللّٰهِ، يَكْتُبُ اِلَى الْمُلُوْكِ بِبِسْمِ اللّٰهِ، وَيَكْتُبُ الْقَضَايَا بِبِسْمِ اللّٰهِ، وَيَفْتَتِحُ كَذَالِكَ كُلَّ ذِىْ بَالٍ مِّنَ الْاُمُوْرِ بِبِسْمِ اللّٰهِ. وَقَالَ : كُلُّ اَمْرٍ ذِىْ بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيْهِ بِبِسْمِ اللّٰهِ فَهُوَ اَقْطَعُ. وَالْحَدِيْثُ وَاِنْ ضَعَّفَهٗ بَعْضٌ لٰكِنْ صَحَّحَهٗ بَعْضٌ وَلَهٗ طُرُقٌ، قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ بَلْ صَحِيْحٌ. قَالَ الْعَلَّامَةُ يُوْسُفُ الْبَنُوْرِىُ : وَمَفَادُهٗ بَعْدَ ثُبُوْتِهِ الْبِدَايَةُ بِذِكْرِ اللّٰهِ فِىْ كُلِّ شَيْئٍ، سَوَاءٌ كَانَ فِىْ صُوْرَةِ الْبَسْمَلَةِ اَوِ الْحَمْدِ اَوْ غَيْرِهِمَا.

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ التَّيَامُنَ فِيْ كُلِّ خَيْرٍ حَتَّى التَّنَعُّلِ وَالتَّرَجُّلِ. يَأْكُلُ بِيَمِيْنِهٖ وَيَشْرَبُ بِيَمِيْنِهٖ، وَكَانَ يُوْصِيْ بِالرَّجُلِ اَنْ لَّا يَأْكُلَ بِشِمَالِهٖ وَلَا يَشْرَبَ بِشِمَالِهٖ ، وَيَقُوْلُ : فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهٖ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهٖ. فَعَلَى الْمُسْلِمِيْنَ اَنْ لَّا يَأْكُلُوْا بِالشِّمَالِ وَلَا يَشْرَبُوْا بِالشِّمَالِ، اِتِّبَاعًا لِّلْمَغَارِبَةِ وَالْجُهَّالِ.

وَ يَا عِبَادَ اللّٰهِ! اَفْشُوا السَّلَامَ فِيْمَا بَيْنَكُمْ، يَزْدَدْ حُبُّكُمْ وَمَوَدَّتُكُمْ. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى تُؤْمِنُوْا، وَلَا تُؤْمِنُوْا حَتّٰى تَحَابُّوْا، اَوَلَا اَدُلُّكُمْ عَلٰى شَيْئٍ اِذَا فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَبْتُمْ، اَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ. وَاعْلَمُوْا اَنَّ السَّلَامَ دُعَاءٌ لَيْسَ فَوْقَهٗ دُعَاءٌ، يُطْلَبُ فِيْهِ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ السَّلَامُ وَالْاَمْنُ فِيْ كُلِّ شُعْبَةٍ مِّنْ شُعَبِ الْحَيَاةِ وَفِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ. وَلَا تَخُصُّوا السَّلَامَ عَلٰى مَنْ عَرَفْتُمْ مِمَّنْ لَمْ تَعْرِفُوْا، وَلَا تَخُصُّوا الْكَبِيْرَ مِنَ الصَّغِيْرِ، وَلَا الْعُلَمَاءَ مِنَ الْجُهَلَاءِ، وَلَا الْحَمِيْمَ مِنَ الْخَصِيْمِ. بَلْ عَلَيْكُمْ اَنْ تُسَلِّمُوْا عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ. وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْشَى النَّاسِ سَلَامًا عَلٰى غَيْرِهٖ. وَالسَّلَامُ اَيْضًا حَقٌّ مِّنْ حُقُوْقِ الْمُسْلِمِيْنَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتُّ خِصَالٍ وَعَدَّ مِنْ ذَالِكَ وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ اِذَا لَقِيَهٗ.

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ : وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَا اَوْ رُدُّوْهَا.

بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِي الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ، وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. اَقُوْلُ قَوْلِيْ هٰذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَاسْتَغْفِرُوْهُ، اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



বয়ান নং -২৯

## পাঁচটা বিশেষ নেক আমল প্রসঙ্গ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ صَمَتَ نَجَا.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

গত জুমুআয় আলোচনা করা হয়েছিল তিনটা বিশেষ সুন্নাত রয়েছে, যার উপর আমরা আমল করলে অন্যান্য বহু সুন্নাতের উপর আমল করা আছান হয়ে যায়। প্রত্যেক ভাল কাজ বিস্‌মিল্লাহ বলে শুরু করা, সমস্ত ভাল কাজ ডান দিক থেকে শুরু করা, আর বেশি বেশি সালাম করা। এই তিনটা সুন্নাতের এমন বরকত ও আছর আছে, যদি কেউ এই তিনটা সুন্নাতের উপর আমল করে, তাহলে এর বরকতে, এর ওছীলায় অন্যান্য বহু সুন্নাতের উপর আমল করা তার জন্য সহজ হয়ে যাবে। বুযুর্গানে দ্বীন কুরআন-হাদীছের আলোকে বলেছেন পাঁচটা আমল এমন রয়েছে, যার উপর আমল করলে শুধু সুন্নাত বরং অন্যান্য বহু আমল করা তার জন্য আছান হয়ে যায়।

বহু আমলের এমন আছর আছে যা দেখা যায় না, অনেক সময় বোঝাও যায় না, কিন্তু আছর হয়। যেমন নামায একটা আমল, এই নামাযের একটা বিশেষ আছর রয়েছে যা দেখা যায় না, এমনকি সেই আছর কীভাবে হয় তা বোঝাও যায় না। এটা হল আল্লাহ তা'আলা যা কুরআন শরীফে বলেছেন,

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ. (আনকাবূত: ৪৫)

'অর্থাৎ, অবশ্যই নামায সমস্ত অশ্লীল কাজ এবং গোনাহের কাজ থেকে বিরত রাখে'।

আল্লাহ পাক তাগিদ দিয়ে কথাটা বলেছেন। "অবশ্যই" শব্দ ব্যবহার করেছেন। কারণ আমাদের সন্দেহ থাকতে পারে যে, নামায হল উঠা-বসা, সূরা-কিরাত ইত্যাদি কিছু আমলের নাম। এর দ্বারা সমস্ত অশ্লীল ও গোনাহের কাজ থেকে দূরে থাকা যায় কীভাবে? তাছাড়া দেখা যায় বহু মানুষ নামায পড়ে অথচ পাপও করে। তাহলে বুঝা যায় তার নামায তাকে পাপ থেকে বিরত রাখে না। এভাবে আয়াতের বক্তব্য সম্বন্ধে আমাদের মনে সন্দেহ থাকতে পারে, এজন্যই আল্লাহ পাক তাগিদ দিয়ে কথাটা বলেছেন। নিয়ম হল যেখানেই সন্দেহ থাকে, সেখানে সন্দেহকে দূর করার জন্য তাগিদ প্রয়োগ করা হয়। এ হিসেবেই তাগিদ সহকারে বলা হয়েছে নিশ্চয়ই নামাযের মধ্যে এরকম আছর রয়েছে যে, নামায দ্বারা মানুষ পাপ কাজ থেকে বিরত হয়ে যায়। এক সাহাবী প্রশ্ন করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! অনেক মানুষতো এমন দেখা যায় যারা নামাযও পড়েন আবার বিভিন্ন রকম গোনাহ করেন, তাহলে দেখা যাচ্ছে নামায গোনাহ থেকে বিরত রাখল না। রাসূল (সা.) জওয়াবে বললেন,

مَنْ لَّمْ تَنْهَهٗ صَلٰوتُهٗ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ فَلَا صَلٰوةَ لَهٗ. (ابن ابى حاتم وابن مردوية)

'অর্থাৎ, যার নামায তাকে অশ্লীল কাজ ও গোনাহ থেকে বিরত রাখছে না অর্থাৎ, সে নামায পড়ছে এরপরেও গোনাহ থেকে বিরত থাকছে না, তাহলে বুঝতে হবে তার নামায ঠিক হচ্ছে না'।

এখানে বোঝানো হয়েছে নামাযের এই আছর অবশ্যই আছে যে, নামায গোনাহ থেকে বিরত রাখবে, এর মধ্যে কোন সন্দেহ নেই। তবে কিছু লোককে যে দেখা যায় নামায পড়া সত্ত্বেও তারা

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

গোনাহ থেকে বিরত থাকে না, সেটা এ কারণে যে, তাদের নামায যথাযথভাবে হচ্ছে না, সঠিকভাবে হচ্ছে না। নামায সঠিকভাবে হলে অবশ্যই নামাযের উক্ত আছর হতই।

নামাযের ন্যায় আরও অনেক আমল আছে যার বিভিন্ন আছর রয়েছে। যেমন– গোসল খানায় পেশাব করলে ওয়াছওয়াছার রোগ সৃষ্টি হয়। ওয়াছওয়াছার রোগ সৃষ্টি হলে সব আমলের মধ্যে তার ওয়াছওয়াছা হবে। যেমন– উযু করতে গেলে তখনও ওয়াছওয়াছা হবে। এক অঙ্গ তিনবার, পাঁচবার, সাতবার ধোয়ার পরও ওয়াছওয়াছা হতে থাকবে যে, অমুক অঙ্গটা বোধ হয় শুকনো রয়ে গেছে। এভাবে ওয়াছওয়াছার ফলে তার উযু মাকরূহ হয়ে যাবে। কারণ তিনবারের বেশি কোন অঙ্গ ধোয়া মাকরূহ। এভাবে উযু নষ্ট অর্থাৎ, মাকরূহ হয়ে যাবে। অনেক সময় জামাআতও ছুটে যাবে। নামাযে দাঁড়ানোর পরও মনে হবে অমুক অঙ্গটা বোধ হয় ভাল করে ধোয়া হয়নি। তখন সে জামাআত ছেড়ে দিয়ে আবার উযু করতে দৌড়াবে। আমরা এরকম ওয়াছওয়াছার রোগী দেখেছি যে, মাথা মাসেহ করার ক্ষেত্রে মাথার উপর মগ ভরে পানি ছেড়ে দেয়। অথচ মাথা মাসেহের জন্য হাত ধোয়ার পরে হাতে যে ভিজা থাকে সেই ভিজা হাত মাথার উপর ফিরিয়ে নিলেও চলে। তবে নতুন পানিতে হাত ভিজিয়ে সেই ভিজা হাত মাথার উপর বুলিয়ে নেয়া উত্তম। শুধু চুলের উপরে হাতের টাচ লাগলেই চলে। কিন্তু আমরা সেই ওয়াছওয়াছার রোগীকে দেখেছি হাতের কোষের ভিতরে পানি নিয়ে মাথার উপরে ঢেলে দেয়, তাতেও তার সন্দেহ যায় না, তখন টিফিন কেরিয়ারের বাটি বা মগে পানি ভরে সেই পানি মাথার উপরে ঢেলে দেয়। আর হাত ধোয়ার সময় হাত ঘষতে ঘষতে হাতের সব পশম খশে গেছে। এরকম ওয়াছওয়াছার রোগী হলে নামায শুরু করার সময় আল্লাহু আকবার বলে হাত বাধে, আবার ছাড়ে, আবার আল্লাহু আকবার বলে হাত বেঁধে আবার ছেড়ে দেয়, এভাবে করতেই থাকে। তার ওয়াছ-ওয়াছা লাগে যে আল্লাহু আকবার পরিষ্কার বলা হল কি-না। তাকবীরে তাহরীমাতো ফরয, ভাল করে বলা না হলে তো আমার নামাযই হবে না। এই ওয়াছওয়াছায় সে হাত ছেড়ে দিয়ে আবার আল্লাহু আকবার বলে, আবার ছেড়ে দিয়ে আবার আল্লাহু আকবার বলে। এভাবে নামাযের পদে-পদে তার ওয়াছওয়াছা হয়। হাদীছে এসেছে,

فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ. (سنن ابي داود برقم ٢٧ والحديث صحيح)

'অর্থাৎ, গোসল খানায় পেশাব করলে এভাবে ব্যাপক ওয়াছওয়াছার রোগ সৃষ্টি হয়'।

গোসল খানায় পেশাব করার সাথে ওয়াছওয়াছা রোগের কী সর্ক তা যুক্তিতে ধরে না। তাই বলেছিলাম বিভিন্ন আমলের মধ্যে এমন আছরও আছে, যা বুঝে আসে না। কিন্তু কুরআন-হাদীছ দ্বারা যেটা প্রমাণিত, সেটা বুঝে না আসলেও বিশ্বাস করতে হবে।

একবার ওয়াছওয়াছা রোগ সৃষ্টি হয়ে গেলে সেটা দূর করার পথ হল প্রত্যেকটা আমল যে কয়বার করার নিয়ম সেই কয়বারই করবে। তার চেয়ে বেশি করবে না। যেমন উযূতে একটা অঙ্গ তিনবার ধোয়ার কথা। ব্যস যতই ওয়াছওয়াছা হোক তিনবারের বেশি ধোবে না। এরপরেও ওয়াছওয়াছা থেকে গেলে মনের উপর জোর দিয়ে মনকে বুঝাতে হবে যে, আমার উযু হয়ে গেছে। এভাবে মনের উপর জোর দিয়ে কিছুদিন এভাবে করতে থাকলে আস্তে-আস্তে ওয়াছওয়াছা দূর হয়ে যাবে। অনেকে পেশাব করার পরে ঢিলা ব্যবহার করেন। তাদের ওয়াছওয়াছা যায়-ই না। ঢিলা ব্যবহার করা সুন্নাত। পেশাবের ফোটা আসা যেন বন্ধ হয়ে যায়, এতটুকু পরিমাণ সময় ঢিলা ব্যবহার করলেই চলে। এর জন্য বিশ সেকেন্ড দেরী করলে, একটু নাড়া চাড়া করলে বা কাশি দিলে যথেষ্ট। কিন্তু ওয়াছওয়াছার

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



রোগ সৃষ্টি হয়ে গেলে ঢিলা নিয়ে ৪০ কদম ৮০ কদম, ১৬০ কদম হাটার পরও ওয়াছওয়াছা থেকে যাবে যে, এখনও বোধ হয় ফোটা আসছে। এরকম ওয়াছওয়াছার এক রোগী আমাকে বলেছেন যে, হুজুর আমি দেখেছি আধা ঘন্টা পরেও পেশাবের ফোটা আসে। তাই আমার পেশাব থেকে ফারেগ হতে আধা ঘন্টা পৌনে এক ঘন্টা লেগে যায় (নাউযু বিল্লাহি মিন যালিকা)। হাদীছে এসেছে এরকম ওয়াছওয়াছার রোগ দূর করার উপায় হল- পেশাব করবে, স্বাভাবিক নিয়মে স্বাভাবিকভাবে ঢিলা পানি ব্যবহার করবে। তারপর যৌনাঙ্গ বরাবর কাপড়ের উপর একটু পানি নিয়ে ছিটিয়ে দিবে। পরে যদি ভিজা ভিজা লাগে তাহলে মনে করবে এটা পেশাব নয় বরং আমি যে পানি ছিটিয়ে দিয়েছিলাম এটা সেই ভিজা। ওখানে হাত দিয়ে টেষ্ট করবে না যে, ভিতর থেকে কিছু বের হয়েছে কি-না। টেষ্ট করার দরকার নেই। এভাবে করতে থাকলে ওয়াছওয়াছা দূর হয়ে যাবে।

এই ওয়াছওয়াছা খুবই খারাপ। এভাবে দেখা যাবে পেশাব করে ঢিলা ব্যবহার করতে থাকছে, ইতিমধ্যে আযানও হয়ে গেছে, জামাআতও শেষ হয়ে গেছে তারপরেও সে পেশাব থেকে ফারেগ হতে পারেনি। এরকম ওয়াছওয়াছার রোগীরা মনে করে আমার আমল খুব সুন্দর হচ্ছে না, বা সহীহভাবে হচ্ছে না। অর্থাৎ, ওয়াছওয়াছার পেছনে অতি সতর্কতার চিন্তা, অতি পরহেযগারীর চিন্তা কাজ করে থাকে। সতর্কতা বা পরহেযগারী ভাল, কিন্তু অতি পরহেযগারী ভাল না। অতি পরহেযগারীর কারণে অনেক আমল খারাপ হয়ে যায়। যেমন– নামাযের মধ্যে রূকুতে মাথা, পিঠ, কোমর সোজা রাখা সুন্নাত। আর মাথা কোমর পিঠ সোজা করতে গেলে রূকুতে গিয়ে একটু সামনের দিকে ঝুকে যেতে হয়। এখন কারও মধ্যে অতি পরহেযগারী এসে গেলে সে এত বেশি ঝুকবে যে, মাথা নীচের দিকে বেশি ঝুকে যাবে। এভাবে অতি পরহেযগারীর কারণে তার রূকু সুন্দর হওয়ার পরিবর্তে খারাপ হয়ে যাবে। তাই কোন আমলের ভিতরে বাড়াবাড়ি না হওয়া চাই। বাড়াবাড়ির চেতনা দূর করতে হবে। দেখতে হবে আমার আমল সহীহভাবে হচ্ছে কি-না, পূর্ণাঙ্গভাবে হচ্ছে কি-না। বেশি ভাল করতে যেয়ে যেন খারাপ হয়ে না যায়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। সতর্ক থাকতে হবে যেন ওয়াছওয়াছার রোগ এসে না যায়।

যাহোক যে কথা বলা হচ্ছিল যে, একেক আমলের মধ্যে একেক আছর রয়েছে। নামাযের ভিতর এরকম আছর আছে যে, নামায সব অশ্লীল কাজ থেকে, পাপ কাজ থেকে বিরত রাখতে পারে। কিন্তু নামাযের এই ফায়দা পাওয়ার জন্য নামায সহীহভাবে হওয়া চাই, সুন্দরভাবে হওয়া চাই। নামায সহীহ ও সুন্দরভাবে হওয়ার জন্য পুরুষরা জামাআতের সাথে নামায পড়বে। জামাআত ছেড়ে ঘরে নামায পড়লে সেই নামায সুন্দর নামায হবে না। ঘরের নামায সুন্দর নামায হয় না, স্টান্ডার্ড নামায হয় না। ঘরের নামায হয় লামছাম নামায, দায়সারা গোছের নামায, কোন রকম পড়েনিলাম আর কি-এই পর্যায়ের নামায। এর বিপরীত মসজিদে এসে জামাআতের সাথে নামায পড়লে অন্তত ফরযটাতো সুন্দরভাবে হবেই, সাথে সাথে সুন্নাতও সুন্দরভাবে হবে। কারণ মসজিদ আল্লাহর রহমতের মারকায। রহমতের ফিরিশতা মসজিদের মুসল্লিদেরকে ঘিরে রাখে। এটা রহমতের পরিবেশ। এই পরিবেশের ওছীলায় এবং আশেপাশে মুসল্লীরা সকলে সুন্দরভাবে নামায পড়ছেন এটা দেখে মনের ভিতরে সুন্দরভাবে নামায পড়ার চেতনা সৃষ্টি হয়। এসব কারণে মসজিদের নামায সুন্দর নামায হয়। ফরযও সুন্দর হয়, সুন্নাতগুলোও সুন্দর হয়। তাই জামাআতের সাথে নামায পড়া চাই। মুহাক্কিক উলামায়ে কেরামের মতে ফরয নামায জামাআতের সাথে আদায় করা ওয়াজিব। যদি কেউ

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বিনা ওজরে জামাআতে না এসে ঘরে একাকী নামায পড়ে, তাহলে তার নামায হবে না। তবে সাধারণভাবে নমনীয় ফতোয়া দেয়া হয়েছে যে, জামাআতের সাথে নামায পড়া সুন্নাতে মুআক্কাদা। তাই ঘরে একাকী নামায পড়লে নামায হয়ে যাবে। কিন্তু তারপরও জামআতের সাথে নামায না পড়ে একাকী নামায পড়া ভাল নয়।

যারা জামাআতের সাথে নামায পড়ে না, তাদের ব্যাপারে রাসূল (সা.) অত্যন্ত কঠোর মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। রাসূল (সা.) বলেছেন, 'আমার মনে চায় যারা জামাআতে আসে না, তাদের ঘরে যাই এবং লাকড়ি দিয়ে তাদের ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দেই'। কিন্তু ঐ ঘরেতো মা'য়ুররা থাকে, বাচ্চারা থাকে, মহিলারা থাকে, তাদের কারণে তিনি এটা করেননি। রাসূল (সা.)-এর এই কথা থেকে বুঝা যায় জামাআতের সাথে নামায পড়া কতবেশি গুরুরূপূর্ণ। কারণ জামাআতের সাথে নামায পড়লেই সেই নামায হয় সুন্দর নামায। নতুবা নামায নষ্ট হয়ে যায়। এমনকি জামাআতে আসা বন্ধ করলে মানুষ বে-নামাযী পর্যন্ত হয়ে যায়। প্রথম দিকে সে জামাআত ছাড়ে এই মনে করে যে, জামাআতে নামায পড়াতো সুন্নাত, ফরয ওয়াজিব নয়। এই মনে করে জামাআত ছেড়ে দেয়। এই চিন্তা থেকেই আস্তে-আস্তে সুন্নাতও ছাড়তে শুরু করে। কখনও একটু মনে না চাইলেই বা স্বাস্থ্য একটু ভাল না লাগলেই মনে করবে এখন শুধু ফরযটাই পড়ে নেই, সুন্নাত না পড়লেওতো চলে। এভাবে সুন্নাত ছুটা শুরু হবে। আস্তে-আস্তে এক সময় এরকম হবে যে, ফরয নামায ছুটতে শুরু করবে। মনে করবে আচ্ছা এখন ভাল লাগছে না, পরে কাযা করে নিব। এরপর আস্তে-আস্তে কাযাটাও ছুটে যাবে। মনে করবে পরে পড়ে নিব। মৃত্যুর আগে পড়ে নিলেইতো হয়। এরপর এক সময় তার মনে হবে আমি তো নিয়মিত নামাযী নই, কাজেই আমার নামায ছুটাটাই স্বাভাবিক। তখন নামায ছেড়ে দেয়াটা তার কাছে স্বাভাবিক বিষয় মনে হবে। এভাবে আস্তে-আস্তে তার অধঃপতন শুরু হবে। অধঃপতন হতে হতে একেবারে বে-নামাযী এমনকি বে-ঈমানও হয়ে যেতে পারে (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিকা)। দেখা গেল জীবনের সুন্নাত মুস্তাহাব ছেড়ে দিলে আস্তে-আস্তে তার ফরয ওয়াজিব ছোটা শুরু হয়। ফরয ওয়াজিবের উপরে টিকে থাকার স্বার্থেই সুন্নাত, মুস্তাহাবকে শক্তভাবে ধরতে হবে। সুন্নাত, মুস্তাহাবের ব্যাপারে ঢিল দিলে আস্তে-আস্তে ফরয ওয়াজিবও ছুটে যাবে, আমলহীন হয়ে যাবে। আমলহীন হতে হতে এক পর্যায়ে ঈমানহীন পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে। আল্লাহ হেফাযত কন। তাই জামাআতের সাথে নামায পড়া সুন্নাত হলেও এটাকে গুরুত্বের সাথে আমল করা চাই।

শুরুতে বলা হয়েছিল বুযুর্গানে দ্বীন বলেছেন, 'পাঁচটা এমন আমল রয়েছে, যদি কেউ যত্নের সাথে সেই পাঁচটা আমল করে, তাহলে তার ওছীলায় তার জীবনে অন্যান্য বহু আমল এসে যাবে, অন্যান্য বহু আমল করা তার জন্য আছান হয়ে যাবে'। সেই পাঁচটা আমলের মধ্যে **এক নম্বর হল:** এই জামাআতের সাথে নামায আদায় করা।

**দুই নম্বর হল:** প্রয়োজনীয় ইল্‌ম অর্থাৎ, দ্বীনী জ্ঞান অর্জন করা, প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল শিক্ষা করা। হক্কানী উলামায়ে কেরামের সোহবতে যেয়ে, তাঁদের কাছে জিজ্ঞাসা করে কিংবা হক্কানী উলামায়ে কেরামের লিখিত বই-পত্র পাঠ করে সহীহ ইল্‌ম অর্জন করতে হবে। প্রয়োজনীয় ইল্‌ম অর্জন করা ফরয। রাসূল (সা.) বলেছেন,

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ. (سنن ابن ماجة برقم ٢٢٤)

'অর্থাৎ, প্রয়োজনীয় ইল্‌ম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয'।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



"প্রয়োজনীয় ইল্‌ম" বলতে কতটুকু বোঝায়? আমার জীবনে আমাকে যা যা করতে হবে, যেমন নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত আদায় করতে হবে, উঠা-বসা চলা-ফেরা, আহার-নিদ্রা করতে হবে। চাকুরী-নওকরী, ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষি-খামারের মধ্যে যে কোন একটা করতে হবে। এই জাতীয় যাবতীয় যা কিছু করতে হবে সে সম্বন্ধে আনুষঙ্গিক সবকিছু জানা ফরয। আমরা অনেকে এই ফরয তরকের ভিতরে আছি। কারণ আমাদের অনেকেরই এই রকম প্রয়োজনীয় ইল্‌ম নেই। আমরা নামাযের মাসায়েল জানি না। সবচেয়ে গুরুরূত্বপূর্ণ ইবাদত হল নামায, এই নামাযের মাসায়েল পর্যন্ত আমরা জানি না। কীভাবে আমাদের উঠা-বসা, চলা-ফেরা, আহার-নিদ্রা হবে, তার তরীকা কী, তা আমাদের জানা নেই। কীভাবে পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করব, কীভাবে ঘর সংসার চালাবো, এসবের প্রয়োজনীয় মাসায়েল আমরা জানি না। এভাবে যে জ্ঞান অর্জন করা ফরয ছিল সেই ফরয তরকের ভিতরে আমরা লিপ্ত আছি।

ইল্‌ম না থাকলে মাসায়েল জানা না থাকলে আমল সহীহ হবে না, আর আমল সহীহ না হলে তা আল্লাহর কাছে কবুলই হবে না। তাই ইল্‌ম অর্জন করা অনেক গুরুরূপূর্ণ বিষয়। মাসআলা জানতাম না একথা বলে ক্ষমা পাওয়া যাবে না। দুনিয়াতেও যদি কেউ বলে আমি অপরাধ করছি, কিন্তু আমাকে শাস্তি দেয়া যাবে না, কারণ আমার আইন জানা ছিল না। আইন না জানাটা ক্ষমার্হ্য নয়। দ্বীনী মাসআলা-মাসায়েলের ব্যাপারেও একথা প্রযোজ্য। মাসায়েল না জানাটা ক্ষমাযোগ্য নয়। তবে হ্যাঁ যদি কেউ নতুন মুসলমান হয়, আর এখনও সব মাসআলা-মাসায়েল শিখতে পারেনি এরই মধ্যে তার মৃত্যু হয়ে গেল, তাহলে তাকে অতটুকু ক্ষমা করা হবে, যেটা জানার সময় সে পাইনি। কিন্তু আমি জীবনে দীর্ঘ সময় পেলাম তা স্বত্ত্বেও মাসআলা-মাসায়েল শিখলাম না, তাহলে আমাকে ক্ষমা করা হবে না।

মাসায়েল জানতে হবে বিজ্ঞ এবং হক্কানী আলেমের কাছে জিজ্ঞেস করে, কিংবা তাঁদের লিখিত বই পাঠ করে। বই পাঠ করার ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, যে কোন বই-এর নাম শুনেই তা পাঠ করা যাবে না। বরং কোন্ বই পাঠ করা যাবে তা একজন বিজ্ঞ আলেম থেকে জেনে নিতে হবে যে, এই বই পাঠ করা যাবে কি-না। বাজারে এখন প্রচুর ধর্মীয় বই পাওয়া যায়। এই প্রচুর বইয়ের মধ্যে বহু এমন বই আছে যা সহীহ নয়, গ্রহণযোগ্য নয়। আবার কিছু বই এমন আছে যা খুবই প্রসিদ্ধ কিন্তু নির্ভরযোগ্য নয়। যেমন মকছুদুল মু'মিনিন, মাকসুদুল মুহছিনীন, নেয়ামুল কুরআন ইত্যাদি। এক সময় বাংলা ভাষায় ইসলামী লেখনী তেমন একটা ছিল না। সেই সময় খালি মাঠে এই বইগুলো বাজার দখল করেছে এবং মানুষের কাছে পরিচিত হয়ে পড়েছে। কিন্তু এই বইগুলো নির্ভরযোগ্য নয়। এরকম আরও বহু বই রয়েছে যা নির্ভরযোগ্য নয়। তাই বিজ্ঞ এবং হক্কানী আলেমের কাছ থেকে জেনে নিতে হবে কোন্ বই পড়া যাবে এবং কোন্‌টা পড়া যাবে না। বাজারে বই দেখলেই তা কিনে পড়া ঠিক হবে না। সেটা গোমরাহীর কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। সাধারণ মানুষের জন্য কোন বাতিলপন্থী লোকের লেখা বই-পত্র কোন ভ্রান্ত-মতবাদের বই-পত্র, বিধর্মীদের ধর্মীয় বই-পত্র, যেমন, বাইবেল, বেদ, উপনিষদ, পুরাণ ইত্যাদি পাঠ করা অত্যন্ত ক্ষতিকর।

অনেকে এসব বই পড়ার পক্ষে যুক্তি দিয়ে বলেন যে, আমরা পড়ে দেখি কী আছে, তারপর ভালটা নিব খারাপটা নিব না। তাহলে কী অসুবিধা? স্থূলভাবে যুক্তিটা ভালই মনে হয়। কিন্তু কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ তা সঠিকভাবে যাচাই-বাছাই করার মত পূর্ণ যোগ্যতা আপনার ভিতর আছে কী? আপনি হয়তো একটা কথাকে মনে করবেন এটা খুবই সুন্দর লিখেছে, কিন্তু আসলে সেটা সুন্দর নয়, তার

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

ভিতরে ভুল বা মারাত্মক গোমরাহী লুকিয়ে আছে। তার ভিতরের ভুল বা গোমরাহীটা এত সুক্ষ্ম যে, একজন বিজ্ঞ আলেমই তা বুঝতে পারবেন, আপনি বুঝতে পারবেন না। ফলে আপনি বিভ্রান্তির শিকার হবেন, গোমরাহীর শিকার হবেন। তাই বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম ছাড়া সাধারণ মানুষের জন্য এসব বই-পত্র পড়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সাধারণ মানুষ দ্বীনী ইল্‌ম অর্জন করবে সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য বই-পত্র পড়ে, কিংবা হক্কানী উলামায়ে কেরাম থেকে জিজ্ঞেস করে। যাহোক যে পাঁচটি আমলের কথা আলোচনা শুরু করা হয়েছিল তার মধ্যে দ্বিতীয় হল এই ইল্‌ম অর্জন করা।

**তৃতীয় আমল হলঃ** কম কথা বলা এবং কম মেলামেশা করা। কথা কম বলার মধ্যে বহু ফায়দা। কথা কম বললে মিথ্যা কম হয়, গীবত শেকায়েত কম হয়, অহেতুক কথা কম হয়। এভাবে বহু গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা যায়। তাই হাদীছে বলা হয়েছেঃ

مَنْ صَمَتَ نَجَا. (مسند أحمد برقم ٦٤٨١ وإسناده حسن)

অর্থঃ যে চুপ থাকে সে মুক্তি পায়, অর্থাৎ, যে চুপ থাকে সে গোনাহ থেকে নিরাপদ থাকে। আর যে গোনাহ থেকে নিরাপদ থাকে সে মুক্তি পায়।

আমরা যত বেশি কথা বলব ততবেশি মিথ্যা এসে যাবে, ততবেশি গীবত শেকায়েত হবে, ততবেশি মানুষের সমালোচনা এবং দোষচর্চা হবে। মানুষের সাথে বেশি মেলামেশা করলে কথা বেশি হয়, তাই বেশি কথা থেকে বেঁচে থাকার জন্য মানুষের সাথে অপ্রয়োজনীয় মেলামেশা বন্ধ করে দিতে হবে। বেশি মেলামেশা করলেই বেশি কথা হবে। আর বেশি কথা বললেই মিথ্যা, গীবত, শেকায়েত ইত্যাদি গোনাহের কথা বেশি হবে। আগের যুগের বুযুর্গানে দ্বীন মানুষকে কম কথা বলতে অভ্যস্ত করানোর সবক দিতেন। যার মধ্যে বেশি কথা বলার রোগ, তাকে মানুষের সংশ্রব থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকতে বলতেন। তবে প্রয়োজনীয় কথা অবশ্যই বলতে হবে। প্রয়োজনীয় মেলামেশাও অবশ্যই করতে হবে। কথা কম বলতে হবে অর্থাৎ, প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া কোন কথা বলা থেকে বিরত থাকতে হবে।

প্রয়োজনীয় কথা হল তিন ধরনের কথা। এই তিন ধরনের কথার বাইরে যত ধরনের কথা আছে সব নিষ্প্রয়োজনীয় কথা। প্রয়োজনীয় তিন ধরনের কথার মধ্যে এক ধরনের হল– যা বললে ছওয়াব হবে সে কথা বলা। আরেক ধরনের কথা হল যে কথা না বললে গোনাহ হবে, সেটাও প্রয়োজনীয় কথা। যেমন আমার চোখের সামনে অন্যায় কাজ হচ্ছে সেখানে আমি চুপ থাকলে, নিষেধ না করলে আমার গোনাহ হবে। কারণ অন্যায়কে বাধা না দেয়া গোনাহ। তাই এখানে কথা বলা হল প্রয়োজনীয় কথা। তৃতীয় আরেক ধরনের কথা হল যে কথা না বললে আমার দুনিয়ার ক্ষতি হয়ে যাবে, সেটাও প্রয়োজনীয় কথা। যেমন ব্যবসায়ী বা দোকানদার যদি চুপ করে থাকে, ক্রেতার সাথে বা মহাজনের সাথে কোন কথা না বলে, তাহলে তার ব্যবসা চলবে না, তার দুনিয়ার ক্ষতি হবে। অফিস-আদালতে গিয়েছে, চুপ-চাপ আছে, কারও সাথে কোন কথাই বলছে না, তাহলে অফিস চলবে না। এসব ক্ষেত্রে কথা না বললে দুনিয়ার কাজ-কারবার সব বন্ধ হয়ে যাবে। এসব ক্ষেত্রে কথা বলাও প্রয়োজনীয় কথা। এই তিন ধরনের কথা হল প্রয়োজনীয় কথা। এর বাইরে আর সব ধরনের কথা হল নিষ্প্রয়োজনীয় কথা।

পরস্পরে দেখা সাক্ষাৎ হলে আমরা সালাম-কালাম করি, একজন আরেকজনের অবস্থা জিজ্ঞাসাবাদ করি, ঐ সময় নিয়ত থাকতে হবে যে, এটা হল সুন্নাত। একজন মুসলমানের সাথে দেখা সাক্ষাৎ হলে তার হালপুরছী করা, অবস্থা জিজ্ঞাসা করা, সুবিধা-অসুবিধার খোঁজ-খবর নেয়া সুন্নাত। এই সুন্নাতের উপর আমল করার নিয়তে এসব কথাবার্তা বললে এটাও ছওয়াবের কথা হয়ে যাবে।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com



আমরা যে কথাই বলব, তা এই তিন ধরনের আওতায় ফেলে বলব। এই তিন ধরনের কথা ছাড়া আর সবকথা আস্তে আস্তে বন্ধ করে দেয়ার অভ্যাস করতে হবে। তাহলে জীবনে বহু গোনাহ থেকে নিরাপদ থাকা যাবে। যবান দ্বারা আমাদের অনেক গোনাহ হয়। যবান সম্পর্কে বলা হয়–

اِنَّ اللِّسَانَ جِرْمُهُ صَغِيْرٌ وَّجُرْمُهُ كَبِيْرٌ.

অর্থাৎ, যবান বা জিহ্বার আকৃতি খুব ছোট, সামান্য একটা মাংস পিণ্ড, কিন্তু এর গোনাহ অনেক বড়। এর দ্বারা অনেক বড় বড় গোনাহ্ সংঘটিত হয়।

এই জিহ্বা দ্বারাই মিথ্যা কথা হয়। আর একটা মিথ্যা কথা বললে সেটাকে ঢাকা দেয়ার জন্য আরও দশটা মিথ্যা কথা বলতে হয়, সেই দশটাকে ঢাকা দেয়ার জন্য একশতটা মিথ্যা কথা বলতে হয়। এভাবে গোটা জীবন মিথ্যায় জর্জরিত হয়ে যায়। একটা গোনাহ আরও বহু গোনাহের দিকে ডাকে। এর বিপরীত একটা নেকী আরও বহু নেকীর দিকে টেনে নিয়ে যায়। যাহোক তৃতীয় আমল হল– কম কথা বলা, মানুষের সাথে মেলামেশা কম করা। অপ্রয়োজনীয় কথা এবং অপ্রয়োজনীয় মেলামেশা বন্ধ করে দেয়া।

**চতুর্থ আমল হলঃ** মুহাসাবা ও মুরাকাবা। মুরাকাবা অর্থ প্রত্যেকটা পদে পদে খেয়াল রাখা যে, আমার আমলগুলো ঠিক মত হচ্ছে কি-না, মাসায়েল অনুযায়ী হচ্ছে কি-না, আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল আমার জীবন যেভাবে পরিচালনা করতে বলেছেন সেভাবে হচ্ছে কি-না। এটা খেয়াল রাখা যে, আমি আল্লাহর দৃষ্টির মধ্যে আছি, তিনি আমার সবকিছু দেখছেন। আমার কথাবার্তা, কাজ-কর্ম, গতিবিধি সবকিছুর প্রতি তিনি লক্ষ্য রাখছেন, সবকিছুর জন্য তিনি আমার হিসাব নিবেন। জীবনের প্রত্যেকটা পদে-পদে এরকম খেয়াল জাগ্রত রাখলে গোনাহের চেতনা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারবে না, নেক আমলের জযবা পয়দা হবে। এই চিন্তা আমাকে পদে-পদে নেক কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করবে। একটা আমল বহু নেক আমল পয়দা করবে। আর

**পঞ্চম আমল হলঃ** তাওবা ও ইস্তেগফার। মানুষের জীবনে সর্বক্ষণ কম-বেশি ভুল হতে পারে, প্রতিদিন পাপ হতে পারে। যতবার ভুল হবে, যতবার পাপ হবে ততবার তওবা ইস্তেগফার করে নিতে হবে। আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। তওবা ইস্তেগফারকে জীবনের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ বানিয়ে নিতে হবে। আমার জীবনের ভুল-ত্রুটি যেমন আমার জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ, ভুল-ত্রুটি যেমন আমার হয়েই থাকে, তওবা ইস্তেগফার করাকেও সেভাবে জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ বানিয়ে নিতে হবে। আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়াকে জীবনের একটা জরুরী অংশ বানিয়ে নিতে হবে। এই পাঁচটি বিষয় হল মানুষের জীবন গঠন করার মূলনীতি। বুযুর্গানে দ্বীন বলেছেন, 'যদি কেউ যত্নের সাথে এই পাঁচটা আমল করে, তাহলে অন্যান্য বহু আমল করা তার জন্য আছান হয়ে যাবে। বহু আমলের পথ তার সামনে খুলে যাবে'। কুরআন-হাদীছের আলোকেই বুযুর্গানে দ্বীন একথা বলেছেন। আমল করলে আমরাও ইনশাআল্লাহ ফায়দা লাভ করতে পারব। আল্লাহ পাক আমাদেরকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বয়ান নং ২৯-এর খুতবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَكْمَلَ لَنَا دِیْنَنَا وَاَعْطَانَا مِنْهَاجًا كَامِلًا، وَمَا تَرَكَ شُعْبَةً مِّنْ شُعَبِ الْحَیَاةِ اِلَّا وَبَیَّنَ فِیْهَا دَلِیْلًا، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِیْكَ لَهٗ لَمْ یَجْعَلْ فِیْ ذَاتِهٖ وَصِفَاتِهٖ مَثِیْلًا ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَیِّدَنَا وَنَبِیَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَنَبِیِّنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ بُكْرَةً وَّاَصِیْلًا.

اَمَّا بَعْدُ :

اَیُّهَا النَّاسُ! اِنَّ فِی الْاِسْلَامِ مَنَاهِجَ وَطُرُقًا لِّكُلِّ شُعْبَةٍ مِّنْ شُعَبِ حَیَاتِنَا، لِمَنَاسِكِنَا وَشَرَائِعِنَا، وَلِاُسْرَتِنَا وَمُجْتَمَعِنَا، وَلِظَاهِرِنَا وَبَاطِنِنَا، وَحَتّٰی لِمَاْ كِلِنَا وَمَشَارِبِنَا وَمَلَابِسِنَا وَمَضَاجِعِنَا، وَحَتّٰی لِتَرَجُّلِنَا وَتَنَعُّلِنَا ، وَلَمْ یَتْرُكْ شَیْئًا مِّنْ اُمُوْرِ حَیَاتِنَا اِلَّا وَ بَیَّنَ اللّٰهُ طَرِیْقَتَهٗ فِی الْكِتَابِ تَبْیِیْنًا، وَفَصَّلَهٗ تَفْصِیْلًا، وَهُوَ الْاِسْلَامُ الْكَامِلُ ، وَقَدْ اَمَرَنَا اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ لِلدُّخُوْلِ فِی الْاِسْلَامِ كَامِلًا . فَقَالَ : یٰٓاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِی السِّلْمِ كَآفَّةً.

عِبَادَ اللّٰهِ! یَقُوْلُ الصُّلَحَاءُ : وَهٰهُنَا سِتَّةُ اَعْمَالٍ مِّنْ اَعْمَالِ الدِّیْنِ، مَنِ اهْتَمَّ بِهَا وَعَمِلَ بِهَا یَسْهُلُ عَلَیْهِ الْمَشْیُ عَلٰی اَكْثَرِ الْاَعْمَالِ شَیْئًا فَشَیْئًا، وَهِیَ طَلَبُ الْعُلُوْمِ الدِّیْنِیَّةِ، وَالْمُحَافَظَةُ عَلَی الصَّلٰوتِ بِالْجَمَاعَةِ، وَقِلَّةُ الْكَلَامِ، وَالْمُحَاسَبَةُ وَالْمُرَاقَبَةُ، وَالتَّوْبَةُ وَالْاِسْتَغْفَارُ. فَاطْلُبُوا الْعُلُوْمَ الدِّیْنِیَّةَ، فَاِنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ فَرِیْضَةٌ عَلٰی كُلِّ مُسْلِمٍ. وَ حَافِظُوْا عَلَی الصَّلٰوتِ، وَاِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ، وَمَنْ لَمْ تَنْهَهُ صَلَاتُهٗ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ فَلَا صَلٰوةَ لَهٗ. وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللِّسَانَ جِرْمُهٗ صَغِیْرٌ وَجُرْمُهٗ كَبِیْرٌ.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



فَاَقِلُّوا الْمُخَالَطَةَ وَ الْكَلَامَ، تُصِیْبُوا السَّلَامَ وَتَحْفَظُوْا عَنِ اللَّغْوِ وَالْاٰثَامِ، قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَمَتَ نَجَا. وَحَاسِبُوْا اَنْفُسَكُمْ قَبْلَ اَنْ تُحَاسَبُوْا، فَاِنَّ الْكَیِّسَ مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهٗ قَبْلَ اَنْ یُّحَاسَبَ. وَرَحِمَ اللّٰهُ امْرَءً رَاقَبَ مَنْ هُوَ عَلَیْهِ شَهِیْدٌ، وَحَاسَبَ نَفْسَهٗ قَبْلَ مُلَاقَاةِ الْحِسَابِ الشَّدِیْدِ. وَاتَّقُوا اللّٰهَ عِبَادَ اللّٰهِ! وَزَكُّوْا بِالتَّوْبَةِ وَالْاِسْتِغْفَارِ اَنْفُسَكُمْ، وَطَهِّرُوْا بِالْاَعْمَالِ الصَّالِحَةِ مِمَّا دَسَّاكُمْ وَاَرْكَسَكُمْ، فَقَدْ شَقِیَ مَنْ تَعَرَّضَ لِلْمَعَاصِیْ بَعْدَ الْاِنْذَارِ، وَهَلَكَ مَنْ تَرَبَّصَ بِالتَّوْبَةِ وَالْاِسْتِغْفَارِ، وَخَابَ مَنْ هَجَمَ عَلَی الْمَحَارِمِ وَاجْتَرَأَ عَلَی الْاَوْزَارِ، حَتّٰی اَوْرَدَتْهُ عَلَی النَّارِ. وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا التَّوْبَةُ النَّصُوْحُ هِیَ تَرْكُ الذُّنُوْبِ، وَالنَّدَمُ عَلٰی فِعْلِهَا خَوْفًا مِّنْ عَلَّامِ الْغُیُوْبِ، وَالْعَزْمُ عَلٰی اَنْ لَّا یَعُوْدَ اِلَیْهَا فِی الْاِسْتِقْبَالِ، وَرَدُّ الظُّلَامَاتِ اِلٰی اَهْلِهَا وَالْاِسْتِحْلَالُ .

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ : یٰٓاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِی السِّلْمِ كَآفَّةً وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّیْطٰنِ، اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِیْنٌ.

بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِی الْقُرْاٰنِ الْعَظِیْمِ، وَنَفَعَنَا وَاِیَّاكُمْ بِالْاٰیَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِیْمِ. اَقُوْلُ قَوْلِیْ هٰذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ لِیْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِیْنَ وَاسْتَغْفِرُوْهُ، اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ.

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বয়ান নং -৩০

## ৬টা বিশেষ গোনাহ প্রসঙ্গ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: يٰاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يَا عَلِيُّ! لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَاِنَّ لَكَ الْاُوْلٰى وَلَيْسَتْ لَكَ الْاٰخِرَةُ.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

গত জুমুআয় আলোচনা করা হয়েছিল কুরআন-হাদীছের আলোকে বুযুর্গানে দ্বীন বলেছেন, 'পাঁচটা এমন আমল রয়েছে, কেউ যত্নের সাথে সেই পাঁচটা আমল করলে অন্যান্য বহু আমল করা তার জন্য আছান হয়ে যাবে। অন্যান্য বহু আমলের পথ তার সামনে খুলে যাবে'। এমনিভাবে বুযুর্গানে দ্বীন কুরআন-হাদীছের আলোকে আরও বলেছেন, 'ছয়টা এমন গোনাহ রয়েছে, কেউ যত্নের সাথে সেই ছয়টা গোনাহ থেকে বিরত থাকলে অন্যান্য বহু গোনাহ থেকে বিরত থাকা তার জন্য আছান হয়ে যাবে'। যেমনভাবে একটা নেক আমল অন্য বহু নেক আমলকে টেনে আনে, একটা নেক আমলের ওছীলায় অন্য বহু নেক আমল করা সহজ হয়ে যায়, তেমনিভাবে একটা গোনাহ অন্য বহু গোনাহের দিকে নিয়ে যায়। একটা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকলে অন্য বহু গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা যায়। গোনাহের মধ্যে বেশ কিছু মৌলিক গোনাহ রয়েছে। সেই মৌলিক গোনাহগুলো থেকে বিরত থাকলে প্রায় সব গোনাহ থেকে বিরত থাকা সহজ হয়ে যায়।

একটা মুল গোনাহের কারণে আর যত গোনাহ আমার দ্বারা হত, যখন আমি সেই মূল গোনাহ থেকে বিরত থাকব, তখন পরবর্তী গোনাহগুলো থেকে অটোমেটিক বিরত থাকা হয়ে যাবে। যেমন– একটা মিথ্যা কথা বললে সেই মিথ্যা কথাকে ঢাকা দেয়ার জন্য আরও অনেক মিথ্যা কথা বলতে হয়। এমনিভাবে একটা পাপ কাজ করলে সেই পাপকে ঢাকা দেয়ার জন্য আরও পাপ করতে হয়, অনেক মিথ্যা কথা বলতে হয়, অনেক প্রতারণা করতে হয়, ধোকা দিতে হয়। এভাবে একটা মূল গোনাহ অনেক পরবর্তী গোনাহ ডেকে আনে। মুল গোনাহটা থেকে বিরত থাকলে পরবর্তী গোনাহগুলো থেকে বিরত থাকা সহজ হয়ে যাবে। কুরআন-হাদীছের আলোকে বুযুর্গানে দ্বীন বলেছেন যে, মানুষের জীবনে যতরকম গোনাহ আছে, তার মধ্যে মৌলিক এমন ছয়টা গোনাহ রয়েছে, যা থেকে বিরত থাকলে অন্যান্য প্রায় সব গোনাহ থেকে বিরত থাকা তার জন্য সহজ হয়ে যায়। তার মধ্যে

**প্রথম নম্বর গোনাহ হলঃ** হারাম খাওয়া থেকে বিরত থাকা। হারাম উপার্জন থেকে বিরত থাকা। হারাম উপার্জন ও হারাম খাওয়া থেকে বিরত থাকা এত গুরুরূপূর্ণ যে, উপার্জন হালাল না হলে, খাওয়া হালাল না হলে কোন ইবাদত কবুল হয় না। এ জন্যই আল্লাহ পাক সমস্ত রকম ইবাদত করার আগে হালাল উপার্জন করার হুকুম দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে,

كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا.

'অর্থাৎ, তোমরা হালাল খাও এবং নেক আমল কর'। (মুমিনূনঃ ৫১)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা "নেক আমল কর" একথাটা বলার আগে "হালাল খাও" কথাটা বলেছেন। মুফাসসিরীনে কেরাম এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এ আয়াতে বোঝানো হয়েছে যে, ইবাদত ও নেক আমল কবুল হওয়ার জন্য হালাল উপার্জন শর্ত। তাই হালাল খাওয়ার কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। যদি উপার্জন হারাম হয়, যদি খাওয়া হালাল না হয়, তাহলে কোন নেক আমলই কবুল হবে না। তাই হারাম খাওয়া এবং হারাম উপার্জন করা এমন একটা গোনাহ, যার কারণে সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে যায়। অর্থাৎ এই একটা পাপের কারণে গোটা জীবনই পাপে জর্জরিত হতে থাকে। একটা গোনাহই যেন সমস্ত আমল তরক করার পর্যায়ের গোনাহ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। যার কারণে গোটা জীবনই বরবাদ হয়ে যাচ্ছে।

শরীআতে হারাম উপার্জন থেকে বেঁচে থাকা এবং হালাল খাওয়া এত বড় গুরুরূপূর্ণ বিষয়। অথচ আমরা এটাকে খুবই হালকা দৃষ্টিতে দেখি। এই জামানায় সুদ, ঘুষ খাওয়াকে যেন গোনাহই মনে করা হচ্ছে না। মানুষের অর্থ আত্মসাৎ করাকে যেন গোনাহই মনে করা হচ্ছে না। আমাদের মধ্যে এমন অনেক ভাই আছেন যারা ভাল নামাযী, বাহ্যিকভাবে নেককার পরহেযগার, কিন্তু তারা অবলীলায় সুদ ঘুষের কারবারে জড়িত। যেন এটাকে তারা হারামই মনে করছেন না। অথচ হারাম উপার্জন করে ইবাদত করলে সেই ইবাদত কবুল হয় না। এমনকি ফেকাহ-র কিতাবে লেখা হয়েছে কারও গায়ে যদি এমন পোষাক থাকে যা হারাম উপার্জন থেকে ক্রয় করা বা অবৈধভাবে অর্জিত, সেই পোষাকে নামায পড়লে সেই নামায কবুল হবে না। হারামপন্থায় অর্জিত টাকা-পয়সা দিয়ে বাড়ি তৈরি করলে সেই বাড়িতে থাকাও গোনাহ। এমনকি যারা ভাড়াটিয়া, তারা ভাড়া দিয়েও সে বাড়িতে থাকবে না। মালিক যদি হারাম অর্থ দিয়ে বাড়ি তৈরি করে থাকে, সেই বাড়িতে অন্যদের জন্যেও থাকা মাকরূহ হবে। কত কড়া মাসআলা, কিন্তু আমরা এটাকে খুবই হালকা দৃষ্টিতে দেখে থাকি। আমরা এটাকে কোন অন্যায়ই মনে করি না।

আমাদের কল্‌ব অর্থাৎ, মন বিকৃত হয়ে যাচ্ছে। যার ফলে অন্যায়কে অন্যায় মনে হচ্ছে না। কল্‌ব বিকৃত হওয়ার অর্থ হল ভালটাকে ভাল না বুঝা, খারাপটাকে খারাপ না বুঝা। খারাপটা খারাপ না লাগা, ভালটা ভাল না লাগা। এটাকেই বলা হয় কল্‌ব বা মনের বিকৃতি। যখন কল্‌ব বিকৃত হয়ে যায়, তখন কুরআন-হাদীছ ভাল লাগে না, কুরআন-হাদীছের কথা ভাল লাগে না, কুরআন-হাদীছের কথা ভালভাবে বুঝে আসে না, কুরআন-হাদীছের কথায় মন খোলে না। নেক কাজ ভাল লাগে না বরং গোনাহের কাজ ভাল লাগে, মনের মধ্যে নেক আমলের ব্যাপারে স্পীরিট আসে না। অর্থাৎ, দ্বীন-ধর্মের ব্যাপারে চেতনা যেমন হওয়ার ছিল, তার উল্টো হয়ে যায়। চেতনা সুস্থ থাকে না। কারণ কল্‌ব যখন অসুস্থ হয়ে যায়, তার চেতনা শক্তিও অসুস্থ হয়ে যায়। হারাম খেতে খেতে মানুষের কল্‌ব অসুস্থ হয়ে পড়ে। সেই কল্‌ব থেকে শুধু অসুস্থ চেতনাই বের হতে থাকে। যে অসুস্থ চেতনা তাকে বহু পাপের দিকে নিয়ে যায়। দেখা গেল উপার্জন হালাল না হওয়া এমন একটা গোনাহ, যার কারণে কোন নেক আমল কবুল হয় না, সাথে সাথে সেটা আরও অনেক গোনাহের দিকে নিয়ে যায়।

**দ্বিতীয় গোনাহ হলঃ** মানুষের যবান দ্বারা যে গোনাহ হয়। মানুষের যবান অর্থাৎ, জিহ্বা দ্বারা বিশেষভাবে দুইটা বড় গোনাহ হয়ে থাকে। একটা হল মিথ্যা বলা, আরেকটা হল গীবত করা। এ দুটো গোনাহই অত্যন্ত বড় গোনাহ। হাদীছে মিথ্যাকে বলা হয়েছে اُمُّ الْفُجُوْرِ অর্থাৎ, সমস্ত গোনাহের মা। এক মা থেকে যেমন অনেক সন্তানের জন্ম হয়, তেমনিভাবে এক মিথ্যা থেকে বহু মিথ্যার জন্ম হয়, বহু পাপের জন্ম হয়। এজন্যই মিথ্যাকে সমস্ত পাপের মা অর্থাৎ, বহু পাপের মা বলা হয়েছে। মানুষ যদি

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

এক মিথ্যাকে বর্জন করে, তাহলে সে বহু পাপ থেকে বিরত থাকতে পারবে। যেমন একজন মানুষ প্রতিজ্ঞা করল যে, আমি মিথ্যা বলবই না, তাহলে সে এমন অনেক পাপ কাজ করতে পারে না, যেগুলো মানুষের সামনে ফাঁস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এরূপ ক্ষেত্রে তার চিন্তা আসবে যে, মানুষ যদি জিজ্ঞাসা করে তখন আমি মিথ্যা বলতে পারব না, তাহলে একাজ করাই যাবে না। এভাবে এক মিথ্যা বর্জন করার ইচ্ছা, এক মিথ্যা বর্জন করার প্রতিজ্ঞা বহু পাপ থেকে বিরত রাখতে পারে।

মানুষের গীবত-শেকায়েত করাও যবানের একটা বড় গোনাহ। গীবত বলা হয় কারও দোষ তার পশ্চাতে বলা। আপনার দোষ আপনার অগোচরে আমি আরেকজনের সামনে বললাম, এটাই হল গীবত। যদি বাস্তবেই আপনার মধ্যে সেই দোষ থাকে তাহলেও গীবত। আমরা সাধারণভাবে বলে থাকি আমি গীবত করতে চাই না, যা বাস্তব কথা তা-ই বলছি। এটা একটা প্রতারণামূলক কথা। বাস্তব কথা বললেই গীবত হয়। আর যদি বাস্তব না হয়, বরং কারও সম্বন্ধে মিথ্যা বলি, তাহলে সেটাকে বলা হয় বুহতান। এতে ডাবল গোনাহ হয়। মিথ্যা বলার গোনাহও হয়, অন্যের দোষ চর্চার গোনাহও হয়।

আমরা এক সংগে কয়েকজন মিলিত হলেই কম-বেশি গীবত করেই থাকি। আমাদের কোন মজলিস গীবত থেকে খালি যায় না। একজন রসিকতা করে বলেছেন, এটাতো গীবত নয় যেন ঘি-ভাত। ঘি-ভাত খেতে যেমন মজা লাগে, গীবত করতেও যেন ওরকম মজা লাগে। এ মজা যেন আমরা ছাড়তে পারি না। তাই সব স্থানেই গীবত। পদে-পদে গীবত। কথাবার্তা শুরু হলেই একজন আরেকজনের দোষ বলছি। রাজনীতির আলোচনা করতে যাচ্ছি, সেখানেও এক পক্ষ আরেক পক্ষের নেতাদের সমালোচনা করছি, এমনকি মরা নেতাদেরও তুলাধুনা করে ফেলছি। এটা হল রাজনৈতিক গীবত। এর দ্বারাও গীবতের গোনাহ হবে। মৃত নেতাদের সমালোচনা করেও কোন ফায়দা নেই। বরং তাদের ভাল দিকগুলো আলোচনা করলে ফায়দা আছে। হাদীছে তাই বলা হয়েছে,

اُذْكُرُوْا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ وَكُفُّوْا عَنْ مَسَاوِيْهِمْ. (رواه الحاكم في المستدرك برقم ١٤٢١ وقال صحيح الإسناد)

'অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের মৃতদের ভাল বিষয়গুলো আলোচনায় আন। খারাপগুলো আলোচনায় আনা থেকে বিরত থাক'।

যারা মরে যায় তাদের দোষ বলাও গীবত। তাদের গীবত করাও নিষেধ। গীবতের কোন প্রয়োজন নেই। আমি আমার কাজ করে যাব, আরেক জনের দোষচর্চা করার, আরেক জনের সমালোচনা করার সময় আমার কোথায়? কোন মানুষ যখন নিজের করণীয় কাজ থেকে গাফেল হয়ে যায়, তখন সে আরেকজনকে নিয়ে চর্চা করার সময় পায়। নিজের কাজ, নিজের ইবাদত-বন্দেগী নিয়ে ব্যস্ত থাকলে অন্যের পিছনে লাগার সময় কোথায়?

গীবত একটা মারাত্মক পাপ। এই এক পাপের মধ্যে আরও বহু পাপ লুকিয়ে থাকে। যখন কেউ গীবত করে, তখন মিথ্যাও এসে যায়, এভাবে গীবতের সাথে-সাথে মিথ্যার গোনাহও হয়। যখন কেউ গীবত করে, তখন তার মধ্যে বড়ায়ী এবং অহংকারও এসে যায়। কারণ আমি আরেকজনের দোষচর্চা করলাম, এর অর্থই হল আমি এমনভাব দেখালাম যে, আমি ঐ দোষ থেকে মুক্ত, আমি খুব ভাল মানুষ। এভাবে গীবত করতে যেয়ে নিজেকে নির্দোষ প্রকাশের প্রচেষ্টা হয়ে যায়। অথচ আমরা কেউ নির্দোষ নই।

**তৃতীয় নম্বর গোনাহ হল:** নিজেকে বড় মনে করা এবং অন্যকে ছোট মনে করা। এটাকে বলা হয় অহংকার। অহংকার হল আত্মার সমস্ত রোগের মূল। অহংকার করা কবীরা গোনাহ। এই অহংকার থেকে মানুষের মধ্যে জুলুম করার মনোভাব আসে, এই অহংকার থেকে অন্য মানুষকে তুচ্ছ করার মনোভাব আসে, এই অহংকারের কারণে বিনয়ের গুণ দূর হয়ে যায়, এই অহংকারের কারণে অনেক

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



সময় মানুষ সত্যের সামনে মাথা নত করে না। এভাবে একটা গোনাহ অনেক গোনাহের কারণ হয়। এই অহংকার থেকে বেঁচে থাকলে অনেক গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব হয়। অহংকার অনেক গোনাহের মূল। এজন্যই বুযুর্গানে দ্বীন বলেছেন মানুষের মনের যত রোগ আছে, সব রোগের মধ্যে সবচেয়ে বড় রোগ হল তাকাব্বুর বা অহংকার। অহংকার হল আত্মার রোগের মধ্যে সবচেয়ে মূল রোগ। এটা হল সর্ব রোগের মা। অহংকার অর্থ হল নিজেকে বড় মনে করা এবং অন্যকে ছোট মনে করা। নিজেকে বড় মনে করারও কোন অবকাশ নেই, অন্যকে ছোট মনে করারও অনুমতি নেই। কাজেই অহংকার করার কোন অবকাশ নেই।

মানুষ কী নিয়ে নিজেকে বড় মনে করবে? কী নিয়ে অহংকার করবে? যা নিয়ে অহংকার করবে, সেটাতো আল্লাহর দেয়া। যেমন– আমার জ্ঞান আছে, বিদ্যা-বুদ্ধি আছে, স্বাস্থ্য আছে, চেহারা আছে, ধন-সম্পদ আছে, মান সম্মান আছে, প্রতিষ্ঠা আছে, পদ আছে, এর কোনটা নিয়ে আমি অহংকার করতে পারি না, কারণ এগুলো সবটাই আল্লাহর দেয়া। কাজেই এর কোনটা নিয়ে আমি বড়ায়ী দেখাতে পারি না। বরং এর জন্য আল্লাহর শোকর আদায় করা উচিত। আল্লাহর সামনে নত হওয়া উচিত। এর জন্য মাথা উঁচু করে বড়ায়ী দেখানো নয় বরং মাথা নত করা উচিত যে, আল্লাহ পাক আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তিনি দয়া করে আমাকে এগুলো দান করেছেন। তিনি ইচ্ছা করলে আমাকে এগুলো না-ও দিতে পারতেন। কিংবা এখনও যদি চান, আমার থেকে ছিনিয়েও নিতে পারেন। আমার পদ আছে, পদ চলে যেতে পারে, আমার স্বাস্থ্য আছে, স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যেতে পারে, আমার ধন-সম্পদ আছে, আমি ফকীর হয়ে যেতে পারি। তিনি যে এখনও অনুগ্রহ পূর্বক এগুলো টিকিয়ে রেখেছেন, এর জন্যেও তাঁর সামনে মাথা নত করা চাই, তাঁর শোকরের মনোভাব জাগ্রত করা চাই। অতএব অহংকার করার অবকাশ কোথায়।

অহংকার এক হিসেবে তাওহীদী চেতনার পরিপন্থী। যে সত্যিকার অর্থে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-য় বিশ্বাসী তার ভিতরে অহংকার আসার অবকাশ নেই। সবকিছু আল্লাহ থেকে হয়-এই বিশ্বাস যার মজবূত থাকে, তার ভিতর অহংকার আসার কোন অবকাশ নেই। আমি যা নিয়ে অহংকার করব, তা আল্লাহর দেয়া। যা কিছুই হচ্ছে সব আল্লাহর থেকে হচ্ছে। সবকিছুই আল্লাহর দেয়া। আমার নিজস্ব ক্ষমতা বলে কিছুই হয় না। আমার নিজস্ব বলে কিছুই নেই। কাজেই অহংকার করারও কোন অবকাশ নেই। তাই এক কবী বলেছেন,

جولا کہاوہ لاہوا
پھرلاہیہ اس میں لاہوا
جزءلاہوا، کل لاہوا، پھرکیا ہوا؟
اللہ ہوا۔

অর্থাৎ, একবার যে বলল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া আর কোন খালেক মালেক নেই, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবূদ নেই। সবকিছু করনেওয়ালা আল্লাহ পাকের যাত। সবকিছু দেনে-ওয়ালা আল্লাহ পাকের যাত। সবকিছুর উৎস আল্লাহ পাকের যাত। অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া আর কিছুই নেই। যখন কেউ এটা বলল, তখন সে নিজেও বিলীন হয়ে গেল, সে নিজেও নেই হয়ে গেল। তার আমিত্ব বলেও কিছু থাকল না। তার আত্মগরিমা বলেও কিছু থাকল না। কারণ সে বলেছে আল্লাহ ছাড়া কিছু নেই, সব আল্লাহর থেকে হচ্ছে। তাই তার ভিতরে আমিত্ব আসতে পারবে না। সংক্ষেপে কবি বলেছেন– যে লা বলল, সে লা হয়ে গেল। "লা" শব্দের অর্থ নেই। যে লা বলল অর্থাৎ, যে বলল আল্লাহ ছাড়া আর কিছু নেই, সে লা হয়ে গেল অর্থাৎ, তার আমিত্বও নেই হয়ে গেল। তার আমিত্ব বলে কিছু থাকতে পারবে

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

না। আমি এই, আমি সেই, আমার এই আছে, সেই আছে-এরকম আমিত্ববোধ তার ভিতরে থাকবে না। অর্থাৎ, তার ভিতরে কোন অহংকার থাকতে পারবে না। এমনকি আমি অহংকার মুক্ত হয়ে গেছি, আমি খুব বিনয়ী, আমার ভিতরে আমিত্ব নেই ভিতরে এতটুকু আমিত্বও থাকতে পারবে না। আমার ভিতরে অহংকার নেই, আমি বিনয়ী গুণের অধিকারী হয়ে গেছি, এই বোধের ভিতরেও একটু আমিত্ব থেকে যায়। এতটুকু আমিত্বও থাকতে পারবে না। অর্থাৎ, আমিত্ব যে নেই-এই বোধও নেই হয়ে যেতে হবে। আমিত্ব নেই এই বোধও থাকতে পারবে না।

جزء لاہوا، کل لاہوا، پھر کیا ہوا؟

اللہ ہوا۔

অর্থাৎ, এভাবে যখন সবকিছু "লা" হয়ে যাবে, ছোট বড় সব শির্ক দূর হয়ে যাবে, ছোট বড় সব রকম আমিত্ব দূর হয়ে যাবে, আল্লাহ ছাড়া সবকিছু পূর্ণাঙ্গভাবে নেই হয়ে যাবে, তখনই সত্যিকারভাবে আল্লাহর চেতনা প্রতিষ্ঠিত হবে, সত্যিকারভাবে তাওহীদ প্রতিষ্ঠিত হবে। বুঝা গেল সত্যিকার তাওহীদ প্রতিষ্ঠিত করতে হলে আল্লাহ ব্যতীত আর কারও কোনরকম বড়ত্ব মেনে নেয়া যাবে না। সব বড়ত্ব একমাত্র আল্লাহর। হাদীছে কুদছীতে আল্লাহ পাক বলেছেন,

اَلْكِبْرِيَاءُ رِدَائِيْ، وَالْعَظْمَةُ اِزَارِيْ. فَمَنْ نَازَعَنِيْ وَاحِدًا مِنْهُمَا اَلْقَيْتُهُ فِى النَّارِ. (رواه أحمد برقم ٧٣٧٦وإسناده حسن)

অর্থাৎ, বড়ত্ব আমার ভূষণ। বড়ত্ব একমাত্র আমাকেই মানায়। কারণ সবকিছু আমার। আমিত্বও আমাকে মানায়, আর কাউকে মানায় না। আমার এই ভূষণ, আমার এই পোষাক নিয়ে যদি কেউ টানাটানি করে, তাহলে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব।

এখানে অহংকারকারীকে আল্লাহর পক্ষ থেকে হুমকি দেয়া হয়েছে। আর যে সমস্ত অপরাধের উপরে আল্লাহ, আল্লাহর রাসূলের পক্ষ থেকে হুমকি আসে, ধমক আসে, বুঝা যায় সেগুলো বড় গোনাহ, কবীরা গোনাহ। তাই এ হাদীছ থেকে বুঝা গেল যে, অহংকার করা গোনাহে কবীরা।

অহংকার দূর করার উপায় হল যখনই কোনকিছু নিয়ে অহংকার বোধ হবে, তখনই মনে করতে হবে যে, এটাতো আল্লাহ পাকের দান, এ নিয়ে আমার বড়ায়ী করার কিছু নেই। বরং আল্লাহর সামনে আমার নত হওয়া উচিত। অহংকারের চিকিৎসায় বুযুর্গানে দ্বীন আরও বলেছেন, এমন-এমন কাজ করবে, যেগুলো সাধারণত নিম্ন শ্রেণির লোকেরা করে থাকে। যেমন– ঘরের সামনের রাস্তায় নিজে ঝাড়ু দিবে, বাজার করতে যাবে, ইত্যাদি। এছাড়া মসজিদের মানুষের জুতা সোজা করে দিবে। মানুষের সামনে মাথা নত করে রাখবে, বড় গলায় কথা বলবে না, জোর আওয়াজে কথা বলবে না। বেশি-বেশি সকলকে সালাম দিবে, বিশেষভাবে আমার থেকে যারা বয়সে ছোট, পদে ছোট, জ্ঞানে ছোট, তাদেরকে বেশি-বেশি সালাম দিবে। এগুলো করলে মনের উপরে চাপ আসে, অহংকারের উপরে আঘাত আসে। তখন অহংকার আস্তে-আস্তে দমন হয়ে যায়। অহংকার খুব জটিল রোগ, এটা দূর হতে বেশ সময় নেয়। যাহোক যে ছয়টা মৌলিক গোনাহের কথা বলা হচ্ছিল, তার ভিতরে এটা হল একটা বিশেষ গোনাহ।

**চতুর্থ নম্বর গোনাহ হল:** গায়রে মাহরাম নারী-পুরুষের মেলামেশা। মূল গোনাহ হল যা মানুষের যৌনাঙ্গের দ্বারা সংঘটিত হয়ে থাকে। যৌনাঙ্গের গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার জন্যই গায়রে মাহরাম নারী-পুরুষের মেলামেশা বন্ধ করতে হবে। এই মেলামেশা থেকেই আস্তে-আস্তে যেনার দিকে অগ্রসর হয়। তাই পরুষ হলে গায়রে মাহরাম মহিলার সংগে কথাবার্তা বলা, তাদের দিকে তাকানো থেকেও

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



বিরত থাকতে হবে। এই তাকানো এবং কথাবার্তাই হল যেনার ভূমিকা। এই ভূমিকা থেকেই ধীরে-ধীরে যেনার দিকে অগ্রসর হয়। তাই এই ভূমিকা থেকে বিরত থাকতে হবে। মহিলা হলে গায়রে মাহরাম পুরুষের সংগে মেলামেশা করবে না, তাদের সাথে কথাবার্তা বলবে না, তাদের দিকে নজর পর্যন্ত দিবে না। গায়রে মাহরাম নারী-পুরুষের দিকে নজর করাকে চোখের যেনা বলা হয়েছে। একবার অনিচ্ছাকৃত যে দৃষ্টি পড়ে যায়, আল্লাহ পাক সেটাকে মাফ করবেন। কিন্তু দ্বিতীয়বার দৃষ্টি দিলে বা প্রথম দৃষ্টিকে আরও দীর্ঘায়িত করলে সে গোনাহ মাফ করা হবে না। এটাকে চোখের যেনা বলা হয়। এটাও গোনাহে কবীরা। একটা হাদীছে এসেছে – রাসূল (সা.) হযরত আলী (রা.)কে বদ-নজরের মাসআলা বোঝানোর জন্য বলেছিলেন,

يَا عَلِيُّ! لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّ لَكَ الْأُوْلَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ. (رواه الترمذي برقم ٢٧٧٧ وقال حسن غريب)

'অর্থাৎ, হে আলী, একবার দৃষ্টি পড়ার পর আবার দৃষ্টি দিবে না। প্রথমটার জন্য তোমাকে পাকড়াও করা হবে না। কিন্তু দ্বিতীয়টা মাফ হবে না'।

মানুষকে যেনা বা যৌনাঙ্গের গোনাহ থেকে বিরত রাখার জন্যই নজর ইত্যাদির ব্যাপারে এত কড়াকড়ি করা হয়েছে। যৌনাঙ্গকে হেফাযত করার গুরুত্ব অনেক বেশি। এ জন্য তার ফযীলতও অনেক। এক হাদীছে রাসূল (সা.) বলেছেন,

مَنْ يَّضْمَنْ لِيْ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ اَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ. (صحيح البخاري برقم ٦٤٧٤)

'অর্থাৎ, যে ব্যক্তি নিজের যৌনাঙ্গকে হেফাযত করার দায়িত্ব নিবে, আমি তাকে জান্নাতে পৌছানোর দায়িত্ব নিয়ে নিব'। সুবহানাল্লাহ!

জান্নাতে যাওয়ার কত সহজ আমল এটা। আমি দায়িত্ব নিব যে, আমার যবান দ্বারা কোন গোনাহ হবে না, মিথ্যা হবে না, কারও গীবত শেকায়েত হবে না, কাউকে গালি গালাজ করা হবে না, কাউকে কটু কথা বলা হবে না, অর্থাৎ যবান দ্বারা যত প্রকার গোনাহ হতে পারে তা হবে না, এমনিভাবে দায়িত্ব নিব যে, যৌনাঙ্গকে আমি হেফাযত করব, অর্থাৎ যৌনাঙ্গ দ্বারা কোন গোনাহ হতে দিব না। আমি এই দুটো দায়িত্ব নিয়ে নিব, তাহলে রাসূল (সা.) আমাকে জান্নাতে পৌছানোর দায়িত্ব নিয়ে নিবেন।

এই যৌনাঙ্গকে হেফাযত করার জন্যই গায়রে মাহরাম নারী-পুরুষের মেলামেশা বন্ধ করতে হবে। এই মেলামেশা থেকেই ইটিস-পিটিস করার গোনাহ হবে, এর থেকে বদ নজরের গোনাহ হবে, এর থেকে অবৈধ যোগাযোগের গোনাহ হবে। শেষ পর্যন্ত যেনা-র চরম গোনাহ সংঘটিত হবে। তাই গায়রে মাহরাম নারী-পুরুষের মেলামেশা এমন একটা গোনাহ, যার থেকে আরও অনেক গোনাহ সংঘটিত হয়। এই একটা গোনাহ থেকে বিরত থাকলে ঐ বহু গোনাহ থেকে বিরত থাকা সম্ভব হবে। ঐসব গোনাহ থেকে বিরত থাকা আছান হবে।

**পঞ্চম নম্বর গোনাহ হল:** জুলুম করা। জুলুম বলা হয় কারও জান, মাল, ইজ্জত-আব্রুর উপরে কোন রকম আঘাত করা। কারও জানের উপর আঘাত করা যাবে না, অর্থাৎ কোনভাবে তাকে দৈহিক ও মানসিক কষ্ট দেয়া যাবে না। কারও মালের উপর আঘাত করা যাবে না, অর্থাৎ কারও সম্পদ নষ্ট হোক এমন কোন পদক্ষেপ নেয়া যাবে না, অন্যায়ভাবে কারও সম্পদ নিয়ে নেয়া যাবে না। কারও ইজ্জত-আব্রু নষ্ট হোক এমন কিছু বলা যাবে না, এমন কিছু করা যাবে না। এভাবে কারও জান-মাল, ইজ্জত-আব্রুর উপর আঘাত করাকে বলা হয় জুলুম। এটা এমন বড় পর্যায়ের গোনাহ যে, এর দ্বারা মানুষের হক নষ্ট করা হয়। আর

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

মানুষের হক নষ্ট করলে আল্লাহ পাক তা মাফ করেন না। বড় বড় গোনাহে কবীরাও আল্লাহ মাফ করবেন, এমনকি কেউ যদি শিরক করে আবার ইসলাম নবায়ন করে নতুন করে মুসলমান হয়, তাহলেও আল্লাহ পাক তাকে মাফ করে দিবেন, কিন্তু কেউ কোন বান্দার হক নষ্ট করলে আল্লাহ তা মাফ করবেন না। কোন বান্দার হক আল্লাহ মাফ করবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা নিজে সেটা মাফ না করবে।

বান্দার হক এত শক্ত বিষয়! অথচ আমরা এটাকে খুব হালকাভাবে নেই। অন্যায়ভাবে মানুষ থেকে অর্থকড়ি নেয়াকে, কথা-আচরণে মানুষকে কষ্ট দেয়াকে আমরা তেমন বড় অন্যায় মনে করছি না, অথচ এগুলো বড় অন্যায়, এগুলো জুলুম, এগুলো বান্দার হক নষ্ট করা। কোন বান্দার হক নষ্ট করলে সে যদি ক্ষমা না করে, তাহলে নাজাত পাওয়া কঠিন হয়ে যাবে। কত মানুষ থেকে আমরা সূদ ঘুষ নিচ্ছি, অন্যায়ভাবে অর্থ-কড়ি নিচ্ছি, অথচ ঐ মানুষ থেকে মাফ করানোর ব্যবস্থাও আর করতে পারছি না। তাহলে আমাদের অবস্থা কী হবে? আল্লাহ আমাদেরকে এরকম অন্যায় থেকে হেফাযত করেন। যারা আমরা এরকম অন্যায় করেছি, তাদের উচিত যার উপর জুলুম করেছি তার থেকে ক্ষমা পাওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা। মাল নিয়ে থাকলে তা তাকে ফেরত দেয়া। না পারলে বা কোনভাবে কথা দ্বারা কিংবা আচরণ দ্বারা কাউকে কষ্ট দিয়ে থাকলে তার থেকে ক্ষমা চেয়ে নেয়া।

অনেক সময় এরকম হয় যে, একজন লোক কিছু টাকা পাবে, কিন্তু এখন তাকে খুঁজে পাচ্ছি না, বা তিনি মরে গেছেন, তার ওয়ারিছ নেই কিংবা ওয়ারিছদেরকে খুঁজে পাচ্ছি না। এরকম হলে সেই পরিমাণ টাকা তার নামে সদকা করে দিতে হবে। এর ছওয়াব তিনি পেয়ে যাবেন। হতে পারে কিয়ামতের দিন এই ছওয়াব পেয়ে খুশি হয়ে তিনি মাফ করে দিবেন। এভাবেও রক্ষা পাওয়ার একটা উপায় আছে।

যাহোক কুরআন-হাদীছের আলোকে ছয়টা বড় গোনাহ সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছিল। এই ছয়টা গোনাহ এমন মৌলিক গোনাহ যে, এগুলো থেকে বিরত থাকলে অন্যান্য বহু গোনাহ থেকে বিরত থাকা আছান হয়ে যায়।

**ষষ্ঠ নম্বর গোনাহ হল:** ক্রোধ। ক্রোধে আক্রান্ত হলে পরিণামে পস্তাতে হয়। কারণ ক্রোধ বা রাগ অবস্থায় মানুষের মাথা ঠিক থাকে না, বুদ্ধি-বিবেচনা হারিয়ে যায়। রাগের মুহূর্তে এমন সব কাজ ঘটে যায়, যা বিবেক বুদ্ধির পরিপন্থী। রাগের সময় মুখ দিয়ে এমন মারাত্মক কথা বের হয়ে পড়ে, অথবা হাত দিয়ে এমন অশোভন কাজ সংঘটিত হয়, যা অনেক সময় মারাত্মক বিপদ বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তারপর যখন রাগ ঠাণ্ডা হয়, তখন আর কিছু করার থাকে না এবং তা সারা জীবন মনোপীড়ার কারণ হয়ে থাকে।

রাগের কারণে অনেক ধরনের গোনাহ হয়ে থাকে। রাগের কারণে মানুষের সাথে বাড়াবাড়ি হয়ে যায়, রাগের কারণে মানুষের প্রতি জুলুম অবিচার হয়ে থাকে, রাগের কারণে মানুষের হক নষ্ট করা হয়ে থাকে, রাগের কারণে ব্যালেন্সহারা হয়ে মানুষ বিবিকে অন্যায়ভাবে তালাক দিয়ে, পরিবারের সুখ-শান্তি বিনষ্ট করে বসে, রাগের কারণে কাউকে কটু কথা বলে পরে সমাজে লাঞ্ছিত হতে হয়। এভাবে এক রাগের কারণে বহু গোনাহ এবং বহু ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। রাগ থেকে বিরত থাকলে এইসব গোনাহ এবং ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে বিশেষভাবে এই ছয়টা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করুন এবং ধীরে-ধীরে সমস্ত গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার অভ্যাস গড়ে তোলার তাওফীক দান করুন। আমীন!

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



বয়ান নং ৩০-এর খুতবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ حَبَّبَ اِلٰى قُلُوْبِنَا الْاِيْمَانَ، وَكَرَّهَ اِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ، اَحْمَدُهٗ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا يَّمْلَأُ الْمِيْزَانَ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ شَهَادَةً تُنَجِّيْنَا مِنَ النِّيْرَانِ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهُ الَّذِىْ هَدَى النَّاسَ اِلَى اجْتِنَابِ الْمَعَاصِىْ فِى السِّرِّ وَالْاِعْلَانِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِاِحْسَانٍ.

اَمَّا بَعْدُ:

اَيُّهَا النَّاسُ! اِنَّ فِى الشَّرْعِ نَوْعَيْنِ مِنَ الْمَسْئُوْلِيَّةِ عَلَى الْاَنَامِ، اِمْتِثَالُ الْحَسَنَاتِ وَاجْتِنَابُ الْمَعَاصِىْ وَالْاٰثَامِ. وَاَشَارَ اِلَيْهِ حَدِيْثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ مَا اَمَرْتُكُمْ بِهٖ فَخُذُوْهُ، وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا. فَاتَّقُوا اللّٰهَ عِبَادَ اللّٰهِ، وَاجْتَنِبُوْا عَنْ مَحَارِمِ اللّٰهِ. وَاعْلَمُوْا اَنَّ الْمَعَاصِىَ اَنْوَاعٌ كَثِيْرَةٌ، يَقُوْلُ الصُّلَحَاءُ: اِذَا كَانَ الرَّجُلُ تَرَكَ سِتَّةَ اَنْوَاعٍ مِنَ الْمَعَاصِىْ يَسْهَلُ عَلَيْهِ الْاِجْتِنَابُ عَمَّا بَقِىَ شَيْئًا فَشَيْئًا. وَهِىَ الْغِيْبَةُ، وَالْغَضَبُ، وَالْكِبْرُ وَاحْتِقَارُ النَّاسِ، وَاَكْلُ الْحَرَامِ، وَالْمُخَالَطَةُ مَعَ غَيْرِ الْمَحَارِمِ. فَيَرْحَمُ اللّٰهُ اِمْرَأً حَفِظَ عَنِ الْغِيْبَةِ لِسَانَهٗ، وَعَنِ الْغَضَبِ قَلْبَهٗ، وَعَنِ الْكِبْرِ وَاحْتِقَارِ النَّاسِ فُؤَادَهٗ، وَعَنْ اَكْلِ الْحَرَامِ بَطْنَهٗ، وَعَنِ النَّظْرِ اِلٰى غَيْرِ الْمَحَارِمِ اَجْفَانَهٗ.

وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللِّسَانَ جِرْمُهٗ صَغِيْرٌ وَجُرْمُهٗ كَبِيْرٌ، اَلَا وَاِنَّ اللِّسَانَ اَعْظَمُ الْاَعْضَاءِ ضَرَرًا، وَاَشَدُّهَا خَطَرًا، وَاِنْ لَّمْ يَتَعَاهَدْهُ صَاحِبُهٗ اَوْقَعَهٗ فِىْ اٰفَاتٍ، وَاَفْضٰى بِهٖ اِلٰى اُمُوْرٍ مُّهْلِكَاتٍ، وَاِنَّ مِنْ اَعْظَمِ اٰفَاتِهِ الْكِذْبُ وَالْغِيْبَةُ. فَاِيَّاكُمْ

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

وَالْغِيْبَةَ ، فَاِنَّ الْغِيْبَةَ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا. وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : مَنْ يَّضْمَنْ لِيْ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ اَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ. اَلَا وَاِنَّ الْكِبْرَ وَالْغَضَبَ خُلُقَانِ مَذْمُوْمَانِ، وَقَدْ جَاءَ الْوَعِيْدُ عَلَيْهِمَا فِى السُّنَّةِ وَالْقُرْاٰنِ، فَاتْرُكُوا الْغَضَبَ وَالْعُجْبَ مِنْ قُلُوْبِكُمْ، وَعِيْشُوْا بِسَلَامَةِ فُؤَادِكُمْ وَمَحَبَّةِ صُدُوْرِكُمْ. اَلَا وَاِيَّاكُمْ وَاَكْلَ الْحَرَامِ، فَاِنَّ اَكْلَ الْحَلَالِ، شَرْطٌ لِقَبُوْلِ الْاَعْمَالِ، قَالَ تَعَالٰى : يَاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا. وَاِيَّاكُمْ عَنِ الْمُخَالَطَةِ مَعَ غَيْرِ الْمَحَارِمِ، فَاِنَّ النَّظَرَ اِلٰى غَيْرِ الْمَحَارِمِ وَالْمُخَالَطَةَ مَعَهُمْ مِنَ الْمَعَاصِيِّ وَالْاٰثَامِ. وَقَدْ اَوْصَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِفْظِ الْاَبْصَارِ عَنْ غَيْرِ الْمَحَارِمِ فَقَالَ : يَا عَلِيُّ! لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ ، فَاِنَّ لَكَ الْاُوْلٰى وَلَيْسَتْ لَكَ الْاٰخِرَةُ. وَقَالَ تَعَالٰى : وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَاسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ، ذٰلِكَ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ.

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ : وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَاِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ. وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ.

بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ، وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. اَقُوْلُ قَوْلِىْ هٰذَا وَاسْتَغْفِرُ اللّٰهَ لِىْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَاسْتَغْفِرُوْهُ، اِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



বয়ান নং -৩১

## শবে বরাতের বয়ান

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُوْمُوْا لَيْلَهَا وَصُوْمُوْا نَهَارَهَا، فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَنْزِلُ فِيْهَا لِغُرُوْبِ الشَّمْسِ اِلَى السَّمَآءِ الدُّنْيَا، فَيَقُوْلُ : اَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَاَغْفِرَلَهُ، اَلَا مِنْ مُّسْتَرْزِقٍ فَاَرْزُقَهُ، اَلَا مِنْ مُّبْتَلًى فَاُعَافِيَهُ فِيْهِ، اَلَا كَذَا اَلَا كَذَا حَتّٰى يَطْلُعَ الْفَجْرُ.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

বরাতের রাত বা শবে বরাত একটা বরকতময় রাত। একটা ফযীলতের রাত। এই রাতে ইবাদত করার জন্য আল্লাহ পাক আমাদেরকে মসজিদে সমবেত হওয়ার তাওফীক দান করেন। আমরা অনেকেই এ রাতে ইবাদতের জন্য মসজিদে সমবেত হয়ে থাকি। এজন্য আল্লাহর শোকর আদায় করতে হবে আল-হামদু লিল্লাহ। এই আল-হামদু লিল্লাহ আরও অর্থবহ হবে যদি আমরা শবে বরাতের মত অন্যান্য সবদিন ফরয নামায জামাআতে পড়ার জন্য উপস্থিত হই।

শবে বরাতে আমরা যে ইবাদতের জন্য মসজিদে হাজির হই, এটা নফল ইবাদত। প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত জামাআতে যে নামায হয় সেটা ফরয ইবাদত। নফলের জন্য যদি আমরা এরকম যত্ন সহকারে সমবেত হতে পারি, এরকম সমবেত হওয়ার তাগিদ এবং প্রয়োজন অনুভব করি, তাহলে ফরযের জন্য কেন আমাদের ভিতর সেরকম অনুভূতি আসবে না? সারা যিন্দেগীর নফল নামায যদি একত্রিত করা হয়, তবুও তা দুই রাকআত ফরযের সমতুল্য হতে পারবে না। ফরযের গুরুত্ব এত বেশি। সেই ফরয নামায যেন সহীহভাবে হয় তার খাতিরে ফরয নামাযের জামাআতকে গুরুত্বপূর্ণ করে দেয়া হয়েছে। ফরয নামায জামাআতের সাথে আদায় করা সুন্নাতে মুআক্কাদা অর্থাৎ, প্রায় ওয়াজিবের পর্যায়ে। হাদীছে জামাআতের ব্যাপারে এতখানি তাগিদ এসেছে যে, এটাকে ওয়াজিব বলতে হয়। কোন রকম গা বাঁচানোর জন্য সুন্নাতে মুআক্কাদা বলে ফতোয়া দেয়া হয়। কিন্তু আসলে হাদীছে জামাআতের ব্যাপারে যতটা তাগিদ এসেছে, তাতে এটাকে ওয়াজিব বলতে হয়। যারা সব সময় বিনা ওজরে জামাআত তরক করে, ফেকাহ্-র পরিভাষায় তাদেরকে বলা হয় ফাসেক, অর্থাৎ, অবাধ্য। এতবড় একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ যে অনবরত ছেড়ে যাচ্ছে, অব্যাহতভাবে ছেড়ে চলছে তাকে আল্লাহর অবাধ্য না বলে বাধ্য বলার উপায় থাকে না। তাই যখন আমার সাধ্য থাকে, আমি বাসায় থাকি, আমার শরীআতসম্মত কোন ওজর না থাকে, আমাকে অবশ্যই জামাআতে এসে নামায পড়তে হবে।

ফরয নামায জামাআতের সাথে আদায় করাই হল আসল বিধান। এর বিপরীত নফলের আসল বিধান হল ঘরে পড়া। শবে বরাতে বা বরাতের রাতে যে ইবাদত করার জন্য আমরা মসজিদে সমবেত হই, সেটা হল নফল ইবাদত। নফল ইবাদত আসলে হবে ঘরে। তবে হ্যাঁ বরাতের রাত্রে আমাদের কী করণীয় সেটা জানার জন্য যদি মসজিদে সমবেত হই, তাহলে ভাল কথা। জানার পর ঘরে যেয়েই ইবাদত করব। নফল ইবাদত ঘরেই করা উত্তম। রাসূল (সা.)-এর ঘর আর মসজিদ ছিল লাগানো। যারা হজ্জে গিয়েছেন তারা দেখেছেন, এখন যেখানে রাসূল (সা.)-এর রওজা মোবারক, এটাই ছিল

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

হযরত আয়েশা (রা.)-এর হুজরা। এর সাথেই মসজিদ লাগানো। রাসূল (সা.)-এর অন্যান্য বিবিদের ঘরও মসজিদের সাথে ছিল। মোটকথা রাসূল (সা.)-এর সব ঘর এরকম মসজিদ লাগোয়া হওয়া সত্ত্বেও রাসূল (সা.) নফল নামায ঘরে পড়তেন। এর থেকে বুঝা যায় নফল নামায ঘরে পড়া উত্তম। কিছু নামায ঘরে পড়লে বিবি বাচ্চারাও দেখে নামায পড়তে উদ্বুদ্ধ হবে। দেখা যায় আমি ঘরের কর্তা, আমি ভাল নামাযী, মসজিদে যাই, কিন্তু আমার বিবিদেরকেও নামাযের জন্য বলি না, বাচ্চাদেরকেও বলি না, আমি ঘরেও কোন নামায পড়ি না। এভাবে আমার বিবি বাচ্চারা কখনই আমাকে সরাসরি নামায পড়তে দেখে না, তাহলে তারা নামায পড়তে উদ্বুদ্ধ হবে কীভাবে? আমার ঘরে নামাযের পরিবেশ গড়ে উঠবে কীভাবে? যদি ঘরে দ্বীনী পরিবেশ গড়ে না ওঠে, তাহলে তারা দ্বীনী পরিবেশ পাবে কোথায়? বাইরে তো দ্বীনী পরিবেশ পাওয়া আরও কঠিন। তাই নফল নামাযের মাসায়েল এভাবে রাখা হয়েছে যে, ঘরেই নফল পড়া উত্তম। হাদীছে এসেছে,

صَلُّوْا فِى بُيُوْتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا. (رواه الترمذي برقم ٤٥١ وقال : حسن صحيح)

অর্থাৎ, তোমরা ঘরেও নামায পড়, তোমাদের ঘরগুলোকে কবর বানিও না। অর্থাৎ কবরে যেরকম নামায নেই, সেখানে কোন ইবাদত বন্দেগী হয় না, তোমাদের ঘরও যেন এরকম না হয় যে, সেখানে কোন নামায, ইবাদত বন্দেগী হবে না। ফরয নামায যেহেতু মসজিদে হবে, তাই ঘরে হবে নফল।

যে কথা বলছিলাম, আমরা শবে বরাতে যেরকম নফল ইবাদতের জন্য মসজিদে আসি, এর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল ফরযের জন্য মসজিদে আসা। আমরা শবে বরাতে যদি মসজিদে জমা হই দ্বীনের কথা শোনার জন্য এবং আমল করার জন্য। সেটাও আল-হামদু লিল্লাহ, ভাল। দ্বীনী জযবা নিয়েই আমাদের আসা হয়। তবে অবস্থা দেখে মনে হয় এটা একটা খুশির রাত, আনন্দের রাত। যে হারে বাচ্চারা, শিশুরা পর্যন্ত মসজিদে আসে এবং তাদের হাব-ভাব দেখে যা মনে হয়, তা হল– তারা এটাকে একটা আনন্দের রাত, একটা ফুর্তির রাত মনে করে। অথচ এটা কোন জাগতিক খুশীর রাত বা আনন্দের রাত নয়। তারা যে এটাকে আনন্দের রাত মনে করে বসেছে, তার কারণও আমরা। আমরা এই রাতে বিশেষ খাবারের আয়োজন করি। এ থেকেই তারা মনে করতে শিখেছে যে, এটা একটা আনন্দ-ফুর্তির রাত। এই রাত আসলেই আমরা হালুয়া, রুটি, মুরগী, পোলাও করাকে যেন জরুরী মনে করে বসেছি। এক শবে বরাতে এক মুসল্লী আমাকে বললেন যে, হুজুর সকালে আমার বিবির সাথে রাগারাগি হয়ে গেল। জিজ্ঞাসা করলাম কী নিয়ে? বলল, বিবি বলছে ঘরে মুরগী নেই, আজকে বিশেষ একটা দিন, ঘরে মুরগী না থাকলে কী চলে? কী দিয়ে কোরমা-পোলাও করব? এ থেকেই বোঝা যায় গোটা সমাজ যেন এই দিন-রাতকে খুশীর দিনরাত মনে করছে, খাওয়া-দাওয়া, হৈ-চৈ এবং আনন্দ-ফুর্তির দিন মনে করছে।

মনের এরকম অবস্থা থেকেই অনেকে এই রাতে মসজিদে ঈদের মত লাইটিং করে। কেন লাইটিং করা হয়? কারণ তারা এ রাতকে একটা ফুর্তির রাত মনে করে। এটাতো আদৌ লাইটিং এর রাত নয়, এটা ফুর্তির রাত নয়, এটা হল খাস করে ইবাদতের রাত। এ রাতের একটা খাস আমল হল আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া। ক্ষমা চাওয়ার জন্য মন থাকবে গোনাহের জন্য অনুতপ্ত, মনে থাকবে আযাবের ভয়। আযাবের ভয়ে মন কাপতে থাকবে। মন থাকবে চিন্তিত, ভারাক্রান্ত। এরকম মনে লাইটিং করার মত ফুর্তি আসতে পারে কীভাবে? এভাবে লাইটিং করা এ রাতের ভাব-গাম্ভীর্যের সাথে উপহাস করা। বোমা ফাটানো, পটকা ফোটানো, আতশবাজী করাও এ রাতের মাহাত্ম ও গাম্ভীর্যের সাথে উপহাস করা।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



এই রাতে কী কী করণীয়- এ সম্পর্কে নবী কারীম (সা.) ইরশাদ করেছেন,

إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُوْمُوْا لَيْلَهَا وَصُوْمُوْا نَهَارَهَا.

অর্থাৎ, যখন শা'বান মাসের অর্ধেক হয়ে যায়, যখন ১৪ই তারিখ দিবাগত রাত হয়, তখন তোমরা সেই রাত্র জাগরণ কর, আর পরের দিন রোযা রাখ। এরপর রাসূল (সা.) বলেছেন,

فَإِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَنْزِلُ فِيْهَا لِغُرُوْبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُوْلُ أَلَا مِنْ مُّسْتَغْفِرٍ فَاَغْفِرَلَهُ، أَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَاَرْزُقَهُ، أَلَا مُبْتَلًى فَاُعَافِيَهُ أَلَا كَذَا أَلَا كَذَا حَتّٰى يَطْلُعَ الْفَجْرُ. (رواه ابن ماجة برقم ١٣٨٨ والبيهقي في شعب الإيمان برقم ٣٨٢٢ والحديث قابل للاحتجاج ولتحقيق الحديث انظر كتابي فضائل زندگى بالبنغالية)

অর্থাৎ, আল্লাহ পাক এই রাতে প্রথম আসমানে চলে আসেন। অর্থাৎ, আল্লাহ পাক বান্দার খুব কাছে চলে আসেন এবং মানুষকে ডেকে ডেকে বলতে থাকেন– তোমরা কেউ পাপী আছ, আমার কাছে মাফ চাইবে, আমি তাকে মাফ করে দিব। তোমাদের কেউ রিযিক চাওয়ার আছে, আমার কাছে রিযিক চাইবে, আমি তাকে রিযিক দান করব। তোমাদের কেউ অসুস্থ আছ, রোগ-শোকগ্রস্থ আছ, আমার কাছে রোগ থেকে মুক্তি চাইবে আমি তাকে মুক্তি দিয়ে দিব। এভাবে আল্লাহ পাক এক একটা বিষয়ের উল্লেখ করে করে বলতে থাকেন– অমুকটা চাওয়ার আছ, চাও, আমি দিয়ে দিব। অমুকটা চাওয়ার আছ, চাও, আমি দিয়ে দিব। এভাবে এক একটা বিষয় উল্লেখ করে আল্লাহ পাক ডেকে ডেকে চাওয়ার জন্য বলতে থাকেন। সুবহে সাদেক পর্যন্ত অর্থাৎ, ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত এভাবে আল্লাহ পাক বিভিন্ন বিষয়ের উল্লেখ করে মানুষকে ডেকে ডেকে চাইতে বলেন, দু'আ করতে বলেন।

এই রাতে আল্লাহ তা'আলা যতগুলো বিষয় চাওয়ার বা দু'আ করার কথা বলেছেন, তার মধ্যে বলেছেন ক্ষমা চাওয়ার কথা। কারণ মানুষের ক্ষমা চাওয়া হল সবচেয়ে বড় চাওয়া, ক্ষমা পাওয়া হল মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় পাওয়া। শবে বরাত সবকিছু চাওয়ার রাত, তবে তার মধ্যে সবচেয়ে প্রধান চাওয়ার বিষয় হল ক্ষমা চাওয়া। ইসলামের দৃষ্টিতে সবচেয়ে বড় চাওয়া হল ক্ষমা চাওয়া, সবচেয়ে বড় পাওয়া হল ক্ষমা পাওয়া। এ জন্যই এই রাতে আল্লাহ পাক প্রথম নম্বরে গোনাহ থেকে মুক্তি চাওয়ার কথা বলেছেন। এর সাথে সাথে অভাব অনটন থেকে মুক্তি চাওয়া, রোগ-শোক থেকে মুক্তি চাওয়া। বিপদ-আপদ থেকে মুক্তি চাওয়া এই সবকিছু চাওয়ার কথাও বলেছেন।

যাহোক এই হাদীছের আলোকে বরাতের রাতের একটা আমল হল নফল ইবাদত করা, আরেকটা আমল হল পরের দিন রোযা রাখা, আরেকটা আমল হল আল্লাহ্‌র কাছ থেকে সবকিছু চেয়ে নেয়া। বিশেষভাবে ক্ষমা চেয়ে নেয়া। এই হল শবে বরাত উপলক্ষে আমাদের বিশেষ বিশেষ করণীয় আমল।

অন্য এক হাদীছে এসেছে, হযরত আয়েশা (রা.) বলেন,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَدْتُّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَيْلَةً فَخَرَجْتُ فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيْعِ فَقَالَ أَكُنْتِ تَخَافِيْنَ أَنْ يَّحِيْفَ اللّٰهُ عَلَيْكِ وَرَسُوْلُهُ ؟ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّيْ ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْضَ نِسَاءِكَ فَقَالَ إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ. (رواه الترمذي برقم ٧٣٩ والبغوي في شرح السنة برقم ٩٩٢ والبيهقي في شعب الإيمان برقم ٣٨٢٥، ٣٨٢٦. والحديث وإن كان سنده منقطعا لاكنه حسن مقبول عند الأحناف.)

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

'অর্থাৎ, এক রাতে আমি রাসূল (সা.)কে পেলাম না। (আমার মনে হিট লাগল। আমি ভাবলাম হয়তো আমার কোন সতীনের ঘরে গিয়ে থাকবেন।) আমি খুঁজতে বের হলাম। খুঁজতে খুঁজতে জান্নাতুল বাকীতে অর্থাৎ, মদীনার কবরস্থানে গিয়ে আমি তাঁকে পেলাম। তিনি বললেন, কী আয়েশা! তুমি কি এই আশংকা করেছিলে যে, আল্লাহ ও আল্লাহর রসূল তোমার প্রতি অবিচার করবেন। আমি বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি তো ভেবেই নিয়েছিলাম যে, আপনি অন্য কোন বিবির ঘরে গিয়ে থাকবেন। তখন রসূল সা. বললেন, শাবানের অর্ধ রাতে অর্থাৎ, ১৫ই রাতে আল্লাহ জাল্লা শানুহু প্রথম আসমানে আসেন অতঃপর বনু কালব গোত্রের যত বকরি আছে সেগুলোর পশমের সংখ্যার চেয়েও বেশি লোককে ক্ষমা করে দেন'।

এ হাদীছে শবে বরাতে আরেকটা আমলের কথা পাওয়া গেল যে, নবী কারীম (সা.) এ রাতে কবর যিয়ারতে গিয়েছেন এবং আপনজন যারা দুনিয়া থেকে চলে গেছে, শুধু আপনজন নয় সমস্ত মু'মিন নরনারী যারা দুনিয়া থেকে চলে গেছে, দ্বীনের রাস্তায় আত্মত্যাগ করে যারা মৃত্যুবরণ করেছেন, তাদের সবার জন্য এ রাতে দু'আ করেছেন। তাই কেউ চাইলে এ রাতে কবর যিয়ারতেও যেতে পারেন।

এই রাতে যে নফল ইবাদতের কথা বলা হল, সেই নফল ইবাদত বলতে কী বোঝায়? নফল ইবাদত বলতে বিশেষভাবে বোঝায় নফল নামায পড়া। হাদীছে এসেছে,

وَمَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ اِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتّٰى اُحِبَّهُ، اِنْ سَاَلَتَنِيْ اَعْطَيْتُهُ وَاِنْ دَعَانِيْ اَجَبْتُهُ.

(رواه أحمد برقم ٢٦٢٣٦ قال شعيب الأرنؤوط : والحديث صحيح لغيره)

অর্থাৎ, নফল ইবাদত দ্বারা বান্দা আমার নৈকট্য অর্জন করে, অর্থাৎ আমার খুব কাছের মানুষ হয়ে যায়। এমনকি আমার ভালবাসার পাত্র হয়ে যায়। তাকে আমি ভালবাসতে শুরু করি। তখন সে যা চায় তাই তাকে দেই, যখন আমাকে ডাকে, তার ডাকে সাড়া দেই। তাই যে যত বেশি নফল নামায পড়বে, সে ততবেশি আল্লাহ পাকের ভালবাসা অর্জন করতে পারবে, সে ততবেশি আল্লাহ পাকের কাছের মানুষ হয়ে যাবে। অতএব আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করার জন্য, আল্লাহর কাছের মানুষ হওয়ার জন্য নফল নামায পড়তে হবে। নফল নামাযের মাধ্যমে আমি যখন আল্লাহর কাছের মানুষ হয়ে যাব, তখন আল্লাহ পাকও আমার সব চাওয়া-পাওয়া পূর্ণ করে দেবেন। আপন মানুষের চাওয়া-পাওয়া অপূর্ণ রাখা হয় না। তাই আল্লাহর কাছে চাওয়ার আগে বিশেষভাবে নফল নামাযের কথা বলা হয়েছে। নফল নামাযের সাথে সাথে অন্যান্য নফল ইবাদতও করা যেতে পারে। কুরআন তেলাওয়াত করা যেতে পারে। দু'আ-দুরূদ পড়া যেতে পারে। যিকির-আযকার করা যেতে পারে।

নফল নামাযের ব্যাপারে মনে রাখতে হবে, ইশার পর থেকে নিয়ে সুবহে সাদেক পর্যন্ত, অর্থাৎ, সেহরির শেষ সময় পর্যন্ত যে সময়, এর ভিতরে যত নফল নামায পড়া হবে সেটাকে বলে তাহাজ্জুদ। তাই আমরা এ রাতে যত নফল নামায পড়ব, তা তাহাজ্জুদের নিয়তেও পড়তে পারি, নফলের নিয়তেও পড়তে পারি। দুই দুই রাকআত করে পড়া উত্তম। এভাবে নিয়ত করা যাবে যে, দুই রাকআত তাহাজ্জুদের নিয়ত করছি, অথবা দুই রাকআত নফল নামাযের নিয়ত করছি। নফল বললেও তাহাজ্জুদই হয়ে যায়। তাহাজ্জুদ বললেও নফলই হবে। কাজেই নিয়ত সহজ। অনেক ভাই, বিশেষ করে অনেক মা-বোন এটাকে খুব কঠিন মনে করে বসে আছেন। তারা মনে করেন শবে বরাতের নামায কী পড়ব? নামাযের নিয়তই তো জানি না! অথচ নিয়তের কোন জটিলতা নেই, দুই-দুই রাকআত নফল

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



নামাযের নিয়ত অথবা দুই-দুই রাকআত তাহাজ্জুদের নিয়ত করলেই হয়ে যায়। এই রাতের নামায কোন্ কোন্ সূরা দিয়ে পড়ব, তাও খুব সহজ, কোনই জটিলতা নেই। কোন নির্দিষ্ট সূরার বাধ্যবাধকতাও নেই। যে কোন সূরা-কিরাত দিয়ে পড়তে পারি। শরীআত কত সহজ, অথচ আমরা শরীআতকে অজ্ঞতার কারণে বা কুসংস্কারের কারণে কঠিন করে ফেলেছি।

এতক্ষণ সাধারণ নফল নামাযের কথা বলা হল। অনেক ভাই সালাতুত তাসবীহ পড়তে চান। সালাতুত তাসবীহও পড়া যায়। সালাতুত তাসবীহ্-এর ফযীলত তো সব সময়ই আছে। রাসূল (সা.) তাঁর চাচা হযরত আব্বাস (রা.)কে বলেছিলেন, 'চাচা! পারলে আপনি প্রতিদিন এই নামায পড়বেন। তা না পারলে সপ্তাহে এক দিন পড়বেন। তাও না পারলে মাসে একবার পড়বেন। তাও না পারলে বছরে একবার পড়বেন। অন্তত জীবনে একবার হলেও এই নামায পড়বেন। এই নামায দ্বারা জীবনের সগীরা, কবীরা, ইচ্ছাকৃত, অনিচ্ছাকৃত, নতুন, পুরাতন, গোপন, প্রকাশ্য সব রকম গোনাহ্ মাফ হয়ে যায়'। সুবহানাল্লাহ! এ নামাযের কত ফযীলত। তাই এই নামাযও আমরা পড়তে পারি।

সালাতুত তাসবীহ্ কথাটার অর্থ হল – সালাত শব্দের অর্থ হল নামায, আর তাসবীহ বলতে এখানে سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ (সুবহানাল্লাহি ওয়াল হাম্দুলিল্লাহি ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার)। এই নামাযের ভিতরে এই তাস্বীহ পড়া হয়, তাই এই নামাযকে সালাতুত তাসবীহ্ বলে।

এই নামায হল চার রাকআত। প্রত্যেক রাকআতে এই তাসবীহ ৭৫ বার পড়তে হয়। তাহলে চার রাকআতে ৩০০ বার হয়। সালাতুত তাসবীহ্ নামাযে এই তাসবীহ্গুলো পাঠ করার দুইটা নিয়ম আছে। একটা নিয়ম হল– প্রথমে এভাবে নিয়ত করবেন- চার রাকআত সালাতুত তাসবীহ নফল নামাযের নিয়ত করলাম। তারপর ছানা, অর্থাৎ সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহাম্দিকা .... এটা পড়বেন। যে কোন একটা সূরা-কিরাত পড়বেন। সূরা-কিরাত শেষ করে ঐ দাঁড়ানো অবস্থাতেই ১৫ বার ঐ তাসবীহ পাঠ করবেন। এরপর আল্লাহু আকবার বলে রুকুতে যাবেন। রূকুর তাসবীহ পড়ার পর আবার ঐ তাসবীহ্ ১০ বার পড়বেন। তারপর রূকু থেকে উঠে রাব্বানা লাকাল হাম্দ বলার পর আবার ঐ তাসবীহ ১০ বার পড়বেন। তারপর সাজদায় যাবেন। সাজদার তাসবীহ পড়ার পর ঐ তাসবীহ ১০ বার, সাজদা থেকে উঠে দুই সাজদার মাঝখানে ১০ বার, দ্বিতীয় সাজদায় সাজদার তাসবীহ পড়ার পর আবার ঐ তাসবীহ্ ১০ বার। এই হল ৬৫ বার। এখন আল্লাহু আকবার বলে দ্বিতীয় সাজদা থেকে উঠে বসে আবার ১০ বার। এই হল এক রাকআতে মোট ৭৫ বার। এবার দ্বিতীয় রাকআতের জন্য উঠবেন। এখানে আল্লাহু আকবার বলে উঠতে হবে না। উঠার আল্লাহু আকবার তো আগেই বলা হয়ে গেছে। দ্বিতীয় রাকআতে ঐ রকম সূরা-কিরাতের পর ১৫ বার, রূকুর তাসবীহের পর ১০ বার, রাব্বানা লাকাল হাম্দ-এর পর ১০ বার, প্রথম সাজদায় ১০ বার, দুই সাজদার মাঝখানে ১০ বার, দ্বিতীয় সাজদায় ১০ বার। এরপর আল্লাহু আকবার বলে উঠবেন। এখানে আত্তাহিয়্যাতু পড়তে হবে। এখানে আগে ১০ বার ঐ তাসবীহ পড়ে তারপর আত্তাহিয়্যাতু পড়তে হবে। মনে রাখতে হবে - এই তাসবীহ সব জায়গায় স্থানীয় তাসবীহের পরে, যেমন সূরা-কিরাতের পরে, রূকুর তাসবীহের পরে, সাজদার তাসবীহের পরে, রাব্বানা লাকাল হাম্দ-এর পরে, এভাবে সবকিছুর পরে, শুধু প্রথম বৈঠকে এবং শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পড়ার জন্য যখন বসা হবে, তখন আত্তাহিয়্যাতু-র আগে ঐ তাসবীহ ১০ বার করে পড়বেন। তারপর আত্তাহিয়্যাতু পড়বেন। শেষ রাকআতেও আগে ১০ বার পড়ে

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

তারপর আত্তাহিয়্যাতু, দুরূদ শরীফ ও দুআয়ে মাছূরা পড়বেন। এভাবে আমরা চার রাকআত সালাতুত তাসবীহ নামায পড়ব। এই নিয়মটা উত্তম।

আরও একটা নিয়ম আছে, অনেকে হয়তো সেভাবে মুখস্থ করে রেখেছেন, তারা সেভাবে পড়তে পারেন। সেই নিয়ম অনুযায়ী নিয়ত বেঁধেই ছানা পড়ার পর সূরা-কিরাত পড়ার আগে ১৫ বার, এরপর সূরা কিরাত শেষ করে দশবার। এখানে দাঁড়ানো অবস্থায় দশবার বেশি হয়ে গেল। এই নিয়মে পড়লে দ্বিতীয় সাজদা থেকে সোজা দাঁড়িয়ে যাবেন। দ্বিতীয় সাজদাতেই ৭৫ বার হয়ে যাবে। এ নিয়মে প্রথম বৈঠক এবং শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পড়ার জন্য যখন বসবেন, তখন আর ঐ তাসবীহ পড়তে হবে না।

তাসবীহ মনে রাখার জন্য আঙ্গুলের কর গণনা করা নিষেধ। ভাল মত খেয়াল রাখলে কিছুই টিপা টিপির দরকার হয় না। একান্তই মনে রাখার প্রয়োজনে আঙ্গুল টিপে টিপে মনে রাখা যেতে পারে। তাসবীহ ৩০০ বার হতে হবে। কম থাকলে চলবে না। তাহলে সালাতুত তাসবীহের ফযীলত পাওয়া যাবে না। তাই খুব এতমীনানের সাথে পড়তে হবে। যদি কেউ কোন এক জায়গায় তাসবীহ পড়তে ভুলে যান বা কম থেকে যায়, তাহলে পরবর্তীতে যে জায়গায় মনে আসবে সেখানে ঐ জায়গারটাও পড়বেন, পিছনের ছুটে যাওয়াটাও আদায় করে নিবেন।

সালাতুত তাসবীহ যেকোন সূরা দিয়ে পড়তে পারেন। কেউ কেউ বলেছেন সূরা-আছর, কাউছার, কাফেরূন ও এখলাস বা সূরা-হাদীদ, হাশ্‌র, ছফ ও তাগাবুন দ্বারা পড়া উত্তম। তবে জরুরী নয়। যে কোন সূরা দিয়ে পড়া যেতে পারে। এমনিভাবে এই রাতে যত নফল পড়বেন তাও যে কোন সূরা দিয়ে পড়তে পারেন। কোন কোন বই পুস্তকে লেখা আছে শবে বরাতের নামাযে অমুক অমুক সূরা এতবার করে পড়তে হবে, এটা ঠিক নয়। এরকম নির্দিষ্ট কোন সূরার বাধ্যবাধকতা নেই। নফল নামায খুব আছান। শবে বরাতের নামাযও নফল, এটাও খুব আছান – কোন নির্দিষ্ট সূরার বাধ্যবাধকতা নেই। যেকোন সূরা দিয়ে পড়তে পারি। অনেকে অমুক অমুক সূরা দিয়ে পড়তে হয় –এরকম ভুল ধারণার শিকার হয়ে এ রাতের নামাযকে কঠিন মনে করে বসেন। আসলে ওরকম কঠিন নয়। যাহোক আমরা নফল নামায পড়ব আর আল্লাহর কাছে দু'আ চাইতে থাকব। বিশেষভাবে ক্ষমার জন্য দু'আ চাইতে থাকব।

ক্ষমা পাওয়ার জন্য চারটা বিশেষ শর্ত আছে। ক্ষমা পাওয়ার জন্য খাঁটি তওবা হওয়া জরুরী। খাঁটি তওবা হল চারটি জিনিসের নাম।

১নং – জীবনে যত গোনাহ হয়ে গেছে, সেই গোনাহের জন্য মনে মনে অনুতপ্ত হতে হবে।

২নং – এখন ঐ গোনাহ ছেড়ে দিতে হবে।

৩নং – ভবিষ্যতে ঐ গোনাহ আর করব না, মনে মনে এরকম প্রতিজ্ঞা নিতে হবে।

৪নং – কোন বান্দার হক নষ্ট করে থাকলে তার হক আদায় করতে হবে।

অর্থাৎ কারও প্রতি যুলুম করে থাকলে তার থেকে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। অর্থ কড়ি হলে ফেরত দিতে হবে। যদি তার কাছে ফেরত দেয়া সম্ভব না হয়, তাকে পাওয়া না যায়, তাহলে তার আপনজনকে ফেরত দিতে হবে। যদি তার আপনজনও খুঁজে না পাওয়া যায়, তাহলে ফেকাহ-র কিতাবে লেখা হয়েছে তার নামে ঐ পরিমাণ অর্থ সদকা করে দিতে হবে। তাহলে এই পরিমাণ ছওয়াব তার আমলনামায় জমা হবে। কিয়ামতের দিন সে এই ছওয়াব পেয়ে খুশি হয়ে দুনিয়াতে তার যে হক নষ্ট

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



হয়েছিল সেটা মাফ করে দিবে। এভাবে চারটা শর্ত পূর্ণ করা হলে তখন হবে খাঁটি তওবা। খাঁটি তওবা হলে গোনাহ মাফ হবে। গোনাহ মাফ হওয়ার জন্যও দু'আ করতে হবে, অন্যান্য সবকিছুর জন্যও দু'আ করতে হবে। দু'আ কবুল হওয়ার যে শর্তগুলো রয়েছে, সেই শর্তগুলো পূরণ করতে হবে।

স্বাভাবিক নিয়ম হল– দু'আ কবুল হওয়ার যে শর্ত রয়েছে, সেই শর্ত পূরণ না করলে আল্লাহ পাক দু'আ কবুল করেন না। দুনিয়াতেও নিয়ম হল বড় অফিস আদালতে বা শাহী দরবারে চাওয়ার বা আবেদন করার যে নিয়ম আছে, সেই নিয়ম অনুযায়ী না চাইলে আবেদন মঞ্জুর হয় না। তদ্রূপ আল্লাহ পাকের কাছে দু'আ কবুল হওয়ারও শর্ত বা নিয়ম রয়েছে। তার ভিতরে এক নম্বর এবং প্রধান শর্ত হল– রিযিক হালাল হওয়া। এই প্রশ্নে আমরা অনেকে আঁটকে যাব। আমাদের অনেকের রিযিক হালাল নয়। দুই নম্বর শর্ত হল– মা-বাবার সাথে নাফরমানী না করা। মা বাবার আনুগত্য করাও দু'আ কবুল হওয়ার জন্য শর্ত। 'আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকার' করাও শর্ত। যিকির-আযকার করে দিল তাজা রাখাও শর্ত। আত্মীয়দের সাথে সু-সম্পর্ক বজায় রাখা, কোন মুসলমানের সাথে অন্যায়ভাবে তিন দিনের বেশি বন্ধ না রাখা, হিংসা না করা, বখিলি বা কৃপণতা না করা ইত্যাদি শর্তগুলো পূরণ করতে হবে।

আল্লাহর কাছে নিজের জন্যেও চাইব। মাতা-পিতার জন্যেও চাইব। আত্মীয়-স্বজনের জন্যেও চাইব। যিন্দা-মুর্দা সকলের জন্য চাইব। দু'আ চাওয়ার নিয়ম হল শুধু নিজের জন্য নয়; বরং সকলের জন্য চাইতে হয়। এতে আল্লাহ বেশি খুশি হন এবং ফিরিশতাদেরও দু'আ পাওয়া যায়। আমি যখন আমার আরেক ভাইয়ের জন্য কোন বিষয়ের দু'আ করব, তখন ফিরিশতারা বলবেন আল্লাহ তোমার জন্যও ওটা করে দেন। আর আমি যদি শুধু নিজের জন্য দু'আ করি, তাহলে ফিরিশতার দু'আ পেলাম না। আমার দু'আর চেয়ে ফিরিশতার দু'আ কবুল হওয়ার বেশি আশা রাখা যায়। তাই শুধু নিজের জন্য নয় সকলের জন্য দু'আ করব। আল্লাহ পাক সহীহ ভাবে আমাদেরকে এই রাতের হক আদায় করার এবং তার ফযীলত ও মর্তবা অর্জন করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

সবশেষে একটা বিষয় বলতে চাই। ইদানিং কেউ কেউ বলতে চান শবে বরাতের কোন ফযীলত সহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। কিন্তু এই বক্তব্য সহীহ নয়। একাধিক হাদীছে শবে বরাতের ফযীলত ও করণীয় বিষয় সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে। এসব হাদীছের মধ্যে দু' একটি হাদীছকে কেউ কেউ যয়ীফ বলেছেন। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কেরামের মতে এসব হাদীছ গ্রহণযোগ্য এবং আমলযোগ্য। হাদীছ বিষয়ক সেসব তাত্ত্বিক কথা সাধারণ মজলিসে আলোচনা করার বিষয় নয়। আপনারা কেউ জানতে চাইলে মাকতাবাতুল আশরাফ, বাংলাবাজার, ঢাকা থেকে প্রকাশিত "শবে বরাতের তত্ত্বকথা" নামক বইটি পড়ে জানতে পারবেন। নির্ভরযোগ্য ফতোয়ার কিতাব - শামী, ফতোয়ায়ে আলমগীরী ইত্যাদিতেও এসব আমলের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সবকিছু সহীহভাবে বোঝার ও আমল করার তাওফীক দান করুন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বয়ান নং ৩১-এর খুতবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ مُصَرِّفِ الْاَوْقَاتِ وَالدُّهُوْرِ، وَمُفَضِّلِ الْاَيَّامِ وَالْاَعْوَامِ وَالشُّهُوْرِ ، اَحْمَدُهٗ وَاَشْكُرُهٗ وَهُوَ الْمَحْمُوْدُ الْمَشْكُوْرُ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهُ الْقَادِرُ الرَّازِقُ وَهُوَ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهُ الَّذِىْ اَخْرَجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا دَامَ الْاَيَّامُ وَالدُّهُوْرُ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الْقَائِمِيْنَ بِامْتِثَالِ الْمَأْمُوْرِ وَاجْتِنَابِ الْمَحْظُوْرِ.

وَبَعْدُ :

اَيُّهَا النَّاسُ! سَيَجِيْئُ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَهِىَ لَيْلَةٌ مُبَارَكَةٌ ذُوْشَانٍ عَظِيْمٍ، فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ، فِيْهَا يُكْتَبُ اَعْمَالُ بَنِىْ اٰدَمَ وَاَرْزَاقُهُمْ وَاٰجَالُهُمْ اِلَى السَّنَةِ، وَمَعْنٰى كِتَابَةِ هٰذِهِ الْاُمُوْرِ اِسْتِنْسَاخُهَا مِنَ اللَّوْحِ الْمَحْفُوْظِ فِىْ لَيْلَةِ الْبَرَائَةِ، وَقَدْ جَآئَتْ كِتَابَتُهَا فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ اَيْضًا فِى الْاَخْبَارِ الصَّحِيْحَةِ، وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا مَا قَالَ صَاحِبُ رُوْحِ الْمَعَانِىْ بِاَنَّهٗ : رُوِىَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا تُقْضَى الْاَقْضِيَةُ كُلُّهَا لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَتُسَلَّمُ اِلٰى اَرْبَابِهَا لَيْلَةَ السَّابِعِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

اَيُّهَا الْاِخْوَانُ! اِنَّ لِلنَّاسِ فِىْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَيَوْمِهَا مَعْرُوْفَاتٍ وَّمُنْكَرَاتٍ، فَمِنَ الْمَعْرُوْفَاتِ خَمْسَةُ اُمُوْرٍ : اَلْاَوَّلُ : قِيَامُ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ، وَالثَّانِىْ : صِيَامُ يَوْمِهَا، وَالثَّالِثُ : اَلدُّعَاءُ وَالْاِسْتِغْفَارُ، ثَبَتَتْ هٰذِهِ الثَّلٰثَةُ بِحَدِيْثٍ رَوَاهُ عَلِىٌّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِذَا كَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُوْمُوْا لَيْلَهَا وَصُوْمُوْا نَهَارَهَا، فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَنْزِلُ فِيْهَا لِغُرُوْبِ الشَّمْسِ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُوْلُ اَلَا مِنْ مُّسْتَغْفِرٍ فَاَغْفِرَلَهٗ، اَلَا مِنْ



مُسْتَرْزِقٍ فَاَرْزُقَهٗ، اَلَا مِنْ مُبْتَلًى فَاُعَافِيَهٗ فِيْهِ، اَلَا كَذَا اَلَا كَذَا حَتّٰى يَطْلُعَ الْفَجْرُ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالْبَيْهَقِىُّ، رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَةَ فِىْ سُنَنِهٖ. وَالرَّابِعُ : زِيَارَةُ الْقُبُوْرِ وَالدُّعَاءُ وَاِيْصَالُ الثَّوَابِ لِاَهْلِهَا، ثَبَتَ ذَالِكَ بِحَدِيْثٍ رُوِىَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : فَقَدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَخَرَجْتُ اَطْلُبُهٗ، فَاِذَا هُوَ بِالْبَقِيْعِ رَافِعًا رَأْسَهٗ اِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ يَا عَائِشَةُ! كُنْتِ تَخَافِيْنَ اَنْ يَّحِيْفَ اللّٰهُ عَلَيْكِ وَرَسُوْلُهٗ؟ قُلْتُ : وَمَالِىَ مِنْ ذَالِكَ، وَلٰكِنِّىْ ظَنَنْتُ اَنَّكَ اَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ. فَقَالَ : اَللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَغْفِرُ لِاَكْثَرِ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ. رَوَاهُ اِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالْبَيْهَقِىُّ وَفِىْ رِوَايَةٍ اِبْنِ حِبَّانَ فِىْ صَحِيْحِهٖ : يَطْلُعُ اللّٰهُ اِلٰى جَمِيْعِ خَلْقِهٖ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيْعِ خَلْقِهٖ اِلَّا لِمُشْرِكٍ اَوْ مُشَاحِنٍ. وَهٰذِهِ الْاَرْبَعَةُ مِنَ الْمَعْرُوْفَاتِ. وَمِنَ الْمُنْكَرَاتِ مَا اخْتَلَقَهٗ بَعْضُ النَّاسِ وَارْتَكَبَهٗ مِنْ اِيْقَادِ الشَّمْعَةِ وَصَدْعِ الصَّارِخَةِ وَطَبْخِ الْخُبْزِ وَالْحَلْوَاءِ وَغَيْرِهَا. قَالَ صَاحِبُ مَا ثَبَتَ بِالسُّنَّةِ بَعْدَ ذِكْرِ هٰذِهِ الْاَشْيَآءِ : لَا اَصْلَ لَهَا فِى الْكُتُبِ الصَّحِيْحَةِ الْمُعْتَبَرَةِ وَلَا فِى الْغَيْرِ الْمُعْتَبَرَةِ. ثُمَّ قَالَ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنَ ذَالِكَ وَهُوَ الظَّنُّ الْغَالِبُ اِتِّخَاذًا مِّنْ رُّسُوْمِ الْهُنُوْدِ فِىْ اِيْقَادِ السُّرُجِ لِلدَّوَالِىْ.

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ : اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ.

بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ، وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. اَقُوْلُ قَوْلِىْ هٰذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ لِىْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَاسْتَغْفِرُوْهُ، اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.
Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বয়ান নং -৩২

## জীবন গড়ার মূলনীতি

(শবে বরাতের পরের জুমুআর বয়ান)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَمَنْ يَّسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللّٰهُ. وَمَنْ يَّسْتَعِفَّ يُعِفُّهُ اللّٰهُ، وَمَنْ يَّتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللّٰهُ، وَمَا اُعْطِىَ اَحَدٌ عَطَاءً هُوَ خَيْرٌ وَ اَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

শবে বরাত চলে গেল, সামনে আসছে রমযান। শবে বরাত আসার অর্থ হল– রমযানের আগমনিবার্তা এসে যাওয়া। শবে বরাত হল রমযানের ভূমিকা। শবে বরাতে রোগ-শোক, অভাব-অনটন ইত্যাদি থেকে মানুষের মুক্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, বিশেষভাবে মাগফিরাতের বা গোনাহ থেকে মুক্তির সুযোগ রাখা হয়েছে। এই সুযোগে মানুষ নিজের মাগফিরাত করে নিবে, নিজেকে সব গোনাহ থেকে মুক্ত করে নিবে। আর এই গোনাহ থেকে মুক্ত ও পূত-পবিত্র অবস্থায় তার সামনে আসবে রমযান। রমযানকে সে কাটাতে পারবে সুন্দরভাবে, গোনাহমুক্তভাবে। রমযানে যত ধরনের ইবাদত রাখা হয়েছে, সেই ইবাদতগুলো সে আদায় করতে পারবে সুন্দরভাবে, গোনাহমুক্তভাবে। মানুষ সুন্দরভাবে যেন রমযানের হক আদায় করতে পারে, তার প্রস্তুতি নেয়ার সুযোগ স্বরূপ এসে থাকে শবে বরাত। শবে বরাতে মাগফিরাত চেয়ে নিবে, তাহলে রমযান কাটবে পূত-পবিত্র অবস্থায়। শবে বরাতে আল্লাহর কাছে তার সবকিছু চেয়ে নিবে, তার মধ্যে ইবাদত করার তাওফীকও চেয়ে নিবে। সাথে সাথে মানসিকভাবেও প্রস্তুতি গ্রহণ করবে, যেন রমযানের ইবাদত সমূহ যথাযথভাবে আদায় করতে পারে। রাসূল (সা.) রমযানের জন্য মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন রজব মাস থেকে। এখন শাবান মাস, এর পূর্বে গেল রজব মাস। সেই রজব মাস থেকেই রাসূল (সা.) মনে মনে রমযানের চিন্তা-ভাবনা শুরু করতেন। যখন রজব মাসের চাঁদ উদয় হত, তখন রাসূল (সা.) আল্লাহর কাছে দু'আ করতেন–

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ رَجَبَ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ. (رواه أحمد في مسنده برقم ٢٣٤٦ وإسناده ضعيف)

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমাদেরকে রজব মাসে বরকত দিও, শাবান মাসেও বরকত দিও, আর রমযান পর্যন্ত আমাদেরকে পৌঁছে দিও।

দেখা গেল, রজব মাস থেকেই রাসূল (সা.)-এর মনে রমযান মাসের চিন্তা এসে গেছে। আর যখন শাবান মাস আসত, তখন তিনি সাহাবায়ে কেরামকেও বলতেন,

اَحْصُوْا هِلَالَ شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ. (رواه الحاكم في المستدرك برقم ١٥٤٨ وقال صحيح على شرط مسلم)

'অর্থাৎ, রমযানের স্বার্থে শাবান মাসের দিনগুলো ভালভাবে গণনা করে রাখ যে, কয়দিন গেল, আর রমযান আসতে কয়দিন বাকি থাকল'।

তিনি এসব কথা কীসের জন্য বলতেন? যাতে করে মানুষ রমযানের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত হয়ে যায়। মানসিকভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করে। রমযান আসার পূর্বেই এমনভাবে সব কাজকর্ম গুটিয়ে নিতে হবে, যেন রমযানের ইবাদতগুলো আদায় করতে কোন ঝামেলা না হয়। সমস্ত ঝামেলা আগেই মিটিয়ে

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



ফেলতে হবে, যাতে রমযানের হক পুরোপুরি আদায় করা যায়। রোযা রাখতে যেন কোন ব্যাঘাত না হয়, তারাবীহ আদায় করতে যেন ব্যাঘাত না হয়, তেলাওয়াতে যেন ব্যাঘাত না হয়। যদি সফর থাকে বা দুনিয়ার কোন বিশেষ ব্যস্ততা থাকে, সেগুলো আগেই সেরে নিতে হবে, যাতে রমযানে রোযা, তারাবীহ, তেলাওয়াত সবকিছুর জন্য পূর্ণ ফারেগ থাকা যায়। এভাবে প্রস্তুতি নেয়ার জন্যই রাসূল (সা.) বলতেন যে, রমযান চলে আসছে, শাবানের কয়দিন গেল, কয়দিন বাকি থাকল, খুব খেয়াল রাখ।

রমযানের জন্য পূর্ণপ্রস্তুতি নেয়া ছাড়া ভালভাবে রমযানের সব আমল সম্পন্ন করা যায় না। পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়া দুনিয়ার কোন কাজও সুন্দরভাবে করা যায় না। একজন ছাত্র লেখাপড়া করে, তার যদি কোন পরিকল্পনা না থাকে যে, আমি কোন ক্লাস পাশ করতে চাই, আমি কী হতে চাই। এরকম কোন পরিকল্পনা না থাকলে, সেই ছাত্রের ভাল লেখা-পড়া হবে না। ভাল লেখা-পড়ার জন্য পূর্ব পরিকল্পনা থাকা চাই। আমি ডাক্তার হব, না ইঞ্জিনিয়ার হব, না বিজ্ঞানী হব, পূর্বে থেকেই এর একটা সুস্পষ্ট পরিকল্পনা থাকা চাই। পরিকল্পনা থাকলে সেইভাবে সে নিজেকে প্রস্তুত করে নিতে পারবে, সেইভাবে নিজেকে গড়ে তুলতে পারবে। একজন সফল ব্যবসায়ী হতে হলে তার পরিকল্পনা থাকা চাই। পরিকল্পনা ছাড়া এলোমেলোভাবে অগ্রসর হলে, ব্যবসায় উন্নতি করা যাবে না। গোটা জীবনের জন্যেই মানুষের পরিকল্পনা থাকে। আমি ব্যবসা করব, বা চাকুরী করব, কীভাবে আমার অর্থ-কড়ি আসবে, কীভাবে আয়-উপার্জন হবে, কীভাবে আমি জায়গা-জমি ক্রয় করব, কীভাবে গাড়ী-বাড়ী করব ইত্যাদি সবকিছুর পরিকল্পনা থাকে। পরিকল্পনা ছাড়া কোন কাজ গোছালোভাবে করা যায় না, সুন্দরভাবে করা যায় না। যে যতসুন্দর পরিকল্পনা করতে পারে সে ততসুন্দরভাবে তার কাজ সম্পন্ন করতে পারে।

পরিকল্পনার বিষয়টা দুনিয়ার লাইনে যেমন, দ্বীনী লাইনেও তেমন। উন্নতির জন্য দুনিয়ার লাইনে যেমন পরিকল্পনা জরুরী, দ্বীনের লাইনেও পরিকল্পনা জরুরী। দ্বীনী লাইনেও পরিকল্পনা থাকতে হবে, টার্গেট থাকতে হবে আমি কী হতে চাই, আমি কতটুকু পরহেযগার হতে চাই, কোন্ মানের দ্বীনদার হতে চাই, কতটুকু ইবাদত গোজার হতে চাই, কোন্ পর্যায়ের ওলী বা বুযুর্গ হতে চাই। পরিকল্পনা না থাকলে এই লাইনেও ততটা উন্নতি করা যাবে না। দুনিয়ার লাইনেও পরিকল্পনা ছাড়া ততটা উন্নতি হয় না, দ্বীনের লাইনেও পরিকল্পনা ছাড়া ততটা উন্নতি হয় না। দুনিয়ার লাইনে কেউ যদি কোন পরিকল্পনা করে এবং টার্গেট স্থির করে যে, আমাকে এতটা জায়গা-জমি করতেই হবে, এতটা ব্যাংক-ব্যালেন্স করতেই হবে, এভাবে টার্গেট ঠিক করে সাধনা করতে থাকলে দেখা যায়, একদিন সে তার টার্গেটে পৌঁছে যায়। তদ্রূপ দ্বীনী লাইনেও কেউ যদি কোন পরিকল্পনা করে এবং টার্গেট ঠিক করে মোজাহাদা শুরু করে, তাহলে সে কামিয়াব হতে পারবে। যেমন– একজন মানুষ পরিকল্পনা করল যে, আমি জীবনে আর মিথ্যা বলব না, তারপর নফসে চাইলেও নফসের সাথে মোজাহাদা করে সে মিথ্যা থেকে বিরত থাকা শুরু করল, তাহলে একদিন এরকম সময় আসবে যে, সে মিথ্যা থেকে মুক্ত হতে পারবে। কেউ টার্গেট করল যে, আমি গীবত করব না, তারপর নফসে চাইলেও সে নফসের সাথে মোজাহাদা করতে থাকল, তাহলে একদিন এরকম সময় আসবে যখন সে সম্পূর্ণ গীবত থেকে মুক্ত হতে পারবে। কেউ পরিকল্পনা করল আজ থেকে আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআতের সাথে নিয়মিত আদায় করবই, তাহলে একদিন না একদিন সে এরকম হতে পারবে। কেউ স্থির করল আমি নিয়মিত তাহাজ্জুদ গোজার হব, তাহলে একদিন না একদিন সে ওরকম হতে পারবে। দুনিয়ার লাইনে কোন টার্গেট স্থির করে সাধনা আরম্ভ করলে, সফল হতেও পারে নাও হতে পারে। সফল হওয়াটা নিশ্চিত নয়। কিন্তু দ্বীনী লাইনে টার্গেট স্থির করে মোজাহাদা শুরু করলে সফল হওয়াটা নিশ্চিত। আল্লাহ পাক তাকে সেরকম হতে সাহায্য করেন। হাদীছে এসেছে,

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

وَمَنْ يَّسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللّٰهُ، وَمَنْ يَّسْتَعِفَّ يُعِفُّهُ اللّٰهُ، وَمَنْ يَّتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللّٰهُ. الحديث. (رواه الترمذي برقم ٢٠٢٤ وقال حسن صحيح)

অর্থাৎ, যে মানুষ থেকে মুখাপেক্ষীহীন থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে মানুষের মুখাপেক্ষী হওয়া থেকে বাঁচান, যে পবিত্র জীবন-যাপন করতে চায়, আল্লাহ তাকে পবিত্র জীবন-যাপন করার তাওফীক দেন, যে ইবাদত-বন্দেগীর উপর অটল থাকতে চায় এবং বিপদ-আপদে ধৈর্য্যধারণ করতে চায়, আল্লাহ তাকে তেমন করার তাওফীক দান করেন।

বোঝাগেল পরিকল্পনা করে অগ্রসর হলে কামিয়াব হওয়া নিশ্চিত। কেউ যদি পরিকল্পনা ছাড়া চলে, যখন ইচ্ছা হল জামাআতে গেল, ইচ্ছা হল না জামাআতে গেল না। মনে চাইলে তাহাজ্জুদ পড়লাম, যেদিন মনে চাইল না পড়লাম না, মনে চাইল ইবাদত করলাম, মনে চাইল না করলাম না। এরকম পরিকল্পনা ছাড়া চললে কখনো উন্নতি করা যাবে না। বোঝাগেল দ্বীনী লাইনে তারাক্কী বা উন্নতি করার একটা মূলনীতি হল পরিকল্পনা। এরকম পরিকল্পনাকে আরবীতে বলা হয় "মুশারাতা"।

পরিকল্পনা বা মুশারাতা-র সাথে মোজাহাদা বা সাধনাও থাকা চাই। মোজাহাদা বলা হয় ত্যাগ, সাধনা, মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করাকে। মনে চায় না তবুও করা। দুনিয়ার লাইনে উন্নতি করার জন্যেও আমরা মোজাহাদা করে থাকি। মোজাহাদা বা মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে করা ছাড়া, ত্যাগ-সাধনা ছাড়া কেউ দুনিয়ার লাইনেও উন্নতি করতে পারে না। জীবনে উন্নতি করার জন্য লেখাপড়া করতে হয়। এখানেও মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করতে হয়। স্বভাবগতভাবে কয়জনের লেখাপড়া করতে খুব ভাল লাগে? কৃষক জমিতে ফসল ফলায়। এখানেও মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে কাজ করতে হয়। কার মনে চায় সারাদিন রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে কাজ করতে? কৃষক বোঝে মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ না করলে চলবে না। চাকুরীজীবী সকাল বেলায় ঘুম থেকে উঠে অফিসে দৌড় দেয়। অফিসে খাওয়া-দাওয়ার ঠিক নেই, আরামের ব্যবস্থা নেই, সেখানে তাকে মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করতে হয়। চাকরিজীবী বোঝে মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ না করতে পারলে উন্নতি করা যাবে না।

দুনিয়ার লাইনে আমরা সকলেই বুঝি যে, মোজাহাদা ছাড়া উন্নতি করা যাবে না। কিন্তু দ্বীনী লাইনে বিষয়টা ওভাবে উপলব্ধি করি না। দুনিয়ার লাইনে এটা বোঝার কারণ হল দুনিয়ার নগদ লাভ আমাদের সামনে থাকে। আমরা দেখি কষ্ট করে লেখাপড়া করলে, কষ্ট করে ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি-নওকরী করলে গাড়ি-বাড়ি হবে, আরামে জীবন যাপন করা যাবে। এভাবে দুনিয়ার একটা নগদ স্বার্থ আমাদের সামনে থাকে। দ্বীনের লাইনে মেহনত-মোজাহাদা করলেও লাভ বা স্বার্থ রয়েছে। সেই স্বার্থ বা সেই লাভ অনেক বড়, তবে নগদ নয়। সেটা নগদ নয় বলেই, সেটা আমাদের চোখের সামনে নয় বলেই সেটা পাওয়ার বিশ্বাস আমাদের দুর্বল। দ্বীনী লাইনে মেহনত-মোজাহাদা করলে জান্নাতের অনন্ত সুখ-শান্তি পাওয়া যাবে -এই বিশ্বাস যদি মজবুত থাকত, তাহলে তার জন্য সব কষ্ট স্বীকার করে নেয়া সহজ হত। শীত কালে ফজরের জামাআতে হাজিরা দিতেও উদ্বুদ্ধ হতাম। এত বড় লাভ অর্জন করার জন্য কষ্ট লাগলেও, মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করতে পারতাম। আযান পড়লে লেপ কম্বল ছেড়ে দিয়ে লাফ দিয়ে উঠে পড়তাম। এরকম শীতের ভোরে যদি একটা ফোন আসে যে, এখনই প্রধানমন্ত্রী আপনাকে দেখা করতে বলেছেন, আপনাকে একটা মন্ত্রিত্ব দিতে চান, তাহলে দেখা যাবে কীসের ঘুম বিছানা ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠে পড়েছি। মন্ত্রিত্ব পাওয়ার মত লাভের চিন্তায় মোজাহাদা করা আমার জন্য আছান হয়ে যেত। আরামের ঘুম ছেড়ে তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে দৌড় দেয়া কষ্টকর নয় বরং আনন্দের মনে হত। দ্বীনের লাইনেও মোজাহাদা করতে আনন্দ আসবে, যদি পরকালের পাওয়াকে বড় পাওয়া বলে মনে হয়।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



যে ইবাদতে যত বেশি মোজাহাদা হবে, সেটা করতে ততবেশি আনন্দ লাগা চাই। কারণ যে সমস্ত ইবাদতে কষ্ট বেশি হয়, যে সমস্ত ইবাদতে মোজাহাদা বেশি হয়, সেটা আল্লাহর কাছেও বেশি প্রিয়, তার দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন হয় বেশি। তাহাজ্জুদের নামাযে মোজাহাদা বেশি হয়, কারণ আরামের ঘুম ছেড়ে, আরামের ঘুমকে হারাম করে উঠতে হয়। এ কারণে তাহাজ্জুদের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য বেশি অর্জন হয়। শীতের বেলায় উযু করতে কষ্ট বেশি লাগে, তাই ঐ উযুর ফযীলতও বেশি। এভাবে যে ইবাদতে মনের ইার বিরুদ্ধে নফসের সাথে মোজাহাদা যত বেশি হবে, সেই ইবাদতের মাকাম মর্যাদাও তত বেড়ে যাবে। এই জগতে মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করলে পরকালের জগতে এমন যিন্দেগী পাওয়া যাবে, যেখানে যা মনে ইচছা হবে তাই পাওয়া যাবে। মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই হবে না।

আল্লাহ তা'আলা তিনটা জগত বানিয়েছেন। একটা হল– দুনিয়ার জগত, আরেকটা হল– আখেরাতের জগত, আরেকটা হল– কবরের জগত। আখেরাতের জগতে মানুষের অবস্থা হবে দুই রকম। কিছু মানুষ এমন হবে, যাদের মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই হবে না। আর কিছু মানুষ এমন হবে সবকিছুই যাদের মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হবে। দুনিয়ার জগতে যে যেমন চলবে, আখেরাতের জগতে তার বিপরীত হবে। দুনিয়ার জগতে যারা মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলবে, আখেরাতে তারা এমন যিন্দেগী পাবে, যেখানে তাঁদের মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই হবে না। জান্নাতে যা মনে চাইবে তাই হবে। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

وَ لَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْٓ اَنْفُسُكُمْ وَ لَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ. (হা মীম সাজদা: ৩১)

অর্থাৎ, জান্নাতে তোমাদের জন্য থাকবে যা তোমাদের মন চাইবে, যা তোমরা দাবি করবে।

জান্নাতে এমন যিন্দেগী দেয়া হবে, যেখানে চাহিবামাত্র সবকিছু উপস্থিত হয়ে যাবে। একটা পাখি উড়ে যেতে থাকবে, একজন জান্নাতির মনে চাইবে ঐ পাখির গোশ্তটা খেতে যেন কেমন মজা লাগত, ব্যস সাথে সাথে সেই পাখির গোশত ভুনা হয়ে সামনে চলে আসবে। একটা গাছের ফল খেতে মনে চাইবে, গাছের ডালটা তার সামনে নত হয়ে আসবে। যদি মনে বলে ফল চিবিয়ে খাব না, এটার রস খাব, তাহলে জুস আকারে সেটা সামনে চলে আসবে। এভাবে যা মনে চাইবে তা হবে। শুধু দুনিয়ার যিন্দেগীতে মনচাহী যিন্দেগী ছাড়তে হবে, মোজাহাদার যিন্দেগী গ্রহণ করতে হবে। এখানে মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে করলে ওখানে সবকিছু মনের অনুকূল পাওয়া যাবে। আর এখানে মনের ইচ্ছামত চললে, মনচাহি যিন্দেগী চালালে, জাহান্নামে যেয়ে চরম শাস্তির মধ্যে বন্দি হতে হবে। সেখানে সবকিছুই হবে মনের বিরুদ্ধে। যা মনে চাইবে তার কিছুই সেখানে পাওয়া যাবে না। অতএব ইসলামী যিন্দেগী গড়ার জন্য মোজাহাদা একটা জরুরী বিষয়। মোজাহাদা ইসলামী যিন্দেগী গড়ার একটা বিশেষ মূলনীতি।

অনেক সময় আমাদের মন মোজাহাদার জন্য রাজি হয় না। কারণ সে চিন্তা করে, মোজাহাদা করতে গেলে দুনিয়ার সুখ-শান্তি সবকিছু বিসর্জন দিতে হয়। কিন্তু এটা ভুল। যারা দ্বীনদার, তারা দুনিয়ায় কোন সুখ শান্তি পায় না এটা ঠিক নয়। তারাও সুখ-শান্তি পায়, তারাও দুনিয়ায় পায়। তবে দুনিয়াদারদের পাওয়া আর দ্বীনদারদের পাওয়ার মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। দুনিয়াদাররা দুনিয়াতে পায়, কিন্তু আখেরাত থেকে বঞ্চিত হয়। এর বিপরীত দ্বীনদাররা আখেরাতে পায়, দুনিয়া থেকেও বঞ্চিত হয় না। দুনিয়াদাররা যতটুকু দুনিয়া পায় অনেক কষ্টে সৃষ্টে পায়। এর বিপরীত দ্বীনদাররা যতটুকু দুনিয়া পায়, কষ্ট ছাড়া বা অল্প কষ্টেই পেয়ে যায়। দুনিয়াদাররা দুনিয়ার সামান আসবাব পায় অর্থাৎ, টাকা-পয়সা ধন-সম্পদ পায়, কিন্তু এইসব আসবাবের আসল যে উদ্দেশ্য দুনিয়ার সুখ-শান্তি, তা থেকে তারা বঞ্চিত হয়। এর বিপরীত দ্বীনদাররা সামান আসবাব পরিমাণে কম পেলেও সুখ-শান্তি বেশি পায়, তারা টাকা-পয়সা ছাড়াই শান্তিতে

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

থাকে। দুনিয়াদাররা আসবাবের মাধ্যমে যা করে, আল্লাহ তা'আলা দ্বীনদারদেরকে আসবাব ছাড়াই তা দিয়ে দেন। যেমন দুনিয়াদাররা টেনশনে বেশি থাকে, ফলে স্বাভাবিক ঘুম পায় না। পয়সা দিয়ে ট্যাবলেট কিনে তারপরে ঘুম যায়। এর বিপরীত দ্বীনদারদের অনায়াশে খুব আরামে ঘুম এসে যায়। আসবাব ছাড়া ঘুম এসে যায়। দুনিয়াদাররা আসবাব অর্থাৎ, টাকা-পয়সা দিয়ে সুখ-শান্তি অর্জন করার চেষ্টা করে, তারপরও তারা প্রকৃত সুখ-শান্তি অর্জন করতে পারে না। অথচ যারা দ্বীনদার আসবাব ছাড়াই তাদের সুখ-শান্তি এসে যায়। মনে কোনভাবে অশান্তি আসে না। কোথাও কোন টেনশন নেই, আত্মীয়-স্বজন ভাল অবস্থায় আছে, সবসময় সুখের সংবাদ পাচ্ছে, মনে কোন টেনশন নেই, পেরেশানী নেই, আরামে ঘুমাচ্ছে, যা খাচ্ছে তাতেই তৃপ্তি অর্জন হচ্ছে, মনে কোন অভাব বোধ থাকছে না। অতএব মোজাহাদার লাইনে গেলে দুনিয়া থেকে একেবারে বঞ্চিত হতে হয়, এই অশঙ্কা ভুল।

দ্বীনের জন্য মোজাহাদার ভিতরে আরও অনেক ফায়দা রয়েছে। দ্বীনের লাইনে মোজাহাদা করলে আল্লাহ পাক কামিয়াবির পথ খুলে দেন। মেহনত মোজাহাদা শুরু না করলে পথ খুলে না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا.

'অর্থাৎ, যারা আমার লাইনে মেহনত মোজাহাদা শুরু করে দেয়, আমি অবশ্যই তাদের জন্য আমার পথ পাওয়ার ব্যবস্থা করে দেই'। (আনকাবূত: ৬৯)

অনেকে কষ্টের ভয়ে মোজাহাদা শুরু করতে সাহস পান না। কিন্তু মোজাহাদা শুরু করলে ধীরে ধীরে কষ্টও দূর হয়ে যায়। প্রথম দিকে কষ্ট থাকে, পরে আর কষ্ট থাকে না। আমল শুরু করলে প্রথম প্রথম খুব কষ্টের মনে হবে, কিন্তু ধীরে ধীরে এই কষ্টবোধ দুর হয়ে যাবে। দ্বীনের লাইনে মেহনত-মোজাহাদা প্রথম দিকে কষ্টের থাকে, পরের দিকে কষ্টের থাকে না; বরং আরামের হয়ে যায়। যারা পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিয়মিত আদায় করেন তারা এটা হাতে নাতে উপলব্ধি করে থাকেন। প্রথমে যখন নামায শুরু করেছিলেন, তখন অনেক কষ্টকর লাগত, কিন্তু নিয়মিত নামায পড়া শুরু করলে এমন একটা সময় আসে যখন নামায পড়তে আর কষ্টকর লাগে না; বরং নামায পড়াটাই স্বাভাবিক লাগে, নামায পড়লেই ভাল লাগে, নামায না পড়া পর্যন্ত স্বস্তি আসে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়– একজন নিয়মিত নামাযী ব্যক্তি যদি কোনোদিন ইশার নামায না পড়ে ঘুমাতে চেষ্টা করেন তাহলে সহজে তার ঘুম আসবে না। মনের মধ্যে অস্বস্তি লাগতে থাকবে। দেখাগেল নামায পড়াটাই তার কাছে স্বাভাবিক হয়ে গেছে, নামায পড়াটাই তার কাছে আরামের হয়ে গেছে। নামায পড়া হয়ে গেল, ব্যস এতমীনান এসে গেল, স্বস্তি এসে গেল। যারা রোযা রাখেন না, তাদেরকে রোযা রাখতে বললে তাদের কাছে মনে হবে মাথার উপরে আসমান চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। রমযান মাস আসতে থাকলে তাদের ঠোঁট শুকিয়ে আসতে থাকে যে, সর্বনাশ ৩০ দিন না খেয়ে থাকতে হবে! কিন্তু যারা নিয়মিত রোযাদার, তাদের কাছে রোযা রাখা কোনই কষ্টের মনে হয় না। রমযান মাস আসতে থাকলে তাদের কষ্ট নয় বরং খুশি লাগতে থাকে যে, একটা বড় ইবাদতের সময় আসছে, ছওয়াব অর্জন করার বড় সুযোগ আসছে! দুনিয়ার লাইনে বড় উপার্জন করার সুযোগ আসতে থাকলে আমরা আনন্দবোধ করি। ব্যবসায়ীদের সামনে ব্যবসার বড় সিজন আসতে থাকলে তাদের কষ্ট লাগে না বরং আনন্দ লাগে। মনে মনে খুশি তারা বোধ করতে থাকে যে, বড় সিজন আসছে, অনেক উপার্জন করতে পারব! দ্বীনী লাইনেও এরকম সিজন আছে। সবচেয়ে বেশি ফযীলতের মাস, সবচেয়ে বেশি ছওয়াব অর্জন করার সুযোগ হল রমযান মাস। রমযান মাস হল ইবাদতের সিজন। তাই

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



রমযান আসতে থাকলে দ্বীনদার মানুষের কাছে খুশি লাগার কথা যে, বড় ছওয়াব অর্জন করার সুযোগ আসছে! অনেক ইবাদত করার সুযোগ আসছে। মনে রাখতে হবে আমল করা শুরু করলে মেহনত মোজাহাদা শুরু করলে কোন ইবাদতই কষ্টের থাকে না। রোযা রাখা, তারাবীহ পড়াও কষ্টের থাকে না। শুরু করার আগে কষ্টকর মনে হয়, কিন্তু শুরু করে দিলে সেই কষ্টবোধ দূর হয়ে যায়।

অনেক সময় ইবাদত শুরু করার আগে এরকম মনে হয় যে, আমার সামনে অনেক সমস্যা, অনেক বাঁধা, আমি পারব না। কিন্তু আমল শুরু করলে সব বাঁধা সব প্রতিকূলতা দূর হয়ে যেতে থাকে। হযরত থানভী (রহ.) এর উদাহরণ দিতেন যে, একটা সুদীর্ঘ লম্বা সড়ক, যার দুই পাশে সারিবদ্ধভাবে গাছ লাগানো। সেই রাস্তার সামনের দিকে তাকালে মনে হবে যে, সামনের দিকে গাছগুলো আস্তে আস্তে মিশে গেছে, সামনে আর পথ নেই, পথ বন্ধ হয়ে গেছে, এ রাস্তা দিয়ে সামনে চলা যাবে না। কিন্তু চলা শুরু করলে যত চলতে থাকবে দেখবে ততই ফাঁকা, যত চলতে থাকবে দেখবে ততই রাস্তা খুলে যাচ্ছে। যত সামনে অগ্রসর হতে থাকবে মনে হবে সব বাঁধা যেন দূর হয়ে যাচ্ছে। অথচ চলা শুরু করার আগে মনে হচ্ছিল অনেক বাঁধা, চলা সম্ভব হবে না। দ্বীনের লাইনটাও এরকম। দ্বীন হল সিরাতে মুস্তাকীম বা সোজা পথ। এর চতুর্পার্শে শয়তানের রাস্তা, শয়তান সিরাতে মুস্তাকীমের পাশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো আছে। দূরের থেকে দেখাচ্ছে যে, আমাদের সামনে অনেক বাঁধা আমরা চলতে পারব না, কিন্তু চলতে থাকলে দেখা যাবে কোনই বাঁধা নেই। বাস্তবেও যদি কোন বাঁধা থাকে, চলা শুরু করলে আল্লাহ পাক সে বাঁধাও অপসারণ করে দিবেন। হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনা এর জ্বলন্ত প্রমাণ। জুলায়খা হযরত ইউসুফ (আ.) থেকে অসৎ মনস্কামনা পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে একে একে সাতটা রুমের দরজা বন্ধ করে তার ভিতরে গিয়ে উস্কানি দিল যে, এখন আমার মনস্কামনা পূর্ণ করতে হবে। হযরত ইউসুফ (আ.) দেখলেন যে, একে একে সাত রুমের দরজায় তালা লাগানো। এখন ভাগার কোন পথ নেই। গোনাহ থেকে বাঁচার পথ নেই। কিন্তু তিনি ভাবলেন দরজা পর্যন্ত দৌড় দেয়ার ক্ষমতা আমার আছে। আমার সাধ্য যতটুকু আছে, আমি ততটুকু প্রয়োগ করি, বাকিটুকু আল্লাহ করে দিবেন। এই ভেবে তিনি তালাবদ্ধ দরজার দিকে দৌড় দিলেন। একটা দরজার সামনে গেলেন, সেই দরজা খুলে গেল। আবার দৌড় দিয়ে আরেকটা দরজার সামনে গেলেন, সেটার তালাও খুলে গেল। এভাবে একে একে সাতটা দরজা খুলে গেল। আল্লাহ পাক এই ঘটনার মাধ্যমে আমাদেরকে শিক্ষা দিলেন যে, দেখ কীভাবে দ্বীনের উপরে চলতে হয়। আমাদেরকে শিক্ষা দিলেন যে, তোমাদের যতটুকু সাধ্য আছে ততটুকু চেষ্টা কর, বাকিটুকু আমি আল্লাহ করে দিব। তোমরা চলতে শুরু করলে আমি আল্লাহ পথ খুলে দিব। প্রথমে বাঁধা মনে হবে, কিন্তু চলতে শুরু করলে আমি আল্লাহ সব বাঁধা অপসারিত করে দিব। দ্বীনের লাইনে যখন মানুষ চলতে শুরু করে, তখন কোন রকম বাঁধা থাকে না, সব দূর হয়ে যায়। আমরা যারা পরিবারকে দ্বীনের উপরে চালাই না, নিজেরা পুরোপুরি দ্বীনের উপরে চলি না, বিভিন্ন রকম বাঁধা মনে হয়, আমরা ভাবি এরকম করতে গেলে অমুকে কী বলবে, অমুক আত্মীয়-স্বজন নারাজ হয়ে যাবে, দাড়ি রাখলে, বিবিকে পর্দা করালে, হাতে তাসবীহ মাথায় টুপি নিলে মানুষে নানারকম টিকা-টিপ্পনী কাটবে, উপহাস করবে, মৌলভী বলবে, হুজুর বলবে ইত্যাদি কতরকম বাঁধা আমাদের সামনে এসে যায়। কিন্তু চলতে শুরু করলে সবরকম বাঁধা দূর হয়ে যায়। কোন বাঁধা আর বাঁধা থাকে না। শুধু আমল করা শুরু করে দিতে হবে, চলা শুরু করতে হবে, মেহনত-মোজাহাদা আরম্ভ করে দিতে হবে। এই মেহনত-মোজাহাদা হল দ্বীনী লাইনে জীবন গড়ার একটা বড় মূলনীতি। জীবন গড়ার প্রথম মূলনীতি বলা হল পরিকল্পনা বা মুশারাতা। দ্বিতীয় মূলনীতি হল মোজাহাদা।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

জীবন গড়ার তৃতীয় মূলনীতি হল– মুরাকাবা। সর্বদা আল্লাহ্ আমাকে দেখছেন এই চিন্তাকে বলা হয় মুরাকাবা। এরূপ চিন্তা ভিতরে না আসলে মানুষ ভাল হতে পারে না। এ সম্পর্কে একটা ঘটনা শুনুন! এক বুযুর্গ তার কয়েকজন মুরীদকে পরীক্ষা করতে চাইলেন যে, তাদের মধ্যে কামালিয়াত এসেছে কি-না, অর্থাৎ সর্বক্ষণ তাদের মধ্যে এই চিন্তা এসেছে কি-না, যে আল্লাহ্ তাদেরকে দেখছেন। পরীক্ষার জন্য তাদের প্রত্যেকের হাতে একটা করে মুরগী দিয়ে বললেন যে, তোমরা যবাই করে নিয়ে আস। এমন স্থানে গিয়ে যবাই করে নিয়ে আসবে যেখানে কেউ দেখবে না। তারা সকলে আড়ালে গিয়ে যার যার মুরগী যবাই করে নিয়ে আসল। কিন্তু একজন যবাই করা ছাড়াই ফিরে এল। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল তুমি কেন যবাই করতে পারলে না? সে বলল আমি কয়েক জায়গায় আড়ালে গেলাম, কিন্তু আমার চিন্তায় আসল যে, সব স্থানেই তো আল্লাহ্ দেখেন। তাই কেউ দেখবে না এমন স্থানে গিয়ে আমি যবাই করতে পারলাম না। তখন উক্ত বুযুর্গ ঐ মুরীদকে খেলাফত দিয়ে দিলেন যে, ব্যস তোমার জিনিস এসে গেছে। অন্যদেরকে খেলাফত দিলেন না।

সর্বদা আল্লাহ্ দেখছেন এই চিন্তা শিশুদের মনের ভিতরেও ঢুকিয়ে দিতে হবে। ঐ ছোট শিশুও কোন অন্যায় করলে তাকে বোঝাতে হবে যে, তুমি যে অন্যায়টা করলে, তুমি ভেবেছ কেউ দেখেনি, কিন্তু আল্লাহ্ তো দেখেছেন। পদে পদে যদি এই চিন্তা শিশুর মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া যায় যে, আল্লাহ্ সবই দেখছেন তাহলে ছোট থেকেই ঐ শিশুর জীবন গঠন হয়ে যাবে। ইসলামে শিশুকে লালন-পালনের যে নিয়ম-নীতি রাখা হয়েছে, তার ভিতর এটাও আছে যে, পদে পদে আল্লাহ্ তাকে দেখছেন এই চিন্তা তার মনে বদ্ধমূল করিয়ে দিতে হবে। পদে পদে আখেরাতের ফিকির তার ভিতরে ঢুকিয়ে দিতে হবে। ভাল কাজ করলে জান্নাতে সে পুরস্কার পাবে, আর অন্যায় করলে জাহান্নামে শাস্তি পাবে, পদে পদে তাকে এটা বোঝাতে হবে। তাহলে তার মধ্যে জান্নাতের আশা এবং জাহান্নামের ভয় পয়দা হবে, তার ভিতরে আখেরাতের চিন্তা জাগ্রত হবে। শিশুদেরকে লালন-পালন করার কত সুন্দর নীতি ইসলামে রাখা হয়েছে।

যাহোক যা বলছিলাম আল্লাহ্ পদে পদে আমাকে দেখেন এই চিন্তা আমার ভিতরে জাগ্রত করতে হবে। সমস্ত ইবাদতের ক্ষেত্রে এই চিন্তা রাখতে হবে। তাহলে ইবাদত ঠিক হবে। নামাযের মধ্যেও এই চিন্তা রাখলে নামায সুন্দর হয়, নামাযে মনযোগিতা আসে, নামাযের সবকিছু সুন্দরভাবে আদায় হয়। এজন্যই এক হাদীছে বলা হয়েছে,

اُعْبُدُوا اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ. (متفق عليه)

অর্থাৎ , তুমি আল্লাহ্র ইবাদত এমনভাবে করবে, যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ। আর তুমি আল্লাহ্কে না দেখলেও তিনি তো তোমাকে দেখছেন।

আল্লাহ্ আমার ইবাদত কেমন হচ্ছে তা দেখছেন –এই চিন্তা করলে ইবাদত সুন্দর হবে। যেমন, একজন চাকর যে মুনিবের কাজ করে, তার যদি এই চিন্তা থাকে যে, আমি কীভাবে কাজ করছি তা মুনিব দেখছেন, তাহলে তার কাজটা সুন্দর হবে, ফাঁকি দেয়ার চিন্তা বা অসুন্দরভাবে করার চিন্তা তার মনে আসবে না। আর মুনিব দেখছেন– এই চিন্তা যখন থাকবে না অর্থাৎ, মুনিব কাছে থাকবে না বা কাছে থাকলেও ঘুমিয়ে আছেন বা অন্য কোন কাজে ব্যস্ত আছেন, ফলে তিনি দেখছেন না –এরূপ হলে তখন দায়সারা গোছের মত সে কাজ সেরে যাবে, ফাঁকি দেয়ার চিন্তা তার মনে আসবে। কিন্তু মুনিব দেখছেন সুন্দর হল কি-না, সবকিছু তিনি লক্ষ্য করছেন –এই চিন্তা থাকলে সবকিছু সে সুন্দরভাবে করবে, গোছালোভাবে করবে। হাদীছে এ রকমই একটা নীতির কথা বলা হল যে, আল্লাহ্ পাক আমার নামাযের

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



সবকিছু দেখছেন, কোনেকিছু আল্লাহ্র অগোচরে নয় –এই চিন্তা রাখতে হবে। এই চিন্তা থাকলে ইবাদত সুন্দরভাবে করা হবে।

এখানে শুধু নামাযের কথা নয়, সব ইবাদতের কথা বলা হয়েছে। যেকোন ইবাদত আমরা করি, যদি এই চিন্তা রেখে করি যে, আল্লাহ পাক আমার সবকিছু দেখছেন, এমনকি আমার মনের অবস্থাও দেখছেন, তাহলে ইবাদত সুন্দরভাবে করা হবে। আমি যখন যাকাত দিব, তখন আমি কী ফরয আদায় করার নিয়তে আল্লাহর ওয়াস্তে দিচ্ছি? নাকি গরীবের কাছে আমার বড়ত্ব ফোটানোর জন্য দিচ্ছি, আমার মনের অবস্থা কি তা আল্লাহ্ জানেন –একথা চিন্তায় রাখতে হবে। وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ অর্থাৎ, আল্লাহ্ পাক আন্তরের বিষয় সম্পর্কেও সম্যক অবগত। আমার মনে কী চিন্তা জাগে, সে সম্পর্কেও আল্লাহ্ অবগত। এই বিশ্বাস জাগ্রত থাকলে গলত নিয়ত আসতে পারবে না। আমি হজ্জ করতে যাচ্ছি, কী নিয়তে যাচ্ছি, আমার নিয়তের খবরও আল্লাহ্ রাখেন। আমি কি সহীহ্ নিয়তে যাচ্ছি, নাকি দেশ ভ্রমনের উদ্দেশ্যে যাচ্ছি, নাকি মার্কেটিং করার জন্য যাচ্ছি, নাকি লোকে আমাকে হাজী সাহেব বলবে এই উদ্দেশ্যে যাচ্ছি? আল্লাহ্ পাক সব খবর রাখেন। এই চিন্তা ভিতরে থাকলে কোন ইবাদতের ক্ষেত্রেই গলদ নিয়ত ভিতরে আসতে পারবে না। এমনিভাবে যেকোন ইবাদত আমি করি, আল্লাহ্র যেকোন হুকুম আমি পালন করি, এই চিন্তা রাখতে হবে যে, আল্লাহ্ আমার মনের কথাও জানেন, যাহেরী জিনিসও তিনি দেখেন। আল্লাহ্র অগোচরে কিছুই নয় -এই চিন্তা জাগ্রত থাকলে মানুষের সবকিছু সুন্দর হয়ে যায়। এই যে চিন্তা, এটাকে বলা হয় মুরাকাবা। দ্বীনী জীবন গড়ার জন্য এটা বিশেষ একটা মূলনীতি।

জীবন গড়ার চতুর্থ মূলনীতি হল মুহাছাবা। মুহাছাবা অর্থ হিসাব-নিকাশ। দিনের শেষে নিজের পাপ-পুণ্যের হিসাব-নিকাশ নিতে হবে এবং যতটুকু নেক কাজ করার তাওফীক হয়েছে তার জন্য আল্লাহ্র শোকর আদায় করতে হবে এবং যা গোনাহ্ হয়েছে তার জন্য তওবা করতে হবে এবং সামনে সেই গোনাহ থেকে কীভাবে বেঁচে থাকা যায় তার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

নিজের হিসাব-নিকাশ নেয়ার ব্যাপারে হাদীছে বলা হয়েছে,

اَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ. (رواه الترمذي برقم ٢٤٥٩ وقال حديث حسن)

অর্থাৎ, জ্ঞানী সেই যে নিজের হিসাব-নিকাশ নেয়।

কোন ব্যবসায়ীর যদি হিসাব-নিকাশ না থাকে, বিনা হিসাবে ব্যবসা করতে থাকে আর সমানে খরচ করতে থাকে, তাহলে সে সফল ব্যবসায়ী হতে পারবে না, কেউ তাকে বুদ্ধিমান ব্যবসায়ী বলবে না; বরং বুদ্ধিমান ব্যবসায়ী সে, যে হিসাব-নিকাশ রাখে। তদ্রূপ দ্বীনের ব্যাপারেও বুদ্ধিমান সে, যে নিজের ব্যাপারে হিসাব-নিকাশ রাখে। উন্নতি হচ্ছে না অবনতি হচ্ছে, কোথায় ছিলাম এখন কোথায় আছি, সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছি না পিছনের দিকে যাচ্ছি -এসব হিসাব-নিকাশ না রাখলে সে বুদ্ধিমান নয়। তাই জীবন গড়তে হলে শুধু পরিকল্পনা এবং সাধনাই যথেষ্ট নয়, হিসাব-নিকাশেরও প্রয়োজন রয়েছে।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে জীবন গঠন করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বয়ান নং ৩২-এর খুতবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ لَمْ یَجْعَلْ حَیَاةَ الْاِنْسَانِ سُدًی وَّهَمَلًا ، وَخَلَقَ مَوْتَهُمْ وَحَیَاتَهُمْ لِیَبْلُوَهُمْ اَیُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِیْکَ لَهُ الَّذِیْ لَمْ یَجْعَلْ لَهُ فِیْ خَلْقِهٖ مَثَلًا، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَیِّدَنَا وَنَبِیَّنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ سَیِّدُ مَنْ لَمْ یَجْعَلْ حَیَاتَهٗ مُهْمَلًا، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِکْ عَلٰی عَبْدِکَ وَرَسُوْلِکَ مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اِلٰی یَوْمِ یُعْطٰی کُلُّ وَاحِدٍ لِاَعْمَالِهٖ بَدْلًا.

اَیُّهَا النَّاسُ! اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی خَلَقَ النَّاسَ لِیَبْلُوَهُمْ اَیُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا، وَ لَمْ یَخْلُقْ حَیَاةَ الْاِنْسَانِ مُهْمَلًا، فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ عَبْدٌ ذَهَبَ زَمَانُهٗ بَاطِلًا، وَتَرَکَ عُمْرَهٗ مِنْ حُلِیِّ الطَّاعَاتِ عَاطِلًا، وَطُوْبٰی لِعَبْدٍ عَمَّرَ اَوْقَاتَ حَیَاتِهٖ بِالْخَیْرَاتِ عَاجِلًا وَّاٰجِلًا، فَصَلّٰی وَصَامَ وَزَکّٰی وَحَجَّ بَیْتَ اللّٰهِ الْعَتِیْقَ، وَقَدْ تَمَّ لَهُمْ لِجَمِیْعِ الْاَعْمَالِ الْاِسْعَادُ وَالتَّوْفِیْقُ.

عِبَادَ اللّٰهِ! یَقُوْلُ صُلَحَآءُ الْاُمَّةِ بِضَوْءِ الْقُرْاٰنِ وَالسُّنَّةِ : لَا بُدَّ لِتَاْسِیْسِ الْحَیَاةِ وَتَشْکِیْلِهَا مِنْ اَرْبَعَةِ مَبَانِیَ، وَهِیَ الْمُشَارَطَةُ وَالْمُجَاهَدَةُ وَالْمُرَاقَبَةُ وَالْمُحَاسَبَةُ.

فَعَلَیْنَا الْمُشَارَطَةُ لِلْاَعْمَالِ، وَهُوَ الْاِسْتِعْدَادُ ذِهْنًا لِلْاَعْمَالِ، وَکَانَ النَّبِیُّ صَلَّی اللّٰهِ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَسْتَعِدُّ ذِهْنًا لَّهَا، کَمَا کَانَ النَّبِیُّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَسْتَعِدُّ لِاسْتِقْبَالِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَادَاءِ وَظَائِفِهٖ، ثَبَتَ ذَالِکَ بِقَوْلِهٖ : اَللّٰهُمَّ بَارِکْ لَنَا فِیْ رَجَبَ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ، وَبِقَوْلِهِ الْاٰخَرِ: اَحْصُوْا هِلَالَ شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



وَعَلَیْنَا الْمُجَاهَدَةُ فِی الْاَعْمَالِ. اَلَا فَاِنَّ الْمَرْأَ اِذَا عَزَمَ عَلٰی شَیْءٍ وَجَاهَدَ لَهُ یَهْدِیَنَّهُ اللّٰهُ سَبِیْلَهُ. قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی : وَالَّذِیْنَ جَاهَدُوْا فِیْنَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا، وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِیْنَ. وَ قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : وَمَنْ یَّسْتَغْنِ یُغْنِهِ اللّٰهُ، وَمَنْ یَّسْتَعِفَّ یُعِفُّهُ اللّٰهُ، وَمَنْ یَّتَصَبَّرْ یُصَبِّرْهُ اللّٰهُ، وَمَا اُعْطِیَ اَحَدٌ عَطَاءً هُوَ خَیْرٌ وَّاَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ.

وَعَلَیْنَا الْمُرَاقَبَةُ فِیْ کُلِّ حِیْنٍ مِّنَ الْاَحْیَانِ، وَهِیَ الْاِحْسَانُ، تَحْسُنُ مِنْهُ اَعْمَالُ الْاِنْسَانِ، وَفِیْ حَدِیْثِ جِبْرَئِیْلَ ـ سُئِلَ النَّبِیُّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَا الْاِحْسَانُ؟ قَالَ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ کَاَنَّکَ تَرَاهُ ، فَاِنْ لَّمْ تَکُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهٗ یَرَاکَ. (مُتَّفَقٌ عَلَیْهِ)

وَعَلَیْنَا الْمُحَاسَبَةُ، قَبْلَ اَنْ یَّجِیْئَ یَوْمٌ لَّا بَیْعٌ فِیْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ. اَخْرَجَ الْاِمَامُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِیُّ بِسَنَدٍ حَسَنٍ وَابْنُ مَاجَةَ وَالْحَاکِمُ عَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اَلْکَیِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهٗ وَ عَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَاجِزُ مَنْ اَتْبَعَ نَفْسَهٗ هَوَاهَا وَتَمَنّٰی عَلَی اللّٰهِ.

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ : تَبَارَکَ الَّذِیْ بِیَدِهِ الْمُلْکُ وَهُوَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ، اَلَّذِیْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیَاةَ لِیَبْلُوَکُمْ اَیُّکُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا، وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْغَفُوْرُ.

بَارَکَ اللّٰهُ لَنَا وَلَکُمْ فِی الْقُرْاٰنِ الْعَظِیْمِ، وَنَفَعَنَا وَاِیَّاکُمْ بِالْاٰیَاتِ وَالذِّکْرِ الْحَکِیْمِ. اَقُوْلُ قَوْلِیْ هٰذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ لِیْ وَلَکُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِیْنَ وَاسْتَغْفِرُوْهُ، اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ.

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

## রমযানের ৩০ বয়ান

**(নোট:** রমযান মাসে মানুষের দিল নরম থাকে। দ্বীনের কথা শোনার এবং মানার জযবাও অন্য সময়ের তুলনায় বেশি থাকে এবং বেশ কিছু বিষয় প্রতিদিন জানানোর প্রয়োজনও থাকে। তাই মানুষের ফায়দা ও প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য রেখে রমযানে প্রতিদিন যেকোন একটা সময়ে কিছু নসীহতের এন্তেজাম রাখা যায়। মহল্লার মুসল্লিদের মোনাছেব সময় বুঝে আসরের পর বা তারাবীহ-এর পর বা ফজরের পর যেকোন একটা সময়ে এটা করা যেতে পারে। এ কাজে ইমাম সাহেবানদের সহযোগিতার জন্য রমযানের ৩০ টি বয়ান পেশ করা হল।)

### ১নং বয়ান

بسم الله الرحمن الرحيم

**قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ.** (رواه الترمذي برقم ١٦٢١وقال حسن صحيح)

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

আল্লাহ পাকের হাজারো শোকর। আল্লাহ পাক আমাদেরকে রহমত, বরকত ও মাগফিরাতের মাসে উপনীত করেছেন। এই মাস পাওয়ার তাওফীক আমাদেরকে দিয়েছেন। ছওয়াব অর্জন করার একটা সিজন আমরা পেয়েছি। এটা এমন ছওয়াবের সিজন যে, রাসূল (সা.) বলেন, 'এ মাসে একটা নফল ইবাদত করলে একটা ফরযের সমতুল্য ছওয়াব হয়। আর একটা ফরয ৭০টা ফরযের সমতুল্য ছওয়াবের হয়ে যায়'। ফরয আর নফল এ দুটোর ভিতরে এত পার্থক্য যে, সারা জীবন কেউ যদি নফল আদায় করে, তবুও একটা ফরযের সমতুল্য হয় না। অথচ আল্লাহ পাক রমযান মাসে একটা নফল ইবাদত করলে ফরযের সমতুল্য ছওয়াব দান করে থাকেন। আমাদের যিন্দেগীতে রমযান মাস ছাড়া ছওয়াব অর্জন করার এত বড় সিজন আর নেই। এই সিজনকে আমরা পুরোপুরি কাজে লাগাই। রমযানের যতরকম ইবাদত আছে, রোযা রাখা, তারাবীহ আদায় করা, তেলাওয়াত করা, তাহাজ্জুদের নামায পড়া, দান-সদকা করা, ইত্যাদি যতরকম ইবাদত আছে সবগুলো আমরা যত্নের সাথে আদায় করি। ব্যবসায়ীদের সামনে যখন সিজন আসে তখন ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা এসে যায়, কে কার চেয়ে বেশি ব্যবসা করতে পারে, কে কার চেয়ে বেশি লাভবান হতে পারে। রমযান মাস আমাদের জন্য ছওয়াব অর্জন করার সিজন, তাই এখানেও প্রতিযোগিতা চাই। এক হাদীছে রাসূল (সা.) তাই বলেছেনও,

**وَيُبَاهِيْ بِكُمْ مَلٰئِكَتَهُ، فَارُوا اللّٰهَ مِنْ اَنْفُسِكُمْ خَيْرًا.** (جامع الأحاديث للسيوطي برقم ٢٥٥ نقلا عن الطبراني)

'অর্থাৎ, আল্লাহ পাক বান্দার ইবাদত নিয়ে ফিরিশতাদের সামনে গর্ব করতে থাকেন, কাজেই তোমরা ইবাদতে প্রতিযোগিতা করতে থাক। আল্লাহকে দেখিয়ে দাও কত ইবাদত করা যায়'। আল্লাহ পাক এটা নিয়ে ফিরিশতাদের সামনে গর্ব করেন যে, দেখ আমার বান্দারা –যাদেরকে সৃষ্টি করার সময় তোমাদের কাছে পরামর্শ চেয়েছিলাম, তোমরা বলেছিলে যে, ওরা তো দুনিয়াতে কত পাপ করবে, তাদেরকে তৈরি করার কী দরকার! ইবাদতের জন্য তো আমরাই যথেষ্ট– দেখ তারা কত ইবাদত করছে। আল্লাহ পাক এভাবে গর্ব করতে থাকেন। তাই রাসূল (সা.) বলেছেন, 'তোমরা আল্লাহকে দেখিয়ে দাও কত ইবাদত করা যায়'। সবরকম ইবাদতের জন্য মনের সাথে প্রস্তুতি নিতে হবে। মনে-মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিতে হবে যে, রমযানে আমার কোন ইবাদত যেন ছুটে না যায়। অনেকটা করতে মনে চায় না, মনের সাথে মোজাহাদা করে করতে হবে। মনের সঙ্গে যে মোজাহাদা করতে পারে সেই হচ্ছে প্রকৃত মুজাহিদ। হাদীছে এসেছে,

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



**اَلْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ.** (رواه الترمذي برقم ١٦٢١وقال حسن صحيح)

অর্থাৎ, সবচেয়ে বড় মুজাহিদ হল সেই, যে তার নফসের সাথে জেহাদ করে। শত্রুর সাথে জেহাদ করাও অনেক সহজ, এক সময় জযবা আসল তলোয়ার নিয়ে, অস্ত্র নিয়ে নেমে গেলাম আর বুকের রক্ত ঢেলে দিলাম, জযবার চোটে জীবনটা পর্যন্ত দিয়ে দিলাম, এটা সহজ। কিন্তু অনবরত সবসময় নফসের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করে যাওয়া অনেক কঠিন। একবার দুইবার করা যায়, কিন্তু সবসময় নফসের সাথে জেহাদ করা খুবই কঠিন। তাই বলা হয়েছে নফসের সাথে যে জেহাদ করতে পারবে, সে হল আসল মুজাহিদ, সে হল সবচেয়ে বড় মুজাহিদ। আল্লাহ পাক আমাদেরকে মোজাহাদা করার জন্য কবুল করুন। আমীন!

### ২নং বয়ান

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

**قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ. الاية.**

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে কারীমের মধ্যে এই রমযান মাসের পরিচয় দিয়েছেন এভাবে যে, রমযান মাসে মানুষের হেদায়েতের জন্য কুরআন নাযিল করা হয়েছে। রমযান মাসের পরিচয় দেয়া হয়েছে কুরআন নাযিল হওয়ার মাস হিসেবে। এজন্যই বলা হয়েছে রমযানের সাথে কুরআন তেলাওয়াতের বিশেষ সম্পর্ক আছে। রমযানে যতগুলো আমল করতে হয়, তার মধ্যে কুরআন তেলাওয়াত একটা বিশেষ আমল। আল্লাহ পাক কুরআন তেলাওয়াতের জন্য রমযান মাসে তারাবীহ-এর বিধানও রেখেছেন এবং তারাবীহের মধ্যে পুরো কুরআন খতম করার নিয়ম রাখা হয়েছে। যাতে নামাযের মধ্যে কুরআন তেলাওয়াত হয়ে যায়। এছাড়াও বুযুর্গানে দ্বীনের আমল থেকে দেখা যায় তাঁরা তারাবীহ-এর বাইরেও তাহাজ্জুদের মধ্যে কুরআন খতম করেন। নামাযের মধ্যে এক খতম কুরআন পাঠ করা হলে প্রতিটা হরফে কম পক্ষে ১০০টা নেকী হয়। আর রমযান মাসে প্রতিটা নেকীকে কমপক্ষে ৭০ গুণ বাড়িয়ে দেয়া হয়। এ হিসেবে রমযান মাসে নামাযের মধ্যে এক কুরআন খতম করলে সাত হাজার খতমের ছওয়াব হয়ে যায়। নামাযের বাইরেও তেলাওয়াত হওয়া চাই।

আমাদের অনেকের আমল হল– এরকম যে, রমযান মাসে কোন রকম একটা খতম দিতে পারলেই মনে করি যে, কুরআন তেলাওয়াত হয়ে গেল। সারা বছর মোটেও তেলাওয়াত করি না, রমযানে যা-ও একটু তেলাওয়াত করি, কোন রকম টেনে-টুনে একটা খতম শেষ হলেই মনে করি ব্যাস আমার তেলাওয়াত শেষ হয়ে গেছে। রমযানে বেশি বেশি তেলাওয়াত করতে বলা হয়েছে, এক খতম নয়, পারলে দুই চার খতম, দশ বিশ খতম তেলাওয়াত করি। রমযান মাস আসলে বুযুর্গানে দ্বীন তেলাওয়াত ছাড়া আর কিছুই বোঝেন না। এই নিকট অতীতে হযরত মাওলানা যাকারিয়া সাহরানপুরী (রহ.), যার লেখা ফাযায়েলে আ'মাল মসজিদে মসজিদে তা'লীম হয়ে থাকে। তিনি রমযান মাসে ৬০ খতম তেলাওয়াত করতেন। প্রতিদিন দিনের বেলায় এক খতম, রাতের বেলায় তাহাজ্জুদে এক খতম। আমরা যারা হাফেজ নই, তারা তাহাজ্জুদে হয়তো খতম করতে পারব না, কিন্তু যতটুকু মুখস্থ আছে বেশি বেশি করে তাহাজ্জুদে তেলাওয়াত করতে পারি।

রমযান মাস তাহাজ্জুদের অভ্যাস গড়ে তোলার একটা সুযোগ, সেহরীর সময় আমাদের উঠতেই হয়। যদি আমরা নিয়ত করে নেই যে, প্রতিদিন সেহরীতে উঠেই আমি তাহাজ্জুদ পড়ব এবং এক মাসে

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

আমার যে অভ্যাস গড়ে উঠবে, সারা বছর আমি এই অভ্যাস ধরে রাখব। এভাবে রমযানে তাহাজ্জুদের অভ্যাস গড়ে তোলার একটা বড় সুযোগ। হাদীছে এসেছে– ফরযের পর সমস্ত নফলের মধ্যে তাহাজ্জুদের ফযীলত সবচেয়ে বেশি। তাহাজ্জুদের মাধ্যমে আল্লাহর নিকটতম বান্দা হওয়া যায়। আমরা হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহ.)-এর নাম শুনেছি। অনেক বড় বুযুর্গ ছিলেন তিন। তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর একজন মহব্বতের মানুষ তাকে স্বপ্নে দেখেছেন, দেখে জিজ্ঞাসা করেছেন হুজুর! আল্লাহ আপনার সাথে কেমন মোয়ামালা করলেন? তখন তিনি বলেছেন, জীবনে মানুষকে অনেক ওয়াজ নসীহত করেছি, অনেক ইবাদত করেছি, তাসাওউফের লাইনে অনেক মানুষকে শিক্ষা দিয়েছি, কিন্তু কোনটাই আমার কোন কাজে আসেনি।

وَمَا نَفَعَنِيْ اِلَّا رَكْعَاتٌ فِيْ جَوْفِ اللَّيْلِ.

অর্থাৎ, গভীর রাতে দাঁড়িয়ে যে কয়েক রাকআত তাহাজ্জুদ পড়তাম, তার ওছীলায় আল্লাহ পাক আমাকে নাজাত দিয়েছেন এবং বুলন্দ মর্যাদা দান করেছেন। অনেক বুযুর্গদের এরকম বিষয় আছে, যার থেকে বুঝা যায় তাহাজ্জুদের দ্বারা আল্লাহ পাকের বিশেষ নৈকট্য অর্জন হয়। এই রমযান মাসে আমরা তাহাজ্জুদের অভ্যাস গড়ে তুলতে পারি। বেশি বেশি তেলাওয়াতের অভ্যাস গড়ে তুলতে পারি। আল্লাহ পাক আমাদেরকে তাওফীক দান করুন। আমীন!

## ৩ নং বয়ান

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِسْتَكْثِرُوْا فِيْهِ مِنْ اَرْبَعِ خِصَالٍ خَصْلَتَيْنِ تُرْضُوْنَ بِهِمَا رَبَّكُمْ وَخَصْلَتَيْنِ لَاغِنَاءَ بِكُمْ عَنْهُمَا. فَاَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ تُرْضُوْنَ بِهِمَا رَبَّكُمْ فَشَهَادَةُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَتَسْتَغْفِرُوْنَهُ، وَاَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ لَا غِنَاءَ بِكُمْ عَنْهُمَا فَتَسْأَلُوْنَ اللّٰهَ الْجَنَّةَ وَتَعُوْذُوْنَ بِهِ مِنَ النَّارِ. (رواه ابن خزيمة برقم ١٨٨٧ وإسناده ضعيف)

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

একটা হাদীছ আপনাদের সামনে তেলাওয়াত করা হল। এ হাদীছের মধ্যে রাসূল (সা.) বলেছেন, রমযান মাসে তোমরা চারটা আমল বেশি বেশি করে করবে। দুইটা আমল এমন– যার দ্বারা তোমরা আল্লাহকে খুশি করতে পারবে। আর দুইটা আমল এমন, যা করা ছাড়া তোমাদের কোন উপায় নেই, যা তোমাদের করতেই হবে। যে দুটো আমল বেশি বেশি করলে আল্লাহকে খুশি করতে পারবে তা হল– লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বেশি বেশি পাঠ করা, আর বেশি বেশি এস্তেগফার করা, অর্থাৎ বেশি বেশি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া। এ দুটো আমল আল্লাহর কাছে বেশি পছন্দনীয়। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, এটা আল্লাহর কাছে খুব পছন্দনীয় আমল। এর মধ্যে বলা হয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। তিনিই সব, সমস্ত ক্ষমতা তাঁর, সমস্ত প্রশংসা তাঁর, সবকিছুই তাঁর। এভাবে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ দ্বারা আল্লাহর অনেক উচ্চাঙ্গের প্রশংসা করা হয়। এর মাধ্যমে আল্লাহর জন্য সর্বোচ্চ পর্যায়ের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। তাই আল্লাহ এটা খুব বেশি পছন্দ করেন। রমযান মাসে এটা বেশি বেশি পাঠ করতে বলা হয়েছে। আর ক্ষমা চাওয়াকেও আল্লাহ পছন্দ করেন। এটাও বেশি বেশি করতে বলা হয়েছে ক্ষমা চাওয়ার অর্থ হল– আল্লাহর কাছে নতি স্বীকার করা। আল্লাহকে বড় বলে স্বীকার করা। আল্লাহর ক্ষমা ছাড়া আমার কোন উপায় নেই, এভাবে নিজের অসহায়ত্ব প্রকাশ করা হয়। আর বান্দার অসহায়ত্ব প্রকাশ করাকে আল্লাহ

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



খুব বেশি পছন্দ করেন। বান্দা যত বড়ায়ী দেখাবে, আল্লাহ তত অপছন্দ করেন। পক্ষান্তরে বান্দা যতবেশি নতি স্বীকার করবে, যতবেশি কাকুতি মিনতি করবে, যতবেশি বিনয় প্রকাশ করবে, তাওয়াযু প্রকাশ করবে, আল্লাহ ততবেশি পছন্দ করবেন। তাই বেশি বেশি ক্ষমা চাইলেও আল্লাহ খুব খুশি হন। এই দুটো আমল অর্থাৎ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বেশি বেশি পড়া, আর আল্লাহর কাছে বেশি বেশি ক্ষমা চাওয়া, এদুটো দ্বারা আল্লাহ খুব খুশি হন। আর দুটো আমল যা আমাদের করা ছাড়া কোন উপায় নেই, একটা হল– আল্লাহর কাছে জান্নাত চাওয়া, আরেকটা হল– জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাওয়া। এই সর্বমোট চারটা আমল। রমযান মাসে এই চারটা আমল বেশি বেশি করতে বলা হয়েছে। এর ভিতরে একটা হল পড়ার অর্থাৎ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বেশি বেশি পড়া। আর তিনটা হল আল্লাহর কাছে চাওয়ার, অর্থাৎ ক্ষমা চাওয়া, জান্নাত চাওয়া এবং জাহান্নাম থেকে নাজাত চাওয়া। একটা পড়ার আমল, তিনটা চাওয়ার আমল, এই মোট চারটা আমল রমযান মাসে বেশি বেশি করতে বলা হয়েছে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে আমল করার তাওফীক নছীব করুন। আমীন!

## ৪নং বয়ান

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنَّ هٰذَا الشَّهْرَ اَوَّلُهُ رَحْمَةٌ. الحديث. (رواه ابن خزيمة برقم ١٨٨٧ وإسناده ضعيف)

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

রমযানের প্রথম দশক রহমতের দশক। রহমতের দশকের আজ চতুর্থ রাত্র চলে যাচ্ছে। আল্লাহর কাছ থেকে আমরা যদি রহমতের ফয়সালা করিয়ে নিতে না পারি, তাহলে রাসূল (সা.)-এর ভাষায় আমরা হতভাগা। রাসূল (সা.) বলেন,

فَاِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ فِيْهِ رَحْمَةَ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ. (جامع الأحاديث للسيوطي برقم ٢٥٥ نقلا عن الطبراني)

'অর্থাৎ, রমযান পেয়েও যে নিজের জন্য আল্লাহর রহমতের ফয়সালা করিয়ে নিতে পারল না সে বড়ই হতভাগা'।

রহমতের বিশেষ সুযোগ এই প্রথম দশকে রাখা হয়েছে। যদিও পুরো রমযান মাসে আল্লাহ পাক রহমতের ফয়সালা করে থাকেন, তার মধ্যে বিশেষভাবে প্রথম দশকে রহমতের ফয়সালা করেন। যারা প্রথম দশকে রহমতের বিশেষ সুযোগ গ্রহণ করতে না পারেন, তার পরেও তাদের জন্য সুযোগ রাখা হয়েছে, পুরো রমযান মাসে আল্লাহ পাক রহমতের ফয়সালা করেন। হাদীছে এসেছে,

يَغْشَاكُمُ اللّٰهُ فِيْهِ فَيَنْزِلُ الرَّحْمَةَ. (جامع الأحاديث للسيوطي برقم ٢٥٥ نقلا عن الطبراني)

অর্থাৎ, এই রমযানের পুরো সময়টাতেই আল্লাহ পাক রহমত দান করেন।

রমযানের প্রথম দশক রহমতের, দ্বিতীয় দশক মাগফিরাতের, অর্থাৎ ক্ষমার, আর তৃতীয় দশক জাহান্নাম থেকে মুক্তির। এটা হল ক্ষমা পাওয়ার বিশেষ সুযোগ। নতুবা পুরো রমযান মাসে মাগফিরাতেরও ফয়সালা হয়। মাগফিরাত অর্থ ক্ষমা। পুরো রমযান মাসে ক্ষমারও ফয়সালা হয়, পুরো রমযান মাসে জাহান্নাম থেকে মুক্তিরও ফয়সালা হয়। হাদীছে এসেছে,

وَيَحُطُّ الْخَطَايَا. (جامع الأحاديث للسيوطي برقم ٢٥٥ نقلا عن الطبراني)

অর্থাৎ, আল্লাহ পাক পুরো রমযান মাসে ক্ষমাও করেন।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

গতকাল যে হাদীছ শোনানো হয়েছিল রাসূল (সা.) রমযান মাসে চারটা আমল বেশি বেশি করতে বলেছেন। তার মধ্যে একটা হল– ক্ষমা চাওয়া। পুরো রমযান মাসে ক্ষমা চাইতে বলা হয়েছে। এমনিভাবে হাদীছে এসেছে,

**اِنَّ لِلّٰهِ عُتَقَاءَ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ (يَعْنِيْ فِيْ رَمَضَانَ).** (رواه أحمد برقم ٧٤٤٣ وإسناده صحيح على شرط الشيخين)

অর্থাৎ, রমযান মাসে প্রত্যেক দিন কিছু সংখ্যক লোকের জন্য আল্লাহ পাক জাহান্নাম থেকে মুক্তির স্থায়ী ফয়সালা করে থাকেন। কাজেই পুরো রমযান মাসে রহমতের দু'আও করতে হবে, মাগফিরাতের দু'আও করতে হবে, জাহান্নাম থেকে মুক্তির দু'আও করতে হবে। আমাদের নিজেদের জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তির দু'আ করতে হবে। সাথে সাথে আমাদের আপনজন যারা দুনিয়া থেকে চলে গেছেন, তাদের জন্যও জাহান্নাম থেকে মুক্তির দু'আ করতে হবে। সারকথা হাদীছের শিক্ষা অনুযায়ী রমযান মাসে খাস করে আমাদেরকে এই কয়েকটা বিষয়ের দু'আ করতে হবে। ক্ষমার দু'আ, জান্নাত চাওয়ার দু'আ, জাহান্নাম থেকে মুক্তির দু'আ, রহমতের দু'আ। এই দু'আগুলো পুরো রমযান মাসেই আমাদের বেশি বেশি করতে হবে।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে বেশি বেশি দু'আ করার তাওফীক নছীব করেন। আমীন!

## ৫নং বয়ান

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

**قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِكُلِّ عَبْدٍ مِنْهُمْ دَعْوَةٌ مُّسْتَجَابَةٌ.** (رواه أحمد برقم ٧٤٤٣ وإسناده صحيح على شرط الشيخين)

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

রমযান মাস সম্পর্কে রাসূলে কারীম (সা.) বলেছেন, 'রমযানে প্রতিদিন দিনের বেলায় হোক বা রাতের বেলায় হোক প্রত্যেক মানুষের একটা দু'আ অবশ্যই কবুল হবে'। শরীআত যত জায়গায় দু'আ কবুল হওয়ার কথা বলেছে, সাধারণভাবে বলেছে। একমাত্র রমযান মাস সম্পর্কেই পাওয়া যায়, যেখানে নিশ্চয়তা জ্ঞাপন করে বলা হয়েছে যে, সাধারণভাবে তো সব দু'আ কবুল হবেই, একটা দু'আ অবশ্যই কবুল হবে। উলামায়ে কেরাম বলেছেন যত জায়গা এরকম আছে যেখানে দু'আ কবুল হওয়ার নিশ্চয়তা পাওয়া যায়, সেখানে আমরা কী দু'আ করব? অনেক উলামায়ে কেরাম বলেছেন যে, সেখানে মাগফিরাতের জন্য দু'আ চাইব। আল্লাহ যেন ক্ষমা করে দেন। কারণ ক্ষমা চাওয়াই হল মানুষের সবচেয়ে বড় চাওয়া, ক্ষমা পাওয়াই হল সবচেয়ে বড় পাওয়া। রমযানে যে দু'আগুলো, করতে বলা হয়েছে– ক্ষমার জন্য দু'আ চাওয়া, জান্নাতের জন্য দু'আ চাওয়া, জাহান্নাম থেকে নাজাতের জন্য দু'আ চাওয়া, রহমতের দু'আ চাওয়া, এই দু'আগুলো আমরা বেশি বেশি করতে থাকব। এর যে, কোন একটা যদি কবুল হয়ে যায়, তাহলে আমরা কামিয়াব। ক্ষমা হলেও কামিয়াব, জাহান্নাম থেকে মুক্তি হলেও কামিয়াব, জান্নাত পেলেও কামিয়াব, আল্লাহর রহমত পেলেও কামিয়াব। যেকোন একটা দু'আ কবুল হয়ে গেলেই আমরা কামিয়াব। রমযানের প্রতিদিন দিনে হোক বা রাতে একটা দু'আ অবশ্যই কবুল হবে।

রমযানের মধ্যে বিশেষভাবে ইফতারীর সময় দু'আ কবুল হয়। এই দুআ ইফতারী শুরু করার আগেও হতে পারে, ইফতারী কিছুটা করে ইফতারীর মাঝেও হতে পারে, ইফতারী শেষ হওয়ার পরেও হতে পারে। মজলিসে যখন ইফতারী হয়, তখন আমরা অনেকেই বলে থাকি যে, হুজুর! দু'আ করেন,

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



এখন তো দু'আ কবুল হওয়ার সময়, কিন্তু ইফতারীর আগেই দু'আ করতে হবে তা জরুরী নয়। তা ছাড়া মজলিস হলে দু'আর কথা আমাদের স্মরণ হয়, কিন্তু নিজেরা যখন ইফতারী করি, ইফতারীর আইটেম গুণতে গুণতে কোন্‌টা আসল কোন্‌টা আসলনা হিসাব-নিকাশ করতে করতে দু'আর কথা আর মনে থাকে না। ইফতারীর সময় দু'আ কবুল হয়, সেটা মজলিস হলেও, একাকী হলেও। সেহরীর সময়ও দু'আ কবুল হয়, আর সাধারণভাবে প্রত্যেকটা নামাযের পরে দু'আ কবুল হয়। আমরা খুব এতমীনানের সাথে দু'আ করি। রমযান দু'আ কবুল হওয়ারও মাস। রমযান যেমন রহমত, মাগফিরাত ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির মাস, রমযান দু'আ কবুল হওয়ারও মাস। আল্লাহর কাছে বেশি বেশি চেয়ে নেয়ার মাস। আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করেন। আমীন!

## ৬ নং বয়ান

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

**قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ.**

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

রমযান মাসের প্রথম দশক চলছে। অর্থাৎ, রহমতের বিশেষ দশক চলছে। গতকাল বলা হয়েছিল আল্লাহর কছে রহমত পাওয়ার জন্য দু'আ করতে হবে। দু'আর সাথে সাথে দাওয়াও গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ, আল্লাহর রহমত পাওয়া যায়, এরকম ওছীলা গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহর রহমত পাওয়ার ওছীলা হল আল্লাহর বান্দাদের প্রতি রহমত করা, অর্থাৎ দয়া করা। আমরা মানুষের উপর রহমত করলে আল্লাহ আমাদের প্রতি রহমত করবেন। আমরা মানুষের উপর দয়া করলে আল্লাহ আমাদের প্রতি দয়া করবেন। আল্লাহ পাকের নিয়ম হল আল্লাহর বান্দার সাথে আমার যেরকম নীতি হবে, আমার সাথেও আল্লাহর ওরকম নীতি হবে। আমি যদি আল্লাহর বান্দাদের প্রতি দয়া করি, আল্লাহও আমার প্রতি দয়া করবেন। হাদীছে বলা হয়েছে,

**اِرْحَمُوْا مَنْ فِى الْاَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَّنْ فِى السَّمَآءِ.** (رواه الترمذي برقم ١٩٢٤ وقال حسن صحيح)

অর্থাৎ, তোমরা দুনিয়াবাসীর প্রতি দয়া কর, আসমানবাসী অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। কুরআন শরীফে বলা হয়েছে,

**اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ.**

এ আয়াতের একটা ব্যাখ্যা এরকম হতে পারে যে, যারা মানুষের প্রতি দয়া করে, আল্লাহর রহমত তাদের কাছে এসে যায়। তাই আল্লাহর রহমত পাওয়ার জন্য আমাদের মানুষের প্রতি রহমত বা দয়া করা উচিত। বিশেষভাবে নিজেদের অধীন যারা আছে, নিজেদের কর্মচারী, চাকর-নওকর যারাই আমাদের অধীন আছে, তাদের প্রতি দয়া করতে হবে। রমযান মাসে তাদের প্রতি দয়া করার একটা বিশেষ উপায় হল তাদের কাজের বোঝা হালকা করে দেয়া। আর তাদের যতটুকু পারিশ্রমিক সাধারণভাবে প্রাপ্য তার থেকে বেশি দেয়া। মুসলমানদের মধ্যে এর থেকেই ঈদ বোনাসের প্রচলন হয়েছে। আমার অধীন কর্মচারী, চাকর-নওকর তাদের ন্যায্য প্রাপ্য যতটুকু তারচেয়ে বেশি দিলাম, এভাবে এক দিকে তাদের বোঝা হালকা করে তাদের প্রতি দয়া করলাম, আবার পারিশ্রমিক বেশি দিয়ে আরও দয়া করলাম। যতভাবে দয়া করা হতে পারে সবভাবে দয়া করলাম। এভাবে তাদের প্রতি দয়া করলে আল্লাহ পাকও আমাদের প্রতি দয়া করবেন, অর্থাৎ রহমত করবেন। রমযানে নিজেদের

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

অধীনস্থদের কাজের বোঝা হালকা করলে এই একটা বিশেষ ফায়দা রয়েছে। এর আরও একটা বিশেষ ফায়দার কথা হাদীছে বলা হয়েছে,

مَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوْكِهِ فِيْهِ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ وَاَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ. (رواه ابن خزيمة برقم ١٨٨٧ وإسناده ضعيف)

অর্থাৎ, রমযান মাসে যে তার অধীনস্থদের কাজের বুঝা হালকা করে দিবে, আল্লাহ পাক তার গোনাহের বোঝা হালকা করে দিবেন এবং তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে দিবেন। যার গোনাহের বোঝা হালকা হবে, সে-ই জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে। তাই রমযান মাসে অধীস্থদের কাজের বোঝা হালকা করা বড় একটা বিশেষ ফযীলতের বিষয়। এর দ্বারা আল্লাহ পাক আমাদের গোনাহের বোঝা হালকা করে দিবেন এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবেন। আল্লাহ পাক আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

## ৭নং বয়ান

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: وَشَهْرُ الصَّبْرِ وَشَهْرُ الْمُوَاسَاتِ وَشَهْرٌ يَزْدَادُ فِيْهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ. (رواه ابن خزيمة برقم ١٨٨٧ وإسناده ضعيف)

মুসল্লিয়ানে কেরাম! রমযান মাসের পরিচয় আমরা জানি যে, রমযান হল রহমতের মাস, রমযান হল মাগফিরাতের মাস, রমযান হল জাহান্নাম থেকে মুক্তির মাস। এর সাথে সাথে রাসূল (সা.) এই মাসের আরেকটা পরিচয় দিয়েছেন وشهر الصبر অর্থাৎ, রমযান হল সবরের মাস। "সবর" বলতে সাধারণভাবে আমরা বুঝি কেউ আমাকে গালি-গালাজ করল, কটু কথা বলল কিংবা কোন আঘাত করল আর আমি প্রতিশোধ নিলাম না এতটুকুই সবর, আমরা এতটুকুকেই সবর মনে করি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সবর এর চেয়ে অনেক ব্যাপক। সবরের প্রকৃত সংজ্ঞা হল–

حَبْسُ النَّفْسِ عَلَى الطَّاعَةِ وَعَنِ الْمَعْصِيَّةِ وَعِنْدَ الشَّدَائِدِ.

অর্থাৎ, ইবাদত করতে মনে চায় না, জোর করে মনকে ইবাদতের উপর ধরে রাখা, মনকে চাপ দিয়ে ইবাদত করা এটাও সবর। এমনিভাবে গোনাহের দিকে মন ছুটে যেতে চায়, গোনাহ করতে মনে চায়, এক্ষেত্রে গোনাহ থেকে বিরত থাকা, এটাও সবর। আর বিপদ-আপদে ধৈর্য্য ধরা এবং প্রতিশোধ না নেয়া, এটাও সবর। অতএব রমযান মাস সবরের মাস– এর অর্থ হল কেউ আমাকে মন্দ বললে আমি তাকে মন্দ বলতে পারব না। কেউ গায়ে পড়ে ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি করতে চাইলে আমি বলব ভাই, আমি রোযাদার। এভাবে ধৈর্য্য ধরে ঝগড়া-বিবাদ থেকে বিরত থাকব। কেউ কটু কথা বললে প্রতিশোধ নিব না। সাথে-সাথে সমস্ত রকম গোনাহ থেকে বিরত থাকব, মিথ্যা বলা, গীবত করা, গান-বাদ্য শোনা, গীবত শোনা ইত্যাদি যতরকম গোনাহ আছে, সবগুলো থেকে বিরত থাকব, এটাও সবর। ইবাদতের উপর মজবুতির সাথে থাকব। এই ব্যাপক অর্থে রমযান মাসকে সবরের মাস বলা হয়েছে। অতএব গোনাহ থেকে বিরত থেকে সবর হবে, ইবাদতের উপর অটল থেকে সবর হবে, প্রতিশোধ না নিয়ে সবর হবে, তাহলে এই ব্যাপক সবরের বদলা হবে জান্নাত। রাসূল (সা.) বলেছেন,

وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ. (رواه ابن خزيمة برقم ١٨٨٧ وإسناده ضعيف)

অর্থাৎ, যদি সত্যিকার সবর অর্জন করা যায়, তাহলে এই সবরের প্রতিদান হল জান্নাত। সবরের বিনিময়ে জান্নাত হাছিল করা যাবে। রাসূল (সা.) এই মাসের আরও পরিচয় দিয়ে বলেছেন,



وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةُ. (أيضا)

অর্থাৎ, রমযান মাস হল সহানুভূতিরও মাস। যেমন সবরের মাস, সহানুভূতিরও মাস। নিজের কর্মচারী, নিজের চাকর-নওকরের প্রতি সহানুভূতি দেখাতে হবে, তাদের কাজ আছান করে দিয়ে সহানুভূতি দেখাতে হবে, সব ধরনের গরীব-দুঃখীকে দান-সদকা করে তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখাতে হবে। এভাবে রমযান হল সহানুভূতির মাস। তাই রমযানে দান-সদকার ছওয়াবও বেশি রাখা হয়েছে। যাকাতও মুসলমানরা রমযানে দিয়ে থাকেন, এর মাধ্যমেও গরীবদের প্রতি সহানুভূতি দেখানো হয়। তাদেরকে খাদ্য-খাবার, টাকা-পয়সা দিয়ে, পোষাক-পরিচ্ছদ দিয়ে সর্বোতভাবে সহানুভূতি দেখানো যেতে পারে। এভাবে সহানুভূতিতে নিজের অর্থ-সম্পদ ব্যয় হবে, কিন্তু তাতে আল্লাহ পাক বরকত দান করবেন। তাই রাসূল (সা.) সাথে সাথে বলেছেন,

وَشَهْرٌ يَزْدَادُ فِيْهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ. (أيضا)

অর্থাৎ, রমযান মাস মু'মিনের রিযিক বর্ধিত হওয়ার মাস। বাহ্যিকভাবেও আমরা দেখতে পাই, বছরের অন্যান্য সময়ে আমরা যা খাই, রমযানে তারচয়ে বেশি খাই এবং অন্যান্য সময়ে যত মজার সাথে খাই, রমযান মাসে আরও বেশি মজার সাথে খাই। আমরা খাওয়া থেকে বিরত থাকি, রোযা রাখতে গেলে বিরত থাকতে হয়, আমরা বিরত থাকি, আল্লাহ পাক বেশি করে খাওয়ান। দুনিয়ার ধর্মটাই এরকম। আমি যত দুনিয়া ত্যাগ করতে চাইব, দুনিয়া তত আমার কাছে আসবে, আর দুনিয়া যত ধরতে চাইব, তত দূরে সরে যাবে। বুযুর্গানে দ্বীন তারাও দুনিয়া পান, দুনিয়ার পরিমাণ না পাইলেও দুনিয়ার বরকত তাঁরা পান। দুনিয়া তাঁরা বর্জন করতে চান, দুনিয়া তাদের পেছনে ছুটে। আমরা দুনিয়ার পেছনে ছুটি, তাই দুনিয়া আমাদের থেকে সরে যায়। অনেক সময় দুনিয়া পাই কিন্তু ইজ্জতের সাথে পাই না, শান্তির সাথে পাই না, অশান্তির সাথে পাই। যাহোক গরীবদেরকে দান সদকা করে, তাদেরকে কিছু দিয়ে সহানুভূতি দেখানো হলে আল্লাহ পাক এই রমযান মাসে রিযিক বাড়িয়ে দিবেন। রমযান মাস সহানুভূতি দেখানোর মাস, রমযান মাস মু'মিনের রিযিক বর্ধিত হওয়ার মাস। আল্লাহ পাক আমাদেরকে কবুল করেন। আমীন!

## ৮নং বয়ান

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ. (الشيخان)

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

গতকাল বলা হয়েছিল রমযান হল সবরের মাস। সবরের অর্থ প্রতিশোধ না নেয়া, ইবাদতের উপরে অটল থাকা, গোনাহের দিকে ধাবিত না হওয়া এবং ইবাদতের উপরে অটল থাকা। মানুষ যেন ইবাদতের উপরে অটল থাকতে পারে এর ব্যবস্থাও আল্লাহ পাক করে দিয়েছেন। এ মাসে শয়তানকে বেঁধে রাখা হয়। যাতে শয়তান মানুষকে ওয়াছওয়াছা দিয়ে গোনাহের দিকে নিতে না পারে। মানুষ শয়তানের ওয়াছওয়াছাতেও গোনাহের দিকে যায়, নফছের ওয়াছওয়াছাতেও যায়। এই দুইটা অপশক্তি মানুষকে গোনাহের দিকে নেয়। এক দিকে শয়তান আরেক দিকে নফ্ছ। রমযানে এই দুইটা শক্তির একটাকে অর্থাৎ, শয়তানকে বেঁধে রাখা হয়, তাই রমযান মাসে ইবাদতের উপরে অটল থাকা খুবই সহজ। এই মাসে মানুষ ইবাদতের উপরে অটল থাকতে অভ্যস্ত হবে, আর এই অভ্যাসকে সারা বছর কাজে লাগাবে। আমরা এই একটা মাস অন্তত নফছের সাথে মোজাহাদা করে ইবাদতের উপরে অটল থাকি এবং এই

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.
Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

নিয়ত করে নেই যে, এখন যেরকম ইবাদতের উপরে আছি, সারা বছর যেন এভাবে থাকতে পারি। এখন যেমন জামা'আতের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ছি, সারা বছর যেন এরকম জামা'আতের সাথে নামায পড়তে পারি। আমরা অনেকেই জামা'আতের সাথে নামায পড়াকে খুব হালকা দৃষ্টিতে দেখি। অথচ এটা হালকা নয়। জামা'আতের সাথে নামায পড়া সুন্নাতে মুআক্কাদা, অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। অনেক উলামায়ে কেরাম বলেছেন ওয়াজিব। বিনা ওজরে জামা'আত ছেড়ে দিয়ে ঘরে নামায পড়লে গোনাহ হয়। যারা সর্বদা এরকম ওজর না থাকা সত্ত্বেও জামা'আতে না এসে ঘরে নামায পড়েন, জামা'আতে উপস্থিত হন না, তাদেরকে বলা হয় ফাসেক অর্থাৎ, শরীআতের অবাধ্য। খুব-ই শক্ত মাসআলা। তাই জামা'আতের সাথে সারা বছর নামায পড়ার পাকা নিয়ত করে নেই। হাদীছে এসেছে,

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ. (متفق عليه)

অর্থাৎ, এ হাদীছের এক ব্যাখ্যা এরূপ হতে পারে যে, নিয়ত মানুষকে আমলের দিকে পৌঁছায়।

আমি যেরকম নিয়ত করব, ওরকম আমল করতে পারব। নিয়ত-ই যদি না করি আমল আসবে কী ভাবে? আমরা পাকা-পোক্ত নিয়ত করে নেই যে, এখন যে অভ্যাস গড়ে উঠছে, এই অভ্যাসের উপর সারা বছর টিকে থাকব, সারা জীবন টিকে থাকব। ইবাদতের উপর অটল থাকা প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক বলেছেন,

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ.

অর্থাৎ, যারা ঈমান আনে এবং আমল শুরু করে আর ঈমান আমলের উপর অটল থাকে তাদের কোন ভয় নেই।

বোঝা গেল ঈমান-আমলের উপরে অটল না থাকলে ভয় আছে। কী ভয় আছে? দুনিয়াতেও বে-ঈমান হয়ে যাওয়ার, বে-আমল হয়ে যাওয়ার ভয় আছে। আমি এখন জামা'আতের সাথে নামায পড়ি, একদিন জামা'আতে আসলাম না, ঘরে নামায পড়ে নিলাম। আর সকলেরই জানা আছে যে, ঘরের নামায সুন্দর হয় না। ঘরে থেকে তো লামছাম নামায হয়, কোন রকম দায়সারা গোছের নামায হয়। এরকম দায়সারা গোছের নামায পড়তে গিয়ে একদিন সুন্নাত ছুটবে যে, কোন রকম ফরযটা পড়লেইতো হয়। এরপরে একদিন ফরযও কাযা হবে, আস্তে আস্তে পরে ফরয কাযা করাও ছেড়ে দিবে। এক সময় দেখা যাবে নামায-ই ছেড়ে দিয়েছে। তখন মনে আসবে যে, আমি তো আর নিয়মিত নামাযী নই, তাই দুই এক ওয়াক্ত ছুটলে আর কী হবে! ভবিষ্যতে ভাল করেই শুরু করব। এভাবে আস্তে আস্তে মানুষ বদ-আমল হয়ে যায়। আমল থেকে সরে যায়। আমল থেকে সরে গেলে ঈমানের উপর খারাপ আছর হয়, তার কলবের ভিতরে গোমরাহী এসে যায়। আল্লাহ পাক হেফাযত করেন। তাই বলা হয়েছে- যতটুকু ইবাদত আমরা শুরু করি, তার উপর যেন অটল থাকি। যতটুকু আগে বেড়েছি তার চেয়ে পিছনে না যাই। পিছনে যাওয়ার কোন অবকাশ নেই, বরং যতটুকু পারব, সামনে অগ্রসর হতে থাকব। শরীআতে ইবাদতের উপরে অটল থাকার অনেক মর্যাদা। আল্লাহ পাক আমাদেরকে তাওফীক নছীব করুন। আমীন!

## ৯নং বয়ান

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ فَطَّرَ فِيْهِ صَائِمًا كَانَ مَغْفِرَةً لِّذُنُوْبِهِ وَعِتْقَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، وَكَانَ لَهُ مِثْلُ اَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يُّنْقَصَ مِنْ اَجْرِهِ شَيْئٌ. (رواه ابن خزيمة برقم ١٨٨٧ وإسناده ضعيف)



মুসল্লিয়ানে কেরাম!

রমযান মাসে আল্লাহ পাক বেশি বেশি ছওয়াব অর্জন করার অনেক সুযোগ করে দিয়েছেন। তার ভিতর একটা সুযোগ হল– রাসূল (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফতার করাবে, ঐ রোযাদার রোযা রেখে যে পরিমাণ ছওয়াব পাবে, ইফতার করানেওয়ালা ঐ পরিমাণ-ই ছওয়াব পাবে। এতে রোযাদারের ছওয়াব কমানো হবে না'। আল্লাহর ভাণ্ডার থেকে ঐ সমপরিমাণ ছওয়াব ইফতার করানেওয়ালাকে দেয়া হবে। এক সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের সকলের কি ঐ সামর্থ আছে যে, আমরা ইফতার করাতে পারি? রাসূল (সা.) বললেন যে, একটা খেজুর যদি খাওয়াও কিংবা একটু পানি খাওয়াও, শরবত পান করাও, তবুও ইফতার করানোর ছওয়াব পেয়ে যাবে। রাসূল (সা.) আরও বললেন,

وَمَنْ اَسْقٰى صَائِمًا سَقَاهُ اللّٰهُ مِنْ حَوْضِىْ شَرْبَةً لَّايَظْمَأُ حَتّٰى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ. (رواه ابن خزيمة برقم ١٨٨٧ وإسناده ضعيف)

অর্থাৎ, কেউ যদি রোযাদারকে শুধু একটু পানিও পান করায়, এর ওছীলায় আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন আমার হাউজে কাউছার থেকে তাকে পান করাবেন। এই পানি পান করলে জান্নাতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত আর তার পিপাসা লাগবে না।

রাসূল (সা.) একথাও বলেছেন যে, রোযাদারকে ইফতার করালে এটা তার গোনাহ মাফের ওছীলা হবে এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তির ওছীলা হবে। দেখা গেল ইফতার করানো একটা ছোট্ট আমল, কিন্তু ছওয়াব অনেক বেশি। রোযা রাখার সমপরিমাণ ছওয়াব, গোনাহ মাফের ওছীলা হওয়া, জান্নাতে যাওয়ার ওছীলা হওয়া এবং হাউজে কাউছারের শরবত পাওয়ার ওছীলা হওয়া। এই একটা ছোট্ট আমলে এতগুলো ফযীলত রাখা হয়েছে। রোযাদারকে আমি আমার বাড়িতে ডেকেও ইফতার করাতে পারি, রোযাদারের বাড়িতে ইফতার পাঠিয়েও করাতে পারি। শুধু আমার বাড়িতে অনুষ্ঠান করতে হবে, দশজনকে ডেকে তারপর ইফতার করাতে হবে, এই আনুষ্ঠানিকতার কথা বলা হয়নি। ইফতার যে কোনভাবে করালেই হয়। সম্পূর্ণ ইফতার হোক অথবা ইফতারের অংশ হোক, সব ক্ষেত্রেই এই ফযীলত পাওয়া যাবে। এই ছোট্ট আমলটার যে ফযীলত, তা খাটো করে দেখার বিষয় নয়। এই একটা আমল-ই জাহান্নাম থেকে মুক্তির ওছীলা হতে পারে।

আল্লাহ তা'আলা বাহানা খুঁজতে থাকবেন মানুষকে কোন সূত্র ধরে নাজাত দিয়ে দেয়া যায় কি-না? দুনিয়াতে আমাদের স্বভাব হল একজনকে ধরার ক্লু খুঁজতে থাকি, একজনকে ধরার ফাঁক-ফোকড় খোঁজ করতে থাকি যে, কোন ফাঁক-ফোকড় দিয়ে একজনকে পাকড়াও করা যায় কি-না। কিন্তু আল্লাহর রহমত এর বিপরীত। আল্লাহর রহমত শুধু মুক্তি দেয়ার ওছীলা খুঁজতে থাকবে যে, কোন্ সূত্র ধরে একজনকে মুক্তি দেয়া যায়। ছোট্ট ছোট্ট একটা আমলও নাজাতের ওছীলা হতে পারে। তাই কোন ছোট আমলকে ছোট মনে না করা চাই।

শরীআতে বলা হয়েছে– কোন একটা সুন্নাত, একটা মুস্তাহাব, একটা আদনা মুস্তাহাবকেও আমরা তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখব না। এরকম মনে করব না যে, সামান্য আমল, এটা না করলে এমন কী? এই সামান্যটাই কিয়ামতের দিন অনেক বড় হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই কোন ছোট্ট আমলকেও তুচ্ছ মনে না করা চাই। এমনিভাবে কোন বড় আমল হলেও সেটার উপর ভরসা করে বসে না থাকা চাই। এরকম মনে না করা চাই যে, জীবনে দশ লাখ টাকা দান করেছি, দশ কোটি টাকার জনসেবা করেছি, আমার তো নাজাত নিশ্চিত। অন্য আমলে ত্রুটি থাকলেও অসুবিধা নেই। কোন বড় আমলের উপরেও এমন

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.
Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

ভরসা করে থাকা উচিত নয়। কারণ হতে পারে ঐ সব বড়-বড় আমলও কর্পুরের মত উড়ে যাবে। আল্লাহ পাক যদি বলেন বান্দা! তোমার তো ইখলাছ ছিল না। দুনিয়াতে সুনামের জন্য তুমি এসব করেছ। অতএব যার জন্য করেছ দুনিয়াতেই তা পেয়ে গেছ, এখন তোমার কিছুই পাওয়ার নেই। তাই বড় আমল করেও অহংকার না করা উচিৎ, কোন ছোট্ট আমলকেও তুচ্ছ না জানা উচিত। ব্যালেন্স রক্ষা করে চলতে হবে। বড় আমলও করতে হবে, ছোট আমলকেও অবহেলা করা যাবে না। হতে পারে কোন একটা ক্ষুদ্র আমলই আমার নাজাতের ওছীলা হয়ে দাঁড়াবে। আল্লাহ পাক আমাদের সহীহ বুঝ দান করুন। আমীন!

## ১০ নং বয়ান

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

**قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ اِلَّا الْجُوْعُ وَ رُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ اِلَّا السَّهْرُ.** (رواه ابن ماجة برقم ١٦٩٠وإسناده ضعيف)

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

রাসূল (সা.) হাদীছে বলেন, 'অনেক রোযাদার এমন আছে যে, রোযা রাখতে ক্ষুধায় যে কষ্ট হয় এই কষ্ট ছাড়া আর কোন ফায়দা তার হয় না, অর্থাৎ তার রোযা ব্যর্থ হয়ে যায়। এমনিভাবে অনেক নামাযী এমন আছে যে, রাত্র জাগরণ করে নামায পড়ে, তারাবীহ পড়ে, তাহাজ্জুদ পড়ে, ঘুম মেরে জেগে কষ্ট করা ছাড়া আর কোন ফায়দা তার হয় না। অর্থাৎ, তার তারাবীহ, তাহাজ্জুদ সব ব্যর্থ হয়ে যায়।

এ হাদীছের আলোকে অনেক রোযাদারের রোযা ব্যর্থ হয়ে যায়, অনেক তারাবীহ, তাহাজ্জুদ আদায় কারীর তারাবীহ, তাহাজ্জুদ ব্যর্থ হয়ে যায়। মুহাদ্দিছীনে কেরাম অন্যান্য অনেক হাদীছের আলোকে এই হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেছেন, 'ঐ সব রোযাদারের রোযা ব্যর্থ হয়ে যায়, যারা হালাল রিযিক দ্বারা রোযা না রাখে। অর্থাৎ, সেহরীতে কী খেল হালাল-হারাম বাছে না, ইফতারী কী দিয়ে করল হালাল-হারাম বাছে না। তাদের রোযা ব্যর্থ হয়ে যায়। এমনিভাবে যারা রোযা রেখে গীবত-শেকায়েত করে, পরের সমালোচনা করে, পর নিন্দা করে, তাদের রোযা ব্যর্থ হয়ে যায়। সারকথা যারা রোযা রেখে পাপও করতে থাকে তাদের রোযা ব্যর্থ হয়ে যায়। এইসব লোকের ক্ষুধার কষ্ট ছাড়া রোযা রেখে আর কোন ফায়দা হয় না। তারা রোযার ছওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। আর যারা তারাবীহ পড়ে, তাহাজ্জুদ পড়ে, নামায ইবাদত করে, কিন্তু ইখলাছের সাথে করে না, ইখলাছ থাকে না, আল্লাহকে রাজি-খুশি করার জন্যই আমি করছি এরকম সম্পূর্ণ খালেছ নিয়ত থাকে না, তাদের ছওয়াব থেকেও তারা বঞ্চিত হয়ে যায়। এভাবে রাত্র জাগরণ করে ঘুম মারাই তাদের সার হয়। রমযানের এক দশক চলে গেল– আমরা প্রত্যেকেই নিজের সম্পর্কে নিজে বিচার করতে পারব যে, আমি রোযা রাখছি আমার রোযা ব্যর্থ হচ্ছে না সফল হচ্ছে। আমার তারাবীহ, তাহাজ্জুদ যা আমি আদায় করছি, যা ইবাদত রমযানে করছি এর ছওয়াব আমি পাব কি পাব না, আমি কোন্ অবস্থায় আছি। এভাবে আমরা প্রত্যেকে নিজেরটা নিজে বিচার করতে পারি যে, আমি কি ব্যর্থ রোযাদার না সফল রোযাদার। আমার ইবাদতের ছওয়াব হচ্ছে, না ছওয়াব থেকে আমি বঞ্চিত হচ্ছি।

রমযান শেষ হয়ে যাচ্ছে, বিশেষভাবে রহমতের দশক আজ শেষ হয়ে যাচ্ছে। হাদীছের ঐ বাণী আমরা স্মরণ করি, যাতে রাসূল (সা.) বলেছেন, 'রমযান পেয়েও যে আল্লাহর কাছ থেকে রহমতের ফয়সালা করিয়ে নিতে পারল না, সে বড়ই হতভাগা'। রহমতের দশক আজ শেষ। সামনেও বাকী

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



দিনগুলোতে আল্লাহর রহমত বাকী থাকবে। তবে রহমতের বিশেষ সুযোগটা আজ শেষ হয়ে যাচ্ছে। এরপর থাকবে সাধারণ সুযোগ। বিশেষ সুযোগে আমরা রহমত পেয়েছি কি-না, বা পাব কি-না নিশ্চিত নই, তাই সারা রমযানই আল্লাহর কাছে রহমত পাওয়ার জন্য দু'আ ও মেহনত করতে হবে। আমি আল্লাহর রহমতের মোহতাজ, আল্লাহর রহমত আমার মোহতাজ নয়। আমি রহমতের মুখাপেক্ষী, আল্লাহর রহমত আমার মুখাপেক্ষী নয়। এরকম বিনয়ের মনোভাব নিয়ে আল্লাহর কাছে রহমত চাইতে থাকতে হবে। আল্লাহর রহমত থেকে যেন আমরা বঞ্চিত না হই। আল্লাহ পাক আমাদেরকে কবুল করেন। আমীন!

## ১১নং বয়ান

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

**قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَعُدَ مَنْ اَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ.....**

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

রমযানের দ্বিতীয় দশক শুরু হয়েছে। এটাকে মাগফিরাতের দশক বলা হয়। প্রথম দশক ছিল রহমতের দশক, দ্বিতীয় দশক মাগফিরাতের অর্থাৎ, ক্ষমা প্রাপ্তির দশক। আর শেষ দশক হল জাহান্নাম থেকে নাজাতের দশক। মাগফিরাতের দশক আজ শুরু হয়েছে। রমযানের এই দশকে আল্লাহ পাক তাঁর বান্দাদেরকে বিশেষভাবে ক্ষমা করে থাকেন। প্রথম দশকেও ক্ষমা করেন, শেষ দশকেও ক্ষমা করেন, তবে মধ্যের এই দশকে বিশেষভাবে ক্ষমা করেন। সেই বিশেষভাবে ক্ষমাপ্রাপ্তির দশক শুরু হয়েছে। এ সম্পর্কে একটা হাদীছে এসেছে একদিন রাসূল (সা.) মিম্বরে বয়ান করার জন্য উঠছিলেন। সাধারণত তিন স্তর বিশিষ্ট মিম্বর থাকে, রাসূল (সা)-এর মিম্বরও এরকম তিনটা স্তর বিশিষ্ট ছিল। রাসূল (সা.) একেবারে উপরের স্তরে বসতেন। যেহেতু রাসুল (সা.) উপরেরটায় বসতেন, তাই আমরা ওর থেকে একটু নীচে বসে থাকি। রাসূল (সা.) যখন মিম্বরের প্রথম ধাপে পা দিয়েছেন, তখন বলেছেন, 'আমীন'! আমীন অর্থ হে আল্লাহ! কবুল কর। কোন্ কথার উপরে রাসূল (সা.) আমীন বললেন, সাহাবায়ে কেরাম তা বুঝতে পারেননি। তারপর দ্বিতীয় ধাপে পা রেখেছেন, তখনও বলেছেন আমীন! তৃতীয় ধাপে যখন বসেছেন তখনও বলেছেন আমীন! এরপর রাসূল (সা.) বয়ান করলেন। বয়ান শেষে এক সাহাবী প্রশ্ন করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! আজকে আপনার মুখ থেকে একটা কথা শুনলাম যার অর্থ বুঝতে পারিনি। আপনি কীসের উপর আমীন বলেছেন? রাসূল (সা.) তখন বললেন, যখন আমি প্রথম ধাপে পা রেখেছি তখন জিব্রাঈল (আ.) আমার সামনে এসেছেন এবং বলেছেন,

**بَعُدَ مَنْ اَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ.** (رواه الطبراني في الكبير برقم ٣١٥ وقال الهيثمي : رجاله ثقات)

অর্থাৎ, রমযান পেয়েও যে তার মাগফিরাতের ফয়সালা করিয়ে নিতে পারল না, নিজের মাগফিরাত অর্থাৎ, ক্ষমা করিয়ে নিতে পারল না, সে বঞ্চিত হয়ে যাক, সে হতভাগা। আমি বলেছি আমীন। অর্থাৎ আল্লাহ তাই করুন! দ্বিতীয় ধাপে যখন পা রেখেছি, তখন জিব্রাঈল (আ.) বলেছেন,

**بَعُدَ مَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ.** (المصدر السابق)

অর্থাৎ, ঐ লোক আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হোক অর্থাৎ ঐ লোক হতভাগা, যার কাছে আপনার নাম নেয়া হল, তবুও সে আপনার উপরে দুরূদ পাঠ করল না।

বোঝা গেল রাসূল (সা.)-এর নাম যখন আমাদের সামনে আসে, তখন দুরূদ পাঠ করা ওয়াজিব। আমরা কথার মধ্যে "রাসূল" শব্দটা আসলে যে বলি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এটা হল খুব

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

সংক্ষিপ্ত দুরূদ। বয়ান করার মধ্যে, বয়ান শোনার মধ্যে, দ্বীনী কথা আলোচনা করার মধ্যে, দ্বীনী কথা শোনার মধ্যে, পারস্পরিক কথা-বার্তার মধ্যে যখনই "রাসূল" শব্দ আসে, বা "মুহাম্মাদ" শব্দ আসে বা "আহমদ" শব্দ আসে অর্থাৎ যে কোনভাবে নবীকে বোঝানো হয়, তখনই সাথে-সাথে দুরূদ শরীফ পড়ে নেয়া চাই। অর্থাৎ, অন্তত "সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম" এই সংক্ষিপ্ত দুরূদের অভ্যাস করে নেয়া চাই। তারপর রাসূল (সা.) বলেন, যখন আমি তৃতীয় ধাপে উঠেছি তখন জিব্রাঈল (আ.) বলেছেন,

بَعُدَ مَنْ اَدْرَكَ اَبَوَيْهِ الْكِبَرَ اَوْ اَحَدَهُمَا فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ. (المصدر السابق)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতা উভয়কে অথবা যেকোন একজনকে বৃদ্ধ অবস্থায় পেল; আর সে তাদের খেদমত করে, তাদেরকে খুশি করে জান্নাত কিনে নিতে পারল না, জান্নাত হাছিল করে নিতে পারল না, সেও হতভাগা হয়ে যাক। তখন আমি বলেছি আমীন। অর্থাৎ, তা-ই হোক।

বোঝা গেল পিতা-মাতার খেদমত করা, পিতা-মাতাকে খুশি করতে পারা, এটা জান্নাত হাছিল করার একটা বড় মাধ্যম। বৃদ্ধ বয়সের কথা এজন্য বলা হয়েছে যে, বৃদ্ধ বয়সে তাদের খেদমতের প্রয়োজন বেশি হয়। বৃদ্ধ বয়স না হলেও, পিতা-মাতাকে বয়সকালে পেলেও তাদের খেদমত করা এবং তাদেরকে খুশি রাখার মাধ্যমে জান্নাত অর্জন করা যাবে। আর বৃদ্ধ বয়সে তাদের খেদমতের প্রয়োজন বেশি হয়, পদে পদে প্রয়োজন হয়, তাই পদে পদে জান্নাত কিনে নেয়ার সুযোগ থেকে যায়। এতবড় সুযোগ পেয়েও যে সুযোগ হারাল সে হতভাগা নয় তো আর কে হতভাগা?

এ হাদীছে প্রথম নম্বর কথা হল মাগফিরাতের দশক পেয়েও যদি আমরা মাগফিরাত করিয়ে নিতে না পারি, তাহলে আল্লাহ না করুক আমরা এই বদ-দু'আর তলে পড়ে যেতে পারি। রাসূল (সা.)-এর নাম যখন আসবে তখন আমরা সব সময় দুরূদ পড়ার অভ্যাস করে নিব। যাদের পিতা-মাতা বেঁচে আছেন, পিতা-মাতার খেদমত করে, তাদেরকে খুশি করে সহজে জান্নাত কিনে নেয়ার পন্থা অবলম্বন করব।

যাদের পিতা-মাতা দুনিয়া থেকে চলে গেছেন, তাদের জীবদ্দশায় যদি তাদেরকে খুশি করতে পেরে, থাকিও, তবুও তাদের জন্য দু'আ দুরূদ করতে থাকব। তাদের উদ্দেশ্যে দান-সদকা করতে থাকব। তাতে তারা আরও বেশি খুশি হবেন। আর যদি তাদের জীবদ্দশায় তাদেরকে খেদমত করে খুশি করতে না পেরে থাকি, তাহলে তাদের মৃত্যুর পর তাদের খুশি করার একটাই মাধ্যম রয়ে গেছে। এখন তো আর তাদের শারীরিক খেদমত করা সম্ভব নয়, এখন তো আর তাদের ফাই-ফরমাস মানা সম্ভব নয়, এখন তাদেরকে খুশি করার একটাই উপায় রয়ে গেছে, সেটা হল তাদের জন্য দু'আ করতে থাকা, আর তাদের জন্য ঈছালে ছওয়াব করতে থাকা। "ঈছালে ছওয়াব" কথাটার অর্থ হল ছওয়াব পৌঁছে দেয়া। আমরা যখন নফল নামায পড়ব, তাদের নিয়তে পড়ব এই ছওয়াব যেন তাদের হয়ে যায় এরকম নিয়তে পড়ব। নফল ইবাদত যা করব, দান সদকা যা করব, সব ক্ষেত্রে এই নিয়তে করব যে, এর ছওয়াব যেন তাদের আমলনামায় পৌঁছে যায়। আল্লাহ পাক আমাকেও ছওয়াব দিবেন, তাদেরকেও দিবেন, ভাগা-ভাগি করে দিবেন না। পূর্বে একদিন বলেছিলাম আল্লাহর ভাণ্ডারে এত কমী নেই যে, ভাগ করে দিতে হবে। আল্লাহ পাক প্রত্যেককেই পুরো পরিমাণ দিতে পারেন। আমি তাদের উদ্দেশ্যে করব, আমার ছওয়াব আমার পুরোপুরি থাকবে, মাঝখান থেকে ঐ পরিমাণ ছওয়াব তাদেরও হয়ে যাবে। এভাবে তাদের জন্য দু'আ করে এবং ঈছালে ছওয়াব করে তাদেরকে খুশি করা যাবে। মৃত্যুর পর তাদেরকে খুশি করার এই একটাই উপায়। আমরা এটা করতে থাকি। আল্লাহ পাক আমাদেরকে কবুল করুন। আমীন!

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com



## ১২নং বয়ান

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

মাগফিরাতের দশক চলছে। মাগফিরাত বা ক্ষমা পাওয়ার দশক চলছে। ক্ষমা পাওয়ার জন্য খাঁটি তওবা হওয়া জরুরী। খাঁটি তওবা না হলে আল্লাহ পাকের কাছে গোনাহ মাফ হয় না। খাঁটি তওবা হওয়ার জন্য বা তওবা খাঁটি হওয়ার জন্য আমাদের চারটা কাজ করণীয়। এই চারটা কাজ করলে আমাদের তওবা হবে খাঁটি তওবা। এরকম খাঁটি তওবাকে বলা হয় "তাওবাতুন্নাসূহা"। কুরআনে কারীমে আমাদেরকে ওরকম তওবা করার হুকুম দেয়া হয়েছে।

**এক নম্বর শর্ত হল–** আমার দ্বারা যত গোনাহ্ হয়েছে, এই গোনাহের জন্য মনে মনে অনুতপ্ত হতে হবে। আমার দ্বারা অপরাধ হয়েছে, এই অপরাধ বোধ আমার ভিতর আসতে হবে। শুধু হলকুমের উপর থেকে বললাম যে, হে আল্লাহ! মাফ করে দাও! ভিতরে ভিতরে অনুতপ্ত হলাম না, মনের মধ্যে সেই অনুভূতি নিয়ে আল্লাহর কাছে বললাম না, তাহলে মাফ হবে না। মোটকথা নিজের কৃত গোনাহের জন্য অনুতপ্ত হতে হবে। এটা হল এক নম্বর শর্ত।

**দ্বিতীয় নম্বর শর্ত হল–** ঐ গোনাহ এখনই বর্জন করতে হবে। গোনাহও করতে থাকব, আর মাফও চাইতে থাকব, তাহলে মাফ হওয়ার আশা দুর্বল হয়ে যায়। আমি যদি নেশা করতে অভ্যস্ত হই, তাহলে এখন-ই নেশা ছেড়ে দিয়ে তওবা করতে হবে। আমি যদি অশ্লীল ছায়াছবি দেখতে অভ্যস্ত থাকি, এখনই ছেড়ে দিয়ে তওবা করতে হবে। এমনিভাবে যে গোনাহের জন্য আমি তওবা করব ঐ গোনাহ এখনই বর্জন করতে হবে। আর তওবা করতে থাকতে হবে।

**তৃতীয় নম্বর শর্ত হল–** ঐ গোনাহ ভবিষ্যতে আর করব না, মনে মনে এরকম পাকাপোক্ত নিয়ত করে নিতে হবে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে, সামনে ঐ গোনাহ আমি আর করব না। হতে পারে আমার দ্বারা ঐ গোনাহ আবার হয়ে যাবে, কিন্তু মনের ইরাদা এই রাখতে হবে যে, ঐ গোনাহ আমি আর করব না। এখন তওবা করলাম, ছেড়ে দিলাম, সামনে আর করব না।

**চতুর্থ নম্বর শর্ত হল–** কোন বান্দার হক যদি আমি নষ্ট করে থাকি, কারও অর্থ অন্যায় ভাবে আত্মসাৎ করে থাকি, কারও জমি-জমা অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করে নিয়ে থাকি, এভাবে যেকোন মানুষের যেকোন হক যদি আমি নষ্ট করে থাকি, এই হক তার কাছে পৌঁছে দিতে হবে। এই মুহূর্তে পৌঁছে দেয়া সম্ভব না হলেও সামনে যখনই সুযোগ হবে, পৌঁছে দেয়ার নিয়ত রাখতে হবে।

অনেক সময় এরকম হয়ে যায় যে, অতীতে কোন একজন মানুষের টাকা-পয়সা বা কিছু নিয়েছি, এখন আর তার কোন সন্ধান পাচ্ছি না, তার আপনজনের সন্ধানও পাচ্ছি না, এখন এটা তার কাছে কীভাবে পৌঁছাব? যদি তার আপনজন ওয়ারিছের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহলে তো তাদেরকেই সেটা দিয়ে দিতে হবে, তাদের কাছেই সেটা পৌঁছে দিতে হবে। যদি এরকম কারও সন্ধান না পাওয়া যায়, তবুও বলা হয়েছে যথাসাধ্য তালাশ করার পরে না পাওয়া গেলে ঐ পরিমাণ অর্থ তার নামে দান করে দিতে হবে। কিয়ামতের দিন যখন সে ঐ দানের ছওয়াব পাবে, তখন নিজের হকের দাবি ছেড়ে দিবে এই ভেবে যে, আমি তো অনেক পেয়েছি, দুনিয়াতে পেলে আমার তেমন কিছুই হত না। এখন এমন মুহূর্তে পেয়েছি, যখন আমার খুব দরকার! এই ভেবে সে খুশি হয়ে নিজের হকের দাবি ছেড়ে দিবে। এভাবে চারটা শর্ত পূর্ণ করা হলে তখন হবে খাঁটি তওবা। আরবীতে খাঁটি তওবাকে বলা হয় توبة نصوحا (তাওবাতুন্নাসূহা)।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

কুরআনে কারীমে আল্লাহ পাক আমাদেরকে ঐ হুকুম-ই দিয়েছেন যে, হে মু'মিনরা! তোমরা তাওবাতুন্নাসূহা কর, খাঁটি তওবা কর। খাঁটি তওবা বলতে এই ব্যাখ্যা বোঝায়, যে ব্যাখ্যা এতক্ষণ করা হল। আল্লাহ পাক আমাদেরকে সহীহভাবে খাঁটি তওবা করার তাওফীক নছীব করুন। আমীন!

## ১৩ নং বয়ান

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَلّٰهُ اَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهٖ. الحديث.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

মাগফিরাতের দশক চলছে, আল্লাহর কাছে বেশি বেশি করে ক্ষমা চাওয়া দরকার। নতুন-পুরাতন সব ধরনের গোনাহের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া দরকার। এরকম নয় যে, অতীতে যে সব গোনাহ হয়ে গেছে তার জন্য বহুবার মাফ চেয়েছি, এখন আর তার জন্য মাফ চাওয়ার প্রয়োজন নেই। বরং তার জন্যেও মাফ চাওয়া দরকার। গোনাহ স্মরণ করে যতবেশি তওবা করা যায়, যতবেশি মাফ চাওয়া যায়, আল্লাহ তা'আলা ততবেশি খুশি হন।

গোনাহের জন্য মাফ চাওয়া, এটাও একটা স্বতন্ত্র আমল। নামায পড়লে আল্লাহ খুশি হন, রোযা রাখলে আল্লাহ খুশি হন, ইবাদত-বন্দেগী করলে আল্লাহ খুশি হন, এমনিভাবে যেকোন আমল করলে আল্লাহ খুশি হন। তদ্রূপ গোনাহের জন্য মাফ চাইলেও আল্লাহ খুশি হন। যতবেশী মাফ চাওয়া যায় ততবেশি আল্লাহ খুশি হন যে, বান্দা আমার কাছে নতি স্বীকার করছে। বান্দার নতি স্বীকার করা, বান্দার নত হওয়াকে আল্লাহ খুব বেশি পছন্দ করেন। বান্দা অহংকার করবে, মাথা উঁচু করবে, আল্লাহ এটা অপছন্দ করেন। আর বান্দা যত নত হবে, আল্লাহর কাছে যত কাকুতি-মিনতি করবে, যত দ্বীনতা-হীনতা প্রকাশ করবে, তত আল্লাহ বেশি খুশি হবেন। হাদীছে তাই রাসূল (সা.) বলছেন,

لَلّٰهُ اَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهٖ. (رياض الصالحين)

অর্থাৎ, আল্লাহ অবশ্যই খুব বেশি খুশি হন বান্দার তওবা করাতে, অর্থাৎ বান্দার মাফ চাওয়াতে।

বান্দাহ তওবা করলে আল্লাহ তা'আলা খুশি হন। রাসূল (সা.)-এর একটা উদাহরণ তুলে ধরেছেন। উদাহরণটা হল– রাসূল (সা.) বলেন, কোন একজন মানুষ একটা উটের পিঠে চড়ে মরুভূমি দিয়ে যাচ্ছিলেন। তার সাথে আর কেউ নেই। সাথে আছে শুধু একটা উট। ঐ উটের পিঠে রয়েছে তার খাদ্য-পানি ও সবকিছু। লোকটা মরুভূমির ভিতর দিয়ে চলছে। তখন সে মনে করল অনেকক্ষণ ঘুমাইনি, একটু ঘুমিয়ে নেই। সে ঐ গাছের সাথে তার উটকে বেঁধে; গাছের ছায়ায় ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম থেকে উঠে দেখে তার উট সেখানে নেই। তখন সে ভাবছে, নির্ঘাত আমাকে মরতে হবে! আমার বাঁচার কোন উপায় নেই। মরুভূমির ভিতরে পানি নেই, কিছুক্ষণের মধ্যেই পিপাসা লাগবে, সেই পিপাসায় মরে যেতে হবে। আর মরুভূমির ভিতরে না জানি কত মাইল পথ আমাকে হাঁটতে হবে। হাঁটতেও পারব না, কোন বাহনও নেই, অগত্যা আমার মরণ অনিবার্য। এই দুশ্চিন্তায় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে আবার তার ঘুম এসে গেল। তারপর ঘুম থেকে চোখ মেলে দেখে তার উটটা সেখানে দাঁড়ানো রয়েছে। তাহলে সে এত খুশি হবে যে, আল্লাহর শোকর স্বরূপ খুশিতে তার বলার কথা যে, হে আল্লাহ! তুমি আমার খোদা, আমি যে তোমার বান্দা! এ না বলে খুশির চোটে সে বলে ফেলল, اَنْتَ عَبْدِيْ وَاَنَا رَبُّكَ অর্থাৎ 'তুমি আমার বান্দা, আমি তোমার খোদা'! খুশির চোটে হুশ হারা হয়ে সে এমন উল্টো বলে ফেলল। এই উদাহরণ তুলে ধরে রাসূল (সা.) বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা বান্দার তওবা দ্বারা এর চেয়ে

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



বেশি খুশি হন। আল্লাহর কাছে নত হয়ে মাফ চাইলে আল্লাহ খুশিতে বাগ বাগ হয়ে যান'। তাই নতুন-পুরাতন সব ধরনের গোনাহের কথা স্মরণ করে আল্লাহর কাছে বেশি বেশি মাফ চাওয়া দরকার। আল্লাহ পাক আমাদেরকে কবুল করুন। আমীন!

## ১৪ নং বয়ান

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ غَفَرَ غُفِرَ لَهٗ.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

মাগফিরাতের দশক চলছে। আল্লাহর কাছে মাগফিরাত বা ক্ষমা পাওয়ার জন্য তওবা-এস্তেগফারের সাথে সাথে আরও তিনটা আমলের কথা বলা হয়েছে। একটা আমল যেটা শুধু রমযান নয় সব সময়-ই চলবে, সেটা হল অন্যকে ক্ষমা করা। হাদীছে বলা হয়েছে, مَنْ غَفَرَ غُفِرَ لَهٗ অর্থাৎ, যে অন্যকে ক্ষমা করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করবেন। আমরা যদি মানুষের ভুল-ত্রুটি, অন্যায়-অপরাধ ক্ষমা করি, আল্লাহ পাকও আমাদের ভুল-ত্রুটি, অন্যায়-অপরাধ ক্ষমা করবেন। আমরা অনেকবার আলোচনা করেছি, আল্লাহর বান্দার সাথে আমাদের মোয়ামালা বা আচরণ যেমন হবে আমার সাথেও আল্লাহ তা'আলা ওরকম আচরণ করবেন। আমরা যদি মানুষের দোষ-ত্রুটি গোপন করে রাখি, আল্লাহ তা'আলাও আমাদের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। হাদীছে এসেছে,

مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ. (رواه ابو نعيم. كذا فى كشف الخفاء)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ-ত্রুটি গোপন করে, আল্লাহ্ও দুনিয়া-আখেরাতে তার দোষ গোপন রাখেন। অর্থাৎ, আমরা যদি কোন মুসলমানের দোষ-ত্রুটি জেনেও সেটা প্রকাশ না করি, তাহলে আল্লাহ পাকও আমাদের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। আমরা এমন অনেক অপরাধ করি, এমন অনেক দোষ করি, যা দুনিয়ার মানুষ জানে না, শুধু আমরা নিজেরাই জানি। কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষের সামনে যদি সেগুলো প্রকাশ করে দেয়া হয়, তাহলে আমাদের শরমের শেষ থাকবে না। এর থেকে বাঁচার উপায় হল দুনিয়ায় মানুষের দোষ জেনেও সেটাকে ঢেকে রাখা। তাহলে আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন আমাদের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখবেন। এভাবে মানুষকে আমি মাফ করলে আল্লাহ পাকও আমাকে মাফ করবেন। মাফ পাওয়ার এই একটা আমল। এটা রমযান গায়রে রমযান সব সময়ই চলবে। রমযানে বিশেষভাবে আর দুটো আমলের কথা বলা হয়েছে,

مَنْ فَطَّرَ فِيْهِ صَائِمًا كَانَ مَغْفِرَةً لِّذُنُوْبِهٖ. (رواه ابن خزيمة برقم ١٨٨٧ وإسناده ضعيف)

অর্থা, কোন রোযাদারকে ইফতার করালেও আল্লাহ পাক এই ওছীলায় ক্ষমা করবেন। মাফ পাওয়ার জন্য এটা রমযানের বিশেষ আমল। আরেকটা আমল হাদীছে বলা হয়েছে,

مَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوْكِهٖ فِيْهِ غَفَرَ اللّٰهُ لَهٗ. (رواه ابن خزيمة برقم ١٨٨٧ وإسناده ضعيف)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি রমযান মাসে অধীনস্থ চাকর-চাকরাণী এবং অধীনস্ত কর্মচারীদের কাজের বোঝা হালকা করবে, আল্লাহ পাকও তার গোনাহের বোঝা হালকা করবেন, অর্থাৎ তাকে গোনাহ থেকে মুক্তি দিবেন। এটাও রমযানে মাগফিরাত লাভ করার একটা বিশেষ আমল। অতএব ক্ষমা পাওয়ার জন্য তওবা এস্তেগফারের সাথে-সাথে আমরা এই তিনটা আমলও জারি রাখি– অন্যকে ক্ষমা করা, ইফতার করানো এবং অধীনস্থদের কাজের বোঝা হালকা করা। আল্লাহ পাক আমাদেরকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

## ১৫ নং বয়ান

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ فَزِعَ إِلَى الصَّلٰوةِ.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

মাগফিরাতের দশক চলছে। আল্লাহর কাছে মাগফিরাত বা ক্ষমা পাওয়ার জন্য আমাদের তওবা এস্তেগফার করতে হবে। ক্ষমা পাওয়ার যেসব ওছীলা রয়েছে যেমন– অন্যকে ক্ষমা করা, অধীনস্থদের কাজের বোঝা হালকা করা, মানুষকে ইফতার করানো, এগুলো সম্পর্কেও গতকাল আলোচনা করা হয়েছে। ক্ষমা পাওয়ার জন্য বিশেষ আরও একটি আমল রয়েছে। সেটা হল সালাতুত তাওবা অর্থাৎ, তওবার নামায। কারও থেকে বিশেষ কোন গোনাহ হয়ে গেলে পাক-পবিত্র হয়ে দুই রাকআত তওবার নামায পড়ে ঐ নামাযের ওছীলায় আল্লাহর কাছে মাফ চাইলে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দেন। এই নামাযকে বলা হয় তওবার নামায। আরবীতে বলা হয় সালাতুত তাওবা। আল্লাহর কাছে বিশেষ কোন গোনাহ থেকে মাফ চাওয়ার জন্য এই নামাযের নিয়ম রাখা হয়েছে। ইসলামে সব সমস্যার জন্য নামায রয়েছে। রাসূল (সা.) সম্পর্কে হাদীছে এসেছে,

كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى. (رواه ابو داؤد في سننه برقم ١٣٢١ والحديث صحيح)

অর্থাৎ, রাসূল (সা.)-এর সামনে যেকোন সমস্যা আসলে তিনি দৌড়ে গিয়ে নামাযে দাঁড়াতেন।

এটা ছিল সালাতুল হাজত বা প্রয়োজনের নামায। যেকোন ঠেকা বা যেকোন প্রয়োজন সামনে আসলে এই নামায পড়তে হয়, মানুষের কাছে ঠেকা-প্রয়োজন হোক বা আল্লাহর কাছে ঠেকা-প্রয়োজন হোক, যেকোন রকম ঠেকা-প্রয়োজন সামনে আসলে রাসূল (সা.) এই সালাতুল হাজত নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন এবং দুই রাকআত সালাতুল হাজত পড়ে আল্লাহর কাছে প্রয়োজন পূর্ণ হওয়ার জন্য দু'আ করতেন। সমস্যার সমাধানের জন্য মানুষের কাছে না দৌড়ে, তিনি আল্লাহর কাছে দৌড়াতেন। এটা হল নামাযের মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করার যিন্দেগী। এভাবে নামাযের মাধ্যমে তিনি সব সমস্যার সমাধান করতেন। আগে নামায হবে এর পরে চেষ্টা হবে। একথা নয় যে, নামায পড়েই বসে থাকব। আমার ঘরে খাবার নেই, শুধু নামায পড়েই বসে থাকলাম, রুজী করার জন্য বের হলাম না, এরকম নয়। আগে নামায এরপরে মেহনত বা চেষ্টা। মেহনত বা চেষ্টা যেটা করা হবে সেটা ফলদায়ক হবে কি-না? তা আল্লাহর মর্জির উপর নির্ভর করছে। তাই আগে নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর মর্জি টেনে নিতে হবে।

যেকোন কাজে আল্লাহ পাকের মর্জি হয়ে গেলে ঐ কাজ আছান হয়ে যায়। তাই সব কাজে আমরা আল্লাহর মর্জি চেয়ে নেই। সালাতুল হাজতের অভ্যাস গড়ে তুলি। গোনাহ থেকে মাফ পাওয়ার জন্য সালাতুত তাওবা বা তওবার নামাযের উপরে আমল শুরু করি।

সালাতুত তাওবা দুই রাকআত। যে কোন সূরা দিয়ে পড়া যায়। এমনিভাবে সালাতুল হাজতও দুই রাকআত, যেকোন সূরা দিয়ে পড়া যায়। আল্লাহ পাক আমাদেরকে আমল করার তাওফীক দিন। আমীন!

## ১৬ নং বয়ান

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اِسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

মাগফিরাতের দশক চলছে। মাগফিরাত বা ক্ষমা পাওয়ার জন্য অনেকগুলো আমলের কথা ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। আরও একটা বিশেষ আমলের কথা হাদীছে এসেছে। বুখারী শরীফের হাদীছে

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



মাগফিরাত পাওয়ার জন্য, আল্লাহর কাছে ক্ষমা পাওয়ার জন্য সব সময় একটা আমল জারী রাখার কথা বলা হয়েছে। শুধু রমযানে নয়, রমযান-গায়রে রমযান সব সময়-ই রাসূল (সা.) এই আমলটা করতেন। রাসূল (সা.) নিষ্পাপ ছিলেন। মাগফিরাতের জন্য তাঁর কোন আমলের প্রয়োজন ছিল না। মানুষকে শিক্ষা দেয়ার জন্য, আমাদেরকে শিক্ষা দেয়ার জন্যই তিনি এই আমলটা করতেন। আমলটা হল সাইয়্যেদুল এস্তেগফারের আমল। সাইয়্যেদুল এস্তেগফার অর্থাৎ এস্তেগফারের সরদার। আল্লাহর কাছে এস্তেগফারের যত বাক্য হতে পারে, তার ভিতরে এই কতকগুলো বাক্যকে সরদার বলা হয়েছে। তাই এগুলোকে সাইয়্যেদুল এস্তেগফার বলা হয়। সকাল-বিকাল ফজরের নামাযের পরে, মাগরিবের নামাযের পরে কেউ এই সাইয়্যেদুল এস্তেগফার পাঠ করলে তার সারা দিন রাতের সমস্ত গোনাহ মাফ হয়ে যায়। আল্লাহর কাছে মাফ চাওয়ার এই বাক্যগুলো যদি কায়মনোবাক্যে পাঠ করা হয়, তাহলে আল্লাহ পাক সমস্ত দিবা-রাত্রের পাপ ক্ষমা করে দিবেন এবং হাদীছে আরও এসেছে ঐ দিন রাতে তার ইন্তেকাল হলে এই সাইয়্যেদুল এস্তেগফারের ওছীলায় তার জান্নাত লাভ হয়ে যেতে পারে। সাইয়্যেদুল এস্তেগফার হল–

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَاَنَا عَبْدُكَ، وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِيْ، فَاغْفِرْلِيْ، فَاِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ. (صحيح البخاري ٦٣٠٦)

বাক্যগুলো একটু লম্বা চওড়া মনে হচ্ছে। আমল করতে থাকলে আস্তে আস্তে মুখস্থ হয়ে যাবে। আহকামে যিন্দেগীতে এই এস্তেগফারের বাক্য লিখে দেয়া আছে। "সকাল-সন্ধ্যার বিশেষ কয়েকটি আমল" এই শিরোনামে সাইয়্যেদুল এস্তেগফার লিখে দেয়া আছে। যাদের বয়স বেশি হয়েছে, তাদের মুখস্থ করতে কষ্ট হয়। তাদের জন্য মুখস্থ করার একটা সহজ উপায় আছে। তাহল এই অংশটুকু ফটোকপি করে পকেটে রেখে দিবেন, সকালে সন্ধ্যায় দেখে দেখে পড়তে থাকবেন, একমাস, দুই মাস পড়তে থাকলে আস্তে আস্তে মুখস্থ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। এই সাইয়্যেদুল এস্তেগফারের আমল রমযান-গায়রে রমযান সব সময়ই জারী রাখতে হবে। মানুষের গোনাহ সব সময় হতে থাকে, সব সময় আল্লাহর কাছে মাফ চাইতে থাকতে হবে। আর মাফ পাওয়ার একটা বিশেষ আমল হল সাইয়্যেদুল এস্তেগফার। আল্লাহ পাক আমাদেরকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

## ১৭ নং বয়ান

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا اَكْرَمَ شَابٌّ شَيْخًا لِسِنِّهِ، اِلَّا قَيَّضَ اللّٰهُ لَهُ مَنْ يُّكْرِمُهُ عِنْدَ سِنِّهِ هٰذَا. (رواه الترمذي برقم ٢٠٢٢ وقال : حديث غريب)

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

মাগফিরাতের দশক প্রায় শেষ হওয়ার দিকে। রাসূল (সা.)-এর ঐ হাদীছটা আমরা স্মরণ করি। রমযান পেয়েও যারা নিজেদের ক্ষমা করিয়ে নিতে পারল না, তারা বড়ই হতভাগা! নিজেদের ক্ষমার ব্যবস্থা নিজেদের-ই করে নিতে হবে। আমরা আমাদের ক্ষমার জন্য আল্লাহর কাছে চাইতে পারি, দু'আ করতে পারি, আমল করতে পারি, তওবা এস্তেগফার করতে পারি। কিন্তু আমাদের আপনজন, আমাদের মাতা-পিতা, ভাই-বোন ইত্যাদি যারা দুনিয়া থেকে চলে গেছেন, তাদের প্রতি আমাদের হক রয়েছে, তারা নিজেদের ক্ষমার জন্য দু'আ, আমল ইত্যাদি করতে পারবে না, তাদের ক্ষমার জন্য এগুলো করার

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

দায়িত্ব আমাদের। আপনজন যদি জেলে আটকা পড়ে, তখন তাদের ছাড়ানোর দায়িত্ব থাকে যারা বাইরে থাকে তাদের। কোন পাওনাদারের কারণে যদি তারা জেলে আটকা পড়ে, তাহলে যারা বাইরে থাকে তাদের সে পাওনা পরিশোধ করে তাকে ছাড়ানোর ব্যবস্থা করার নৈতিক দায়িত্ব এসে যায়। এরকম অবস্থায় জেলে আটক লোকেরা বাইরের আপনজনের দিকে তাকিয়ে থাকে। ঠিক যারা জাহান্নামের কয়েদী তাদেরও এরকমই অবস্থা। তারা তাকিয়ে থাকে দুনিয়ার আপনজনের দিকে যে, তারা তাদের মুক্তির কোন ব্যবস্থা করে কি-না। তাই আপনজনের মুক্তির ব্যবস্থা করার নৈতিক দায়িত্ব আমাদের। যারা দুনিয়া থেকে চলে যান, তাদের ক্ষমার ব্যবস্থা হল যদি তাদের কোন অনাদায়ী ইবাদত থাকে, যেমন কিছু নামায পড়তে বাকি ছিল, সেই ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা করা। অর্থাৎ, সেই অনাদায়ী নামাযের ফিদইয়া বা ফিতরা দিয়ে দেয়া। যদি হজ্জ অনাদায়ী থাকে, তাহলে বদলী হজ্জ করানোর ব্যবস্থা করতে হবে। যদি মাইয়্যেত ওছিয়াত করে যেয়ে থাকেন, আর তার সম্পদও রেখে যেয়ে থাকেন, তাহলে সন্তানদের উপরে বদলী হজ্জ করানো ওয়াজিব হয়ে যায়। যদি ওছিয়াত নাও করে যেয়ে থাকেন, তবুও সন্তানদের নৈতিক কর্তব্য হল তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করার জন্য তাদের বদলী হজ্জ করানো। এমনিভাবে তাদের ঋণ থাকলে পরিশোধ করে দেয়া। যেটার যেরকম ব্যবস্থা করার নিয়ম শরীআতে আছে, সেভাবে করতে হবে। এভাবে তাদের ক্ষমার জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে, সাথে সাথে দু'আও করতে হবে।

মাইয়্যেত আমাদের জন্য অনেক কিছু রেখে যান- টাকা-পয়সা, ধন-দৌলত রেখে যান, যদি সরাসরি ধন-দৌলত নাও রেখে যান আমাদেরকে যে লালন-পালন করে বড় করেছেন, শিক্ষা দিয়েছেন এটাও তো কম রেখে যাওয়া নয়। তাদের এই শিক্ষা দেয়ার ফলেই তো আমরা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছি, ধন-সম্পদ উপার্জন করছি। কাজেই এটাও আমাদের জন্য তাদের কম রেখে যাওয়া নয়। মাইয়্যেত কবরে বসে বলতে থাকে–

تو توانگر گشتی از مال ما + ایں زماں غافل شدی از حال ما

অর্থাৎ, আমার সবকিছু নিয়েই তো বড় হয়েছ। আমার সব ধন-সম্পদ নিয়েই তো তুমি স্বচ্ছল হয়েছ। অথচ আমি আজ কোন্ অবস্থায় আছি সে কথা থেকে তুমি গাফেল হয়ে আছ। মাইয়্যেত তার আপনজনদের উদ্দেশ্যে এরকম আফসোস করতে থাকে। আল্লাহ পাক যেন তাদেরকে আফসোসের ভিতর না রাখেন। আমরা মাইয়্যেতের জন্য, আপনজনদের জন্য মুক্তির ব্যবস্থা করব, তাহলে আমাদের চলে যাওয়ার পরেও আমাদের উত্তরসূরীরা আমাদের জন্য করবে। আমরা আমাদের পূর্বসূরীদের জন্য করব, তাহলে আমাদের উত্তরসূরিরাও আমাদের জন্য করবে। উর্দূতে বলা হয়,

جیسے کرنی ویسے بھرنی

অর্থাৎ, যেমন করবে তেমন ফল পাবে।

আমরা যেমন করব তেমনই পাব। আমরা পিতা-মাতার খেদমত করলে সন্তানের খেদমত পাব। আমরা পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাদের জন্য করলে আমাদের সন্তানরাও আমাদের মৃত্যুর পর আমাদের জন্য করবে। শুধু মাতা-পিতার জন্য কেন হাদীছে বলা হয়েছে,

مَا اَكْرَمَ شَابٌّ شَيْخًا لِّسِنِّهٖ، اِلَّا قَيَّضَ اللّٰهُ لَهٗ مَنْ يُّكْرِمُهٗ عِنْدَ سِنِّهٖ هٰذَا. (رواه الترمذي برقم ٢٠٢٢ وقال : حديث غريب)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কোন বৃদ্ধকে খাতির যত্ন করবে, সে বৃদ্ধ অবস্থায় উপনীত হলে আল্লাহ পাক সেই বয়সে তার খাতির যত্ন করার জন্য লোক নিযুক্ত করে দিবেন। আল্লাহ পাক আমাদেরকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com



## ১৮ নং বয়ান

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

আল্লাহ পাক কুরআন শরীফে এই রমযানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন, 'রমযানের উদ্দেশ্য হল পরহেযগারী অর্জন করা'। পরহেযগারীর জীবন অবলম্বন করা, গোনাহ মুক্ত জীবনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা। রমযানে গোনাহ মুক্ত থাকার যে প্রশিক্ষণ নেয়া হবে, এই প্রশিক্ষণ গায়রে রমযানেও চলতে থাকবে। বছরের অন্য সময়েও চলতে থাকবে। রমযানে গোনাহ মুক্ত থাকার যে সূচনা করা হবে, এর ধারা সারা বছর অব্যাহত থাকবে। একথা নয় যে, রমযানে গোনাহ মাফ চেয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে গেলাম, রমযান গেলে আবার আগের মত যেই সেই হয়ে গেলাম। তাহলে রমযানের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। এখন রমযানের ওছীলায় শয়তান আবদ্ধ আছে, এই ওছীলায় এবং নেক আমলের পরিবেশের ওছীলায় অনেক ধরনের গোনাহ থেকে আমরা মুক্ত থাকতে পারছি। সারা বছর যেন এরকম থাকতে পারি, মনের সাথে এরকম পাকা-পোক্ত নিয়ত করে নিতে হবে। মানুষ এক সাথে সব গোনাহ বর্জন করতে পারে না, আস্তে-আস্তে বর্জন করার অভ্যাস করতে হয়। যেমন কেউ নেশায় অভ্যস্ত, তাহলে একদিনে সে পুরো নেশা ছাড়তে পারে না। আস্তে-আস্তে ছাড়ার অভ্যাস গড়তে হয়। গোনাহের প্রতিও মানুষের নেশা আছে, গোনাহের প্রতিও একটা আকর্ষণ বা টান থাকে, আকর্ষণ এবং টানে মানুষ গোনাহের দিকে ছুটে যায়। তাই গোনাহের নেশা ছাড়তে গেলেও, গোনাহ মুক্ত জীবন যাপন করতে গেলেও মানুষ এক সাথে পারে না। আস্তে-আস্তে অভ্যাস করতে হয়।

বুযুর্গানে দ্বীন কুরআন হাদীছের আলোকে এবং তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে বলেছেন যে, মানুষ যদি গোনাহ মুক্ত জীবন যাপন করতে চায়, তাহলে আস্তে-আস্তে তাকে গোনাহ ছাড়ার অভ্যাস করতে হবে। প্রথম পর্যায়ে তাকে ছয়টা গোনাহ বর্জন করে চলতে হয়। এই ছয়টা গোনাহ বর্জন করতে পারলে পর্যায়ক্রমে অন্যান্য বহু গোনাহ বর্জন করা তার জন্য আছান হয়ে যাবে। সেই ছয়টা গোনাহ হল-

**এক নম্বর :** গীবত বর্জন করা। কোন মানুষের বদনাম আলোচনা না করা।

**দ্বিতীয় নম্বর :** যুলুম বর্জন করা। যুলুম হল কথায়, ব্যবহারে বা আচরণে কাউকে কষ্ট দেয়া। তাই যুলুম থেকে বাঁচতে হলে যেকোন কথা বলার পূর্বে বা যেকোন আচরণের পূর্বে তার দ্বারা কেউ কষ্ট পাবেন কি-না তা চিন্তা করে নিতে হবে।

**তৃতীয় নম্বর :** মানুষকে ছোট জানা ও নিজেকে বড় মনে করা। যেটাকে অহংকার বলা হয়। এটাও বর্জন করতে হবে। অহংকারকে বলা হয় اُمُّ الْاَمْرَاضِ অর্থাৎ, মনের যত রোগ আছে, সেই সমস্ত রোগের মা। এর থেকে অনেক রোগ জন্ম নেয়। যখন আমি আমাকে বড় মনে করব, তখন আরেকজনের ভাল কিছু দেখলে আমার হিংসা লাগবে যে, ও বড় হয়ে যাচ্ছে, আমি ছোট হয়ে যাচ্ছি। এভাবেই নিজের ভিতরে হিংসা-বিদ্বেষ জন্ম নিবে। আমরা যে মানুষের সমালোচনা করি, দোষ বদনাম আলোচনা করি, এর পেছনেও অহংকারবোধ কাজ করে থাকে। আরেকজনকে আমি ছোট করে দেখতে চাই, পক্ষান্তরে নিজেকে আমি বড় করে দেখতে চাই। কারোর সমালোচনা অর্থ হল যে, অমুকের মধ্যে এই দোষ আছে, আমার মধ্যে মাশাআল্লাহ এই দোষ নেই। আমি খুব ভাল, ফ্রেশ মানুষ। দেখা গেল এখানেও মনের অহংকারবোধ আছে। এভাবে অহংকার থেকে অনেক রোগ সৃষ্টি হয়, তাই অহংকার বর্জন করতে হবে।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

**চতুর্থ নম্বর :** রাগ বর্জন করা। যখন মানুষের মধ্যে রাগ আসে, তখন মানুষ ব্যালেন্স হারা হয়ে যায়। তার কথায়ও কোন ব্যালেন্স থাকে না, তার আচরণেও কোন ব্যালেন্স থাকে না। এই ব্যালেন্স হারা হয়ে সে অনেক অন্যায় করে ফেলে। এমন কিছু বলে ফেলে বা এমন কিছু করে ফেলে, যার ফলে পরে তাকে অনুতপ্ত হতে হয়। তাই ক্রোধ বা রাগ বর্জন করতে হবে।

**পাঁচ নম্বর :** বেগানা নারীদের সাথে মেলা-মেশা করা বন্ধ করতে হবে। যাদের সাথে দেখা দেয়া জায়েয নেই তাদের সঙ্গে সব রকম মেলা-মেশা, কথা-বার্তা বলা, মিষ্টি কথা বলা, একটু সেজেগুজে তাদের কাছে যাওয়া এবং এভাবে তাদের কাছে নিজেকে আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টা করা, এগুলো মানুষকে গোনাহের দিকে টেনে নিয়ে যায়। পুরুষ হলে বেগানা নারীদের থেকে, আর নারী হলে বেগানা পুরুষদের থেকে দূরে থাকতে হবে। এর ওছীলায় সে অনেক গোনাহ থেকে বিরত থাকতে পারবে।

**ছয় নম্বর :** হারাম মাল খাওয়া বর্জন করতে হবে। মানুষ যে খাদ্য-খাবার খায়, এই খাদ্য-খাবার থেকেই তার রক্ত, রস, মাংস এমনকি তার মন-মানসিকতা, তার চিন্তা-চেতনা সবকিছুই গঠিত হয়। যখন মানুষ হারাম খাবার গ্রহণ করে, ঐ হারাম খাবারের আছরও খারাপ হয়। এর দ্বারা তার মন এবং চিন্তা-চেতনা সব খারাপ হয়ে গড়ে ওঠে। তাই হারাম রিযিক বন্ধ করতে হবে।

বুযুর্গানে দ্বীন তাদের অভিজ্ঞতায় বলেছেন, এই ছয়টা জিনিস বর্জন করতে পারলে তার জন্য অন্যান্য বহু গোনাহ বর্জন করা আস্তে আস্তে সহজ হয়ে যায়। গোনাহ বর্জন করা সহজ। ধীরে ধীরে গোনাহ করতে হবে নতুবা একসাথে গোনাহ থেকে বিরত থাকা কঠিন। তাই গোনাহ বর্জন করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

## ১৯ নং বয়ান

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

**قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَاقَ طَعْمَ الْاِيْمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا.** (رواه مسلم برقم ١٦٠)

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

ধীরে ধীরে রমযান শেষ হয়ে আসছে। আমাদের অনেকের মনে খুশি লাগছে যে, রমযান শেষ হলেই অনেক কষ্ট থেকে বাঁচতে পারি। রোযার কষ্ট, তারাবীহ-এর কষ্ট থেকে মুক্তি পাই। তাই রমযান যত শেষ হতে থাকে আমাদের মনে খুশি আসতে থাকে। এর বিপরীত যারা কবরবাসী আছেন, রমযান উপলক্ষে তাদের আযাব মওকূফ থাকে, তাদের অবস্থা হল রমযান যত শেষ হতে থাকে তাদের পেরেশানী বাড়তে থাকে এই চিন্তায় যে, না জানি রমযানের পরে আবার আযাব শুরু হয়ে যায়! তাই খাস করে পিতা-মাতা প্রমুখ আপনজনের জন্য দু'আ করা চাই। যদি কবরে তাদের আযাব হয়ে থাকে, আর রমযান উপলক্ষে যে আযাব মওকূফ হয়ে আছে, আমরা দু'আ করি স্থায়ীভাবে যেন আল্লাহ পাক তাদের শাস্তি মওকূফ করে দেন। আর আমাদের মনের এই অবস্থারও পরিবর্তন হওয়া চাই- ইবাদত না করতে পারায় ভাল লাগা, ইবাদত করতে কষ্ট লাগা -এই মনোভাব দূর করা চাই। এই মনোভাব দূর করার কী উপায়? তাও হাদীছে বলে দেয়া হয়েছে। আল্লাহর রাসূল (সা.) সব কথাই বলে দিয়ে গেছেন। হাদীছে এসেছে, যদি কেউ তিনটা বিষয় চিন্তা করে, তাহলে তার ইবাদতে মজা লাগতে থাকবে। ইবাদত করতে কষ্ট লাগা দূর হয়ে যাবে, ইবাদত করতে ভাল লাগবে।

**প্রথম চিন্তা করার বিষয় হল–** مَنْ رَضِيَ بِاللّٰهِ رَبًّا অর্থাৎ, যে ব্যক্তি এই চিন্তা করবে যে, আমাদের খোদার চেয়ে আর ভাল খোদা হতে পারে না। খৃষ্টানরা ঈসা (আ.)কে খোদা বানিয়ে বসে আছে। তারা



আল্লাহর এক বান্দাকে খোদা বানিয়ে বসে আছে। পৃথিবীর বহু মানুষ নিজের হাতে গড়া মূর্তিকে পুজা করে। খড়-কুটা, মাটি দিয়ে তৈরি করে আবার সেটার-ই পুজা করে। এভাবে তারা কত অযৌক্তিক খোদাকে নিয়ে বসে আছে। আর আমাদের খোদা যিনি প্রকৃত খোদা, আমরা সেই খোদার বান্দা, আমরা তাঁর অনুসারী। কাজেই আমরা যুক্তির উপরে আছি, ন্যায়ের উপরে আছি। এরূপ চিন্তা করলে তাঁর হুকুম মানতে আস্তে-আস্তে ভাল লাগবে। ধীরে ধীরে তাঁর হুকুম মানার মধ্যে মজা আসা শুরু হবে।

**দ্বিতীয় চিন্তা করার বিষয় হল–** وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا অর্থাৎ, আমাদের ধর্ম ইসলাম, এই ইসলাম-ই সঠিক ধর্ম, পৃথিবীর আর কোন ধর্ম সঠিক নয়। আমরা যে আদর্শে আছি এটাই সঠিক আদর্শ, পৃথিবীর আর কোন আদর্শ সঠিক নয়। আমরা ভাল আদর্শে সঠিক আদর্শে আছি। পক্ষান্তরে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা ভুল আদর্শে আছে। এরূপ চিন্তা করলে ইসলামের সব জিনিস মানতে ভিতর থেকে জযবা আসবে, ভাল লাগবে যে, আমি তো ভালটাই করছি, এই আদর্শে যারা নেই তারা তো ভুল পথে আছে, আমি সঠিক পথে আছি। তখন এই আদর্শ মানতে ভাল লাগবে।

**তৃতীয় চিন্তা করার বিষয় হল–** وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا অর্থাৎ, এই চিন্তা করা যে, আমাদের রাসূল হলেন মুহাম্মাদ (সা.), যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল। আল্লাহ পাক আমাদেরকে অন্য কোন নবীরও উম্মত বানাতে পারতেন। মেহেরবানী করে তিনি আমাদেরকে এই রাসূলের উম্মত বানিয়েছেন। আল্লাহর কাছে আমরা চাইনি বরং মেহেরবানী পূর্বক তিনি আমাদেরকে শ্রেষ্ঠ উম্মত হওয়ার তাওফীক দান করেছেন। এই রাসূলের উম্মত হতে পারা আমাদের জন্য গর্বের বিষয়। যখন এই কথা চিন্তা করা হবে, তখন এই রাসূলের প্রতি ভক্তি আসবে, তাঁর আদর্শ মানতে ভাল লাগবে।

এই তিনটা চিন্তা যতবেশি করা হবে দ্বীনের কাজ করতে, ইবাদতের কাজ করতে, ঈমান-আমলের উপরে অটল থাকতে তত মজা লাগবে। খারাপ লাগা এবং কষ্টবোধ হওয়াটা আস্তে-আস্তে দুর হয়ে যাবে। খারাপ লাগা এবং কষ্ট বোধ হওয়া মূলত মনের একটা রোগ। এটা হল মনস্তাত্ত্বিক রোগ। মনস্তাত্ত্বিক রোগের চিকিৎসা, মনস্তাত্ত্বিকভাবেই করতে হয়। চিন্তার রোগকে চিন্তা দিয়েই দূর করতে হয়। কত সুন্দর পদ্ধতি রাসূল (সা.) বলেছেন। আল্লাহ পাক আমাদেরকে আমল করার তাওফীক দিন। আমীন!

## ২০ নং বয়ান

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

**قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْمُعْتَكِفُ هُوَ يَعْتَكِفُ الذُّنُوْبَ وَيُجْرِيْ لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ: مَنِ اعْتَكَفَ يَوْمًا اِبْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ جَعَلَ اللّٰهُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النَّارِ ثَلَاثَ خَنَادِقَ اَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْخَافِقَيْنِ.** (رواه البيهقي وابن ماجة)

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

আজ রমযানের ২০তম রাত। আগামী রাত থেকে শুরু হবে রমযানের শেষ দশক। এই শেষ দশকে গুরুত্বপূর্ণ আমল হল এ'তেকাফ। এ'তেকাফ করা সুন্নাতে মুআক্কাদা। যারা এ'তেকাফ করবেন, এ'তেকাফ করার সময় তাদের নিয়ত থাকবে এই গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত আদায় করার নিয়ত। সাথে সাথে এ'তেকাফের পাঁচটা ফায়দা রয়েছে। এই পাঁচটা ফায়দাও যেন অর্জন হয় তারও নিয়ত রাখতে হবে। এ'তেকাফের ফায়দা পাঁচটা হল এই–

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.
Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

**এক নম্বর :** এ'তেকাফ দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন হয়। আল্লাহর নৈকট্য অর্জন হওয়ার পথে সবচেয়ে বড় বাঁধা হল দুনিয়া। এ'তেকাফের মাধ্যমে এই দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আল্লাহর দরবারে পড়ে থাকা হয়। এ জন্য এ'তেকাফ দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন হয়।

**দুই নম্বর :** এ'তেকাফের দ্বিতীয় ফায়দা হল– এ'তেকাফ করা দ্বারা লাইলাতুল কদর অর্থাৎ, শবে কদরের ফযীলত পাওয়াটা অনেকাংশে নিশ্চিত হয়ে যায়। যেহেতু শেষ দশকেই শবে কদর তালাশ করার কথা বলা হচ্ছে। শেষ দশকের যেকোন বেজোড় রাতে সেটা হতে পারে। এ'তেকাফের মাধ্যমে যেহেতু সর্বক্ষণ আল্লাহর দরবারে পড়ে থাকা হয়, এ জন্য এই দশকে এ'তেকাফ করা দ্বারা শবে কদরের ফযীলত পাওয়াটা অনেকাংশে নিশ্চিত হয়ে যায়।

**তিন নম্বর :** এ'তেকাফের তৃতীয় ফায়দা হল– আল্লাহ পাক এ'তেকাফকারীকে গোনাহ থেকে মুক্ত করে দেন। গোনাহ হয় দুনিয়ার কারণে। আর এ'তেকাফের মাধ্যমে যেহেতু সেই দুনিয়া ত্যাগ করে আসা হয়, হোক কয়েক দিনের জন্য তবুও সে দুনিয়া ত্যাগ করেছে, এই ওছীলায় আল্লাহ পাক তাকে গোনাহ থেকে মুক্ত করে দেন।

**চার নম্বর :** এ'তেকাফের চতুর্থ ফায়দা হল– যারা এ'তেকাফ করবেন না এ'তেকাফের বাইরে থেকে যত রকম নেক কাজ করা সম্ভব, হয়তো সবটা তারা করতে পারবেন না। যে কয়টা নেকী তারা অর্জন করবেন এ'তেকাফের বাইরে থেকে, যিনি এ'তেকাফ করবেন আল্লাহ পাক তাকে সব ধরনের নেক আমলের ছওয়াব দিয়ে দিবেন। সে বাইরে থাকলে যে নেক আমলগুলো করতে পারত না, সেগুলোর ছওয়াবও তাকে দিয়ে দেয়া হবে। যেহেতু এ'তেকাফকারী অন্যান্য নেক আমল করার সুযোগ ছেড়ে দিয়ে একটা আমলের ভিতরে মশগুল হয়ে গেছেন, এ জন্য আল্লাহ পাক তাকে সব রকম নেক আমলের ছওয়াব দিয়ে দিবেন।

**পাঁচ নম্বর :** এ'তেকাফের পঞ্চম ফায়দা হল– প্রতিদিন এ'তেকাফের বদৌলতে আল্লাহ পাক জাহান্নামকে তার থেকে তিন খন্দক দূরে সরিয়ে দিবেন। এক খন্দক দূরত্ব বলতে বোঝানো হয় আসমান যমীনের ব্যবধান অর্থাৎ অনেক ব্যবধান। হাদীছের আলোকে এ'তেকাফের এই পাঁচটা ফায়দা বুঝা যায়। যিনি এ'তেকাফ করবেন সুন্নাত আদায় করার নিয়তের সাথে সাথে এই ফায়দাগুলো হাছিল হওয়ার নিয়তও করবেন। একটা নেক আমলের সাথে যত ভাল নিয়ত জড়িত করে নেয়া যায়, আল্লাহ পাক ততই নছীব করেন। ঘরে মা-বোনেরা যারা এ'তেকাফ করবেন, তাদেরকেও আমরা এই কথাগুলো শিখিয়ে দেই। আল্লাহ পাক আমাদেরকে আমল করার তাওফীক নছীব করুন। আমীন!

## ২১ নং বয়ান

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

**قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ.**

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

আমরা রমযানের শেষ দশকে এসে পৌঁছেছি। শেষ দশকের আজ প্রথম রাত– ২১শে রাত। এই রাত শবে কদর হওয়ার একটা বিশেষ সম্ভাবনাময়ী রাত। আমরা শুধু ২৭শে রাতকেই শবে কদর ধরে বসে আছি। কিন্তু হাদীছে বলা হয়েছে, বোখারী শরীফের হাদীছে আছে– রাসূল (সা.) বলেছেন,

**تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ.** (صحيح البخاري ٢٠١٧)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



অর্থাৎ, তোমরা রমযানের শেষ দশকের বেজোড় রাত্রগুলোতে শবে কদর তালাশ কর। সেই হিসেবে শবে কদর তালাশ আজও করতে হবে। আজ ২১শে রাত, সামনে ২৩শে রাত, ২৫শে রাত, ২৭ ও ২৯শে রাত, এই সব বেজোড় রাতেরই প্রত্যেকটাতেই শবে কদর তালাশ করতে বলা হয়েছে। বুযুর্গানে দ্বীনের অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হয়েছে যে, ২৭শে রাত ছাড়া অন্যান্য রাতেও শবে কদর হয়ে থাকে। অনেক বুযুর্গানে দ্বীন বলেছেন তারা সাতাশের বাইরেও শবে কদর পেয়েছেন। কেউ ২১শে রাতের কথা বলেছেন। কেউ ২৩শের কথা বলেছেন। হতে পারে শবে কদর সব বছর একই রাতে হয় না। শবে কদর সব বেজোড় রাত্রগুলোতে ঘুরতে থাকে। এক এক বছর এক এক রাতে হয়। তাই সব বেজোড় রাতেই শবে কদরের ফযীলত পাওয়ার জন্য মেহনত করতে হবে।

শবে কদরের ফযীলত পাওয়ার জন্য বিশেষ দুটো আমলের কথা হাদীছে এসেছে। একটা আমল হল নফল নামায পড়া। সাধারণ নফলের নিয়তে বা তাহাজ্জুদের নিয়তে এই নামায পড়তে হবে। যে কোন সূরা দিয়ে পড়ার স্বাধীনতা রয়েছে। এভাবে শবে কদরের ফযীলত পাওয়ার জন্য কিছু নফল নামায পড়তে হবে। আর একটা আমল হল– আল্লাহর কাছে দু'আ করা। বিশেষভাবে ক্ষমার জন্য দু'আ চাওয়া। হযরত আয়েশা (রা.) রাসূল (সা.) কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি আমি শবে কদর পাই তাহলে আমি কি করব? তখন রাসূল (সা.) বলেছিলেন,

**قُوْلِيْ اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ.** (رواه أحمد في مسنده برقم ٢٥٤٢٣ وإسناده صحيح)

অর্থাৎ, তুমি আল্লাহর কাছে এই বলবে- আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুউন তুহিব্বুল আফওয়া ফা'ফু আন্নী। অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি বড়ই ক্ষমাশীল ক্ষমা করতে ভালবাস। তাই আমাকে ক্ষমা করে দাও।

পারলে রাসূল (সা.)-এর শিখানো ভাষায় আরবীতেই এভাবে বলতে হবে। এটা খুব বড় দু'আ নয়, মুখস্থ করে নেয়া সম্ভব। তারপরও আরবীতে এভাবে বলতে না পারলে নিজের ভাষায় আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। শবে কদরের ফযীলত পাওয়ার জন্য এই দুটো আমল করতে হবে, কিছু নফল নামায পড়তে হবে, আর আল্লাহর কাছে দু'আ করতে হবে। বিশেষভাবে ক্ষমার জন্য দু'আ চাইতে হবে। শবে কদরের এই বিশেষ দুটো আমলের জন্য হাদীছে বলা হয়েছে। এখন থেকে প্রত্যেকটা বেজোড় রাতে এবং জোড় রাতেও, জোড় বেজোড় সব রাতেই বিশেষভাবে বেজোড় রাত্রগুলোতে এই দুটো আমল আমরা জারী রাখি। আল্লাহ পাক আমাদেরকে শবে কদরের ফযীলত নছীব করুন। আমীন!

## ২২ নং বয়ান

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

**قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ فَطَّرَ فِيْهِ صَآئِمًا كَانَ مَغْفِرَةً لِّذُنُوْبِهِ. وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ: مَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوْكِهِ فِيْهِ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ.**

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

রমযানের শেষ দশক চলছে। জাহান্নাম থেকে মুক্তির দশক। রমযানের শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত প্রতিদিন-ই আল্লাহ পাক অনেক লোককে জাহান্নামীদের তালিকা থেকে মুক্ত করে দেন। জাহান্নামের অনেক কয়েদীকে মুক্ত করে দেন। বিশেষভাবে রমযানের শেষ দশকে এই মুক্তি দেয়া হয়। তাই নিজেদের জন্য, নিজেদের মাতা-পিতা ও আপনজনদের জন্য বিশেষভাবে জাহান্নাম থেকে মুক্তির দু'আ করতে হবে। দু'আর সাথে সাথে দাওয়া অর্থাৎ আমলও গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ জাহান্নাম থেকে মুক্তির যে সব আমল কুরআন হাদীছে বলা হয়েছে সেগুলোও করতে হবে। জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বিশেষভাবে রমযান মাসে দুটো আমলের কথা বলা হয়েছে। একটা আমল অন্যকে ইফতার করানো। ইফতার করানোর অনেকগুলো ফযীলত রয়েছে, তার মধ্যে একটা হল,

مَنْ فَطَّرَ فِيْهِ صَآئِمًا كَانَ مَغْفِرَةً لِّذُنُوْبِهٖ. (رواه ابن خزيمة برقم ١٨٨٧ وإسناده ضعيف)

'অর্থাৎ, রাসূল (সা.) বলেছেন, অন্যকে ইফতার করালে এটা তার গোনাহ থেকে এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তির কারণ বা ওছীলা হবে'। আরেকটা আমলের কথা বলা হয়েছে-

مَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوْكِهٖ فِيْهِ غَفَرَ اللّٰهُ لَهٗ. (المصدر السابق)

'অর্থাৎ, রাসূল (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি রমযান মাসে নিজের অধীনস্থ চাকর-নওকর ও কর্মচারীদের কাজের বোঝা হালকা করবে, আল্লাহ পাক তাকে গোনাহ থেকে এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবেন'। আল্লাহ বলবেন, 'আমার বান্দাকে তুমি দুনিয়ার কষ্ট থেকে মুক্তি দিয়েছ, আমি তোমাকে সবচেয়ে বড় কষ্ট থেকে অর্থাৎ, জাহান্নামের কষ্ট থেকে মুক্তি দিলাম'। জাহান্নাম থেকে মুক্তির ওছীলা হিসেবে এই দুটো আমল রমযানে করার কথা বলা হয়েছে। আরেকটা আমল রয়েছে সারা বছরে করার জন্য। সেটা হল প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ এই দু'আটা সাতবার পড়া। এই দু'আটার অর্থ হল– হে আল্লাহ তুমি আমাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা কর। সকালে ফজরের নামাযের পর ৭ বার, মাগরিবের নামাযের পর সাতবার এই দু'আটা পড়া সুন্নাত। এই আমলটি শুধু রমযানের জন্য নয়, বরং সারা বছর এটা করতে বলা হয়েছে। আর কবরের আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সূরা মুলকের আমল করার কথা বলা হয়েছে। এটাও সুন্নাত। রাসূল (সা.) প্রতিদিন আমল করতেন। ইশার পর থেকে নিয়ে ঘুমানোর আগ পর্যন্ত যেকোন সময় সূরায়ে মুলক একবার পড়ে নিতে হবে। সূরায়ে মুলক ২৯ পারার প্রথম সূরা। এটা আমরা সকলেই মুখস্থ করে নিতে পারি এবং মুখস্থ করে নেয়া কর্তব্য। কবরের আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বিশেষভাবে এই আমলের কথা বলা হয়েছে। কবরের আযাব এটাও জাহান্নামের আযাব, তাই জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সারা বছর আমরা এই দুটো আমল জারী রাখতে পারি। প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় আমরা সাতবার পড়ব اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ আর প্রতিদিন রাতে ঘুমানোর পূর্বে একবার সূরা মুলক পড়ব। আল্লাহ পাক আমাদেরকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

## ২৩ নং বয়ান

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ. (رواه الشيخان)

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

আজ শেষ দশকের ২৩ শে রাত। শবে কদর হওয়ার বিশেষ একটা সম্ভাবনাময়ী রাত। অনেক বুযুর্গানে দ্বীন ২৩ শে রাতেও শবে কদর পাওয়ার কথা বলেছেন। শবে কদরে সমস্ত গাছ-পালা, সমস্ত মাখলূক আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাজদায় লুটিয়ে যায়, ফলে তারা এগুলো দেখতে পান। সেমতে অনেক বুযুর্গানে দ্বীন ২৩শে রাতেও শবে কদর পাওয়ার কথা বলেছেন। তাই শবে কদর পাওয়ার উদ্দেশ্যে এই রাতেও কিছু নফল নামায পড়তে হবে এবং আল্লাহর কাছে দু'আ করতে হবে। বিশেষভাবে মাগফিরাতের জন্য দু'আ করতে হবে।

শবে কদরে যে ইবাদত করা হবে, কি নিয়তে করতে হবে? কুরআন-হাদীছে শবে কদরের তিনটা ফযীলতের কথা বলা হয়েছে। এই ফযীলতগুলো হাছিল করার নিয়তে ইবাদত করতে হবে। এক নম্বর ফযীলত যেটা কুরআন শরীফে বলা হয়েছে,

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ.

অর্থাৎ, শবে কদরে ইবাদত করা হাজার মাস ইবাদত করার চেয়েও বেশি উত্তম। এক হাজার মাসে ৮৩ বছর ৪ মাস হয়। এই ফযীলত অর্জন করার নিয়তে ইবাদত করতে হবে। শবে কদরের দ্বিতীয় ফযীলত হল এক হাদীছে রাসূল (সা.) বলেছেন,

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيْمَانًا وَّاِحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهٗ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ. (صحيح البخاري ٢٠١٤ ومسلم ١٨١٧)

'অর্থাৎ, ঈমান ঠিক রেখে, ছওয়াব অর্জন করার নিয়তে যে ব্যক্তি শবে কদরে ইবাদত করবে আল্লাহ পাক তার জীবনের সমস্ত গোনাহ মাফ করে দিবেন'।

এটা অনেক বড় ফযীলত। মানুষের জীবনে গোনাহ মাফ হয়ে যাওয়া অনেক বড় বিষয়! জীবনের সবচেয়ে বড় পাওয়াই হল ক্ষমা পাওয়া। এই শবে কদরে ইবাদত করার ওছীলায় সেই ক্ষমা পাওয়া যায়। তাই এই ফযীলত পাওয়ারও নিয়তে ইবাদত করতে হবে। শবে কদরের তৃতীয় ফযীলত হল– এক হাদীছে রাসূল (সা.) বলেছেন,

اِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ نَزَلَ جِبْرَئِيْلُ فِيْ كَبْكَبَةٍ مِّنَ الْمَلٰئِكَةِ يُصَلُّوْنَ عَلٰى كُلِّ قَائِمٍ اَوْ قَاعِدٍ يَّذْكُرُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ. (رواه البيهقي في شعب الإيمان برقم ٣٧١٧ وإسناده ضعيف)

'অর্থাৎ, যখন শবে কদর হয় জিব্রাঈল (আ.) তাঁর রহমতের ফিরিশতা বাহিনীসহ সারা পৃথিবী সায়ের করতে থাকেন। আর যারা ইবাদত করে দাঁড়িয়ে, বসে, অর্থাৎ নামাযে থাকে কিংবা তেলাওয়াত যিকিরে থাকে, তাদের জন্য রহমতের দু'আ করতে থাকেন'।

ফিরিশতাদের মুখের দু'আ পাওয়া অনেক বড় কথা। আমাদের গোনাহে জর্জরিত মুখ, এই মুখে দু'আ চাওয়া, আল্লাহর কাছে হয়তো পুরোপুরি মঞ্জুরি নাও পেতে পারে। পক্ষান্তরে ফিরিশতারা হলেন নিষ্পাপ এবং সবচেয়ে নিকটতম ফিরিশতা হলেন জিব্রাঈল (আ.)। সেই নিকটতম ফিরিশতা তাঁর সঙ্গী ফিরিশতাসহ সমবেত ভাবে এই রাতে ইবাদত করনেওয়ালাদের জন্য রহমতের দু'আ করতে থাকেন। এই তিনটা বিশেষ ফযীলতের কথা শবে কদর সম্পর্কে পাওয়া যায়। আমরা এখন থেকে শবে কদরের উদ্দেশ্যে যা কিছু ইবাদত করব, এই তিনটা ফযীলত পাওয়ার নিয়তে করব। হাদীছে এসেছে,

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ. (متفق عليه)

অর্থাৎ, আমলের ফল পাওয়া যায় নিয়তের ভিত্তিতে। আমরা যেমন নিয়ত রাখব আল্লাহ পাক আমাদেরকে আমলের ছওয়াব, আমলের বদলা ওরকমই দান করবেন। আল্লাহ পাক আমাদেরকে সহীহ সমঝ নছীব করুন। আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

## ২৪ নং বয়ান

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَفِى الْحَدِيْثِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُنَادِيًا فِى فِجَاجِ مَكَّةَ: اَلَا اِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ. الحديث. (رواه الترمذي برقم ٦٧٤ وقال حسن غريب)

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

রমযান শেষ হয়ে আসছে। অনেক ভাই সদকায়ে ফিতর দেয়া শুরু করেছেন। তাই এ সম্পর্কে কয়েকটি মাসআলা জেনে নেই। সদকায়ে ফিতরকে আমরা সাধারণভাবে ফিতরা বলে থাকি। আরবীতে বলে সদকাতুল ফিত্‌র। উর্দূতে বলে সদকায়ে ফিতির। যাদের কাছে ঈদের দিন যাকাত ফরয হওয়া

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

পরিমাণ অর্থ থাকে, তাদের উপর ঈদের দিন সুবহে সাদেকের পর ফিতরা ওয়াজিব হয়। যদি কেউ রমযানে ফিতরা দিয়ে দিতে চান, দিতে পারেন। সেটা হবে অগ্রিম দেয়া। আসলে ফিতরা ওয়াজিব হয় ঈদের দিন সুবহে সাদেকের পর অর্থাৎ, ঈদের দিন সকালে।

ফিতরা নিজের পক্ষ থেকে এবং পিতা হলে নিজের না-বালক সন্তানের পক্ষ থেকে দেয়া ওয়াজিব। পরিবারের অন্যান্য সদস্য যারা আছেন, যেমন– স্ত্রী কিংবা মাতা-পিতা, বালেগ সন্তান, চাকর-চাকরাণী, তাদের পক্ষ থেকে দেয়া ওয়াজিব নয়, তবে একান্নভুক্ত পরিবার হলে সকলের পক্ষ থেকে দিয়ে দেয়া উত্তম।

মাথা পিছু প্রত্যেক জনের জন্য ফিতরা দিতে হয় এক সের সাড়ে বার ছটাক আটা বা গমের মূল্য। এখনকার কেজির হিসেবে এক সের সাড়ে বার ছটাকে ১ কেজী ৬৬২ গ্রাম হয়। বাজারে এখন যে ... টাকা কেজি দরে আটা বিক্রি হয় এ হিসেবে প্রতিটা ফিতরার জন্য ..... টাকা আদায় করলে একটা ফিতরা আদায় হয়ে যায়। তাই মাথা পিছু .... টাকা হারে ফিতরা দিতে হবে। যাদেরকে যাকাত দেয়া যায়, তাদেরকে ফিতরা দেয়া যায়। তবে ফিতরার পয়সা দেয়ার ক্ষেত্রে এতটুকু বলা হয়েছে যে, দুই টাকা, চার টাকা এভাবে ভেঙ্গে ভেঙ্গে না দিয়ে একজনকে এতটুকু পরিমাণ দেয়া, যাতে সে পরিবারকে নিয়ে এক দুই বেলা খেতে পারে। যেমন– একজনকে অন্তত ১০০ টাকা দেয়া হল। দুই-পাঁচ টাকা বা দশ টাকা করে ফকিরদেরকে যেটা দেয়া হয়, এভাবে দেয়া উত্তম নয়। কারণ শরীআতে ফিতরার প্রবর্তন কেন হয়েছে সে আঙ্গিকটা বুঝতে হবে। ঈদের দিন এটা ওয়াজিব হয়। একজন গরীবকে যেন এতটুকু পরিমাণ দেয়া হয় যে, ঈদের দিন সে পরিবারকে নিয়ে অন্তত অভুক্ত না থাকে। ঈদের খুশিতে সে কোন ভাবে হলেও যেন শরীক হতে পারে। এই আঙ্গিকেই সদকায়ে ফিতির বা ফিতরার প্রবর্তন করা হয়েছে। তাই দুই-পাঁচ টাকা করে খুচরা ভেঙ্গে-ভেঙ্গে না দিয়ে একজনকে এতটুকু পরিমাণ দেয়া, যাতে সে তার পরিবারকে নিয়ে এক বেলা দু' বেলা খেতে পারে। এভাবেই ফিতরা দেয়াকেই উত্তম বলা হয়েছে। যাকাতের ক্ষেত্রে এরকম বাধ্যবাধকতা নেই। যাকাত যাকে যতটুকু খুশি দিয়ে দেয়া যায়। ঘরের চাকর-চাকরাণী যারা আছে, তাদেরকে যেমন যাকাত দেয়া যায় যদি গরীব হয়, আর সাধারণভাবে চাকর-চাকরাণীরা গরীবই হয়ে থাকে, তাহলে তাদেরকে যেমন যাকাত দেয়া যায়, ফিতরাও দেয়া যায়। তবে বেতনের হিসেবের বাইরে হতে হবে। অর্থাৎ, যাকাত-ফিতরা দিয়ে এটাকে বেতনের থেকে কেটে দেয়া যাবে না। তাহলে বেতন দেয়া হবে যাকাত দেয়া হবে না। প্রত্যেকটা মাসআলা সহীহভাবে জেনে সেভাবে আমরা আমল করি। আল্লাহ পাক তাওফীক দান করুন। আমীন!

## ২৫ নং বয়ান

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

**قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنَّ هٰذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَ كُمْ وَفِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ، وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا اِلَّا مَحْرُوْمٌ.** (رواه ابن ماجة بإسناد حسن)

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

রমযানের আজ পঁচিশে রাত। শবে কদর হওয়ার একটি বিশেষ সম্ভাবনাময়ী রাত। রাসূল (সা.) রমযান মাস আসলে বলতেন, 'তোমাদের কাছে একটা মাস আসছে, আবার বলতেন আমাদের কাছে একটা মাস এসেছে এই মাসে আল্লাহ তা'আলা এমন একটা রাত রেখেছেন যে রাতে ইবাদত করা হাজার মাসে ইবাদত করার চেয়েও শ্রেষ্ঠ'। কাজেই এত বড় সুযোগ পাওয়ার পরেও যে ব্যক্তি শবে

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com



কদরের ফযীলত থেকে বঞ্চিত হল সে যেন সবকিছু থেকে বঞ্চিত হল। যে ব্যক্তি শবে কদর থেকে বঞ্চিত হল, সে তো পুরো হতভাগা।

এ হল রাসূল (সা.)-এর ভাষা। তাই শবে কদর পাওয়ার জন্য যে, ইবাদত করতে হয় নফল নামায পড়তে হয়, দু'আ করতে হয়, বিশেষভাবে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হয়, এই আমলগুলো আজও আমরা জারী রাখি। আমাদের চিরাচরিত অভ্যাস হল আমরা শবে কদর বলতে শুধু সাতাশে রাতকেই বুঝি। কিন্তু হাদীছে বলা হয়েছে, শেষ দশকের প্রত্যেকটা বেজোড় রাত্রই শবে কদর হওয়ার ক্ষেত্রে সমান গুরুত্ব রাখে। তাই শবে কদর পাওয়ার জন্য সব বেজোড় রাতেই মেহনত করতে হবে। যদি মেহনত করার অভ্যাস না করি, শুধু গা বাঁচানোর অভ্যাস করি, তাহলে দ্বীনী লাইনে তারাক্কী হবে না। যারা গা বাঁচিয়ে চলে, দুনিয়ার লাইনেও তাদের তারাক্কী হয় না। যে মেহনত করতে না চায়, সে কোন লাইনেই তারাক্কী করতে পারে না। তাই হাদীছে মেহনত মোজাহাদার কথা, নফসের সাথে মোজাহাদার কথা বার বার বলা হয়েছে। এক হাদীছে ইরশাদ হয়েছে,

**اَلْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ لِلّٰهِ.** (رواه أحمد في مسنده برقم ٢٣٩٩٧ وإسناده صحيح)

অর্থাৎ, সবচেয়ে বড় মুজাহিদ তাকে বলা হয় যে তার নফসের সাথে মোজাহাদা করে।

জেহাদ করে যেমন শত্রুকে শেষ করে দেয়া হয়। এমনিভাবে নফসের সাথে জেহাদ করে নফসকে শেষ করে দিতে হবে। আমার নফস আমার ইচ্ছার বাইরে এবং শরীআতের চাহিদার বাইরে যেন আমাকে চালাতে না পারে, এমনভাবে নফসকে দমন করে দিতে হবে। এরকম যে করতে পারে, সে হল সবচেয়ে বড় মুজাহিদ। যুদ্ধের সময় মানুষের জযবা (সেন্টিমেন্ট) থাকে, তাই জেহাদ করা সহজ। কিন্তু লাগাতার নিরবচ্ছিন্নভাবে সব সময়, সারা জীবন নফসের বিরুদ্ধে জেহাদ করা অনেক বড় কঠিন মোজাহাদা। তাই বলা হয়েছে– বড় মুজাহিদ সেই, যে নফসের সাথে মোজাহাদা করতে পারে। নফসের সাথে মোজাহাদা করে সব সময় ইবাদতের উপরে অটল থাকতে হবে। নফস আরাম চাইলে আগে শরীআতের কাজ করে, আগে দ্বীনের কাজ করে তারপরে নফসের আরাম দেয়া যাবে, আগে নয়। একথা নয় যে, তাহলে নফসকে আরাম দেয়াই যাবে না, তাহলে ঘুমানোই যাবে না, কারণ ঘুমানো একটা আরাম। এমনিভাবে খাওয়াও যাবে না, কারণ খাওয়াও একটা আরাম। তা নয়, শরীআতের কাজ করে তারপরে নফসকে আরাম দেয়া যাবে। এটাও শরীআতে আছে। হাদীছে ইরশাদ হয়েছে,

**اِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا.** (السنن الكبرى للبيهقي برقم ٨٦٠٤)

অর্থাৎ, তোমার দেহেরও একটা হক আছে। দেহেরও আরাম আছে। তার খানা-পিনার চাহিদা, তার দৈহিক চাহিদা, তার বৈধ চাহিদা পূরণ করতে হবে। নতুবা মানুষ অচল হয়ে যাবে। শরীআত কোন অপ্রাকৃতিক বিধান দেয়নি। শরীআতসম্মতভাবে প্রাকৃতিক চাহিদা পূরণ করতে হবে, কিন্তু প্রাধান্য দিতে হবে শরীআতের চাহিদাকে। তাই আমরা শরীআত ঠিক রেখে তারপরে আয়-ইনকাম করব। শরীআত ঠিক রেখে তারপর খাওয়া-দাওয়া করব। আমার দেহকে আরাম দেব, ঘুমাব, তবে ফজরের নামায কাজা করে নয়। শরীআত ঠিক রেখে এরপরে যতটুকু আরাম নেয়া যায় ততটুকুই আরাম নেয়া হবে এবং সেটাও নেয়া হবে দ্বীনের নিয়তে। তাহলে আরাম, দুনিয়ার কাজ-কর্ম, এগুলোও দ্বীন হয়ে যাবে। মু'মিন মুসলমান দুনিয়ারও কাজ করবে কিন্তু দ্বীনের নিয়তে করবে। যেমন আমি ঘুমাবো কেন? আমি এই নিয়তে ঘুমাবো এবং আগে আগে ঘুমিয়ে যাব, যাতে ফজরের সময় আগে আগে উঠতে পারি। ফজরের নামাযের যেন ব্যাঘাত না হয়। আমার দেহটাকে সুস্থ রাখব কেন? যাতে আমার কর্তব্যগুলো আমি পালন করতে পারি। কর্তব্য পালন করতে যেন আমি দুর্বল হয়ে না পড়ি। এভাবে দুনিয়ার সব কাজ করতে

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

হবে দ্বীনের নিয়তে। তাহলে দুনিয়াও দ্বীন হয়ে যাবে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে সহীহ সমঝ দান করুন। আমীন!

## ২৬ নং বয়ান

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُبَّ تَالٍ لِلْقُرْاٰنَ وَالْقُرْاٰنُ يَلْعَنُهُ.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

তারাবীহ-তে আজ আমাদের ২৯ পারা শেষ হল। ইনশাআল্লাহ আগামীকাল খতম হবে। আল্লাহ পাক আমাদের তেলাওয়াতের ভুল-ত্রুটি মাফ করে খতমের পুরোপুরি ছওয়াব দান করেন। তারাবীহ্-এর বাইরে আমরা নিজেরাও যা তেলাওয়াত করেছি আল্লাহ পাক তার ভুল-ত্রুটি মাফ করে দিয়ে কবুল করে নেন।

অনেক ভাই আছেন নিজেরা তেলাওয়াত করেছেন, এখন আমাদের কাছে এসে বলেন হুজুর! এক খতম তেলাওয়াত করেছি একটু বখশে দিন। জেনে রাখা দরকার বখশে দেয়ার বিশেষ কোন সিষ্টেম শরীআতে নেই। বখশে দেয়া কথাটার অর্থ হল দান করে দেয়া। তেলাওয়াত করবে একজন, আর বখশে বা দান করবে আরেকজন- এরকম কোন বিধান নেই। কিংবা আমি তেলাওয়াত করেছি মাইয়্যেতের উদ্দেশ্যে অর্থাৎ, আমার আপনজনের উদ্দেশ্যে এর ছওয়াব পৌছে দেয়ার জন্য, এখন বখশে দেয়ার জন্য হুজুরের মাধ্যম ধরতে হবে এমন কোন বাধ্য-বাধকতা নেই। যখন আমি তেলাওয়াত করি তখন আমার নিয়ত এটাই থাকে যে, আল্লাহ যেন আমাকে এর ছওয়াব দান করেন এবং আমার আপনজন যারা দুনিয়া থেকে চলে গেছেন তাদের রূহে, তাদের আমলনামায় যেন এটার ছওয়াব পৌছে যায়। এই যে নিয়ত করা হল, এই নিয়তের কারণেই ছওয়াব পৌছে যায়। তেলাওয়াতের পরে আলাদাভাবে কিছু বলার তেমন প্রয়োজন নেই। যদি বলতে চান বলতে পারেন, কিন্তু এর জন্য বিশেষ কোন সিস্টেম বা এমন কোন বিশেষ ব্যবস্থা, যেটা হুজুর জানেন আমরা জানি না, এমন কিছু নেই। কাজেই হুজুরের মাধ্যমে বখশে দিতে হবে এমন কোন নিয়ম নেই। আমরা নিজেরাই আল্লাহর কাছে বলতে পারি যে, হে আল্লাহ! আমি যা তেলাওয়াত করেছি তার ভুল-ত্রুটি মাফ করে দাও এবং এর ছওয়াব আমার অমুক অমুক আত্মীয়ের আমলনামায় পৌছে দাও। ব্যস! আরও একটা কথা মনে রাখা দরকার, আমরা রমযানে তেলাওয়াত করে থাকি। এই তেলাওয়াত শুধু রমযানের জন্য নয়, সারা বছর তেলাওয়াত করতে হবে। কুরআন তেলাওয়াত সারা বছরের আমল। কুরআন তেলাওয়াত একটা সর্বোত্তম ইবাদত। কুরআন তেলাওয়াত দ্বারা মানুষের ক্বলব পরিষ্কার হয়। কলবের জং দূর হয়, আল্লাহ্র সাথে মহব্বত বৃদ্ধি পায়, দ্বীনী কাজে মহব্বত বৃদ্ধি পায়, ইবাদত করতে মজা (তৃপ্তি) বোধ সৃষ্টি হয়, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়। এভাবে কুরআন তেলাওয়াতের বহু ফায়দা, অসংখ্য ফায়দা।

তাই সারা বছর আমরা কুরআন তেলাওয়াত জারী রাখি। রমযানে কুরআন এক খতম পড়লাম, এরপর কুরআন শরীফ জুযদানে ভরে রেখে দিলাম, আবার আগামী রমযানে খুলব, এরকম যেন না হয়। আরও একটা বিষয় হল– তেলাওয়াত যেন সহীহ হয়। এ বিষয়টার প্রতি আমরা খুব-ই গুরুত্ব কম দেই, অথচ হাদীছে পরিষ্কার বলা হয়েছে,

رُبَّ تَالٍ لِلْقُرْاٰنَ وَالْقُرْاٰنُ يَلْعَنُهُ. (التبيان في آداب حملة القران)

অর্থাৎ, অনেক তেলাওয়াতকারী এমন আছে, যারা কুরআন তেলাওয়াত করে, কিন্তু কুরআন তেলাওয়াতে তাদের ছওয়াব হবে কি উল্টো কুরআন তাদেরকে অভিশাপ দিতে থাকে।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



যাদের তেলাওয়াত সহীহ হয় না, কুরআন তেলাওয়াত-এর দ্বারা তারা ছওয়াব পায় না বরং উল্টো গোনাহ হয়। যাদের তেলাওয়াত সহীহ নয়, তাদের নামায সহীহ হয় না এবং যত আমলে তেলাওয়াতের প্রয়োজন আছে এরকম কোন আমল তাদের সহীহ হয় না। তাই কুরআন তেলাওয়াত সহীহ করার বিষয়টা এত হালকা বিষয় নয়, অথচ আমরা এটাকে খুবই হালকা দৃষ্টিতে দেখি।

অনেক ভাই এমন আছি, যারা কুরআন পড়তেও জানি না। বাজারে বাংলা উচ্চারণে লেখা কুরআন শরীফ আছে তাই পড়ি। অথচ বাংলা উচ্চারণ পড়ে যিন্দেগীতে সহীহ পড়া সম্ভব নয়। যারা বাংলা কুরআন শরীফ ছেপেছে, তাদেরকে আমরা বলেছি যে, আপনাদের গোনাহ হবে, হাজার হাজার মানুষ যারা আরবী পড়া শিখছে না, তারা শুধু এটার উপরে নির্ভর করে যে, বাংলা উচ্চারণ আছে আমরা এটা দেখে পড়ব, এভাবে হাজার হাজার মানুষের গলত তেলাওয়াতের উপরে টিকে থাকার কারণ আপনারা। আপনাদের গোনাহ হবে। বাংলা উচ্চারণ দেখে কোনোদিন সহীহ–শুদ্ধভাবে পড়া সম্ভব নয়। আরবী এমন অনেক অক্ষর আছে, যার উচ্চারণ বাংলা কোন অক্ষরে আনা সম্ভব-ই না।

কুরআন তেলাওয়াত সহীহভাবে শেখা এমন কঠিন কোন কিছু নয়। চার মাস, ছয়মাস একজন উস্তাদের কাছে মেহনত করলে সহীহ তেলাওয়াত শেখা যায়। আমরা সহজপন্থা তালাশ করি। অনেকে হুজুরকে পরামর্শ দেন যে, হুজুর নামাযের পরে যদি একটা একটা সূরা করে আমাদেরকে পড়ে শুনান, আমরাও পড়ি, তাহলে আমরা শিখে যেতে পারি। কিন্তু জেনে রাখবেন এভাবে পড়লে কোনোদিন পড়া শুদ্ধ হবে না। আগে হরফ সহীহ করতে হবে। প্রয়োজনীয় কাওয়াইদ শিখতে হবে। তারপরে পড়া সহীহ হবে। হরফ সহীহ না করে, প্রয়োজনীয় কাওয়াইদ আয়ত্ব না করে এভাবে শুনে-শুনে পড়া সহীহ করতে চাইলে সহীহ হবে না। একজন উস্তাদ ধরে কিছুদিন মেহনত করলে সহীহভাবে শেখা সম্ভব। সারা জীবনের নামায, সারা জীবনের তেলাওয়াতের স্বার্থে এতটুকু আমরা অবশ্যই করতে পারি। শুধু এটার গুরুত্ব আমাদের মনে আসতে হবে। যদি আমরা মেহনত শুরু করি, তাহলে সহীহ করতে যতদিন সময় লাগবে, ততদিন হয়তো আল্লাহ পাক ছওয়াব দিয়ে দিবেন, যেহেতু মেহনতের উপরে আছি। সহীহভাবে শেখার কোন মেহনত যদি না করি বরং যেমন আছে এভাবেই সারা জীবন পড়ে যেতে থাকি, তাহলে আল্লাহ পাক মেহেরবানী করে ছওয়াব দিয়ে দিলে দিয়ে দিতে পারেন, কিন্তু নিয়মে বলে না যে, এতে তিনি ছওয়াব পাবেন। আল্লাহ আমাদের সহীহ বুঝ দান করুন। আমীন!

## ২৭ নং-শবে কদরের বয়ান

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَ مَآ اَدْرٰىكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيْمَانًا وَّاِحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ. وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ: اِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ نَزَلَ جِبْرَئِيْلُ فِى كَبْكَبَةٍ مِّنَ الْمَلٰئِكَةِ يُصَلُّوْنَ عَلٰى كُلِّ قَائِمٍ اَوْ قَاعِدٍ يَّذْكُرُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

আল্লাহ পাকের অশেষ রহমত, আল্লাহ পাকের অশেষ মেহেরবানী, আমরা তারাবীহ-এর মধ্যে পুরো কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করা এবং শোনার তাওফীক হাছিল করেছি। কুরআন শরীফ পড়তে

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

পারাও আল্লাহর খাস রহমত, শুনতে পারাও আল্লাহর খাস রহমত। একমাত্র আসমানী কিতাবের মধ্যে কুরআনে কারীমই এমন কিতাব, যা মানুষ মুখস্থ করতে পারে এবং মুখস্থ রাখতে পারে। অন্য কোন আসমানী কিতাব কেউ মুখস্থ করতেও পারত না, মুখস্থ রাখতেও পারত না। আল্লাহ পাক কুরআন সম্পর্কে বলেছেন,

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ.

'অর্থাৎ, এই কুরআন আমি অবতীর্ণ করলাম, আর অবশ্যই আমি তা সংরক্ষণও করব'।

কেউ এই কুরআনের একটা বাক্য নয়, একটা শব্দ নয়, একটা হরফ নয়, একটা নুকতারও পরিবর্তন করতে পারবে না। দুনিয়ায় অন্য কোন কিতাব এরকম অবিকৃত এবং অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকেনি, শুধু কুরআন রয়েছে। এই যে সংরক্ষিত থাকল, হেফাযত থাকল, এর বড় একটা মাধ্যম হল আল্লাহ পাকের রহমতে মানুষ কুরআন মুখস্থ করতে পারে, মুখস্থ রাখতে পারে। দুনিয়ায় হাজার হাজার নয় বরং লক্ষ হাফেজ রয়েছে। যাদের সিনার মধ্যে আল্লাহ পাক কুরআন হেফাযত রেখে দিয়েছেন। কেউ ইচ্ছা করলেও এই কুরআনের কোন কিছু পরিবর্তন করতে পারবে না। ইসলামের শত্রুরা যদি পরিকল্পিতভাবেও কুরআনের একটা অক্ষর নয়, একটা নুকতা অর্থাৎ, একটা বিন্দুও পরিবর্তন করে দিতে চায়, তাও সম্ভব হবে না। দুনিয়ার সমস্ত কুরআনের কপি যদি কেউ গায়েব করে দিতে সক্ষম হয়, তবুও কুরআনে কেউ পরিবর্তন আনতে পারবে না। লক্ষ হাফেজ রয়ে গেছে যারা বিন্দু মাত্র পরিবর্তন হলেও তা ধরে দিতে পারবে। নামাযে দাঁড়িয়ে যখন কুরআন পড়া হয়, একের পর এক শব্দ ও বাক্য আসতে থাকে, একটা আয়াত যখন তেলাওয়াত করি, তখন বলতে পারি না সামনের আয়াতটা কী, একটা শেষ হয় আরেকটা এসে যায়, একের পর এক এভাবে আসতে থাকে, তখন বুঝে আসে কুরআন মুখস্থ রাখতে পারা আল্লাহর খাস রহমত।

তাই কুরআন পড়তে পারাও আল্লাহর রহমত এবং শুনতে পারাও আল্লাহ্‌র রহমত। আমাদের চেয়ে কত স্বাস্থ্যবান মানুষ, কত সুস্থ মানুষ, কত বিদ্বান মানুষ কুরআন শুনতে পারেনি। তারাবীহ পড়তে পারেনি। আমাদের মধ্যে কত মা'যূর ভাই আছেন যারা দাঁড়িয়ে নামায পড়তে সক্ষম নন, বসে পড়েন, তারপরেও মা'যূরী হালাতে কুরআন শুনেছেন। তাদের প্রতি আল্লাহর রহমত হচ্ছে বলেই তারা শুনতে পেরেছেন। এমনিভাবে দ্বীনের যেকোন কাজ করতে পারা, আল্লাহর যেকোন হুকুম মানতে পারা, যে কোন ইবাদত-বন্দেগী করতে পারা আল্লাহ পাকের খাস মেহেরবানী ছাড়া হয় না। তাই ইবাদত-বন্দেগী করতে পারার জন্যও আল্লাহর কাছে মেহেরবানী চেয়ে নিতে হয়, তাওফীক চেয়ে নিতে হয়। ঈমানের উপরে টিকে থাকার জন্য, আমলের উপরে টিকে থাকার জন্য তাওফীক চেয়ে নিতে হয়। কারণ আল্লাহর রহমত ও তাওফীক ছাড়া কেউ এগুলো করতে পারে না। আল্লাহর যদি ফয়সালা হয় তাহলেই আমার ভিতরে মানার বুঝ আসে, তাহলেই তো আমার ভিতরে মানার চেতনা আসে। তাই যেকোন দ্বীনের কথা আমরা শুনি তখন আল্লাহর কাছে দু'আ করতে থাকি যে, হে আল্লাহ! এটা মানার জযবা আমার ভিতরে দিয়ে দাও! আমি যেন মেনে নিতে পারি, আমার মনে যেন খটকা না থাকে, সব যেন পরিষ্কারভাবে বুঝে নিতে পারি, ভালভাবে আমল করার চেতনা লাভ করতে পারি। এভাবে আল্লাহর কাছে দু'আ করতে থাকতে হবে। যাহোক যা বলছিলাম আল্লাহর রহমতে আমরা খতম করতে পারলাম।

মনে রাখতে হবে খতম তারাবীহ শেষ হয়েছে, তারাবীহ শেষ হয়নি। দেখা যাবে আজ খতম হয়ে যাওয়ার পর অনেকে মসজিদে আসা বন্ধ করে দিব। মসজিদে না এসে ঘরে নামায পড়ব, তাও হয়তো হয়ে উঠবে না। কারণ মসজিদে আসলে যেরকম নামায হয় এবং যেরকম সুন্দর নামায হয়, ঘরে থাকলে

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



কখনও ওরকম সুন্দর নামায হয় না। ঘরে নামায পড়তে গেলে নামাযের ব্যাপারে নানান রকম ওয়াছওয়াছা আসে। কখনও ওয়াছওয়াছা আসে একটু তাড়াতাড়ি পড়ে নেই, কখনও ওয়াছওয়াছা হয় আজকে না হয় গেলই! এভাবে নানান রকম ওয়াছওয়াছা আসতে থাকে। কোন রকম যদি পড়ে নেয়াও হয়, তবুও তা দায়সারা গোছের হয়। সুন্দর নামায ঘরে থেকে হয় না। তাই বলছিলাম তারাবীহ শেষ হয়নি। এ কয়দিন তারাবীহ যেমন সুন্নাতে মুআক্কাদা ছিল, বাকী কয়দিনও সুন্নাতে মুআক্কাদাই থাকবে। মাঝখান থেকে খতম করা বা শোনা একটা বিশেষ সুন্নাত ছিল সেই সুন্নাতের উপরে আমরা আমল করতে পেরেছি। আল্লাহ পাকের কাছে এর শোকর আদায় করি। আগামীতে যদি আল্লাহ আমাদেরকে হায়াত রাখেন, আমরা যেন এরকমই দ্বীনের কাজ করে যেতে পারি।

আজ ২৭শে রাত। এটাই শবে কদরের রাত এমন কোন গ্যারান্টি নেই। হ্যাঁ হাদীছে রাসূল (সা.) যেটা বলেছেন,

تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ. (صحيح البخاري ٢٠١٧)

অর্থাৎ, তোমরা রমযানের শেষ দশকের বেজোড় রাত্রগুলোতে শবে কদর তালাশ কর।

তাই রমযানের শেষ দশকের যেকোন বেজোড় রাতেই শবে কদর হতে পারে। বেজোড় রাত্রগুলোর মধ্যে আজও একটা বেজোড় রাত। তাই এ রাতও শবে কদর হওয়ার একটা বিশেষ সম্ভাবনাময়ী রাত। কোন্ রাত শবে কদর, রাসূল (সা.) তা নির্দিষ্ট করে বলার জন্য নিজের হুজরা থেকে মসজিদে আসছিলেন, মাঝখানে তাঁকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। মসজিদে যখন এসেছেন ,তখন আর মনে নেই কোন্ রাত শবে কদর। আল্লাহ পাকের হয়তো আমাদের আগ্রহ, জযবা দেখার ইচ্ছা যে, এত বড় একটা ফযীলতের রাত পাওয়ার জন্য আমরা একটু মেহনত করতে পস্তুত কি-না। তাই কয়েকটা রাতের ভিতরে শবে কদরকে ঘোরানো হয়েছে, যেকোন রাত হতে পারে, ২১শে রাতেও হতে পারে, ২৩শে রাতেও হতে পারে ২৫শে, ২৭শে বা ২৯শে রাতেও হতে পারে। তাই রাসূল (সা.) বললেন, 'যে, সব বেজোড় রাত্রগুলোতেই তোমরা শবে কদর তালাশ কর'। তালাশ কর অর্থাৎ, এই সব বেজোড় রাত্রগুলোতেই তোমরা শবে কদর পাওয়ার জন্য ইবাদত-বন্দেগী ও দু'আ যা করণীয় আছে তা কর। শবে কদরের ফযীলত পাওয়ার জন্য যতটুকু যা করা দরকার ,সব রাত্রগুলোতেই সমানভাবে করতে বলা হয়েছে।

শবে কদরের তিনটা ফযীলত রয়েছে একটা ফযীলত কুরআনের আয়াতে বলা হয়েছে,

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ.

অর্থাৎ, শবে কদর হাজার মাসের চেয়েও শ্রেষ্ঠ।

হাজার মাসে ইবাদত করলে যত ছওয়াব ও যত মর্যাদা পাওয়া যায়, এই এক রাতে ইবাদত করলে তার চেয়ে বেশি ছওয়াব ও মর্যাদা পাওয়া যায়। এভাবে আল্লাহ পাক যিন্দেগীতে আগে বাড়ার কত সুযোগ করে দিয়েছেন। আগের উম্মতরা ৫০০ বছর, হাজার বছর হায়াত পেত। রাসূল (সা.) একবার সাহাবাদের সামনে বয়ান করলেন যে, বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি ৫০০ বছর জেহাদে কাটিয়েছেন, কেউ এক হাজার বছর আল্লাহর ইবাদত করেছেন। এগুলো শুনে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে তড়পানি শুরু হল, তাদের ভিতরে একটা ব্যথা সৃষ্টি হল যে, তাহলে আমরা তো এত হায়াতও পাব না, এত ইবাদত করারও সুযোগ পাব না। আমরা তাহলে অন্য উম্মতের চেয়ে পিছে পড়ে যাব। তখন কুরআনের এই আয়াত নাযিল হয়েছে যে, আল্লাহ পাক তোমাদেরকে প্রতি বছর রমযানে একটা রাত্র দান করলেন, যে এক রাতে ইবাদত করলে হাজার মাসের চেয়েও বেশি ছওয়াব পাওয়া যায়। হাজার মাসে ৮৩ বছর

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

৪ মাস হয়। এভাবে কেউ যদি যিন্দেগীতে ১২টা শবে কদর পায়, তাহলে এক হাজার বছরের সমান ইবাদত হয়ে যাবে বরং তারচেয়ে বেশি হয়ে যাবে। এভাবে আমাদেরকে অল্প মেহনতে আগের যুগের মানুষের চেয়েও আগে বেড়ে যাওয়ার সুযোগ দেয়া হয়েছে। এই হল শবে কদরের একটা ফযীলত।

শবে কদরের আরেকটা ফযীলত হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيْمَانًا وَّاِحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. (متفق عليه)

অর্থাৎ, শবে কদরে ঈমানের সাথে ছওয়াব অর্জন করার নিয়তে যে ব্যক্তি ইবাদত করবে, তার পেছনের সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেয়া হবে। এটা অনেক বড় ফযীলতের কথা। আল্লাহর কাছে ক্ষমা পেয়ে যাওয়া জীবনের অনেক বড় পাওয়া।

শবে কদরের আরেকটা ফযীলত হাদীছে বলা হয়েছে,

اِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ نَزَلَ جِبْرَئِيْلُ فِى كَبْكَبَةٍ مِّنَ الْمَلٰئِكَةِ يُصَلُّوْنَ عَلٰى كُلِّ قَائِمٍ اَوْ قَاعِدٍ يَّذْكُرُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ. (رواه البيهقى فى شعب الايمان)

অর্থাৎ, যখন শবে কদর হয়, তখন জিব্রাঈল (আ.) তাঁর বাহিনীসহ অর্থাৎ তার অধীনস্থ ফিরিশতাসহ দলবলে সারা দুনিয়ায় ঘুরতে থাকেন। আর যারা এই রাতে ইবাদত করে ও যিকির-আযকার করে তাদের জন্য রহমতের দু'আ করতে থাকেন।

বোঝা গেল এই রাতে ইবাদত করলে আল্লাহর রহমতের ফয়সালা হয়। এই তিনটা ফযীলতের জন্য আমাদের তিনটা আমল করণীয় বলা হয়েছে। একটা আমল হল যা এই হাদীছেই বলা হল, অর্থাৎ নামায পড়া এবং যিকির-আযকার করা।

নামায বলতে বিশেষভাবে নফল নামাযের কথা বোঝানো হয়েছে। তাই কদরের ফযীলত পাওয়ার জন্য নফল নামায পড়তে হবে। ইশার পর থেকে নিয়ে সুবহে সাদেক পর্যন্ত যত নফল পড়া হবে, এটাকে নফলও বলা যায়, তাহাজ্জুদও বলা যায়। কাজেই এই রাতের ফযীলত পাওয়ার জন্য আমরা যে নামায পড়ব তা কী নিয়তে পড়ব? নফলের নিয়তেও পড়তে পারি, তাহাজ্জুদের নিয়তেও পড়তে পারি। কদরের নামায- এ কথা বলা জরুরী নয়।

দুই-দুই রাকআত করে নফল পড়া উত্তম। তাই দুই-দুই রাকআত করে নফল বা তাহাজ্জুদের নিয়তে পড়তে থাকব। যেকোন সূরা দিয়ে পড়তে পারি, কোন সূরার বাধ্য-বাধকতা নেই। আমাদের সমাজে এক সময়ে মাসআলা-মাসায়েল-এর নির্ভরযোগ্য কিতাবের অভাব ছিল। তখন মকসূদুল মু'মিনীন, নেয়ামুল কুরআন বের হয়েছে, তাই মাসায়েলের কিতাব হিসেবে এগুলো জনসমাজে পরিচিত হয়ে যায়। কিন্তু এ বইগুলোর কোনোটাই পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য নয়। এগুলোতে শুধু গলদ মাসআলা নয়, বরং এমন মারাত্মক ভুল কথাও আছে যা বিশ্বাস করলে মানুষের ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে। এগুলোর ভিতরেই এরকম বলা হয়েছে যে, কদরের নামায পড়তে হবে, এত এত রাকআত পড়তে হবে এবং অমুক অমুক সূরা দিয়ে পড়তে হবে। এগুলো ভুল মাসআলা। এসব ভুল মাসআলা দিয়ে মানুষের কাছে দ্বীনকে জটিল করে ফেলা হয়েছে। মা-বোনেরা অনেকে এত জটিল মনে করেন যে, কদরের নামায কী নিয়তে পড়ব, কোন্ কোন্ সূরা কতবার পড়তে হবে, কত রাকআত পড়তে হবে? এগুলো কিছুই জানি না! এভাবে তারা কদরের নামাযকে জটিল মনে করে বসেছেন। অথচ ছিল খুবই আছান। নফল নামায পড়বেন, যেকোন সূরা দিয়ে পড়বেন, যত রাকআত ইচ্ছা পড়বেন। কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



যাহোক শবে কদর উপলক্ষে একটা আমল হল নফল নামায, আরেকটা হল যিকির করা। যা উপরোক্ত এক হাদীছ থেকেই বোঝা যায়। যিকির কী? যিকির হল সুবহানাল্লাহ, আল-হামদু লিল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহু আকবার ইত্যাদি পড়া।

কুরআন তেলাওয়াতও একটা যিকির। আর কদরের রাতের সাথে কুরআনের একটা বিশেষ সম্পর্কও আছে। কারণ কুরআন শরীফ প্রথম নাযিল হয়েছিল কদরের রাতে। তাই এই রাতে যে যিকির-আযকার হবে তার মধ্যে বিশেষভাবে কুরআন তেলাওয়াতও রাখা যায়। শবে কদরের তৃতীয় আমল হল দু'আ করা। দু'আর মধ্যে বিশেষভাবে ক্ষমার দু'আ চাইতে হবে। হযরত আয়েশা (রা.) রাসূল (সা.) কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন,

اَرَاَيْتَ اِنْ عَلِمْتُ اَيَّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ مَاذَا اَقُوْلُ فِيْهَا؟

অর্থাৎ, হযরত আয়েশা (রা.) রাসূল (সা.) কে জিজ্ঞাসা করলেন আমাকে বলুন যদি আমি জানতে পারি শবে কদর কোন রাত, তাহলে আমি কী বলব অর্থাৎ কী দু'আ চাইব? রাসুল (সা.) বললেন তুমি বলবে,

قُوْلِيْ اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ. (رواه الترمذي برقم ٣٥١٣ وقال حسن صحيح)

অর্থাৎ, এই দু'আটা করবে যে, হে আল্লাহ! তুমি বড়ই ক্ষমাশীল, ক্ষমা করতে তুমি ভালবাস, তাই আমাকে ক্ষমা করে দাও।

এটা হল এই রাতের বিশেষ আমল, যা রাসূল (সা.) শিক্ষা দিলেন– সেটা হল আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া। ইসলামে যতগুলো ফযীলতের সময় রয়েছে এবং যতগুলো দু'আ কবুল হওয়ার বিশেষ মুহূর্ত রয়েছে, দেখা যায় শরীআতে এই সব সময় এবং মুহূর্তে ক্ষমার দু'আ চাইতে বলা হয়েছে। কারণ ক্ষমা পাওয়াটাই হচ্ছে মানুষের সবচেয়ে বড় পাওয়া। আমি কিছুই যদি না পাই, শুধু আল্লাহর কাছে ক্ষমা পেয়ে যাই, তাহলে আমি কামিয়াব। পক্ষান্তরে অনেক কিছু পেলাম, স্বাস্থ্য পেলাম, চেহারা পেলাম, গাড়ি-বাড়ি পেলাম, ধন-দৌলত পেলাম নামী-দামী আত্মীয়-স্বজন পেলাম, মান-সম্মান পদমর্যাদা অনেক কিছু পেলাম, কিন্তু আসল জায়গায় যেয়ে ধরা খেয়ে গেলাম, অর্থাৎ আমার ক্ষমা হল না, তাহলে আমার কিছুই হল না, তাহলে আমি ব্যর্থ, আমার জীবন ব্যর্থ। তাই ক্ষমা পাওয়া হল সবচেয়ে বড় পাওয়া। ক্ষমা চাওয়াই হচ্ছে সবচেয়ে বড় চাওয়া। তাই বড় বড় রাত্রগুলোতে বড় বড় সময়ে এই বড় দু'আ করতে বলা হয়েছে।

অন্য যেকোন কিছু আমরা চাইতে পারি আল্লাহর কাছে তো সবকিছু চেয়েই নিতে হয়। হাদীছে এসেছে যে, তুমি আল্লাহর কাছে সবকিছু চেয়ে নাও। এমনকি জুতার ফিতা ছিড়ে গেলে তাও আল্লাহ্র কাছে চেয়ে নাও। এভাবে সবকিছু আল্লাহর কাছে চেয়ে নিতে বলা হয়েছে। আল্লাহ তো চাওয়াটাই পছন্দ করেন। তাই যত আল্লাহর কাছে চাওয়া হয় আল্লাহ তত বেশি খুশি হন। দুনিয়ার মানুষের মত নয়, আমাদের কাছে চাইলেই আমাদের বিরক্তি লাগে, আমাদের কাছে মানুষ যত চায়, তত আমাদের বিরক্তি লাগে। আর আল্লাহর কাছে যত চাওয়া হয় ততই আল্লাহর খুশি লাগে। ততই আল্লাহ বেশি পছন্দ করেন।

যাহোক এই রাতের এই তিনটা আমল– নামায পড়া, যিকির করা তার মধ্যে বিশেষভাবে তেলাওয়াত করা, আর আল্লাহর কাছে দু'আ করা, বিশেষভাবে ক্ষমার জন্য দু'আ করা। নিজের ক্ষমার জন্য, সমস্ত মানুষের জন্য, যারা দুনিয়ায় বেঁচে আছেন তাদের জন্যেও, যারা দুনিয়া থেকে চলে গেছেন,

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বিশেষভাবে আপনজন যারা চলে গেছেন যেমন– মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, তাদের ক্ষমার জন্য, সবার ক্ষমার জন্য দু'আ করতে হবে। শবে কদরের তিনটা ফযীলত পাওয়ার জন্য আমরা এই তিনটা আমল করতে থাকি।

নফল নামায সেহরীর শেষ সময় পর্যন্ত আমরা পড়তে পারি। অনেক ভাই সালাতুত তাসবীহ পড়তে চান। সালাতুত তাসবীহও পড়া যায়। সালাতুত তাসবীহ্-এর ফযীলত তো সব সময়ই আছে। রাসূল (সা.) তাঁর চাচা হযরত আব্বাস (রা.)কে বলেছিলেন, 'চাচা, পারলে আপনি প্রতিদিন এই নামায পড়বেন। তা না পারলে সপ্তাহে একদিন পড়বেন। তাও না পারলে মাসে একবার পড়বেন। তাও না পারলে বছরে একবার পড়বেন। অন্তত জীবনে একবার হলেও এই নামায পড়বেন। এই নামায দ্বারা জীবনের সগীরা, কবীরা, ইচ্ছাকৃত, অনিচ্ছাকৃত, নতুন, পুরাতন, গোপন, প্রকাশ্য সবরকম গোনাহ্ মাফ হয়ে যায়'। সুবহানাল্লাহ! এ নামাযের কত ফযীলত। তাই এই নামাযও আমরা পড়তে পারি।

সালাতুত তাসবীহ্ কথাটার অর্থ হল - সালাত শব্দের অর্থ হল– নামায, আর তাসবীহ বলতে এখানে) سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ সুবহানাল্লাহি ওয়াল হাম্দুলিল্লাহি ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার)। এই নামাযের ভিতরে এই তাস্বীহ পড়া হয়, তাই এই নামাযকে সালাতুত তাসবীহ্ বলে।

এই নামায হল চার রাকআত। প্রত্যেক রাকআতে এই তাসবীহ ৭৫ বার পড়তে হয়। তাহলে চার রাকআতে ৩০০ বার হয়। সালাতুত তাসবীহ্ নামাযে এই তাসবীহ্গুলো পাঠ করার দুইটা নিয়ম আছে। একটা নিয়ম হল– প্রথমে এভাবে নিয়ত করবেন– চার রাকআত সালাতুত তাসবীহ নফল নামাযের নিয়ত করলাম। তারপর ছানা অর্থাৎ, সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহাম্দিকা .... এটা পড়বেন। যেকোন একটা সূরা-কিরাত পড়বেন। সূরা-কিরাত শেষ করে ঐ দাঁড়ানো অবস্থাতেই ১৫ বার ঐ তাসবীহ পাঠ করবেন। এরপর আল্লাহু আকবার বলে রুকুতে যাবেন। রুকুর তাসবীহ পড়ার পর আবার ঐ তাসবীহ্ ১০ বার পড়বেন। তারপর রুকু থেকে উঠে 'রাব্বানা লাকাল হাম্দ' বলার পর আবার ঐ তাসবীহ ১০ বার পড়বেন। তারপর সাজদায় যাবেন। সাজদার তাসবীহ পড়ার পর ঐ তাসবীহ ১০ বার, সাজদা থেকে উঠে দুই সাজদার মাঝখানে ১০ বার, দ্বিতীয় সাজদায় সাজদার তাসবীহ পড়ার পর আবার ঐ তাসবীহ্ ১০ বার। এই হল ৬৫ বার। এখন আল্লাহু আকবার বলে দ্বিতীয় সাজদা থেকে উঠে বসে আবার ১০ বার। এই হল এক রাকআতে মোট ৭৫ বার। এবার দ্বিতীয় রাকআতের জন্য উঠবেন। এখানে আল্লাহু আকবার বলে উঠতে হবে না। উঠার আল্লাহু আকবার তো আগেই বলা হয়ে গেছে। দ্বিতীয় রাকআতে ঐ রকম সূরা-কিরাতের পর ১৫ বার, রুকুর তাসবীহের পর ১০ বার, রাব্বানা লাকাল হাম্দ-এর পর ১০ বার, প্রথম সাজদায় ১০ বার, দুই সাজদার মাঝখানে ১০ বার, দ্বিতীয় সাজদায় ১০ বার। এরপর আল্লাহু আকবার বলে উঠবেন। এখানে আত্তাহিয়্যাতু পড়তে হবে। এখানে আগে ১০ বার ঐ তাসবীহ পড়ে তারপর আত্তাহিয়্যাতু পড়তে হবে। মনে রাখতে হবে – এই তাসবীহ সব জায়গায় স্থানীয় তাসবীহের পরে, যেমন সূরা-কিরাতের পরে, রুকুর তাসবীহের পরে, সাজদার তাসবীহের পরে, রাব্বানা লাকাল হাম্দ-এর পরে, এভাবে সবকিছুর পরে, শুধু প্রথম বৈঠকে এবং শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পড়ার জন্য যখন বসা হবে, তখন আত্তাহিয়্যাতু-র আগে ঐ তাসবীহ ১০ বার করে পড়বেন। তারপর আত্তাহিয়্যাতু পড়বেন। শেষ রাকআতেও আগে ১০ বার পড়ে তারপর আত্তাহিয়্যাতু, দুরূদ শরীফ ও দুআয়ে মাছূরা পড়বেন। এভাবে আমরা চার রাকআত সালাতুত তাসবীহ নামায পড়ব। এই নিয়মটা উত্তম।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com



আরও একটা নিয়ম আছে, অনেকে হয়তো সেভাবে মুখস্থ করে রেখেছেন, তারা সেভাবে পড়তে পারেন। সেই নিয়ম অনুযায়ী নিয়ত বেঁধেই ছানা পড়ার পর সূরা-কিরাত পড়ার আগে ১৫ বার, এরপর সূরা কিরাত শেষ করে দশবার। এখানে দাঁড়ানো অবস্থায় দশবার বেশি হয়ে গেল। এই নিয়মে পড়লে দ্বিতীয় সাজদা থেকে সোজা দাঁড়িয়ে যাবেন। দ্বিতীয় সাজদাতেই ৭৫ বার হয়ে যাবে। এ নিয়মে প্রথম বৈঠক এবং শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পড়ার জন্য যখন বসবেন, তখন আর ঐ তাসবীহ পড়তে হবে না।

তাসবীহ মনে রাখার জন্য আঙ্গুলের কর গণনা করা নিষেধ। ভাল মত খেয়াল রাখলে কিছুই টিপা টিপির দরকার হয় না। একান্তই মনে রাখার প্রয়োজনে আঙ্গুল টিপে টিপে মনে রাখা যেতে পারে। তাসবীহ ৩০০ বার হতে হবে। কম থাকলে চলবে না। তাহলে সালাতুত তাসবীহের ফযীলত পাওয়া যাবে না। তাই খুব এতমীনানের সাথে পড়তে হবে। যদি কেউ কোন এক জায়গায় তাসবীহ পড়তে ভুলে যান বা কম থেকে যায়, তাহলে পরবর্তীতে যে জায়গায় মনে আসবে সেখানে ঐ জায়গারটাও পড়বেন, পিছনের ছুটে যাওয়াটাও আদায় করে নিবেন। সালাতুত তাসবীহ নামায একাকী পড়তে হয়, জামাতে পড়া মাকরূহ।

সালাতুত তাসবীহ যেকোন সূরা দিয়ে পড়তে পারেন। কেউ কেউ বলেছেন সূরা আছর, কাউছার, কাফেরূন ও এখলাস বা সূরা হাদীদ, হাশ্র, ছফ ও তাগাবুন দ্বারা পড়া উত্তম। তবে জরুরী নয়। যেকোন সূরা দিয়ে পড়া যেতে পারে। এমনিভাবে এই রাতে যত নফল পড়বেন, তা যেকোন সূরা দিয়ে পড়তে পারেন। কোন কোন বই পুস্তকে লেখা আছে শবে কদরের নামাযে অমুক অমুক সূরা এতবার করে পড়তে হবে, এটা ঠিক নয়। এরকম নির্দিষ্ট কোন সূরার বাধ্যবাধকতা নেই। নফল নামায খুব আছান। শবে কদরের নামাযও নফল, এটাও খুব আছান - কোন নির্দিষ্ট সূরার বাধ্যবাধকতা নেই। যেকোন সূরা দিয়ে পড়তে পারি। অনেকে অমুক অমুক সূরা দিয়ে পড়তে হয় -এরকম ভুল ধারণার শিকার হয়ে এ রাতের নামাযকে কঠিন মনে করে বসেন। আসলে ওরকম কঠিন নয়। যাহোক আমরা নফল নামায পড়ব আর আল্লাহর কাছে দু'আ চাইতে থাকব। বিশেষভাবে ক্ষমার জন্য দু'আ চাইতে থাকব।

এভাবে যেকোন নফল ইবাদত করব, তেলাওয়াত করব, দু'আ করব। এই আমলগুলো এই রাতেও করব, আগামী ২৯ শে রাতেও করব। আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে শবে কদরের ফযীলত নসীব করেন। কদরের ফযীলত থেকে যেন আমরা বঞ্চিত না হই। এবং আমরা যা রোযা রেখেছি, তেলাওয়াত করেছি, বিশেষ করে নামাযের ভিতরে তেলাওয়াত করেছি, এর ভুল-ত্রুটি আল্লাহ পাক মাফ করে দিয়ে আমাদেরকে পুরোপুরি ছওয়াব নসীব করেন। আমীন!

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

## রমযানের ২৮ নম্বর বয়ান

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِنَّ لِلّٰهِ عُتَقَاءَ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ (يَعْنِيْ فِيْ رَمَضَانَ) لِكُلِّ عَبْدٍ مِنْهُمْ دَعْوَةٌ مُّسْتَجَابَةٌ. (رواه أحمد في مسنده برقم ٧٤٤٣ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين)

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

রমযানের শেষ দশকের আজ অষ্টম রাত। শেষ দশক জাহান্নাম থেকে মুক্তির দশক। পুরা রমযানেই প্রতিদিন আল্লাহ পাক বহু লোককে জাহান্নাম থেকে স্থায়ীভাবে মুক্তি দিয়ে থাকেন। তার মধ্যে শেষ

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

দশকে বিশেষভাবে মুক্তি দেন। যে হাদীছখানা আমি তেলাওয়াত করেছি, তার মধ্যে রাসূল (সা.) বলেন, 'রমযানের প্রতিদিন আল্লাহ পাক জাহান্নামের বহু কয়েদীকে মুক্তি দিয়ে থাকেন'। এরপর রাসুল (সা.) বলেছেন, এবং প্রতিদিন মুসলমানের একটা দু'আ অবশ্যই কবুল হয়ে থাকে। এ হাদীছে প্রতিদিন আল্লাহ পাক বহু লোককে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন– এই কথার সাথে সাথে বলা হয়েছে প্রতিদিন অন্তত একটা দু'আ অবশ্যই কবুল হয়ে থাকে। এই মুক্তি দেয়া এবং দুআ কবুল হওয়া কথা দুটোকে পাশাপাশি বলে হয়তো এদিকেও ইংগিত করা হয়েছে যে, প্রতিদিন যে আল্লাহ পাক বহু লোককে মুক্তি দিবেন, তুমিও দু'আ কর তোমার লোকজনও যেন মুক্তি পেয়ে যায়। রমযান শেষ হওয়ার পথে। তাই আমাদের আপনজনের মুক্তির জন্য বিশেষভাবে দু'আ করতে হবে। যদি তাদের উপর কোন আযাবের ফয়সালা হয়ে থাকে, তাহলে এই রমযানের ওছীলাতে যেন আল্লাহ পাক তাদের জন্য স্থায়ীভাবে জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তির ফয়সালা করে দেন। এ হাদীছে যে বলা হয়েছে প্রতিদিন অন্তত একটা দু'আ অবশ্যই কবুল হয় – মুহাদ্দিছীনে কেরাম বলেছেন, এই দু'আটা ইফতারীর সময় কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। তাই এখন থেকে ইফতারীর সময় বিশেষভাবে স্মরণ করে নিজেদের আপনজনের জন্য দু'আ করতে হবে। ইফতারীর আইটেম কয়টা হল, কোন্‌টা আসল, কোন্‌টা বাদ পড়ল – এগুলো দেখতে দেখতে, এগুলো চিন্তা করতে করতে যেন দু'আর কথা ভুলে না যাই। আল্লাহ পাক যিন্দা-মুরদা সকলের জন্য নাজাতের ফয়সালা করেন। আমীন!

## রমযানের ২৯ নম্বর বয়ান

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

**قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ.** (صحيح البخاري برقم ٢٠١٧)

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

রমযানের আজ ২৯শে রাত। সর্বশেষ বেজোড় রাত। শেষ দশকের প্রত্যেক বেজোড় রাতে শবে কদর তালাশ করার কথা হাদীছে বলা হয়েছে। ২৭শে রাতে শবে কদর তালাশ করা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, ২৯শে রাতেও শবে কদর তালাশ করা ঐ রকম-ই গুরুত্বপূর্ণ। হাদীছে নিশ্চিত করে একথা বলা হয়নি যে, ২৭শে রাত -ই শবে কদর। যেকোন বেজোড় রাতেই শবে কদর হতে পারে।

কোন্ রাত শবে কদর তা নিশ্চিত করে বলার জন্য রাসূল (সা.) সাহাবীদের কাছে আসছিলেন, কিন্তু পথিমধ্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁকে ভুলিয়ে দেয়া হয়। রাসূল (সা.) ভুলে যান। উলামায়ে কেরাম বলেছেন, এর মধ্যেও হেকমত রয়েছে। যদি কোন এক রাত্রের ব্যাপারে নিশ্চিত জানা থাকত যে, এটাই শবে কদর, তাহলে মানুষ অন্য রাতে আর ইবাদত বন্দেগী করত না। এখন এক ওছীলায় অনেক রাতেই মেহনত হচ্ছে। আর এতবড় ফযীলত পাওয়ার জন্য তালাশ আগ্রহও ঐ পর্যায়ের থাকতে হয়, মেহনত মোজাহাদাও ঐ পর্যায়ের থাকতে হয়। তাই অনেক রাতেই এটা তালাশ করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যাতে মানুষের আগ্রহের পরিমাণ, মেহনত-মোজাহাদার পরিমাণ কতটুকু তার পরিচয় পাওয়া যায়। তাই আজ রাতেও শবে কদর পাওয়ার জন্য আমাদেরকে মেহনত করতে হবে। যদি বাস্তবেই এ বছর আজ ২৯শে রাতে শবে কদর হয়ে থাকে, আর আমরা মেহনত করলাম না, তাহলে সারাপথ দৌড়াদৌড়ি আসল জাগায় গড়াগড়ি হয়ে যাবে। এরকম যেন না হয়। তাই আজ রাতেও শবে কদরের জন্য

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



বিশেষভাবে নামায পড়তে হবে, দু'আ করতে হবে এবং বিশেষভাবে মাগফিরাতের দু'আ করতে হবে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

## রমযানের ৩০ নম্বর বয়ান

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

**وَفِى الْحَدِيْثِ اِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْفِطْرِ سُمِّيَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةُ لَيْلَةَ الْجَائِزَةِ.** (الترغيب والترهيب)

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

আমরা মাহে রমযানের শেষ রাতে এসে উপনীত হয়েছি। সামনে রমযানের একদিন বাকী আছে। রহমত, বরকত, মাগফিরাত ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি এই সবকিছু প্রাণ ভরে চেয়ে নেই। সামনে আসছে ঈদের রাত। এটাও একটা বরকতময় রাত। এই রাতেও ইবাদত করার ফযীলত রয়েছে। হাদীছে এসেছে উপরে হাদীছটি তেলাওয়াত করেছি, এর মধ্যে বলা হয়েছে, ঈদের রাতকে বলা হয় পুরস্কারের রাত। কাজেই পুরস্কার বন্টনের সময় অনুপস্থিত থাকা বোকামি। অন্য এক হাদীছে এসেছে, যারা দুই ঈদের রাতে ইবাদত করে, কিয়ামতের ভয়াবহ দিনে যখন সবাই পেরেশান, হতাশ এবং মহা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায় থাকবে, সেই সময় যারা দুই ঈদের রাতে ইবাদত করে, তারা নিশ্চিন্ত থাকবে, তাদের মনে কোন পেরেশানী থাকবে না। ময়দানে হাশরের ভয়াবহতায় তাদের দিল ঘাবড়াবে না। কিয়ামতের ভয়াবহতা এমন হবে যে, কুরআনে বলা হয়েছে, যদি কোন মহিলার গর্ভ থাকে, তাহলে তার গর্ভপাত হয়ে যাবে, দুশ্চিন্তায় যুবক বৃদ্ধ হয়ে যাবে, মানুষকে দেখাবে সবাই যেন মাতাল অবস্থায় আছে, বেহুশ অবস্থায় আছে। কিন্তু আসলে তারা মাতাল নয়। হয়রানি, পেরেশানী, ভয়াবহতা, বিভীষিকার এমন অবস্থা হবে যে, সকলকে তখন অস্বাভাবিক মনে হবে। দুই ঈদের রাত খুশির দুই রাত, আনন্দের রাত। এ সময়ে যদি আমারা আল্লাহকে স্মরণ করি, তাহলে আল্লাহ পাক সবচেয়ে পেরেশানীর দিন আমাদেরকে পেরেশানী থেকে মুক্ত রাখবেন এবং আনন্দিত রাখবেন। এদিক থেকে বিবেচনা করলে ঈদের দুই রাত অনেক ফযীলতের রাত। তাই ঈদের রাতেও আমরা ইবাদত করব, এই নিয়তে যেন আল্লাহ পাক কিয়ামতের ময়দানের ভয়াবহতা থেকে আমাদেরকে মুক্তি দেন। আল্লাহর কাছে বিশেষভাবে দু'আ করি, আমাদের রোযাগুলোকে আল্লাহ পাক কবুল করে নেন, তারাবীহগুলোকে কবুল করে নেন, তেলাওয়াত যিকির-আযকার ইত্যাদি যা কিছু টোটা-ফাটা ইবাদত-বন্দেগী করেছি সব আল্লাহ পাক কবুল করে নেন। আমীন!

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বয়ান নং -৩৩

## রমযানের প্রস্তুতি

(রমযানের পূর্বের জুমুআর বয়ান)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ. وَقَالَ تَعَالٰى : وَ مَنْ يُّعَظِّمْ شَعَآئِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. تَسَحَّرُوْا فَاِنَّ فِى السَّحُوْرِ بَرَكَةً.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

শাবান মাসের আজ ..... তারিখ। যদি এ মাস ২৯ শে যায়, তাহলে .....দিবাগত রাতে তারাবীহ শুরু হবে এবং সেই রাতে সেহরী খেয়ে পরের দিন থেকে রোযা রাখা শুরু হবে। আর মাস ৩০ শে গেলে একদিন পিছাবে। এই রমযান মাসে আমরা রোযা তারাবীহসহ সকল ইবাদত-বন্দেগী পূর্ণাঙ্গভাবে আদায় করতে পারি, এজন্য মনের থেকে পস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। একটা রমযান মাস আমাদের সামনে আসছে, তার পরবর্তী রমযান মাস আমরা পাব তার কোন গ্যারান্টি নেই। এই রমযানই হতে পারে আমার যিন্দেগীর শেষ রমযান। অনেক ভাই গত বছর ছিলেন এই বছর নেই, আবার আমাদের মধ্যে হয়তো অনেক ভাই পরবর্তী বছর থাকব না। তাই জীবনের শেষ রমযান মনে করে পূর্ণ যত্নের সাথে রমযানের যাবতীয় ইবাদত পালন করা চাই। কেননা হতে পারে এটাই আমার জীবনের শেষ রমযান।

সব ইবাদতের ক্ষেত্রেই এরকম মনোভাব রাখতে হয় যে, হয়তো এটাই আমার এই ইবাদত করার শেষ সুযোগ। নামাযের ক্ষেত্রেও বলা হয়েছে এমন মনোভাব নিয়ে নামায পড়বে. যেন এটাই তোমার জীবনের শেষ নামায। হতে পারে এর পরবর্তী নামায আর পাবে না। তাই যতবেশি সুন্দর করে পড়া যায়, পড়ে নিতে হবে। হয়তো জীবনে আর নামায পড়ার সুযোগ পাবে না। রোযার ক্ষেত্রে এরকম চিন্তা রাখতে হবে যে, হতে পারে এটাই আমার শেষ রোযা, হয়তো পরবর্তী রমযান আর পাব না। তাই সব রকম গাফিলতী ছেড়ে দিয়ে. সব রকম বাহানা অজুহাত বর্জন করে রোযা রাখতে হবে, তারাবীহ আদায় করতে হবে, রমযানের যাবতীয় হক আদায় করতে হবে।

ইবাদত সামনে আসলে আমাদের মধ্যে নানা রকম বাহানা এসে যায়। রোযা রাখার ক্ষেত্রে বাহানা হয় যে, আমার গ্যাষ্টিক, রোযা রাখতে প্রচণ্ড কষ্ট হয়। কারও বাহানা হয় আমার ডায়াবেটিস, রোযা রাখলে সুগার নীল হয়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। কারও বাহানা হয় আমার প্রচণ্ড লো প্রেসার, রোযা রাখলে আমার কোন দুর্ঘটনা হয় কি-না। ইত্যাদি নানা রকম বাহানা, নানা রকম অজুহাত মানুষের সামনে আসে। এর মধ্যে কিছু অজুহাত এমন যা মানুষ এরাদা করলেই দূর হয়ে যায়। যদি কেউ মজবূত এরাদা করেন, পাক্কা এরাদা করেন যে, আমি রোযা রাখবই, তাহলে অনেকেরই এ সমস্ত অজুহাত অজুহাত থাকবে না। যদি বাস্তবেই কারও অসুবিধা এবং মা'যুরী থাকে, তাহলে তার ব্যাপারে শরীআতে আছানী রাখা হয়েছে। যদি বাস্তবেই কারও অবস্থা এরকম হয় যে, রোযা রাখলে তার জীবনের আশঙ্কা কিংবা তার রোগ মারাত্মকভাবে বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা, তাহলে তার ব্যাপারে শরীআতে আছানী রাখা হয়েছে। তিনি রোযা বর্জন করতে পারেন। তবে এর পরে জীবনে যদি কখনো সুস্থ হন– এতটুকু সুস্থ হন যে, রোযা কাযা করতে পারেন, তাহলে তখন কাযা করতে হবে। এখন আমি মা'যুর তাই রোযা না রাখতে

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



পারি– এর অর্থ এই নয় যে, জীবনে আর রাখতেই হবে না। জীবনে আবার যদি কখনো সুস্থ হয়ে যাই এবং কাযা করার ক্ষমতা ফিরে আসে, তাহলে আমাকে রোযা কাযা করতে হবে। এখন রোযা রাখতে পারলাম না, রোযার ফিদইয়া বা ফিতরা দিয়ে দিলাম, ব্যস সম্পূর্ণ চিন্তা মুক্ত হয়ে গেলাম তা নয়। এই ফিতরা বা ফিদইয়া আদায় করার পরও জীবনে পরে কখনও রোযা কাযা করার মত সুস্থ হলে তাকে কাযা করতে হবে। কাজেই কোনোভাবে গা বাঁচানোর চিন্তা রাখা যাবে না। যদি বাস্তবেই কেউ মা'যুর হন, এরকম অসুস্থ হন যে, রোযা রাখলে তার রোগ আরও বেড়ে যাবে কিংবা জীবনের আশঙ্কা দেখা দিবে। কোন দ্বীনদার ডাক্তার যদি এরকম বলেন এবং রোযা না রাখার পরামর্শ দেন, তাহলে তিনি রোযা ছাড়তে পারবেন। কোন গর্ভবতী মহিলা বা দুগ্ধদায়িনী মহিলা রোযা রাখলে যদি তার নিজের জীবনের আশঙ্কা থাকে কিংবা বাচ্চার জীবনের আশংকা থাকে, আর কোন দ্বীনদার ডাক্তার তাকে রোযা না রাখার পরামর্শ দেন, তাহলে তিনিও রোযা ছাড়তে পারেন, তবে পরে কাযা করতে হবে। তবে শুধু নিজে মনে মনে কল্পনা করলেই হবে না যে, রোযা রাখলে আমার এই এই মারাত্মক অসুবিধা হবে। বরং কোন দ্বীনদার ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করে নিতে হবে। আর অনেক সময় ডাক্তারকেও জিজ্ঞাসা করার দরকার হয় না। নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করলেও জওয়াব পাওয়া যায়। আমার মনই বলে দিবে বাস্তবে আমার মারাত্মক অসুবিধা আছে কি-না। মানুষকে অনেক কিছু বলে বোঝানো যায় যে, আমার এই অসুবিধা, সেই অসুবিধা। কিন্তু আসলে কতটুকু অসুবিধা তাতো আমি নিজেই জানি। নিজের মনের কাছে জিজ্ঞেস করলেই আসল জওয়াব পাওয়া যায়। মানুষের কাছে আসল কথা লুকানো যায়, কিন্তু নিজের মনের কাছে লুকানো যায় না। আল্লাহর কাছেও লুকানো যায় না। মনের মধ্যে যদি চোর লুকানো থাকে, তাহলে মন সেটার সাক্ষী দিবে, আল্লাহ পাকও সেটা জানবেন। কুরআন শরীফে বলা হয়েছে,

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ.

অর্থাৎ, আল্লাহ মনের সব কথা জানেন। (তাগাবুন: ৪)

তাই আল্লাহকে ফাঁকি দেয়া যাবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাকড়াও করবেন। কিয়ামতের দিন এক পর্যায়ে মানুষের যবান বন্ধ করে দেয়া হবে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সাক্ষী দিবে বাস্তবে শরীআত সম্মত ওজর ছিল কি-না। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰى اَفْوَاهِهِمْ وَ تُكَلِّمُنَآ اَيْدِيْهِمْ وَ تَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ.

অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক বলবেন, আজ তোমাদের যবান আমি বন্ধ করে দিব, মুখে সিল মোহর মেরে দিব। তোমাদের হাত, পা ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আমার সাথে কথা বলবে অর্থাৎ, সাক্ষী দিবে। (ইয়াছীন: ৬৫)

অতএব মনে রাখতে হবে কোনভাবেই আল্লাহর কাছে কোনকিছু লুকানো যাবে না। হ্যাঁ বাস্তবেই যদি কেউ মা'যুর হন, তাহলে মাসআলা হল– এখন তিনি রোযা কাযা করতে পারবেন, তবে জীবনে কখনো আবার কাযা করতে পারার মত সুস্থ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে ফিদইয়া দেয়া চলবে না। কাযা করার নিয়ত রাখতে হবে, যখন সুস্থ হবেন তখন কাযা করবেন। যদি এমন অবস্থা হয় যে, আমার সেরকম সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা নেই, যেমন অতি বৃদ্ধ কিংবা এমন মারাত্মক কোন রোগে আক্রান্ত, সাধারণভাবে যার থেকে সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা নেই, তাহলে তিনি একটা রোযার বদলে একটা ফিদইয়া বা ফিতরা আদায় করতে পারেন। ফিদইয়ার পরিমাণ হল ঈদুল ফিতরের দিন জনপ্রতি যে ফিতরা আদায় করা হয় সে পরিমাণ। প্রতিটা রোযার বদলে ঐ পরিমাণ ফিদইয়া আদায় করতে হবে। ৩০টা রোযার বদলে এরকম ৩০ ফিতরা পরিমাণ আদায় করতে হবে। কিন্তু যিনি সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা রাখেন

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

তার ক্ষেত্রে মাসআলা হল এখন তিনি রোযা ছাড়তে পারেন, ফিদইয়াও দিতে পারেন তবে সুস্থ হলে তাকে কাযা আদায় করতে হবে।

যিনি রোযা রাখতে পারবেন না, তিনিও প্রকাশ্যে পানাহার করতে পারবেন না। যা কিছু পানাহার করার গোপনে করবেন, প্রকাশ্যে নয়। কোন অসুস্থ ব্যক্তির পক্ষেও রমযান মাসে প্রকাশ্যে পানাহার করার অনুমতি দেয়া হয়নি। কারণ তাতে রমযানের অবমাননা হয়। রমযানের সম্মান রক্ষার খাতিরে কেউ প্রকাশ্যে পানাহার করতে পারবে না। রমযান মাস হল ইসলামের তথা মুসলমানদের একটা শি'আর বা ধর্মীয় প্রতীক। এই ধর্মীয় প্রতীককে সম্মান জানাতে হবে। ইসলামে সমস্ত ধর্মীয় প্রতীককে সম্মান জানানোর নিয়ম রাখা হয়েছে। দাঁড়ি, টুপি, পাগড়ী, এগুলোও ইসলামের ধর্মীয় প্রতীক, এগুলো ইসলাম ধর্মের নিদর্শন। এগুলোর সম্মান রক্ষা করাকেও জরুরী করে দেয়া হয়েছে। কেউ যদি ধর্মীয় প্রতীককে অবমাননা করে, তাহলে তার ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

وَ مَنْ يُّعَظِّمْ شَعَآئِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ.

অর্থাৎ, কেউ আল্লাহর মনোনীত ধর্মের প্রতীকগুলোকে সম্মান দেখালে এটা তার অন্তরে তাকওয়া বা আল্লাহর ভয় থাকার পরিচয়। (হাজ্জ: ৩২)

কেউ যদি দাঁড়ি, টুপি, পাগড়ী, মসজিদ, মাদ্রাসা ইত্যাদি ধর্মের কোন প্রতীককে অবমাননা করে, তাহলে এটা হল তার ভিতরে তাকওয়া বা আল্লাহর ভয় না থাকার পরিচয়।

ধর্মের শি'আর বা প্রতীককে অবমাননা করার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। ফোকাহায়ে কেরাম বলেছেন, যারা ধর্মের প্রতীককে নিয়ে উপহাস করে, টিকা-টিপ্পনী কাটে, তাদের ঈমান থাকে না। (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক)। মাসআলা বড় শক্ত! তাই যারা রোযা রাখতে সক্ষম নয়, তারাও প্রকাশ্যে পানাহার করে রমযানের অবমাননা করতে পারবে না। আর যারা রোযা রাখতে সক্ষম, তা স্বত্ত্বেও রোযা রাখছেন না, প্রকাশ্যে পানাহার করছেন, প্রকাশ্যে বিড়ি-সিগারেট খাচ্ছেন, তারা মারাত্মক অন্যায় করছেন। যারা প্রকাশ্যে পানাহার করার কাজে সহযোগিতা করছেন, তারাও অন্যায়ের সহযোগিতা করার জন্য দায়ী। এজন্যই বলা হয় রমযান মাসে কোন হোটেল রেস্তোঁরা খোলা রাখা যাবে না। যারা অসুস্থ তাদের জন্য হোটেল রেস্তোঁরা খোলা রাখার অজুহাত গ্রহণযোগ্য নয়। যদি বাস্তবে কেউ মা'যূর থাকে, অসুস্থ থাকে, তারা হোটেলেই খাওয়া দাওয়া করবে এটা জরুরী নয়। তারা ব্যক্তিগতভাবে গোপনে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিবে। কিছু লোক আছেন যারা রমযান মাসে হোটেল রেস্তোঁরা খোলা রাখার পক্ষে যুক্তি পেশ করেন যে, বহু অসুস্থ ব্যক্তি থাকেন, হাসপাতালের রোগীরা আছেন, বিদেশী লোকজন আছেন, বিধর্মীরা আছেন। এখন যদি হোটেল রেস্তোঁরা খোলা না থাকে তাহলে তারা কোথায় খাবে? কিন্তু বাস্তব কথা হল বিদেশীরা এই সমস্ত রাস্তার আশে পাশে প্রকাশ্যে খেতে আসে না। হাসপাতালের রোগীরা হাসপাতাল থেকেই খাবার পায় বা বাসা-বাড়ী থেকে স্পেশালভাবে রোগীর উপযোগী করে তাদের জন্য খাবার তৈরি করে নেয়া হয়। সাধারণত রোগীরা হোটেলের খাবার খায় না। সুস্থ মানুষ-ই তো হোটেলে খেতে চায় না যে, খেলে আমি অসুস্থ হয়ে যাব। সেখানে অসুস্থ লোকদের হোটেল থেকে খাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। দুই চারজন বিধর্মী যাদের বাসাবাড়ির ব্যবস্থা নেই, তাদেরও মুসলমানদের ধর্মীয় বিষয়ের ব্যাপারে সহিষ্ণু হয়ে একটু গোপনে খাবারের ব্যবস্থা করার কষ্ট স্বীকার করা উচিত। অতএব নিজেদের নফসানিয়াত মিটানোর জন্য অবাধে হোটেল রেস্তোঁরা খোলা রাখার পক্ষে অসুস্থ, বিদেশী, বিধর্মী ইত্যাদি লোকদের অজুহাত বের করাকে মেনে নেয়া যাবে না, ধর্মের বিশেষ প্রতীককে অবমাননা করা মেনে নেয়া যাবে না। এ সমস্ত অজুহাত দিয়ে আল্লাহর কাছে পার পাওয়া যাবে না।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



রোযা না রাখলেও বা রাখতে না পারলেও রোযার সম্মান রক্ষা করতে হবে। যারা রোযা রাখতে সক্ষম, তা সত্ত্বেও প্রকাশ্যে পানাহার করেন, তাদের ডবল পাপ হবে। একটা হল রোযা না রাখার পাপ, আরেকটা হল রমযান মাসকে অবমাননা করার পাপ। যদি কোন কারণ বশত কারও রোযা ভঙ্গ হয়ে যায়, তারপরেও বলা হয়েছে তিনি দিনের অবশিষ্ট সময়টুকু রোযাদারের মত থাকবেন। আর রোযা রাখতে অক্ষম হলে প্রকাশ্যে নয় বরং গোপনে পানাহার করবে, প্রকাশ্যে মানুষের সামনে রোযাদারের মতই থাকবে। রমযান মাসের সম্মান রক্ষার খাতিরেই এরকম মাসআলা রাখা হয়েছে।

মাসিক অবস্থায় মহিলাদের নামায পড়া নিষেধ। এ অবস্থায় নামায পড়া যায় না। মাসিক অবস্থায় তারা রোযাও রাখবে না, তবে রোযা পরে কাযা করতে হবে। কিন্তু এরপরও যাতে বাচ্চারা বা বাইরের কেউ টের না পায় যে, সে রোযাদার নয়। তাই এ অবস্থায় তারা প্রকাশ্যে পানাহার করবে না। কারণ যদি প্রকাশ্যে পানাহার করতে দেখা যায়, তাহলে বাচ্চারা বা বাইরের লোকেরা মনে করবে যে, অমুকে রোযা রাখে না। এভাবে তার সম্পর্কে একটা অহেতুক বদ-ধারণা এসে যাবে। এসব মহিলাদের জন্য মাসআলা রাখা হয়েছে, নামাযের সময় হলে তারা নামাযের স্থানে যেয়ে তাসবীহ তাহলীল করতে থাকবে। অন্যথায় বাচ্চা-কাচ্চারা মনে করবে যে, মা নামায পড়েন না। কী জন্য নামায পড়েন না, বাচ্চারা বুঝবে না, যার কারণে বাচ্চার মনে খারাপ আছর হবে যে, মা নামায পড়েন না, তাহলে নামায পড়া বুঝি এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। মাঝে মধ্যে নামায ছাড়াও যায়। এই জন্য বলা হয়েছে মাসিক অবস্থায়, নেফাসের অবস্থায় যে কয়দিন নামায মাফ, তখনও উযূ করবে, জায়নামাযে বসে তাসবীহ তাহলীল পড়তে থাকবে, যা দেখে বাচ্চা-কাচ্চারা বুঝবে যে, তিনি নামায পড়ছেন। যাতে করে বাচ্চার মনে নামাযের প্রতি একটা খারাপ ধারণা, একটা অবহেলার ধারণা জন্ম নিতে না পারে। আমি অসুস্থ বা মা'যূর হলেও রমযানে প্রকাশ্যে পানাহার করব না; বরং প্রকাশ্যে রোযাদারের মত থাকব। যাতে বাইরের লোকেরা দেখলে মনে করবে উনি রোযাদার। আমি মা'যূর কি মা'যূর নই তা বাইরের লোকেরা বুঝবেন না। তারা মনে করবে যে, উনিও তো খুব নামাযী মানুষ, দ্বীনদার মানুষ, ভাল মুসলমান, তারপরও উনি রোযা রাখেননি। উনাকে দেখলাম হোটেলে চা খাচ্ছেন। এভাবে আমার ব্যাপারে বদ-ধারণা এসে যাবে। অহেতুক নিজের ব্যাপারে বদ-ধারণা আসার সুযোগ দেয়া উচিত নয়।

যাহোক রমযান মাসের সম্মান রক্ষার কথা বলা হচ্ছিল। রমযান মাসের সম্মান রক্ষা করা ওয়াজিব। রোযা না রাখলেও বা রাখতে না পারলেও রমযান মাসের সম্মান রক্ষা করে চলতে হবে।

রোযার উদ্দেশ্য কী? আমাদের কাছে মনে হবে রোযা রাখার উদ্দেশ্য হল সারা দিন না খেয়ে নফ্সকে কষ্ট দেয়া। আল্লাহ পাক বোধ হয় আমাদেরকে কষ্টই দিতে চান। না হলে একমাস সারাদিন এভাবে না খেয়ে কষ্ট করার পিছনে কী যুক্তি! অথচ রোযার উদ্দেশ্য এটা নয়। আমাদেরকে না খাইয়ে কষ্ট দেয়া আল্লাহর উদ্দেশ্য নয়। রোযার কী উদ্দেশ্য তা স্বয়ং আল্লাহ পাক নিজেই বলে দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

অর্থাৎ, হে মুমিনরা! তোমাদের উপরে রোযার বিধান দেয়া হল, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদেরকে রোযার বিধান দেয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা মুত্তাকী পরহেযগার হতে পার। (বাকারা: ১৮৩)

মুত্তাকী বা পরহেযগার শব্দটার অর্থ হল যিনি গোনাহ থেকে বিরত থাকে। আর গোনাহ থেকে বিরত থাকতে হলে নেক আমলও করতে হয়। কারণ নেক আমল বর্জন করলে গোনাহ হয়। যেমন নামায পড়া নেক আমল, এই আমল বর্জন করলে অর্থাৎ, নামায না পড়লে গোনাহ হয়। অতএব সব রকম গোনাহ থেকে বাঁচতে গেলে গোনাহের কাজ বর্জন করার সাথে সাথে নেক আমলও করতে হয়। তাই পরহেযগার

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

ঐ ব্যক্তি যিনি আল্লাহর সব হুকুম মানবেন, সব রকম গোনাহ থেকে বিরত থাকবেন। রোযার উদ্দেশ্য হল মানুষকে এরকম বানানো।

রোযা রাখা দ্বারা কীভাবে মানুষ পরহেযগার হয়, তা একটু চিন্তা করলেই বুঝে আসবে। মানুষের যত গোনাহ হয় তা খাদ্য-খাবারের কারণে হয় কিংবা যৌন চাহিদাগত কারণে হয়। রোযা রাখার মাধ্যমে খাবার চাহিদা এবং যৌন চাহিদাকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এভাবে গোনাহের দুই প্রধান উৎসকে নিয়ন্ত্রণ করার অভ্যাস গড়ে ওঠে। এছাড়া মানুষের হাতের দ্বারা গোনাহ হয়, চোখের দ্বারা গোনাহ হয়, যবান দ্বারা গোনাহ হয়, কানের দ্বারা গোনাহ হয়, রোযা অবস্থায় এসব অঙ্গকেও গোনাহ থেকে বিরত রাখা হয়। রোযাকে পূর্ণাঙ্গ খাঁটি রোযা বানাতে হলে মিথ্যা থেকে বিরত থাকতে হয়, গীবত থেকে বিরত থাকতে হয়, ঝগড়া-বিবাদ থেকে বিরত থাকতে হয়। এভাবে যবানকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। কানকেও গীবত শোনা, গান-বাদ্য শোনা, মানুষের সমালোচনা শোনা ইত্যাদি থেকে বিরত রাখতে হয়। চোখকেও গোনাহের জিনিস দেখা থেকে বিরত রাখতে হয়। এভাবে সব অঙ্গ- প্রত্যঙ্গকে গোনাহ থেকে বিরত রাখার অভ্যাস গড়ে ওঠে। রমযানের একটা মাসে গোনাহ থেকে বিরত থাকার এই যে অভ্যাস গড়ে উঠবে, বছরের বাকী ১১ মাসও এই অভ্যাসের উপর চলতে থাকলে গোনাহ মুক্ত জীবন গড়ে উঠবে। আর রমযান মাসে নেক আমল বেশি রাখা হয়েছে, নেক আমলের ছওয়াবও বেশি রাখা হয়েছে, যাতে করে মানুষ রমযান মাসে বেশি বেশি নেক আমলে অভ্যস্ত হয়ে যায়। বছরের বাকী ১১ মাসও এরূপ নেক আমল জারী রাখলে নেক আমলের যিন্দেগী গড়ে উঠবে। এভাবে রোযা এবং রমযান মাসে গোনাহ থেকে বিরত থাকা এবং নেক আমলের যিন্দেগী তথা পরহেযগারীর যিন্দেগী গড়ে তোলা হয়। এরূপ পরহেযগারীর যিন্দেগী গড়ে তোলাই রোযার উদ্দেশ্য।

রোযার মাধ্যমে না খাইয়ে মানুষকে কষ্ট দেয়া আল্লাহ পাকের উদ্দেশ্য নয়। সেহরী এবং ইফতারের মাসআলার দিকে তাকালেও বোঝা যায়। না খাইয়ে মানুষকে কষ্ট দেয়া উদ্দেশ্য নয়। সেহরীর মাসআলা রাখা হয়েছে– সেহরী যত বিলম্বে খাওয়া হবে তত উত্তম, আর ইফতারীর মাসআলা রাখা হয়েছে –ইফতারী সময় হওয়ার সাথে সাথে বিলম্ব না করে ইফতারী করা উত্তম। ইফতারীর সময় হয়ে গেলে বিনা ওজরে বিলম্ব করলে মাকরূহ হবে। যদি না খাইয়ে কষ্ট দেয়া উদ্দেশ্য হত, তাহলে মাসআলা এরকম রাখা হত –সেহরী যত আগে খাবে, আর ইফতারী যত বিলম্বে করবে তত উত্তম। কারণ তাতে না খেয়ে থাকার সময় বেশি হওয়ায় কষ্ট বেশি হবে। কিন্তু মাসআলা সেরকম রাখা হয়নি। বোঝা গেল না খাওয়ার কষ্ট রোযার মূল উদ্দেশ্য নয়। এ জন্যেই সেহরী খাওয়ার সময় এরকম নিয়ত না রাখা যে, সেহরী খাই তাহলে দিনের বেলায় কষ্ট কম হবে। এটা সেহরীর নিয়ত নয়। বরং সেহরীর নিয়ত হবে সেহরী খাওয়া সুন্নাত সেই সুন্নাত পালন করা, আর সেহরীর বরকত হাছিল করা। হাদীছে বলা হয়েছে,

تَسَحَّرُوْا فَإِنَّ فِى السَّحُوْرِ بَرَكَةً. (صحيح البخاري ١٩٢٣ وصحيح مسلم ٢٦٠٣)

অর্থাৎ, তোমরা সেহরী খাও, সেহরী খাওয়ার ভিতরে বরকত রয়ে গেছে।

তাই ক্ষুধা না লাগলেও খাব। একটু চা-পানি হলেও সেহরীর বরকত হাছিল করার নিয়তে খেয়ে নেব, সুন্নাতের উপরে আমল করার নিয়তে খেয়ে নিব। আর যখন-ই সেহরী খাব, তাতেই আমার রোযা রাখার নিয়ত হয়ে যাবে। অনেক মা-বোন আছেন, তারা রোযার নিয়ত কী এটা নিয়ে পেরেশান থাকেন। শুধু মা-বোনেরা নয় আমাদের মধ্যেও অনেকে এরকম আছেন, যারা মাসআলা না জানার কারণে ভাবেন কী রোযা রাখব, রোযা রাখার নিয়তই তো জানি না! তারা মনে করেন রোযার নিয়ত হল– নাওয়াইতু আন আসুমা গাদাম মিন শাহরি রমাযানাল মুবারাকে..... ইত্যাদি লম্বা দু'আটা পড়া। তারা দুশ্চিন্তায় পড়ে যান

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com



যে, এই লম্বা দু'আ হল নিয়ত, এই নিয়ত মুখস্থ নেই, কাজেই কী রোযা রাখব? অথচ নিয়তের জন্য এই লম্বা কথা বলা কোনই জরুরী ছিল না। যখন আমরা সেহরী খাই তখনই নিয়ত হয়ে যায়। রোযার যে নিয়ত ফরয, সেটা হল দিলের নিয়ত। আমরা যখন সেহরী খাই, তখনই মনে মনে নিয়ত হয়ে যায় যে, আগামী কাল রোযা রাখব। এভাবে নিয়তের ফরয আদায় হয়েই যায়। মুখে কিছু না বললেও রোযা হয়ে যায়। হ্যাঁ মুখে নিয়ত বলা উত্তম। তাই আরবীতে না পারলে নিজের ভাষায়ও নিয়ত বলে নিতে পারি যে, আমি রোযা রাখার নিয়ত করলাম। আরবীতে বলতে চাইলে খুব ছোট করে এভাবে বলতে পারি, نَوَيْتُ بِصَوْمِ غَدٍ অথবা نَوَيْتُ بِصَوْمِ الْيَوْمِ কাজেই রোযার নিয়ত নিয়ে পেরেশান হওয়ার কিছু নেই। ইফতারীর দু'আ মুখস্থ না থাকলেও পেরেশান হওয়ার কিছু নেই। বিসমিল্লাহ বলে ইফতারী করলেই হয়ে যাবে। তারাবীহ-এর চার রাকআত পরপর যে দু'আ পড়া হয়, তারাবীহ-এর শেষে যে মোনাজাত করা হয়, এগুলো মুখস্থ না থাকলেও কোন পেরেশানীর কারণ নেই। যাদের মুখস্থ নেই, তাদের সেগুলো মুখস্থ করারও তেমন কোন প্রয়োজন নেই। নামাযের শেষে দু'আ কবুল হওয়ার সময়, যেকোন ভাষায় আমরা দু'আ করতে পারি। আরবীতে না পারি নিজের ভাষায় দু'আ করতে পারি। সাধারণত তারাবীহ-এর শেষে মোনাজাত করা হয় اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ يَا خَالِقَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ. الخ এ মোনাজাত হাদীছের শিখানো মোনাজাত নয়। তবে এর অর্থ ভাল, কেউ চাইলে এটা মুখস্থ করতে পারেন। কিন্তু জরুরী কোনকিছু নয়। আর চার রাকআত পর পর সাধারণত যে দু'আ পড়া হয়–

سُبْحَانَ ذِى الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ سُبْحَانَ ذِى الْعِزَّةِ وَالْعَظْمَةِ وَالْهَيْبَةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْجَبَرُوْتِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْحَيِّ الَّذِيْ. الخ.

এটা পড়াও কোন জরুরী কিছু নয়। এটাও হাদীছে বর্ণিত কোন দু'আ নয়। বরং ফেকাহ-র কিতাবে লেখা হয়েছে তারাবীহ-এর চার রাকআত পরে যখন বিরতি নেয়া হয়, তখন سبحان الله وَالحمد لله ولا اله الا الله এসব দু'আ পড়া উত্তম। কারণ এগুলো হাদীছের শিখানো দু'আ। কিংবা চার রাকআত পরপর কিছু না পড়লেও চুপচাপ কিছুক্ষণ আরাম করে আবার চার রাকআত পড়া শুরু করা যায়।

এভাবে শরীআতে রোযার নিয়ত, ইফতারীর দু'আ, তারাবীহ-এর দু'আ মাসআলাগুলো সহজ রাখা হয়েছিল। অথচ আমরা এগুলোকে কঠিন মনে করে বসেছি। যার ফলে আমাদের হতাশা আসছে যে, রোযার নিয়ত জানি না, ইফতারীর দু'আ জানি না, তারাবীহ-এর দু'আ, মোনাজাত জানি না, কী করে রোযা রাখব, তারাবীহ পড়ব! এ সব ব্যাপারে শরীআত কত সহজ তা জানলে এরকম সমস্যা মনে হত না।

তারাবীহ নামাযের নিয়তও সহজ। দুই রাকআত তারাবীহ-এর নামাযের নিয়ত করছি এভাবে নিয়ত করলেই নিয়ত হয়ে যায়। যারা আরবীতে নিয়ত করতে চান সংক্ষেপে এভাবে বলতে পারেন,

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ التَّرَاوِيْحِ.

তারাবীহ নামায পড়া সুন্নাতে মুআক্কাদা এবং বিশ রাকআত পড়া সুন্নাতে মুআক্কাদা।

রমযান সম্পর্কিত, রোযা সম্পর্কিত এবং তারাবীহ সম্পর্কিত আরও যে সব মাসআলা মাসায়েল রয়েছে আমরা কিতাব পড়ে সেগুলো জেনে নেই, উলামায়ে কেরাম থেকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেই, সেভাবে আমল করি। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সুষ্ঠুভাবে রমযান মাস কাটানোর তাওফীক দান করুন, রমযান মাসের পুরোপুরি হক আদায় করার তাওফীক দান করুন, রমযানের পুরোপুরি খায়ের ও বরকত হাছিল করার তাওফীক দান করুন। আমীন

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বয়ান নং ৩৩-এর খুতবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ مُصَرِّفِ الْاَوْقَاتِ وَالدُّهُوْرِ، وَهُوَ الَّذِىْ فَضَّلَ شَهْرَ رَمَضَانَ عَلٰى غَيْرِهٖ مِنَ الشُّهُوْرِ، وَجَعَلَ ثَوَابَهٗ سَبْعِيْنَ ضِعْفًا فِىْ كُلِّ الْاُمُوْرِ، اَحْمَدُهٗ وَهُوَ الْمَحْمُوْدُ الْمَشْكُوْرُ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهُ الرَّحِيْمُ الْغَفُوْرُ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْعَرْضِ وَالنُّشُوْرِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اِلٰى اَنْ يُّبْعَثَ مَنْ فِى الْقُبُوْرِ.

اَمَّا بَعْدُ :

اَيُّهَا النَّاسُ ! نَحْنُ فِىْ اٰخِرِ شَهْرِ شَعْبَانَ، وَسَيَجِيْئُ شَهْرُ رَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ فَرَضَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْهِ الصِّيَامَ، وَسَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمُ الْقِيَامَ، وَهُوَ شَهْرٌ يُّعْدِلُ فِيْهِ نَفْلٌ فَرِيْضَةً فِيْمَا سِوَاهُ، وَفَرْضٌ يَّعْدِلُ سَبْعِيْنَ فَرِيْضَةً فِيْمَا سِوَاهُ. فَالشَّهْرُ هٰذَا هُوَ الْمُعَظَّمُ، وَلِاكْتِسَابِ الثَّوَابِ الْمَوْسِمُ، وَهُوَ السَّبَبُ لِلتَّخَلُّصِ عَنِ الْمَاْثَمِ، فَعَلَيْنَا الْاِسْتِعْدَادُ ذِهْنًا لِاسْتِقْبَالِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَاَدَاءِ وَظَآئِفِهٖ، وَكَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَعِدُّ لَهٗ قَبْلَ مَجِيْئِهٖ فِىْ رَجَبَ وَشَعْبَانَ، ثَبَتَ ذَالِكَ بِقَوْلِهٖ : اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ رَجَبَ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ، وَبِقَوْلِهِ الْاٰخَرِ: اَحْصُوْا هِلَالَ شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ.

اَيُّهَا النَّاسُ ! وَاعْلَمُوْا اَنَّ صِيَامَ هٰذَا الشَّهْرِ فَرْضٌ وَلَيْسَ هُوَ مِنَ الْاِخْتِيَارِيِّ بَلْ هُوَ مِنْ عَزَآئِمِ الْاُمُوْرِ، فَلَيْسَ لِلْعَاقِلِ الْبَالِغِ اَنْ يَّصُوْمَ اِنْ شَآءَ وَيُفْطِرَ اِنْ شَآءَ، وَقَدْ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ اَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَلَا مَرَضٍ، لَمْ يَقْضِهِ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهٖ وَاِنْ صَامَهٗ. وَاِنَّ صَلَاةَ التَّرَاوِيْحِ سُنَّةٌ مُّؤَكَّدَةٌ، وَخَتْمُ الْقُرْاٰنِ فِيْهَا سُنَّةٌ مُّؤَكَّدَةٌ ، فَعَلَيْنَا صِيَامُ هٰذَا الشَّهْرِ وَقِيَامُهٗ.

اَلَا وَاِنَّ صِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ اَعْظَمِ شَعَائِرِ الدِّيْنِ وَاَرْكَانِهٖ، وَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَوْدَعَ فِيْهِ مِنَ الْحِكَمِ وَالْاَحْكَامِ مَا دَلَّ بِهٖ عَلٰى عَظْمِ شَانِهٖ وَعُلُوِّ مَكَانَتِهٖ، فَاقْبَلُوْا عَلَيْهِ اَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ، وَصُوْمُوْا بِاِخْلَاصٍ لِلّٰهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ، وَعَظِّمُوْا شَهْرَ رَمَضَانَ وَصِيَامَهٗ بِعَدَمِ اِظْهَارِ الْمَعَاصِىْ وَالذُّنُوْبِ، لِاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ : وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ. اَلَا فَاعْزِمُوْا عَلَى الصِّيَامِ وَالْقِيَامِ، وَجَاهِدُوْا فِيْهَا تَصِلُوا الْمَرَامَ. لِاَنَّ الْمَرْأَ اِذَا عَزَمَ عَلٰى شَيْئٍ وَجَاهَدَ لَهٗ يَهْدِيَنَّهُ اللّٰهُ سَبِيْلَهٗ. قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَمَنْ يَّسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللّٰهُ، وَمَنْ يَّسْتَعِفَّ يُعِفُّهُ اللّٰهُ، وَمَنْ يَّتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللّٰهُ. اَلْحَدِيْثُ.

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ : يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ، وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. اَقُوْلُ قَوْلِىْ هٰذَا وَاسْتَغْفِرُ اللّٰهَ لِىْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَاسْتَغْفِرُوْهُ، اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

৩৪ নং -বয়ান

## এসলাহে বাতেন-এর প্রয়োজনীয়তা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ وَ مَآاُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اَلَا اِنَّ فِى الْجَسَدِ مُضْغَةً اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ، وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ، اَلَا وَهِىَ الْقَلْبُ.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

ইসলাম আমাদেরকে যত বিধি-বিধান এবং আমল দিয়েছে তা দুই ধরনের। কিছু বিধি-বিধান এবং আমলের সম্পর্ক মানুষের যাহেরের সাথে, অর্থাৎ মানুষের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে, মানুষের ধন-সম্পদের সাথে। এগুলোকে বলা হয় যাহেরী বিধি-বিধান। যেমন– নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি। আর কিছু বিধি-বিধান এবং আমলের সম্পর্ক মানুষের বাতেনের সাথে, অর্থাৎ মানুষের অন্তর বা কলবের সাথে। এগুলোকে বলা হয় বাতেনী বিধি-বিধান। যেমন– অন্তরে ইখলাস নিয়ে ইবাদত করতে হয়, অন্তরে খোদাভীতি রাখতে হয়, মনের মধ্যে সবর থাকতে হয়। এমনিভাবে মনে অহংকার রাখা নিষেধ, হিংসা-বিদ্বেষ রাখা নিষেধ ইত্যাদি। এগুলো কলব বা মনের সাথে সম্পর্কিত বিধি-বিধান। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি যাহেরী বিধি-বিধান মান্য করা যেমন জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ, অন্তরের সাথে সম্পর্কিত বাতেনী বিধি-বিধান মান্য করাও ওরকম জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ। বরং এক হিসেবে বাতেনী বিধি-বিধান মান্য করা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বাতেনী বিধি-বিধান মান্য না করলে দিল ঠিক হয় না, চিন্তা-ফিকির দোরস্ত হয় না। আর দিল ঠিক না হলে নামায, রোযা ইত্যাদি যাহেরী আমলও নষ্ট হয়ে যায়। এ হিসেবে বাতেনী বিধি-বিধান হল বুনিয়াদী বিষয়। যেমন, একজন মানুষ অনেক ইবাদত করল, অনেক নামায, রোযা, হজ্জ, দান-সদকা ইত্যাদি করল, কিন্তু তার দিল ঠিক নেই, মনের মধ্যে ইখলাস নেই; বরং মনের মধ্যে রিয়া বা মানুষকে দেখানোর চিন্তা থাকল, মানুষের কাছে সুনাম অর্জন করার চিন্তা থাকল, তাহলে তার সমস্ত ইবাদত বেকার হয়ে গেল। এসব ইবাদতের কোন ছওয়াব সে পাবে না।

কিয়ামতের ময়দানে অনেক বড় বড় ইবাদতকারীকে ডাকা হবে, যেমন একজন বড় মুজাহিদকে ডাকা হবে -যে আল্লাহর রাস্তায় নিজের জীবন বিসর্জন দিয়ে শহীদ হয়েছিল– তাকে ডেকে আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন বান্দা! তুমি আমার জন্য কী করেছিলে? সে বলবে ইয়া আল্লাহ! তোমার জন্য আমার জীবনটা পর্যন্ত বিসর্জন দিয়ে দিয়েছিলাম। আল্লাহ পাক বলবেন, তুমি আমার জন্য জীবন বিসর্জন দাওনি; বরং তুমি এই চিন্তায় জীবন বিসর্জন দিয়েছিলে যে, মানুষ তোমাকে বড় বীর-বাহাদুর বলবে। দুনিয়াতে এটা বলা হয়ে গেছে। তোমার যা পাওয়ার ছিল দুনিয়াতেই তুমি পেয়ে গেছ, এখন আমার কাছে আর কিছুই পাওয়ার নেই। যাও জাহান্নামে চলে যাও। এরূপ একজন বড় দানশীলকে ডাকা হবে, তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, বান্দা! আমার জন্য কী করেছিলে? সে বলবে, হে আল্লাহ! আমার রক্ত পানি করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জন করা সম্পদ তোমার রাস্তায় দান করেছি। আল্লাহ পাক বলবেন, তুমি আমার জন্য করনি; বরং তুমি এই চিন্তায় করেছিলে যে, মানুষ তোমাকে বড় দানশীল বলবে, মানুষ তোমার প্রশংসা করবে। দুনিয়াতে সেটা হয়ে গেছে, তোমার যা পাওয়ার দুনিয়াতেই তুমি পেয়ে গেছ।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



অতএব এখন আমার কাছে আর কিছুই পাওয়ার নেই, যাও জাহান্নামে চলে যাও। দেখা গেল অন্তরে রিয়া থাকার কারণে, অন্তরে ইখলাস না থাকার কারণে তাদের ইবাদত নষ্ট হয়ে গেল। এজন্য ইবাদত করার সাথে এসলাহে বাতেন তথা অন্তরের অবস্থাকে দোরস্ত করা এবং বাতেনী বিধি-বিধান মেনে চলা জরুরী; বরং বুনিয়াদী বিষয় হিসেবে এটা বেশি জরুরী। কারণ অন্তর ঠিক থাকলে ইবাদত ঠিক থাকে, অন্তর নষ্ট হয়ে গেলে সব ইবাদত নষ্ট হয়ে যায়।

বাতেনী বিধি-বিধান অর্থাৎ, অন্তরের সাথে সম্পর্কিত বিধি-বিধান দুই ধরনের। কিছু হল বর্জনীয়, কিছু হল অর্জনীয়। বর্জনীয় অর্থাৎ, যা বর্জন করা জরুরী। যেমন তাকাব্বুর, রিয়া, হিংসা-বিদ্বেষ, ক্রোধ, দুনিয়ার লোভ, কৃপণতা ইত্যাদি। আর অর্জনীয় অর্থাৎ, যা অর্জন করা জরুরী। যেমন ইখলাস, সবর, তাকওয়া বা খোদাভীতি, তাওয়াক্কুল, তাওয়াযু বা বিনয়, আল্লাহর মহব্বত, যুহ্দ বা দুনিয়ার মোহ ত্যাগ, শোকর, উদারতা, বদান্যতা, হায়া বা লজ্জাশীলতা, দয়াপরায়ণতা ইত্যাদি। আধ্যাত্মিকক এই সব বিধি-বিধান যে শ্রেণিরই হোক না কেন বর্জনীয় শ্রেণির হোক বা অর্জনীয় শ্রেণির হোক, সবটাই জরুরী এবং বুনিয়াদী। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদির ন্যায় জরুরী। নামায-রোযা করা যেমন ফরয এবং তরক করা হারাম, তদ্রূপ ইখলাস, তাকওয়া ইত্যাদি অর্জন করাও ফরয এবং তাকাব্বুর, রিয়া, হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যাদি হারাম। অথচ আমরা এগুলোকে এরকম জরুরী বিষয় মনে করি না। আমরা যে এগুলোকে জরুরী মনে করি না, তার একটা প্রমাণ হল আমরা নামায রোযা ইত্যাদির মাসায়েল জানার জন্য উলামায়ে কেরামের কাছে যাই, কিন্তু খুব কম সংখ্যক লোকই আলেমের কাছে এ জন্য যেয়ে থাকে যে, হুজুর! কীভাবে তাকওয়া অর্জন করা যায়, কীভাবে তাকাব্বুর দূর করা যায় তার পদ্ধতি বলে দিন।

যাহোক আধ্যাত্মিক এই সব বিধি-বিধান জরুরী এবং বুনিয়াদী। এর একেকটা বিধান পালন না করলে বহু যাহেরী আমল ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায়। যেমন পূর্বে বলা হল ইখলাস না থাকলে সমস্ত আমল রিয়ায় পরিপূর্ণ হয়ে যায়। সমস্ত আমলের ছওয়াব বরবাদ হয়ে যায়। এক অহংকার থাকলে মানুষের এমন পতন ঘটতে পারে যে, মানুষ কাফের পর্যন্ত হয়ে যায়। এই অহংকারই ইবলিসের কুফ্‌রীর মূল কারণ ছিল। ইবলিস আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত ছিল। সে ছিল জিন। আল্লাহ পাক তাকে মর্যাদা দিয়ে ফিরিশতাদের ভিতর স্থান দিয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহ পাক হযরত আদম (আ.)কে সৃষ্টি করে ইবলিসকে হুকুম দিলেন আদমকে সাজদা কর! তখন ইবলিস সাজদা করল না, তাকে অহংকারে পেয়ে বসল। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ.

অর্থাৎ, সে সাজদা করতে অস্বীকার করল, তার ভিতরে অহংকার এসে গিয়েছিল। ফলে সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। (বাকারা: ৩৪)

তার ভিতরে অহংকার এসেছিল যে, আমি আগুনের তৈরি, আর আগুনের স্বভাব হল উপরের দিকে থাকা। আর আদম মাটির তৈরি এবং মাটির স্বভাব হল নীচের দিকে যাওয়া। তাই আমি আগুনের তৈরি হয়ে আদমকে সাজদা করার জন্য নীচের দিকে যেতে পারি না। আমি উপরে থাকব, আমি নত হব না। এভাবে অহংকারের কারণে সরাসরি আল্লাহর নির্দেশকে অস্বীকার করায় সে কাফের হয়ে গেল। আল্লাহর হুকুমকে সরাসরি অস্বীকার করলে কেউ মুসলমান থাকে না কাফের হয়ে যায়, ইবলিসেরও তাই হয়েছে। অহংকার মনের সাথে সম্পর্কিত একটা মাত্র বিধান, কিন্তু এতবড় গুরুত্বপূর্ণ বিধান যে এটা বর্জন না করলে অর্থাৎ অহংকার না ছাড়লে এটা মানুষকে কাফের পর্যন্ত বানিয়ে দেয়। এই অহংকারের কারণেই

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

অনেকে কুরআন-হাদীছের কথা মানতে চায় না, সবকিছু নিজের বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে চায়। কুরআন-হাদীছের কথার উপরে নিজের বুঝকে বড় মনে করে, আল্লাহ, আল্লাহর রাসূলের বুঝকে বড় মনে করে না, এটা অহংকার থেকে হয়ে থাকে। অহংকারের কারণে মানুষ অনেক আমল থেকে সরে যায়, তাওয়াযু থেকে সরে যায়, ক্ষমা করা থেকে সরে যায়। এই অহংকারের কারণেই মানুষ অন্যের উপর যুলুম করে, অন্যের গীবত সমালোচনা করে, অন্যকে ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ মনে করে, নিজের দোষ-ত্রুটির দিকে নজর দেয় না। দেখা গেল অহংকার একটা মাত্র রোগ, কিন্তু এই রোগই বহুভাবে মানুষের পতন ঘটাতে পারে। এভাবে আধ্যাত্মিক এক একটা বিধান পালন না করলে বহু আমল বর্জন হয়ে যায়, বহু গোনাহের পথ খুলে যায়। যেমন তাকওয়া বা খোদাভীতি একটা বিধান। এই তাকওয়া বা খোদাভীতি না থাকলে মানুষ অবলিলায় যেকোন পাপে জড়িত হয়ে পড়ে। এজন্যেই হাদীছে এসেছে–

عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ قَالَ : قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! اَوْصِنِيْ، قَالَ اُوْصِيْكَ بِتَقْوَى اللّٰهِ، فَاِنَّهُ رَاْسُ الْاَمْرِ كُلِّهِ. (رواه ابن حبان في صحيحه برقم ٣٦١)

অর্থাৎ, একদিন হযরত আবূ যর গেফারী (রা.) বললেন ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাকে কিছু নসীহত করুন। রাসূল (সা.) বললেন, তুমি তাকওয়া অবলম্বন কর, তাকওয়া হল সমস্ত বিষয়ের মূল।

এমনিভাবে লজ্জা রাখা একটা বিধান। এই লজ্জা না থাকলে মানুষ অবলিলায় বহু পাপে জড়িত হয়ে পড়তে পারে। তাই হাদীছে এসেছে আগের যুগের নবীরাও বলতেন,

اِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ. (صحيح البخاري برقم ٣٤٨٤)

অর্থাৎ, তোমার ভিতর হায়া-লজ্জা না থাকলে তুমি যাচ্ছে তাই করে বসবে।

দেখা গেল আধ্যাত্মিক একেকটা বিধান অনেক জরুরী, মৌলিক ও বুনিয়াদী বিষয়। তাই এসলাহে বাতেন বা আধ্যাত্মিক সংশোধন অনেক জরুরী এবং বুনিয়াদী বিষয়।

এসলাহে বাতেন বা আধ্যাত্মক সংশোধন যে এরকম মৌলিক বিষয়, সেদিকে ইংগিত করে বোখারী শরীফের হাদীছে বলা হয়েছে,

اَلَا اِنَّ فِى الْجَسَدِ مُضْغَةً اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. (صحيح البخاري برقم ٥٢ وصحيح مسلم برقم ٤١٧٨)

অর্থাৎ, জেনে রেখ, দেহের ভিতরে একটা মাংসখণ্ড আছে, যখন সেটা ঠিক হয়ে যায় গোটা দেহ দোরস্ত হয়ে যায়। অর্থাৎ, গোটা দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমস্ত আমল দোরস্ত হয়ে যায়। আর যখন সেটা নষ্ট হয়ে যায়, তখন গোটা দেহ নষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ, গোটা দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল নষ্ট হয়ে যায়। জেনে রেখ সেটা হল কলব।

এ হাদীছে শুধু ইংগিত নয়; বরং স্পষ্টত বলা হয়েছে কলব নষ্ট হয়ে গেলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল নষ্ট হয়ে যায়। আর আধ্যাত্মিক বিধি-বিধান পালন না করলে কলব নষ্ট হয়ে যায়। অতএব আধ্যাত্মিক বিধি-বিধান পালন করা অত্যন্ত জরুরী ও বুনিয়াদী বিষয়।

কলবকে বাংলায় বলা হয় হৃদয় বা অন্তর যেটা হার্টের ভিতরে থাকে। এই কলব বা অন্তর কী এবং কেমন, তা কোন ভাষা দিয়ে বোঝানো যায় না, এজন্য রাসূল (সা.) বলেছেন "মাংসখণ্ড"। আসলে মাংসখণ্ডটা অন্তর নয়। বরং অন্তর হল যেটা ঐ মাংসখণ্ডের ভিতরে থাকে। আরবীতে বলা হয় রূহ্। এই রূহ এমন একটা জিনিস, যা মানুষকে বোঝানো সম্ভব নয়। আমাদের অবস্থা হল– যা দেখা যায় তা

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com



আমরা বুঝতে পারি, যা দেখা যায় না তা বুঝতে পারি না। রূহ্ কেমন তা দেখা যায় না, তাই সঠিকভাবে রূহ্-এর স্বরূপ বোঝা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। রূহ্ এমন একটা জিনিস যা মানুষের বোঝার ক্ষমতার বাইরে। রূহ্ কেমন তার আকার কী, সাইজ কী, দৈর্ঘ্যে কত, প্রস্থে কত, কী দিয়ে গঠিত, এগুলোর কিছুই আমরা জানি না। রূহ সম্পর্কে আমরা যেমন অজ্ঞ, রূহের রোগ কীভাবে হয়, সেই রোগ কীভাবে সারাতে হয় সে সম্পর্কেও আমরা অজ্ঞ। আমাদের স্থূল বুদ্ধি দিয়ে তা বোঝা সম্ভব নয়। মানুষ নিজস্ব মেধা দিয়ে তা বুঝতে পারবে না। যেমন হাদীছে এসেছে একটা মানুষ যখন একটা পাপ করে তার অন্তরে একটা কালো দাগ পড়তে থাকে। এভাবে পাপ করতে করতে, তার অন্তরে কালো দাগ পড়তে পড়তে এক সময় তার গোটা অন্তর সম্পূর্ণ কালিমা আচ্ছন্ন হয়ে যায়। সেই অন্তর সঠিকভাবে ভাল মন্দ বিবেচনা করতে পারে না। এ হাদীছে পাপের কারণে অন্তরে যে কালো দাগ পড়ার কথা বলা হয়েছে, তা কেমন তা স্থূল বুদ্ধি দিয়ে বোঝা সম্ভব নয়। আর এক হাদীছে বলা হয়েছে,

صَقَالَةُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللّٰهِ. (كنز العمال برقم ١٧٧٧)

অর্থাৎ, অন্তরের জং দূর করার রেত হল আল্লাহর যিকির।

রেত দ্বারা যেমন লোহার জং দূর করা হয়, তদ্রূপ অন্তরে জং পড়লে অর্থাৎ গোনাহের কালো দাগ পড়লে সেই জং দূর করার উপায় হল যিকির। লোহার জং দূর করতে হলে রেত দিয়ে ঘষতে হয়। অন্তরের জং দূর করতে হলে অন্তরের উপর বারবার যিকির চালাতে হবে। যিকিরের ঘর্ষণে অন্তরের জং দূর হয়ে যাবে। এ হাদীছে যিকির দ্বারা অন্তরের জং দূর হওয়ার যে কথা বলা হয়েছে, সেটাও স্থূল বুদ্ধিতে ধরা পড়ে না। কুরআনের এক আয়াতে বলা হয়েছে,

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ.

অর্থাৎ, আল্লাহর যিকির দ্বারা অন্তরের প্রশান্তি আসে টেনশন দূর হয়ে যায়। (রা'দ: ২৮)

এখানেও যিকির দ্বারা কীভাবে টেনশন দূর হবে, তাও আমরা স্থূল বুদ্ধিতে বুঝতে পারব না। এভাবে অন্তরের কোন বিষয়ই স্থূল বুদ্ধি দিয়ে বোঝা সম্ভব নয়। কুরআন-হাদীছে যা বলা হয়েছে, তা বিশ্বাস করতে হবে। দুনিয়ার কেউ আত্মা সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছু বলতে পারবে না, কারণ আত্মা কী এবং কেমন তাই কেউ বলতে পারে না। আত্মার রোগগুলো কী কী ও কেমন এবং তার প্রতিকার প্রতিশেধক কী, তাও কেউ বলতে পারবে না। এসব ব্যাপারে কুরআন-হাদীছে যা বলা হয়েছে, তা বিশ্বাস করা ছাড়া আর কোন পথ নেই। কুরআন হাদীছে আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে কাউকে কিছু জানানো হয়নি। তবে আত্মার বিভিন্ন অবস্থা, আত্মার বিভিন্ন রোগ ও প্রতিকার ব্যবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে। কাজেই রূহানী চিকিৎসা বা আধ্যাত্মিক সংশোধন সম্পর্কে নিজস্ব চিন্তা- ভাবনা থেকে কেউ কোন ব্যবস্থা উদ্ভাবন করতে পারবে না। বরং এ ব্যাপারে কুরআন-হাদীছে যা বলে দেয়া হয়েছে তা-ই মানতে হবে।

আত্মার স্বরূপ কী তা কাউকে বলা হয়নি এ কারণে যে, মানুষ তা বুঝতে পারবে না। পৃথিবীর শুরু থেকে নিয়ে আজ পযন্ত কেউ বলতে পারেনি আত্মার স্বরূপ কী এবং ভবিষ্যতেও কেউ তা বলতে পারবে না। একথাটা কুরআনেও বলা হয়েছে, অন্যান্য আসমানী কিতাবেও বলে দেয়া হয়েছিল যে, রূহ কী জিনিস তা কেউ বলতে পারবে না। রাসূল (সা.) যখন মক্কায় তার মিশন নিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তখন মক্কার মুশরিকরা রাসূল (সা.)-এর মিশনকে ব্যর্থ করার কোন পদ্ধতি খুঁজে পাচ্ছিল না। যে পদ্ধতিই গ্রহণ করছিল তা দ্বারা এই মিশনকে ঠেকানো যাচ্ছিল না। অবশেষে একবার তারা নিজেরা পরামর্শ করল যে, ইহুদীদের মধ্যে অনেক পণ্ডিত আছে। তারা আসমানী কিতাব সম্পর্কে অনেক জ্ঞান রাখে, চলো

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

আমরা তাদের কাছে যাই, যেয়ে তাদের কাছ থেকে মুহাম্মাদের মিশনকে কীভাবে ব্যর্থ করা যায় তার একটা শলা পরামর্শ নিয়ে আসি। পারিকল্পনা মোতাবেক কয়েকজন বিশিষ্ট মুশরিক নেতা মদীনার ইহুদীদের কাছে যেয়ে বলল, আপনারা আমাদেরকে মুহাম্মাদকে ঠেকানোর কৌশল শিখিয়ে দিন, তারা শিখিয়ে দিল যে, তোমরা মুহাম্মাদকে তিনটা বিষয়ে প্রশ্ন করবে– রূহ, আসহাবে কাহাফ ও যুলকারনাইন সম্পর্কে প্রশ্ন করবে। রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করবে, রূহ কি জিনিস? যদি মুহাম্মাদ রূহের কোন ব্যাখ্যা দেয়, তাহলে বুঝবে সে মিথ্যুক। কারণ আমাদের আসমানী কিতাবে আছে রূহ-এর স্বরূপ আল্লাহ ছাড়া আর কারও জানা নেই।

কাজেই মুহাম্মাদ নিজের রূহ-এর স্বরূপ সম্পর্কে কিছু বললে প্রমাণ হবে যে, সে আল্লাহর পক্ষ থেকে বলে না; বরং সে নিজের পক্ষ থেকে বলে। অতএব নবী নয়, সে মিথ্যুক। আর মুহাম্মাদ যেহেতু কারও থেকে কোন বিদ্যা শিক্ষা করেনি, তাই তোমরা তার কাছে অতীতের দুটো ইতিহাস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে। একটা হল আসহাবে কাহাফ কারা ছিল, আরেকটা হল যুলকারনাইন কে ছিল? মুহাম্মাদ যদি এ দুটো ঘটনা সম্পর্কে সঠিক বর্ণনা দিতে পারে, তাহলে বুঝা যাবে সে নবী। কারণ সে কারও থেকে কিছু শিক্ষা করেনি। তা সত্ত্বেও সঠিক বলতে পারলে বুঝা যাবে সে আল্লাহর থেকে জেনে বলেছে। আর যদি সঠিকভাবে বলতে না পারে তাহলে প্রমাণ হবে সে আল্লাহর পক্ষ থেকে জেনে বলে না। যাহোক তারা এভাবে তিনটা প্রশ্ন শিখিয়ে দিল। মুশরিক নেতারা এসে নবী (সা.)কে এই তিনটা প্রশ্ন করল। প্রথম প্রশ্ন সম্পর্কে কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে,

(বানী ইসরাঈল: ৮৫) يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا.

অর্থাৎ, তারা তোমাকে রূহ সম্পর্কে, আত্মা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তুমি বলে দাও! রূহ বা আত্মা হল রবের নির্দেশে পরিচালিত একটা বিষয়। তোমাদেরকে জ্ঞান খুবই কম দেয়া হয়েছে।

এই শেষ কথাটা "তোমাদেরকে জ্ঞান খুবই কম দেয়া হয়েছে"-এ কথাটা বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রূহের আসল স্বরূপ কী তা তোমরা বুঝতে পারবে না। কারণ তোমাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে খুবই কম। এই স্বল্প জ্ঞান দিয়ে রূহ-এর স্বরূপ বুঝা সম্ভব নয়। এই জওয়াবে রাসূল (সা.) রূহ সম্পর্কে নিজের পক্ষ থেকে কোন ব্যাখ্যা দেননি। রূহ-এর স্বরূপ কী তার ব্যাখ্যা না দিয়ে বলেছেন এটা আল্লাহর নির্দেশ ঘটিত একটা বিষয়, যা মানুষের ধারণ ক্ষমতার বাইরে, যা মানুষের বোধ ক্ষমতার বাইরে, যার স্বরূপ কেউ বুঝতে পারবে না।

তাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল– আসহাবে কাহাফ সম্পর্কে। আসহাবে কাহাফ সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাবে কুরআনে বিস্তারিত বিবরণ নাযিল হয়েছে। আসহাবে কাহাফ কথাটার অর্থ হল গুহাবাসী। রাসূল (সা.)-এর জন্মের ২৭০ বছর পূর্বে অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্মের ২০০ বছর পরের ঘটনা। তখন একজন সম্রাট ছিল দাকিয়ানুস। সে তার প্রজাদেরকে মূর্তিপূজা করতে বাধ্য করত। তখন কয়েকজন যুবক তাদের ঈমানকে রক্ষা করার জন্য সংকল্প করল যে, আমরা এই বাদশাহর এলাকা ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে আত্মগোপন করব, যেখানে বাদশাহ আমাদেরকে খুঁজে না পায়। তাহলে আমরা তাওহীদের উপরে তথা একত্ববাদের উপরে টিকে থাকতে পারব। আমরা মূর্তিপূজা করতে চাই না! সংকল্প অনুসারে সাতজন যুবক সাথে একটা কুকুর নিয়ে একটা গুহার ভিতরে গিয়ে আশ্রয় নিল। তারা গুহায় যেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। কুরআন শরীফের বর্ণনা মতে তাদেরকে দেখলে মনে হত জাগ্রত। কিন্তু আসলে তারা ঘুমন্ত। তারা মাঝে মধ্যে পাশ ফিরাত, এপাশ ওপাশ করত। গুহার মুখে ছিল

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com



বীভৎস আকারের কুকুরটা, যাতে কেউ দেখলে ভিতরে ঢুকতে সাহস না পায়। এভাবে আড়াই শত বছর চলে গেল। আড়াই শত বছর পরে তারা জাগ্রত হল। এই জাগ্রত হওয়ার ঘটনা ঘটে সম্রাট বাইদুসীস-এর আমলে।

এটা কোন্ এলাকার ঘটনা তা নিয়ে মতভেদ আছে। অধিকাংশ মুফাস্সিরীনে কেরাম বলেছেন, এটা তুরস্কের ইজমীর শহরের পাশে আফসূস নগরীর ঘটনা। আড়াই শত বছর পরে তারা জাগ্রত হল। ক্ষুধা টের পেয়ে তাদের একজন বাজার করতে বাইরে আসল। পকেট থেকে মুদ্রা বের করতেই ধরা পড়ে গেল। লোকেরা দেখল, এ যে শত শত বছর আগের মুদ্রা! বিষয়টা নিয়ে হৈ চৈ পড়ে গেল। অবশেষে সম্রাটকে জানানো হল। সম্রাট লোকজনসহ গুহা দেখতে আসল। তারা গুহার ভিতরে ঢুকতেই আসহাবে কাহাফের সকলের মৃত্যু হয়ে গেল। এ হল আসহাবে কাহাফের মোটামুটি ঘটনা। এই ঘটনা দ্বারা আল্লাহ পাক দেখিয়েছেন যে, যিনি আড়াই শত বছর পর ঘুমন্ত মানুষকে জাগ্রত করতে পারেন, তিনি মৃত্যুর পর আবার মানুষকে উঠাতে সক্ষম।

কুরআন শরীফে মৃতকে জীবিত করারও অনেকগুলো ঘটনা বয়ান করা হয়েছে। এসব ঘটনার মাধ্যমে দেখানো হয়েছে যে, আল্লাহ পাক মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম। তার মধ্যে একটা ঘটনা হল হযরত উযায়ের (আ.)-এর ঘটনা। তিনি শাম দেশে বায়তুল মুকাদ্দাস এলাকায় ছিলেন। তিনি আল্লাহর কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন হে আল্লাহ! তুমি কীভাবে মৃতকে যিন্দা কর তা আমাকে দেখাও। তখন তিনি একটা গাধার উপরে সওয়ার ছিলেন। ঐ গাধার সাথে খাদ্য-খাবারও ছিল। আল্লাহ পাকের হুকুমে সাথে সাথে উযায়ের (আ.)-এর মৃত্যু হয়ে গেল। একশত বছর পর আবার আল্লাহ তাঁকে যিন্দা করলেন। তাঁর যিন্দা হওয়ার পর আল্লাহ পাক তাঁর গাধাটাকে যিন্দা হওয়ার হুকুম দিলেন। তখন মরে পঁচে মাটি হয়ে যাওয়া গাধার হাড়গুলো একে একে জুড়ে গেল। তার উপর মাংস লেগে গেল, চামড়া লেগে গেল, আবার যিন্দা হয়ে গেল। আল্লাহ পাক দেখালেন এভাবে আমি মৃতকে যিন্দা করি।

আর একটা ঘটনা হল হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর ঘটনা। তিনি আল্লাহর কাছে আবেদন করেছিলেন হে আল্লাহ! কীভাবে তুমি মৃতকে যিন্দা কর তা আমাকে দেখাও। আল্লাহ তা'আলা বললেন তুমি চারটা পাখি নাও, তিনি চারটা পাখি নিলেন। একটা কবুতর, একটা মোরগ, একটা ময়ূর এবং একটা কাক -এই চারটা পাখি নিলেন। আল্লাহ পাক বললেন, সবগুলোকে যবাই কর। যবাই করে এই সবগুলোর মাংস এক সাথে মিলাও। সেই মিশ্রিত মাংসকে চারটা ভাগ করে চারটা পাহাড়ের উপরে রেখে দাও। তারপর এক একটা পাখির নাম ধরে ডাক দাও! তিনি তাই করলেন। যেটার নাম ধরে ডাক দেয়া হল, রক্ত, মাংস, হাড়, পর বা পাখা ইত্যাদি অংশগুলো দৌড়ে আসতে থাকল। এসে এসে জুড়ে আবার যিন্দা হয়ে গেল। এভাবে আল্লাহ পাক দেখিয়েছেন মানুষ মরে মাটি হয়ে যাক, ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাক। ইন্দিরা গান্ধীর মত জ্বালিয়ে সেই ছাই হিমালয়ের উপর থেকে উড়িয়ে দেয়া হোক। এর খণ্ডগুলো কোন না কোনোভাবে যেখানেই থাকবে, আল্লাহ পাক যখন ডাক দিবেন- দ্বিতীয় শিংগায় ফুক দেয়ার মাধ্যমে এই ডাক দেয়া হবে, তখন প্রত্যেকের অংশগুলো জুড়ে জুড়ে আবার যিন্দা হয়ে যাবে।

আর একটা ঘটনা হল হযরত মূসা (আ.)-এর সময়কার একটা ঘটনা। তখন এক ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছিল, হত্যাকারী কে তা জানা যাচ্ছিল না। হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে তারা আসল যে, আমরা হত্যাকারী কে তা জানতে চাই। আল্লাহর নির্দেশে হযরত মূসা (আ.) তাদেরকে বললেন একটা গাভী যবাই কর। সেই গাভীর যেকোন একটা অংশ দিয়ে ঐ মুর্দার গায়ে স্পর্শ করা মাত্রই ঐ মুর্দা যিন্দা হয়ে বলে দিবে কে তাকে হত্যা করেছে। শেষ পর্যন্ত তা-ই হয়েছিল। মুর্দা যিন্দা হয়ে বলে দিয়েছিল

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

আমার সম্পদের লোভে আমার ভাতিজা আমাকে হত্যা করেছে। ভাতিজা ছাড়া তার আর কোন ওয়ারিছ ছিল না। ভাতিজা ভেবেছিল চাচা কোন্ কালে কবে মরবে, এতদিন অপেক্ষা করা তার সহ্য হচ্ছিল না। তাই তাকে হত্যা করে তাড়াতাড়ি সম্পদ হাতানোর চিন্তা করেছিল। যাহোক কুরআন শরীফে এসব ঘটনা বর্ণনা করে দেখানো হয়েছে যে, আল্লাহ পাক মুর্দাকে যিন্দা করতে সক্ষম। আসহাবে কাহাফের ঘটনায়ও এটাই দেখানো হয়েছে।

তারা তৃতীয় প্রশ্ন করেছিল যুলকারনাইন সম্পর্কে। এ সম্পর্কেও কুরআন শরীফে সুদীর্ঘ বর্ণনা পেশ করা হয়েছে। এভাবে মুশরিকদের তিনটি প্রশ্নেরই জওয়াব দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম প্রশ্ন ছিল রূহ সম্পর্কিত। এ প্রশ্নের জবাবে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ ছাড়া রূহের স্বরূপ কেউ বলতে পারবে না। রূহ আল্লাহর নির্দেশে পরিচালিত একটি জিনিস, যার স্বরূপ কেউ বুঝতে সক্ষম নয়। তাই রূহ বা আত্মার রোগ-ব্যাধি কী কী, এসব রোগের সংশোধন কীভাবে হবে, তাও মানুষ নিজের বুদ্ধি বিবেক থেকে বের করতে পারবে না। এ ব্যাপারে কুরআন-হাদীছে যা বলে দেয়া হয়েছে। সেটাই মেনে নিতে হবে এবং সেটাই করতে হবে।

ইনশাআল্লাহ আগামী জুমুআয় আধ্যাত্মিক সংশোধন বা এসলাহে বাতেনের তরীকা ও পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আলোচনা করার, শোনার ও মানার তাওফীক দান করুন। আমীন!

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



বয়ান নং ৩৪-এর খুতবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَّامِ الْغُيُوْبِ، اَلْمُطَّلِعِ عَلٰى سَرَائِرِ الْقُلُوْبِ، اَحْمَدُهٗ وَاَشْكُرُهٗ وَاِلَيْهِ اَتُوْبُ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ شَهَادَةً تُكَفِّرُ كُلَّ الذُّنُوْبِ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهُ الْمُتَّصِفُ بِصَفَاءِ الْقُلُوْبِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَعَلٰى اَصْحَابِهٖ مَا دَامَ الطُّلُوْعُ وَالْغُرُوْبُ.

اَمَّا بَعْدُ :

اَيُّهَا النَّاسُ! اِنَّ اَحْكَامَ الشَّرْعِ عَلٰى نَوْعَيْنِ، نَوْعٌ يَّتَعَلَّقُ بِالظَّاهِرِ، وَنَوْعٌ يَّتَعَلَّقُ بِالْبَاطِنِ. وَفِى النَّوْعِ الثَّانِىْ مِنَ الْمُهِمَّاتِ وَالْمُفْسِدَاتِ كَمَا فِى النَّوْعِ الْاَوَّلِ ذَالِكَ، وَالْاَوَّلُ يُسَمّٰى اَلْخَصَائِلَ وَالثَّانِى الرَّذَائِلَ. وَمِنَ الْمُهِمَّاتِ اَلْاِخْلَاصُ وَالتَّقْوٰى وَالتَّوَكُّلُ وَالتَّفْوِيْضُ وَالرِّضَاءُ بِالْقَضَاءِ وَالصَّبْرُ وَغَيْرُ ذَالِكَ. وَمِنَ الْمُهْلِكَاتِ الْحَسَدُ وَالْحِقْدُ، وَ هُمَا دَاءَانِ مُهْلِكَانِ، وَالْكِبْرُ وَالْعُجْبُ وَهُمَا خُلُقَانِ مَذْمُوْمَانِ، وَالْغِيْبَةُ وَالنَّمِيْمَةُ وَهُمَا مَرَضَانِ مُفْسِدَانِ. وَغَيْرُ ذَالِكَ مِنْ اَمْرَاضِ الْقُلُوْبِ وَاٰثَامِهَا. فَاَطْلِقُوا النُّفُوْسَ مِنْ وَثَائِقِ اٰثَامِهَا، وَاَعْتِقُوْهَا مِنْ رِقِّ مَعَاصِيْهَا وَاَجْرَامِهَا، وَاَوْفِرُوْهَا بِالْخَصَائِلِ، وَاَنْقُوْهَا مِنَ الرَّذَائِلِ. وَاِنْ لَمْ تَصِحَّ الْقُلُوْبُ لَمْ تَصِحَّ اَعْمَالُ الْاَجْسَامِ. وَاِلَيْهِ اَشَارَ اِلَيْهِ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – اَلَا اِنَّ فِى الْجَسَدِ مُضْغَةً اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ، وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ، اَلَا وَهِىَ الْقَلْبُ. فَالْقُلُوْبُ اِذَا اسْوَدَّتْ بِالْمَعَاصِى فَاصْقُلُوْهَا بِذِكْرِ اللّٰهِ، قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِكُلِّ شَيْءٍ صَقَالٌ وَصَقَالُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللّٰهِ. وَاِنَّ الْعَبْدَ اِذَا اَذْنَبَ نُكِتَتْ فِىْ قَلْبِهٖ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، فَالذُّنُوْبُ الْكَثِيْرَةُ تَجْعَلُهَا سَوْدَاءَ،

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বয়ান নং -৩৫

## এসলাহে বাতেনের তরীকা (১ম পর্ব)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّیْ. وَقَالَ تَعَالٰى : يٰٓاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ، ارْجِعِیْٓ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً، فَادْخُلِیْ فِیْ عِبٰدِیْ وَ ادْخُلِیْ جَنَّتِیْ. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اَلْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهٗ.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

গত জুমুআয় এসলাহে বাতেনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল শরীআতে যত বিধি-বিধান আছে তা দুই ধরনের। কিছু মানুষের শরীর এবং সম্পদের সাথে সম্পর্কিত, আর কিছু মানুষের নফ্স বা মনের সাথে সম্পর্কিত। মানুষের শরীর ও সম্পদের সাথে সম্পর্কিত বিধি-বিধান যেমন– নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জ ইত্যাদি মান্য করাও জরুরী, মনের সাথে সম্পর্কিত বিধি-বিধান যেমন– ইখলাস, তাকওয়া, খোদাভীতি ইত্যাদি অর্জন করা এবং তাকাব্বুর, হাছাদ ইত্যাদি বর্জন করাও জরুরী। বরং এক হিসেবে মনের সাথে সম্পর্কিত বিধি-নিষেধ মান্য করার গুরুত্ব বেশি। অর্থাৎ, এসলাহে বাতেন বা আধ্যাত্মিক সংশোধনের গুরুত্ব বেশি।

এসলাহে বাতেনের গুরুত্ব হল মৌলিক এবং বুনিয়াদী। কারণ এসলাহে বাতেন না হলে অনেক সময় যাহেরী আমলও বেকার হয়ে যায়। যেমন মনের ভিতরে রিয়া থাকলে অনেক ইবাদত করেও কোন ছওয়াব পাওয়া যায় না। এমনিভাবে একেকটা আধ্যাত্মিক বিধান লঙ্ঘন করলে তার কারণে বহু পাপের পথ খুলে যায়। আবার এর বিপরীত একেকটা আধ্যাত্মিক বিধান মান্য করলে বহু নেকীর পথ খুলে যায়। এ সম্পর্কে গত জুমুআয় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছিল। তাই বুঝা গেল মনের সাথে সম্পর্কিত বিধি-বিধান অর্থাৎ, আধ্যাত্মিক বিধি-নিষেধ পালন করার গুরুত্ব হল মৌলিক ও বুনিয়াদী। এসলাহে বাতেন বা আধ্যাত্মিক সংশোধন হল মৌলিক ও বুনিয়াদী বিষয়।

এখন জানার বিষয় হল– এসলাহে বাতেন কীভাবে করতে হবে, আধ্যাত্মিক সংশোধনের পদ্ধতি কী? মনের অনেক ধরনের রোগ আছে, যেগুলো বর্জন করা দরকার। যেমন– অহংকার, হিংসা-বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, কৃপণতা ইত্যাদি। আবার অনেক ধরনের আত্মিক গুণাবলী আছে, যেগুলো অর্জন করা দরকার। যেমন– ইখলাস, তাকওয়া, সবর, উদারতা, খোদাভীতি ইত্যাদি। এই সব রোগ দূর করার এবং এই সব গুণাবলী হাছিল করার ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। তবে মৌলিকভাবে এসলাহে বাতেনের জন্য একটা কাজ করতে হবে। সেটা হল নফসের সাথে মোজাহাদা করা। অর্থাৎ, নফসের চাহিদার বিরুদ্ধাচরণ করা। নফস অর্থ মন। এই নফ্সের খারাপ চাহিদাকে বলা হয় খাহেশাতে নফসানী। এই খাহেশাতে নফসানীর বিরুদ্ধাচরণ করতে হবে। আল্লাহ পাক মানুষের পরীক্ষার জন্য নফ্সের মধ্যে খারাপ চাহিদা রেখে দিয়েছেন। তাই মানুষের মন স্বভাবগতভাবে খারাপ কাজেরই চাহিদা করে থাকে। কুরআন শরীফে বলা হয়েছে,

اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ.

অর্থাৎ, মানুষের মন অবশ্যই খারাপ বিষয়ের কথা বলে। (ইউনুস: ৫৩)

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



وَالذِّكْرُ الْكَثِيْرُ يَجْعَلُهَا بَيْضَآءَ، وَقَالَ تَعَالٰى : يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ، وَقَالَ تَعَالٰى : اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ.

وَيَا عِبَادَ اللّٰهِ! اِنَّ مَحَاسِنَ الْقُلُوْبِ لَا بُدَّ اَنْ تُحَصِّلُوْهَا، كَمَا اَنَّ مَعَائِبَهَا لَا بُدَّ اَنْ تَتْرُكُوْهَا. وَمِنْ اَعْظَمِ الْمَحَاسِنِ الْاِخْلَاصُ، وَهُوَ رُوْحُ الْاَعْمَالِ، لَا تُقْبَلُ الْاَعْمَالُ اِلَّا بِهٖ، قَالَ تَعَالٰى : وَمَا اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَاِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوٰى. اَلْحَدِيْثُ. وَمِنْ اَهَمِّهَا التَّقْوٰى، فَاِنَّ التَّقْوٰى رَأْسُ الْاُمُوْرِ كُلِّهَا، وَمِنْ اَهَمِّهَا الْحَيَآءُ، فَاِنَّ الْحَيَاءَ يَحُثُّ النَّاسَ عَلٰى اَدَاءِ الْمَامُوْرِ وَاجْتِنَابِ الْمَحْظُوْرِ، فَمَنْ حُرِمَ الْحَيَاءَ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهٗ وَخَذَلَ بِالشَّقَآءِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلَّهٗ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : اِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ. وَمِنْ اَهَمِّ الْمَعَائِبِ التَّكَبُّرُ وَهُوَ اُمُّ الْاَمْرَاضِ وَهُوَ دَاءٌ مُهْلِكٌ وَمَرَضٌ مُّفْسِدٌ، وَبِهٰذَا التَّكَبُّرِ لَمْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ مِنَ السَّاجِدِيْنَ، فَصَارَ مِنَ الْمَلْعُوْنِيْنَ، قَالَ تَعَالٰى : اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ. وَذَالِكَ عِنْدَ مَا اَمَرَهٗ تَعَالٰى بِالسُّجُوْدِ لِاٰدَمَ فَاَنْكَرَهٗ وَقَالَ : خَلَقْتَنِیْ مِنْ نَارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ. قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيْمٌ. وَاِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ.

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ : يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّیْ وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا.

بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِی الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ، وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. اَقُوْلُ قَوْلِیْ هٰذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ لِیْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَاسْتَغْفِرُوْهُ، اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

তাই স্বাভাবিকভাবে মানুষের মনে খারাপ কাজের চাহিদা বেশি, খারাপ কাজ করতে ভাল লাগে, পাপ করতে ভাল লাগে, গোনাহ করতে মজা লাগে, মিথ্যা কথা বলতে ভাল লাগে, গীবত করতে ভাল লাগে, যেনা করতে ভাল লাগে, গান-বাজনা শুনতে ভাল লাগে। স্বভাবগতভাবেই এ সব পাপের কাজ মানুষের কাছে ভাল লাগে। স্বভাবগতভাবেই পদে পদে মনের মধ্যে পাপের চাহিদা জাগে। নফসের সাথে মোজাহাদা করা ছাড়া, মনের সাথে সংগ্রাম করা ছাড়া, মনের চাহিদার বিরুদ্ধাচরণ করা ছাড়া শরীআতের উপরে উঠে আসা সম্ভব নয়। যেহেতু মনের স্বভাব-ই হল পাপের দিকে, অর্থাৎ শরীআতের বিরুদ্ধে নিয়ে যেতে চাওয়া। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, নফস খারাপটার কথাই বলে। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

اِلَّا مَارَحِمَ رَبِّیْ.

অর্থাৎ, হ্যাঁ আল্লাহ রহমত করলে ভিন্ন কথা। (ঐ)

অর্থাৎ,আল্লাহ যখন রহমত করেন, তখন নফ্স খারাপটার কথা বলে না। আল্লাহর এই রহমত কেউ কেউ শুরু থেকেই পেয়ে যান। যার কারণে কোন মোজাহাদা ছাড়াই জন্মগতভাবেই তাঁদের নফ্স দোরস্ত থাকে। ফলে তাদের মনে কখনো খারাপ কাজের চেতনা জাগে না। যেমন: আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালামের নফ্স জন্মগত ভাবেই দোরস্ত। তাই তাদের মনে পাপের চেতনা জাগে না, তারা পাপ কাজ করেন না। নবীগণ হলেন মা'সূম বা নিষ্পাপ।

আল্লাহর ঐ রহমত কেউ কেউ পান মোজাহাদা বা সাধনা করার পর। নফ্সের সাথে মোজাহাদা করতে করতে তাদের নফ্স দোরস্ত হয়। যাদের নফ্স জন্মগতভাবে দোরস্ত থাকে না, তাদের নফ্সও খারাপ কাজের কথা বলে, খারাপটাকে তাদের ভাল লাগে, গোনাহেরটা ভাল লাগে, নেক কাজ ভাল লাগে না, তবে নফসের সাথে মোজাহাদা করতে করতে একটা পর্যায় এমন আসে, যখন পাপের কাজ তাদের কাছে খারাপ লাগে এবং নেক কাজ ভাল লাগে।

কুরআন-হাদীছে নফ্সের তিনটা স্তর বলা হয়েছে, প্রথম স্তর হল– "নফ্সে আম্মারা"। এটা হল নফ্সের বা মনের ঐ অবস্থা, যেটা পাপের নির্দেশ দেয়। জন্মগতভাবে প্রত্যেকেরই নফ্স থাকে নফ্সে আম্মারা। যে সম্পর্কে পূর্বে কিছু কথা বলা হল। যখন এই নফ্সে আম্মারার উপর মোজাহাদা শুরু হয় এবং নফ্সের চাহিদার বিরুদ্ধাচরণ করা হয়, তার চাহিদা পূরণ করা বন্ধ করে দেয়া হয়, অর্থাৎ নফ্সের খাবার দেয়া বন্ধ করা হয়, তখন না খেতে খেতে সে দুর্বল হয়ে পড়ে। যার খাবার দেয়া হয় না সে তো দুর্বল হয়-ই। দুর্বল হতে হতে এক সময় নফ্স ভাবতে থাকে যে, আমাকে বেঁচে থাকতে হলে উনার কথা মানা ছাড়া উপায় নেই। উনি যে খাবার দিতে চান, সেই খাবারেই আমাকে অভ্যস্ত হতে হবে, নতুবা জীবন বাঁচবে না। তখন চুপচাপ সে শরীআতের কাজ করে যেতে থাকে। ইচ্ছে না হলেও নীরবে সে এই খাবার খেয়ে যেতে থাকে। এই খাবার খেতে খেতে যখন সে অভ্যস্ত হয়ে যায়, অর্থাৎ নেক আমল করতে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তখন সে বুঝতে পারে এটাই আসল খাবার। সে আসল খাবারের স্বাদ পেতে শুরু করে। তখন খারাপ খাবারের প্রতি অর্থাৎ খারাপ কাজের প্রতি তার ঘৃণা আসতে শুরু করে। তখন এই নফ্সই পাপের বিরুদ্ধে বলতে থাকে। নফ্সের এই পর্যায়কে বলা হয় "নফসে লাওয়ামা" অর্থাৎ, আত্মার ঐ অবস্থা, যে অবস্থা খারাপ কাজের নিন্দা করে, যে অবস্থা খারাপ কাজের প্রতি ঘৃণা জাগ্রত করে।

নফ্সের সাথে মোজাহাদা করতে করতে নফ্সে আম্মারা নফ্সে লাওয়ামা-র পর্যায়ে চলে আসে। এই পর্যায়ের উপর টিকে থাকলে এরপরে এমন একটা পর্যায় আসে, যখন নফ্স ভাল কাজ করতে

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



নিজের থেকে তৃপ্তিবোধ করা শুরু করে, নেক কাজে প্রচুর মজা পেতে শুরু করে। তখন নফ্সের উপর অনেকটা আস্থা করা যায় যে, তার মধ্যে আর গোনাহের চেতনা খুব একটা জাগ্রত হবে না। কারণ সে নেক কাজে পূর্ণাঙ্গ অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, নেক কাজে পূর্ণাঙ্গ মজা পেতে শুরু করেছে। এই মজা ছেড়ে তার অন্যত্র না যাওয়াটাই স্বাভাবিক। নফ্সের এই পর্যায়কে বলা হয় "নফ্সে মুতমাইন্না"। অর্থাৎ, যে নফ্সের উপর এতমীনান করা যায়, আস্থা বোধ করা যায়। নফ্সের সাথে মোজাহাদা করতে করতে নফ্সকে এই পর্যায়ে নিয়ে আসতে বলা হয়েছে। তাহলেই নফ্সের সাথে মোজাহাদা পূর্ণাঙ্গ হবে, তাহলেই নফ্স বা আত্মা পূর্ণাঙ্গ কামেল হবে। কিয়ামতের দিন এরকম কামেল আত্মাকেই আল্লাহ পাক জান্নাতে যাওয়ার আহ্বান জানাবেন। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা বলবেন,

يٰٓاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ، اِرْجِعِیْٓ اِلٰی رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً، فَادْخُلِیْ فِیْ عِبٰدِیْ وَ ادْخُلِیْ جَنَّتِیْ.

অর্থাৎ, হে নফসে মুতমাইন্না! তোমার প্রতিপালকের কাছে ফিরে আস এবং নেককার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে খুশি খুশি জান্নাতে প্রবেশ কর। (ফাজ্‌র: ২৭-৩০)

নফ্সের সাথে মোজাহাদা করতে করতে কীভাবে নফ্সে আম্মারা নফ্সে লাওয়ামা হয়ে যায়, তারপর আরও মোজাহাদা করতে করতে নফ্সে মুতমাইন্না-য় পরিণত হয়, এর একটা উদাহরণ দেয়া যায়। যেমন একজন মানুষ যে নামায পড়ে না, নামাযের কথা শুনলেই তার কাছে খারাপ লাগে, তার নফ্স নামায না পড়তে বলে। এটা হল নফ্সে আম্মারার পর্যায়। এরপর যখন সে নফ্সের বিরুদ্ধাচরণ করে নামায পড়া শুরু করে, তখন একটা পর্যায় এমন আসে, যখন নামায পড়তে তার খুব একটা খারাপ লাগে না। বরং নামায ছাড়তেই খারাপ লাগে। নামায ছাড়লে মনের মধ্যে তিরস্কার আসতে থাকে। নফ্সের এই পর্যায়কে বলা হয় নফ্সে লাওয়ামা। এই পর্যায়ে নামায ছাড়লে মনের মধ্যে তিরস্কার আসে, তবে নামাযের সাথে খুব একটা মহব্বত পয়দা হয় না। এই পর্যায়ের মানুষ অনেক সময় বলে থাকে, আচ্ছা খাওয়া-দাওয়া পরে করা যাবে, আগে নামাযের ঝামেলাটা সেরে নেই। বোঝা গেল নামাযের সাথে তার মহব্বত ভালবাসা গড়ে ওঠেনি, মহব্বত ভালবাসা গড়ে উঠলে নামাযকে তো ঝামেলার জিনিস মনে করত না। যেমন– কোন স্পেশাল প্রিয় খাবার সামনে থাকলে কেউ বলে না যে, আস আগে এই খাবারের ঝামেলা সেরে নেই। হ্যাঁ যদি লামছাম খাবার হয়, যার প্রতি কোন আকর্ষণ নেই, আর এই খাবারের পর কোন আকর্ষণীয় কিছু থাকে, তাহলে বলে আগে এই খাবারের ঝামেলা সেরে নেই। এরপর মোজাহাদা করতে করতে নামায পড়তে পড়তে এমন একটা পর্যায় আসে, যখন নামাযের প্রতি পূর্ণ আকর্ষণ এসে যায়, নামাযের সাথে তার মহব্বত ভালবাসা গড়ে ওঠে, নামায পড়তে তার খুব মজা লাগে। নফ্সের এই পর্যায়কে বলা হয় নফ্সে মুতমাইন্না। যেমন– হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী (রহ.) কে একজন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, হুজুর! আল্লাহ যদি আপনাকে জান্নাতবাসী করেন, তাহলে আল্লাহর কাছে কী আবেদন জানাবেন? তিনি উত্তর দিয়েছেন, আমি বলব আমার জন্য একটা জায়নামাযের ব্যবস্থা করা হোক, জান্নাতের এক কোণে ঐ জায়নামায বিছিয়ে আমি নামায পড়তে থাকব। নামাযের সাথে কতখানী মহব্বত থাকলে এটা হতে পারে। প্রত্যেকটা ইবাদতের ক্ষেত্রে নফ্সের সাথে মোজাহাদা করতে থাকলে সেই ইবাদতের ক্ষেত্রে নফ্স এই পর্যায়ে চলে আসে। শরীআতের সব হুকুমের ব্যাপারে, সব ইবাদতের ক্ষেত্রে মনের যখন এই অবস্থা হবে, তখন নফ্স পরিপূর্ণ মুতমাইন্না হয়ে যাবে। সব ব্যাপারে নফ্সের কথা অমান্য করে চলতে থাকতে হবে। নফ্সকে শরীআতের অনুগত বানানোর চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। তাহলে এক পর্যায়ে নফ্স শরীআতের অনুগত হয়ে যাবে, নফ্স আর শরীআতের বিপরীত কথা

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বলবে না। বরং নফ্স শরীআত মানতে পারলেই আনন্দবোধ করবে। এ পর্যায়ে চলে আসলে আমার নফ্স পরিপূর্ণ মোজাহাদায় পূর্ণাঙ্গ সাধনায় উন্নীত হয়ে গেল। এর জন্য নফ্সের সাথে মোজাহাদা করা চাই, খাহেশাতে নফসানীর বিরুদ্ধাচরণ করা চাই।

মোজাহাদা শব্দের অর্থ হল চরম প্রচেষ্টা, লাগাতার প্রচেষ্টা, নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রচেষ্টা। নফ্সের বিরুদ্ধে অব্যাহতভাবে প্রচেষ্টা চালাতে হবে। নফ্সের বিরুদ্ধে অত্যন্ত শক্ত থাকতে হবে। নফ্সের চাহিদার সামনে দুর্বল হলেই নফ্স আমাকে ধ্বংস করে দিবে। বুযুর্গানে দ্বীন বলেন, নফ্সের উদাহরণ হল বাঘের মত। যদি কেউ বাঘের সামনে ভিজা বিড়াল হয়ে থাকে, তাহলে বাঘ তাকে ধরে খেয়ে ফেলবে, তাকে শেষ করে ফেলবে। আর যদি শক্ত হয়ে থাকে- বন্দুক উঁচু করে ধরে কিংবা আগুন উঁচু করে ধরে, তাহলে বাঘ পালাবে, সে জীবনে রক্ষা পাবে। এমনিভাবে নফ্সের সাথে যে যত কড়া ভাব প্রদর্শন করবে, নফ্সের সামনে যত শক্ত হবে, নফ্স তত নরম হবে, এক পর্যায়ে নফ্স পরাস্ত হয়ে যাবে, সে রক্ষা পাবে। আর নফ্সের সাথে যে যত নম্রতা প্রদর্শন করবে, নফ্সের সামনে যে যত দুর্বল হয়ে পড়বে, নফ্স তাকে তত সহজে গ্রাস করবে। শেষ পর্যন্ত তাকে ধ্বংস করে দিবে।

যদি কেউ মনে করে নফ্স খারাপ খেতে চায়, আচ্ছা কিছু দিন তাকে এই খারাপ খাবারই পর্যাপ্ত পরিমাণে দিয়ে দেই, তার চাহিদা পুরণ হয়ে গেলে, তার পেট ভরে গেলে সে আর খাবার চাইবে না, তখন আর তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে মোজাহাদা করার প্রয়োজন থাকবে না; এমনিতেই সে বিমুখ হয়ে যাবে। কিন্তু এই দর্শন ঠিক নয়। নফ্সের চাহিদার কোন শেষ নেই। খারাপ পথে যতই তার চাহিদা পুরণ করা হোক, কোন দিন তার চাহিদা শেষ হবে না। পাশ্চাত্য জগতে পাপের সরঞ্জাম অবাধ করে দেয়া হয়েছে, পাপের উপকরণ অবাধ করে দেয়া হয়েছে, সমস্ত পাপ কাজকে আইন করে বৈধ করে দেয়া হয়েছে। সেখানকার মানুষ অবাধে যেনা করছে, অবাধে মদ খাচ্ছে, সব রকম নাচ-গান ইত্যাদি চালাচ্ছে, মনের সব চাহিদাকে তারা অবাধে পূরণ করে যাচ্ছে, কিন্তু কৈ তাদের নফ্সের চাহিদা তো শেষ হল না, এত পঁচা খাবার খেয়েও তো তাদের নফ্সের পেট ভরল না। তারা তো কখনও বলল না যে, ব্যস আর নয়, পেট ভরে গেছে। যদি ওদের কাছে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, ভাই! তোমরা তো খুব অবাধে সব পাপ কাজ করতে পার, কোন ধরনের বাঁধা নেই- ধর্মেরও বাঁধা নেই, সমাজেরও বাঁধা নেই, রাষ্ট্রীয় আইনেরও বাঁধা নেই, তোমাদের নীতি-নৈতিকতার বিচারেও কোন বাঁধা নেই, সম্পূর্ণ অবাধে নফ্সের সব চাহিদা পূরণ করতে পার, এখন কী তোমাদের চাহিদা শেষ হয়েছে? কেউ বলবে না যে, আমার চাহিদা শেষ হয়েছে। আসলে নফ্সের চাহিদার কোন শেষ নেই। এই চাহিদা কোনদিন শেষ হয় না।

নফ্সের চাহিদা হল দুনিয়াবী চাহিদা, আর দুনিয়ার কোন চাহিদা কোনোদিন শেষ হয় না। কেউ হাজার হাজার টাকার মালিক হোক, লক্ষ-কোটি টাকার মালিক হোক, বহু গাড়ি-বাড়ির মালিক হোক, আরাম আয়েশ ও বিলাসিতার বহু উপকরণের মালিক হোক, তবুও সে কোন দিন একথা বলবে না যে, আমার আর কোন চাহিদা নেই, আমার সব চাহিদা পূরণ হয়ে গেছে। বরং তার যত হবে তত চাহিদা বাড়তে থাকবে। আরও চাই আরও চাই-এই মনোভাব কোনোদিন শেষ হবে না। রাসূল (সা.) নফ্সের চাহিদা সম্পর্কে এ কথাই বলে গেছেন। ইরশাদ করেছে,

يَهْرُمُ ابْنُ اٰدَمَ وَتَشِبُّ مِنْهُ اِثْنَتَانِ اَلْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمُرِ. (صحيح مسلم برقم ٢٤٥٩)

অর্থাৎ, মানুষ বৃদ্ধ হয় আর তার মধ্যে দুটো চাহিদা জওয়ান হতে থাকে, সম্পদের লোভ ও বেঁচে থাকার দীর্ঘ আশা।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



বোঝা গেল লোভের কোন শেষ নেই, দীর্ঘ আশারও কোন শেষ নেই। যেমন– দীর্ঘ দিন বেঁচে থাকার আশার কোন শেষ নেই। যাদের বয়স ৩০-৪০ তারা মনে করে– যদি আরও ১০-১২ বছর ২০ বছর বেঁচে থাকতে পারতাম। এভাবে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকার আশা কখনও তৃপ্ত হবার নয়, দুনিয়ার কোন বিষয়ের আশা এবং লোভ কখনও তৃপ্ত হবার নয়। ধন-সম্পদের লোভও কখনো তৃপ্ত হবার নয়। এক হাদীছে বলা হয়েছে,

لَوْ كَانَ لِابْنِ اٰدَمَ وَادِيًا مِّنْ ذَهَبٍ لَاَحَبَّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهُ ثَالِثٌ وَلَا يَمْلَأُ فَاهُ اِلَّا التُّرَابُ. (رواه الترمذي في سننه برقم ٢٣٣٧ وقال : حسن صحيح غريب)

অর্থাৎ, যদি বনী আদমের এক উপত্যকা ভরা স্বর্ণ হয়ে যায়, তবুও তার মনে হবে আরও যদি এত পরিমাণ হত। তার গাল কখনও ভরবে না। বোখারীর এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যদি দুই উপত্যকা ভরা সম্পদ হয়, তবে তৃতীয় উপত্যকা ভরা কামনা করবে, অর্থাৎ যত ভরবে গাল তত বড় করতে থাকবে। তার গালের হা শুধু বাড়তেই থাকবে। কবরের মাটি ঢোকার আগ পর্যন্ত আর কিছুতে তার গাল ভরবে না।

এ হাদীছে বোঝানো হয়েছে- মানুষের সম্পদের চাহিদা কখনো শেষ হবে না। মনের চাহিদার ব্যাপারটাই হল এরকম যে, যত পাক কোন ব্যাপারেই সে তৃপ্ত হয় না। অতএব পাপের স্বাধীনতা যতই দেয়া হোক, যতই গোনাহ করার সুযোগ দেয়া হোক, মনের চাহিদা কোনোদিন পূরণ হবে না। কাজেই এ যুক্তি ঠিক নয় যে, কিছুদিন অবাধে পাপ করতে দিলে মন ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, এরপরে আর ঐ সমস্ত পাপের দিকে মনের আকর্ষণ থাকবে না।

পাপ করে কোনদিন মনের তৃপ্তি বা মনের প্রকৃত শান্তি আসবে না। মনের প্রকৃত শান্তি এবং তৃপ্তিবোধ আসবে দ্বীনের লাইনে। অন্য কোন লাইনে নয়। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ.

অর্থাৎ, জেনে রেখ আল্লাহর স্মরণেই মনের প্রশান্তি আসে। (রা'দ: ২৮)

একমাত্র আল্লাহর স্মরণেই মনের প্রশান্তি আসতে পারে, অন্য কোনোভাবে নয়। এখানে "আল্লাহর স্মরণ" দ্বারা যিকির, ইবাদত-বন্দেগী সবকিছু উদ্দেশ্য। এই সবকিছু দ্বারা মনের প্রশান্তি আসবে। অর্থাৎ, মনের প্রশান্তি আসবে দ্বীনের লাইনে। এ লাইনে যে যতবেশি অগ্রসর হবে, সে ততবেশি মনের প্রশান্তি লাভ করতে পারবে। তাই দেখা যায় যারা দ্বীনের লাইনে চলেন তাদের মনে টেনশন কম থাকে, পেরেশানী কম থাকে, দুশ্চিন্তা কম থাকে। এর বিপরীত যারা দ্বীনের লাইনে চলে না, তাদের যত টাকা-পয়সা থাকুক, যত গাড়ি-বাড়ি থাকুক, যত ধন-দৌলত ঐশ্বর্য্য থাকুক, তাদের টেনশন কমে না, তাদের পেরেশানী বাড়তেই থাকে। মুসলমানদের তুলনায় অমুসলিমদের ধন-সম্পদ স্বাভাবিকভাবে কিছু বেশি থাকে, যেহেতু তাদের পরকালে কিছু নেই, যা পাওয়ার দুনিয়াতেই আল্লাহ তাদেরকে দিয়ে দেন, কিন্তু ধন-সম্পদ বেশি থাকা সত্ত্বেও তাদের মনে প্রকৃত শান্তি নেই তাদের টেনশন পেরেশানী কমে না। টেনশন পেরেশানীতে টেবলেট খেয়ে তারপর ঘুমাতে হয়। এর বিপরীত যারা দ্বীনী লাইনে চলে আসে, দ্বীনী চেতনায় চলে আসে, তাদের টেনশন নেই, পেরেশানী নেই। অভাবে আছে, না খেয়ে আছে, তারপরেও তাদের মনের ভিতরে কোন পেরেশানী নেই। এটাই তো আসল শান্তি!

যাহোক যে কথা বলা হচ্ছিল দুনিয়ার চাহিদার কোন শেষ নেই। যতই দুনিয়া হোক তাতে শান্তি নেই, না দুনিয়াতে শান্তি আছে না আখেরাতে শান্তি হবে। বরং দ্বীনের লাইনে চলে আসলেই শান্তি হবে, দুনিয়াতেও শান্তি হবে, আখেরাতেও শান্তি হবে।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

দ্বীনের লাইনে উঠে আসতে হলে মনের সাথে মোজাহাদা করতে হবে। মনের চাহিদার বিরুদ্ধে শরীআতের কাজ করতে থাকতে হবে। মনের চাহিদার বিরুদ্ধে করতে করতে এক সময় মন অভ্যস্ত হয়ে যাবে। তখন আর মোজাহাদা লাগবে না, তখন ইবাদত-বন্দেগীতে আরাম লাগবে। যারা নামায পড়েন তারা উপলব্ধি করতে পারেন। যখন নামায পড়তেন না, তখন নামাযের কথা শুনলে কষ্ট লাগত। নামায পড়ার কথা চিন্তা করলেও কষ্ট লাগত, কিন্তু নামায পড়তে পড়তে এরকম অভ্যস্ত হয়ে গেলে নামায না পড়ে আর শান্তি পাওয়া যায় না, নামায না পড়ে যদি ঘুম পড়তে যান তাহলে ঘুম আসে না, অশান্তি বোধ হয়। নামায পড়লেই দিলের ভিতরে এতমীনান এসে যায়। প্রত্যেকটা কাজ-ই এরকম। একজন মহিলা যে পর্দা করে না, পর্দার কথা ভাবতেও তার কষ্ট লাগে। বোরখার কথা বলা হলে তার মনে হবে দম আটকে মরে যাবে, তাকে বস্তাবন্দি করে ফেলা হচ্ছে। তার গায়ে জ্বালা শুরু হয়ে যাবে। কিন্তু পর্দা করতে অভ্যস্ত হলে এমন হবে যে, তখন পর্দা ছাড়া বের হতেই অস্বস্তিবোধ হবে, পর্দা করা ছাড়া সে স্বস্তি পাবে না। দ্বীনের প্রত্যেকটা আমলই এরকম, করার আগে মনের কাছে খুব কষ্টকর বোধ হয়, কিন্তু নফ্সের সাথে মোজাহাদা করে, কষ্ট বরদাশ্ত করে যদি আমল করা শুরু করে দেয়, তাহলে কষ্ট দূর হয়ে যায়, বরং এক পর্যায়ে সেটা করার মধ্যেই শান্তি বোধ হতে থাকে। প্রথম প্রথম কষ্ট থাকে, পরের দিকে কষ্ট থাকে না, বরং আরামের হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এই আরাম বোধ আসা পর্যন্ত অব্যাহত মোজাহাদা করা চাই।

নফ্সের সাথে মোজাহাদা করা ছাড়া দুনিয়ার কোন কাজও হয় না। মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করা ছাড়া দুনিয়ার কোন বিষয়েও কেউ কামিয়াব হতে পারে না। একজন মানুষ লেখা-পড়া করে কামিয়াব হতে চাইলেও তাকে মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করতে হবে। বাচ্চাদের মনে চায় না খেলা-ধূলা ছেড়ে ফূর্তি-ফার্তি ছেড়ে বই নিয়ে বসতে, মাষ্টারের কাছে যেতে মনে চায় না, কষ্ট লাগে, মনে মনে ভাবে উনি কেন আসেন, উনি না আসলে খুব ভাল হত, কিন্তু মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে পড়তে বসতে হয়। মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে মাদ্রাসা, স্কুলে যেতে হয়, তার মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পিতা-মাতা তাকে ভোর বেলায় ঘুম থেকে তাকে তুলে দেয়, পড়াশুনা করতে বাধ্য করে। কারণ তারা বোঝে মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মোজাহাদা না করলে কামিয়াবী বা সফলতা আসবে না। যারা চাকুরী করে, তাদেরকে মনের ইচ্ছার সাথে মোজাহাদা করতে হয়, সকাল বেলায় ঘুম থেকে উঠে বিবি বাচ্চাদেরকে ছেড়ে চলে যেতে হয়, মনে না চাইলেও যেতে হয়, কষ্ট করতে হয়। সে বোঝে এই সাধনার মধ্যেই সফলতা। যদি বলা হয় ভাই আপনার চাকরী করতে খুব কষ্ট হয়, মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করতে হয়, আমি আপনার বস্কে বলে আপনার চাকরীটা ছুটিয়ে দেই, তাহলে আপনি কষ্ট থেকে মুক্তি পেয়ে যাবেন, তাহলে সে রাজী হবে না; বরং সে আরও অখুশি হবে। সে বুঝেছে এই কষ্ট করলেই আমার সফলতা, এতেই আমার ফায়দা। চাকরীর কষ্ট স্বীকার করে নিলে মাস শেষে গোনা গোনা বেতন পাব! দেখা গেল লাভের আশায় মানুষ কষ্ট বরদাশত করতে পারে, লাভের আশায় মনের সাথে মোজাহাদা করতে পারে, লাভের আশায় মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনেক কিছু করতে পারে। লাভের বিষয়টা সামনে থাকলেই এরকম মোজাহাদা করা সহজ হয়ে যায়।

দ্বীনী লাইনেও যখন লাভের বিষয়টা সামনে রাখা হবে, যখন দ্বীনী আমলের লাভ সামনে থাকবে, তখন দ্বীনী আমলের জন্যেও মোজাহাদা করা এবং কষ্ট বরদাশত করা সহজ হয়ে যাবে। মনের সব চাহিদাকে, সমস্ত খাহেশাতে নফ্সানীকে কুরবানী দিয়ে দেয়া সহজ হয়ে যাবে। নিজের নফ্সের চাহিদাকে কুরবানী দিতে হবে। আল্লাহ আল্লাহর রাসূলের চাহিদার মধ্যে নিজের চাহিদাকে বিলীন করে দিতে হবে।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



এক বুযুর্গ কবিতা বলেছেন,

آرزوئے خاک ہویا حسر تیں پا مال ہو
اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے

অর্থাৎ, আমার মনের সব চাহিদা ধূলিসাৎ হয়ে যাক, মনের সমস্ত কামনা-বাসনা পদদলিত হয়ে যাক, তবুও আমার দিলকে তোমার জন্য উপযুক্ত বানাতে চাই। অর্থাৎ, আমার দিলের সব চাহিদাকে তোমার চাহিদার মধ্যে বিলীন করে দিতে চাই, আমার সব কামনা-বাসনাকে তোমার কামনা-বাসনার মধ্যে বিলীন করে দিতে চাই।

অতএব নিজের ইচ্ছা এবং কামনা-বাসনাকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের হুকুমের সামনে কুরবানী দিয়ে দিতে হবে। মনের অবৈধ চাহিদা এবং অবৈধ কামনা-বাসনা পদদলিত করে দিতে হবে। গোনাহ করতে মনে চাইলে মনের সেই চাওয়াকে কুরবানী দিয়ে দিতে হবে। মিথ্যা বলতে মনে চাইলে, মানুষের গীবত শেকায়েত করতে মনে চাইলে মনের সেই চাওয়াকে কুরবানী দিয়ে দিতে হবে। যদি বেগানা মহিলার দিকে তাকাতে বাসনা জাগে যে, আহা কী সুন্দর চেহারা, আহা কত স্মার্ট, কত ফিটফাট মন ছুটে যায়! মনের এই বাসনাকে, মনের এই চাহিদাকে দমন করে রাখতে হবে। শীতের ভোর রাতে লেপ কম্বলের মধ্য থেকে উঠতে মনে না চাইলেও মনের চাহিদাকে কুরবানী দিয়ে নামাযের জন্য উঠে পড়তে হবে। গান-বাজনা শুনতে মনে চাইলেও মনের সেই চাহিদাকে কুরবানী দিতে হবে। নাচ, সিনেমা, নাটক দেখতে মনে চাইলেও মনের সেই চাওয়াকে কুরবানী দিতে হবে। এভাবে শরীআত বিরোধী মনের সব চাহিদাকে কুরবানী দিতে হবে। এজন্য পদে পদে নফ্সের চাহিদার বিরুদ্ধে মোজাহাদা করতে হবে। প্রথম দিকে মোজাহাদা করে দ্বীনের উপর উঠে আসতে কষ্ট হবে। কিন্তু পরে আর কষ্ট লাগবে না। প্রথম দিকে আল্লাহর হুকুম ইবাদত-বন্দেগীতে মজা বোধ হবে না, কিন্তু পরে মজা বোধ হতে শুরু করবে।

এভাবে যে মোজাহাদা করতে পারবে, সে-ই হল আসল মুজাহিদ। যুদ্ধের ময়দানে যে জেহাদ করে, সেও মুজাহিদ। কিন্তু মনের সাথে যে মোজাহাদা করে, মনের সাথে যে সংগ্রাম করে, সে হল বড় মুজাহিদ। কারণ যুদ্ধের ময়দানে জেহাদ করার সময় মানুষের মনে বিশেষ স্পিরিট থাকে, তখন জীবন দিয়ে দেয়াও সহজ বোধ হয়। তাছাড়া জেহাদ সর্বক্ষণ করতে হয় না, হয়তো জীবনে মাঝে মধ্যে কখনও দু'একবার এরকম পরিস্থিতি এসে যায়। কিন্তু নফ্সের সাথে মোজাহাদা সর্বক্ষণ করে যেতে হয়, জীবনের প্রত্যেকটা পদে পদে করে যেতে হয়। তাই নফ্সের সাথে এই মোজাহাদা বেশি কঠিন। এই জন্যেই নফ্সের সাথে যে মোজাহাদা করতে পারে সে হল বড় মুজাহিদ। সে হল আসল মুজাহিদ। নবী কারীম (সা.) ইরশাদ করেছেন,

**اَلْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ.** (رواه أحمد في مسنده برقم ٢٣٩٩٧ وإسناده صحيح والترمذي برقم ١٦٢١ وقال حسن صحيح)

অর্থাৎ, মুজাহিদ তো সেই, যে তার নফসের সাথে মোজাহাদা করে।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে নফ্সের সাথে মোজাহাদা করে দ্বীনের উপর উঠে আসার তাওফীক দান করুন। আমীন! ইনশাআল্লাহ এ সম্পর্কে আগামী জুমুআয় আরও কিছু আলোচনা পেশ করা হবে।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বয়ান নং ৩৫-এর খুতবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ، اَلْمُطَّلِعِ عَلٰى سَرَائِرِ الْقُلُوْبِ ، اَحْمَدُهٗ وَاَشْكُرُهٗ وَاِلَيْهِ اَتُوْبُ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ شَهَادَةً تُكَفِّرُ كُلَّ الذُّنُوْبِ ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهُ الْمُتَّصِفُ بِصَفَاءِ الْقُلُوْبِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَعَلٰى اَصْحَابِهٖ مَا دَامَ الطُّلُوْعُ وَالْغُرُوْبُ.

اَمَّا بَعْدُ :

اَيُّهَا النَّاسُ ! اِنَّ فِى النَّفْسِ اَنْوَاعًا مِّنَ الرَّذَائِلِ وَالْفَحْشَآءِ، وَهِىَ مَجْبُوْلَةٌ بِالسُّوْءِ وَالْاَمَانِىِّ، قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّىْ. وَمِنْ طَرِيْقِ التَّخَلُّصِ عَنْ رَذَائِلِ النُّفُوْسِ اَلْمُجَاهَدَةُ مَعَهَا فِيْمَا اشْتَهَاهَا، فَمَنْ جَاهَدَ نَفْسَهٗ فِيْمَا يَتَقَاضَاهَا، تَكُوْنُ نَفْسُهٗ لَوَّامَةً فِيْمَا يَشْتَهِيْهَا، ثُمَّ تَكُوْنُ مُطْمَئِنَّةً يَّطْمَئِنُّ بِهَا، فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ اَعْلَاهَا، قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : يٰٓاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِىْ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِىْ فِىْ عِبَادِىْ وَادْخُلِىْ جَنَّتِىْ. فَالْمُجَاهَدَةُ مَعَ النَّفْسِ وَالشَّيْطَانِ هِىَ الْجِهَادُ الْاَكْبَرُ، وَالْمُجَاهَدَةُ مَعَ اَعْدَاءِ النَّاسِ هِىَ الْجِهَادُ الْاَصْغَرُ، وَقَدْ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ قَفَلَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ : رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْاَصْغَرِ اِلَى الْجِهَادِ الْاَكْبَرِ. فَاَشَارَ اِلٰى اَنَّ الْجِهَادَ مَعَ النَّفْسِ هُوَ الْجِهَادُ الْاَكْبَرُ. وَلِذَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : اَلْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهٗ.

وَمِنْ رَذَائِلِ الْقُلُوْبِ اَلْحِرْصُ وَطُوْلُ الْاَمَلِ، وَ هُمَا دَاءَانِ مُهْلِكَانِ، وَمَرَضَانِ مُفْسِدَانِ، وَقَدْ ضُرِبَا بِالْمَثَلِ بِاَنَّهُمَا لَا يَشْبَعَانِ، قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَهْرَمُ ابْنُ اٰدَمَ وَيَشِبُّ فِيْهِ اِثْنَانِ اَلْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمُرِ. وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : لَوْ كَانَ لِابْنِ اٰدَمَ وَادِيًا مِّنْ ذَهَبٍ لَاَحَبَّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ ثَانِيًا وَلَنْ يَّمْلَاَ فَاهُ اِلَّا التُّرَابَ. فَاَطْلِقُوا النُّفُوْسَ مِنْ وَثَائِقِ اٰثَامِهَا، وَاَعْتِقُوْهَا مِنْ رِقِّ مَعَاصِيْهَا وَاَجْرَامِهَا، وَاَوْفِرُوا النُّفُوْسَ بِالْخَصَائِلِ، وَاَنْقُوْهَا مِنَ الرَّذَائِلِ. وَمِنْ طَرِيْقِ التَّخَلُّصِ مِنَ الْحِرْصِ وَطُوْلِ الْاَمَلِ، اَلنَّظَرُ فِى الدُّنْيَا اِلٰى مَنْ هُوَ الْاَسْفَلُ، وَقَطْعُ لَذَّاتِ الدُّنْيَا بِذِكْرِ الْمَوْتِ. قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اُنْظُرُوْا فِى الدُّنْيَا اِلٰى مَنْ هُوَ اَسْفَلُ مِنْكُمْ. وَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَكْثِرُوْا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ.

وَطَرِيْقُ التَّخَلُّصِ مِنْ رَذَائِلِ الْقُلُوْبِ ذِكْرُ اللّٰهِ. قَالَ تَعَالٰى : يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا، وَسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا، وَقَالَ تَعَالٰى : اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ. وَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِكُلِّ شَيْءٍ صَقَالَةٌ، وَصَقَالَةُ الْقُلُوْبِ ذِكْرُ اللّٰهِ.

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ : وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ.

بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ، وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. اَقُوْلُ قَوْلِىْ هٰذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ لِىْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَاسْتَغْفِرُوْهُ، اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বয়ান নং -৩৬

## এসলাহে বাতেনের তরীকা (২য় পর্ব)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لِكُلِّ شَيْءٍ صَقَالٌ وَصَقَالُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللّٰهِ.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

গত জুমুআয় এসলাহে বাতেন বা আধ্যাত্মিক সংশোধনের তরীকা সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল মনের বিভিন্ন রকম রোগ রয়েছে। যেমন– তাকাব্বুর বা অহংকার, রিয়া বা লোক দেখানো, হিংসা-বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, লোভ, কৃপণতা, দুনিয়ার মহব্বত, বদ-নজর ইত্যাদি। এসব রোগের মধ্যে এক এক রোগের একেক রকম চিকিৎসা রয়েছে। তবে মৌলিকভাবে আধ্যাত্মিক সংশোধনের জন্য কয়েকটা আমল করা জরুরী। তার মধ্যে প্রথম পর্যায়ের একটা মৌলিক বিষয় হল নফসের সাথে মোজাহাদা করা। নফসের সাথে মোজাহাদা করার অর্থ হল মনের মধ্যে শরীআত বিরুদ্ধ যত চাহিদা জাগবে, সেই চাহিদার বিরুদ্ধাচরণ করতে হবে। সেই চাহিদাকে কুরবানী দিয়ে, সেই স্থলে আল্লাহ, আল্লাহর রাসূলের যা চাহিদা সেটাকে বাস্তবায়ন করতে হবে। এভাবে মনের চাহিদার সাথে মোজাহাদা করতে-করতে মনের চাহিদাকে আল্লাহ আল্লাহর রাসূলের চাহিদার অনুগত বানিয়ে ফেলতে হবে। মন যদি মিথ্যা বলতে চায়, তাহলে সেই চাহিদাকে কুরবানী দিয়ে সত্য বলতে হবে, কারণ সত্য বলাই আল্লাহ আল্লাহর রাসূলের চাহিদা। মন যদি চায় অহংকার করতে, তাহলে সেই চাহিদাকে কুরবানী দিয়ে তাওয়াযু বা বিনয় প্রদর্শন করতে হবে, কারণ তাওয়াযু করাই আল্লাহ আল্লাহর রাসূলের চাহিদা। মন যদি বেগানা নারীর দিকে নজর দিতে চায়, তাহলে সেই চাহিদাকে কুরবানী দিয়ে দৃষ্টি নত করে নিতে হবে, কারণ বেগানা নারীর দিকে নজর না দেয়াই আল্লাহ আল্লাহর রাসূলের চাহিদা। মন যদি নামায তরক করতে চায়, তাহলে মনের সেই চাহিদাকে কুরবানী দিয়ে নামায পড়তে হবে, কারণ নামায পড়াই আল্লাহ আল্লাহর রাসূলের চাহিদা। এভাবে প্রত্যেকটা পদে পদে নফসের চাহিদাকে আল্লাহ আল্লাহর রাসূলের চাহিদার অনুগত বানিয়ে ফেলতে হবে। তাহলে আমরা খাঁটি মু'মিন হতে পারব, খাঁটি দ্বীনদার হতে পারব। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন,

لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهٖ. (مشكاة عن شرح السنة)

অর্থাৎ, তোমাদের কেউ খাঁটি মু'মিন হতে পারবে না, পূর্ণাঙ্গ মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার নফসের চাহিদা আমার আনীত আদর্শের অনুগত না হবে।

এ হাদীছে বোঝানো হয়েছে নফসকে শরীআতের অনুগত বানাতে না পারলে, শরীআতের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনতে না পারলে খাঁটি মু'মিন হওয়া যাবে না। আর খাঁটি মু'মিন না হলে কামিয়াব হওয়া যাবে না। অতএব খাঁটি মু'মিন হতে চাইলে নফসকে শরীআতের আনুগত বানাতে হবে। আর নফসকে শরীআতের অনুগত বানাতে হলে প্রত্যেকটা পদে নফসের চাহিদাকে কুরবানী দিয়ে আল্লাহ আল্লাহ্র রাসূলের চাহিদাকে বাস্তবায়ন করতে হবে। এ জন্য প্রত্যেকটা পদে পদে নফসের চাহিদার বিরুদ্ধে মোজাহাদা করতে হবে। নফস যা বলে তা নয়; বরং শরীআত যা বলে, নফসকে সেটা মানানোর

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



চেষ্টা করতে হবে। তাহলে আমি কামিয়াব হতে পারব। নফসের কথা মানলে আমি কামিয়াব হতে পারব না; বরং ব্যর্থ হব। নবী কারীম (সা.) ইরশাদ করেছেন,

اَلْعَاجِزُ مَنْ اَتْبَعَ نَفْسَهٗ هَوَاهَا وَتَمَنّٰى عَلَى اللّٰهِ. (رواه الترمذي في سننه برقم ٢٤٥٩ وقال : حسن)

অর্থাৎ, অক্ষম ও ব্যর্থ ঐ ব্যক্তি যে তার মনকে খাহেশাত বা খেয়াল খুশির অনুগত বানিয়ে নেয়। যা মনে চায় তাই করে। মনচাহি যিন্দেগী চালায়, খাহেশাতের যিন্দেগী গ্রহণ করে এবং আল্লাহ্র কাছে বড় বড় আশা করে।

অতএব দ্বীনী লাইনের সফলতা আনতে হলে– যা মনে চায় তা বলা যাবে না, যা মনে চায় তা করা যাবে না; বরং সেটা শরীআতের আওতায় পড়ে কি-না তা বুঝে নিতে হবে। যা খেতে মনে চায় তা খাওয়া যাবে না, দেখতে হবে সেটা শরীআতে অনুমোদিত কি-না। যেমন– পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করতে মনে চায় তেমনটা পরিধান করা যাবে না, দেখতে হবে সেটা শরীআত সম্মত কি-না। যেভাবে আয় উপার্জন করতে মনে চয়, যেভাবে ব্যয় করতে মনে চায়, সেভাবে করা যাবে না, দেখতে হবে সে ব্যাপারেও শরীআত কী বলে। এভাবে প্রত্যেকটা পদে পদে মনে যা চায় মনের সেই চাহিদাকে বিচার করে দেখবে সেটা শরীআতের আলোকে করা যাবে কি যাবে না। যদি করার অনুমতি না থাকে, তাহলে মনের সেই চাহিদাকে কুরবানী দিয়ে দিতে হবে। আমি নফ্সের চাহিদা বুঝি না, আমি শরীআতের চাহিদা বুঝি। আমি নফ্সের গোলাম হব না, বরং নফ্সকে শরীআতের গোলাম বানাব। নফ্সকে যতক্ষণ পর্যন্ত শরীআতের গোলাম বানানো না হবে, শরীআতের অনুগত বানানো না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি খাঁটি মু'মিন হতে পারব না, খাঁটি মু'মিন থাকতেও পারব না। খাঁটি মু'মিন হতে গেলে এবং খাঁটি মু'মিন থাকতে গেলে প্রতিনিয়ত নফ্সের সাথে জেহাদ চালিয়ে যেতে হবে। আর নফ্সের সাথে এই জেহাদ-ই হচ্ছে বড় জেহাদ।

মানুষ শত্রুর সাথে ময়দানে জেহাদ করে। সেই জেহাদ হয় একটা বিশেষ জযবায়, যখন তার দেশ আক্রান্ত হয়ে গেছে! তার চোখের সামনে তার মাতা-পিতা ভাই-বোন ও আপন জনকে হত্যা করা হচ্ছে, তার আপনজনের প্রতি অত্যাচার করা হচ্ছে, দুর্বিচার করা হচ্ছে। এরূপ মুহূর্তে তার রক্ত টগবগ করে ওঠে। তার নফসের মধ্যে তেজ এসে যায়, ক্রোধ এসে যায়। ফলে শত্রুর সাথে যুদ্ধ করে জীবন দিয়ে দেয়াও সহজ হয়ে যায়। কিন্তু নফ্সের সাথে যুদ্ধ করতে হয় ঠাণ্ডা মুহূর্তে, যখন উত্তেজনা সৃষ্টি হওয়ার মত তেমন কিছু থাকে না। তারপরেও নফ্সের সাথে সংগ্রাম করে যেতে হয় এবং সেটা বিশেষ কোন একটা মুহূর্তে নয়, বরং সারা জীবন এই সংগ্রাম অব্যাহত রাখতে হয়। এসব কারণে নফ্সের সাথে মোজাহাদা করা খুব কঠিন। এজন্যেই নফ্সের সাথে মোজাহাদা করাকে বড় জেহাদ বলা হয়েছে। নবী (সা.) যখন তাবুকের যুদ্ধ থেকে ফিরে আসেন, যে যুদ্ধ ছিল রোমান সম্রাটের বিরুদ্ধে, যদিও মুসলমানদের ব্যাপক সৈন্য সামন্তের কথা শুনে রোমানরা যুদ্ধ করতে আসেনি, যুদ্ধ হয়নি। ফলে নবী কারীম (সা.) সাহাবাদেরকে নিয়ে ফিরে আসেন। মদীনার কাছে এসে তিনি বলেন,

رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْاَصْغَرِ اِلَى الْجِهَادِ الْاَكْبَرِ. (كشف الخفاء ومزيل الإلباس عن البيهقي وتاريخ الخطيب)

অর্থাৎ, আমরা ছোট জেহাদ থেকে বড় জেহাদের দিকে ফিরে আসলাম।

এ হাদীছের ব্যাখ্যায় মুহাদ্দিছীনে কেরাম বলেছেন, এর অর্থ হল আমরা শত্রুর সাথে জেহাদ করতে গিয়েছিলাম, এটা ছিল ছোট জেহাদ। এখন বাড়ি ফিরে যাচ্ছি, এখন নফ্সের সাথে জেহাদ চলতে থাকবে, এটা হল বড় জেহাদ। সংক্ষেপে তিনি বলেছেন আমরা ছোট জেহাদ থেকে বড় জেহাদের দিকে

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

ফিরে আসলাম। বোঝা গেল নফ্সের সাথে জেহাদ করা হল বড় জেহাদ। সাময়িকভাবে যুদ্ধের ময়দানে জীবন দিয়ে দেয়া সহজ, কিন্তু নফ্সের সাথে মোজাহাদা করা এত সহজ নয়। কারণ প্রতিনিয়ত, সব সময় নফ্সের বিরুদ্ধে মোজাহাদা করতে হয়। এ কারণেই নফ্সের সাথে মোজাহাদা হল বড় জেহাদ।

কারও মনে মনে খটকা লাগতে পারে যে, বড় ছোট-র তুলনা হয়ে থাকে এক ধরনের জিনিসের মধ্যে। অথচ ময়দানের জেহাদ আর নফ্সের সাথে মোজাহাদা দুটো দুই ধরনের জিনিস। কাজেই এ দুটোর মধ্যে একটা ছোট আর একটাকে বড় বলা হল কীভাবে? তাহলে শুনুন- ময়দানের জেহাদ আর নফ্সের সাথে মোজাহাদার মধ্যে অনেক মিল রয়েছে। ময়দানের জেহাদে একটা প্রতিপক্ষ থাকে, সেই প্রতিপক্ষ হল অমুসলিম শত্রুরা। এমনিভাবে নফ্সের সাথে মোজাহাদার ক্ষেত্রেও প্রতিপক্ষ রয়েছে, সেই প্রতিপক্ষ হল নফ্স ও শয়তান। নফ্স এবং শয়তানও আমাদের শত্রু। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

إِنَّ الشَّيْطٰنَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ.

অর্থাৎ, অবশ্যই শয়তান মানুষের শত্রু। (ইউসুফ: ৫)

যদিও এ আয়াতে শয়তান আমাদের শত্রু- একথা বলা হয়েছে, নফ্সের কথা বলা হয়নি, তবে শয়তান আর নফ্সের মধ্যে খুব তেমন একটা পার্থক্য নেই। নফ্স হল গাড়ির মত, আর শয়তান হল সেই গাড়ির ড্রাইভার। যাহোক ময়দানের জেহাদ আর নফ্সের সাথে মোজাহাদা উভয় ক্ষেত্রেই প্রতিপক্ষ শত্রু থাকে। যুদ্ধের ময়দানে যেমন সদা সতর্ক থাকতে হয়, কখন কোন্ দিক থেকে যেন শত্রুর আক্রমণ হয়ে বসে, তদ্রূপ নফ্সের সাথে মোজাহাদা করতে যেয়েও সদা সতর্ক থাকতে হয়, কখন কোন্ লাইনে যেন নফ্স ও শয়তানের আক্রমণ হয়ে বসে। এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। একজন সীমান্ত প্রহরী সদা সর্বদা চৌকান্না থাকে, সতর্ক থাকে যে, কোন্ মুহূর্তে যেন শত্রুর আক্রমণ হয়ে যায়। যেকোন মুহূর্তে শত্রু সীমান্ত ভেদ করে চলে আসতে পারে। একজন মু'মিনকেও ওরকম সদা সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। মুমিনের আসল শত্রু হচ্ছে শয়তান-নফ্স, সে যেন কোন মুহূর্তে আক্রমণ করতে না পারে, তাই তাকে সদা সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। এর অর্থই হল শয়তানের সাথে যেকোনভাবে মোকাবিলা হতে পারে।

যেকোনো লাইনে শয়তান আক্রমণ করে বসতে পারে। ঈমান-আমল উভয় লাইনে আক্রমণ করতে পারে। ঈমানের লাইনে আক্রমণ তো সহজ। আমরা যে সমস্ত বিষয় না দেখে ঈমান রাখি, সেসব ব্যাপারে নফ্সের ভিতরে সহজে ওয়াছওয়াছা আসতে পারে যে, আসলে আদৌ এসব জিনিস আছে কি-না? আল্লাহর কথা শুনি বটে, কিন্তু আদৌ এরকম কেউ আছেন কি-না? জান্নাত জাহান্নামের কথা শুনি, কিন্তু আদৌ এরকম কিছু আছে কি-না। হুজুররা বলে, অনেক মানুষও বলে, কিন্তু আসলে এরকম কিছু আছে কি-না? এরকম ওয়াছওয়াছা হল ঈমানের ব্যাপারে নফ্স ও শয়তানের আক্রমণ। হাদীছে এসেছে এরকম আক্রমণ হলে সেই আক্রমণ ঠেকানোর জন্য চারটা আমল করতে হবে। এক নম্বর আমল হল আউযু বিল্লাহি মিনাশ্ শাইত্বনির রজীম পড়ে নিতে হবে। দুই নম্বর আমল হল– এই সন্দেহ আসার কারণে ঈমানের মধ্যে যে ত্রুটি এসে গেছে, সেই ত্রুটি সংশোধন করার জন্য অর্থাৎ ঈমানকে নবায়ন করার জন্য বলতে হবে اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ অর্থাৎ, আমি আল্লাহর উপর ঈমান আনলাম। আল্লাহ যা বলেছেন সব সত্য, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তিন নম্বর আমল হল, এরকম চিন্তা থেকে বিরত থাকতে হবে। এরকম চিন্তাকে আর অগ্রসর হতে দেয়া যাবে না। চার নম্বর আমল হল– এরকম চিন্তা থেকে মনকে সরানোর জন্য অন্য কোন চিন্তা শুরু করতে হবে। যাহোক ঈমানের লাইনে শয়তান আক্রমণ করতে

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com



পারে, সেই আক্রমণ প্রতিহত করার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। আমলের লাইনেও নফ্স শয়তান আক্রমণ করতে পারে। সে আক্রমণ ঠেকানোরও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আমল বা ইবাদত বন্দেগীর লাইনে যেন নফ্স ও শয়তান আক্রমণ করতে না পারে এ জন্য সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا.

অর্থাৎ, হে মু'মিনরা! তোমরা ইবাদতের উপরে অটল থাক। নিজেরাও অটল থাক, অন্যদেরকেও অটল থাকতে বল। সীমান্ত প্রহরীর মত আর সদা সতর্ক থাক। (আল ইমরান: ২০০)

এখানে সীমান্তপ্রহরীর মত সদা সতর্ক থাক কথাটা বলে বোঝানো হয়েছে ইবাদত-বন্দেগী এবং আমলের উপর থাকতে গেলেও শত্রুর আক্রমণ হতে পারে, অর্থাৎ নফ্স ও শয়তানের আক্রমণ হতে পারে, তাই সদা সতর্ক থাক। এ আয়াত থেকেও বুঝা যায় নফ্সের সাথে মোজাহাদা করা, আর ময়দানে জেহাদ করা উভয়টার মধ্যে খুব মিল রয়েছে।

যাহোক নফ্সের সাথে মোজাহাদা করা প্রসঙ্গে দীর্ঘ বক্তব্য রাখা হল। এই নফ্সের সাথে মোজাহাদা করা হল এসলাহে বাতেন বা আধ্যাতিক সংশোধনের একটা মৌলিক পদ্ধতি।

এসলাহে বাতেন বা আধ্যাতিক সংশোধনের জন্য এবং আধ্যাতিক উৎকর্ষ অর্জন করার জন্য আরেকটা মৌলিক বিষয় হল যিকির। যিকিরের বহু ফায়দা রয়েছে। তার মধ্যে একটা বড় ফায়দা হল যিকির করা দ্বারা কলবের ময়লা পরিষ্কার হয়ে যায়। নবী কারীম (সা.) ইরশাদ করেছেন,

إِنَّ لِكُلِّ شَيْئٍ صَقَالَةً وَصَقَالَةُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللّٰهِ. (كنز العمال برقم ١٧٧٧)

অর্থাৎ, সব জিনিসের রেত রয়েছে, কলবের রেত হল যিকির। যেমন লোহার উপর জং পড়লে, মরিচা পড়লে রেত দ্বারা ঘষে সেই জং দূর করা হয়। তদ্রূপ কলবের উপর জং বা মরিচা পড়লে যিকির দ্বারা এই জং পরিষ্কার করা যায়।

এখন বুঝতে হবে কলবের জং কী এবং সেই ঝং পরিষ্কার না করলে কী ক্ষতি হয়, আর পরিষ্কার করলে কী লাভ হয়। কলবের জং হল পাপের ময়লা। পাপ করলে কলবের উপর কালো দাগ পড়ে। হাদীছে এসেছে–

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيْئَةً نُكِتَتْ فِيْ قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ. الخ (رواه الترمذي برقم ٣٣٣٤ وقال: حسن صحيح)

অর্থাৎ, বান্দা যখন কোন পাপ করে, তখন তার কলবে অর্থাৎ তার অন্তরে একটা কালো দাগ পড়ে যায়। (তিরমিযী) এভাবে পাপ করতে করতে এবং তার কলবে কালো দাগ পড়তে পড়তে এক সময় তার অন্তর সম্পূর্ণ কালিমাযুক্ত হয়ে যায়।

কলবের উদাহরণ হল– একটা কাঁচের পাত্রের মত। কাঁচের উপর যদি ময়লা থাকে বা কালি দিয়ে লেপটানো থাকে, তাহলে ঐ কাঁচ ভেদ করে ভিতরে কোন আলো ঢুকতে পারে না। কাঁচের ভিতরে আলো ঢুকতে হলে কাঁচ পরিষ্কার থাকতে হবে। ময়লা-আবর্জনা থাকলে তার ভিতরে আলো ঢুকবে না। আলো বাঁধাগ্রস্ত হবে। কাঁচ যত পরিষ্কার ঝকঝকে থাকবে, তার মধ্যে আলো ততবেশি ঢুকবে। কলবের অবস্থাও তেমন। কলব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকলে তার মধ্যে আলো ঢুকবে, কলবে ময়লা থাকলে, কালি দিয়ে লেপা থাকলে তার মধ্যে আলো ঢুকতে পারবে না, অর্থাৎ কুরআন-হাদীছের নূর ঢুকতে পারবে না।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

নূর অর্থ হল আলো। কুরআন-হাদীছের কথা হল নূর। কুরআনে কারীমকে নূর বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

قَدْ جَائَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّ كِتٰبٌ مُّبِيْنٌ.

অর্থাৎ, তোমাদের কাছে এসেছে নূর অর্থাৎ, সুস্পষ্ট কিতাব। (মায়িদা : ১৫)

অতএব কোন কলবের আয়নার উপরে ময়লা থাকলে, অর্থাৎ গোনাহের ময়লা থাকলে ঐ কলবে কুরআন-হাদীছের নূর প্রবেশ করতে পারবে না। কলব থাকবে অন্ধকার। ঐ অন্ধকারে কুরআন-হাদীছের কোন কথার আসল স্বরূপ তার কাছে পরিষ্কার হবে না। এ জন্যেই দেখা যায় কুরআন-হাদীছের কথা শুনলে নেককার লোকদের ভাল বুঝে আসে, পাপীদের ভাল বুঝে আসে না। এমনও দেখা যায় কুরআন-হাদীছের বরাত দিয়েও যদি বুঝানো হয় যে, এটা বিদআত, এটা কুসংস্কার, এটা পাপ, এটা করা ঠিক নয়, কিন্তু তারপরেও আমাদের অনেকের মনের ভিতরে ঢুকে না, ভালভাবে বুঝে আসে না, অস্পষ্টতা কাটে না। এর কারণ একটাই। তাহল ঐ সব বিদআত কুসংস্কারের পাপের ময়লা আমাদের কলবের আয়নাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ফলে কুরআন-হাদীছের কথা আমাদের অন্তরে ঢুকছে না। কুরআন-হাদীছের নূর ভিতরে প্রবেশ করছে না। যার কারণে বার বার বলা হচ্ছে, কুরআন-হাদীছের বরাত দিয়ে ফেকাহ-র কিতাবের বরাত দিয়ে বলা হচ্ছে, কিন্তু দিলে ধরছে না। দিল বিকশিত হচ্ছে না। কলবে পাপের ময়লা না থাকলে, কলব আয়নার মত ঝকঝকে পরিষ্কার থাকলে ভাল করে বুঝতে পারতাম। দিলের মধ্যে কথা ভালভাবে ঢুকত। দ্বীনের সব কথা কলবের কাছে পরিষ্কার মনে হত। দ্বীন সম্বন্ধে সব অস্পষ্টতা কেটে যেত।

পাপের কারণে অন্তর কালিমাচ্ছন্ন থাকলে ঐ অন্তরে হেদায়েতের আলো ঢোকে না বলেই সেই অন্তর থেকে ভাল-মন্দের বিবেচনা বোধ লোপ পায়। ফলে ভালকে খারাপ বোধ হয়, আর খারাপটাকে ভাল বোধ হয়। এক হাদীছে রাসূল (সা.) ফিতনার যমানার কথা উল্লেখ করে বলেছেন, যখন নানারকম পাপের বিস্তার ঘটবে, রাসূল (সা.) বলেন,

حَتّٰى تَصِيْرَ عَلٰى قَلْبَيْنِ عَلٰى اَبْيَضَ مِثْلَ الصَّفَا ... وَالْاٰخَرُ اَسْوَدُ مُرْبَادًّا كَالْكُوْزِ مُجَخِّيًا لَايَعْرِفُ مَعْرُوْفًا وَلَايُنْكِرُ مُنْكَرًا اِلَّا مَا اُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ. (رواه مسلم في صحيحه برقم ٣٨٦)

অর্থাৎ তখন মানুষের কলব দুই ধরনের হয়ে যাবে। এক ধরনের কলব সেই সব পাপ থেকে দূরে থাকার কারণে কালিমাচ্ছন্ন হবে না; বরং ঝকঝকে মসৃণ পাথরের মত থাকবে। আর এক ধরনের কলব সেই সব পাপে জর্জরিত হওয়ার কারণে কালো হয়ে যাবে, সেই সব অন্তর ভালকে ভাল এবং মন্দকে মন্দ বলে বুঝতে সক্ষম হবে না। বরং শুধু খাহেশাতে নফসানীটাই বুঝবে। সেই অন্তরে কোন ভাল কথা ঢুকবে না। যেমন একটা মশক উপুড় করে দেয়া হলে তার ভিতর আর কিছু ঢুকতে পারে না।

অতএব এই দুই হাদীছ দ্বারা বোঝা গেল যিকির দ্বারা কলব পরিষ্কার হয়, আর কলব যত পরিষ্কার থাকবে দ্বীনের কথা তত ভাল লাগবে, দ্বীনের কথা তত ভাল বুঝে আসবে, ভাল-মন্দ বিবেচনা বোধ ঠিক থাকবে। যিকির করলে কলব পরিষ্কার থাকার কারণে দ্বীনের কথা কলবে ভাল আছর করবে। দ্বীনের কথায় কলবে আছর হলে ইবাদত-বন্দেগীর আগ্রহ পয়দা হবে, গোনাহ থেকে বিরত থাকার জযবা পয়দা হবে, আখেরাতের ফিকির এবং আল্লাহর আযাবের ভয় বৃদ্ধি পাবে। এভাবে যিকির দ্বারা কলবের বহু জঞ্জাল দূর হয়ে যাবে, কলবের অবস্থার বহু উন্নতি হবে, কলবের বহু এসলাহ হয়ে যাবে।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



যিকির অনেক ধরনের আছে। কুরআন তেলাওয়াতও যিকির। সুবহানাল্লাহ বলা, আল-হামদু লিল্লাহ বলা, আল্লাহু আকবার বলা, এগুলোও যিকির। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলাও যিকির। আল্লাহ, আল্লাহ বলাও যিকির।

যদি কেউ হক্কানী পীর-মুর্শিদের কাছে বায়আত হয়ে থাকেন, তাহলে পীর-মুর্শিদের সবক মোতাবেক যিকির করবেন। আর এরকম বায়আত না হয়ে থাকলে তিনি উপরোক্ত যিকিরগুলো করবেন। তবে বুযুর্গানে দ্বীন কুরআন-হাদীছের আলোকে বলেন, অন্তত সকাল সন্ধ্যায় এই তাসবীহগুলো পাঠ করা চাই–

১। سُبْحَانَ اللّٰهِ ১০০ বার
২। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ১০০ বার
৩। لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ১০০ বার
৪। اَللّٰهُ اَكْبَرُ ১০০ বার
৫। اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ ১০০ বার
৬। যেকোন দুরূদ ১০০ বার

পারলে একটা নির্দিষ্ট সময় কেবলামুখী হয়ে বসে হুজুরে কলব বা একাগ্রতার সাথে কিছুক্ষণ যিকির করা চাই। এতে কলবে ভাল আছর হয়। এছাড়াও হাটতে, বসতে, চলতে-ফিরতে সর্বক্ষণ যিকির করা উত্তম। হাদীছে সদা সর্বদা যিকির জারী রাখার জন্য উৎসাহ দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ. (رواه أحمد في مسنده برقم ١٧٧١٦ وقال شعيب الأرؤوط : إسناده صحيح)

অর্থাৎ, আল্লাহর যিকির দ্বারা যেন সর্বদা তোমার যবান ভিজা থাকে।

যিকির পরিমাণে খুব বেশি করতে বলা হয়েছে। কত বেশি তার কোন সীমা বলে দেয়া হয়নি। যে যত বেশি যিকির করতে পারবে তার তত ফায়দা হবে। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا.

অর্থাৎ, হে মু'মিনরা তোমরা বেশি বেশি আল্লাহর যিকির কর। (আহযাব: ৪১)

সর্বদা এত বেশি যিকির করতে বলা হয়েছে যে, মানুষ মনে করবে এ লোকটা পাগল হয়ে গেছে, যিকির ছাড়া দুনিয়ার আর কিছু বোঝেনা। হাদীছে ইরশাদ হয়েছে,

اَكْثِرُوْا ذِكْرَ اللّٰهِ حَتّٰى يَقُوْلُوْا مَجْنُوْنٌ. (رواه أحمد في مسنده برقم ١١٦٧١ وإسناده ضعيف)

অর্থাৎ, আল্লাহর যিকিরে এত বেশি মগ্ন থাকবে যে, লোকেরা বলবে পাগল।

কেউ কেউ মনে করেন চলতে ফিরতে যিকির করলে হুজুরে কল্‌ব বা একাগ্রতা থাকে না। এরকম যিকির দ্বারা কোন ফায়দা নেই। এ জন্য এক ভাই কবিতাও রচনা করেছেন

درزباں تسبیح ودردل گاؤخر + ایں چنیں تسبیح کے دارواثر

অর্থাৎ, মনের মধ্যে গরু, গাধা ইত্যাদির চিন্তা, অর্থাৎ মনের মধ্যে টাকা-পয়সা, ধন-দৌলত ইত্যাদি দুনিয়ার, চিন্তা রেখে মুখে তাসবীহ আওড়াতে থাকলে কী ফায়দা? এতে কোন ফায়দা নেই।

কিন্তু এই কথা পুরোপুরি ঠিক নয়। নিঃসন্দেহে হুজুরে কল্‌ব বা একাগ্রতার সাথে যিকির করলে ফায়দা বেশি, তাতে কলবে ভাল আছর হয়। তবে পুরোপুরি হুজুরে কল্‌ব ছাড়া যিকির করলেও তা একেবারে ফায়দা থেকে খালি নয়। যিকির কোন অবস্থাতেই ফায়দা থেকে খালি নয়। এজন্যেই হযরত থানভী (রহ.) উপরোক্ত কবিতাটিকে একটু পরিবর্তন করে এভাবে বলতেন,

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

درزباں تسبیح ودردل گاؤخر + ایں چنیں تسبیح ہم دارداثر

অর্থাৎ, মনের মধ্যে গরু, গাধা ইত্যাদির চিন্তা, অর্থাৎ টাকা-পয়সা, ধন-দৌলত ইত্যাদি দুনিয়ার চিন্তা রেখে মুখে তাসবীহ আওড়াতে থাকলেও ফায়দা রয়েছে। এটাও ফায়দা থেকে খালি নয়।

উযু সহকারে যিকির করতে পারলে উত্তম। তবে উযু ছাড়াও যিকির করা জায়েয। এমনিভাবে উযু ছাড়া দুরূদ শরীফ পড়া যায়। হাটতে চলতেও দুরূদ শরীফ পাঠ করা যায়। আমরা অনেকে ভুল ধারণার শিকার যে, হাটতে চলতে দুরূদ শরীফ পড়া যায় না। বিনা উযুতেও দুরূদ শরীফ পড়া যায় না। এক ভাই একবার আমাকে বললেন হুজুর! শুনেছি উযূ ছাড়া নাকি বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানীর নাম নেয়া যায় না, তাহলে নাকি একটা পশম কেটে পড়ে যায়! আমি বললাম উযূ ছাড়া আব্দুল কাদের জিলানী-র নাম নিলে যদি পশম কেটে পড়ে যাবে, তাহলে উযূ ছাড়া আল্লাহর নাম নিলে কল্লা কেটে পড়ে যাওয়ার কথা!

যাহোক না পারলে বিনা উযূতেও যিকির করা যাবে, তবে উযূ সহকারে যিকির করাই উত্তম।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে আমল করার তাওফীক দান করুন, আমাদের কলবের এসলাহ করার তাওফীক দান করুন, আমাদেরকে সহীহ সমঝ নসীব করুন। আমীন!

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



বয়ান নং ৩৬-এর খুতবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ، اَلْمُطَّلِعِ عَلٰى سَرَائِرِ الْقُلُوْبِ، اَحْمَدُهٗ وَاَشْكُرُهٗ وَاِلَيْهِ اَتُوْبُ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ شَهَادَةً تُكَفِّرُ كُلَّ الذُّنُوْبِ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهُ الْمُتَّصِفُ بِصَفَاءِ الْقُلُوْبِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَعَلٰى اَصْحَابِهٖ مَا دَامَ الطُّلُوْعُ وَالْغُرُوْبُ.

اَمَّا بَعْدُ :

اَيُّهَا النَّاسُ! اِنَّ فِى النَّفْسِ اَنْوَاعًا مِّنَ الرَّذَائِلِ، كَمَا اَنَّ فِيْهَا اَنْوَاعًا مِّنَ الْخَصَآئِلِ. وَمِنَ الرَّذَائِلِ الْحَسَدُ وَالْحِقْدُ، وَالْكِبْرُ وَالْعُجْبُ، وَالْغِيْبَةُ وَالنَّمِيْمَةُ، وَالْحِرْصُ وَطُوْلُ الْاَمَلِ، اِلٰى غَيْرِ ذَالِكَ. وَمِنَ الْخَصَائِلِ الْاِخْلَاصِ وَالتَّقْوٰى وَالتَّوَكُّلُ وَالتَّفْوِيْضُ وَالرِّضَاءُ بِالْقَضَاءِ وَالصَّبْرُ وَغَيْرُ ذَالِكَ. وَاعْلَمُوْا اَنَّ لِاِزَالَةِ الرَّذَائِلِ طُرُقًا خَآصَّةً، كَمَا اَنَّ لِحُصُوْلِ الْخَصَائِلِ طُرُقًا خَاصَّةً، وَمِنْ مُّهِمَّاتِ الطُّرُقِ الْخَاصَّةِ لِاِزَالَةِ الرَّذَائِلِ مُخَالَفَةُ النَّفْسِ وَالشَّيْطَانِ وَ ذِكْرُ اللّٰهِ. وَاعْلَمُوْا اَنَّ الشَّيْطَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ. قَالَ تَعَالٰى : اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يَا بَنِىْ اٰدَمَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ، اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ. فَالتَّنَبُّهُ كُلَّ التَّنَبُّهِ بِالشَّيْطَانِ، وَهُوَ يَاْمُرُ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، وَيَاْمُرُ بِالسُّوْءِ وَالْفَحْشَآءِ بِمَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، فَتَيَقَّظُوْا لَهٗ فِىْ كُلِّ حِيْنٍ مِّنَ الْاَحْيَانِ، قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا، وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

اَيُّهَا الْعِبَادُ! لَا يُفْلِحُ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مَا لَمْ يُجَاهِدْ نَفْسَهٗ وَيُخَالِفْ بِمَا يَهْوِيْهِ، قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَاجِزُ مَنْ اَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنّٰى عَلَى اللّٰهِ.

اَيُّهَا الْعِبَادُ! وَاِنَّ الذُّنُوْبَ تُدَنِّسُ الْقُلُوْبَ وَتُسَوِّدُهَا، وَ ذِكْرُ اللّٰهِ تَعَالٰى يُصْلِحُهَا وَيُنَقِّيْهَا مِنْ دَنَسِهَا وَسَوَادِهَا، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِكُلِّ شَيْءٍ صَقَالٌ وَصَقَالُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللّٰهِ. فَاذْكُرُوا اللّٰهَ تَعَالٰى ذِكْرًا جَزِيْلًا، قَالَ تَعَالٰى : يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا وَسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا. وَفِى الْحَدِيْثِ – لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ. وَفِىْ حَدِيْثٍ اٰخَرَ– اَكْثِرُوْا ذِكْرَ اللّٰهِ حَتّٰى يَقُوْلُوْا مَجْنُوْنٌ. وَمِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى تِلَاوَةُ الْقُرْاٰنِ، وَمِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى قَوْلُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ. وَمِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى ذِكْرُ اَسْمَاءِ اللّٰهِ الْحُسْنٰى. وَمِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى سُبْحَانَ اللّٰهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ. اِلٰى غَيْرِ ذَالِكَ مِنَ الْاَذْكَارِ.

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ : اُتْلُ مَا اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ، اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ، وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ.

بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ، وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. اَقُوْلُ قَوْلِىْ هٰذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ لِىْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَاسْتَغْفِرُوْهُ، اِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



বয়ান নং -৩৭

## তাকাব্বুর বা অহংকার প্রসঙ্গ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

গত কয়েক জুমুআয় অন্তরের রোগসমূহ দূর করার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছিল। মৌলিক ভাবে এসলাহে নফ্সের পদ্ধতি কী, সে সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। অন্তরের রোগগুলোর মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক রোগ হল তাকাব্বুর বা অহংকার। তাকাব্বুর বা অহংকারকে বলা হয় 'উম্মুল আমরায' অর্থাৎ, সমস্ত রোগের মা। মা থেকে যেমন সন্তানাদির জন্ম হয়, সেই সন্তানাদির আরও সন্তানাদি হয়। এভাবে এক মা থেকে বহু মানুষের সৃষ্টি হয়, একজন মা থেকে বহু মানুষের বিস্তার ঘটে। তদ্রূপ এক অহংকারের কারণে মনের বহু রোগ সৃষ্টি হয়। মা যেমন বহু মানুষের মূল, অহংকারও তদ্রূপ বহু রোগের মূল।

অহংকার থেকে মানুষের ভিতর অনেক রোগ জন্ম নেয়। যেমন মনের একটা রোগ হল হিংসা। এই হিংসা রোগ অহংকার থেকে জন্ম নেয়। হিংসা হল একজনের ভাল কিছু দেখে তা ধ্বংস হওয়ার কামনা করা। কেউ যখন নিজেকে বড় মনে করে, অর্থাৎ নিজের মধ্যে বড়ায়ী বা অহংকার বোধ থাকে, তখন সে অন্যের ভাল কিছু দেখলে মনে করে যে, ওতো আমার চেয়ে বড় হয়ে গেল, আমি ছোট হয়ে গেলাম। তখনই তার মনের মধ্যে অন্যের সেই ভালটা ধ্বংস হওয়ার কামনা জাগে। এটাকেই বলা হয় হাছাদ বা হিংসা। যেমন একজনের টাকা-পয়সা দেখে, মান-সম্মান, ইজ্জত-আব্রু দেখে, পদমর্যাদা দেখে ভিতরে হিংসা আসে এবং মনে মনে কামনা জাগে যে, ওর ওটা যদি ধ্বংস হয়ে যেত। দেখা গেল এই হিংসারোগ অহংকার থেকে সৃষ্টি হচ্ছে। আমরা মানুষের গীবত-শেকায়েত করি, চিন্তা করলে দেখা যায় এখানেও আমাদের মনের ভিতরে অহংকার কাজ করতে থাকে। আরেকজনের গীবত বা দোষচর্চা করা হয় কেন? এজন্যই করা হয় যে, তার দোষ বললে সে একটু ছোট হবে এবং আমি যখন অন্যের এই দোষ বলছি এর দ্বারা বোঝাবে যে, আমার ভিতরে এই দোষ নেই, আমি মাশাআল্লাহ খুব ভাল। আমার ভিতরে সেই দোষ থাকলে কি আর আমি সেটা দোষ হিসেবে উল্লেখ করতাম? দেখা গেল গীবত করার সময় মনের ভিতরে নিজের বড়ায়ী বা অহংকার কাজ করতে থাকে। যখন মানুষ গীবত করে, তখন তার ভিতরে অহংকার কাজ করতে থাকে।

অহংকার ছাড়াও আরও বিভিন্ন কারণে মানুষ গীবত-শেকায়েত করে থাকে। তবে অহংকার তার একটা বড় কারণ। একজন মানুষ আরেকজন মানুষের প্রতি যুলুম করে, এর পেছনেও অহংকার কাজ করে থাকে। যার প্রতি আমি যুলুম করছি, তাকে আমি ছোট মনে করছি এবং নিজেকে বড় মনে করছি। এই মনোভাব থেকেই যুলুম করা আসছে। আমি নিজেকে বড় মনে করছি বলেই ভাবছি ও আমার সাথে এরকম ব্যবহার করল কেন, আমি ওকে দেখিয়ে ছাড়ব! এই ভেবে তার প্রতি যুলুম করছি। দেখা গেল

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

যুলুম করার মনোভাবও অহংকার থেকে সৃষ্টি হয়। প্রতিশোধ নেয়ার জযবাও অহংকার থেকে সৃষ্টি হয়। এভাবে বড়ায়ী বা অহংকার রোগ থেকে বহু রোগ সৃষ্টি হয়, বহু পাপের জন্ম হয়। এমনকি গত এক জুমুআয় বলা হয়েছিল এই অহংকারের কারণে কুফ্‌রী পর্যন্ত এসে যেতে পারে।

আমরা পূর্বেও আলোচনা করেছি এই অহংকারের কারণেই শয়তান কাফের হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)কে তৈরি করে যখন ইবলীসকে হুকুম দিয়েছিলেন আদমকে সাজদা কর, তখন সে সাজদা করেনি। তার ভিতরে অহংকার এসে গিয়েছিল যে, আমি আগুনের তৈরি আর আদম মাটির তৈরি। আমি আদমের সামনে নত হতে পারি না। এই অহংকারে সে আল্লাহ্‌র হুকুমকে অমান্য করল এবং কাফের হয়ে গেল। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ. (বাকারা: ৩৪)

অর্থাৎ, সে অস্বীকার করল এবং অহংকার করল। আর সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

এ আয়াতে বোঝানো হয়েছে অহংকারই ছিল তার অস্বীকার করা এবং কাফের হওয়ার কারণ। এই তাকাব্বুরই তাকে কাফের বানাল, এই তাকাব্বুরই তাকে উচ্চ মর্যাদা থেকে নীচে নামিয়ে দিল, তাকে লাঞ্ছিত, অভিশপ্ত বানালো। শেখ সাদী বলেছেন,

تکبر عزازیل را خوار کرد + بزندان لعنت گرفتار کرد

অর্থাৎ, অহংকারই আযাযীলকে অর্থাৎ ইবলীসকে লাঞ্ছিত করল, অহংকারই তাকে অভিশাপের শৃংখলে আবদ্ধ করল।

মানুষের মধ্যে যখন অহংকার আসে, তখন সে অনেক সময় সত্যকে স্বীকার করতে চায় না। আত্মগরিমার কারণে সে সত্যকে অস্বীকার করে বসে। এমনকি খোদাকে পর্যন্ত অস্বীকার করে বসে। এমনকি নিজে খোদায়ী দাবী করে বসে। ফিরআউন আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করে বসেছিল। সে নিজেকে খোদা বলে দাবী করে বসেছিল। ক্ষমতা এবং দাপটের অহংকারেই সে নিজেকে খোদা বলে বসেছিল। কারূন ধন-সম্পদের অহংকারে খোদার অবাধ্য হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা তাকে ধন-সম্পদ দিয়েছিলেন, সে ধন-সম্পদকে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ মনে করেনি বরং এর কারণে নিজেকে বড় মনে করে বসেছে এবং এর অহংকারে খোদাকে অস্বীকার করেছে, আল্লাহ্‌র অবাধ্য হয়েছে। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

اِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوْسٰى فَبَغٰى عَلَيْهِمْ وَ اٰتَيْنٰهُ مِنَ الْكُنُوْزِ مَآ اِنَّ مَفَاتِحَهٗ لَتَنُوْٓاُ بِالْعُصْبَةِ اُولِى الْقُوَّةِ.

অর্থাৎ, কারূন মূসা (আ.)-এর বংশধর ছিল। সে আল্লাহ্‌র অবাধ্য হয়ে গিয়েছিল, আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করে বসেছিল। সম্পদের বড়ায়ীতে সম্পদের দম্ভে সে আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করে বসেছিল। আল্লাহ বলেন তাকে এত সম্পদ দেয়া হয়েছিল যে, সম্পদের ভাণ্ডারগুলোর চাবি উঁচু করতে বেশ কয়েকজন শক্তিশালী লোকের প্রয়োজন হত। (কাসাস: ৭৬)

আমরা ধন-সম্পদ, জ্ঞান-বুদ্ধি, রূপ-সৌন্দর্য, মান-মর্যাদা যা কিছু নিয়ে অহংকার করে থাকি, যদি আমরা চিন্তা করতাম যে, এগুলো আল্লাহ্‌র দান, তাহলে আমরা অহংকার করতে পারতাম না। বরং যত ধন-সম্পদ ইত্যাদি বাড়ত, তত মনে করতাম যে, আমার প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ কথা মনে করে ততই আল্লাহ্‌র সামনে বেশি নত হতাম। আমার যত ধন-সম্পদ থাকুক, যত

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



জ্ঞান-বুদ্ধি থাকুক, যত মান-সম্মান থাকুক, যত প্রভাব-প্রতিপত্তি থাকুক, যা কিছুই থাকুক, এসবই তো আল্লাহ্‌র দেয়া। আমার নিজস্ব বাহু বলে কিছু অর্জিত হয়নি। তাহলে এগুলো নিয়ে আমার অহংকার করার কী আছে?

আমরা সম্পদ নিয়ে অহংকার করি। কিন্তু যদি আমরা মনে করতাম যে, আমরা এই সম্পদের আসল মালিক নই, বরং আল্লাহ এগুলোর আসল মালিক। তিনি এগুলো আমাদের কাছে রেখেছেন, তাঁর হুকুম অনুযায়ী ব্যয় করার জন্য। এরূপ মনে করলে সম্পদ নিয়ে আমাদের অহংকার বোধ হত না। যেমন কোন মিল ফ্যাক্টরীর মালিক তার ক্যাশিয়ারের কাছে লক্ষ-লক্ষ টাকা রাখল এবং বলল এ টাকাগুলো কর্মকর্তা কর্মচারীদের মধ্যে বিতরণ করে দাও। তাদের বেতন-ভাতা, অফিস খরচ ইত্যাদিতে ব্যয় কর। এই টাকার জন্য ক্যাশিয়ারের কোন অহংকার আসে না যে, আমার কাছে লক্ষ-লক্ষ টাকা আছে। অহংকার না আসার কারণ হল তার বিশ্বাস আছে যে, এই টাকার আসল মালিক সে নয়। আসল মালিক হল ফ্যাক্টরীর মালিক। তিনি তার কাছে এই টাকা দিয়েছেন তার হুকুম মত ব্যয় করার জন্য। যেহেতু সে আসল মালিক নয়, কাজেই সেই টাকা নিয়ে তার অহংকার করার কিছু নেই। তদ্রূপ একজন মু'মিন, যে আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করে, সে এটাও বিশ্বাস করে যে, টাকা-পয়সা ধন-দৌলত আল্লাহ্‌র দেয়া। আল্লাহ হলেন আসল মালিক। তিনি দিয়েছেন তাঁর হুকুম মত ব্যয় করার জন্য। কাজেই এটা নিয়ে অহংকার করার কিছু নেই।

এমনিভাবে আল্লাহ পাক যত গুণাবলী দিয়েছেন, জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়েছেন, পদমর্যাদা দিয়েছেন, মান-সম্মান দিয়েছেন, এই সবকিছু আল্লাহ্‌র দান, তাঁর অনুগ্রহ। মানুষ নিজের ক্ষমতা বলে এগুলো অর্জন করতে পারে না। আল্লাহ্‌র দেয়া জিনিস আল্লাহ পাক যেকোন সময় ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। রাজাকে পথের ফকীর বানাতে পারেন, সম্মানী ব্যক্তিকে হেয় বানাতে পারেন। সবকিছু আল্লাহ্‌র হাতে। কাজেই কোনকিছু নিয়ে অহংকার করা চলে না। যে ব্যক্তি আল্লাহকে বিশ্বাস করে, সে অহংকার করতে পারে না। অহংকার করার অর্থই হল– আল্লাহ্‌র অনুগ্রহকে এক রকম অস্বীকার করা। আর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহকে অস্বীকার করা অনেকটা আল্লাহকে অস্বীকার করা। অতএব আল্লাহতে বিশ্বাসী মানুষ অহংকার করতে পারে না। আল্লাহকে বিশ্বাস করলে সবকিছু আল্লাহ্‌র দেয়া একথা বিশ্বাস করতে হবে। কারও ভিতরে এই বিশ্বাস থাকলে তার ভিতরে অহংকার আসতে পারবে না। যে আল্লাহকে স্বীকার করবে, সে নিজেকে সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌র মধ্যে বিলিন করে দিবে। তার ভিতর আমিত্ব বলে কিছু থাকবে না। আমার গুণ, আমার সম্পদ, আমার পদ, আমার মর্যাদা, এরূপ কোন আমিত্ব বলতে তার ভিতরে কিছু থাকবে না। মু'মিনের কছে "আমি" বলতে কিছু নেই। ইসলামের কালিমার ভিতরেই এরূপ আমিত্ব বর্জনের শিক্ষা রয়েছে। কালিমার মধ্যে বলা হয়েছে,

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ.

অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বূদ নেই।

মা'বুদ অর্থ যার ইবাদত করা যেতে পারে, যার গোলামী ও দাসত্ব করা যেতে পারে। তিনি সবকিছু করেন। কাজেই তাঁকে ছাড়া আর কারও ইবাদত বা গোলামী করা যায় না। অতএব কোন মা'বুদ নেই, একথা বললেই বুঝা যায় আর কেউ কিছু করতে পারে না। একমাত্র তিনিই সবকিছু করতে পারেন। সবকিছু তিনিই করে থাকেন। অতএব সবকিছু তাঁরই। আমার বলতে কিছুই নেই। আমিত্ব বলতে

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

কিছুই নেই। এভাবে কালিমার ভিতরে আমিত্ব বিসর্জন দেয়ার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। আমিত্ববোধ আমাদেরকে ধ্বংস করে দেয়।

ইবলীস কেন ধ্বংস হল? সে জিন জাতির লোক হওয়া সত্ত্বেও তার ইবাদত-বন্দেগীর কারণে আল্লাহ পাক তাকে ফেরেশতাদের মধ্যে স্থান দিয়েছিলেন। এত মর্যাদাবান হওয়া সত্ত্বেও সে কীসের কারণে ধ্বংস হয়েছিল? সে বলেছিল আমি আদমের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, আমি কী করে ওকে সাজদা করতে পারি? বুযুর্গানে দ্বীন বলেন, এই "আমি" কথাটা অর্থাৎ, এই আমিত্বই ওকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। আমিত্ব মানুষকে ধ্বংস করে দেয়। মু'মিনের কোন আমিত্ব থাকবে না, সবক্ষেত্রে সে আল্লাহ্‌র সামনে নতী স্বীকার করবে। মু'মিন মনে করবে আমার কিছুই নয়, আমার সবকিছু আল্লাহ্‌র দেয়া, আমার কৃতিত্ব কিছুই নেই। এভাবে নিজেকে যখন আল্লাহর মধ্যে বিলীন করে দিবে, তখন তার ভিতরে পূর্ণ তাওহীদ এসে যাবে। পূর্ণ তাওহীদ আসবে তখন, যখন মানুষ নিজের আমিত্বকে সম্পূর্ণ মিটিয়ে দিতে পারবে। এর বিপরীত আমিত্বের কারণে ধীরে ধীরে এক পর্যায়ে কুফ্‌রী এসে যেতে পারবে। যেমন এসেছিল শয়তানের।

অতএব মু'মিন অহংকার করতে পারে না। মু'মিন কোন বড়ায়ী দেখাতে পারে না। মু'মিন থাকবে গোলামের মত বিনয়ী। সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল, যাকে সৃষ্টি করা না হলে জান্নাত-জাহান্নাম কিছুই সৃষ্টি করা হত না, আসমান-যমীন কিছুই সৃষ্টি করা হত না। সেই রাসূলের ভিতরে এতটা বিনয় ছিল যে, তিনি সব ক্ষেত্রে গোলামের মত হয়ে থাকতে চাইতেন। গোলামের মত চলতে চাইতেন, গোলামের মত বসতে চাইতেন, গোলামের মত বসে খাবার খেতে চাইতেন। এক হাদীছে এসেছে রাসূল (সা.) বলেন,

اِنِّيْ اٰكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبِيْدُ. (مشكاة عن شرح السنة)

অর্থাৎ, আমি গোলামের মত বসে খাই।

যখন মানুষের মধ্যে বিনয় আসে, বিনয় মানুষকে এরকম গোলাম বানিয়ে ফেলে, আল্লাহর গোলাম বানিয়ে ফেলে। আর বিনয় না থাকলে মানুষের মধ্যে অহংকার আসে, সেই অহংকারে মানুষ শেষ পর্যন্ত নিজেকে খোদা বলেও দাবী করে বসে।

মানুষ কোনোকিছু নিয়ে অহংকার করতে পারে না। কারণ তার কোন কৃতিত্ব তার নিজের নয়; বরং সব কিছু আল্লাহর দেয়া। একমাত্র আল্লাহ তা'আলা এমন, যার সমস্ত কৃতিত্ব তাঁর নিজের। কাজেই অহংকার করা একমাত্র আল্লাহকেই মানায়, অন্য কাউকে নয়। তাই হাদীছে কুদসীতে আল্লাহ পাক বলেন,

اَلْكِبْرِيَاءُ رِدَائِيْ وَالْعَظْمَةُ اِزَارِيْ فَمَنْ نَازَعَنِيْ وَاحِدًا مِّنْهُمَا قَذَفْتُهُ فِى النَّارِ. (سنن ابي داؤد برقم ٤٠٩٢ والحديث صحيح)

অর্থাৎ, অহংকার আমার ভূষণ, অর্থাৎ, অহংকার একমাত্র আমাকেই মানায়, আর কাউকে নয়। কারণ, মানুষ কী নিয়ে অহংকার করবে, তার নিজস্ব কৃতিত্ব বলে কিছু নেই। সবই তো আমার দেয়া। কাজেই অহংকার করলে একমাত্র আমিই করতে পারি, অহংকার একমাত্র আমাকেই মানায়, আর কাউকে নয়। অহংকার হল আমার ভূষণ। আমার এই ভূষণকে নিয়ে যারা টানা-টানি করবে, আমি তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। হাদীছে এসেছে কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক সমস্ত আসমান যমীনকে তাঁর কুদরতী হাতে গুটিয়ে নিবেন। কীভাবে গুটিয়ে নিবেন তা আল্লাহ পাক-ই জানেন।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



আমরা আল্লাহ পাকের সত্তা কত বড় তাও কল্পনা করতে পারি না, সেই সত্তার হাত কত বড় তা-ও কল্পনা করতে পারি না। সেই হাতে আসমান-যমীনকে কীভাবে গুটিয়ে নিবেন তাও বুঝতে পারি না। যা হোক আসমান-যমীনকে তার হাতে গুটিয়ে নিয়ে বলবেন,

اَنَا الْمَلِكُ اَيْنَ الْجَبَّارُوْنَ اَيْنَ الْمُتَكَبِّرُوْنَ؟ (صحيح مسلم برقم ٧٢٢٨)

অর্থাৎ, ঐ অহংকারকারীরা কোথায় যারা অনেক কিছু নিয়ে অহংকার দেখাত? দাম্ভিক লোকেরা কোথায় যারা অনেক কিছু নিয়ে দম্ভ দেখাতো? তারা আজ কোথায়? আল্লাহ আরও বলবেন,

اَنَا الْمَلِكُ اَيْنَ مُلُوْكُ الْاَرْضِ؟ (صحيح البخاري ٤٨١٢ وصحيح مسلم ٧٢٢٧)

অর্থাৎ, আজ আমিই সম্রাট, কোথায় দুনিয়ার সম্রাটরা? সাম্রাজ্যের অধিপতি হয়ে যারা অহংকার দেখাতো, তারা আজ কোথায়?

কিয়ামতের দিন এই ঘোষণার সময় বুঝে আসবে দুনিয়ার বিভিন্ন জিনিস নিয়ে অহংকার কত বড় ঠুনকো বিষয় ছিল!

অহংকারের কারণে আল্লাহ তা'আলা এত গোস্বা হন যে, হাদীছে এসেছে,

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ فِيْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبْرٍ. (صحيح مسلم ٢٧٥)

অর্থাৎ, যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও অহংকার আছে, সে জান্নাতে যেতে পারবে না। যদিও অহংকারের পাপ ক্ষমা হয়ে গেলে অহংকারীও জান্নাতে যেতে পারবে। কিন্তু অহংকার করলে বা অন্য কোন পাপ করলে আল্লাহ পাক যে চরম গোস্বা হন, সেই গোস্বার চরমতার দিকে তাকালে ক্ষমা পাওয়ার আশা খুবই ক্ষীণ হয়ে পড়ে। রাসূল (সা.) আল্লাহর গোস্বার চরমতার দিকে তাকিয়েই তাই ঐ কথাটি বলেছিলেন।

অহংকারের মধ্যে নিজেকে বড় মনে করা হয় এবং অন্যকে ছোট মনে করা হয়। এতক্ষণ বলা হল– কোন কিছুর জন্য নিজেকে বড় মনে করার কোন অবকাশ নেই। তদ্রূপ কাউকে ছোট অর্থাৎ তুচ্ছ মনে করারও অবকাশ নেই। এমনকি কোন কাফেরকেও তুচ্ছ মনে করতে নেই। তবে হ্যাঁ এতটুকু যে, আল্লাহ আমাকে মু'মিন বানিয়েছেন, মু'মিন হিসেবে আমি কাফেরের চেয়ে উত্তম। সাথে-সাথে একথাও মনে রাখতে হবে এই কাফেরও ঈমানদার হয়ে আমার চেয়ে উত্তম হয়ে যেতে পারে। এ হিসেবে কোন কাফেরকেও তুচ্ছ মনে করা যাবে না। এমনকি মানুষ তো অনেক উর্ধ্বের, আল্লাহর মাখলূক হিসেবে কোন প্রাণীকেও তুচ্ছ জানতে নেই।

বুযুর্গানে দ্বীন মানুষ তো দূরের কথা কোন প্রাণীকেও তুচ্ছ জানতেন না। আমরা হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (রহ.)-এর কথা শুনেছি। ইরানের একটা প্রসিদ্ধ এলাকা হল বোস্তাম। বায়েজিদ (রহ.) এই এলাকার অধিবাসী ছিলেন বলে তাকে বোস্তামী বলা হয়। এই বায়েজিদ বোস্তামী অনেক উঁচু স্তরের বুযুর্গ ছিলেন। তাঁর ইন্তেকালের পর তার এক মুরীদ তাকে স্বপ্ন দেখে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'হুজুর! আল্লাহ তা'আলা আপনার সাথে কি মোয়ামালা করলেন' । হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (রহ.) বললেন, আল্লাহ তা'আলা আমার কাছে জিজ্ঞাসা করেছেন যে, বায়েজিদ আমার জন্য কী কী করে এসেছ? আমি চিন্তা করছিলাম কী বলব, কিন্তু কোন আমলের কথাই উল্লেখ করতে পারছিলাম না। ভাবছিলাম কোন্ আমলের কথা উল্লেখ করব, যদি ভিতরে এখলাসের ত্রুটি থেকে থাকে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা সেটা নাকচ করে দিবেন। তাই কোনোটাই বলতে পারছিলাম না, চুপ করে ছিলাম। তখন আল্লাহ পাক

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বললেন, তোমার একটা আমল আমার খুব পছন্দ হয়েছে। একদিন শীতের রাতে বাইরে একটা কুকুরের বাচ্চা শীতের কারণে কাঁতরাচ্ছিল। তোমার দয়া হয়েছিল। তুমি মনে করেছিলে এও তো আল্লাহর মাখলূক, আমিও আল্লাহর মাখলূক। আমি আরামে শুয়ে আছি, আর আল্লাহর এই মাখলূকটা কষ্ট পাচ্ছে। এই ভেবে তুমি কুকুরের বাচ্চাটাকে তুলে এনে; তোমার লেপের তলে রেখেছিলে। তুমি তাকে তুচ্ছ জাননি। তোমার এই আমলটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে। এটাই হল তোমার সবচেয়ে বড় আমল।

দেখা গেল মানুষের জীবনের কোন্ আমলটা আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয় হবে, তা বুঝা কঠিন। একটা ক্ষুদ্র আমলও আল্লাহর কাছে অনেক প্রিয় হয়ে যেতে পারে। তাই কোন আমলকে তুচ্ছ মনে করতে নেই। হতে পারে ছোট একটা আমলও আমার নাজাতের ওছীলা হয়ে দাঁড়াবে। এমনিভাবে কোন ছোট পাপকেও তুচ্ছ জানতে নেই। কারণ একটা ছোট পাপের কারণেও আল্লাহ তা'আলা কঠিনভাবে পাকড়াও করতে পারেন। হাদীছে এসেছে: এক বেশ্যা মহিলা একটা কুকুরকে পানি পান করানোর কারণে তার ওছীলায় আল্লাহ তা'আলা তাকে নাজাত দিয়ে দেন এবং এক নেককার মহিলা এক বিড়ালকে বেধে রাখায় বিড়ালটা না খেয়ে মারা যায়। এর কারণে আল্লাহ তা'আলা ঐ মহিলাকে শাস্তি দেন।

যাহোক আলোচনা করা হচ্ছিল কাউকে তুচ্ছ জানারও অবকাশ নেই, কারও উপর বড়ায়ী দেখানোরও কোন অবকাশ নেই। এক বুযুর্গ বলেছেন মন যদি অহংকার করতে চায়, তাহলে মনকে বোঝাতে হবে। কবির ভাষায়:

اَوَّلُكَ نُطْفَةٌ قَذِرَةٌ + وَاٰخِرُكَ جِيْفَةٌ مُّدِرَةٌ + وَاَنْتَ فِيْمَا بَيْنَهُمَا تَحْمِلُ عَذِرَةً.

অর্থাৎ, হে মন! তুমি কী নিয়ে বড়ায়ী করতে চাও? তোমার মধ্যে বড়ায়ী করার মত কী আছে? শুরুতে তুমি ছিলে এক ফোটা নাপাক দুর্গন্ধযুক্ত পানি, তোমার শেষ ফল হল মরে পচে দুর্গন্ধময় লাশ হয়ে যাবে, আর মাঝখানে নাপাক দুর্গন্ধময় কিছু ময়লা পেটের মধ্যে বহন করে চলছ। কাজেই বড়ায়ী বোধ ছাড়, অহংকার বোধ ছাড়, বিনয়ী হতে শিখ, তোমার মানসিকতা দোরস্ত কর।

আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে অহংকারমুক্ত জীবন গড়ার তাওফীক দান করুন। আমীন!

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



বয়ান নং ৩৭-এর খুতবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ، اَلْمُطَّلِعِ عَلٰى سَرَائِرِ الْقُلُوْبِ، اَحْمَدُهٗ وَاَشْكُرُهٗ وَاِلَيْهِ اَتُوْبُ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ شَهَادَةً تُكَفِّرُ السَّيِّئَاتِ وَ الذُّنُوْبَ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهُ الْمُتَّصِفُ بِصَفَاءِ الْقُلُوْبِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ مَا دَامَ الطُّلُوْعُ وَالْغُرُوْبُ.

اَمَّا بَعْدُ :

اَيُّهَا النَّاسُ! اِنَّ الْكِبْرَ وَالْعُجْبَ دَاءَانِ مُهْلِكَانِ، وَخُلُقَانِ مَذْمُوْمَانِ، وَقَدْ جَاءَ الْوَعِيْدُ عَلَيْهِمَا فِى السُّنَّةِ وَالْقُرْاٰنِ، فَاتْرُكُوا الْكِبْرَ وَالْعُجْبَ، وَعِيْشُوْا فِى النَّاسِ بِالْمَوَدَّةِ وَالْحُبِّ. وَاعْلَمُوْا اَنَّ التَّكَبُّرَ مِنْ اَفْظَعِ اَمْرَاضِ الْقُلُوْبِ، حَتّٰى يُقَالُ اُمُّ الْاَمْرَاضِ. يَنْشَأُ مِنْهُ اَمْرَاضٌ كَثِيْرَةٌ، يَنْشَأُ مِنْهُ الْحَسَدُ وَالْحِقْدُ، وَيَنْشَأُ مِنْهُ الظُّلْمُ وَالْعُدْوَانُ عَنْ ظَلَمَاتِ النَّاسِ، وَيَنْشَأُ مِنْهُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ، حَتّٰى يَنْشَأُ مِنْهُ الْكُفْرُ، وَبِهٰذَا التَّكَبُّرِ صَارَ الشَّيْطَانُ مِنَ الْكَافِرِيْنَ وَ الْمَلْعُوْنِيْنَ، قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ. وَبِهٰذَا صَارَ فِرْعَوْنُ وَقَارُوْنُ مِنَ الطَّاغِيْنَ. قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِى الْاَرْضِ، وَقَالَ تَعَالٰى : اِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوْسٰى فَبَغٰى عَلَيْهِمْ، وَاٰتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوْزِ مَا اِنَّ مَفَاتِحَهٗ لَتَنُوْءُ بِالْعُصْبَةِ اُولِى الْقُوَّةِ، اِذْ قَالَ لَهٗ قَوْمُهٗ لَا تَفْرَحْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ. وَكَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكْثَرَ النَّاسِ تَوَاضُعًا وَخُضُوْعًا، وَ اَبْعَدَهُمْ كِبْرًا وَّغُرُوْرًا. وَكَانَ يَقُوْلُ : اِنِّىْ اٰكُلُ كَمَا يَاْكُلُ الْعَبِيْدُ. وَكَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَاضِعًا فِىْ كُلِّ شَيْءٍ مِنَ الْاَكْلِ

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

وَالشُّرْبِ وَ الْجُلُوْسِ وَالْمَشْيِ، وَفِى الْحَدِيْثِ اَنَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا مَشٰى تَكَفَّأَ تَكَفُّأً كَاَنَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ. وَكَانَ اِذَا مَشٰى مَشٰى خَلْفَ النَّاسِ لَا اَمَامَهُمْ، كَيْ لَا يَقَعَ فِيْ قَلْبِهِ الْكِبْرُ. وَاعْلَمُوْا اَنَّ التَّكَبُّرَ حَرَامٌ مِنَ الْكَبَائِرِ. حَتّٰى جَاءَ فِى الْحَدِيْثِ – قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبْرٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِى الْحَدِيْثِ الْقُدْسِيِّ – اَلْكِبْرِيَاءُ رِدَائِيْ وَالْعَظْمَةُ اِزَارِيْ، فَمَنْ نَازَعَنِيْ وَاحِدًا مِنْهُمَا اَلْقَيْتُهُ فِى النَّارِ. وَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غَضَبًا وَتَهْدِيْدًا لِلْجَبَّارِيْنَ وَالْمُتَكَبِّرِيْنَ : اَيْنَ الْجَبَّارُوْنَ؟ اَيْنَ الْمُتَكَبِّرُوْنَ ؟

وَاعْلَمُوْا اَنَّ كُلَّ مَا اَصَابَ النَّاسَ مِنَ الْحَسَنَاتِ وَ الْاِنْعَامِ، كُلُّ ذَالِكَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلَّامِ ، فَمَنْ صَدَّقَ بِذَالِكَ لَا يَنْبَغِيْ لَهُ الْكِبْرُ وَالْخُيَلَاءُ. مَعَ اَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ النَّاسِ لَهُ مِنَ الْمَعَائِبِ وَالْقُصُوْرِ، مِمَّا يُنْكِرُ لَهُ الْكِبْرَ وَالْغُرُوْرَ. وَكَيْفَ يَتَكَبَّرُ الْمَرْأُ وَحَالُهُ كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ :

اَوَّلُكَ نُطْفَةٌ قَذِرَةٌ ÷ وَاٰخِرُكَ جِيْفَةٌ مَدَرَةٌ ÷ وَاَنْتَ فِيْمَا بَيْنَهُمَا تَحْمِلُ عَذِرَةً

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ : وَلَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا، اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا. كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوْهًا.

بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ، وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. اَقُوْلُ قَوْلِيْ هٰذَا وَاسْتَغْفِرُ اللّٰهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَاسْتَغْفِرُوْهُ، اِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



বয়ান নং -৩৮

## তাওয়াযু' বা বিনয় প্রসঙ্গ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ، مَآ اُرِيْدُ مِنْهُمْ مِّنْ رِّزْقٍ وَّ مَآ اُرِيْدُ اَنْ يُّطْعِمُوْنِ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ اللّٰهُ.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

গত জুমুআয় তাকাব্বুর বা অহংকার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল তাকাব্বুর বা অহংকার হল– বহু রোগের মা, অনেক পাপের মূল। তাকাব্বুর এত জঘন্য রোগ যে, এর থেকে আরও বহু রোগ সৃষ্টি হয়। এ কারণে তাকাব্বুর একটা বড় ধরনের কবীরা গোনাহ। এত বড় জঘন্য কবীরা গোনাহ যে, হাদীছে বলা হয়েছে, যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আল্লাহ পাক আমাদেরকে হেফাযত করুন।

তাকাব্বুর-এর বিপরীত গুণ হল– তাওয়াযু' বা বিনয়। তাকাব্বুর দূর হলেই তাওয়াযু' বা বিনয় আসে। তাওয়াযু বা বিনয় হল তাকাব্বুর এর বিপরীত অবস্থা। তাই অহংকার যেমন মনের সবচেয়ে বড় রোগ, এর বিপরীত তাওয়াযু' হল মনের সবচেয়ে উত্তম গুণ। তাওয়াযু' এত উঁচু পর্যায়ের গুণ যে, হাদীছে বলা হয়েছে,

مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ اللّٰهُ. (رواه البيهقي في شعب الإيمان برقم ٨١٤٠)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি তাওয়াযু বা বিনয়ের গুণ অর্জন করবে, আল্লাহ পাক তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন, তাকে উঁচু করে দিবেন। তাকাব্বুরের কারণে মর্যাদার পতন ঘটে। যেমন– শয়তান এই তাকাব্বুরের কারণেই আল্লাহর দরবার থেকে মারদূদ বা বিতাড়িত হয়েছিল। এর বিপরীত তাওয়াযু'-র কারণে আল্লাহর দরবারে মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

তাওয়াযু'-এর এত মর্যাদা কেন? কারণ তাওয়াযু' বা বিনয়ের মাধ্যমে মানুষ নিজের আমিত্বকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে দেয় এবং সম্পূর্ণ আল্লাহর কাছে নিজেকে ন্যস্ত করে দেয়। তাওয়াযু বলাই হয় নিজের আমিত্বকে বিসর্জন দেয়া, নিজেকে বড় মনে না করা। আমি কিছু নই, কোন গুণ আমার নিজস্ব নয়, সব আল্লাহর দেয়া। আমার স্বাস্থ্য ভাল, এটা আল্লাহর দেয়া। আমার চেহারা ভাল, এটাও আল্লাহর দেয়া। আমার অনেক ধন-সম্পদ আছে, এটাও আল্লাহর দেয়া। আমার অনেক জ্ঞান-বুদ্ধি আছে, এটাও আল্লাহর দেয়া। এভাবে সবকিছুই আল্লাহ পাকের দেয়া, আমার কিছুই নয়। অতএব আমি কী নিয়ে বড়ায়ী করব? সবই তো আল্লাহ পাকের এহসান। এভাবে নিজেকে ছোট মনে করা এবং আল্লাহ পাকের সমস্ত এহসানের জন্য তাঁর সামনে নত হওয়াকেই বলা হয় তাওয়াযু'।

তাওয়াযু' মূলত মনের বিষয়। মনে মনে নিজেকে ছোট মনে করতে হবে, মনের অহংকার বর্জন করতে হবে, মনে মনে আল্লাহর সামনে নত থাকতে হবে। তাই শুধু মুখে বললে তাওয়াযু' হয় না। মুখে বললাম আমি কিছুই নই, আমি একটা অধম, আমি একটা অপদার্থ! মুখে মুখে এরকম বললাম, কিন্তু মনের অবস্থা হল-আমি অধম নই, আমি তো অনেক কিছুই। মুখে নিজেকে অধম বলছি, এ কারণে যাতে

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

মানুষ আমাকে বলে যে, লোকটার অহংকার নেই, লোকটা খুবই তাওয়াযুর অধিকারী, বিনয়ী। এটাকে তাওয়াযু' বলা হয় না। নিজেকে ছোট বলা তাওয়াযু' নয়, বরং নিজেকে ছোট মনে করা হল তাওয়াযু'।

কোন ব্যাপারে শুধু মুখের বলা বা বাহ্যিক অবস্থার ভিত্তিতে আল্লাহ কোন ফয়সালা করবেন না। আল্লাহ তা'আলা মনের আসল অবস্থা দেখবেন। হাদীছে ইরশাদ হয়েছে,

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ إِلٰى أَجْسَادِكُمْ وَلَا إِلٰى صُوَرِكُمْ وَلٰكِنْ يَنْظُرُ إِلٰى قُلُوْبِكُمْ. (رواه مسلم في صحيحه برقم ٦٧٠٧)

অর্থাৎ, আল্লাহ পাক তোমাদের দেহ দেখেন না, অর্থাৎ তোমাদের বাহ্যিক আকৃতি বা বাহ্যিক আচরণ দেখেন না, তার ভিত্তিতে আল্লাহ পাক কোন মূল্যায়ন করেন না, বরং তিনি দেখেন তোমাদের মনের অবস্থা।

অতএব মনের মধ্যে অহংকার লুকিয়ে রেখে মুখে মুখে নিজেকে নিকৃষ্ট, অধম ইত্যাদি বললে বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে বিনয়ের ভাব দেখালেই তাওয়াযু' হয়ে যায় না। বরং এটা হল তাওয়াযু'র আবরণে তাকাব্বুর। এক বুযুর্গের দরবারে এক ব্যক্তি একটা আমল করা শুরু করল। আমলটা হল সে মসজিদের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে যখন-ই কোন লোক মসজিদে প্রবেশ করত, তার জুতা সোজা করে দিত। একদিন উক্ত বুযুর্গ তাকে ডেকে বললেন যে, এই জুতা সোজা করাও তোমার একটা অহংকার। তুমি এটা বন্ধ করে দাও! সে বলল, হুজুর! অহংকার নয়, আমি তো বিনয়ের সাথে মানুষের জুতা সোজা করে দিচ্ছি। আমার অহংকার কমানোর জন্য আমি এটা করছি। বুযুর্গ বললেন তোমার মনে এই চিন্তা কাজ করছে যে, আমি জুতা সোজা করে দিচ্ছি, এ দেখে সকলেই আমাকে বিনয়ী মনে করবে যে, দেখ এত বড় মানুষ, কিন্তু কোন অহংকার নেই, মানুষের জুতা সোজা করে দিচ্ছে। এভাবে ভিতরে-ভিতরে তোমার মনে অহংকার কাজ করছে, এটা বিনয় নয়, এটা হল বিনয়ের আবরণে অহংকার। এভাবে অহংকার কমে না; বরং আরও বেড়ে যায়।

দেখা গেল মনের রোগ ধরা খুব কঠিন। নিজে নিজে মনের রোগের চিকিৎসা করতে গেলে রোগ কমা নয়; বরং বেড়ে যেতে পারে। এ জন্যেই হক্কানী বুযুর্গানে দ্বীনের কাছে যেতে হয়। তাঁরা মনের রোগ চিনে সঠিক চিকিৎসা দিতে পারেন। তাঁরা হলেন রূহানী চিকিৎসক। যিনি যে রোগের চিকিৎসক, সেই রোগ সারানোর জন্য তার স্বরণাপন্ন হওয়াই নিরাপদ। নিজে চিকিৎসক না হয়ে চিকিৎসা করতে যাওয়া নিরাপদ নয়।

আমরা অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের মূল রোগ ধরতে পারি না। যেমন– নিয়ম হল আল্লাহ পাকের হুকুমকে মাথা নত করে মেনে নিতে হবে। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় আমরা আল্লাহর হুকুমের যুক্তি খুঁজি। যুক্তি বুঝে না আসলে মানতে চাই না। এর কারণ হল আমাদের ভিতরে বড়ত্ববোধ অর্থাৎ অহংকারবোধ কাজ রকতে থাকে। নিজেকে বড় মনে করি বলেই যুক্তি খুঁজি। নিজেকে বড় মনে করা থেকেই যুক্তি খোঁজার চেতনা জাগ্রত হয়ে থাকে। নিজেকে যদি ক্ষুদ্র মনে করতাম, নিজেকে যদি আল্লাহ আল্লাহর রাসূলের গোলাম মনে করতাম, তাহলে আল্লাহ আল্লাহর রাসূলের হুকুমের সামনে কোন যুক্তি খুঁজতাম না। কোন গোলাম তার মুনিবের হুকুমের যুক্তি খোঁজে না। বরং মুনিব যা বলে তার সামনে তার মাথা নত হয়ে আসে। বিনা যুক্তিতে সে তা মেনে নেয়। গোলাম মুনিবের কোন হুকুমের যুক্তি খুঁজতে পারে না। বরং মুনিব যা বলে গোলামের কাজ হল তাই করে যাওয়া। কোন রকম অহংকার দেখানো গোলামকে মানায় না, বরং তাওয়াযু' বা বিনয়ই গোলামকে মানায়। আমরা আল্লাহর গোলাম। গোলামী করা অর্থাৎ দাসত্ব করাই আমাদের কাজ। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা এ কথাই বলেছেন। ইরশাদ হয়েছে,

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ. (যারিয়াত: ৫৬)

অর্থাৎ, আমি জিন এবং ইনসানকে সৃষ্টি করেছি আমার ইবাদত করার জন্য, অর্থাৎ আমার গোলামী করার জন্য, আমার দাসত্ব করার জন্য। যে ব্যক্তি গোলাম বা দাস হয়, সে মুনিবকে খাওয়া পরা দেয় না, বরং মুনিবই গোলামের ভরণ-পোষণ দেয়, মুনিবই গোলামের সব দায়িত্ব গ্রহণ করে। তাই আল্লাহ পাক এই আয়াতের শেষে বলেছেন,

مَآ أُرِيْدُ مِنْهُمْ مِّنْ رِّزْقٍ وَّ مَآ أُرِيْدُ أَنْ يُّطْعِمُوْنِ.

অর্থাৎ, আমি আল্লাহ তাদের কাছে রিযিক চাই না, বরং আল্লাহই রিযিক দাতা। এখানে আল্লাহ পাক বুঝিয়েছেন আমি মুনিব, তারা আমার গোলাম, তাই মুনিব হিসেবে আমি তাদের ভরণ-পোষণ ইত্যাদি সবকিছুর দায় দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছি। (যারিয়াত: ৫৭)

আল্লাহকে মুনিব বলে স্বীকার করলে এবং নিজেকে আল্লাহর গোলাম বলে মেনে নিলে কোন অসম্মান নেই। বরং এতে আমাদের সম্মান, এতে আমাদের লাভ। যিনি মুনিব হন, তিনি গোলামের সব দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করেন। গোলামের ভরণ-পোষণ, সুবিধা-অসুবিধা সবকিছুর দায়িত্ব মুনিবের। অতএব আমরা যদি আল্লাহকে মুনিব বলে স্বীকার করি এবং নিজেকে আল্লাহর সামনে গোলাম হিসেবে দাঁড় করাই, তাহলে আল্লাহ পাকও আমাদের সব দায়-দায়িত্ব নিয়ে নিবেন, আল্লাহ পাক আমাদের সব সুবিধা-অসুবিধা দেখবেন। কারণ, আমি আমাকে আল্লাহর গোলাম বলে পেশ করলাম, এর অর্থ হল– আমি আমার সবকিছু দেখা-শোনার দায়িত্ব আল্লাহর উপরে ছেড়ে দিলাম। একজন গোলাম যদি মুনিবের সামনে নিজেকে এভাবে পেশ করে যে, আমার নিজস্ব কোন বুঝ নেই, আমার নিজস্ব কোন যুক্তি নেই, নিজের আমিত্ব বলতে কিছু নেই, মুনিবের কথা ছাড়া সে কিছুই বোঝে না, তাহলে সেই গোলাম কামিয়াব। ঐ মুনিব তাকে মনে প্রাণে দেখবে। কারণ মুনিব চিন্তা করবে এ গোলাম আমার কথার বাইরে কিছুই বোঝে না, আমার মর্জির বাইরে কিছুই বোঝে না, সে সম্পূর্ণ আমার জন্য নিবেদিত। এরকম গোলামের জন্য মুনিবের দয়া উথলে ওঠে।

আমরা নিজেদেরকে আল্লাহর গোলাম মনে করব অর্থই হল– আমরা আল্লাহর গোলামী ছাড়া আর কিছুই বুঝি না, তাঁর মর্জি ছাড়া আর কিছুই বুঝি না, আমরা সম্পূর্ণ আল্লাহর জন্য নিবেদিত। এরকম হতে পারলে আল্লাহ আমাদের সবকিছু দেখা-শোনার দায়িত্ব নিয়ে নিতেন। আল্লাহ পাক আমাদের সব সুবিধা-অসুবিধা দেখবেন। এজন্য নিজেকে গোলাম বানাতে পারা সবচেয়ে কামিয়াবী-র বিষয়। হাদীছে এসেছে রাসূল (সা.)কে যখন নবুওয়াত দেয়া হয়, যখন তাঁকে নবী বানানো হয়, তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কেমন নবী হতে চাও? বাদশাহ নবী হতে চাও, না গোলাম নবী হতে চাও? নবী কারীম (সা.) বলেছিলেন, আমি গোলাম নবী হতে চাই। অর্থাৎ, নবী হয়েও গোলামের যিন্দেগী চাই। কারণ আল্লাহর গোলাম হতে পারার মধ্যেই কামিয়াবী। তাই নিজেকে তিনি গোলাম বলে পরিচয় দিয়েছেন। আল্লাহ পাকও রাসূল (সা.)-এর পরিচয় দিয়েছেন গোলাম বলে। যখন রাসূল (সা.)কে সবচেয়ে মর্যাদার স্তর দান করা হয়, অর্থাৎ তাঁকে মে'রাজে নিয়ে যাওয়া হয়, যা অন্য কোন নবীর ক্ষেত্রে আল্লাহ পাক করেননি। একমাত্র আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা (সা.)-এর ক্ষেত্রেই করেছেন। তাঁকে স্বশরীরে সপ্তম আসমানের উপরে, তার থেকেও আরও উপরে আল্লাহর খাস দরবার পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই মর্যাদার স্তর দান করা প্রসঙ্গ আলোচনা করতে যেয়ে আল্লাহ পাক নবী কারীম (সা.)-এর পরিচয় দিয়েছেন "গোলাম বলে"। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

سُبْحٰنَ الَّذِيْٓ أَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا.

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

অর্থাৎ, আল্লাহ তাঁর গোলামকে রাতের বেলায় ভ্রমণে নিয়ে গেলেন। এখানে নবী কারীম (সা.)কে গোলাম বলে পরিচয় দিলেন কেন? কারণ গোলামের পরিচয়টাই হচ্ছে সবচেয়ে মর্যাদার পরিচয়। যে নিজেকে যত বড় গোলাম বানাতে পারবে, সে আল্লাহর তত আপন হয়ে যেতে পারবে। এই গোলাম বানানোর উপায় হল নিজের আমিত্বকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে দেয়া। নিজের মধ্যে চরম তাওয়াযু' বা বিনয় প্রতিষ্ঠা করা।

রাসূল (সা.)-এর মধ্যে বিনয় গুণ কেমন ছিল, তার বিস্তারিত বর্ণনাও হাদীছ এবং সীরাতের কিতাবে রয়েছে। তাঁর কথা-বার্তার মধ্যে বিনয় ছিল, চলা-ফেরার মধ্যে বিনয় ছিল, উঠা-বসার মধ্যে বিনয় ছিল, প্রত্যেকটা পদে পদে তাঁর ভিতরে বিনয় ছিল। যখন তিনি চলতেন, আমাদের মত এরকম মাথা উঁচু করে, বুক টান করে চলতেন না। হাদীছে এসেছে,

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اِذَا مَشٰى تَكَفَّأَ كَاَنَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ. (شمائل ترمذى)

অর্থাৎ, যখন রাসূল (সা.) চলতেন ঝুঁকে ঝুঁকে চলতেন, মাথা নীচু করে চলতেন। মনে হত যেন উঁচু জায়গা থেকে নীচু জায়গার দিকে নামছেন। বুক টান করে, মাথা উঁচু করে তিনি চলতেন না। যখন অনেক লোকের সাথে চলতেন, তখন আমাদের নেতাদের মত দলের আগে আগে চলতেন না, বরং অন্যদেরকে আগে বাড়িয়ে দিয়ে তিনি পেছনে পেছনে চলতেন। হাদীছে এসেছে,

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ: اِذَا مَشٰى مَشٰى اَصْحَابُهُ اَمَامَهُ. (سنن ابن ماجة برقم ٢٤٦ وفي الزوائد رجال إسناده ثقات)

অর্থাৎ, রাসূল (সা.) যখন সাহাবাদের নিয়ে চলতেন, তখন সাহাবীগণ তাঁর আগে চলতেন। এরকম নয় যে, নেতা আগে থাকবে আর অনুসারীরা পেছনে থাকবে। এতে মনের ভিতরে গর্ববোধ সৃষ্টি হয়, অহংকার সৃষ্টি হয়। তাই রাসূল (সা.) এরকম চলতেন না। বরং সাহাবীদেরকে আগে দিয়ে দিতেন। কোথাও তিনি পদমর্যাদার বড়ায়ী ফোটাতেন না। সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে যখন তিনি মজলিসে বসতেন, তখন বাইরের কোন অচেনা লোক আসলে রাসূল (সা.)কে চেনার জন্য তাকে জিজ্ঞাসা করতে হত যে, তোমাদের মধ্যে মুহাম্মাদ কে? কারণ তিনি সাহাবীদের সাথে এমনভাবে মিলে মিশে একাকার হয়ে বসতেন যে, বোঝাই যেতনা মুহাম্মাদ কে? মজলিস প্রধান কে? বসার মধ্যে পদমর্যাদার কোন ভাব ফুটে উঠত না। তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠনবী, আল্লাহ্‌র সবচেয়ে বড় প্রিয়পাত্র, যাকে সৃষ্টি করা না হলে আসমান-যমীন জান্নাত-জাহান্নাম কিছুই সৃষ্টি করা হত না, তারপরও তিনি এমন নিরহংকার ছিলেন, এমন বিনয়ী ছিলেন যে, একজন বৃদ্ধা মহিলা এসে নবী (সা.)কে বলল,

اِنَّ لِيْ اِلَيْكَ حَاجَةً.

অর্থাৎ, আপনার কাছে আমার একটা প্রয়োজন আছে। রাসূল (সা.) বুঝলেন যে, হয়তো বৃদ্ধার কোন গোপন কথা আছে যা সে এই মজলিসে বলতে চায় না; বরং আমাকে একাকী বলতে চায়। তাই রাসূল (সা.) তাকে বললেন,

اِجْلِسِيْ فِيْ اَيِّ طَرِيْقِ الْمَدِيْنَةِ شِئْتِ اَجْلِسْ اِلَيْكَ. (شمائل ترمذى)

অর্থাৎ, ঠিক আছে, যান মদীনার যেকোন রাস্তায় যেকোন স্থানে গিয়ে বসুন, আমি এসে আপনার কথা শুনব এবং আপনার প্রয়োজন পূরণ করব। মজলিস থেকে তিনি উঠে গেলেন বৃদ্ধার কথা শোনার জন্য। পদের মর্যাদার প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ তিনি করলেন না।

রাসূল (সা.) বাইরে থেকে যখন মজলিসে আসতেন, তখন সাহাবায়ে কেরাম রাসূল (সা.)-এর আগমনে সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যেতেন। কিন্তু রাসূল (সা.) এটা পছন্দ করতেন না। এটাকে তিনি বিনয়ের

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



পরিপন্থী মনে করতেন। রাসূল (সা.) এটা অপছন্দ করেন, টের পেয়ে সাহাবায়ে কেরাম পরবর্তীতে দাঁড়ানো ছেড়ে দিয়েছিলেন। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে হযরত আনাস (রা.) বলেন,

لَمْ يَكُنْ شَخْصٌ اَحَبَّ اِلَيْهِمْ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَكَانُوْا اِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُوْمُوْا لِمَا يَعْلَمُوْنَ مِنْ كَرَاهِيَّتِهٖ لِذَالِكَ. (رواه الترمذى وقال : هذا حديث حسن صحيح)

অর্থাৎ, সাহাবীদের কাছে রাসূল (সা.)-এর চেয়ে অধিক প্রিয় আর কেউ ছিল না। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম রাসূল (সা.) কে দেখলে দাঁড়াতেন না। কারণ এই দাঁড়ানোটাকে রাসূল (সা.) অপছন্দ করেন এটা তারা বুঝতে পেরেছিলেন।

এভাবে রাসূল (সা.)-এর কথা-বার্তা, চলা-ফেরা, উঠা-বসা সবকিছুর মধ্যে তাওয়াযু' বা বিনয় ছিল। সবকিছুর মাধ্যমেই তিনি গোলামীর ভাব প্রকাশ করে চলতেন।

সাহাবায়ে কেরামের অবস্থাও এরকম ছিল। তারা নিজেদেরকে আল্লাহ, আল্লাহর রাসূলের গোলাম বলে পরিচয় দিতে পারাতে আনন্দবোধ করতেন। একটা ঘটনা শুনুন। হযরত ওমর (রা.) যখন খলীফা ছিলেন, তখন তার পুত্র আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) ছিলেন খলীফার ছেলে, অর্থাৎ বাদশাহর ছেলে। আর হযরত হুসাইন (রা.) ছিলেন রাসূল (সা.)-এর নাতী। তাদের উভয়ের তখনও বয়স কম। একদিন হুসাইনের সাথে ইবনে ওমরের কথা কাটাকাটি হয়ে গেল। এক পর্যায়ে হুসাইন আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরকে বললেন– তুমি আমার নানার গোলামের পুত হয়ে আমাকে এমন বড় কথা বললে? বোঝাতে চাইল যে, তোমার পিতা ওমর ছিল আমার নানা রাসূল (সা.)-এর গোলাম। তুমি সেই গোলামের ছেলে হয়ে এরকম কথা বললে? একথা শুনে ইবনে ওমর রেগে গেল এত বড় কথা! আমি বাদশাহর ছেলে, আমাকে বলছ গোলামের পুত! রেগে যেয়ে পিতার কাছে নালিশ দিল যে, হুসাইন আমাকে গোলামের পুত বলেছে। হযরত ওমর (রা.) সাহাবায়ে কেরামকে ডাকলেন যে, দরবার বসবে। এ কথার বিচার হবে। মানুষ মনে করল এবার বোধ হয় খলীফা হুসাইনকে শাস্তি দিবেন। যদি তাই হয়– রাসূলের নাতিকে শাস্তি দেয়া হয়, তাহলে মদীনায় আল্লাহর গযব নেমে আসবে। ওমর এটা কী করতে যাচ্ছে! সাহাবায়ে কেরামের দরবার বসল। সকলে চিন্তা করছেন কী যেন ঘটতে যাচ্ছে! হযরত ওমর (রা.) হুসাইনকে জিজ্ঞাসা করলেন তুমি যে আমার ছেলেকে গোলামের ছেলে বলেছ, কেন বলেছ? হুসাইন জওয়াব দিল কেন আপনি আমার নানার গোলামী করেননি? তাহলে তো আপনি আমার নানার গোলাম। অতএব আপনার পুত্র গোলামের পুত্র বৈ কি? তখন হযরত ওমর (রা.) বললেন আপনারা মদীনার সমস্ত সাহাবীরা সাক্ষী থাকুন রাসূলের নাতী স্বীকার করলেন যে, আমি রাসূলের গোলাম। আপনারা কি একথার সাক্ষী থাকলেন? সকলে বললেন, হ্যাঁ আমরা সাক্ষী থাকলাম। তখন হযরত ওমর (রা.) আবেগজড়িত কণ্ঠে বললেন, 'হাশরের ময়দানে আমি যেন রাসূলের গোলাম হয়ে উঠতে পারি। আমি তখন বলব আমি আপনার গোলাম, আপনার নাতী একথার স্বীকৃতি দিয়েছে। বহু মানুষ তার সাক্ষী। কাজেই আমার সব দায়িত্ব আপনার। গোলামের সব কিছুর দায়িত্ব থাকে মুনিবের। আমি আপনার গোলাম, আমাকে উদ্ধার করার দায়িত্ব আপনার'।

এভাবে শুধু রাসূল (সা.) এবং সাহাবায়ে কেরামই নন, যারা বড় হয়েছেন, তাওয়াযু এবং বিনয়ের মাধ্যমেই বড় হয়েছেন। সমস্ত বুযুর্গানে দ্বীনের অবস্থা এরকম। তারা বড় হয়েছেন নিজেদের ছোট মনে করেই বড় হয়েছেন। শায়খ আহমদ কবীর রেফায়ী (রহ.) এক বড় বুযুর্গ ছিলেন। তাঁর ঘটনা আমরা অনেকে শুনেছি। রাসূল (সা.)-এর রওযার কাছে যেয়ে তিনি বলেছিলেন, আপনার মোবারক হাতখানা বের করে দিন, আমি ঐ হাতে চুমু খেতে চাই। রাসূল (সা.)-এর সাথে তাঁর ছিল প্রেমের সম্পর্ক। একথা বলার পর রওযা শরীফ থেকে রাসূলের হাত উঠে আসে, তিনি সেই মোবারক হাতের সাথে মোসাফাহা

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

করেছেন এবং চুমু দিয়েছেন। এর পরে সাথে সাথে মনে করেছেন, এখন এই দরবারের সমস্ত মানুষ আমাকে বড় বুযুর্গ মনে করবে, আমার মনে অহংকার এসে যাবে, তাই সাথে সাথে তিনি মসজিদের দরজার উপরে শুয়ে পড়েন এবং বলতে থাকেন আমার ভিতরে অহংকার এসে গেছে, আপনাদের কাছে অনুরোধ আপনারা সবাই আমার উপর পাড়া দিয়ে পার হয়ে যান। এভাবে নিজের মধ্যে অহংকার আসার কোন সুযোগ দেননি। নিজেকে মানুষের সামনে তুচ্ছ করে রাখতে চেয়েছেন। সকলকে বড় মনে করেছেন, নিজেকে তুচ্ছ জেনেছেন। এই বুযুর্গেরই আর একটা ঘটনা। একটা কুকুরের গায়ে খোস পাচড়া। সমস্ত মানুষ কুকুরটাকে ঘৃণা করছে। কিন্তু তিনি ঐ কুকুরটাকে ধরে নিয়ে এসেছেন। ডাক্তার ডেকে চিকিৎসা করিয়েছেন। চিকিৎসা করে সুস্থ হওয়ার পর আপনজনদেরকে বলেছেন, তোমরা এই কুকুরটার দায়িত্ব নিয়ে নাও! কেউ তার দায়িত্ব নেয়নি। অবশেষে তিনি নিজের দায়িত্বে রেখেছেন। পরবর্তীতে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাঁর কাছে এলহাম হয়েছে যে, তোমার যত মারেফাতের জ্ঞান, যত বুযুর্গী, তা ঐ কুকুরের খেদমত করার ওছীলায়। তিনি বলতেন। এই কুকুরটা আল্লাহর এক মাখলূক, আল্লাহর কাছে আমার যদি নাজাত না হয়, তাহলে আমার চেয়ে এই কুকুরটা বেশি দামি। দেখা গেল কোন মানুষকে নয়, একটা তুচ্ছ প্রাণী কুকুরকেও তিনি তুচ্ছ জানেননি।

বুযুর্গানে দ্বীন বলেন, কোন মানুষকে তুচ্ছ মনে করার অবকাশ নেই। এমনকি আল্লাহর কোন প্রাণীকেও তুচ্ছ মনে করতে নেই। আল্লাহর কাছে কে দামি, তা আল্লাহ পাকই জানেন। কাজেই আমি আল্লাহর কোন মাখলূক থেকে নিজেকে বড় মনে করতে পারি না। একজন বুযুর্গের ঘটনা আছে- তার মুখে ছিল নীচের দিকে সামান্য কয়েকটা দাড়ি। আমরা অনেকে এরকম দাড়িকে ছাগলে দাড়ি বলে থাকি। কিন্তু এটা ঠিক নয়। দাড়ি তো দাড়িই। দাড়ি একটা মর্যাদার জিনিস। সেটাকে ছাগলের মুখের পশমের সাথে উদাহরণ দিয়ে ছাগলে দাড়ি বলা ঠিক নয়। যাহোক একদিন এক লোক ঐ বুযুর্গের সাথে উপহাস করার জন্য একটা ছাগল নিয়ে এসে বলল হুজুর! আপনার দাড়ি বেশি দামি না আমার ছাগলের দাড়ি বেশি দামি । বুযুর্গ বললেন, আমি এখন মন্তব্য করতে পারব না, মরার পরে আমাকে জিজ্ঞাসা করো। মরার পরে যখন ঐ বুযুর্গের লাশ নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন সেই লোকটা হাজির হল। তখন লাশের যবান খুলে গেল যে, তোমার ছাগলের দাড়ির চেয়ে আমার দাড়ি বেশি দামি। কারণ আমার ঈমানের সাথে মৃত্যু হয়েছে, আমার নাজাতের ব্যবস্থা হয়ে গেছে। কিন্তু জীবদ্দশায় তিনি বলেননি, আমার দাড়ি বেশি দামি। একটা ছাগলকেও তিনি তুচ্ছ জানেননি। এভাবে সব ক্ষেত্রে নিজেদেরকে তুচ্ছ জেনে এবং তাওয়াযু' প্রদর্শন করেই বড়রা বড় হয়েছেন। নিজেকে বড় মনে করলে এবং বড়ায়ী দেখালেই বড় হওয়া যায় না। তাওয়াযু' বা বিনয়ের মাধ্যমেই বড় হওয়া যায়। যে তাওয়াযু' এখতিয়ার করে, আল্লাহ পাক তাকে বড় করেন। হাদীছে এসেছে,

مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ اللّٰهُ. (رواه البيهقي في شعب الإيمان برقم ٨١٤٠)

অর্থাৎ, যে তাওয়াযু অবলম্বন করে, আল্লাহ পাক তার মর্যাদা উন্নত করে দেন। তাওয়াযু দ্বারা আল্লাহ্‌র কাছেও প্রিয় হওয়া যায়, মানুষের কাছেও প্রিয় হওয়া যায়। শেখ সাদী (রহ.) বলেছেন,

دلا گر تواضع کنی اختیار + شود خلق دنیا ترا دوست دار

অর্থাৎ, তুমি যদি তাওয়াযু অবলম্বন কর, তাহলে দুনিয়া তোমাকে ভালবাসবে। দুনিয়ার মানুষের কাছে তুমি প্রিয় হতে পারবে। অতএব তাওয়াযু এমন এক গুণ, যার দ্বারা দুনিয়া আখেরাত উভয় জগতের লাভ। এর বিপরীত অহংকার এমন এক দোষ, যার দ্বারা দুনিয়া আখেরাত উভয় জগতের ক্ষতি।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে সহীহ সমঝ নসীব করুন, আমল করার তাওফীক দান করুন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



বয়ান নং ৩৮-এর খুতবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَرْشَدَنَا اِلٰى اِمْتِثَالِ الْمَاْمُوْرِ وَاجْتِنَابِ الْمَحْظُوْرِ، اَحْمَدُهٗ وَاَشْكُرُهٗ وَهُوَ الْمَحْمُوْدُ الْمَشْكُوْرُ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَهُوَ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهُ الْمُتَوَاضِعُ فِىْ كُلِّ الْاُمُوْرِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اُوْلِى الْعِصْمَةِ مِنَ الْكِبْرِ وَالْغُرُوْرِ.

اَمَّا بَعْدُ :

اَيُّهَا النَّاسُ! اِنَّ التَّوَاضُعَ لَهٗ مَكَانَةٌ رَفِيْعَةٌ عِنْدَ اللّٰهِ، فَقَدْ جَآءَ فِى الْحَدِيْثِ : مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ اللّٰهُ. رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَةَ وَاَحْمَدُ.

وَكَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكْثَرَ النَّاسِ تَوَاضُعًا. وَقَدْ ظَهَرَ تَوَاضُعُهٗ فِىْ اَقْوَالِهٖ وَاَفْعَالِهٖ وَاَحْوَالِهٖ، حَتّٰى كَانَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا مَشٰى تَكَفُّأَ تَكَفُّأً كَاَنَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ. وَكَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا مَشٰى مَشٰى اَصْحَابُهٗ اَمَامَهٗ لِئَلَّا يَقَعَ فِىْ نَفْسِهٖ شَيْئٌ مِّنَ الْكِبْرِ. رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَةَ . وَالْكِبْرُ ضِدُّ التَّوَاضُعِ ، فَلَمْ يَكُنْ فِىْ ذَاتِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبْرٍ، حَتّٰى جَائَتْ عِنْدَهٗ عَجُوْزٌ، وَقَالَتْ : اِنَّ لِىْ اِلَيْكَ حَاجَةً، فَقَالَ : اِجْلِسِىْ فِىْ اَىِّ طَرِيْقِ الْمَدِيْنَةِ شِئْتِ اَجْلِسْ اِلَيْكِ. وَكَانَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ اَنْ يَّقُوْمَ لَهُ النَّاسُ حِيْنَ رَاَوْهُ، كَمَا جَاءَ فِى الْحَدِيْثِ – وَكَانُوْا اِذَا رَاَوْهُ لَمْ يَقُوْمُوْا لِمَا يَعْلَمُوْنَ مِنْ كَرَاهِيَتِهٖ لِذَالِكَ . وَهٰذَا كُلُّهٗ مِنْ شَاْنِ تَوَاضُعِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

اَيُّهَا النَّاسُ! وَالتَّوَاضُعُ صِفَةُ الْقَلْبِ، فَمَنْ اَظْهَرَ التَّوَاضُعَ وَفِىْ قَلْبِهِ الْعُجْبُ فَلَيْسَ ذَالِكَ مِنَ التَّوَاضُعِ ، وَاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لَا يَنْظُرُ اِلٰى صُوَرِ النَّاسِ

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

وَلَا اِلٰى اَجْسَادِهِمْ وَلٰكِنْ يَنْظُرُ اِلٰى قُلُوْبِهِمْ وَاَعْمَالِهِمْ. وَاعْلَمُوْا اَنَّ التَّوَاضُعَ لَيْسَ مَعْنَاهُ الذُّلُّ وَالْهَوَانُ، فَلَا يَنْبَغِى التَّوَاضُعُ عِنْدَ الْاَغْنِيَاءِ طَمْعًا لِمَا عِنْدَهُمْ، لِاَنَّ فِيْهِ الذُّلَّ. وَجَاءَ فِى الْحَدِيْثِ- لَايَنْبَغِىْ لِلْمُؤْمِنِ اَنْ يُّذِلَّ نَفْسَهُ. رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ. وَفِىْ كِتَابِ الْفُرْقَانِ نَقْلًا عَنْ دَائِرَةِ الْمَعَارِفِ- مَنْ خَضَعَ نَفْسَهُ لِغَنِيٍّ طَمْعًا لِمَا عِنْدَهُ، ذَهَبَ ثُلُثَا دِيْنِهِ وَشَطْرُ مُرُوَّتِهِ.

وَاعْلَمُوْا اَنَّ فِى التَّوَاضُعِ اِظْهَارَ الْعُبُوْدِيَّةِ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ. وَهُوَ تَعَالٰى يُحِبُّهَا. قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ. مَا اُرِيْدُ مِنْهُمْ مِنْ رِّزْقٍ وَّمَا اُرِيْدُ اَنْ يُّطْعِمُوْنِ. وَقَدْ لَقَّبَ تَعَالٰى نَبِيَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَبْدِ حِيْنَ ذَهَبَ بِهِ اِلٰى مَقَامِ دَنَا فَتَدَلّٰى، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى ، فَقَالَ : سُبْحٰنَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى. اَلْاٰيَةُ.

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ : اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا.

بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ، وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. اَقُوْلُ قَوْلِىْ هٰذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ لِىْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَاسْتَغْفِرُوْهُ، اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



বয়ান নং -৩৯

## হিংসা বা পরশ্রীকাতরতা প্রসঙ্গ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: اَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلٰى مَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَلَا تَحَاسَدُوْا وَلَاتَبَاغَضُوْا وَلَا تَدَابَرُوْا، وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا. وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ: اِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ، فَاِنَّ الْحَسَدَ يَاْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَاْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

আমরা আজ মনের একটা মারাত্মক ব্যাধি সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই। ব্যাধিটা হল হিংসা। হিংসা একটা মারাত্মক মনের রোগ। হিংসাকে আরবীতে বলা হয় হাছাদ। হাছাদ বা হিংসা বলা হয় কারও জ্ঞান-বুদ্ধি, ধন-সম্পদ, মান-ইজ্জত, সুখ-স্বাচ্ছন্দ ইত্যাদি ভাল কিছু দেখে মনে কষ্ট লাগাকে এবং এই আকাংখা হওয়াকে যে, সেটা না থাকুক বা ধ্বংস হয়ে যাক এবং তা হলেই মনে আনন্দ লাগা। হাছাদ হল একটা খারাপ মনোবৃত্তি। এটা হল পরশ্রীকাতরতা, অর্থাৎ পরের শ্রী বা ভাল কিছু দেখে কাতর হয়ে পড়া। হাছাদ বা হিংসা করা কবীরা গোনাহ। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা হাছাদ বা হিংসাকারীদেরকে তিরস্কার করে বলেছেন,

اَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلٰى مَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ.

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা তাঁর অনুগ্রহে মানুষকে যা দান করেছেন, তার উপর তারা হিংসা করে? (নিছাঃ ৫৪)

এ আয়াতে বোঝানো হয়েছে কোন লোকের কোন বিষয় সম্পদ ও নেয়ামত দেখে হাছাদ বা হিংসা করা নিষেধ। তবে কোন কাফের, মুরতাদ, ফাসেক ও বিদআতী লোকের কোন বিষয় সম্পদ ও নেয়ামত অর্জিত হলে এবং সে তা দ্বারা ফেতনা-ফাসাদ ও দ্বীনের ক্ষতি করতে থাকলে, তার সে সম্পদ ও নেয়ামত ধ্বংস হওয়ার কামনা করা নিন্দনীয় নয় বরং কোন কোন অবস্থায় তা উত্তম ইবাদত বলে গণ্য হবে। যেমন– একজন ফাসেক বা কাফের ব্যক্তির অনেক ধন-সম্পদ হয়েছে, সে সেই ধন-সম্পদ ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে, তাহলে সেই ব্যক্তির ধন-সম্পদ নষ্ট হওয়ার কামনা করলে তা নিষিদ্ধ হবে না। বরং ইসলামের মহব্বতে এরকম কামনাই করা উচিত। কারণ সে তার সম্পদ দ্বারা ইসলামের ক্ষতি সাধন করছে। আর কোন মুসলমান ইসলামের ক্ষতি সাধন হওয়াকে পছন্দ করতে পারে না।

হাছাদ একটা মনের রোগ। মনের মধ্যে এই রোগ সৃষ্টি হওয়ার অনেকগুলো কারণ রয়েছে। সাধারণত তাকাব্বুর বা নিজের বড়ত্ববোধ থেকে হাছাদ সৃষ্টি হয়। অন্যের জ্ঞান-বুদ্ধি, ধন-সম্পদ, মান-ইজ্জত বেশি দেখলে অন্যে বড় হয়ে যাচ্ছে, সে বড় হতে পারছে না, এরকম মনোভাব থেকে হাছাদ বা হিংসা জাগে। সে ভাবে অন্যদেরটা ধ্বংস হলে, অন্যরা ছোট থাকবে, সে বড় থাকতে পারবে। এই ভেবে সে অন্যের ভালটা ধ্বংস হওয়ার কামনা করে। প্রতিবেশীর মেয়ের খুব ভাল ঘরে বিবাহ হয়ে যাচ্ছে, সেটা জেনে আমি হিংসা করতে পারব না। হিংসা বশত এমন কিছু বলতে পারব না বা এমন কিছু করতে পারব না, যাতে সে বিবাহটা ভেঙ্গে যায়। একজনের ব্যবসায় খুব উন্নতি হচ্ছে বা একজন

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বড় কোন চাকরি পেয়ে যাচ্ছে বা বড় কোন পদ পেয়ে যাচ্ছে –এটা জেনে আমার ভিতরে জ্বালা শুরু হতে পারবে না, সেটা নষ্ট করার কোন চিন্তা করতে পারব না। এই নষ্ট করার চিন্তা হিংসা থেকেই হয়ে থাকে। আর এই হিংসা আসে তাকাব্বুর বা নিজে বড় থাকার চিন্তা থেকে। অথচ ইসলামের শিক্ষা হল শুধু নিজে বড় থাকার চিন্তা করা যাবে না। নিজের থেকে অন্যকে আলাদা করে ভাবা যাবে না। পরিচিত-অপরিচিত, আপন-পর, নিকটের-দূরের সমস্ত মুসলমানকে আমি এক করে ভাবব, কাউকে আমি আলাদা করে ভাবব না, কারও ক্ষতির চিন্তা আমি করব না, কারও প্রতি হিংসা রাখব না। হাদীছে ইরশাদ হয়েছে,

اَلْمُسْلِمُوْنَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ اِنِ اشْتَكٰى عَيْنُهُ اِشْتَكٰى كُلُّهُ وَاِنِ اشْتَكٰى رَأْسُهُ اِشْتَكٰى كُلُّهُ.

(مسلم برقم ٦٧٥٤)

অর্থাৎ, সমস্ত মুসলমান একটা মানুষের মত, অর্থাৎ একটা দেহের মত। একটা দেহের চোখে ব্যথা হলে সারা দেহে সে ব্যথা টের পায়, মাথায় ব্যথা হলে সারা দেহে সে ব্যথা টের পায়। এভাবে সমস্ত মুসলমান একটা দেহের মত। একজনের সুখে দুঃখে আরেকজন শরীক থাকবে, অর্থাৎ একজনের ব্যথায় আর একজন ব্যথিত হবে, একজনের সুখে আরেকজন সুখী হবে।

এ হাদীছে সমস্ত মুসলমানকে এক করে ভাবার, সকলের মধ্যে পারস্পরিক সহানুভূতি সৃষ্টির জন্য যে উদাহরণ এবং অভিব্যক্তি পেশ করা হয়েছে, তার চেয়ে সুন্দর অভিব্যক্তি আর কী হতে পারে? কুরআন শরীফে ইরশাদ হয়েছে,

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ.

অর্থাৎ, সমস্ত মুসলমান ভাই ভাই। অতএব এক ভাই আরেক ভাইয়ের অকল্যাণ চাইতে পারে না, এক ভাই আরেক ভাইয়ের খারাবী চাইতে পারে না, এক ভাই আরেক ভাইয়ের প্রতি হিংসা করতে পারে না। হিংসা বর্জন করলে পরস্পরে ভ্রাতৃত্বভাব কায়েম হবে। হাদীছে রাসূলে কারীম (সা.) ইরশাদ করেছেন,

وَلَا تَحَاسَدُوْا وَلَاتَبَاغَضُوْا وَلَا تَدَابَرُوْا، وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا. (صحيح البخاري ٦٠٦٦ وصحيح مسلم ٦٧٠١)

অর্থাৎ, তোমরা একে অপরের প্রতি হিংসা করো না, একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ রেখো না, একজন আরেকজনের পিছে লেগো না, বরং (হে আল্লাহর বান্দারা)! তোমরা একে অপরের ভাই ভাই হয়ে যাও।

কখনও কখনও শত্রুতা থেকেও হাছাদের মনোভাব সৃষ্টি হয়, কিংবা কারও মন যদি খবীছ হয়, মনের মধ্যে উদারতার অভাব থাকে, তাহলেও এরূপ মনোবৃত্তি জাগতে পারে। অথচ ইসলামের শিক্ষা হল এক মুসলমান আরেক মুসলমানের শত্রু নয় বরং বন্ধু। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

اَلْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ.

অর্থাৎ, মুসলমানগণ একে অপরের বন্ধু। (তাওবা: ৭১)

ইসলামের শিক্ষা হল মনকে উদার রাখতে হবে। মনের মধ্যে উদারতা আনতে হবে। মুসলমানের ভালায়ী কামনা করতে হবে। অন্যদের কল্যাণ কামনা করতে হবে। আমি উদারতা পরিহার করে চলব, সংকীর্ণতা পোষণ করব, তাহলে আল্লাহ পাকও আমার সাথে সংকীর্ণতার মোয়ামালা করবেন। আল্লাহ

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



পাকের নিয়ম হল আমি তাঁর বান্দার সাথে যেমন নীতিতে চলব, আল্লাহ পাকও আমার সাথে ঐ নীতিতে চলবেন। একথা বিভিন্ন হাদীছে বলা হয়েছে। এক হাদীছে বলা হয়েছে,

مَنْ غَفَرَ غُفِرَ لَهُ.

অর্থাৎ, যে অন্যকে ক্ষমা করে, আল্লাহও তাকে ক্ষমা করেন। আর এক হাদীছে বলা হয়েছে,

مَنْ كَانَ فِيْ حَاجَةِ اَخِيْهِ كَانَ اللّٰهُ فِيْ حَاجَتِهِ. (كشف الخفاء عن مكارم الاخلاق للخرائطي وعن الخطيب)

অর্থাৎ, যে অন্যের সাহায্যে এগিয়ে আসে, আল্লাহও তার সাহায্যে এগিয়ে আসেন। আরেক হাদীছে বলা হয়েছে,

مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا فِي الدُّنْيَا سَتَرَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ. (رواه أحمد في مسنده برقم ١٧٠٠٠ والحديث صحيح)

অর্থাৎ, যে অন্যের দোষ গোপন করে, আল্লাহও দুনিয়া এবং আখেরাতে তার দোষ গোপন করেন। রাসূল (সা.) আরও ইরশাদ করেছেন,

وَاللّٰهُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِيْ عَوْنِ اَخِيْهِ. (رواه مسلم في صحيحه برقم ٧٠٢٨)

অর্থাৎ, বান্দা যতক্ষণ আরেক বান্দার সাহায্যে থাকে, আল্লাহ তা'আলাও তার সাহায্যে থাকেন।

এসব হাদীছে বোঝানো হয়েছে বান্দার সাথে বান্দার মোয়ামালা যেমন হবে, আল্লাহ পাকও তার সাথে ঐ রকম মোয়ামালা করবেন। অতএব আমি অন্যের প্রতি হিংসা করে তার অকল্যাণ চাইলে আল্লাহ পাকও আমার অকল্যাণ করবেন।

এ ছাড়াও হাছাদের আরও বহু ক্ষতি রয়েছে। হাছাদকারী ব্যক্তির দুআ কবুল হয় না। হাছাদের কারণে নেক আমল নষ্ট হয়ে যায় এবং আল্লাহর ক্রোধের পাত্র হতে হয়। হাদীছে ইরশাদ হয়েছে,

اِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ، فَاِنَّ الْحَسَدَ يَاْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَاْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ. (رواه ابو داؤد في سننه برقم ٤٩٠٥ والحديث ضعيف)

অর্থাৎ, তোমরা হাছাদ থেকে বেঁচে থাক। কারণ হাছাদ নেকীকে খেয়ে ফেলে, যেমন আগুন লাকড়ীকে খেয়ে ফেলে।

এটা হল হাছাদের পরকালীন ক্ষতি। হাছাদের কারণে দুনিয়াতেও মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হিংসুক ব্যক্তিকে কেউ পছন্দ করে না, হিংসুক ব্যক্তি চিরকাল মনের কষ্টে কাল যাপন করতে থাকে, জীবনে কখনও মনে শান্তি পায় না। কারণ সারাক্ষণ সে অন্যের ভাল কিছু দেখে মনের মধ্যে যন্ত্রণাবোধ করতে থাকে, অশান্তিবোধ করতে থাকে। আর যেহেতু অন্য সকল মানুষের ভাল সবকিছু ধ্বংস হওয়া সম্ভব নয়, তাই হিংসুক ব্যক্তির মনে শান্তি আসাও সম্ভব নয়। হিংসুক সর্বদাই নিজের হিংসার আগুনে নিজেই জ্বলতে থাকে।

ফকীহ আবুল লাইছ সমরকন্দী বলেছেন, হিংসার চেয়ে ক্ষতিকর আর কিছু নেই। কারণ যার প্রতি হিংসা করা হয় তার পূর্বে স্বয়ং হিংসুক এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। হিংসুক তার হিংসার কারণে পাঁচ ধরনের শাস্তি ভোগ করে থাকে।

১ নং হল : সারাক্ষণ দুশ্চিন্তা।

২ নং হল : এটা এমন এক যন্ত্রণা, যার বিনিময়ে কোন ছওয়াব পাওয়া যায় না।

৩ নং হল : এটা এমন এক দোষ, যার কারণে সকলের নিন্দা কুড়াতে হয়, কেউ এর প্রশংসা করে না।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

৪ নং হল : এর কারণে আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি আসে।

৫ নং হল : এর কারণে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাওফীকের দরজা বন্দ হয়ে যায়।

মনের ভিতর হিংসা রেখে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করা যায় না, আল্লাহ্‌র তাওফীক অর্জন করা যায় না, আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দা হওয়া যায় না। যারা আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দা তাঁরা কারও প্রতি হিংসা বা পরশ্রীকাতরতা রাখেন না। এক হাদীছে এসেছে,

হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) বয়ান করেন। এক দিন আমরা রাসূল (সা.)-এর দরবারে বসেছিলাম। ইতিমধ্যে একজন লোক মসজিদে প্রবেশ করল। রাসূল (সা.) বললেন, তোমরা দেখে রাখ একজন জান্নাতী লোক মসজিদে প্রবেশ করছে। আমরা খুব খেয়াল করে বাখলাম কে মসজিদে প্রবেশ করল। যখন মজলিস ভেঙ্গে গেল, আমি সেই লোকটার সাথে সাথে তার বাসা পর্যন্ত গেলাম। যেয়ে বললাম ভাই, আপনার বাসায় আমি দুই-তিন দিন থাকতে চাই, অনুমতি দিন। উদ্দেশ্য দুই-তিন দিন থেকে দেখবেন তার কী বিশেষ আমল রয়েছে, যে আমলের কারণে রাসূল (সা.) সকলের সামনে ভরা মসজিলে তাঁর জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ দিলেন। আমি রাত্রের বেলা তাঁর বাড়ীতে থাকলাম। সারারাত জেগে রইলাম দেখি তিনি রাতের বেলা উঠে কী পরিমাণ তাহাজ্জুদ নামায পড়েন বা বিশেষ কোন আমল করেন কি-না। কিন্তু সারা রাত জেগে থেকে দেখলাম তিনি কোন নামায পড়লেন না। তবে ফজরের আযানের সাথে সাথে জামাআতে চলে গেলেন। দেখলাম তিনি পাঁচ ওয়াক্তের নামায যত্নের সাথে মসজিদে গিয়ে আদায় করেন, আর চুপ-চাপ থাকেন, মানুষের সাথে কথা-বার্তা কম বলেন। তিন দিন এভাবে চলে গেল। এর মধ্যে তাঁর বিশেষ কোন আমল দেখতে পেলাম না। তিন দিন পর আমি তাঁকে বললাম ভাই! রাসূল (সা.) আপনার জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন। তাই আমি আপনার কাছে এসেছিলাম আপনার বিশেষ কোন আমল আছে কি-না তা দেখার জন্য। যার কারণে আপনি জান্নাতের সুসংবাদ পেয়ে গেলেন। কিন্তু তেমন কিছু বুঝতে পারলাম না। তখন তিনি বললেন, আমার বিশেষ তেমন কোন আমল নেই। রাসূল (সা.) যদি সুসংবাদ দিয়ে থাকেন, সেটা আমার প্রতি আল্লাহ পাকের এহসান। নতুবা আমার এমন বিশেষ কোন আমল নেই। তবে জীবনে সব সময় আমি একটা আমল খুব যত্নের সাথে করে থাকি। সেটা হল কাউকে আমি হিংসা করি না। কারও প্রতি আমার হিংসা-বিদ্বেষ হয় না। আল্লাহ তা'আলা আমার মনকে হিংসা-বিদ্বেষ থেকে পাক-ছাফ রেখেছেন। এক রেওয়ায়েতে এসেছে এই লোকটা হলেন হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.)। রাসূল (সা.) যে দশজন মানুষকে দুনিয়াতেই জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন তাঁদেরকে বলা হয় আশারায়ে মুবাশ্‌শারা, অর্থাৎ জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশ ব্যক্তি। এই আশরায়ে মুবাশ্‌শারার একজন হলেন হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.)।

তবে একটা কথা উল্লেখ করতে হয়। তা হল– কারও ভাল কিছু দেখে সেটা ধ্বংসের কামনা করলাম না বরং শুধু নিজের জন্য অনুরূপ হয়ে যাওয়ার কামনা করলাম, এটা নিষেধ নয়। এরূপ কামনা করার ক্ষেত্রে মাসআলা হল– সেটা ওয়াজিব পর্যায়ের বিষয় হলে এরূপ কামনা করা ওয়াজিব, মুস্তাহাব পর্যায়ের হলে মুস্তাহাব, আর মোবাহ পর্যায়ের হলে মোবাহ। যেমন– একজন মানুষ ভাল নেককার পরহেযগার হয়েছে, আমিও কামনা করলাম যেন আমি তার মত নেককার হতে পারি। কিংবা একজন মানুষ তার ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করে অনেক ছওয়াবের অধিকারী হচ্ছে, তা দেখে কামনা জাগল যে আমিও যদি এরকম ধন-সম্পদের মালিক হতাম, তাহলে আমিও তার মত ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করে অনেক ছওয়াবের অধিকারী হতে পারতাম। এটা নিষেধ নয় বরং জরুরী বা উত্তম। এটাকে

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



হাছাদ নয় বরং গেবতা বলা হয়। হাছাদ বলা হয় অন্যের ভাল কিছু দেখে সেটা নষ্ট হওয়ার কামনা করা। অন্যের ভাল কিছু দেখে সেটা নষ্ট হওয়ার কামনা না করে শুধু নিজের জন্য অনুরূপ কামনা করা হলে সেটাকে হাছাদ বলা হয় না; বরং সেটা হল গেবতা। হাছাদ বা হিংসা করা নিষেধ, গেবতা করা নিষেধ নয়। এজন্যেই হাদীছে ইরশাদ হয়েছে,

لَاحَسَدَ اِلَّا فِيْ اِثْنَيْنِ. رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلٰى هَلَكَتِهٖ فِى الْحَقِّ، وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِيْ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا. (صحيح البخاري ١٤٠٩ وصحيح مسلم ١٩٣٣)

অর্থাৎ, দুই ধরনের ব্যক্তির প্রতি হিংসা করা যায়। এক ব্যক্তি হল– যাকে আল্লাহ তা'আলা ধন-সম্পদ দান করেছেন, আর সে ব্যক্তি ঐ ধন-সম্পদ অকাতরে দ্বীনের কাজে ব্যয় করে। আরেক ব্যক্তি হল– যাকে আল্লাহ তা'আলা ধর্মীয় জ্ঞান দান করেছেন, আর সে ঐ ধর্মীয় জ্ঞান অনুযায়ী সবকিছুর ফয়সালা করে এবং অন্যদেরকে সেই ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষা দেয়। এ হাদীছে হিংসা বলে গেবতাকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, কারও নেক আমল দেখে নিজের জন্যেও অনুরূপ হওয়ার কামনা করা যায়, সেরূপ কামনা করা নিষেধ নয়, বরং তা উত্তম।

বুযুর্গানে দ্বীন কুরআন হাদীছের আলোকে বলেছেন হিংসা দূর করার বেশ কয়েকটি পদ্ধতি রয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটি পদ্ধতি হল–

১ নং পদ্ধতি : কারও কোন বিষয়ে হিংসা লাগলে যখনই মনের ভিতরে সে বিষয়ের ক্ষতির চিন্তা আসবে, তখন এই দুআ করতে হবে যে, হে আল্লাহ! অমুকের এই বিষয়টা বা এই গুণটা আরও বৃদ্ধি করে দাও। এরূপ করলে হিংসার চিন্তা মারাত্মকভাবে আঘাত প্রাপ্ত হবে। এভাবে আঘাত দিতে থাকলে হিংসার হুশ ফিরে আসবে, মন থেকে হিংসার চিন্তা শেষ হয়ে যাবে। যেমন একজনের আর্থিক উন্নতি দেখে আমার মনে হিংসা জাগল, তাহলে তখনই এই দু'আ করব যে, হে আল্লাহ! তুমি তার সম্পদ আরও বৃদ্ধি করে দাও। কিংবা কারও সুখ-শান্তি দেখে হিংসা লাগল, তাহলে এই দু'আ করব যে, হে আল্লাহ! তুমি তার সুখ-শান্তি আরও বৃদ্ধি করে দাও। কারও মেয়ের খুব ভাল ঘরে বিবাহ হতে যাচ্ছে দেখে হিংসা লাগলে এরূপ দু'আ করব যে, হে আল্লাহ! তুমি এই ঘরে এই মেয়েটার বিবাহ সুচারুরূপে সম্পন্ন করে দাও। এরূপ করতে থাকলে মন থেকে হিংসার রোগ দূর হয়ে যাবে। মন থেকে হিংসা দূর করার এটাই হল সব থেকে সহজ পদ্ধতি।

২ নং পদ্ধতি : যার প্রতি হাছাদ বা হিংসা হয়, মনে না চাইলেও লোক সমাজে তার প্রশংসা করতে হবে। এরকম করলে অন্য লোকের ক্ষতির চিন্তা অর্থাৎ হিংসার চিন্তা মন থেকে দূর হতে থাকবে।

৩ নং পদ্ধতি : মনে না চাইলেও যার প্রতি মনে হিংসা জাগে, তার সাথে দেখা হলে তাকে সালাম করতে হবে, তার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা দেখাতে হবে এবং তার সাথে নম্র ব্যবহার করতে হবে। সালামের দ্বারা মহব্বত বৃদ্ধি পায়। আর মহব্বত বৃদ্ধি পেলে হিংসা দূর হয়ে যাবে। তাই হিংসা দূর করার জন্য যার প্রতি হিংসা হয় তাকে বেশি বেশি সালাম করতে হবে। একটা দীর্ঘ হাদীছের শেষ ভাগে রাসূলে পাক (সা.) ইরশাদ করেন,

اَوَلَا اَدُلُّكُمْ عَلٰى شَيْئٍ اِذَا فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَبْتُمْ اَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ. (رواه مسلم في صحيحه برقم ٢٠٣)

অর্থাৎ, আমি কি তোমাদেরকে এমন একটা জিনিস বলে দিব যার দ্বারা তোমাদের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টি হবে? সেটা হল তোমরা নিজেদের মধ্যে বেশি বেশি সালাম আদান-প্রদান কর।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বয়ান নং ৩৯-এর খুতবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَرْشَدَنَا اِلٰى سَبِيْلِ السَّدَادِ، اَحْمَدُهٗ حَمْدًا كَثِيْرًا يُنَجِّيْنَا يَوْمَ التَّنَادِ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَلَيْسَ لَهٗ اَمْثَالٌ وَّاَنْدَادٌ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ذُو الْعِصْمَةِ مِنَ الْاَحْقَادِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَعَلٰى اَصْحَابِهِ الرُّحَمَآءُ فِيْمَا بَيْنَهُمْ ذُو الْحُبِّ وَالْوَدَادِ.

اَمَّا بَعْدُ :

اَيُّهَا النَّاسُ ! اِنَّ مِنْ اَمْرَاضِ الْقُلُوْبِ اَلْحَسَدُ وَالْحِقْدُ، وَهُمَا دَاءَانِ مُهْلِكَانِ، وَقَدْ جَاءَ الْوَعِيْدُ عَلَيْهِمَا فِى السُّنَّةِ وَالْقُرْاٰنِ، فَاتْرُكُوا الضَّغَآئِنَ مِنْ قُلُوْبِكُمْ وَالْاَحْقَادَ، وَعِيْشُوْا بِصِدْقِ الْحُبِّ وَالْوَدَادِ . وَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِاَنْ يَّعِيْشُوْا بِالْمَوَدَّةِ وَالْاُخُوَّةِ، فَقَالَ : اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ، فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ، وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ. وَقَالَ تَعَالٰى : اَلْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. وَ اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ التَّحَاسُدِ وَالتَّبَاغُضِ وَالتَّقَاطُعِ وَالتَّبَاعُدِ. وَفِى الصَّحِيْحَيْنِ مِنْ حَدِيْثِ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهٗ قَالَ : لَا تَبَاغَضُوْا وَلَا تَفَاخَرُوْا وَلَا تَحَاسَدُوْا وَلَا تَدَابَرُوْا، وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا. وَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلْمُسْلِمُوْنَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ، اِنِ اشْتَكٰى عَيْنُهٗ اِشْتَكٰى كُلُّهٗ، وَاِنِ اشْتَكٰى رَأْسُهٗ اِشْتَكٰى كُلُّهٗ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ، فَاِنَّ الْحَسَدَ يَاْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَاْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ فِىْ كِتَابِ الْاَدَبِ. وَفِىْ حَدِيْثٍ اٰخَرَ – لَا

www.maktabatulabrar.com



সালামের দ্বারা মহব্বত বৃদ্ধি পায়। কেননা সালামের মধ্যে কল্যাণ কামনা করা হয়। "আসসালামু আলাইকুম ওরহমাতুল্লাহ-এর অর্থ হল আল্লাহ তোমাকে শান্তি দান করুন। এভাবে সালামের অর্থ বুঝে সালাম দিলে এবং সালাম নিলে উভয় পক্ষের মনেই অপর পক্ষের প্রতি কল্যাণকামিতার মনোভাব জাগ্রত হবে। আর এরূপ মনোভাব জাগ্রত হলেই হিংসার মনোভাব দূর হবে।

৪ নং পদ্ধতি : যার প্রতি মনে হিংসা জাগে, মাঝে মধ্যে তাকে হাদিয়া প্রদান করতে হবে। হাদিয়া দ্বারা মনের হিংসা-বিদ্বেষ এবং কালিমা দূর হয়ে যায়। হাদীছে ইরশাদ হয়েছে,

تَهَادَوْا فَاِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصُّدُوْرِ. (رواه الترمذي في سننه برقم ٢١٣٠ وقال غريب)

অর্থাৎ, তোমরা একে অপরকে হাদিয়া আদান-প্রদান কর, কেননা হাদিয়া মনের কালিমাকে দূর করে দিবে।

এ হাদীছে উভয় পক্ষকে হাদিয়া দিতে বলা হয়েছে। শুধু একজন আমাকে হাদিয়া দিয়ে যেতে থাকল আর আমি সেটা গ্রহণ করে যেতে থাকলাম তা নয়। বরং আমিও তাকে হাদিয়া দিব। এভাবে যার প্রতি আমার হিংসা হয়, তাকে যখন আমি হাদিয়া দিব আর সেও আমাকে হাদিয়া দিবে, তাহলে তার প্রতি আমার মনের কালিম দূর হয়ে যেতে থাকবে।

৫ নং পদ্ধতি : কারও কোন বিষয়ের প্রতি হিংসা জাগলে এ কথা চিন্তা করা দরকার যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকেও এমন অনেক কিছু দিয়েছেন যা ঐ ব্যক্তিকে দেননি। কাজেই আমারটা দেখে যখন সে হিংসা করছে না, আমারও উচিত তারটা দেখে হিংসা না করা। আল্লাহ পাক যাকে যেটা দিয়েছেন তার মধ্যেই হেকমত রয়েছে। আল্লাহর এই হেকমতের বিরুদ্ধে কামনা করা ঠিক নয়। হযরত হাছান বসরী (রহ.) বলতেন, হে বনী আদম! তোমার ভাইয়ের প্রতি হিংসা কর কেন? যদি আল্লাহ তাকে সম্মান দান করার জন্য কিছু দিয়ে থাকেন তাহলে কেন তুমি এমন লোকের প্রতি হিংসা করবে, আল্লাহ যাকে সম্মান দিতে চান? আর যদি সে এমন লোক হয়ে থাকে ,যাকে আল্লাহ সম্মান দিতে চান না, তাহলে এমন লোকের প্রতি হিংসা করে কী হবে, যার পরিণাম জাহান্নাম?

তাছাড়া এটাও মনে রাখা দরকার যে, কোন ভাল লোকের ভাল কিছু দেখে হিংসা করে আমি তার সেই নেয়ামত দূর করতে পারব না। আর খারাপ লোক হলে তার প্রতি আমার হিংসা করার প্রয়োজনই বা কি? তার পরিণতি তো এমনিতেই খারাপ। হযরত মুহাম্মাদ ইব্নে সিরীন (রহ.) বলতেন, আমি কারও কিছু দেখে হিংসা করি না। কারণ সে হয় জান্নাতী লোক হবে, তাহলে তার প্রতি হিংসা করে লাভ কী? সে তো জান্নাতী হবেই কিংবা সে জাহান্নামী হবে, তাহলে তার প্রতি হিংসা করে তার আর কী ক্ষতি করব? সে তো এমনিতেই চরম ক্ষতির সন্মুখীন কেননা সে জাহান্নামী!

এভাবে চিন্তা করতে থাকলে এবং এসব পদ্ধতিগুলো গ্রহণ করতে থাকলে ধীরে ধীরে মন থেকে হাছাদ বা হিংসা রোগ দূর হতে থাকবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা আমাদের মন থেকে হিংসা রোগকে দূর করে দেন। আমাদের মধ্যে মানুষের প্রতি কল্যাণকামিতার মনোভাব পয়দা করে দেন। আমীন!

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.
Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

حَسَدَ اِلَّا فِیْ اِثْنَیْنِ، رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَسَلَّطَهٗ عَلٰی هَلَكَتِهٖ فِی الْحَقِّ، وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ یَقْضِیْ بِهَا وَیُعَلِّمُهَا.

عِبَادَ اللّٰهِ! اِنَّ اٰفَةَ الْحَسَدِ وَالْحِقْدِ كَثِیْرٌ وَهُوَ یَقْطَعُ الْمَوَدَّةَ، وَ یُبَدِّلُ الْحُبَّ بِالْعَدَاوَةِ، وَیَاْكُلُ الْحَسَنَةَ دُوْنَ السَّیِّئَةِ، فَتَذَكَّرُوْا حِیْنَئِذٍ مَا قَالَ نَبِیُّ الرَّحْمَةِ وَالشَّفَقَةِ : لَا تَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰی تُؤْمِنُوْا، وَلَا تُؤْمِنُوْا حَتّٰی تَحَابُّوْا، اَوَلَا اَدُلُّكُمْ عَلٰی شَیْئٍ اِذَا فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَبْتُمْ؟ اَفْشُوا السَّلَامَ بَیْنَكُمْ. وَقَالَ عَلَیْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ : تَهَادَوْا، فَاِنَّ الْهَدِیَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصُّدُوْرِ. وَقَالَ صُلَحَآءُ الْاُمَّةِ : مَنْ كَانَ فِیْ قَلْبِهٖ حَسَدٌ لِاَحَدٍ، فَعَلَیْهِ اَنْ یَّدْعُوَ لَهٗ لِیَزْدَادَ فِی الْاَمْرِ الْمَحْسُوْدِ.

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ : اَمْ یَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلٰی مَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ.

بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِی الْقُرْاٰنِ الْعَظِیْمِ، وَنَفَعَنَا وَاِیَّاكُمْ بِالْاٰیَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِیْمِ. اَقُوْلُ قَوْلِیْ هٰذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ لِیْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِیْنَ وَاسْتَغْفِرُوْهُ، اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



বয়ান নং -৪০

## গীবত : একটি মারাত্মক গোনাহ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ وَخَاتَمِ النَّبِیِّیْنَ، وَعَلٰی اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِیْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی : اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ : وَ لَا یَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا اَیُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ یَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِیْهِ مَیْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِیْمٌ. وَقَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: اَلْغِیْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

আজ আমরা একটা মারাত্মক গোনাহ সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই। সেটা হল গীবত। গীবত বলা হয় কাউকে হেয় করে তোলার উদ্দেশ্যে তার পশ্চাতে তার প্রকৃত দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা।

আমরা অনেক সময় বলে থাকি যে, যা সত্য তাই বলছি, তাহলে গীবত হবে কেন? কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়, যা সত্য তা-ই যদি পশ্চাতে বলা হয় তাকে বলে গীবত। আর প্রকৃতপক্ষে সেই দোষ তার মধ্যে না থাকলে সেটাকে বলে বোহতান, যা গীবতের চেয়েও বড় গোনাহ, ডবল গোনাহ। এক হল গীবত বা সমালোচনা করার গোনাহ, আরেক হল মিথ্যা বলার গোনাহ। এক হাদীছে গীবত এবং বোহ্তানের এরকম পরিচয় দেয়া হয়েছে। রেওয়ায়েতটি এরকম– এক সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন,

مَاالْغِیْبَةُ یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ ذِكْرُكَ اَخَاكَ بِمَا یَكْرَهُ قَالَ اَرَاَیْتَ اِنْ كَانَ فِیْ اَخِیْ مَا اَقُوْلُ؟ قَالَ اِنْ كَانَ فِیْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ اِغْتَبْتَهٗ وَاِنْ لَّمْ یَكُنْ فِیْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ بَهَّتَّهٗ. (رواه ابو داود برقم ٤٨٧٦ ومسلم ٦٧٥٨)

অর্থাৎ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! গীবত কী? রাসূল (সা.) বললেন, 'তোমার কোন ভাইয়ের পশ্চাতে তার দোষ-বদনাম বর্ণনা করা'। সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি বাস্তবেই তার মধ্যে সে দোষ থাকে'? রাসূল (সা.) বললেন, 'যদি বাস্তবেই তার মধ্যে সেই দোষ থাকে, তাহলে তো গীবত হবে। আর যদি বাস্তবে তার মধ্যে সেই দোষ না থাকে, তাহলে সেটা হবে বোহতান'।

গীবত করা হারাম, যেনার চেয়েও গুরুতর কবীরা গোনাহ। নবী কারীম (সা.) ইরশাদ করেছেন,

اَلْغِیْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا. (رواه البیهقي في شعب الإیمان برقم ٦٧٤١)

অর্থাৎ, গীবত করা যেনার চেয়েও গুরুতর।

গীবত করা এত মারাত্মক গোনাহ, অথচ আমরা এটাকে গোনাহই মনে করি না। আমাদের কোন মজলিস গীবত থেকে খালি যায় না। দুই চারজন এক সাথে বসে কথা শুরু করলেই, ব্যস গীবত শুরু হয়ে যায়। আর কোন গীবত না হলেও অন্তত কোন রাজনৈতিক দলের গীবত তো হবেই। প্রতিপক্ষ দলের গীবত না করলে যেন আমাদের পেটের ভাত হজম হয় না। মনে রাখতে হবে রাজনৈতিক গীবতও গীবত। এটাতেও গীবতের গোনাহ হবে। অথচ আমরা কোন গীবতকেই যেন গোনাহ মনে করছি না। বরং খুব মজা করে গীবত করতে থাকি। একজন রসিক মন্তব্য করেছেন গীবত যেন এখন ঘি-ভাত হয়ে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ, ঘি-ভাত খেতে যেরকম মজা লাগে, গীবত করতেও আমাদের ওরকম মজা লাগে।

কোন গোনাহকে গোনাহ মনে না করা মারাত্মক গোনাহ। কোন গোনাহকে গোনাহ মনে করা সত্ত্বেও যদি কেউ সেই গোনাহ করে, তাহলে তার মনের ভিতর সেই গোনাহের জন্য অনুশোচনা থাকে, ফলে

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

একদিন না একদিন সেই গোনাহের জন্য সে তওবা করে নিতে পারে। কিন্তু কোন গোনাহকে যদি কেউ গোনাহই মনে না করে, তাহলে সেই গোনাহের জন্য তার মনে কোন অনুশোচনা থাকে না। ফলে ঐ গোনাহ থেকে তার কোন দিন তওবা করা হয়ে ওঠে না। ঐ পাপ নিয়েই সে কবরে চলে যায়। এ কারণে গোনাহকে গোনাহ মনে না করা খুবই মারাত্মক ব্যাপার।

গীবত করার অনেক ক্ষতি, গীবতের শাস্তি খুব সঙ্গীন। হাদীছে এসেছে,

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: لَمَّا عُرِجَ بِيْ مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ اَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمِشُوْنَ بِهَا وُجُوْهَهُمْ وَصُدُوْرَهُمْ. قُلْتُ مَنْ هٰؤُلَآءِ؟ قَالَ هٰؤُلَآءِ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ لُحُوْمَ النَّاسِ وَيَقَعُوْنَ فِيْ اَعْرَاضِهِمْ. (ابو داود في سننه برقم ٤٨٨٠ والحديث صحيح)

অর্থাৎ, হযরত আনাছ (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, যখন মে'রাজের সময় আমাকে আসমানে তুলে নেয়া হয়, তখন আমি এমন এক দল লোকের কাছ দিয়ে অতিক্রম করি, যাদের নখ ছিল তামার, তারা নিজেদের নখ দ্বারা নিজেদের চেহারা ও সীনা খামছে খামছে ছিড়ছিল। আমি হযরত জিব্রাঈল (আ.)কে জিজ্ঞাসা করলাম এরা কারা? তিনি বললেন, এরা ঐ সমস্ত লোক, যারা মানুষের গোশত খেত অর্থাৎ, মানুষের গীবত করত এবং মানুষের ইজ্জতের উপর হামলা করত।

গীবতের আর একটা ক্ষতি হল - যারা গীবত করে, তাদের দু'আ কবুল হয় না। তাই গীবত বর্জন করতে হবে। গীবত করলে যার গীবত করা হয় তার আমলনামায় গীবতকারীর ছওয়াব চলে যায় এবং তার গোনাহ গীবতকারীর আমলনামায় চলে আসে। এ জন্যেই হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলতেন যদি কারও গীবত করতেই হয়, তাহলে মা-বাপের গীবত কর! কথাটা একটু বুঝতে হবে। এ কথার অর্থ হল, যেহেতু গীবত করলে আমি যার গীবত করব, আমার নেকী তার আমলনামায় চলে যাবে এবং তার গোনাহ আমার আমলনামায় চলে আসবে, এজন্যেই তিনি বলতেন যদি একান্তই কারও গীবত করতে হয়, তাহলে পিতা-মাতার গীবত কর। তাহলে অন্তত তোমার ছওয়াব অন্যের আমলনামায় না গিয়ে তোমার পিতা-মাতার আমলনামায় গেল।

গীবতের আর একটা ক্ষতি হল –গীবত করলে যার গীবত করা হয় তার আমলনামায় গীবতকারীর ছওয়াব চলে যায়, এ জন্যেই হযরত হাছান বসরী (রহ.) যার নাম আমরা অনেকে শুনেছি। তিনি অনেক বড় বুযুর্গ ছিলেন। তিনি কখনও যদি শুনতেন যে, অমুকে আমার গীবত করেছে, তাহলে তার কাছে প্লেট ভরে ফল-ফ্রুট মিষ্টি মিঠাই হাদিয়া পাঠিয়ে দিতেন। তিনি বলতেন মাশাআল্লাহ তিনি আমার অনেক উপকার করেছেন, এত কষ্ট করে ছওয়াব অর্জন করে তিনি আমাকে সেই ছওয়াব দিয়ে দিয়েছেন। তাই তার উদ্দেশ্যে মিষ্টি পাঠিয়ে দিতেন।

বুঝা গেল নিজের দু'আ কবুল করার স্বার্থে এবং নিজের ছওয়াব হেফাযত করার স্বার্থে গীবত থেকে বিরত থাকা প্রয়োজন। গীবত বর্জন করা ছাড়া আল্লাহ ওয়ালা হওয়া কঠিন।

বহু বুযুর্গ এমন চলে গেছেন, যারা জীবনে কোনোদিন কারও গীবত-শেকায়েত করেননি। হযরত হাছান বসরী (রহ.) কারও গীবত করতেন না। ইমাম মুসলিম (রহ.) সম্পর্কে ইতিহাস রয়েছে তিনিও জীবনে কারও গীবত-শেকায়েত করেননি। হযরত হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহ.)ও জীবনে কারও গীবত-শেকায়েত করেননি।

ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর সময়কার একজন বড় মুহাদ্দিছ ছিলেন সুফিয়ান ছাওরী (রহ.)। এই সুফিয়ান ছাওরী (রহ.)কে একদিন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল ইমাম আবূ হানীফা সম্পর্কে আপনি একটু

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



মন্তব্য করুন, তিনি কেমন ব্যক্তি। তখন সুফিয়ান ছাওরী (রহ.) বললেন, ইমাম আবু হানীফা একজন চরম বখিল ব্যক্তি। অথচ ইমাম আবূ হানীফা বখিল ছিলেন না। তিনি অনেক বড় মালদার ছিলেন। কুফার ভিতরে সবচেয়ে বড় ব্যবসা ছিল তার। তার সম্পদও ছিল প্রচুর। দান-খয়রাতও করতেন প্রচুর। অথচ সুফিয়ান ছাওরী (রহ.) বললেন যে, তিনি চরম বখিল লোক। একথা শুনে প্রশ্নকারী লোকটা বলল হুজুর! বলেনকি তাঁকে তো আমরা বড় দানশীল লোক বলে জানি! অথচ আপনি বলছেন চরম বখিল। তখন সুফিয়ান ছাওরী বললেন, আপনি আমার কথার অর্থ বোঝেননি। ইমাম আবূ হানীফা জীবনে কোনোদিন কারও গীবত করেন না। তিনি কাউকে নিজের ছওয়াব দিতে রাজি না। কারও গীবত শেকায়েত করে কাউকে নিজের একটু ছওয়াবও দিতে রাজি নন। এই অর্থে আমি বলেছি তিনি চরম বখিল।

আমরা এই ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মাযহাবের অনুসারী। তিনি আমাদের ইমাম। অর্থাৎ তিনি যেভাবে কুরআন-হাদীছ বুঝে মাসআলা-মাসায়েল বলে গেছেন, আমরা তার অনুসরণ করি। কারণ তিনি আমাদের চেয়ে কুরআন-হাদীছ ভাল বুঝতেন। তাই তিনি যেভাবে কুরআন-হাদীছ থেকে মাসআলা-মাসায়েল চয়ন করে গেছেন, আমরা সেটাকে নির্ভরযোগ্য মনে করি এবং সেগুলোর অনুসরণ করি। সেগুলোকে অনুসরণ করাকেই বলা হয় তাঁর মাযহাব অনুসরণ করা।

অনেকে মাযহাব বিষয়টা ভাল করে বোঝেন না। তাই তারা বলেন এক আল্লাহ, এক নবী, এক কুরআন- হাদীছ, তাহলে এত মযহাব কেন? কিন্তু মাযহাব কুরআন-হাদীছের বাইরে কিছু নয়। একজন যোগ্য ব্যক্তি যেভাবে কুরআন-হাদীছ বুঝে মাসআলা মাসায়েল বলছেন সেটার অনুসরণ করাকেই বলা হয় তার মাযহাব অনুসরণ করা। যেমন– একজন সাধারণ মুসল্লি যিনি সরাসরি কুরআন-হাদীছ থেকে মাসআলা-মাসায়েল বের করতে পারেন না, তিনি তার মসজিদের ইমাম সাহেব বা ব্যক্তিগত হুজুর যেভাবে মাসআলা বলেন সেভাবেই সব কিছু করেন। এখানে কেউ এ কথা বলে না যে, ইমাম সাহেবের কথা মানব কেন, কুরআন-হাদীছের কথাই মানব? এরকম কেউ বলে না। কারণ তারা জানে ইমাম সাহেব নিজের থেকে কিছু বলেন না। বরং যারা বোঝে না, তাদেরকে তিনি কুরআন হাদীছ থেকেই বোঝান। তাই ইমাম সাহেবকে মানা মূলত কুরআন-হাদীছকেই মানা। তদ্রূপ মাযহাব অনুসরণ করা কুরআন-হাদীছেরই অনুসরণ করা। যারা ইমাম আবূ হানীফার ব্যাখ্যা মেনে চলছেন, তাদেরকে বলা হয় তারা হানাফী মাযহাব অনুসরণ করেন। যারা ইমাম শাফিঈ (রহ.)-এর ব্যাখ্যা অনুসরণ করেন তাদেরকে বলা হয় শাফেঈ। যারা ইমাম মালেক (রহ.)-এর ব্যাখ্যা অনুসরণ করেন, তাদেরকে বলা হয় মালেকী। যারা ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর ব্যাখ্যা অনুসরণ করেন, তাদেরকে বলা হয় হাম্বলী। এই চার জন ইমামের ব্যাখ্যা পৃথিবীতে ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য হয়েছে বলে আমরা চার মাযহাবের কথা শুনে থাকি। এই সব মাযহাবই হক। এসব মাযহাব মানা মূলত কুরআন-হাদীছকেই মানা। যাহোক আমাদের ইমাম হলেন হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)।

এই ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) অনেক উঁচু পর্যায়ের বুযুর্গ ছিলেন। তিনি ৪০ বৎসর একাধারে ইশার উযূ দিয়ে ফজরের নামায পড়েছেন। ইশার পর সেই উযূতে তাহাজ্জুদে দাঁড়িয়ে যেতেন, ফজরের ওয়াক্ত পর্যন্ত তাহাজ্জুদে লিপ্ত থাকতেন। তারপর ফজরের নামায পড়তেন। এভাবে ৪০ বৎসর ইশার উযূ দিয়ে ফজরের নামায আদায় করেছেন। তিনি জীবনে কারও কোন গীবত করতেন না। কেউ কোনোদিন তাঁকে কারও গীবত করতে শোনেনি।

গীবত করার একটা সামাজিক বড় ক্ষতি হল– যার গীবত করা হয়, সমাজে তার মান-সম্মান ধ্বংস করে দেয়া হয়। মানুষের কাছে তাকে হেয় করে তোলা হয়। একজন মানুষকে সমাজে হেয় করা, তাকে

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

হত্যা করে দেয়ার চেয়েও খারাপ। কারণ অসম্মানী হয়ে দুনিয়ায় বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই সহজ। গীবত করা দ্বারা মানুষকে এরকম অসম্মানী করে তোলা হয়। তাই গীবত যেন একজন লোককে জীবিত রেখে তাকে মেরে ফেলা। কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে,

وَ لَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ.

অর্থাৎ, তোমাদের একে অপরের গীবত যেন না করে। তোমাদের কেউ কি এটা পছন্দ করবে যে, সে তার মরা ভাইয়ের গোশত চিবিয়ে চিবিয়ে খাবে? তোমরা তো এটা অপছন্দ কর। কাজেই আল্লাহকে ভয় কর। আর যদি গীবতের গোনাহে জড়িয়ে পড়ে থাক, তাহলে তওবা করে নাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তওবা কবুলকারী, দয়ালু। (হুজুরাত: ১২)

রাসূল (সা.)-এর যমানায় দু'জন মহিলা রোযা রেখে খুব কাঁতর হয়ে পড়ল, তাদের অবস্থা মরণাপন্ন হয়ে দাঁড়াল। সাহাবায়ে কেরাম রাসূল (সা.)কে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। রাসূল (সা.) তাদের কাছে একটা পেয়ালা পাঠিয়ে দিলেন যে, এই পেয়ালায় যেন তারা বমি করে। বমি করলে দেখা গেল যে, তাতে গোশতের টুকরা এবং তাজা রক্ত পড়েছে। রাসূল (সা.) বললেন যে, তারা গীবত করেছে, তাই তাদের এই দুরাবস্থা হয়েছে। কোন মুসলমানের গীবত করার অর্থ হল তার মাংস চিবিয়ে খাওয়া, যা কুরআনে বলা হয়েছে। এটা যে বাস্তব, অমূলক নয় -এটা প্রমাণ করার জন্যই হয়তো আল্লাহ পাক এ ঘটনা ঘটিয়ে দেখিয়েছেন।

রাসূল (সা.) বলেছেন, এই গীবত করার কারণেই তাদের রোযায় কষ্ট হচ্ছে। এ থেকে বুঝা গেল– কোন ইবাদত যদি সহীহ্ তরীকায় করা না হয়, তার মধ্যে যদি গলতী এসে যায়, তাহলে সেই ইবাদতে কষ্ট হয়। রোযার যে সহীহ্ তরীকা ছিল, ঐ মহিলারা সেই সহীহ্ তরীকায় রোযা রাখেনি, তারা রোযার মধ্যে গলতী করেছে অর্থাৎ, গীবত করেছে, তাই তাদের রোযায় কষ্ট হয়েছে। আরও অনেক সাহাবী রোযা রেখেছিলেন, তারা তো কেউ কষ্টের অভিযোগ করেননি। তাঁরা সহীহ তরীকায় রোযা রেখেছেন বলে তাদের রোযায় কোন কষ্ট হয়নি। অভিজ্ঞতায়ও দেখা যায় রোযায় মুত্তাকী পরহেযগার মানুষের কোন কষ্ট হয় না, ফাসেক ফাজেরদের কষ্ট হয়।

আমরা যত ইবাদত করি, অনেক সময় খুব কষ্ট লাগে। নামায পড়তে কষ্ট লাগে, রোযা রাখতে কষ্ট লাগে, কুরআন তেলাওয়াত করতে কষ্ট লাগে। ইত্যাদি যতরকম ইবাদত আছে সেগুলো করতে কষ্ট লাগে। এর একটা কারণ এ-ও যে, আমরা ইবাদত সহীহ্ তরীকায় করি না। প্রত্যেকটা ইবাদতকে যদি সহীহ্ তরীকায় করতাম, অর্থাৎ যেভাবে করা কাম্য সেভাবে করতাম, তাহলে তাতে কোন কষ্ট বোধ হত না বরং আরাম বোধ হত।

আমরা অনেকে মনে করি শুধু মুখে বললেই গীবত হয়। কিন্তু তা নয়, মুখে বললেও যেমন গীবত হয়, তদ্রূপ অঙ্গভঙ্গী এবং ইশারা ইঙ্গিতেও গীবত হয়। একবার উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.) হুজুর (সা.)-এর সামনে ছিলেন। তখন কথায় কথায় হযরত সাফিয়া (রা.)-এর আলোচনা এসে গেল। হযরত সাফিয়া ছিলেন হযরত আয়েশা (রা.)-এর সতীন। আর এক সতীনের প্রতি আরেক সতীনের একটু ইয়ে থাকেই। হযরত সাফিয়া (রা.) ছিলেন একটু বেটে। তাই হযরত আয়েশা (রা.) হযরত সাফিয়া-এর আলোচনা করতে গিয়ে হাত দ্বারা ইশারা করে দেখালেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সাফিয়া তো ইয়ে, অর্থাৎ বুঝাতে চাইলেন যে সে খাটো। এভাবে ইশারা দ্বারা গীবত হয়ে গেল। তাই রাসূল (সা.)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



বললেন, আয়েশা! আজ তুমি এমন একটা কাজ করলে, যদি এই আমলের দুর্গন্ধ এবং তার বিষ সমুদ্রে ছেড়ে দেয়া হয়, তাহলে গোটা সমুদ্রের পানি দুর্গন্ধযুক্ত এবং বিষাক্ত হয়ে যাবে। বুঝা গেল ইশারা ইঙ্গিত এবং অঙ্গ ভঙ্গিতেও কারও দোষ প্রকাশ করা গীবত এবং পাপের অন্তর্ভুক্ত।

অনেকে মনে করি শুধু স্বভাব-চরিত্রের দোষ প্রকাশ করাই গীবত। কিন্তু তা নয়। স্বভাব-চরিত্রের দোষ প্রকাশ করা যেমন গীবত, তদ্রূপ জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক, পোষাক-পরিচ্ছদ, শারীরিক গঠন, বংশ ইত্যাদি যেকোন বিষয়ের দোষ বর্ণনাই গীবতের অন্তর্ভুক্ত। গীবত যেমন জীবিত মানুষের হয়, তেমনি মৃত মানুষেরও হয়। ছোট-বড়, মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের দোষ চর্চাই গীবত।

গীবত করা হারাম, কবীরা গোনাহ। তবে কয়েকটা ক্ষেত্রে গীবত করা, অর্থাৎ পশ্চাতে দোষ বলা পাপ নয়। পরিভাষায় সেগুলোকে গীবত বলাও হয় না। যেমন ন্যায্য বিচার প্রার্থনা করতে গিয়ে বিচারকের নিকট প্রতিপক্ষের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করতে হয়। কেউ মনে করতে পারে এটাও গীবত, কিন্তু তা নয়। এতে গীবতের গোনাহ হবে না। তদ্রূপ কাউকে অপরের ক্ষতি থেকে সাবধান করার নিয়তে যদি কিছু বলা হয়, তাতেও গীবতের গোনাহ হবে না। যেমন কোন বাতিল মতবাদপন্থী থেকে লোকদেরকে সাবধান করার উদ্দেশ্যে তার চিন্তাধারার দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করলে তাও গীবত হবে না। এমনিভাবে ছাত্রকে শাসন করানোর জন্য উস্তাদের কাছে ছাত্রের দোষ-ত্রুটি বললে বা গুরুজনের নিকট অধীনস্থদেরকে শাসন করানোর জন্য তাদের দোষ-ত্রুটি উল্লেখ করলে তা গীবতের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

নিজে গীবত করলে যেমন গোনাহ হয়, তেমনিভাবে স্বেচ্ছায় এবং মনোযোগ সহকারে গীবত শুনলেও গীবতের গোনাহ হয়। কাউকে গীবত করতে শুনলে তাকে বাঁধা দেয়া উচিত। না পারলে সেই মজলিস ত্যাগ করতে হবে। যদি সে মজলিস ত্যাগ করা সম্ভব না হয়, তাহলে গীবত শোনা থেকে মনোযোগ হটিয়ে মনে মনে অন্য কিছু ভাবা শুরু করতে হবে বা মনে মনে যিকির-আযকার ইত্যাদিতে লিপ্ত হতে হবে। তাহলেও গীবত শোনার গোনাহ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে।

যদি কখনও কারও থেকে কারও গীবত শোনা হয়ে যায়, কারও গীবত নিজের কানে আসে, তাহলে সেই গীবত শোনার পর এই কয়েকটা কাজ করা উচিত।

১ নং– এ শোনা কথা অন্যের কাছে বর্ণনা না করা।

২ নং– যার দোষ শোনা হল তার দোষ খুঁজতে শুরু না করা।

৩ নং– যার দোষ শোনা হল, তার উপর বদ-গোমানী না করা। বিনা দলীল-প্রমাণে কারও ব্যাপারে বদ-গোমানী করা জায়েয নয়।

৪ নং– পারলে গীবতকারীকে গীবতের অভ্যাস পরিত্যাগ করার পরামর্শ দিতে হবে।

৫ নং– প্রয়োজন মনে করলে আসল ব্যক্তির থেকে জেনে নেয়া যেতে পারে যে, ব্যাপারটা কতদূর সত্য। তবে তাহ্কীক করতে যেয়ে গীবতকারীর নাম উল্লেখ করা উচিত নয়। তাতে ফ্যাসাদ বৃদ্ধি পাবে।

উলামায়ে কেরাম লিখেছেন যদি কেউ কখনও নফ্সের ধোকায় বা বে-খেয়ালীতে কারও গীবত করে বসে, তাহলে নিজে এস্তেগফার করে নিতে হবে, যার গীবত করা হয়েছে তার জন্যও এস্তেগফার করতে হবে আর সম্ভব হলে এবং ভাল মনে করলে যার গীবত করা হয়েছে তার নিকট ওজরখাহী করে নিতে হবে যে, ভাই! অন্যায়ভাবে আপনার গীবত করে বসেছি, আমাকে ক্ষমা করে দিবেন। তবে অনেক সময় এরকম বলতে গেলে হীতে বিপরীত হতে পারে। সে রকম হলে না বলে নিজে নিজেই আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। এবং ভবিষ্যতে আর গীবত না করার প্রতিজ্ঞা করতে হবে। আর গীবত করা দ্বারা

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

সেই ব্যক্তির মান-সম্মানের যে ক্ষতি হয়েছে তা পূরণ করার জন্য যাদের সামনে সেই লোকের গীবত করা হয়েছে তাদের সামনে তার প্রশংসা করতে হবে।

গীবত একটা মনের রোগ। গীবত কেন করা হয় সেটা চিন্তা করলেই বুঝা যাবে যে, এটা মনের রোগ। যেমন কখনও কখনও গীবত করা হয় রাগের কারণে। যার উপর রাগ রয়েছে সেই রাগ চরিতার্থ করার আর কোন পথ না পেয়ে তার দোষ-বদনাম করে মনের ঝাল মিটানোর চেষ্টা করা হয়ে থাকে। কখনও কখনও গীবত করা হয় অহংকারের কারণে। অন্যের চেয়ে নিজেকে বড় করে দেখানোর জন্য অন্যের দোষ-বদনাম করে তাকে ছোট এবং নিজেকে সেই দোষমুক্ত করে দেখানোর চেষ্ট করা হয়ে থাকে। কখন কখনও গীবত করা হয় সম্মানের মোহ থেকে। গীবত বা দোষচর্চা করে অন্যকে অসম্মানী করে নিজেকে সম্মানীত করে দেখানোর প্রচেষ্টা থেকে গীবত করা হয়। আবার কখনও কখনও গীবত করা হয় হিংসা- বিদ্বেষ চরিতার্থ করার জন্যে। কারও প্রতি মনে হিংসা বিদ্বেষ রয়েছে, সেই হিংসা চরিতার্থ করার আর কোন পথ না পেয়ে, অবশেষে তার দোষচর্চা করে মনের হিংসা চরিতার্থ করার পথ ধরা হয়। দেখা গেল মনের বিভিন্ন রোগ থেকেই গীবতের জন্ম হয়ে থাকে। তাই যে কারণে গীবত হয়, সে কারণের চিকিৎসা করা দরকার। সেই কারণটা দূর করলেই গীবত রোগ দূর হবে।

গীবত থেকে বেঁচে থাকার সবচেয়ে সহজ উপায় হল কারও সম্পর্কে কিছু বলতে মনে চাইলে চিন্তা করে নেয়া যে, এটা গীবত হয়ে যাচ্ছে না তো? যদি গীবতের পর্যায়ভুক্ত হয়, তাহলে তাতে গোনাহ হবে- এই চিন্তা করে তা থেকে বিরত থাকা।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে গীবত মুক্ত জীবন গড়ে তোলার তাওফীক দান করুন। আমীন!

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



বয়ান নং ৪০-এর খুতবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَمَرَنَا بِحِفْظِ اللِّسَانِ عَنِ الْغِيْبَةِ، وَهُوَ الَّذِىْ شَرَعَ لَنَا اَنْوَاعًا مِّنَ الْاَحْكَامِ بِالْحِكْمَةِ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ اَلْمُنْفَرِدُ بِالْكِبْرِيَاءِ وَالْعِزَّةِ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ سَيِّدُ اُولِى الْعِصْمَةِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَعَلٰى اَصْحَابِهٖ اُولِى الْعِفَّةِ.

اَمَّا بَعْدُ:

اَيُّهَا النَّاسُ! اِنَّ الْغِيْبَةَ وَالنَّمِيْمَةَ خُلُقَانِ مَذْمُوْمَانِ، وَقَدْ جَاءَ الْوَعِيْدُ عَلَيْهِمَا فِى السُّنَّةِ وَالْقُرْاٰنِ، اَلَا وَاِنَّ اللِّسَانَ اَعْظَمُ الْاَعْضَاءِ ضَرَرًا، وَاَشَدُّهَا خَطَرًا، وَاِنْ تَعَاهَدَهٗ صَاحِبُهٗ اَوْقَعَهٗ فِىْ اٰفَاتٍ، وَاَفْضٰى بِهٖ اِلٰى اُمُوْرٍ مُهْلِكَاتٍ. فَاِيَّاكُمْ وَالْغِيْبَةَ، فَاِنَّ الْغِيْبَةَ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا. وَسُئِلَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ مَا الْغِيْبَةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ ذِكْرُكَ اَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ. قَالَ اَرَاَيْتَ اِنْ كَانَ فِىْ اَخِىْ مَا اَقُوْلُ؟ قَالَ اِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ اَغْتَبْتَهٗ، وَاِلَّا فَقَدْ بَهَّتَّهٗ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ. وَالْغِيْبَةُ تَعُمُّ الْاِغْتِيَابَ قَوْلًا وَفِعْلًا وَصَرَاحَةً وَاِشَارَةً وَدَلَالَةً وَنَقْلًا بِالْاَعْضَاءِ. وَسَوَاءٌ كَانَتِ الْغِيْبَةُ فِىْ مَقَالَةِ النَّاسِ اَوْ اَفْعَالِهِمْ اَوْاَحْوَالِهِمْ اَوْ اَنْسَابِهِمْ اَوْ غَيْرِ ذَالِكَ مِمَّا يَكْرَهُ النَّاسُ اَنْ يُّذْكَرَ. اِلَّا اَنْ يَّذْكُرَهٗ اَحَدٌ تَنْبِيْهًا، اَوْ تَادِيْبًا، اَوْ طَلَبًا لِلْاِنْصَافِ فِى الْمُحَاكَمَاتِ، اَوْ لِلدَّفْعِ عَنِ الظَّلَامَاتِ، اَوْكَانَ الشَّىْءُ مِمَّا يَعْلَمُهُ الْعَوَامُّ وَالْخَوَاصُّ.

وَاعْلَمُوْا اَنَّ الْغِيْبَةَ الْمُحَرَّمَةَ مِنَ الْكَبَائِرِ، وَسَمَاعُهَا مِنَ الْكَبَائِرِ، وَالْاِشْتِرَاكُ فِى مَجْلِسِ الْغِيْبَةِ بَعْدَ اَنْ عَلِمَ بِهَا مِنَ الْكَبَائِرِ، فَنَسْاَلُ

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

اللّٰهَ تَعَالٰى اَنْ يَّحْفَظَ عَنِ الْاِغْتِيَابِ اَلْسِنَتَنَا، وَعَنْ سَمَاعِهَا اٰذَانَنَا، وَعَنِ التَّيَقُّنِ بِذَالِكَ مِنْ غَيْرِ تَحْقِيْقٍ اَفْئِدَتِنَا.

وَاعْلَمُوْا اَنَّ الْغِيْبَةَ وَالنَّمِيْمَةَ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ، وَقَدْ وَرَدَ الْوَعِيْدُ الشَّدِيْدُ عَلَيْهَا فِيْ كَثِيْرٍ مِّنَ النُّصُوْصِ وَاٰيَاتِ الْقُرْاٰنِ الْكَرِيْمِ. قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ وَاتَّقُوا اللّٰهَ، اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ. وَقَالَ تَعَالٰى : وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ . وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْغِيْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا. وَعَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَمَّا عُرِجَ بِيْ مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَّهُمْ اَظْفَارٌ مِّنْ نُحَاسٍ يُخَمِّشُوْنَ بِهَا وُجُوْهَهُمْ وَصُدُوْرَهُمْ. قُلْتُ مَنْ هٰؤُلَاءِ؟ قَالَ هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ لُحُوْمَ النَّاسِ وَيَقَعُوْنَ فِيْ اَعْرَاضِهِمْ . وَمَعْنَى اَكْلِ لُحُوْمِ النَّاسِ اِغْتِيَابُهُمْ اِسْتِعَارَةً.

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ : يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ، اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ، وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ وَاتَّقُوا اللّٰهَ، اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ.

بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ، وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. اَقُوْلُ قَوْلِيْ هٰذَا وَاسْتَغْفِرُ اللّٰهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَاسْتَغْفِرُوْهُ، اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



বয়ান নং -৪১

## দুনিয়ার মহব্বত প্রসঙ্গ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيْئَةٍ.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

মানুষের কলব বা অন্তরে যত ধরনের রোগ আছে, সেই রোগগুলো দূর করার কী উপায় এ সম্পর্কে আমরা আলোচনা করছিলাম। মনের একটা বড় রোগ হল দুনিয়ার মহব্বত। দুনিয়ার মহব্বত থেকে মানুষের মধ্যে অনেক ধরনের পাপের সৃষ্টি হয়।

দুনিয়ার মহব্বত বলতে বোঝায় দুনিয়ার সম্পদের প্রতি মোহ এবং দুনিয়ার সম্মানের প্রতি মোহ। মনের মধ্যে যদি দুনিয়ার মহব্বত অর্থাৎ, সম্পদের মোহ এবং সম্মানের মোহ এসে যায়, তাহলে তার দ্বারা অনেক পাপ সংঘটিত হবে, সে অনেক পাপে জড়িয়ে পড়বে। যেমন একজন মানুষ চুরি করে, সে কেন চুরি করে? কারণ তার ভিতরে দুনিয়ার মহব্বত প্রবেশ করেছে। তার মাল চাই, আর চুরি করলে মাল পাওয়া যায়, তাই সে চুরি করে। একজন মানুষ ঘুষ খায়, সে কেন ঘুষ খায়? দুনিয়ার মহব্বত অর্থাৎ, মালের মহব্বত বা মোহ থাকার কারণেই সে ঘুষ খায়। একজন মানুষ দুনিয়ার একটা পদ পাওয়ার জন্য মিথ্যা বলে, অপপ্রচার করে, ষড়যন্ত্র করে, এমনকি এমন মরিয়া হয়ে ওঠে যে, প্রতিপক্ষকে খুন, গুম পর্যন্ত করে। সে এ সবকিছু করে কেন? কারণ তার মধ্যে পদের মহব্বত অর্থাৎ, দুনিয়ার মহব্বত ঢুকেছে। দুনিয়ার মহব্বতের থেকেই সে এ সব করে। এভাবে দুনিয়ার মহব্বতের কারণে মানুষ বহু পাপে জড়িয়ে পড়ে। দুনিয়ার মহব্বত বহু পাপের উৎস। বরং এক হিসেবে সমস্ত পাপের মূল হল দুনিয়ার মহব্বত। তাই হাদীছে বলা হয়েছে,

حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيْئَةٍ. (رواه البيهقى فى شعب الإيمان عن الحسن مرسلاً)

অর্থাৎ, দুনিয়ার মহব্বত হল সমস্ত পাপের মূল।

মানুষের কলব একটা, আর এক কলবের ভিতরে দুই জিনিস পূর্ণাঙ্গভাবে থাকতে পারে না। কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে,

مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهٖ.

অর্থাৎ, আল্লাহ পাক একজন মানুষের ভিতরে দুটো কলব বা দুটো মন সৃষ্টি করেননি, বরং একটাই সৃষ্টি করেছেন। কাজেই একটা মনের ভিতরে একটা চিন্তাই প্রবলভাবে থাকতে পারে। কাজেই হয় কলবের ভিতর দুনিয়ার মহব্বত থাকবে, কিংবা দ্বীনের মহব্বত থাকবে। দুনিয়ার মহব্বতও থাকবে দ্বীনের মহব্বতও থাকবে, তা হবে না। মহব্বত ভাগাভাগি হয় না। এ জন্যেই রাসূল (সা.) বলেছেন,

اَبْرَأُ اِلٰى كُلِّ خَلِيْلٍ مِنْ خُلَّتِهٖ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلًا غَيْرَ رَبِّيْ لَاتَّخَذْتُ اَبَا بَكْرٍ. (ابن ماجة)

অর্থাৎ, কারও সাথে আমার অন্তরের অন্তস্থলের বন্ধুত্ব নেই। আল্লাহর সাথে আমার এরকম আন্তরিক বন্ধুত্বের সম্পর্ক। তাই আমি দুনিয়ার কাউকে সেরকম বন্ধু বানাতে পারি না। যদি কাউকে সে রকম বন্ধু বানাতাম, তাহলে আবূ বকরকে বানাতাম।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

এখানে একটা বিষয় বুঝা দরকার। সেটা হল রাসূল (সা.) আল্লাহকে ছাড়াও অনেককে ভালবাসতেন। অর্থাৎ, আরও অনেকের সাথে রাসূল (সা.)-এর বন্ধুত্ব বা মহব্বতের সম্পর্ক ছিল। যেমন হাদীছে এসেছে রাসূল (সা.) বিবিদের মধ্যে হযরত আয়েশা (রা.)কে সবচেয়ে বেশি ভালবাসতেন। আয়েশা (রা.)-এর বুদ্ধিমত্তা এবং তাঁর জ্ঞানের কারণে তাকে ভালবাসতেন। তিনি রাসূলের সব কথা, কাজ অর্থাৎ সব হাদীছের সংরক্ষণ করতে পারতেন। তাঁর মেধা ছিল প্রচুর। এসব কারণে রাসূল (সা.) তাকে খুব বেশি ভালবাসতেন। কারণ নারী সমাজের কাছে, পরবর্তীদের কাছে রাসূল (সা.)-এর পারিবারিক আদর্শ যথাযথভাবে পৌঁছে দেয়ার মত আয়েশার কোন বিকল্প ছিল না। এ কারণে তাকে খুব বেশি ভালবাসতেন। আয়েশা ছিলেন বিবিদের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয়। আর পুরুষদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভালবাসতেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)কে। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) দ্বীনের জন্য এবং রাসূল (সা.)-এর জন্য যা করেছেন, তা মানুষ কল্পনাও করতে পারবে না। তাবুকের যুদ্ধের সময় যখন মুসলমানদের খুব অভাব ছিল, এ সময় রাসূল (সা.) সাহাবাদের কাছে আবেদন রাখলেন- তোমরা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় কর, জেহাদের জন্য দান কর। তখন একেকজন তার সামর্থ অনুসারে বিভিন্ন পরিমাণে দান করেছেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)ও কিছু নিয়ে এসেছেন। রাসূল (সা.) তাকে জিজ্ঞাসা করেছেন কী পরিমাণ নিয়ে এসেছ আর ঘরে কী রেখে এসেছ? হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) উত্তর দিলেন ঘরে শুধু আল্লাহ, আল্লাহর রাসূলকে রেখে এসেছি। আর যা ছিল সব নিয়ে এসেছি। রাসূলের জন্য নিজের সর্বস্ব বিসর্জন দেয়ার এমন দৃষ্টান্ত কে দেখাতে পারে? হিযরতের আগে রাসূল (সা.) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)কে বলে রেখেছিলেন যে, আমরা মক্কা থেকে হিযরত করে মদীনায় চলে যাব, তুমি প্রস্তুত থেক। এই কথা বলার পর থেকে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) রাতের বেলা আর বিছানায় পিঠ লাগাতেন না, ঘরের দরজার সাথে পিঠ লাগিয়ে ঘুমাতেন। এরপর যে রাতে রাসূল (সা.) হিযরত করবেন, ঘর থেকে বের হয়ে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর ঘরের দরজায় এসে সামান্য একটা টোকা দিলেন, সাথে সাথে দরজা খুলে দেয়া হল। রাসূল (সা.) আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন- আবূ বকর সামান্য একটু টোকা দিতেই কীভাবে তুমি দরজা খুলে দিলে? হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) বলেছেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যেদিন বলেছিলেন হিযরত করবেন এবং আমাকে সাথে নিয়ে যাবেন, সেদিন থেকে ভেবেছি যেকোন সময় আপনি এসে যেতে পারেন। তাই সেদিন থেকেই আমি আর বিছানায় পিট লাগিয়ে ঘুমাইনি। এই দরজার সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমাই যে, কখন আবার রাসূল এসে ডাক দিবেন, আর আমি ঘুমে থাকব, আল্লাহর রাসূল কষ্ট পাবেন। এই মহব্বতের নমুনা দুনিয়ার কে দেখাতে পারে? এসব কারণে রাসূল (সা.) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)কে সবচেয়ে বেশি ভালবাসতেন। এসব বর্ণনা থেকে বুঝা যায় রাসূল (সা.) আল্লাহ ছাড়াও অন্যকে ভালবেসেছেন। তবে এটা ছিল সাধারণ ভালবাসা। মনের একনিষ্ঠ ভালবাসা বা একনিষ্ঠ বন্ধুত্ব, অর্থাৎ পুরো মন দিয়ে যে বন্ধুত্ব হয়ে থাকে, সেরকম বন্ধুত্ব একমাত্র আল্লাহর সাথে ছিল। অন্য কারও সাথে সেই বন্ধুত্ব ছিল না। অন্য কারও সাথে সে প্রেম ছিল না। কারণ এক মনের ভিতরে দুই জিনিস পুরোপুরি সমানভাবে থাকতে পারে না। অতএব অন্তরে হয় দ্বীনের মহব্বত থাকবে, না হয় দুনিয়ার মহব্বত থাকবে। একই সাথে দুই মহব্বত সমানভাবে থাকতে পারবে না। হ্যাঁ দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক থাকবে। তবে মনের আসল মহব্বত থাকবে একটার প্রতি, অর্থাৎ দ্বীনের প্রতি। দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক থাকবে কিন্তু সেটা ঐ পর্যায়ের সম্পর্ক নয়, দ্বীনের সাথে আমার যেমন মহব্বত বা প্রেমের সম্পর্ক। কারণ এক কলবের ভিতরে সমানভাবে দুটো জিনিসকে পুরোপুরি স্থান দেয়া যায় না। তাই অন্তরে হয় দুনিয়ার মহব্বত থাকবে, না হয় দ্বীনের মহব্বত থাকবে। দুনিয়ার মহব্বত আসলে দ্বীনের মহব্বত পুরোপুরি আসবে না। দ্বীনের মহব্বত পুরোপুরি আসলে সেখানে দুনিয়ার মহব্বত ঐ পর্যায়ের থাকবে না। মাও. রূমী (রহ.) বলতেন,

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



ہم خدا خواہی وہم دنیائے دوں + ایں خیال ست محال ست وجنوں

অর্থাৎ, আমরা খোদাকেও চাই পুরোপুরি, আবার দুনিয়াও চাই পুরোপুরি। এটা হল একটা অলিক কল্পনা, একটা অসম্ভব বিষয়, একটা পাগলামী।

বড় আজীব-আজীব কথা বলতেন মাওলানা রূমী (রহ.)। তিনি বলেছেন দুনিয়ার তো প্রয়োজন আছে, দুনিয়া ছাড়া চলা সম্ভব নয়। কিন্তু দুনিয়ার সাথে দিল লাগানো যাবে না। তিনি একটা উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, যেমন– নৌকা পানির ভিতরে চলে। পানি ছাড়া নৌকা চলতে পারে না। কিন্তু এই পানি যদি নৌকার ভিতরে ঢুকে যায়, তাহলে নৌকা ডুবে যায়। তদ্রূপ দুনিয়া হল আমাদের এই জীবন তরীর পানির মত, দুনিয়া ছাড়া এই জীবন তরী চলবে না, কিন্তু এই দুনিয়াকে দিলের ভিতরে ঢোকানো যাবে না, এটাকে বাইরেই রাখতে হবে। পানিকে যেমন নৌকার ভিতরে ঢোকানো যায় না, ঢুকতে দিলে নৌকা ডুবে যায়।

এর আর একটা উদাহরণ দেয়া যায়। যেমন একজন লোক একটা ঘর বানায়। সেই ঘরের ভিতরে বেড রুম থাকে, এটা থাকা দরকার। সেই ঘরে কিচেন বা রান্নাঘর থাকে, এটাও দরকার। ড্রয়িংরুম থাকে, এটাও দরকার। গেষ্ট রুম থাকে, এটাও দরকার। বাথরুম থাকে, এটাও দরকার। যদিও বাথরুম নাপাক স্থান, তবুও দরকারি। একটা বাসায় সুন্দর বেডরুম বানালাম, ড্রয়িং রুম বানালাম, সবকিছু সুন্দর বানালাম, কিন্তু এই নাপাকীর জায়গা অর্থাৎ বাথরুম বানালাম না, তাহলে কেউ সেই বাসায় থাকবে না, কেউ সেটা ভাড়া নিবে না। কারণ বাথরুম নাপাকীর স্থান হলেও এটা দরকারি। তবে অন্যান্য দরকারি রুমের সাথে যেমন মহব্বতের সম্পর্ক থাকবে, বাথরুমের সাথে সে রকম মহব্বতের সম্পর্ক থাকবে না। কেউ একথা মনে করে না যে, আহা বাথরুম কত ভাল লাগে, ওখানে যেয়ে একটু শুয়ে থাকি! ওখানে যেয়ে একটু আরাম করে ঘুমাই! বাথরুমের প্রয়োজন আছে, কিন্তু তার সাথে কারও মহব্বত থাকে না। নেহায়েত প্রয়োজন ছাড়া কেউ বাথরুমের ধারে কাছেও যায় না। আবার যাওয়ার পরও প্রয়োজন সারার সাথে সাথে সেখান থেকে সরে আসে। দুনিয়ার অবস্থাও এরকম। দুনিয়া হল বাথরুমের মত। প্রয়োজনে সেখানে গেলেও প্রয়োজন সারার সাথে সাথে সেখান থেকে সরে আসতে হবে।

যাহোক দুনিয়ার সাথে মহব্বত হলে দ্বীন আসে না। দুনিয়ার সাথে দিল লাগালে দ্বীনের সাথে দিল লাগে না। দুনিয়ার ভিতরে ডুবে থেকে আল্লাহকে পাওয়া যায় না। আমরা অনেকে প্রসিদ্ধ বুযুর্গ হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রা.)-এর নাম শুনেছি। তিনি এক সময় বলখের বাদশাহ ছিলেন। বলখ হল আফগানিস্তানের একটা জায়গা। এক যুগে এটা প্রসিদ্ধ নগরী ছিল। এখানের বাদশাহ ছিলেন হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহ.)। বাদশাহ থেকেও তিনি নামায রোযা করতেন, আল্লাহকে পাওয়ার জন্য সাধনা করতেন। কারণ তার খান্দান ছিল দ্বীনদার খান্দান। আল্লাহ পাক কোন কোন মানুষকে খাস হেদায়েত করার জন্য ওছীলা করে দিয়ে থাকেন। হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহামের ব্যাপারেও তাই করলেন। একদিন তিনি শাহী মহলে রয়েছেন, এ সময় শুনতে পেলেন ছাদের উপরে কে যেন ঠক ঠক করে হাটছে। বাদশাহ হিসেবে তার খুব রাগ এসে গেল। তিনি ছাদের উপরে যেয়ে রাগান্বিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন কী চাও এখানে? লোকটা বলল আমার একটা উট হারিয়ে গেছে! আমার উটটা তালাশ করছি। বাদশাহ বললেন উট তালাশ করবে তা এখানে কেন, জঙ্গলে যাও! এখানে উট পাবে কী করে? আহাম্মক! ছাদে কি উট খুঁজে পাওয়া যায়? তখন লোকটা বলল বাদশাহ নামদার! আপনি তো আমার চেয়ে বেশি আহাম্মক! আপনি তো এই বাদশাহীর ভেতরে থেকে খোদাকে পেতে চান! বাদশাহীর ভিতরে কী খোদাকে পাওয়া যায়? আল্লাহকে পেতে হলে বাদশাহী ছেড়ে ফকীর হতে হয়, আল্লাহর রাস্তার ফকীর হতে হয়! ব্যস, ইবরাহীম ইবনে আদহামের অন্তরের চোখ খুলে গেল, তাঁর বুঝ এসে গেল। তিনি বাদশাহী ছেড়ে দিয়ে আল্লাহকে পাওয়ার জন্য ফকীরী জীবন গ্রহণ করলেন।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

এ ঘটনা শুনে আমাদের মনে একটা প্রশ্ন জাগতে পারে যে, তাহলে কি আমরাও দুনিয়া সম্পূর্ণ ছেড়ে দেব! তাহলে কি ঘর সংসার ছেড়ে আমরা সন্নাসী হয়ে যাব? এ প্রশ্নের উত্তর হল বিশেষ-বিশেষ বুযুর্গের বিশেষ বিশেষ হালাত থাকে। সকলেই সেই হালাত গ্রহণ করতে পারে না। রাসূল (সা.)ও সব সাহাবীকে এক রকম আমল করাতেন না। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) যখন তাঁর সব মাল আল্লাহর রাস্তায় দিয়ে দিয়েছেন, রাসূল (সা.) তা গ্রহণ করেছেন এবং আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর প্রশংসা করেছেন, কিন্তু হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) যখন বলেছেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার সব মাল আমি আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিতে চাই, তখন রাসূল (সা.) তা গ্রহণ করেননি, বরং বলেছেন দশ ভাগের এক ভাগ আল্লাহর রাস্তায় দাও, আর বাকীটা তোমার জন্য রেখে দাও। তিনি আবেদন করেছেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আরও বেশি দিতে চাই। তখন রাসূল (সা.) বলেছেন পাঁচ ভাগের এক ভাগ দাও! তিনি তাতেও রাজি না হলে বলেছেন চার ভাগের এক ভাগ দাও, তাতেও রাজি হয়নি। শেষ পর্যন্ত রাসূল (সা.) বলেছেন, তিন ভাগের এক ভাগ আল্লাহর রাস্তায় দাও, বাকী দুই ভাগ রেখে দাও। দেখা গেল রাসূল (সা.) সম্পূর্ণ দুনিয়া ত্যাগ করার বিষয়ে এক সাহাবীকে সমর্থন করলেন, আর এক সাহাবীকে সমর্থন করলেন না। বুঝা গেল সকলের হালত এক নয়, সকলের ব্যাপারে এক নীতি নয়।

সম্পূর্ণ দুনিয়া বর্জন করার নীতি সকলের জন্য নয়। উলামায়ে কেরাম সাধারণ মানুষকে একথা বলেন না যে, সব মাল আল্লাহর রাস্তায় দান করে দাও, নিজের জন্য কিছুই রাখার দরকার নেই। একথা বলেন না এ কারণে যে, এখন সে আল্লাহর রাস্তায় সব মাল দিয়ে দিল, পরবর্তীতে যদি এক বেলা না খেয়ে থাকার মত পরীক্ষা আসে, তাহলে আল্লাহর উপরে তার শেকায়েত এসে যাবে যে, আল্লাহর রাস্তায় সব দিয়ে দিলাম, এখন যে আমার না খেয়ে থাকতে হচ্ছে, কই আল্লাহ দেখেন কই? তাহলে কি আল্লাহ নেই? (নাউযু বিল্লাহি মিন যালিক)। এভাবে ঈমানের দুর্বলতার কারণে সে গোমরাহ হয়ে যেতে পারে, বেঈমান হয়ে যেতে পারে। কিন্তু বুযুর্গদের হালত এরকম যে, তারা দিনের পর দিন না খেয়ে থাকেন, না খেয়ে বেহুশ হয়ে পড়েন, তবুও মুখ থেকে আল্লাহর ব্যাপারে সামান্যতম অভিযোগও বের হয় না। না খেয়ে বেহুশ হয়ে পড়ে থাকেন, তারপরও হুশ ফিরে এলে বলেন আলহামদু লিল্লাহ! হয়তো আল্লাহ পাক এর ভিতরেই আমার ভালায়ী রেখেছেন। তাদের মত যাদের মনের মজবুতি আছে, তারা সব আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিতে পারেন। দুর্বল মনের লোকেরা এ আমল করতে যাবে না। হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহ.) এরকম মজবুত মনের অধিকারী ছিলেন। তিনি ঘর সংসার ছেড়ে সবরকম কষ্ট বরদাশত করতে পেরেছেন, জঙ্গলে থেকেছেন, না খেয়ে মোজাহাদা করেছেন। আল্লাহ পাক তাকে দুনিয়ার ভিতরে একজন শ্রেষ্ঠ বুযুর্গ বানিয়েছেন। তাঁর ঘটনা থেকে আমাদের জন্য এতটুকু শিক্ষণীয় যে, দুনিয়ার ভিতরে ডুবে থেকে আল্লাহকে পাওয়া যায় না। আল্লাহকে পাওয়ার জন্য দুনিয়ার মহব্বত ত্যাগ করতে হবে।

আল্লাহ পাক হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহ.)-এর খাস হেদায়েতের জন্য যেমন ঘটনা ঘটিয়েছেন, আরও বহু বুযুর্গদের ক্ষেত্রে তিনি এরকম করেছেন। যেমন এক বুযুর্গ ছিলেন হযরত ফরীদ উদ্দীন আত্তার (রহ.)। 'আত্তার' শব্দের অর্থ আতর বিক্রেতা। তিনি একজন বড় আতর বিক্রেতা ছিলেন। তিনি ইউনানী ঔষধও বিক্রি করতেন। একদিন তিনি দোকান সাজিয়ে বসে আছেন। নানা রকম শিশিতে ঔষধ এবং বিভিন্ন রকম আতর। এ সময় পাগল ধরনের উষ্কখুষ্ক অবস্থার এক লোক দোকানে ঢুকল। ঢুকে বিভিন্ন শিশি তালাশ করে কী যেন খুঁজছিল। একের পর এক শিশি দেখেই যাচ্ছিল। ফরীদ উদ্দীন আত্তার জিজ্ঞাসা করলেন ভাই! আপনার কি চাই? লোকটা বলল কিছুই চাই না, শুধুই দেখছি। সে আবার দেখতে থাকল। এক সময় ফরীদ উদ্দীন আত্তার বিরক্ত হয়ে বললেন, যদি কিছুই না চান তাহলে এত কী দেখছেন,

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com



এত দেখার প্রয়োজন কী? তখন লোকটা বলল আমি দেখছি আর চিন্তা করছি যখন আপনার মওত আসবে, তখন আপনার জানটা কী করে বের হবে। ফরীদ উদ্দীন আত্তার বললেন, এর সাথে আমার জানের কী সম্পর্ক? লোকটা বলল এত রং বেরংয়ের শিশি, এত দামি দামি জিনিস পত্র, এই সবকিছুর ভিতরে তো আপনার রূহ ঢুকে আছে। তাই ভাবছি যখন আযরাঈল রূহ কবজ করার জন্য আসবে, তখন আপনার রূহ এক শিশির থেকে আরেক শিশির মধ্যে ঢুকবে, এটা থেকে ওটার মধ্যে ছুটাছুটি করতে থাকবে, এ অবস্থায় কী করে আপনার রূহ বের হবে? ফরীদ উদ্দীন আত্তার বললেন আরে পাগল! আমার রূহ কীভাবে বের হবে তা নিয়ে তোমার এত চিন্তা, তোমার রূহ কীভাবে বের হবে? লোকটা বলল- আমার রূহ বের হওয়া তো খুব সহজ -শুয়ে পড়ব, ব্যস আমার রূহ বের হয়ে যাবে। দেখবেন? এই বলে লোকটা শুয়ে পড়ল, মুখে উচ্চারণ করল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। ব্যস তার মৃত্যু হয়ে গেল। ঘটনা দেখে ফরীদ উদ্দীন আত্তারের মনে আছর পড়ল। দোকানদারি ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে গেলেন। ফকীরী জীবন গ্রহণ করলেন। পৃথিবীর এক বিখ্যাত বুযুর্গে পরিণত হলেন। এসব ঘটনায় দেখানো হয়েছে যে, দুনিয়ার ভিতরে ডুবে থেকে দ্বীনের মহব্বত আসে না। এক সাথে দুই মহব্বত হয় না। দুনিয়ার মহব্বতও থাকবে, দ্বীনের মহব্বতও হবে তা হয় না। দ্বীনের মহব্বতের জন্য দিল থেকে দুনিয়ার মহব্বত বের করতে হবে।

দিল থেকে দুনিয়ার মহব্বত বের করার জন্য দুটো কাজ করতে হবে। একটা হল দুনিয়াকে প্রয়োজনের ভিতরে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। দুনিয়া প্রয়োজন তাই আমি গ্রহণ করব, যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু পেলে আর দুনিয়ার ফিকিরে ডুবে থাকব না। দুনিয়া আমার আসল উদ্দেশ্য নয়, আমার আসল উদ্দেশ্য হল দ্বীন। তাই দ্বীনের কাজ আগে সেরে তারপর দুনিয়ার কাজ করব। এরকম নয় যে, দুনিয়া আগে সেরে তারপর দ্বীনের কাজ করব। বরং দ্বীনী জরুরত আগে সারব, তারপর দুনিয়া করব। কুরআনে কারীমে আমাদেরকে এই শিক্ষাই দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ.

অর্থাৎ, নামায থেকে ফারেগ হয়ে আয়-উপার্জনের জন্য বের হও। (জুমুআ. ১০)

এখানে বোঝানো হয়েছে আগে দ্বীনী জরুরত সেরে তারপর দুনিয়াবী জরুরতে মশগুল হওয়া নিয়ম। কাজেই এরকম করা যাবে না যে, জামাআতে নামায তো সব দিনই পড়ি, আজকে একটু কাজের ঝামেলা আছে, জামাআতের সময়ও হয়ে গেছে, এখন জামাআত ছেড়ে আগে কাজটা সেরে নেই, তারপরে ঘরে নামায পড়ে নিব। এরকম করলে বিষয়টা এমন দাঁড়াল যে, আগে দুনিয়া সারলাম, পরে দ্বীন করলাম। এরকম করা যাবে না। বরং আগে দ্বীনী জরুরত সেরে পরে দুনিয়া। এভাবে দুনিয়ার উপর দ্বীনী বিষয়কে প্রাধান্য দিতে থাকলে আস্তে আস্তে দুনিয়ার দিকে বেড়ে যাওয়ার চিন্তা এবং দুনিয়ার মহব্বত কন্ট্রোল হয়ে আসবে। যেটুকু দুনিয়ার মহব্বত আছে, তাও ধীরে ধীরে কলব থেকে বের হয়ে যাবে।

দিল থেকে দুনিয়ার মহব্বত বের করার জন্য আরেকটা কাজ হল বেশি বেশি আখেরাতের চিন্তা করা। বেশি বেশি মৃত্যুকে স্মরণ করা। নবী কারীম (সা.) ইরশাদ করেন,

اَكْثِرُوْا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ يَعْنِى الْمَوْتَ. (رواه الترمذي في سننه برقم ٢٣٠٧ وقال حسن غريب)

অর্থাৎ, বেশি বেশি মৃত্যুকে স্মরণ কর। এটা অন্তর থেকে দুনিয়ার স্বাদকে মিটিয়ে দিবে।

মানুষ যখন মৃত্যুর কথা চিন্তা করবে, আখেরাতের কথা চিন্তা করবে, তখন তার ভিতর এই চিন্তা আসবে যে, আমার দুনিয়ার মান-সম্মান, দুনিয়ার ধন-সম্পদ কিছুই আমার সাথে যাবে না। আমার সাথে যাবে শুধু আমার আমল। দুনিয়া আমার সাথে যাবে না! বরং আমার মৃত্যুর সাথে সাথে অন্যেরা এগুলোর মালিক হয়ে যাবে। বিবি মালিক হবে, সন্তান মালিক হবে, ভাই বেরাদার মালিক হবে। যে দুনিয়ার জন্য

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

আমি এত কিছু করছি, তার কিছুই আমার সাথে যাবে না, বরং সাথে যাবে শুধু আমার আমল। অন্য কিছুই যাবে না। বেশি বেশি এরকম ফিকির করলে ধীরে ধীরে দিল থেকে দুনিয়ার মহব্বত কমে যাবে। অন্তরে আমলের জযবা সৃষ্টি হবে।

আমাদের অন্তরে দুনিয়ার মহব্বত থাকার কারণে অনেক সময় মনে হয় এত আখেরাতের কথা চিন্তা করলে দুনিয়া থেকে একেবারে বঞ্চিত হয়ে যাব। কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয়। দ্বীন হলে দুনিয়া থেকে বঞ্চিত হয় না, বরং আখেরাতও হয়। হয়তো টাকা-পয়সা কিছু কম হতে পারে, তবে টাকা-পয়সা আসল কাম্য নয়। আসল কাম্য হল দিলের শান্তি এবং মনের সুখ। দ্বীনকে বাদ দিলে মানুষ টাকা-পয়সা হয়তো অর্জন করতে পারে, গাড়ি-বাড়ি বেশি করতে পারে, দুনিয়ায় বিভিন্ন পদ, মর্যাদা বেশি অর্জন করতে পারে। কিন্তু যে জিনিসটা আসল অর্থাৎ, মনের শান্তি, এটা অর্জন করতে পারে না। এটাই তো আসল কামিয়াবী। আসল সফলতা হল মনের শান্তি এসে যাওয়া। আমার দিলের ভিতরে প্রশান্তি আছে, কোন অস্থিরতা নেই, টেনশন নেই, দুশ্চিন্তা নেই, আমি যা নিয়ে আছি, তার ভিতরেই শান্তি বোধ হচ্ছে, এটাই আসল কাম্য। দ্বীন হলে এই আসল কাম্য জিনিসটা এসে যায়। দ্বীন বাদ দিয়ে শুধু দুনিয়া হলে এই আসল কাম্য জিনিসটা আসবে না। আল্লাহ পাক কুরআন শরীফে একথা বলে দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে,

وَ مَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا . الاية.

অর্থাৎ, যে আমার স্মরণ থেকে অর্থাৎ দ্বীনের উপরে চলা থেকে বিমুখ হবে, অর্থাৎ দ্বীনী চিন্তা বাদ দিয়ে শুধু দুনিয়ার চিন্তায় লিপ্ত থাকবে, তার জীবন হবে সংকীর্ণ, অর্থাৎ তাকে আমি দুনিয়া দিলেও তার মনের ভিতরে প্রশস্ততা বা শান্তি থাকবে না। বরং সব সময়-ই তার মনের ভিতরে থাকবে দুশ্চিন্তা, টেনশন পেরেশানী, অস্থিরতা। এভাবে তার জীবন থাকবে সংকীর্ণ। (তাহা: ১২৪)

সারকথা হল শুধু দুনিয়া হলে দ্বীন হবে না। বরং দ্বীন হলে দুনিয়াও হবে আখেরাত তো হবেই। শুধু দুনিয়ার চিন্তা হলে দ্বীন থেকে সরে যেতে হয়। দুনিয়ার মহব্বত দ্বীন থেকে সরে যাওয়ার একটা বড় কারণ। তাই পুরোপুরি দ্বীনের উপর উঠে আসতে হলে দুনিয়ার মহব্বত ত্যাগ করতে হবে। প্রয়োজন মত দুনিয়ার জন্য চেষ্টা করতে হবে, কিন্তু দুনিয়ার সাথে দিল লাগানো যাবে না। অনেক বুযুর্গানে দ্বীন এমন অতিবাহিত হয়েছেন যাদের অনেক ধন-সম্পদ ছিল, তাঁরা অনেক টাকা-পয়সার মালিক ছিলেন। কিন্তু দুনিয়ার সাথে তাঁদের দিল লাগানো ছিল না। এরই নাম হল যুহদ বা দুনিয়া ত্যাগ। সম্পদ না থাকার নাম দুনিয়া ত্যাগ নয়, বরং দুনিয়া ত্যাগের অর্থ হল মনের থেকে দুনিয়া ত্যাগ করা, দুনিয়ার সাথে দিল না লাগানো। একজন ব্যক্তির অনেক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও সে দুনিয়া ত্যাগী হতে পারে, যদি সম্পদের সাথে তার দিল লাগানো না থাকে। আবার এক ব্যক্তির সম্পদ না থাকা সত্ত্বেও সে দুনিয়াদার হতে পারে, যদি সম্পদের সাথে তার দিল লাগানো থাকে। যখন সম্পদের সাথে দিল লাগানো থাকবে না, তখন সম্পদ বাড়ানোর জন্য হারাম পথে যাওয়ার চিন্তাও আসবে না। বরং যতটুকু হালালভাবে আসবে, ততটুকুর উপর সীমাবদ্ধ থাকবে। হারাম পথে হলেও সম্পদ বাড়াতে হবে-এরকম চিন্তা আসবে না। আর যাদের দিলে দুনিয়ার মহব্বত থাকবে, তাদের দিলের অবস্থা হবে আরও চাই, আরও চাই। তখন হালালপন্থায় না আসলে, তারা হারামপন্থায় চলে যাবে। এভাবে মালের মহব্বত অর্থাৎ দুনিয়ার মহব্বত তাকে হারামপন্থায় নিয়ে যাবে। এজন্যই অন্তরে দুনিয়ার মহব্বত রেখে দ্বীনদার হওয়া যায় না। এ জন্যই দুনিয়ার মহব্বত এত খারাপ। আল্লাহ পাক আমাদেরকে দুনিয়ার মহব্বত থেকে মুক্তি দান করুন। আমীন!

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



বয়ান নং ৪১-এর খুতবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَرْشَدَنَا اِلٰى سَبِيْلِ صَفَاءِ الْقُلُوْبِ، اَحْمَدُهٗ وَاَشْكُرُهٗ وَاِلَيْهِ اَتُوْبُ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهُ الَّذِىْ حُبِّبَ اِلَيْهِ الْاِفْلَاسُ وَهُوَ اَمْرٌ مَرْغُوْبٌ ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ مَا تَعَاقَبَ الطُّلُوْعُ وَالْغُرُوْبُ.

اَمَّا بَعْدُ :

اَيُّهَا النَّاسُ! اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى جَعَلَ الدُّنْيَا مَرْغُوْبَةً ، فَقَالَ : زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. اَلْاٰيَةُ. وَجَعَلَ تَعَالٰى اَلدُّنْيَا مَرْغُوْبَةً، عَلٰى رَغْمِ اَنَّ حُبَّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيْئَةٍ، وَذَالِكَ اِبْتِلَاءٌ مِّنَ اللّٰهِ ذِى الْحِكْمَةِ. فَمَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهٖ حُبُّ الدُّنْيَا اَىْ حُبُّ الْمَالِ وَالْجَاهِ، لَا يَسَعُ فِيْهِ حُبُّ اللّٰهِ وَحُبُّ رَسُوْلِهٖ، لِاَنَّ قَلْبَ الْمَرْءِ وَاحِدٌ لَا يَسَعُ فِيْهِ شَيْئَانِ. قَالَ تَعَالٰى : مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِىْ جَوْفِهٖ. فَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْ لَّا يُحِبَّ اَحَدًا غَيْرَ اللّٰهِ، وَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى جَعَلَ حُبَّ الرَّسُوْلِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُبَّهٗ، كَمَا قَالَ تَعَالٰى : قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ. فَلَا يُحِبُّ اَحَدًا غَيْرَ اللّٰهِ، وَلَا يُحِبُّ شَيْئًا اِلَّا لِلّٰهِ ، وَلِاَجْلِ ذَالِكَ قَالَ الرَّسُوْلُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِنَّ اللّٰهَ اتَّخَذَنِىْ خَلِيْلًا كَمَا اتَّخَذَ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلًا، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلًا غَيْرَ رَبِّىْ لَاتَّخَذْتُ اَبَا بَكْرٍ.

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

وَاعْلَمُوْا اَنَّ حُبَّ الْجَاهِ وَالْمَالِ دَاءَانِ مُهْلِكَانِ، قَدْ جَاءَ الْوَعِيْدُ عَلَيْهِمَا فِى السُّنَّةِ وَالْقُرْاٰنِ، فَاتْرُكُوْا عَنْ قُلُوْبِكُمْ حُبَّ الْجَاهِ وَالْمَالِ، وَعِيْشُوْا بِغِنَى النَّفْسِ وَقَنَاعَةِ الْبَالِ. وَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلْغِنٰى غِنَى النَّفْسِ.

اَيُّهَا النَّاسُ! وَلَا تَخَافُوا الْفَقْرَ وَضِيْقَ الْعَيْشِ، فَاِنَّ الْبَسْطَ اَحَقُّ اَنْ يُّخَافَ بِهٖ دُوْنَ الْفَقْرِ. قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَاللّٰهِ لَا الْفَقْرَ اَخْشٰى عَلَيْكُمْ، وَلٰكِنْ اَخْشٰى عَلَيْكُمْ اَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلٰى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا اَهْلَكَتْهُمْ. وَاعْلَمُوْا اَنَّ الْحَيَاةَ الطَّيِّبَةَ فِى الْاِيْمَانِ وَالْاَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، لَا فِى الْمَالِ وَكَثْرَةِ الْمَتَاعِ، قَالَ تَعَالٰى : وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً. وَقَالَ تَعَالٰى : وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ. وَبِخِلَافِ ذَالِكَ قَالَ تَعَالٰى : وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا. اَلْاٰيَةُ. فَرَجِّحُوْا فِكْرَ الْاٰخِرَةِ عَلٰى فِكْرِ الدُّنْيَا، قَالَ تَعَالٰى : فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ. وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

وَاعْلَمُوْا اَنَّ طَرِيْقَ النَّجَاةِ مِنْ لَذَّاتِ الدُّنْيَا ذِكْرُ الْمَوْتِ، قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَكْثِرُوْا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ.

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ : رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ، وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. اَقُوْلُ قَوْلِىْ هٰذَا وَاسْتَغْفِرُ اللّٰهَ لِىْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَاسْتَغْفِرُوْهُ، اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



বয়ান নং -৪২

## ক্রোধ বা রাগ প্রসঙ্গ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ. وَفِى الْحَدِيْثِ اِنَّ رَجُلًا قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! اَوْصِنِيْ وَلَا تُكْثِرْ عَلَيَّ. قَالَ لَاتَغْضَبْ فَرَدَّدَ مِرَارًا قَالَ لَا تَغْضَبْ.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

আমরা গত কয়েক জুমুআ ধরে নফ্সের বিভিন্ন রোগ এবং সেই সবের এসলাহ বা সংশোধন করার পদ্ধতি কী সে সম্পর্কে আলোচনা করে আসছি। নফ্সের যতগুলো রোগ আছে তার মধ্যে আরেকটা বড় রোগ হল রাগ বা গোস্বা। কারও রাগ যখন মাত্রা ছাড়িয়ে যায়, তখন সেটা অনেক গোনাহের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, অনেক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। রাগের কারণে মানুষ বে-সামাল হয়ে অন্যের প্রতি যুলুম বাড়াবাড়ি করে। রাগের কারণে মনের মধ্যে প্রতিশোধের আগুন জ্বলে ওঠে, তখন খুন খারাবী পর্যন্ত হয়ে যায়। রাগের কারণে ঘর ভাংগাভাংগি হয়ে যায়, সংসার ভাংগাভাংগি হয়ে যায়। এসব কারণে শরীআতের দৃষ্টিতে রাগ অত্যন্ত খারাপ।

তবে সব ক্ষেত্রে রাগ খারাপ বা নিন্দনীয় নয়। জীবনের ক্ষেত্রে এমনও আছে যেখানে মানুষের রাগ বা ক্রোধের প্রয়োজন আছে। সেজন্যই আল্লাহ পাক মানুষের মধ্যে জন্মগতভাবে, স্বভাবগতভাবে কিছুটা ক্রোধ দিয়ে দিয়েছেন। যদি মানুষের মধ্যে ক্রোধ মোটেই না থাকে, তাহলে তার চোখের সামনে অন্যরা তার ধন-সম্পদ লুটেপুটে নিয়ে যাবে, তার চোখের সামনে তার বিবি-বাচ্চার ইজ্জত-আবরু লুটে নিবে, তবুও তার ভিতর সেটা প্রতিরোধ করার কোন স্পিরিট আসবে না। নিজের জান-মাল হেফাযত করার মত, নিজের এবং নিজের আপন জনের ইজ্জত-আবরু হেফাযত করার মত স্পিরিটও তার ভিতরে থাকবে না, মুসলমানদের উপর কাফেররা আক্রমণ করবে, কাফেররা মুসলমানদের দেশ নিয়ে যাবে, জান-মাল নিয়ে যাবে, মুসলমান নারীদের ইজ্জত-আবরু লুটে নিবে, তবুও তার ভিতরে জেহাদের স্পিরিট আসবে না। অথচ নিজের জান-মাল হেফাযত করার স্পিরিট, নিজের ইজ্জত-আবরু হেফাযত করার স্পিরিট, নিজের দেশ ও ধর্ম হেফাযত করার স্পিরিট শরীআতে কাম্য। এসব ক্ষেত্রে প্রতিরোধ গড়ে তোলার মত ক্রোধের প্রয়োজন আছে। এ জন্যই আল্লাহ পাক মানুষের মধ্যে ক্রোধও রেখে দিয়েছেন।

তবে এই ক্রোধটা সীমানার ভিতরে থাকতে হবে, নিয়ন্ত্রণের ভিতরে থাকতে হবে। যদি সীমার বাইরে চলে যায়, নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তাহলে সেটা অনেক গোনাহ এবং অনেক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তাই ক্রোধ একেবারে না থাকা কাম্য নয়; বরং ক্রোধ থাকবে, তবে ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণে রাখা কাম্য।

সুফিয়ায়ে কেরাম –যারা নফ্সের এসলাহের চিন্তা-ভাবনা করেন, যারা আধ্যাত্মিক সংশোধনের লাইনে কাজ করেন তাঁরা– বলেন, ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারাই হল আধ্যাত্মিক সাধনার লাইনে এক বিরাট সফলতা। আধ্যাত্মিক সাধনার মধ্যে ক্রোধকে নির্মূল করা কাম্য নয়, বরং নিয়ন্ত্রণে আনাই

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

উদ্দেশ্য। এবং নিয়ন্ত্রণে আনতে পারা এক বিরাট কামিয়াবী। কারণ মানুষের যত গোনাহ হয়, তার কিছু হয় খাহেশাতে নফসানীর কারণে। যেমন মানুষ গায়রে মাহরাম নারীর দিকে নজর করে, যেনা করে, হস্তমৈথুন করে, পুরুষে পুরুষে সমকামিতা করে, এগুলো করে খাহেশাতে নফসানীর কারণে। মানুষ সুদ ঘুষ খায়, এটাও করে খাহেশাতে নফসানী-র কারণে। এভাবে অনেক গোনাহ এমন আছে যেগুলো মানুষের খাহেশাতে নফসানী থেকে সৃষ্টি হয়। আর বেশ কিছু গোনাহ এমন আছে, যেগুলো হয় মানুষের ক্রোধের কারণে। যেমন মানুষের প্রতি বাড়া-বাড়ি করা, যুলুম করা, কাউকে অন্যায়ভাবে গালি-গালাজ করা। এসব গোনাহ ক্রোধের কারণেই হয়ে থাকে। গীবত সমালোচনার পেছনেও মানুষের ক্রোধ কাজ করে থাকে। একজনের ভাল কিছু দেখে আমার বরদাশত হল না, ভিতরে রাগ সৃষ্টি হল। সেই রাগ মিটানোর আর কোন পথ না পেয়ে তার সমালোচনা করে আমার নফসকে ঠাণ্ডা করলাম। দেখা গেল এরকম গীবত, সমালোচনার মূলেও রয়েছে ক্রোধ। হাছাদ বা হিংসার মূলেও থাকে এক ধরনের ক্রোধ। এভাবে অনেক গোনাহ ক্রোধ থেকে সৃষ্টি হয়। কিছু গোনাহ হয় খাহেশাতে নফসানী থেকে আর কিছু হয় ক্রোধ থেকে। কাজেই আধ্যাত্মিক সাধনার লাইনে কেউ খাহেশাতে নফসানী এবং ক্রোধ এই দুটোকে দমন করতে পারলে সে কামিয়াব। ক্রোধকে কন্ট্রোল করতে পারা হল সেই কামীয়াবির অর্ধেক। তাই শরীআতের দৃষ্টিতে ক্রোধকে দমন করা অনেক বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এক হাদীছে এসেছে-এক সাহাবী রাসূল (সা.)-এর কাছে এসে আবেদন জানালেন,

يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَوْصِنِيْ. قَالَ لَاتَغْضَبْ فَرَدَّدَ مِرَارًا قَالَ لَا تَغْضَبْ. (رواه البخاري في صحيحه برقم ٦١١٦)

অর্থাৎ, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাকে একটু উপদেশ দিন। রসূল (সা.) বললেন, ক্রোধ বর্জন কর।

এ হাদীছ থেকে একটা ফায়দা বুঝা গেল সাহাবায়ে কেরাম উপদেশ চেয়ে নিতেন। আমাদের অবস্থা হল আমরা উপদেশ চেয়ে নেয়া তো দূরের কথা, কেউ স্বেচ্ছায় উপদেশ দিলে বা ভুল ধরে দিলে, আমাদের রাগ আসে যে, উনি আমাকে উপদেশ দিতে এসেছেন, আমার ভুল ধরতে এসেছেন, আমি কি উনার চেয়ে কম বুঝি! অথচ উপদেশের কথা শুনে রাগ নয় বরং খুশি হওয়া চাই। কেউ ভুল ধরে দিলে রাগ নয় বরং খুশি হওয়া চাই। কারণ যে আমাকে উপদেশ দিল বা আমার ভুল ধরে দিয়ে আমার ভুল সংশোধন করে দিল, সে আমার বিরাট উপকার করল। নসীহত বা উপদেশ ছাড়া কে ভাল হতে পারে? নসীহতের কথা শুনেই তো আমরা দ্বীনী লাইনে চলি। আমরা সকলেই নসীহতের মুখাপেক্ষী। কাজেই নসীহত শুনে রাগ হওয়া বুদ্ধিমত্তা নয়, বরং ভাল মানুষ পেলে তাদের কাছ থেকে উপদেশ চেয়ে নেয়া দরকার। সাহাবায়ে কেরাম সময় সুযোগ পেলে রাসূল (সা.) থেকে উপদেশ চেয়ে নিতেন। এ হাদীছে সেরকমই একটা বর্ণনা রয়েছে যে, এক সাহাবী রাসূল (সা.)-এর কাছে আসলেন। তার খুব ব্যস্ততা ছিল, তাই বললেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! অল্প কথায় আমাকে একটু উপদেশ দান করুন। রাসূল (সা.) বললেন, তুমি ক্রোধ বর্জন কর! এ নসীহতটুকু বেশি সংক্ষিপ্ত হওয়ার কারণে উক্ত সাহাবী আবার আরয করলেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আরও একটু উপদেশ দিন। রাসূল (সা.) আবার বললেন, ক্রোধ বর্জন কর। তিনি আবার আরয করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! আরও একটু উপদেশ শোনান। রাসূল (সা.) আবারও বললেন, ক্রোধ বর্জন কর। এভাবে লোকটা তিনবার নসীহতের আবেদন করলেন, আর রাসূল (সা.) তিনবারই একই কথা বললেন যে, ক্রোধ বর্জন কর। এ থেকে বুঝা যায়, ক্রোধ বর্জন করার গুরুত্ব কতখানি। তাই বুযুর্গানে দ্বীন ক্রোধ বর্জন করার উপর খুব বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন।

পূর্বেও বলা হয়েছে– সব স্থানে ক্রোধ বর্জন করা নয় বরং জীবনের কোথাও কোথাও ক্রোধের প্রয়োজনও রয়েছে। আমার সন্তানাদি যদি কোন অন্যায় কাজ করে, তখন যদি আমি তাদেরকে কোন

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com



রকম ধমক না দেই, কোনভাবে রাগ না দেখাই, তাহলে তাদের আস্পর্ধা বেড়ে যাবে, তাদের সংশোধন হবে না। ছেলে-মেয়ে বা ছাত্ররা যদি পড়া-শুনা না করে সময় নষ্ট করে, আর তাদেরকে আমরা শাসন না করি, তাহলে তাদের জীবন নষ্ট হবে। তাই ঘরের এসলাহের জন্য রাগ ও শাসনের প্রয়োজন রয়েছে। এমনিভাবে সমাজের এসলাহের জন্য, দেশের এসলাহের জন্যও রাগ ও শাসনের প্রয়োজন রয়েছে। আমি অফিসের কর্মকর্তা হয়ে থাকলে, দেশের কর্মকর্তা হয়ে থাকলে আমার অধীনস্থদের সংশোধনের জন্য, অফিস ও দেশের কাজ ঠিকমত চালানোর জন্য আমার রাগ ও শাসনের প্রয়োজন রয়েছে।

সব ক্ষেত্রে কিছু না কিছু রাগের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কিন্তু এটা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকতে হবে। যতটুকু প্রয়োজন, তার চেয়ে বেশি রাগ হলে সেটা ক্ষতির দিকে নিয়ে যাবে। যেমন– একজন স্বামী তার স্ত্রীকে শাসন করতে যেয়ে মাত্রার চেয়ে বেশি রাগান্বিত হয়ে উঠলে পুরো ঘর-সংসার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। যেমন রাগের চোটে বে-শামাল হওয়ার কারণেই মানুষ বিবিকে তালাক দিয়ে বসে। ঠাণ্ডা মাথায় খুব কম মানুষ বিবিকে তালাক দেয়। রাগের মাথায় তালাক দেয় বলেই এক তালাক দিয়ে ক্ষ্যান্ত থাকে না বরং তিন তালাক দিয়ে বসে। আমাদের কাছে তালাকের যত ফতোয়া আসে, তার মধ্যে এক তালাকের ফতোয়া আসে না বললেই চলে; বরং সবই তিন তালাকের ফতোয়া। এমনকি এরকম ফতওয়াও আসে যে, রাগের মাথায় বলে ফেলেছে, তোকে তালাক, তোর মা-বাপ তালাক, তোর চৌদ্দ গোষ্ঠী তালাক। এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক, ঘর ভরে তালাক ইত্যাদি। এ থেকে বুঝা যায় রাগের মাথায় মানুষ এসব তালাক দিয়ে থাকে। অথচ শরীআত বলেছে নেহায়েত অপারগ অবস্থায় তালাক দিতে হলেও মাত্র একটা তালাক দাও। এটাই হল তালাকের উত্তম পন্থা। এক তালাক দিলে প্রয়োজন বোধে আবার সহজে বিবিকে ফেরত নেয়া যায়। কিন্তু মানুষ রাগের মাথায় তালাক দেয় বলে, এক তালাকের উপর ক্ষ্যান্ত থাকে না, ফলে পরে বিবিকে ফিরিয়ে আনা খুব জটিল হয়ে পড়ে। পরিমিত মাত্রার চেয়ে বেশি রাগ হওয়ার কারণেই এই জটিলতা সৃষ্টি হয়।

অনেকে এসে বলেও থাকে যে, হুজুর! রাগের মাথায় তালাক দিয়ে ছিলাম মাথা ঠিক ছিল না। অর্থাৎ বোঝাতে চায় রাগের কারণে আমার মাথাই যখন ঠিক ছিল না, তখন আমার তালাক কার্যকর হবে কেন? কিন্তু আপনারাই বলুন কেউ রাগের মাথায় ঘরে আগুন দিয়ে দিলে কি ঘর না জ্বলে থাকবে? কেউ যদি রাগের মাথায় আরেকজনের মাথায় পিটানি দেয়, তাহলে কি সে না মরে থাকবে?

যাহোক রাগকে নিয়ন্ত্রণে আনতে না পারলে সেই রাগ ক্ষতি ডেকে আনে, ধ্বংস ডেকে আনে। রাগের মাথায় কোন ছাত্রকে বেশি মারধর করলে সেই ছাত্র বে-আদব হয়ে যায়। উস্তাদের প্রতি তার ভক্তি নষ্ট হয়ে যায়। ছাত্র ভাবে আমি তো এত অন্যায় করিনি, তাহলে উস্তাদ আমাকে এত মারলেন কেন? উস্তাদ আমার প্রতি যুলুম করেছেন! এভাবে সে উস্তাদের প্রতি মনে মনে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে। এমনকি লেখাপড়ার প্রতিও বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে এবং লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে সম্পূর্ণ বিগড়ে যায়, লাইনচ্যুত হয়ে যায়। রাগের মাথায় অতিরিক্ত শাসন করলে সন্তানও বিগড়ে যায়, বিবিও বিগড়ে যায়, সমাজও বিগড়ে যায়। তাই বলা হচ্ছে রাগের প্রয়োজন রয়েছে, কিন্তু রাগকে কন্ট্রোল করতে হবে।

বুযুর্গানে দ্বীনের তরীকা হল তারা নিজেদের ব্যাপারে কখনই রাগ করেন না। তবে শরীআতের প্রশ্ন আসলে রেগে যান। নিজেদের সাথে কেউ যতই দুর্ব্যবহার করুক, তাঁরা সেটা ক্ষমা করেন। কিন্তু শরীআত বিরোধী বিষয় হলে সেখানে রেগে যান, সেটা ক্ষমা করেন না। একটা ঘটনা বলি– ঘটনাটি হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর। ঘটনাটি বলার পূর্বে হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) সম্পর্কে

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

কয়েকটা কথা বলে নিতে হবে। হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর অভ্যাস ছিল রাতের বেলায় তিনি ঘুমাতেন না। ইশার নামাযের পর খানা-পিনার জরূরত থাকলে সেরে তাহাজ্জুদের নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন। ফজর পর্যন্ত তাহাজ্জুদে লিপ্ত থাকতেন। তিনি চল্লিশ বছর একাধারে ইশার উযুতে ফজরের নামায আদায় করেছেন। প্রতি রাতে তাহাজ্জুদের মধ্যে এক খতম কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করতেন। সকালে ফেকাহ গবেষণার মজলিসে বসে যেতেন। বিভিন্ন শাস্ত্র বিশেষজ্ঞ ৪০ জন আলেমের সমন্বয়ে এই মজলিস গঠিত ছিল। এই মজলিসকে নিয়ে ফেকাহ শাস্ত্রের মাসআলা মাসায়েল গবেষণা করতেন। এরপর যোহর পর্যন্ত নিজের ব্যবসা দেখা-শোনা করতেন। তার নিজের বড় ব্যবসাও ছিল। যোহর থেকে নিয়ে আসর পর্যন্ত ছিল তাঁর ঘুমানোর সময়।

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর অনেক সমালোচনাকারী ছিল। বড় ব্যক্তিদের প্রতি হিংসার কারণে যেমন হয়ে থাকে। তাঁর ব্যাপারে অনেক ভিত্তিহীন অপবাদ ছড়ানো হয়েছিল। এরকম ভিত্তিহীন সমালোচনা ও মিথ্যা অপবাদের মধ্যে একটা বিষয় ছিল যে, ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) খুব রাগী এবং বদ মেজাযী মানুষ। এবার মূল ঘটনাটি শুনুন। একদিন একজন লোক ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বাস্তবেই বদ মেজাযী কি-না তা পরীক্ষা করার জন্য যোহরের পরে যখন ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) কেবল ঘুমিয়েছেন, সেই মুহূর্তে তার ঘরের দরজায় গিয়ে নক করল। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) দরজা খুলে বের হয়ে আসলেন। জিজ্ঞাসা করলেন ভাই! কী জন্য এসেছেন? সে বলল হুজুর, একটা মাসআলা জিজ্ঞেস করতে এসেছিলাম, কিন্তু এখন তা ভুলে গেছি। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে, স্মরণ হলে আসবেন। লোকটা চলে গেল। কিছু দূর যেয়ে আবার ফিরে এল। ইতিমধ্যে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) আবার ঘুমিয়ে গেছেন। তখন লোকটা এসে আবার নক করল। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) থাকতেন দোতলায়। তিনি উঠে নীচ তলায় এসে আবার দরজা খুললেন। দেখলেন সেই আগের লোকটাই। বললেন কী ভাই মাসআলাটি মনে এসেছে? লোকটা বলল হুজুর, মনে এসেছিল, কিন্তু এই আপনি সিঁড়ি থেকে নামতে নামতে আবার ভুলে গেছি। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বললেন, ঠিক আছে, আবার স্মরণ হলে আসবেন। সে আগের মত চলে গিয়ে আবার কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে দরজায় নক করল। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) আবার নীচে নেমে দরজা খুলে জিজ্ঞাসা করলেন স্মরণ এসেছে? লোকটা বলল জী হুজুর। মাসআলাটা হল মানুষ যে পায়খানা করে, এই পায়খানার স্বাদটা কি মিঠা না তিতা? বলুন এ অবস্থায় প্রচণ্ড রেগে যাওয়ার কথা কি-না? কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) রাগলেন না। সম্পূর্ণ শান্তভাবে বললেন যখন পায়খানা কাঁচা থাকে, তখন তা মিষ্টি থাকে, আর শুকিয়ে গেলে তিতা হয়ে যায়।

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং হেকমতওয়ালা ছিলেন। তিনি নিজের বুদ্ধি দিয়ে অনেক কিছুর রহস্য বের করতে পারতেন। একটা ঘটনা বলি। একদিন একটা লোক ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর কাছে এসে বলল হুজুর! আমার কিছু টাকা ছিল। আমি বাড়িতে কোন এক স্থানে সেগুলো পুতে রেখেছিলাম। কিন্তু কোন্ জায়গায় পুতে রেখেছিলাম তা এখন স্মরণ করতে পারছি না। আপনি মেহেরবানী করে সে স্থানটি কোথায় তা একটু বলে দিন। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বললেন আমি তো আলিমুল গায়েব নই, কী করে বলে দিব? এটা কোন মাসআলার বিষয়ও নয়। লোকটা বলল হুজুর! আমার বিশ্বাস আপনি বলতে পারবেন। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বললেন, আচ্ছা যাও, যেয়ে উযু করে নফল নামাযে দাঁড়াবে। যতক্ষণ পর্যন্ত স্মরণ না আসবে, ততক্ষণ পর্যন্ত নফল পড়তেই থাকবে। লোকটা

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



কথামত উযু করে নামাযে দাঁড়িয়ে গেল। নামাযের ভিতরেই তার স্মরণ এসে গেল। তখন সে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর কাছে ছুটে এসে বলল হুজুর! নামাযে দাঁড়ানোর কিছুক্ষণ পরই আমার স্মরণে এসে গেছে। কিন্তু এটা কী করে হল? আমাকে রহস্যটা একটু খুলে বলুন। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বললেন, শয়তান সব সময় মানুষের সাথে থাকে। তাই ভাবলাম তুমি কোথায় সম্পদ পুতে রেখেছ তা আর কেউ না দেখলেও শয়তান অবশ্যই দেখেছে। আরও চিন্তা করলাম, যখন তুমি এই নিয়তে নামাযে দাঁড়াবে যে, মনে না আসা পর্যন্ত নামায পড়তেই থাকবে, তখন শয়তানের গায়ে জ্বালা ধরে যাবে। সে ভাববে লোকটা কত ফযীলত অর্জন করে নিবে! সেই ফযীলত অর্জনকে ঠেকানোর জন্য এর নামায বন্ধ করে দিতে হবে। আর তা করার উপায় হল আমি ওকে স্মরণ করিয়ে দেই। তাই শয়তান-ই তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। যাহোক ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) অত্যন্ত বুদ্ধিমান মানুষ ছিলেন। তিনি নিজের বুদ্ধি থেকেই বললেন, যখন পায়খানা কাঁচা থাকে তখন মিষ্টি থাকে, আর শুকিয়ে গেলে তিতা হয়ে যায়। লোকটা জিজ্ঞাসা করল হুজুর! এটা কি করে বুঝলেন? এটা কী কোন কিতাবে লেখা আছে? ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বললেন এটা কোন কিতাবে লেখা নেই। তবে আমি দেখেছি মানুষের পায়খানা যখন কাঁচা থাকে, তখন তার উপরে মাছি পড়ে, আর মাছি মিষ্টি জিনিসের উপরই পড়ে থাকে। আর পায়খানা শুকিয়ে গেলে তার উপরে মাছি পড়ে না। তাই আমি বুঝলাম পায়খানা শুকিয়ে গেলে সেটা মিষ্টি থাকে না, বিস্বাদ হয়ে যায়। এরপর লোকটা বললেন হুজুর! আমি হেরে গেছি আপনি জিতে গেছেন। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বললেন কী ব্যাপার, আপনার এ কথার রহস্য কী? তখন লোকটা বলল যে, হুজুর! আপনার ব্যাপারে একজনের সাথে আমার তর্ক হয়ে গেছে। আমি বলেছি আপনি খুব রাগী এবং বদ মেজাযী মানুষ, সে বলেছে না, এটা তার ব্যাপারে মিথ্যা অপপ্রচার। তখন আমি আপনার রাগ পরীক্ষা করার জন্য আসলাম। বারবার আপনার কাঁচা ঘুম ভেঙ্গে আপনাকে একটা প্রশ্ন করলাম, তাও একটা বাজে প্রশ্ন করলাম। কিন্তু দেখলাম তবুও আপনি রাগেননি। তাই বললাম আপনি জিতে গেছেন, আমি হেরে গেছি।

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) কত বেশি রাগকে দমন করতে পারতেন, তার আর একটা ঘটনা শুনুন। একদিন তিনি মসজিদ থেকে নামায পড়ে ফারেগ হয়ে ঘরে যাচ্ছিলেন। তখন একজন লোক তাঁর সাথে সাথে যাচ্ছিল। লোকটা তাঁর সমালোচনা শুরু করে দিল যে, আপনি এই করেন, সেই করেন ইত্যাদি। লোকটা সমালোচনা করেই যাচ্ছে। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) সমালোচনা শুনে মোটেই রাগছেন না; বরং শুনছেন আর হাসছেন। কিছুদূর যেয়ে রাস্তা দুই দিকে ভাগ হয়ে গেল। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর বাসার রাস্তা গিয়েছে এক দিকে, আর সেই লোকের বাসার রাস্তা গিয়েছে আরেক দিকে। সেই মোড়ে গিয়ে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) দাঁড়ালেন এবং বললেন ভাই! এখন তো আমরা আলাদা হয়ে যাব। আমি বুঝলাম আমার ব্যাপারে আপনার ভিতরে অনেক রাগ রয়ে গেছে। অনেক কিছুই হয়তো বলার আছে, এখন আলাদা হয়ে গেলে তা আর বলতে পারবেন না। তাই আমি এখানে একটু দাঁড়াই, আপনার যা বলার আছে বলুন। বলে আপনার মন পুরো শান্ত হলে তখন আমি চলে যাব। তারপর ফিকির করে দেখব আপনি যা বলেছেন যদি সে সব ব্যাপারে আমার এসলাহ করার কিছু থাকে, সংশোধন করার কিছু থাকে, অবশ্যই তা করব।

এই হল বুযুর্গানে দ্বীনের আমল। তাঁরা নিজেদের ব্যাপারে কখনই রাগ করনে না, কিন্তু শরীআতের কোন হুকুম লঙ্ঘন হতে দেখলে, শরীআতের অবমাননা হতে দেখলে তারা প্রচণ্ড রাগ হয়ে যান। কোথায়

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

রাগ করা যাবে আর কোথায় করা যাবে না– এটাই হল তার মাপকাঠি। আমি রাগবো কীসের জন্য? আমি আমার নিজের জন্য রাগবো না বরং শরীআতের জন্য রাগবো। রাগ ভালবাসা বন্ধুত্ব, শত্রুতা, আদান-প্রদান সবকিছু আবর্তিত হবে শরীআতকে কেন্দ্র করে, দ্বীনকে কেন্দ্র করে। তিরমিযী শরীফের এক হাদীছে একথাই বলা হয়েছে,

مَنْ اَعْطٰى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ وَاَحَبَّ لِلّٰهِ وَاَبْغَضَ لِلّٰهِ وَ اَنْكَحَ لِلّٰهِ فَقَدْ اِسْتَكْمَلَ اِيْمَانَهُ. (رواه الترمذي برقم ٢٥٢١ وقال : حسن)

অর্থাৎ, ঈমান পূর্ণ করার চারটা আমল। তা হল- যা কিছু মানুষকে দিব আল্লাহকে রাজি-খুশি করার জন্য দিব অর্থাৎ, দ্বীনকে সামনে রেখে দিব। যা কিছু না নিব তাও আল্লাহকে রাজি-খুশি করার জন্য, অর্থাৎ দ্বীনকে সামনে রেখে নিব। যাকে ভালবাসব আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ভালবাসব। আর যার প্রতি রাগ হব যাকে ভাল না বাসব, সেটাও আল্লাহর উদ্দেশ্যে করব।

এ হাদীছে বোঝানো হয়েছে মানুষের দেয়া, না দেয়া, ভালবাসা, রাগ হওয়া সবকিছু আবর্তিত হবে আল্লাহকে কেন্দ্র করে, অর্থাৎ দ্বীন ও শরীআতকে কেন্দ্র করে। যে ব্যক্তি এরকম করে, সেই পূর্ণাঙ্গ ঈমানের উপর আছে, পূর্ণাঙ্গ সহীহ তরীকার উপরে আছে।

রাগ হতে হবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে, অর্থাৎ দ্বীনের উদ্দেশ্যে। তাই ব্যক্তির প্রতি রাগ নয় বরং কোন অন্যায় দেখলে, সেই অন্যায়ের প্রতি রাগ আসা জরুরী। সেই অন্যায়কে বাঁধা দেয়া আমার দায়িত্ব। আমার সামনে কোন অন্যায় কাজ হচ্ছে, আমার সাধ্য আছে আমি সেটাকে বাঁধা দিতে পারি, সেটার প্রতিবাদ করতে পারি, তবুও করলাম না, তার প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলাম না, তাহলে আমি সহীহ তরীকার উপর নেই। অন্যায়ের প্রতি রাগ আসবে কিন্তু ব্যক্তির প্রতি কোন রাগ থাকবে না। হযরত থানভী (রহ.) সম্পর্কে প্রসিদ্ধ আছে, তিনি তাঁর সামনে, তাঁর মজলিসে কোন অন্যায় কাজ হতে দেখলে অত্যন্ত রেগে যেতেন। যদি কেউ তাঁর মজলিসে বসার আদব রক্ষা না করত, সাথে সাথে তিনি তাকে ধমক দিতেন। এজন্য প্রসিদ্ধ ছিল তিনি খুব রাগী। হযরত থানভী (রহ.) নিজেই বলেছেন– আমি যখনই রাগ প্রকাশ করি, তখন আমার দিলে দিলে এই নিয়ত থাকে যে, হে আল্লাহ! আমি অন্যায়ের জন্য রাগ করছি, ঐ ব্যক্তির প্রতি আমার কোন ক্ষোভ নেই। ঐ ব্যক্তি তো তোমার কাছে আমার চেয়ে ভাল হতে পারে। তোমার কাছে ঐ ব্যক্তির মর্যাদা আমার চেয়ে বেশিও হতে পারে। তাই ব্যক্তির প্রতি আমার কোন রাগ নেই, আমি অন্যায়ের প্রতিবাদ করছি মাত্র।

রাগ হবে দ্বীনের খাতিরে ব্যক্তিগত আক্রোশে নয়। এর একটা জ্বলন্ত উদাহরণ হল হযরত আলী (রা.)-এর ঘটনা। প্রসিদ্ধ আছে এক কাফের রাসূল (সা.)কে গালি দিয়েছিল। হযরত আলী (রা.) ছিলেন বাহাদুর মানুষ। তিনি সাথে সাথে লোকটাকে ধরে উঁচু করে আছাড় দিয়ে ফেলে দিলেন। তারপর তার বুকের পরে চড়ে বসলেন যে, তোকে শেষ করে দিব। রাসুলকে গালি দেয়ার মত এতবড় দুঃসাহস তোর! তখন লোকটা হযরত আলী (রা.)-এর মুখের উপর থুতু মারল। তখন সাথে সাথে আলী (রা.) তাকে ছেড়ে দিলেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হল আপনার মুখে থুতু মারা হল, আপনার তো আরও রেগে যাওয়ার কথা, অথচ আপনি তাকে ছেড়ে দিলেন! হযরত আলী (রা.) বললেন, পূর্বে তার প্রতি রাগ করেছিলাম আল্লাহকে রাজি-খুশি করার জন্য যে, আল্লাহ্‌র রাসূলকে সে গালি দিয়েছে, এতবড় দুঃসাহস তার। আর যখনই সে আমার মুখে থুতু মেরেছে, তখন আমার ব্যক্তিগত আক্রোশ এসে গেছে। এই রাগ বা আক্রোশটা আল্লাহ্‌র জন্য নয় বরং আমার নিজের জন্য। এখন তাকে হত্যা করলে সেটা হবে আমার

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



ব্যক্তিগত আক্রোশের কারণে। তাই তাকে ছেড়ে দিয়েছি। এটাই হল দ্বীনকে সামনে রেখে রাগ করা বা রাগ বর্জন করার নমুনা।

আর একটা ঘটনা শুনুন। হযরত আব্বাস (রা.) ছিলেন রাসূল (সা.)-এর চাচা। হযরত আব্বাস (রা.)-এর ঘর ছিল মসজিদে নববীর সাথে। রাসূল (সা.) তাঁকে খুব ভালবাসতেন। হযরত আব্বাস (রা.)-এর ঘরের পানি পড়ার পরনালাটা মসজিদের গায়ে এসে লেগেছিল। রাসূল (সা.) পরনালাটা সরাতে বলেননি; বরং বলেছেন এতো আব্বাসের ঘরের পরনালা। এটা এভাবেই থাকুক। হযরত ওমর (রা.) এ ঘটনাটা জানতেন না। এরপর হযরত ওমর (রা.) যখন খলীফা হয়েছেন, তখন তিনি দেখেছেন আল্লাহ্‌র ঘরের সাথে পরনালাটা লেগে আছে, তিনি রাগান্বিত হয়েছেন যে, নিজের ঘরের চালের পানি আল্লাহ্‌র ঘরের পরে যেয়ে পড়ছে, এটা বেআদবী হচ্ছে। হযরত ওমর (রা.) হুকুম দিয়েছেন। পরনালাটি ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে। হযরত আব্বাস (রা.) শুনেই খলীফার কাছে এসে বললেন যে, আপনি আমার ঘরের পরনালা ভেঙ্গেছেন, আপনি জানেন রাসূল (সা.)-এর সামনে এই পরনালাটি এভাবেই মসজিদের সাথে লাগানো ছিল, রাসূল সেটা ভাংগেননি বরং সমর্থন করেছেন? একথা শোনার সাথে সাথে হযরত ওমর (রা.)-এর আগের রাগ পানি হয়ে গেল। তিনি আব্বাস (রা.)কে বললেন, আপনি আমার সাথে আসুন! আব্বাস (রা.)কে সাথে নিয়ে ঐ পরনালার সেখানে গেলেন। ওখানে যেয়ে সওয়ারীর মত হয়ে দাঁড়ালেন এবং আব্বাস (রা.)কে বললেন, আপনি আমার পিঠের উপর দাঁড়িয়ে পরনালাটি আবার লাগান। হযরত আব্বাস (রা.) বললেন, আপনি খলীফা, আপনার পিঠে উঠে কেন লাগাব? আমি অন্য কোন লোক দিয়ে লাগিয়ে নিব। হযরত ওমর (রা.) বললেন, না, আল্লাহর রাসূল যেটা দেখেছেন এবং সমর্থন করেছেন, আমি ওমর সেটা ভাঙ্গার কে? আমার নফসের শাস্তির জন্য আপনাকে বলছি আমি এখানে দাঁড়াব, আপনি আমার পিঠে উঠে ওটা লাগাবেন। হযরত ওমর (রা.) প্রথমে সেটা ভেঙ্গেছেন দ্বীনী চেতনায় ভেঙ্গেছেন, প্রথমে রাগান্বিত হয়েছেন আল্লাহ আল্লাহ্‌র রাসূলের খাতিরে, আল্লাহ এবং আল্লাহ্‌র রাসূলকে রাজি-খুশি করার জন্য। পরে যখন বুঝেছেন এই ভাঙ্গাটা রাসূলের রেজামন্দীর বাইরে চলে যাচ্ছে, এই রাগটা রাসূলের সন্তুষ্টির বাইরে চলে যাচ্ছে। তখন তিনি আবার সেটা করেছেন যাতে রাসূল সন্তুষ্ট। এভাবে আল্লাহ আল্লাহ্‌র রাসূলের রেজামন্দীর কথা চিন্তা করে রাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

এছাড়াও রাগ নিয়ন্ত্রণ করার আরও অনেক পন্থা কুরআন-হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে একটা পন্থা হল দাঁড়ানো অবস্থায় রাগ দমন না হলে বসে পড়তে হবে। বসা অবস্থায় রাগ হলে শুয়ে পড়তে হবে। তাহলে নফসের উল্টা করা হবে। নফসকে দমন করতে হলে সব সময় নফসের উল্টো করতে হয়। নফসের স্বভাব হল যখন রাগ হয়, সে চেতে ওঠে, শোয়া থাকলে বসে যায়, বসা থাকলে দাঁড়িয়ে ওঠে। অর্থাৎ রাগের গতি হল উপরের দিকে। তাই বলা হচ্ছে রাগ দমন করার জন্য গতি নীচের দিকে করে দাও। দাঁড়ানো থাকলে বসে পড়, বসা থাকলে শুয়ে পড়, তাহলে রাগ কমে যাবে। এরপরও যদি রাগ দমন না হয়, তাহলে ঠাণ্ডা পানি পান করতে বলা হয়েছে। ঠাণ্ডা পানি পান করলে রাগের কারণে রক্তে যে উষ্ণতা সৃষ্টি হয়, সেই উষ্ণতা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। এভাবে রাগ পড়ে যাবে।

রাগ দমন করার জন্য রাসূল (সা.) আরেকটা পন্থা বলেছেন, যখন তোমার রাগ হয়, তখন মনে করবে আমার চেয়ে উপরওয়ালা একজন আছেন, তিনি যদি আমার প্রতি রাগ করেন, তাহলে আমার কী উপায় হবে?

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

রাগ বর্জন করা দ্বারা আল্লাহ্‌র কাছে মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। যারা উঁচু মাকাম মর্যাদার লোক, তারা রাগ করতেও পারেন না। রাগ তাদের জন্য শোভাও পায় না। এক রেওয়ায়েতে এসেছে, একদিন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) তাঁর গোলামের প্রতি রাগ হয়ে তাকে খুব বকা ঝকা করেছিলেন। রাসূল (সা.) দেখে বললেন,

لَعَّانِيْنَ وَصِدِّيْقِيْنَ كَلَّا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ! (رواه البيهقي في شعب الإيمان برقم ٥١٥٤)

অর্থাৎ, রাগের কারণে তিরস্কারও করছ আবার অন্য দিকে সিদ্দীকও হয়ে যাবে? কা'বার রবের কসম! এমন হতে পারে না।

অর্থাৎ, মানুষের প্রতি রাগ দেখাও, আবার তুমি আবূ বকর সিদ্দীক! "সিদ্দীক" বলা হয় দ্বীনের ক্ষেত্রে যার মর্যাদা অনেক উঁচু, ধর্মের ক্ষেত্রে যার মর্যাদা, যার মাকাম অনেক উপরে। তাই রাসূল (সা.) বললেন, সিদ্দীক হয়ে আবার মানুষের প্রতি রাগ? সিদ্দীক হবে আবার রাগও করবে, মানুষকে বকা ঝকা করবে, তিরস্কার করবে, তা কী করে হতে পারে? এ দুটোর ভিতর সমন্বয় হতে পারে না। তুমি তো আবূ বকর সিদ্দীক, তাই তুমি রাগ করতে পার না। তুমি ধর্মীয় বড় ব্যক্তিত্ব হয়ে মানুষের প্রতি রাগ করবে, রাগ হজম করতে পারবে না তা হতে পারে না।

দ্বীনের পথে চলতে গেলে রাগ হজম করার অভ্যাস করতে হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে কারীমের এক আয়াতে নেককার মানুষের গুণাগুণ বর্ণনা করে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ.

অর্থাৎ, নেককার মানুষের একটা বড় গুণ হল তারা ক্রোধ হজম করতে জানে। (আলে ইমরান: ১৩৪)

রাগ দমন করার আর একটা পদ্ধতি হল আউযু বিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম পড়ে নেয়া। কারণ রাগের মধ্যে শয়তানের ওয়াছওয়াছার দখল থাকে। আর শয়তানের ওয়াছওয়াছা থেকে বাঁচার একটা উপায় হল আউযু বিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রজীম পাঠ করা। কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে,

وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ.

অর্থাৎ, যদি শয়তানের পক্ষ থেকে কোন উস্কানী তোমাকে পায়, তাহলে আউযু বিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রজীম পড়ে নিও। (হা মীম সাজদা: ৩৬)

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে রাগ দমন করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



বয়ান নং ৪২-এর খুতবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ حَدَّ لَنَا فِىْ كُلِّ شَىْءٍ حُدُوْدًا، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَمْ يُشْرِكْ فِىْ حُكْمِهٖ اَحَدًا، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ اَبْعَدُ النَّاسِ غَضَبًا، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَبَدًا اَبَدًا.

اَمَّا بَعْدُ :

اَيُّهَا النَّاسُ ! اِنَّ الْغَضَبَ خُلُقٌ مَذْمُوْمٌ فِى الشَّرْعِ الْمَتِيْنِ، وَمِنَ الْغَضَبِ يَنْشَأُ مَشَاعِرُ الْاِنْتِقَامِ، وَمِنْهُ يَنْشَأُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ، وَالْحَسَدُ وَالشَّحْنَاءُ، وَيَرِدُ النَّاسُ بِذَالِكَ مَوْرَدَ الْغَضَبِ وَ الْهَلَاكِ، اِلَّا اِذَا كَانَ الْغَضَبُ فِىْ ذَاتِ اللّٰهِ، فَذَالِكَ مَمْدُوْحٌ. وَكَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبْعَدَ النَّاسِ عَنِ الْاِنْتِقَامِ وَاَبْعَدَهُمْ غَضَبًا، اِلَّا اِذَا انْتُهِكَتْ حُرُمَاتُ اللّٰهِ، فَاِنَّهٗ يَغْضَبُ لِذَالِكَ غَضَبًا شَدِيْدًا، وَلَا يُفَرِّقُ فِىْ ذَالِكَ قَرِيْبًا وَلَا بَعِيْدًا، يُقِيْمُ الْحَدَّ عَلٰى مَنْ جَنَا، وَلَا يَشْفَعُ اَحَدًا فِىْ حَدٍّ مِّنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ. فَالْحُبُّ اَوِ الْغَضَبُ كُلُّ ذَالِكَ لَا بُدَّ اَنْ يَّكُوْنَ لِذَاتِهٖ تَعَالٰى. وَلِاَجْلِ ذَالِكَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ اَعْطٰى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ وَاَحَبَّ لِلّٰهِ وَاَبْغَضَ لِلّٰهِ، فَقَدْ اِسْتَكْمَلَ اِيْمَانَهٗ. رَوَاهُ التِّرْمِذِىْ. وَكَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْصِى النَّاسَ بِتَرْكِ الْغَضَبِ. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : اِنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ اَوْصِنِىْ وَلَا تُكْثِرْ عَلَىَّ. قَالَ لَا تَغْضَبْ، فَرَدَّدَ مِرَارًا قَالَ لَا تَغْضَبْ. رَوَاهُ فِىْ جَامِعِ الْاُصُوْلِ. وَكَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْضَبُ لِمَنْ غَضَبَ فِىْ ذَاتِ نَفْسِهٖ . فَيَوْمًا سَبَّ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

غُلَامًا لَهُ غَضْبًا عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِطَابًا لَهُ : لَعَّانِيْنَ وَصِدِّيْقِيْنَ كَلَّا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ!

وَلِكَاظِمِ الْغَيْظِ فَضَائِلُ عَدِيْدَةٌ، وَقَدْ اَعْلَمَكُمُ اللّٰهُ اَنَّ الْجَنَّةَ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ، اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلٰى اَنْ يُّنَفِّذَهُ، دَعَاهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى رُؤُسِ الْخَلَائِقِ، فَيُخَيِّرُهُ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ مَا شَاءَ.

وَاعْلَمُوْا اَنَّ طَرِيْقَ اِزَالَةِ الْغَضَبِ اَلْاِسْتِعَاذَةُ، قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ. وَمِنْ طُرُقِهِ ذِكْرُ غَضَبِ اللّٰهِ تَعَالٰى ، وَهُوَ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ، وَهُوَ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ. وَمِنْ طُرُقِهِ الْجُلُوْسُ اِذَا كَانَ الْغَضَبُ فِى حَالَةِ الْقِيَامِ، اَوِالرُّقُوْدُ اِذَا كَانَ ذَالِكَ فِىْ حَالَةِ الْجُلُوْسِ، اَوْ شُرْبُ مَاءٍ بَارِدٍ، اَوِالْوَضُوْءُ.

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ : وَسَارِعُوْا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ، اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ، وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ.

بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ، وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. اَقُوْلُ قَوْلِىْ هٰذَا وَاسْتَغْفِرُ اللّٰهَ لِىْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَاسْتَغْفِرُوْهُ، اِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



বয়ান নং -৪৩

## গোনাহের প্রতি আকর্ষণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ثَلَاثَةٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْاِيْمَانِ، مَنْ كَانَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَاَنْ يُّحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهٗ اِلَّا لِلّٰهِ، وَاَنْ يَّكْرَهَ اَنْ يَّعُوْدَ فِى الْكُفْرِ بَعْدَ اَنْ اَنْقَذَهُ اللّٰهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ اَنْ يُّقْذَفَ فِى النَّارِ.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

কলবের বিভিন্ন রোগ এবং সেই সব রোগ দূর করার কী উপায়, সে সম্বন্ধে আলোচনা চলছে। কলবের একটা বড় রোগ হল গোনাহের প্রতি আকর্ষণ। গোনাহের প্রতি আকর্ষণ থাকার কারণেই গোনাহের কাজ করতে ভাল লাগে, নেকীর কাজ করতে ভাল লাগে না। যখন-ই গোনাহের কাজ সামনে আসে, মনের টানে, মনের আকর্ষণে আমরা তাতে মশগুল হয়ে পড়ি। আর ইবাদত করতে ভাল লাগে না বলে, নেক কাজ করতে ভাল লাগে না বলে যতটুকু ইবাদত-বন্দেগী এবং নেক কাজ করি, তা জবরদস্তি করি। কোন রকম দায়সারা গোছের করি। তাতে কোন আন্তরিকতা থাকে না। অথচ আন্তরিকতা ছাড়া কোন কাজ করে সেই কাজে কেউ উন্নতি করতে পারে না। দ্বীনী কাজেও আন্তরিকতা থাকলে এ লাইনেই কেউ উন্নতি করতে পারবে না। জোর জবরদস্তি কাউকে উন্নতি করানো যায় না। একটা ছাত্র যার পড়তে ভাল না লাগে, লেখাপড়ার প্রতি যার আন্তরিকতা নেই, জোর-জবরদস্তি তাকে কতটুকু লেখা পড়া করানো যায়? কতটুকু অগ্রসর করানো যায়? জোর-জবরস্তি করে কিছুদূর তাকে নেয়া যায়, খুব বেশি দূর নেয়া যায় না। দ্বীনের ক্ষেত্রে আমাদের মনের অবস্থা এরকম। দ্বীনী কাজের সাথে মহব্বত নেই। মনে চায় না, আন্তরিকতা পয়দা হচ্ছে না। যতটুকু করছি জবরদস্তি করছি। তাই দ্বীনের লাইনে আমাদের উন্নতি হচ্ছে না। যতটুকু হচ্ছে, কোন রকম দায়সারা গোছের হচ্ছে।

আমাদের মনে দ্বীনী কাজের প্রতি মহব্বত এবং আকর্ষণ না থাকার কারণ হল– গোনাহের প্রতি আকর্ষণ এবং গোনাহের কাজ ভাল লাগা। মানুষের মন একটা। এই মনে যেকোন একটা বিষয়ের প্রতিই ভালবাসা থাকতে পারে। হয় গোনাহের প্রতি ভালবাসা থাকবে, নতুবা নেক কাজের প্রতি ভালবাসা থাকবে।

মানুষের মনে যে কোন একটা বিষয়ের প্রতি ভালবাসা থাকবেই। কারণ মানুষের মনের স্বভাব হল ভালবাসা। মনের স্বভাব হল আকর্ষণ বোধ করা। তাই সে যেকোন একটাকে ভালবাসবেই, যেকোন একটার প্রতি তার আকর্ষণ থাকবেই। যদি গোনাহের প্রতি আকর্ষণ থাকে, সেখান থেকে আকর্ষণকে টেনে এনে নেক কাজের প্রতি লাগাতে পারি। হযরত থানভী (রহ.)-এর একজন বড় খলীফা ছিলেন, পাকিস্তানের ডক্টর আ. হাই সাহেব। অনেক উঁচু দরজার বুযুর্গ ছিলেন। তিনি প্রায়ই একটা কথা বলতেন যে, নফ্স বা মন চায় মজা! যে কোন জিনিস দ্বারা মজা হলেই তার সারে। কোন নির্দিষ্ট জিনিসেরই মজা হতে হবে এরকম কোন গোঁ নেই তার। তাকে আমি যেটা দিব, সেটা খেয়ে সে মজা বোধ করতে অভ্যস্ত হয়ে যাবে। যদি তাকে গোনাহের কাজে লিপ্ত করি, তাহলে সে গোনাহের কাজে মজা বোধ

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

করতে অভ্যস্ত হবে। আর যদি নেক কাজে লিপ্ত করি, তাহলে নেক কাজে মজা বোধ করতে অভ্যস্ত হবে। নফসের প্রয়োজন হল মজা, কিন্তু এই মজার মাধ্যম কী হবে, সে ব্যাপারে তার নির্দিষ্ট কোন চাহিদা নেই; যেটাতে লাগাব সেটাতেই লাগবে। যেমন একটা ছোট বাচ্চা, যে কিছুই বোঝে না, তার কোন একটা মজা চাই-ই। এখন তাকে যদি আমি চকলেট খাওয়ানোর মজা বুঝিয়ে দেই, তাহলে বারবার সে চকলেট চাইবে, তার মধ্যেই সে মজা খুঁজে পাবে; যা তার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এর বিপরীত যদি তাকে ভাল ফল-ফ্রুট খাওয়ানোর অভ্যাস করাই, তাহলে এর ভিতরেই সে মজা পাবে। এটা তার স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। তাকে চকলেট স্পর্শই করতে দিব না, শুধু ফল-ফ্রুটই দিতে থাকব, তাহলে এর ভিতরেই তার মজা লেগে যাবে, এটাতেই তার নেশা লেগে যাবে। আমি তাকে যেটাতেই অভ্যস্ত করাব, সেটাতেই সে অভ্যস্ত হয়ে যাবে। নফ্সের অবস্থাও এরকম। নফ্সের মজা চাই, গোনাহের মজা হোক বা নেক কাজের মজা হোক। যেটাতে তাকে অভ্যস্ত করাব, সেটাতেই সে মজা বোধ করতে থাকবে।

যারা নেক কাজের মজা বোঝে না, ইবাদত-বন্দেগীর মজা বোঝে না, তাদের কাছে মনে হয় নেক কাজ এবং ইবাদত-বন্দেগীতে কোন মজা নেই। কিন্তু এটা ঠিক নয়। নেক কাজেও মজা আছে। ইবাদত-বন্দেগীতেও মজা আছে। আমরা বুঝি না, তাই মনে করি মজা নেই। যারা বোঝেন তারা ঠিকই এই মজায় ডুবে থাকেন। হযরত সুফিয়ান ছাওরী (রহ.), যিনি দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দীর একজন বড় মুহাদ্দিছ এবং বড় বুযুর্গ ছিলেন। তিনি বলতেন, আমরা এই দ্বীনী জ্ঞান চর্চা, ইবাদত-বন্দেগী এবং আল্লাহ্কে ডাকার মধ্যে যে মজা পাই, যদি রাজা বাদশাহ এবং সম্পদশালী দুনিয়াদাররা এর খোঁজ পেত, তাহলে তলোয়ার উঁচু করে, সৈন্য-সামন্ত নিয়ে আমাদের মজার উপরে আক্রমণ করত যে, এত বড় মজার জিনিস নিয়ে তোমরা আছ, আমাদেরকেও এর অংশ দাও। কিন্তু ওরা এটার সন্ধান পায়নি, ওরা দুনিয়ার মধ্যেই মজা বুঝেছে। কিন্তু আসল মজার সন্ধান পেয়েছি আমরা। এক বুযুর্গ কবিতা রচনা করেছেন,

نہ کھانے میں مزہ ہے نہ سونے میں نہ پینے میں
مزہ جو کچھ آتا ہے اخیر رات کو رونے میں

অর্থাৎ, না খাওয়ার ভিতর মজা আছে, না পান করার মধ্যে, না ঘুমানোর মধ্যে। মজা যা পাওয়া যায়, তা তো শেষ রাতে কান্নাকাটির মধ্যে।

বোঝা গেল যারা এই লাইনের লোক, তারা এ লাইনের মজা বোঝেন। আমরা এই মজায় অভ্যস্ত নই, তাই মজা বুঝি না।

গোনাহের কাজেও মজা আছে, নেক কাজেও মজা আছে। তবে এই দুই মজার মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। গোনাহের মজা মানুষ শুরুর থেকেই বুঝতে পারে, নেক কাজের মজা শুরুতে বুঝতে পারে না। পরে বুঝতে পারে। শুরুতে গোনাহের মজা বোধ হয়, কিন্তু পরে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। হযরত থানভী (রহ) বলতেন গোনাহের মজার উদাহরণ হল – গায়ে খুজলী চুলকাতে খুব মজা বোধ হয়, কিন্তু চুলকানী শেষ হলে পরে জ্বলতে থাকে। শুরুতে ইবাদত-বন্দেগী করতে মজা লাগে না, বরং কষ্ট লাগে, তবে পরে মজা লাগে। এর বিপরীত গোনাহের কাজে শুরুতে মজা লাগে, কিন্তু পরে মজা লাগে না। এক হাদীছের মধ্যে নবী কারীম (সা.) ইরশাদ করেছেন,

حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ. (رواه مسلم برقم ٧٣٠٨ والبخاري برقم )

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com



অর্থাৎ, জান্নাতকে ঢেকে রাখা হয়েছে অপছন্দনীয় এবং কষ্টকর জিনিস দিয়ে, আর জাহান্নামকে ঢেকে রাখা হয়েছে আকর্ষণীয় জিনিস দিয়ে।

এ হাদীছে বোঝানো হয়েছে জান্নাতে যেতে যেসব কাজ করতে হয়, তা করতে শুরুতে খারাপ লাগে। তবে পরে আর খারাপ লাগে না বরং ভিতরে ঢুকলে দেখা যায় খুব আকর্ষণীয়। এর বিপরীত জাহান্নামে যাওয়ার যত কাজ, সেগুলো শুরুতে খুব আকর্ষণীয় লাগে, কিন্তু আসলে সেগুলো আকর্ষণীয় নয়; ভিতরে ঢুকলে দেখা যায় তার মধ্যে নরকের অশান্তি। এ কথাটিকেই রাসূল (সা.) এ ভাষায় বলেছেন যে, জান্নাতকে ঢেকে রাখা হয়েছে খুব অপছন্দনীয় জিনিস দ্বারা যাতে কোন আকর্ষণ নেই। আর জাহান্নামকে ঢেকে রাখা হয়েছে আকর্ষণীয় জিনিস দ্বারা।

যাহোক নেক কাজ করতে শুরুতে মজা হয় না, কিন্তু পরে যে মজা হয়, তা গোনাহের মজার চেয়ে অনেক বেশি। মুসনদে আহমদ কিতাবে একটা হাদীছে এসেছে –রাসূল (সা.) বলেন, যখন পথে ঘাটে চলতে কোন বেগানা মহিলার দিকে তোমার নজর পড়ে যাবে, তোমার মনে তার দিকে তাকানোর চাহিদা জাগবে, তখন তার দিকে তাকানো থেকে বিরত থাকলে দিলের মধ্যে নূর উপলব্ধি হবে। এই নূর উপলব্ধি হলেই মজা আসতে শুরু করবে। এটা শুধু বদ-নজর থেকে বেঁচে থাকলে নয় বরং সব পাপের ক্ষেত্রে এই কথা। পাপ থেকে বিরত থাকলে ধীরে ধীরে মজা বোধ এসে যাবে, স্বাদ উপলব্ধি হতে থাকবে। দুনিয়ার কোন স্বাদ সেই স্বাদের মোকাবিলা করতে পারবে না। যেমন মানুষের গীবত করতে মজা লাগে, মানুষের দোষ চর্চা করতে ভাল লাগে। এখন কেউ যদি এই মজাকে উপেক্ষা করে গীবত থেকে বিরত থাকতে অভ্যস্ত হয়, তাহলে সেই বিরত থাকার ভিতরে একটা স্বাদ উপলব্ধি হবে যে, আমি একটা নেক কাজ করতে পারলাম। আমি নফ্সের সাথে মোকাবিলা করে জয়ী হতে পারলাম। এভাবে একটা আনন্দ উপলব্ধি ভিতরে সৃষ্টি হবে। ধীরে ধীরে এই আনন্দ উপলব্ধিটাই জোরালো হবে। তখন গীবত করার স্বাদ থাকবে না। বরং সেটা বিষে পরিণত হবে। তখন গীবত করতে খারাপ লাগবে। গীবত থেকে বিরত থাকতেই মজা বোধ হবে।

সব গোনাহের ক্ষেত্রেই একথা। প্রথমে বিরত থাকতে কষ্ট হয়, পরে বিরত থাকতে মজা লাগে। অন্তরে প্রশান্তি বিরাজ করতে থাকে। আর গোনাহের অবস্থা হল– প্রথমে মজা লাগে, কিন্তু শেষ দিকে আর মজা থাকে না, মনে তৃপ্তি বোধ আসে না। বরং যত গোনাহ করে তত আরও বেশি গোনাহ করতে মনে চায়। যতই গোনাহ করে, ততই অতৃপ্তি বাড়তে থাকে। যেমন– একজন মানুষ প্রথমে বেগানা মহিলাকে দেখতে মজাবোধ করে। দেখতে দেখতে তখন দেখার মজা আর থাকে না, মনে অতৃপ্তি থেকে যায়। তখন আরও আগে বাড়তে মনে চায়। আরও আগে বাড়লেও তৃপ্তি হয় না। পাশ্চাত্যের লোকেরা অবাধে যেনা করতে পারে, যেনা করতে কোন বাঁধা নেই। ইচ্ছা করলেই রাস্তা ঘাটে পার্কে মানুষের সামনে কুকুর কুকুরীর মত লেগে যায়। এত অবাধে যেনা করেও তাদের মন তৃপ্ত হয় না। তখন তাদের মনে চায় স্বেচ্ছায় যেনা করার মজা তো দেখলাম; জোর জবরদস্তি কোন নারীকে ধর্ষণ করার মধ্যে যেন কী মজা! তখন তারা জোর জবরদস্তী ধর্ষণ করে নতুন মজা খোঁজার চেষ্টা করে। এতেও তাদের মন তৃপ্ত হয় না। তখন তারা নারী নারীর সাথে, পুরুষ পুরুষের সাথে সমকামিতায় লিপ্ত হয়, নতুন তৃপ্তি খুঁজতে চায়। কিন্তু কোন ভাবেই তাদের মনে তৃপ্তি আসছে না। অতৃপ্তি থেকেই যাচ্ছে। তাই বলা হচ্ছিল পাপ কাজে প্রথমে মজা থাকে কিন্তু পরে আর মজা থাকে না। পাপ কাজে মনের তৃপ্তি কোন দিনই আসে না। এর বিপরীত নেক কাজের মজা সব সময় থাকে। নেক কাজে মন তৃপ্ত হয়ে যায়। দেহ মনজুড়ে পূর্ণাঙ্গ প্রশান্তি বিরাজমান হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ.

অর্থাৎ, আল্লাহকে স্মরণ করার দ্বারাই অন্তরের প্রশান্তি অর্জিত হয়। (রা'দ: ২৮)

এই মজা এবং প্রশান্তি অর্জন করার জন্য প্রথমে গোনাহের মজা বর্জন করার কষ্ট সহ্য করতে হবে। যেমন একটা শিশু মায়ের দুধ খেতে খুব মজা পায়। এরপর একটা পর্যায় আসে, তখন তার জন্য এই দুধ খাওয়া ঠিক নয়। তখন মা তার দুধ ছাড়াতে চেষ্টা করে। কিন্তু বাচ্চা কোনোভাবেই দুধ খাওয়ার মজা ছাড়তে চায় না, সে কান্নাকাটি করে, চিৎকার করে। সে বোঝে না যে, দুধ ছাড়ার কষ্ট সহ্য করলে পরে ভাত মাছ, কোরমা পোলাও ইত্যাদি আরও বেশি মজার জিনিস রয়েছে, সেগুলো অভ্যস্ত করলে আরও বেশি মজা পাওয়া যাবে। নফসের অবস্থাও এরকম দুধের শিশুর মত। আল্লামা বুছিরী (রহ.) বলেছেন,

اَلنَّفْسُ كَالطِّفْلِ اِنْ تُهْمِلْهُ شَبَّ عَلٰى + حُبِّ الرِّضَاعِ وَاِنْ تَفْطِمْهُ يَنْفَطِمُ

অর্থাৎ, নফ্স হল বাচ্চার মত। যদি তার দুধ না ছাড়াও, জওয়ান হয়ে গেলেও দুধ খেতেই থাকবে। আর যদি কান্নাকাটি সত্ত্বেও দুধ ছাড়িয়ে দাও, তাহলে ছাড়তে পারবে। কিন্তু প্রথম ছাড়তে একটু কষ্ট লাগবে, তবে পরে আর কোন কষ্ট থাকবে না বরং পরে আরও মজাদার খাবার খেতে অভ্যস্ত হয়ে, পেছনের মজার চেয়ে আরও বেশি মজাবোধ করতে শুরু করবে।

ঈমান আমলের যে মজা বা স্বাদ রয়েছে, সেই মজা এবং স্বাদ পাওয়ার জন্য কিছু আমল করণীয় রয়েছে। এ প্রসঙ্গে এক হাদীছে রাসূল (সা.) তিনটা বিষয়ের কথা উল্লেখ করে বলেছেন,

ثَلَاثَةٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْاِيْمَانِ، مَنْ كَانَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَاَنْ يُّحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ اِلَّا لِلّٰهِ، وَاَنْ يَّكْرَهَ اَنْ يَّعُوْدَ فِى الْكُفْرِ بَعْدَ اَنْ اَنْقَذَهُ اللّٰهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ اَنْ يُّقْذَفَ فِى النَّارِ. (رواه مسلم في صحيحه برقم ١٧٤)

অর্থাৎ, যার মধ্যে তিনটা বিষয় থাকবে, সে ঈমান আমলের স্বাদ উপলব্ধি করতে পারবে। ঈমান-আমলের মজা পেতে থাকবে। সেই তিনটা বিষয় হল–

এক নং مَنْ كَانَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا অর্থাৎ, দুনিয়ার সকলের ভালবাসার চেয়ে আল্লাহ আল্লাহ্র রাসূলের ভালবাসাকে প্রাধান্য দিতে হবে। সকলের ভালবাসার চেয়ে আল্লাহ আল্লাহ্র রাসূলের ভালবাসা বড় – এটা চিন্তা করতে হবে। যখন আমার মনে আল্লাহ-আল্লাহ্র রাসূলের ভালবাসা বেশি থাকবে, তখন আল্লাহ, আল্লাহ্র রাসূলের কোন হুকুম মানতে গিয়ে কোন মানুষের অপ্রিয় হতে হলেও তার প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ আসবে না। আমি আল্লাহ, আল্লাহ্র রাসূলের আদর্শে চললে মানুষ আমাকে ভালবাসবে না, ভাল জানবে না, তারপরেও আল্লাহ, আল্লাহর রাসূলের ঐ হুকুম মানতে পারব। কারণ আমার কাছে সকলের ভালবাসার চেয়ে আল্লাহ, আল্লাহ্র রাসূলের ভালবাসাই বড়। আমি দাড়ি-টুপি রাখতে গেলে, ইসলামী লেবাস-পোষাক পরতে গেলে অমুকের কাছে প্রিয় হতে পারব না, আমার বিবি ভালবাসবে না –এই সব সমস্যা কোন সমস্যা বোধ হবে না। কারণ তাদের চেয়ে আল্লাহ আল্লাহর রাসূলের কাছে প্রিয় হওয়ার বিষয়টা আমার কছে বড়। এটাকেই বলা হয় আল্লাহ আল্লাহ্র রাসূলের ভালবাসাকে প্রাধান্য দেয়া। আল্লাহ আল্লাহ্র রাসূলের ভালবাসাকে প্রাধান্য না দিলে ঈমান-ই মুকাম্মাল হয় না। ঈমান পূর্ণাঙ্গ হয় না। হাদীছে ইরশাদ হয়েছে,

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ. (صحيح البخاري ١٥ وصحيح مسلم ١٧٨)

অর্থাৎ, তোমাদের কেউ পূর্ণাঙ্গ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ তার মাতা-পিতা, সন্তান এবং সকল মানুষের চেয়ে আমি তার কাছে বেশি প্রিয় না হব।

এ হাদীছে সকল মানুষের চেয়ে আল্লাহ আল্লাহ্র রাসূলকে বেশি ভালবাসার কথা বলা হয়েছে। যখন আমরা আল্লাহ আল্লাহ্র রাসূলকে বেশি ভালবাসব, তখন তাঁদের কথা মানতে অর্থাৎ, দ্বীনের উপর চলতে স্বাদ লাগবে, দ্বীনী কাজের প্রতি মহব্বত সৃষ্টি হবে। দ্বীনী কাজের প্রতি মনে আকর্ষণ বোধ হবে এবং গোনাহের আকর্ষণ কমে যাবে।

ঈমান আমলের স্বাদ পাওয়ার জন্য দ্বিতীয় যে বিষয়টার কথা বলা হয়েছে, তা হল– وَاَنْ يُّحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ اِلَّا لِلّٰهِ অর্থাৎ, মানুষকে ভালবাসবে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে। স্বামী-স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, বন্ধু-বান্ধব সকলকে ভালবাসতে হবে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে। অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়। যার মনের অবস্থা এরকম হবে, সে মনে করবে আমি আমার স্বামী বা স্ত্রীকে ভালবাসি, আমার সন্তানকে ভালবাসি, অমুককে ভালবাসি, অমুককে ভালবাসি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ভালবাসি। আল্লাহর ভালবাসাই মূল। তখন সেই আল্লাহ্র সব হুকুম মানতে তার ভাল লাগবে, মজা লাগবে। এভাবে সে ঈমান আমলের স্বাদ পেতে শুরু করবে।

ঈমান আমলের স্বাদ পাওয়ার জন্য তৃতীয় যে বিষয়টার কথা বলা হয়েছে তা হল– وَاَنْ يَّكْرَهَ اَنْ يَّعُوْدَ فِى الْكُفْرِ بَعْدَ اَنْ اَنْقَذَهُ اللّٰهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ اَنْ يُّقْذَفَ فِى النَّارِ অর্থাৎ, গোনাহের কাজ করতে, কুফ্রী করতে তার এত খারাপ লাগতে হবে, যেন তাকে আগুনে নিক্ষেপ করা হচ্ছে। একজন মানুষকে যদি আগুনে নিক্ষেপ করতে চাওয়া হয়, তাহলে এটাকে সে কত অপছন্দ করবে? সেই অপছন্দের কোন শেষ নেই। চূড়ান্তভাবে অপছন্দ করবে। কোন মানুষ কোন ভাবেই সেটা পছন্দ করবে না। তদ্রূপ গোনাহের কাজ করতেও মনের অবস্থা এই হতে হবে যে, কোনভাবেই আমি তা চাই না। রাসূল (সা.) গোনাহের কাজ করাকে আগুনে ফেলানোর সাথে উদাহরণ দিয়ে কথাটা বুঝিয়েছেন। কারণ গোনাহের কাজ করলে পরিণামে আমাদেরকে আগুনেই পুড়তে হবে। আমি একটা গোনাহের কাজ করছি– এর অর্থ হল আমি নিজেকে আগুনে নিক্ষেপ করছি। যেকোন গোনাহ করার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আমি আমাকে আগুনের ভিতরে নিক্ষেপ করছি, জাহান্নামের ভিতরে নিক্ষেপ করছি। তাই দুনিয়ার আগুনে পুড়তে যদি এত অপছন্দ লাগে, তাহলে জাহান্নামের আগুনে পুড়তে কেন অপছন্দ লাগবে না। আমাদের ঈমান পূর্ণাঙ্গ নেই। আমরা দুনিয়ার আগুনকে বিশ্বাস করি, তাই এ আগুনে পড়ার কথা চিন্তা করতে আমাদের কষ্ট লাগে। জাহান্নামের আগুনকে আমরা ঐ পর্যায়ে বিশ্বাস করি না, তাই পাপ করলে জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে হবে –এ চিন্তা মজবুত হয় না। ফলে পাপ করতে খারাপ লাগে না। আমি পাপ করলে জাহান্নামে পড়ব –এই উপলব্ধি জাগ্রত করতে হবে, তাহলে পাপ কাজ খারাপ লাগবে এবং নেক কাজ ভাল লাগবে, ঈমান-আমলের কাজে মজা বোধ সৃষ্টি হবে।

যাহোক ঈমান আমলের স্বাদ সৃষ্টি করার জন্য এই তিনটা বিষয়ের কথা হাদীছে বলা হয়েছে। অন্য এক হাদীছে রাসূল (সা.) বলেছেন,

ذَاقَ طَعْمَ الْاِيْمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا. (صحيح مسلم برقم ١٦٠)

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

অর্থাৎ, ঐ ব্যক্তি ঈমান-আমলের স্বাদ উপলব্ধি করতে পারবে, যে আল্লাহকে তার রব হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট, নবী মুহাম্মাদ (সা.)কে তার রাসূল হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট এবং ইসলামকে তার ধর্ম হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট।

যে মনে করবে যে তার খোদা সবচেয়ে ভাল খোদা, তিনিই আসল খোদা, তিনি কোন মানুষের হাতে গড়া নকল খোদা নন যে, নিজের হাতে মাটি,পাথর দিয়ে তৈরি করে আবার তারই পূজা করলাম। এমন অথর্ব খোদা নয়। বরং তার খোদাই আসল খোদা, তিনিই আসল সৃষ্টিকর্তা। এরকম চিন্তা করলে সেই খোদার কথা মানতে তার ভাল লাগবে। এমনিভাবে যখন চিন্তা করবে যে, আমার ধর্মই সঠিক ধর্ম। আমি এই ধর্ম নিয়ে সন্তুষ্ট। ধর্ম সম্পর্কে এরকম চিন্তা করলে তখন এই ধর্ম মানতে তার ভাল লাগবে। এমনিভাবে যখন চিন্তা করবে আমার রাসূলকে পেয়ে আমি সন্তুষ্ট। আমার রাসূল শ্রেষ্ঠ রাসূল, যাকে সৃষ্টি করা না হলে এই দুনিয়া সৃষ্টি করা হত না, জান্নাত-জাহান্নাম কিছুই সৃষ্টি করা হত না। আমি সেই শ্রেষ্ঠ রাসূলের উম্মত। আল্লাহ পাক অনুগ্রহ করে আমাকে এই নবীর উম্মত বানিয়েছেন। যে নবীর উম্মত হওয়ার জন্য আগের যুগের নবীরা পর্যন্ত আল্লাহ্‌র কাছে দরখাস্ত করেছেন। সেই নবীর উম্মত হতে পেরে আমি ভাগ্যবান। এরকম চিন্তা করলে এই নবীর আদর্শ মানতে ভাল লাগবে, মজা লাগবে।

এ হাদীছের সার কথা হল- আল্লাহ, আল্লাহ্‌র রাসূল এবং ধর্মের প্রতি ভক্তি থাকলে ধর্মকর্মে মজা পাওয়া যাবে। ধর্মের জন্য সব রকম কষ্ট স্বীকার করতেও মজা লাগবে। আমরা দেখতে পাই কোন এক নেতার প্রতি যদি কারও ভক্তি থাকে, কোন মতবাদকে যদি কেউ ভালবাসে, তাহলে সেই নেতার কথায় উঠতে বসতে সে মজা বোধ করে, সেই মতবাদের জন্য সে সব রকম কষ্ট আনন্দের সাথে মেনে নিতে পারে। মিছিল করতে মজা বোধ করে, মিটিং-সিটিং করতে মজা বোধ করে, এমনকি তার জন্য নিজের জীবন বিসর্জন দিতেও আনন্দ বোধ করে। এমনিভাবে যদি আল্লাহ্‌র প্রতি ভক্তি থাকে, আল্লাহ্‌র রাসূলের প্রতি ভক্তি থাকে, দ্বীনের প্রতি ভক্তি থাকে, তাহলে আল্লাহ আল্লাহ্‌র রাসূলের জন্য এবং দ্বীনের জন্য সবকিছু করতে মজা বোধ হবে। প্রত্যেকটা পদে পদে আনন্দ লাগবে।

এতক্ষণ বলা হল নেক কাজে মজা বোধ সৃষ্টি করার জন্য কী কী করতে হবে। এর সাথে সাথে গোনাহের প্রতি আমাদের যে আকর্ষণ বা মহব্বত রয়ে গেছে, সেটাকেও দূর করতে হবে। মন থেকে গোনাহের আকর্ষণ এবং মহব্বত দূর করতে গেলে যেসব গোনাহের প্রতি আমাদের আকর্ষণ রয়েছে, সেই সব গোনাহের উপকরণগুলো কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে হবে এবং সেই গোনাহ সম্বন্ধে সবরকম আলোচনা পর্যালোচনা থেকেও বিরত থাকতে হবে।

একবার রাসূল (সা.)-এর কাছে বাহরাইন থেকে একটা প্রতিনিধি দল আসল। তখনকার যুগে সৌদি আরবের পূর্ব দিকের পারস্য উপসাগরীয় উপকূলীয় কিছুটা এলাকাকে বাহরাইন বলা হত। এখান থেকে আব্দুল কায়েছ গোত্রের একটা প্রতিনিধি দল রাসূল (সা.)-এর কাছে আসল। এক পর্যায়ে তারা উল্লেখ করল যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ। আমরা সকলে নেশায় অভ্যস্থ। তারা মদ খেতে অভ্যস্ত ছিল। রাসূল জিজ্ঞাসা করলেন তোমরা কী কী পাত্রে মদ তৈরি কর? তারা চার ধরনের পাত্রের কথা উল্লেখ করল যে, আমরা কদূর খোলের ভিতরে মদ তৈরি করি। সবুজ রংয়ের লেপ দেয়া কলসিতে মদ তৈরি করি। আলকাতরা-র লেপ দেয়া পাত্রে মদ তৈরি করি এবং খেজুর গাছের গুড়ি দিয়ে তৈরি করা পাত্রে মদ তৈরি করি। রাসূল (সা.) বললেন, মদতো হারাম, এই পাত্রগুলোও তোমাদের জন্য হারাম করে দিলাম। এই পাত্রগুলোও ব্যবহার করতে পারবে না। এখানে বোঝার দরকার পাত্রের কী দোষ? পাত্রগুলো অন্য

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



কাজেও ব্যবহার করা যেতে পারত। তা সত্ত্বেও রাসূল (সা.) কেন এই চার ধরনের পাত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করে দিলেন। মুহাদ্দিছীনে কেরাম এ ব্যাপারে বলেছেন এটা হল একটা মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার। ঐ পাত্র দেখলেই তাদের ভিতর মদের নেশা চাঙ্গা হয়ে যেতে পারত। তাই ঐ পাত্রগুলোও ব্যবহার করতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। তাদের মদের নেশা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করার জন্যই তাদের মদের সব ধরনের পাত্রকে ব্যবহার করতে নিষেধ করে দেয়া হয়েছিল।

যারা সিগারেট খান, তারা যদি একটা সিগারেটের প্যাকেট দেখেন, কিংবা এ্যাশট্রে দেখেন, তাহলে তাদের ভিতরে সিগারেট খাওয়ার জযবা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এমনিভাবে যারা যে রকম নেশায় অভ্যস্ত, সেই নেশার উপকরণ দেখলে ভিতরের চাপা নেশা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। যারা গান-বাদ্য শোনায় অভ্যস্থ, গানের উপকরণ দেখলে তাদের ভিতরে গানের নেশা জাগ্রত হয়ে ওঠে। যারা অশ্লীল ছবি দেখতে অভ্যস্ত, ভিডিও দেখলে, টেলিভিশন সামনে আসলে, সিডি সামনে আসলে তাদের মধ্যে সেই চেতনা জাগ্রত হয়ে ওঠে। যারা খেলা-ধূলায় অভ্যস্ত, খেলা-ধূলার উপকরণ দেখলে কিংবা পেপার-পত্রিকায় খেলার বিবরণ পড়লে কিংবা কারও মুখে তার আলোচনা শুনলে আবার ঐ চেতনা জাগ্রত হয়ে ওঠে। তাই গোনাহ থেকে বিরত থাকার জন্য যে রকম গোনাহে অভ্যস্ত সেই গোনাহের উপকরণ কাছ থেকে সরিয়ে ফেলার কথা বলা হয়েছে। তার কোন আলোচনা নিজেও না করা, অন্য কারও থেকে তার আলোচনা না শোনা। এভাবে বিরত থাকলে আস্তে আস্তে মনের ভিতর থেকে নেশা মুছে যাবে। চাই যত বড় নেশাই থাকুক।

এক শ্রেণির লোক আছে যারা খেলার পাগল। পেপার সামনে আসলে আগে খেলার খবরটা পড়ে নেয়। দুনিয়ার অন্য কোন খবর না রাখলেও খেলার খবরটা ঠিকই রাখে। এরকম লোকও যদি কিছুদিন পেপার পড়া থেকে বিরত থাকে, খেলার কোন আলোচনা পর্যালোচনা করা ও শোনা থেকে বিরত থাকে, তাহলে গ্যারান্টি দিয়ে বলা যায় যে, কিছু দিনের মধ্যেই তার মন থেকে খেলার নেশা চলে যাবে। সব গোনাহের ব্যাপারেই এই কথা। কেউ কোন মেয়ের প্রেমে পড়েছে, তাহলে নিজে তার আলোচনা করবে না, কারও থেকে তার সম্বন্ধে কোন আলোচনা শুনবে না, ভিতরে চিন্তা আসলে সেই চিন্তাকেও অগ্রসর করবে না, অন্য চিন্তায় লিপ্ত হয়ে যাবে। এরূপ করতে থাকলে কিছু দিনের মধ্যেই অটোমেটিক তার মন থেকে সেই মেয়ের প্রেম মুছে যাবে। সারকথা যেকোন গোনাহের উপকরণ থেকে দূরে থাকলে তার আলোচনা, পর্যালোচনা এবং চিন্তা থেকে বিরত থাকলে অটোমেটিক মন থেকে সেই গোনাহের আকর্ষণ মুছে যাবে। গোনাহের আকর্ষণ থেকে দিলকে মুক্ত করে ইবাদত করতে থাকলে ইবাদতে মজাও বেশি লাগবে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে সহীহ সমঝ দান করুন, আমল করার তাওফীক নছীব করুন। আমীন!

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বয়ান নং ৪৩-এর খুতবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ قَدَّرَ الْاُمُوْرَ وَقَضَاهَا، وَاَلْهَمَ فِى النُّفُوْسِ فُجُوْرَهَا وَتَقْوَاهَا، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ شَهَادَةً تَدُوْمُ وَلَا تَتَنَاهَا، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهُ الَّذِىْ بَيَّنَ لِلنَّاسِ الشَّرَائِعَ اَدْنَاهَا وَاَقْصَاهَا ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ مَا بَقِىَ لِنَفْسِ الْاِنْسَانِ هُدَاهَا.

اَمَّا بَعْدُ :

اَيُّهَا النَّاسُ! اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى خَلَقَ الْجَنَّةَ وَحَجَبَهَا بِالْمَكَارِهِ، وَخَلَقَ النَّارَ وَحَجَبَهَا بِالشَّهَوَاتِ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَ حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ. وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، ذَالِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ. فَلِاَجْلِ ذَالِكَ الْمَعَاصِىْ مِمَّا تَشْتَهِيْهَا نُفُوْسُ الْاِنْسَانِ وَتَرْغَبُ اِلَيْهَا، وَالْمَحَاسِنُ مِمَّا تُنْكِرُهَا وَتَرْغَبُ عَنْهَا، بِالْاِضَافَةِ اِلٰى اَنَّ الشَّيْطَانَ يُزَيِّنُ لِلنَّاسِ الْمَعَاصِىَ وَالسَّيِّئَاتِ. قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ. وَفِىْ اٰيَةٍ اُخْرٰى ـ اِنَّ الَّذِيْنَ ارْتَدُّوْا عَلٰى اَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطٰنُ سَوَّلَ لَهُمْ وَاَمْلٰى لَهُمْ. وَكُلُّ ذَالِكَ اِبْتَلَاءٌ مِّنَ اللّٰهِ الْحَكِيْمِ.

وَاعْلَمُوْا اَنَّ الْمَعَاصِىَ وَلَذَّاتِ الدُّنْيَا وَاِنْ جُبِلَتْ عَلَيْهَا النُّفُوْسُ لَاكِنَّ النَّفْسَ لَا تَطْمَئِنُّ بِهَا، بَلْ تَزْدَادُ شَوْقًا وَرَغْبَةً اِلَى الشَّهَوَاتِ زِيَادَةَ اِشْتِغَالِهَا بِهَا. وَاِلَيْهِ اَشَارَ قَوْلُهٗ تَعَالٰى ـ وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



اَلْاٰيَةُ. فَلَا تَطْمَئِنُّ بِهَا بَلْ تَطْمَئِنُّ بِالْعِبَادَةِ وَالذِّكْرِ. قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ. وَالنَّفْسُ تَتَقَاضٰى لَذَّةً بِاَىِّ نَوْعٍ كَانَتْ لَا لَذَّةً خَاصَّةً، فَاِنْ اِعْتَادَتْ بِالْعِبَادَةِ تَتَلَذَّذُ بِهَا، وَاِنْ اِعْتَادَتْ بِالْمَعَاصِىْ تَتَلَذَّذُ بِهَا. وَاِلَيْهِ اَشَارَ الْبُوْصِيْرِىْ بِقَوْلِهٖ :

اَلنَّفْسُ كَالطِّفْلِ اِنْ تُهْمِلْهُ شَبَّ عَلٰى ÷ حُبِّ الرِّضَاعِ وَاِنْ تُفْطِمْهُ يَنْفَطِمُ

وَبَيَّنَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُمُوْرًا تَجِدُ النَّفْسُ بِهَا حَلَاوَةَ الْاِيْمَانِ وَالْاَعْمَالِ. فَقَالَ : ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْاِيْمَانِ، مَنْ كَانَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَاَنْ يُّحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهٗ اِلَّا لِلّٰهِ، وَاَنْ يَّكْرَهَ اَنْ يَّعُوْدَ فِى الْكُفْرِ بَعْدَ اَنْ اَنْقَذَهُ اللّٰهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ اَنْ يُّقْذَفَ فِى النَّارِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِىْ حَدِيْثٍ اٰخَرَ ـ ذَاقَ طَعْمَ الْاِيْمَانِ مَنْ رَضِىَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّ بِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ نَّبِيًّا وَّرَسُوْلًا.

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ : مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ، وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. اَقُوْلُ قَوْلِىْ هٰذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ لِىْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَاسْتَغْفِرُوْهُ، اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বয়ান নং -৪৪

## মিথ্যা, ওয়াদা খেলাফী ও খেয়ানত প্রসঙ্গ (১ম পর্ব)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّهٗ نَصِيْبٌ مِّنْهَا وَ مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَّهٗ كِفْلٌ مِّنْهَا. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اَلَا اُنَبِّأُكُمْ بِاَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلَاثًا قَالُوْا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ. قَالَ: اَلْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ وَفِىْ رِوَايَةٍ وَقَوْلُ الزُّوْرِ.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

আপনাদের সামনে একটা হাদীছ শরীফ তেলাওয়াত করা হয়েছে। এই হাদীছের মধ্যে রাসূল (সা.) বলেছেন, তিনটা বিষয় এমন আছে, যে তিনটা হল মুনাফেক হওয়ার আলামত। অর্থাৎ, খাঁটি মুসলমান এই তিনটা কাজ করতে পারে না। নিজেকে মুসলমান বলে পরিচয় দেয়া সত্ত্বেও যদি কেউ এই তিনটা কাজ করে, তাহলে বুঝা যাবে যে, সে খাঁটি মুসলমান নয় বরং সে হচ্ছে মুনাফেক অর্থাৎ, কপট মুসলমান। এই তিনটা বিষয়ের মধ্যে একটা হল– اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ অর্থাৎ, কথা বললে মিথ্যা বলে। আরেকটা হল– اِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ অর্থাৎ, যখন ওয়াদা করে, তখন মনের মধ্যে থাকে যে, সে ওয়াদা পূর্ণ করবে না। আরেকটা হল– اِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ অর্থাৎ, তার কাছে আমানত রাখা হলে সে আমানতের খেয়ানত করে। এই তিনটা কাজ অর্থাৎ, মিথ্যা বলা, ওয়াদা খেলাফ করা এবং আমানতের খেয়ানত করা- এই তিনটাকে রাসূল (সা.) মুনাফেক হওয়ার আলামত বলে উল্লেখ করেছেন। আর এক রেওয়ায়েতে এসেছে,

وَاِنْ صَامَ وَصَلّٰى وَزَعَمَ اَنَّهٗ مُسْلِمٌ. (صحيح مسلم برقم ٢٢٢)

অর্থাৎ, যদিও নামায পড়ে, রোযা রাখে এবং নিজেকে খুব খাঁটি মুসলমান বলে মনে করে, তারপরও এই তিনটা কাজ করলে সে খাঁটি মুসলমান নয় বরং সে হল মুনাফেক।

এই কাজগুলো করলে কেউ খাঁটি মুসলমান থাকে না। খাঁটি মুসলমান এগুলো করতে পারে না। আমরা মনে করে নিয়েছি যে, নামায পড়া, রোযা রাখা, হজ্জ করা, যাকাত দেয়া -এরকম মোটা মোটা কয়েকটা আমলের নাম হল ইসলাম। শুধু এগুলো করলেই সে খাঁটি মুসলমান। কিন্তু তা নয়। শুধু এগুলো করলেই খাঁটি মুসলমান হওয়া যায় না। খাঁটি মুসলমান হওয়ার জন্য জীবনের সবক্ষেত্রে ইসলামের দেয়া বিধি-বিধানকে মানতে হবে। ইসলাম এমন এক ধর্মের নাম, যে ধর্ম মানুষের ব্যক্তিজীবন, সমাজজীবন, রাষ্ট্রীয়জীবন সব ক্ষেত্রে বিধি-বিধান দিয়েছে। মানুষের উঠা-বসা, চলা-ফেরা, কথা বলা, চিন্তা করা সবক্ষেত্রে ইসলামের বিধি-বিধান রয়েছে। মানুষের অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি সব ক্ষেত্রে ইসলামের বিধি-বিধান রয়েছে। ব্যক্তিজীবন, পারিবারিকজীবন, সমাজজীবন, রাষ্ট্রীয়জীবন সবক্ষেত্রে ইসলামের নীতিমালা রয়েছে। এই সবগুলো যে মেনে চলবে, সেই হল খাঁটি মুসলমান। এই সবগুলো মানলে মানুষের জীবনে শান্তি এবং কামিয়াবী আসবে। দুনিয়াতেও শান্তি এবং কামিয়াবী আসবে, আখেরাতেও শান্তি এবং কামিয়াবী আসবে।

ইসলামে এমন কোন কিছুকে বৈধ রাখা হয়নি, যার দ্বারা মানুষের দুনিয়া বা আখেরাতের কোন রকমের ক্ষতি এবং অশান্তি হতে পারে। পূর্বে হাদীছে যে তিনটা বিষয়ের কথা বলা হল, অর্থাৎ মিথ্যা

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



বলা, ওয়াদা খেলাফ করা এবং আমানতে খেয়ানত করা- এই তিনটা বিষয় এমন, যা মানুষের ক্ষতি এবং অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ কারণেই এ তিনটা ইসলামে নিষিদ্ধ এবং পাপ।

এর মধ্যে প্রথম নম্বরে বলা হয়েছে মিথ্যার বিষয়টা। মিথ্যা বলা এত জঘন্য পাপ যে, এক হাদীছে মিথ্যাকে শিরকের সমপর্যায়ের গোনাহ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীছে এসেছে একদিন রাসূল (সা.) সাহাবীদেরকে লক্ষ্য করে বললেন,

اَلَا اُنَبِّأُكُمْ بِاَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلَاثًا قَالُوْا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ. قَالَ : اَلْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ وَفِىْ رِوَايَةٍ وَقَوْلُ الزُّوْرِ. (صحيح مسلم برقم ٢٦٩)

অর্থাৎ, আমি কি তোমাদেরকে বলব সবচেয়ে বড় কবীরা গোনাহ কী কী? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, জ্বী এরশাদ করুন। রাসূল (সা.) আবার বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বলব সবচেয়ে বড় কবীরা গোনাহ কী কী? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, জ্বী ইয়া রাসূলাল্লাহ! এরশাদ করুন। রাসূল (সা.) আবার জিজ্ঞাসা করলেন আমি কি তোমাদেরকে বলব সবচেয়ে বড় কবীরা গোনাহ কি কি? সাহাবায়ে কেরাম বললেন জ্বী ইয়া রাসূলাল্লাহ! এরশাদ করুন। এভাবে তিনবার জিজ্ঞাসা করার পর বললেন, সবচেয়ে বড় কবীরা গোনাহ হল তিনটা। একটা হল শিরক করা, অর্থাৎ আল্লাহর সাথে শরীক করা, আরেকটা হল– মা-বাপের নাফরমানী করা, আরেকটা হল মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া বা মিথ্যা বলা।

এ হাদীছে দেখানো হয়েছে শিরক যে পর্যায়ের শক্ত গোনাহ, পিতা-মাতার নাফরমানী করাও ঐ পর্যায়ের শক্ত গোনাহ, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া বা মিথ্যা বলাও ঐ পর্যায়ের শক্ত গোনাহ। অথচ আজ সমাজে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া বা মিথ্যা বলাকে তেমন শক্ত গোনাহ মনে করা হচ্ছে না। দ্বীনদার নামাযী মুসল্লি ব্যক্তিও অবলীলায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিচ্ছে এবং মিথ্যা বলছে। এমনকি সেটাকে মিথ্যাও মনে করছে না। দেখা যায় একজন লোক অসুস্থ নয় তারপরও একজন নামাযী পরহেযগার বলে পরিচিত ডাক্তার তাকে মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দিয়ে দিচ্ছে যে, সে অসুস্থ। এটা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া হল। এতে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার গোনাহ হবে। অথচ এটাকে তেমন গোনাহই মনে করা হচ্ছে না। দ্বীনদার পরহেযগার বলে পরিচিত মানুষ অফিস থেকে ছুটি নিয়ে বাড়ি গিয়েছে, ছুটি শেষ হওয়ার পরও আসতে মনে চাচ্ছে না কিংবা অন্য কোন কাজে লিপ্ত হয়েছে, তখন সে অসুস্থ ছিল বলে একটা মিথ্যা মেডিকেল সার্টিফিকেট নিয়ে অফিসে জমা দিচ্ছে। সে এটাকে গোনাহই মনে করছে না। এতে গোনাহের মাত্রা আরও বেড়ে যাচ্ছে। যদি কেউ কোন গোনাহকে গোনাহ মনে করার পরেও করে, তাহলে তার একটা পাপ হবে– সিঙ্গেল পাপ হবে। আর যদি কোন গোনাহকে গোনাহ মনে না করে, তাহলে ডবল পাপ হবে। এক হল পাপ করার পাপ। আরেক হল– পাপকে পাপ মনে না করার পাপ।

মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া এবং মিথ্যা সার্টিফিকেট দেয়ার কারণে বহু রকম দুর্নীতির বিস্তার ঘটে, বহু অপরাধের বিস্তার ঘটে। যদি সমাজের মানুষ মিথ্যা সার্টিফিকেট দেয়া বন্ধ করত, তাহলে মানুষ চাকুরির স্বার্থে হলেও ভাল হতে বাধ্য হত। মানুষ মনে করত ভাল না হলে চাকুরি হবে না। তাই ভাল থাকা ছাড়া উপায় নেই। বিগত এক সরকারকে আমরা প্রস্তাব দিয়েছিলাম যে, সমাজকে ঠিক করার জন্য শুধু একটা কাজ করুন। তা হল ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট ছাড়া কোন চাকুরি হবে না। আর ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট দিবেন প্রার্থীর মহল্লার মসজিদের ইমাম সাহেব। নিয়মিত নামায না পড়লে ইমাম সাহেব সার্টিফিকেট দিবেন না। দিলে মিথ্যার দায়ে ইমামকে চাকুরিচ্যুত করা হবে। এমন করা হলে যৌবন বয়সেই সকলে

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

নিয়মিত নামাযী হয়ে যাবে। আর নামাযের প্রভাবে তাদের জীবন সুন্দর হয়ে উঠবে। এটা করলে সমাজের উপরে এর বিরাট প্রভাব পড়বে।

শুধু এই মিথ্যা সার্টিফিকেট নয়। বরং আমরা নামাযী দ্বীনদার বলে পরিচিত মানুষ আরও এমন অনেক গোনাহ করি, যেগুলোকে আমরা গোনাহ-ই মনে করি না। যেমন– একজন লোক এসে আমাদের কাছে বলল আপনি যদি একটা চারিত্রিক সার্টিফিকেট দিয়ে দেন বা একটু সুপারিশ করে দেন, তাহলে আমার চাকুরিটা হয়ে যায়। আমি অফিসার, লিখে দিলাম সে খুব ভাল মানুষ, ইত্যাদি। অথচ সে ভাল মানুষ নয়। এতে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার গোনাহ হবে। এতে মিথ্যা বলারও গোনাহ হবে, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ারও গোনাহ হবে, মিথ্যাকে মিথ্যা মনে না করারও গোনাহ হবে। সেই সাথে সাথে যার কাছে এই সার্টিফিকেট যাচ্ছে, সে এই সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে মনে করবে আসলেই তিনি ভাল মানুষ। এভাবে তাকে প্রতারণা করা হল। ফলে প্রতারণার গোনাহও হবে। এরপর যদি সেই সার্টিফিকেট বা সুপারিশের ভিত্তিতে তার চাকুরি হয়, আর সে অন্যায় অপরাধ করে তাহলে তার জন্য ঐ সুপারিশকারীও দায়ি হবে। এভাবে একটা মিথ্যা কথা বা একটা মিথ্যা সাক্ষ্য বহু গোনাহের কারণ ঘটবে।

তাহলে কি আমরা সুপারিশ করব না? এর জওয়াব হল হ্যাঁ ভাল হলে সুপারিশ করতে পারি, নতুবা নয়। ভাল লোকের জন্য বা ভাল কাজের জন্য সুপারিশ করা ভাল। এর বিপরীত খারাপ লোকের জন্য বা খারাপ কাজের জন্য সুপারিশ করা খারাপ। কুরআন শরীফে বলা হয়েছে,

مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّهُ نَصِيْبٌ مِّنْهَا وَ مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا.

অর্থাৎ, যে ভাল সুপারিশ করবে, সে ভালোর অংশীদার হবে, আর যে খারাপ সুপারিশ করবে, সে খারাপের অংশীদার হবে। (নিছা: ৮৫)

যেমন একজন যোগ্য, আমানতদার, আস্থাভাজন ও দ্বীনদার ব্যক্তি, তার চাকুরি হচ্ছে না। এখন যদি আমি তার জন্য সুপারিশ করি, আর সেই সুপারিশে তার চাকুরি হয়ে যায়, তাহলে সেই চাকুরির আয় উপার্জন থেকে সে যত নেক কাজ করবে, তার সমপরিমাণ সওয়াব আমিও পাব। কারণ, আমার সুপারিশে তার এই সব নেক কাজের সুযোগ ঘটেছে। এভাবে ভাল সুপারিশ করলে নেকীর অংশ পাওয়া যায়। এর বিপরীত একজন খারাপ লোকের জন্য সুপারিশ করলাম বা মিথ্যা সার্টিফিকেট দিলাম, আর এর ভিত্তিতে তার চাকুরি হল, তাহলে এই সুবাদে সে যত পাপ করবে, সব পাপে অংশীদার হতে হবে।

যাহোক বলা হচ্ছিল মিথ্যা সার্টিফিকেট দেয়া অনেক বড় গোনাহ। না জেনে কারও সম্পর্কে ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট দেয়া জায়েয নেই। একথা মনে করা যাবে না যে, বেচারার চাকুরি নেই, আমার কাছে এসেছে, একটু লিখে দিলে তার বড়ই উপকার হবে। এমন মনে করা ঠিক হবে না। ভাল করে না জেনে কারও সম্পর্কে কোন সার্টিফিকেট দেয়া যায় না, ভাল মন্তব্য করা যায় না। হযরত ওমর (রা.)-এর মজলিসে একবার একজন লোক অন্য একজন সম্বন্ধে মন্তব্য করলেন যে, হুজুর লোকটা খুব ভাল মানুষ। হযরত ওমর (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন, লোকটা ভাল না মন্দ তুমি কতটুকু যাচাই-বাছাই করেছ? তুমি কি কখনো তার সাথে লেন-দেন করেছ? তিনি বললেন, হুজুর! কখনো তার সাথে আমার লেন-দেন হয়নি। হযরত ওমর (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন কখনো তার সঙ্গে এক সাথে সফর করেছ? তিনি বললেন জী না হুজুর! কখনো এক সাথে সফরও করিনি। তখন হযরত ওমর (রা.) বললেন, তাহলে তো তার চরিত্র সম্পর্কে তুমি কিছুই জান না। এখানে বোঝানো হয়েছে ভাল করে না জেনে কারও সম্পর্কে কোন সার্টিফিকেট দেয়া যায় না, ভাল করে না জেনে কারও সম্পর্কে ভাল মন্তব্য করা যায় না।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com



এখানে হযরত ওমর (রা.) আরও বুঝিয়েছেন –একজন মানুষের চরিত্র বোঝার জন্য তার সাথে লেন-দেন কর, তাহলে বুঝবে সে কেমন চরিত্রের মানুষ। লেন-দেনের ক্ষেত্রে মানুষের আসল চরিত্র ফুটে উঠে। আর যখন তুমি তার সাথে সফর করবে, তখন তার ভিতরের সব অবস্থা খুলে যাবে। তার ওঠা-বসা, চলা-ফেরা, ওযূ-ইস্তেঞ্জা, আহার-নিদ্রা, ব্যক্তিস্বার্থ ত্যাগ করতে পারা না পারা ইত্যাদি সবকিছুই দেখতে পাবে। সফর এমন এক জিনিস যে, সফরে মানুষের এইসব চরিত্র ফুটে ওঠে। এক সাথে সফরে না চললে মানুষের আসল চরিত্র এভাবে বুঝা যায় না। হযরত ওমর (রা.) বোঝাতে চাইলেন যে, তুমি তার চরিত্র সম্পর্কে জানই না, কাজেই তাকে ভাল বলে মন্তব্য করে তুমি মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছ, এটা মিথ্যা সাক্ষ্য। কারও সম্পর্কে না জেনে ভাল বলে সাক্ষ্য দেয়া ঠিক নয়। এটাও মিথ্যার শামিল। এতেও মিথ্যার পাপ হবে।

কাউকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে গিয়ে বা হাসির ছলে মিথ্যা বললেও মিথ্যার পাপ হবে। হাদীছে এসেছে,

اَلَا وَاِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ، فَاِنَّ الْكِذْبَ لَا يَصْلُحُ بِالْجَدِّ وَلَا بِالْهَزْلِ. (سنن ابن ماجة برقم ٤٦)

অর্থাৎ, খাঁটি খাঁটি হোক বা মানুষকে হাসানোর জন্য হোক কোনোভাবেই মিথ্যা বলা যাবে না।

আমরা অনেক সময় হাসি তামাসাচ্ছলে কথা বানিয়ে বলি; রাসূল (সা.) এর বক্তব্য অনুসারে এটাও মিথ্যার শামিল। যদিও হাসির ছলে যে মিথ্যা বলা হয়, তাতে বাস্তবতা উদ্দেশ্য হয় না, তবুও এভাবে বলার থেকেই আস্তে আস্তে মিথ্যা বলার অভ্যাস গড়ে ওঠে। পরে এ অভ্যাসটা বাড়তে বাড়তে অন্য ক্ষেত্রেও মিথ্যার বিস্তৃতি ঘটতে শুরু করে। তাই কোনভাবেই মিথ্যা বলার অবকাশ নেই। এমনকি বাচ্চাদেরকে ভোলানোর জন্য, তাদের কান্না থামানোর জন্য বা তাদের কোন আবেগ ঠেকানোর জন্য আমরা অনেক সময় যে মিথ্যা বলি, যেমন বলি কেঁদোনা; তোমাকে এই কিনে দেব, ঐই কিনে দিব– এটাও মিথ্যার শামিল। এতেও মিথ্যা বলার পাপ হবে; যদিও আমরা এটাকে পাপ মনে করি না।

একদিন রাসূল (সা.)-এর সামনে এক মহিলা তার বাচ্চাকে কোলে নেয়ার চেষ্টা করছিল। কিন্তু কোন ভাবেই তাকে কোলে নিতে পারছিল না। বাচ্চাটি কাছেই আসছিল না। তখন সেই মহিলা বাচ্চাটিকে কাছে আনার জন্য হাত মুঠ করে বাচ্চাকে দেখিয়ে বলছিল আস! আস! তোমাকে এই জিনিসটা দিব। রাসূল (সা.) বললেন, তোমার হাতের ভিতর কী আছে? আসলেই কি তাকে কিছু দেয়ার ইচ্ছা আছে, না কি শুধু ভোলানোর জন্যই মিছেমিছি বলছ? মহিলা বলল, না আমার হাতে খেজুর আছে, সত্যিই তাকে খেজুর দিব! তখন রাসূল (সা.) বললেন, তাহলে ঠিক আছে। যদি তোমার কোন কিছু দেয়ার নিয়ত না থাকত, আর তুমি মিছেমিছিই এমন বলতে, তাহলে তোমার আমলনামায় একটা মিথ্যার গোনাহ লেখা হত। দেখা গেল হাসি-ফুর্তিচ্ছলে হোক বা যে কোনভাবে হোক, কোনভাবে মিথ্যা বলার অবকাশ শরীআতে নেই। শরীআতে মিথ্যা এত বড় পাপ যে, কোন মুসলমান মিথ্যা বলতে পারে না। তাই রাসূল (সা.) বলেছেন, নামায পড়ে, রোযা রাখে তারপরও মিথ্যা বললে সে খাঁটি মুসলমান নয়; বরং সে মোনাফেক বা কপট মুসলমান।

ওয়াদা খেলাফ করাও এ পর্যায়ের পাপ। যেকোন রকম ওয়াদা হোক, কোন ওয়াদা খেলাফ করার অবকাশ নেই। এমনকি রাজনৈতিক ওয়াদাও খেলাফ করার অবকাশ নেই। যারা রাজনীতি করেন, তারা মনে করেন, নির্বাচনে জেতার জন্য অনেক ওয়াদাই করতে হয়। এসব ওয়াদা পূরণ না করলেও চলে। তাই তারা লাগামহীনভাবে ওয়াদা দিতে থাকেন –এই করে দিব, সেই করে দিব, দুধের নহর প্রবাহিত

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

করে দিব। কিন্তু ওয়াদা করার সময় দিলের মধ্যে নিয়ত থাকে আদৌ এগুলো করব না। এতে এক দিকে মিথ্যা বলার গোনাহ হবে, অন্য দিকে প্রতারণা করার গোনাহও হয়। তাই যে কোনভাবে একবার ওয়াদা করতে হলে ওয়াদা করার সময় সেটা পূরণ করার নিয়ত রাখতে হবে। এবং ওয়াদা করে বসলে সেটা পূরণ করতেই হবে।

হাদীছে একটা সুন্দর ঘটনা এসেছে। রাসূল (সা.) হিজরত করে মদীনায় চলে গেছেন। তার এক বছর পর দ্বিতীয় হিজরীতে মদীনায় বদর যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে। এদিকে আবূ জেহেল তার বাহিনী নিয়ে যুদ্ধের জন্য রওনা হয়েছে। পথে দেখা হয়েছে এক সাহাবী হযরত হুযায়ফা (রা.)-এর সাথে। তিনি তার পিতাসহ মদীনায় হিজরত করে যাচ্ছেন। আবূ জেহেল তাকে দেখে জিজ্ঞাসা করল কোথায় যাওয়া হচ্ছে? হযরত হুযায়ফা (রা.) বললেন, আমরা মদীনায় যাচ্ছি! আবূ জেহেল বলল, তাহলে তো তোমাকে ছাড়া হবে না। আমরা মদীনায় যাচ্ছি মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য। তুমি ওখানে যেয়েই তো আমাদের সংগে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। কাজেই তোমাকে ছাড়া হবে না। হযরত হুযায়ফা (রা.) বললেন, আমরা যুদ্ধের কোন প্রস্তুতি নিয়ে আসিনি, যুদ্ধে শরীক হওয়ার কোন নিয়তও নেই। শুধু নবীজীর সাথে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছি। আবূ জেহেল বলল, তাহলে ওয়াদা কর যে, যুদ্ধে শরীক হবে না। তখন হুযায়ফা (রা.) বললেন, ‘ আমি ওয়াদা করলাম’।

তখনকার যুগের কাফেররাও মিথ্যা কথা বলত না, ওয়াদা খেলাফ করত না। সেই জেহেলী যুগেও লোকেরা মিথ্যা বলা এবং ওয়াদা খেলাফ করাকে খারাপ মনে করত। মাঝখানে আরেকটা ঘটনা শুনুন। রাসূল (সা.) রোমের সম্রাট হেরাক্লিয়াসের কাছে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে পত্র প্রেরণ করেছিলেন। হেরাক্লিয়াস পত্র পেয়ে পত্রের প্রেরক মুহাম্মাদ (সা.) সত্যিই নবী কি-না তা যাচাই করার জন্য বলল এখানে আমাদের এই বায়তুল মুকাদ্দাসের আশে-পাশে আরবের কোন লোকজন আছে কি-না খুঁজে দেখ। হেরাক্লিয়াসের লোকজন খুঁজে আবূ সুফিয়ানকে পেল। আবূ সুফিয়ান (রা.) তখনও মুসলমান হননি। তিনি ব্যবসার জন্য ঐ অঞ্চলে গিয়েছিলেন। তাকে হেরাক্লিয়াসের দরবারে ডেকে আনা হল। হেরাক্লিয়াস দোভাষীর মাধ্যমে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে মুহাম্মাদ নামে যে লোক নবুওয়াতের দাবি করছে, তাঁর বংশ কেমন? আবূ সুফিয়ান বললেন, তার বংশ খুব ভাল। তিনি ভাল বংশের ছেলে। হেরাক্লিয়াস বললেন, হ্যাঁ নবী সব সময় ভাল বংশের-ই হয়ে থাকে। তারপর জিজ্ঞাসা করল তোমাদের সংগে মুহাম্মাদের কখনও যুদ্ধ হয়? আবূ সুফিয়ান বললেন হ্যাঁ যুদ্ধও হয়। তারপর জিজ্ঞাসা করল যুদ্ধে তোমরা বিজয়ী হও, না তাঁরা অর্থাৎ, মুহাম্মাদ বিজয়ী হয়? আবূ সুফিয়ান বললেন এ পর্যন্ত তাদের সাথে আমাদের দুটো যুদ্ধ হয়েছে; এক যুদ্ধে আমরা বিজয়ী হয়েছি, আরেক যুদ্ধে তারা বিজয়ী হয়েছে। হেরাক্লিয়াস বলল, হ্যাঁ সব নবীদের ক্ষেত্রেই এরকম হয়ে থাকে। পরীক্ষার জন্য কখনো আল্লাহ তাদের পরাজিত করেন, আবার বিজয়ীও করেন। এভাবে হেরাক্লিয়াস বিভিন্ন প্রশ্ন করল! আবূ সুফিয়ান প্রত্যেকটা প্রশ্নের জবাবে সত্য কথাই বলে গেলেন। শেষ পর্যন্ত হেরাক্লিয়াস বিশ্বাস করল যে, মুহাম্মাদ সত্য নবী। দেখা গেল সেই যুগের কাফেররা পর্যন্ত মিথ্যা বলত না।

যাহোক সেই যুগের কফেররাও ওয়াদা খেলাফ করত না। তাই আবূ জেহেল হুযায়ফা (রা.) থেকে ওয়াদা নিল যে, ওয়াদা কর যুদ্ধ করবে না। ওয়াদা শুনেই আবূ জেহেল নিশ্চিত হয়ে গেল। কারণ তাদের এই ধারণাই ছিল না যে, কেউ ওয়াদা খেলাফ করতে পারে। যাহোক আবূ জেহেল ওয়াদা পেয়ে হুযায়ফা (রা.)কে ছেড়ে দিল। হুযায়ফা (রা.) মদীনায় পৌঁছার পূর্বেই পথে রাসূল (সা.)-এর সাক্ষাৎ পেলেন।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



রাসূল (সা.) যুদ্ধের জন্যই আসছিলেন। হুযায়ফা (রা.) রাসূল (সা.)-এর কাছে ঘটনা বয়ান করলেন যে, আবূ জেহেলের সাথে আমার দেখা হয়েছিল, আমি তার সাথে এই যুদ্ধে শরীক না হওয়ার ওয়াদা করে ফেলেছি। কিন্তু ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা ইসলামের সর্ব প্রথম জেহাদ। এটা অনেক ফযীলতের জেহাদ। বদর যুদ্ধ ছিল ইসলামের প্রথম জেহাদ। এ জেহাদে যারা শরীক হয়েছিলেন, আল্লাহ পাক তাদের প্রতি এত খুশি হয়েছেন যে, তাদের উদ্দেশ্যে বলে দিয়েছেন,

اِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ. (صحيح البخاري برقم ٣٠٠٧)

অর্থাৎ, এখন তোমরা যা ইচ্ছা তাই করতে পার। আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি।

হুযায়ফা (রা.) তাই বললেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এই ফযীলতের জেহাদে শরীক হতে চাই! আমি তো ওয়াদা করেছিলাম জানের ভয়ে। এখন আমাকে এই জেহাদে শরীক হওয়ার অনুমতি দিন। রাসূল (সা.) বললেন, যেভাবেই হোক তুমি ওয়াদা করেছ, সেই ওয়াদার ভিত্তিতেই সে তোমাকে ছেড়ে দিয়েছে। এই ওয়াদা খেলাফ করা যাবে না। কোন ওয়াদাই খেলাফ করা চলবে না। দেখা গেল কাফেরের সাথে ওয়াদা করলেও সে ওয়াদা খেলাফ করা চলবে না।

হযরত ওমর (রা.) যখন বায়তুল মুকাদ্দাস জয় করেছিলেন, তখন সেখানকার ইহুদীদের সংগে চুক্তি হয়েছিল তারা বৎসরে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ জিয়্যা কর দিবে; আর তার বিনিময়ে মুসলমানরা তাদের জান-মালের হিফাযত করবে। হযরত ওমর (রা.) তাদের জান-মালের হেফাযতের জন্য বায়তুল মুকাদ্দাস এলাকায় কিছু সেনা মোতায়েন করলেন। এরপর এক যুদ্ধে প্রয়োজনে বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে কিছু সৈন্য আনার প্রয়োজন হয়েছিল, যারা ইহুদীদের হেফাযতের জন্য নিযুক্ত ছিল। এরকম বাহিনীর কিছুটা তুলে আনার প্রয়োজন হয়েছিল। তিনি সেখান থেকে কিছু সৈন্য তুলে আনলেন এবং তুলে আনার সাথে সাথে ঘোষণা দিয়ে দিলেন যে, এই বৎসর তোমরা যে কর দিয়েছিলে সেটা ফেরৎ নিয়ে নাও। কারণ তোমাদের জান-মালের ওয়াদা দেয়া হয়েছিল। সেই ওয়াদার ভিত্তিতে আমরা কর নিয়েছিলাম। এখন সৈন্যবাহিনী তুলে নিলাম। তাই তোমাদের জান-মালের নিরাপত্তা থাকলো না। আমরা তোমাদের জান-মালের নিরাপত্তা পুরোপুরি দিতে পারলাম না। কাজেই এই বৎসরের কর তোমরা ফেরৎ নিয়ে নাও। এই হল ইসলামের ওয়াদা রক্ষার ইতিহাস। পৃথিবীর কোন ইতিহাস এর তুলনা দেখাতে পারবে না।

ইসলামের কোথাও ওয়াদা খেলাফ করার অবকাশ রাখা হয়নি। কোথাও মিথ্যা বলার অবকাশ রাখা হয়নি। একমাত্র যদি জান চলে যাওয়ার মত আশঙ্কা দেখা দেয়, অর্থাৎ এমন পরিস্থিতি দেখা দেয় যে, ওয়াদার উপর থাকতে গেলে জান রক্ষা পায় না, মিথ্যা না বললে জান রক্ষা হয় না, এই ধরনের ক্ষেত্রে একটু ব্যতিক্রম রাখা হয়েছে। তাও যতক্ষণ পর্যন্ত সরাসরি মিথ্যা না বলে পারা যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত সরাসরি মিথ্যা না বলা চাই। বরং গোলমেলে কথা বলে জান রক্ষা করার চেষ্টা করতে হবে।

একটা উদাহরণ দেই। হযরত কাসেম নানুতুবী (রহ.) দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ১৮৫৭ সালের যুদ্ধে তিনি মুসলমানদের পক্ষে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। পরে যখন ইংরেজরা তার বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি করে এবং সরকারী লোকেরা তাকে খুঁজতে দেওবন্দে আসে। তিনি মসজিদের এক হুজরার ভিতরে থাকতেন। তিনি ছিলেন অনেক বড় আলেম, অনেক বড় দার্শনিক ব্যক্তিত্ব। কিন্তু তাকে দেখে কেউ বুঝতো না যে, তিনি এতবড় ব্যক্তিত্ব। একটা চাদর গায়ে দিতেন, আরেকটা চাদর পরতেন। তাও সাদা মার্কিন কাপড়ের চাদর। তাতে কড়া নীল দিয়ে পরতেন। দেখলে মনে হত কোন গ্রাম্য চাষা গোছের

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

মানুষ। পুলিশ যখন তল্লাশি করতে আসে, তখন তিনি মসজিদের বারান্দায় বসা ছিলেন। তিনি পুলিশকে দেখে নিজের জায়গা থেকে একটু সরে বসেন। যেখানে ছিলেন সেখান থেকে একটু সরে আরেক পাশে বসেন। পুলিশ এসে তার কাছেই জিজ্ঞাসা করল এখানে কাসেম আছে? তিনি পাশের দিকে ইশারা করে বললেন একটু আগে এখানে ছিল। পুলিশ মনে করল মুসলমানদের এতবড় নেতা এরকম হতে পারে না। সে লোক অন্য কেউ হবে। সে হয়তো এখানে ছিল, একটু পূর্বে চলে গেছে। পুলিশ চলে গেল। হযরত কাসেম নানুতুবী (রহ.) জান বাঁচানোর এরকম মুহূর্তেও সরাসরি মিথ্যা বললেন না; বরং হেকমতের মাধ্যমে একটু গোলমেলে করে কথাটা বললেন।

দেওবন্দের আরেক বুযুর্গ ছিলেন হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গোহী (রহ.)। তাকে শেষ যুগের সবচেয়ে বড় ফকীহ বলা হয়। ফেকাহ শাস্ত্রের অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে বলা হয় ফকীহ। শেষ যুগে তাকে বলা হয় সবচেয়ে বড় ফকীহ। এই রশীদ আহমদ গাঙ্গোহী (রহ.)ও ইংরেজ বিরোধী জেহাদে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তিনি ধরা পড়েন। যখন তাকে কোর্টে হাজির করা হয়, তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় আপনার কাছে কোন অস্ত্র আছে? বাস্তবে তাঁর কাছে অস্ত্র ছিল। কিন্তু তিনি চিন্তা করলেন অস্ত্রের কথা স্বীকার করলে আমার ফাঁসি হয়ে যাবে। এখন জান বাঁচানোর প্রশ্ন। এ মুহূর্তে মিথ্যা বলাও জায়েয। কিন্তু তিনি সরাসরি মিথ্যা না বলে পকেট থেকে তসবীহ বের করে বললেন এই হল আমাদের অস্ত্র। জজরা মনে করল আরে মোল্লা মানুষ তো। মোল্লার দৌড় তো ঐ পর্যন্তই। ওরা মসজিদ, মাদ্রাসা, টুপি, তাসবীহ ছাড়া আর কী-ইবা বোঝে! মনে হয় তার কাছে কোন অস্ত্রপাতি নেই। আল্লাহ পাকই সবকিছুর হেফাযতের ব্যবস্থা করে দেন। এই কথাবার্তা চলছিল, এরই মধ্যে এক গ্রাম্য লোক ঐ কোর্টে তার কোন কেসের জন্য আসল। সে এসে গাঙ্গোহী (রহ.)কে দেখে বলল, আরে মুয়াযযিন সাহেব! আপনি এখানে? ঘটনা হল রশীদ আহমদ গাঙ্গোহী (রহ.) মহল্লার মসজিদে আযানও দিতেন। এতবড় ইসলামী ব্যক্তিত্ব মসজিদে আযান দিতেন। এখন তো আমাদের সমাজে মুয়াযযিনকে মর্যাদাই দেয়া হয় না। অথচ মুয়াযযিনী পদ অনেক মর্যাদার পদ। কেমন মর্যাদার পদ? হযরত আলী (রা.) রাসূল (সা.)-এর ইন্তেকালের পর একদিন আফসোস করে বলেছিলেন, আমি জীবনে বড় একটা ভুল করেছি। রাসূল (সা.) বেঁচে থাকতে আমার পুত্র হাসান হোসাইনের জন্য মসজিদের মুয়াযযিনের পদটা চেয়ে রাখিনি। এটা আমার জীবনের একটা বড় ভুল। কিয়ামতের দিন যখন সমস্ত মানুষ হাশরের ময়দানে সমবেত হবে, তখন মুয়াযযিনের গলা সবচেয়ে উঁচু থাকবে। যেন মানুষ দেখলে বুঝতে পারে তাদের বিশেষ একটা বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

যাহোক ঐ লোক গাঙ্গোহী (রহ.)কে দেখে বলল আরে মুয়াযযিন সাহেব! আপনি এখানে কেন? জজ মনে করল আসলেই বোধ হয় লোকটা তেমন বড় কোন নেতা নয়, মসজিদের মুয়াযযিন আর কত বড় নেতা হতে পারে। তাছাড়া কোন অস্ত্রপাতিও তার কাছে নেই। জজ তাকে ছেড়ে দিল। আল্লাহ পাক তাকে হেফাযত করলেন। সত্যের উপরে থাকলে আল্লাহ পাক তাকে হেফাযত করেন।

যেকথা বলা হচ্ছিল ওয়াদা খেলাফ করার কোন অবকাশ নেই। মিথ্যা বলার কোন অবকাশ নেই। আল্লাহ পাক আমাদেরকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.



বয়ান নং ৪৪-এর খুতবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى السَّبِيْلَ، وَيَنْهٰى عَنِ الْكِذْبِ وَخِلَافِ الْوَعْدِ وَالْخِيَانَةِ وَالتَّبْدِيْلِ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَلَا مَثِيْلَ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ اَلْاٰمِرُ بِالْاَمَانَةِ وَالصِّدْقِ وَاِيْفَاءِ الْعَهْدِ وَبِكُلِّ خُلُقٍ جَمِيْلٍ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ فِىْ كُلِّ بُكْرَةٍ وَاَصِيْلٍ.

اَمَّا بَعْدُ :

اَيُّهَا النَّاسُ! اِنَّ الْكِذْبَ وَالْبُهْتَانَ، خُلُقَانِ مَذْمُوْمَانِ، وَاِنَّ خِلَافَ الْوَعْدِ وَالْخِيَانَةَ مِنْ اَقْبَحِ الشَّنَاعَةِ، وَقَدْ وَرَدَ الْوَعِيْدُ عَلَيْهَا فِى الْاَحَادِيْثِ وَالْاٰيَاتِ، فَاحْفَظُوْا اَلْسِنَتَكُمْ عَنْ خِلَافِ الْوَعْدِ وَالْكِذْبِ وَالْخِيَانَةِ. وَاعْتَمِدُوا الصِّدْقَ فِى الْاَقْوَالِ وَالْاَفْعَالِ فِىْ كُلِّ حَالَةٍ.

وَاعْلَمُوْا اَنَّ الْكِذْبَ مِنْ اَكْبَرِ الْكَبَائِرِ، قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلَا اُنَبِّئُكُمْ بِاَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلَاثًا، قَالُوْا : بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ. قَالَ : اَلْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ، وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ، وَفِىْ رِوَايَةٍ وَقَوْلُ الزُّوْرِ. وَقَدْ عَدَّ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْكِذْبَ وَخِلَافَ الْوَعْدِ وَالْخِيَانَةَ مِنْ عَلَامَاتِ الْمُنَافِقِ، فَقَالَ : اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثَةٌ – اِذَا حَدَّثَ كَذِبَ، وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ، وَاِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ. وَفِىْ رِوَايَةٍ – وَاِنْ صَامَ وَصَلّٰى وَزَعَمَ اَنَّهٗ مُسْلِمٌ.

اَيُّهَا النَّاسُ! اِنَّ الصِّدْقَ يُنْجِىْ وَالْكِذْبَ يُهْلِكُ، فَاِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِىْ اِلَى الْبِرِّ، وَالْكِذْبَ يَهْدِىْ اِلَى الْفُجُوْرِ. وَفِى الْحَدِيْثِ– اِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِىْ

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.
Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

اِلَى الْفُجُوْرِ، وَاِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِىْ اِلَى النَّارِ، وَاِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِىْ اِلَى الْبِرِّ، وَاِنَّ الْبِرَّ يَهْدِىْ اِلَى الْجَنَّةِ، وَاِنَّهٗ يُقَالُ لِلصَّادِقِ صَدَقَ وَبَرَّ، وَيُقَالُ لِلْكَاذِبِ كَذَبَ وَفَجَرَ، اَلَا وَاِنَّ الْعَبْدَ يَكْذِبُ حَتّٰى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ كَذَّابًا. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةْ.

وَاعْلَمُوْا اَنَّ مَا يَعْتَادُ اَهْلُ هٰذَا الْعَصْرِ بِاَنْ يَّمْنَحُوْا اَنْوَاعَ الْوَثَائِقِ كِذْبًا، ذَالِكَ اَيْضًا مِنَ الْكِذْبِ وَشَهَادَةِ الزُّوْرِ. وَذَالِكَ يَتَضَمَّنُ الشَّفَاعَةَ السَّيِّئَةَ اَيْضًا، وَهِىَ مِنَ الْكَبَائِرِ . قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّهٗ نَصِيْبٌ مِّنْهَا، وَمَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَّهٗ كِفْلٌ مِّنْهَا. وَاِنَّ مَا يَعْتَادُ بَعْضُ النَّاسِ بِاَنْ يَّكْذِبَ هَزْلًا، اَوْ يَعِدَ صَبِيَّهٗ وَلَا يَنْوِى الْوَفَاءَ، فَذَالِكَ اَيْضًا مِنَ الْكِذْبِ وَالْكَبَائِرِ. وَفِى الْحَدِيْثِ- اَلَا وَاِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ، فَاِنَّ الْكِذْبَ لَا يَصْلُحُ بِالْجِدِّ وَلَا بِالْهَزْلِ، وَلَا يَعِدُ الرَّجُلُ صَبِيَّهٗ ثُمَّ لَا يَفِىْ لَهٗ. اَلْحَدِيْثُ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةْ.

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ : وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ، اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا، وَقَالَ تَعَالٰى : اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا اَثِيْمًا. وَقَالَ تَعَالٰى: لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ.

بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ، وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. اَقُوْلُ قَوْلِىْ هٰذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ لِىْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَاسْتَغْفِرُوْهُ، اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



বয়ান নং -৪৫

## মিথ্যা, ওয়াদা খেলাফী ও খেয়ানত প্রসঙ্গ (২য় পর্ব)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ الْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَ اَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : اَلْمَجَالِسُ بِالْاَمَانَةِ.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

গত জুমুআয় আলোচনা করা হয়েছিল তিনটা কাজ এমন আছে, যা কোন খাঁটি মু'মিন করতে পারে না। কথা বললে মিথ্যা বলা, ওয়াদা করলে খেলাফ করা এবং আমানতের খেয়ানত করা। এই তিনটা কাজ হল মুনাফেকের আলামত। মুনাফেকই এগুলো করতে পারে। কোন খাঁটি মুমিন এগুলো করতে পারে না। এই তিনটার মধ্যে মিথ্যা বলা এবং ওয়াদা খেলাফ করা সম্পর্কে গত জুমুআয় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছিল।

ওয়াদা খেলাফ করা এবং মিথ্যার মধ্যে এত ক্ষুদ্র বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত যে, বাচ্চাদেরকে আমরা ভোলানের জন্য তাদেরকে বিভিন্ন বিষয় দেয়ার যে ওয়াদা করি, সেই ওয়াদা খেলাফ করাও নিষেধ। দেয়ার নিয়ত না থাকা সত্ত্বেও এরকম বলা মিথ্যার শামিল। তার ভিতরে বাচ্চাদের সাথে প্রতারণা হয়। এরকম ওয়াদা খেলাফ করতেও নিষেধ করা হয়েছে। যেকোন ভাবে ওয়াদা করে ফেললে তা পুরণ করতে হবে। এমনকি ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন, যে সমস্ত রাষ্ট্রীয় আইন আছে, আন্তর্জাতিক আইন আছে, যে আইন কোন কুরআনের আইন নয়, এগুলো মানাও মানুষের কর্তব্য। কারণ, আমরা রাষ্ট্রের নাগরিক, আর রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়ার অর্থ হল আমরা রাষ্ট্রের সাথে ওয়াদাবদ্ধ যে, আমরা এ রাষ্ট্রের আইন অমান্য করব না, বরং মান্য করব। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত সে আইন মানতে গেলে আল্লাহর নাফরমানী না হয়ে যায়, ততক্ষণ সে আইন মানতে হবে। হ্যাঁ যদি সে আইন মানতে গেলে আল্লাহর নাফরমানী হয়ে যায়, অর্থাৎ গোনাহ হয়ে যায়, তাহলে সে আইন মানার কথা ইসলামে নেই। হাদীছে ইরশাদ হয়েছে,

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ. (رواه أحمد برقم ١٠٩٥ وإسناده على شرط الشيخين)

অর্থাৎ, কোন মানুষকে মানতে যেয়ে আল্লাহর নাফরমানী করা চলবে না। এমনকি পিতা-মাতা যাদের পায়ের তলে সন্তানের বেহেশত, সেই পিতা-মাতাও যদি কোন গোনাহের কথা বলে, তবুও সেটা মানা যাবে না। কুরআন শরীফে ইরশাদ হয়েছে,

وَاِنْ جَاهَدَاكَ عَلٰى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا.

অর্থাৎ, পিতা-মাতা যদি তোমাকে কুফ্‌রী অর্থাৎ ঈমানহীন কোন কাজের জন্য চাপ দেয়, তাহলে তাদেরকে মানবে না।

আল্লাহ্‌র পরে যে পিতা-মাতার অধিকার, তাদের ক্ষেত্রেই যখন বলা হচ্ছে আল্লাহ্‌র নাফরমানী করে তাদেরকে মানা যাবে না, তখন আল্লাহ্‌র নাফরমানী করে অন্য কারও কথা মানার প্রশ্নই ওঠে না। তাই রাষ্ট্রের আইন হোক বা আন্তর্জাতিক আইন হোক, যদি সেটা গোনাহের আইন হয় তাহলে সেটা মানা যায় না। যতক্ষণ গোনাহ না হবে সে আইন মানা আমাদের কর্তব্য। যেমন দেশের ট্রাফিক আইন হল রাস্তা

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

দিয়ে গাড়ী চালানোর সময় ট্রাফিক সিগন্যাল মেনে চলতে হবে। যেখানে সেখানে গাড়ি পার্কিং করা যাবে না। এ সমস্ত আইন কোন গোনাহের আইন নয়। এগুলো মানা কর্তব্য। যতগুলো ট্রাফিক আইন আছে, সেগুলোর ভিতরে ইসলামের দৃষ্টিতে তেমন কোন সমস্যা নেই। শুধুমাত্র একটা আইন যে, বাম পাশ দিয়ে চলতে হবে। এটা গোনাহের নয়, তবে সুন্নাতের খেলাফ। সুন্নাত হল সড়ক যদি প্রশস্ত হয়, তাহলে ডান পাশ দিয়ে চলা। যদি আইনটা এরকম থাকত, তাহলে আমাদের একটা সুন্নাতের উপরে আমল হয়ে যেত। রাস্তার বাম পাশ দিয়ে গাড়ি চালাতে গিয়ে একটা সুন্নাত বর্জন হয়ে যাচ্ছে। আবার সুন্নাত মানতে গেলে রাষ্ট্রীয় আইন অমান্য হয়ে যায়। আমরা রাষ্ট্রের আইনও অমান্য করতে চাই না, আবার সুন্নাত বর্জন হোক তা-ও চাই না। আমরা রাষ্ট্রের আইন মানতে যেয়ে এরকম সমস্যায় যেন না পড়ি, তার ব্যবস্থা করা কর্তব্য রাষ্ট্র পরিচালকদের। আমরা রাষ্ট্রের সাথে ওয়াদাবদ্ধ যে, রাষ্ট্রের আইন মেনে চলব। কিন্তু যেখানে রাষ্ট্রীয় আইন মানতে গেলে গোনাহ হয়ে যায়, সেখানে আমরা শরীআত মোতাবেক তা মানতে পারি না। অথচ রাষ্ট্রীয় আইনের বিরোধিতাও করতে পারি না। এটা আমাদের জন্য খুব জটিল ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। যেমন– আমাদের সংবিধানে মানুষকে অর্থাৎ জনগণের প্রতিনিধিকে আইন রচনা করার অধিকার দিয়ে রাখা হয়েছে। অথচ ইসলামী শরীআত অনুযায়ী আইন করার অধিকার একমাত্র আল্লাহ্‌র, আল্লাহ্‌র রাসূলের এবং আল্লাহ, আল্লাহ্‌র রাসূল যেটা বলে গেছেন তার আলোকে গবেষক উলামায়ে কেরাম প্রয়োজনে নতুন কোন বিধান গবেষণা করে বের করতে পারেন। এছাড়া সাধারণ কোন মানুষের কোন আইন রচনা করার অধিকার নেই। এখন সংবিধানের এ বিষয়টা মানতে গেলে আমরা খোদাদ্রোহী হয়ে যাই। আবার যদি বলি সংবিধানের এই ধারা মানি না, তাহলে রাষ্ট্রদ্রোহী হয়ে যাই। এখন রাষ্ট্রদ্রোহী হব না খোদাদ্রোহী হব? আমরা রাষ্ট্রদ্রোহী হয়ে দুনিয়ার কারাগারে যেমন যেতে চাই না, তেমনিভাবে খোদাদ্রোহী হয়ে পরকালের কারাগার জাহান্নামেও যেতে চাই না। রাষ্ট্রপ্রধানদের কর্তব্য আমাদেরকে এই সমস্যা থেকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করা। এরকম কিছু কিছু জায়গায় সমস্যা আছে, নতুবা সাধারণভাবে রাষ্ট্রীয় আইন মানতে আমাদের কোন অসুবিধা নেই এবং ইসলামের দৃষ্টিতেও তা আমাদের মানা কর্তব্য। কারণ আমরা দেশের আইন মানতে ওয়াদাবদ্ধ। আর কোন মুসলমান ওয়াদা খেলাফ করতে পারে না।

আন্তর্জাতিক আইন আছে এক দেশ আরেক দেশের উপর আক্রমণ করতে পারবে না। প্রতিবেশী দেশ হোক বা দূরের দেশ হোক কোন দেশের উপর কেউ আক্রমণ করতে পারবে না। কেউ কারও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। কেউ কারও ভূখণ্ড দখল করতে পারবে না। জাতিসংঘের মাধ্যমে সকলে এসব কথায় ওয়াদাবদ্ধ। তাই যদি এক মুসলমান রাষ্ট্র আরেক রাষ্ট্র দখল করে, তাহলে সেটা অন্যায়। অমুসলমান যদি মুসলমানদের দেশ দখল করতে যায়, সেটাও অন্যায়। কারণ এটাও ওয়াদা খেলাফের অন্তর্ভুক্ত। বুঝা গেল ওয়াদা রক্ষা করার বিষয়টা অনেক ব্যাপক।

ওয়াদা রক্ষা করার বিষয়টা এত ব্যাপক যে, কুরআনের এক আয়াত থেকে বুঝা যায় আল্লাহ্‌র সমস্ত হুকুম আহকাম মানতে আমরা ওয়াদাবদ্ধ। কাজেই আল্লাহ্‌র হুকুম অমান্য করাও ওয়াদা খেলাফির অন্তর্ভুক্ত। কুরআনে কারীমের এক আয়াতে এসেছে- আল্লাহ পাক যখন সমস্ত রূহকে সৃষ্টি করলেন, তখন সমস্ত রূহকে সম্বোধন করে বললেন, اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ অর্থাৎ, আমি কি তোমাদের রব নই? তখন সকলেই বলল بَلٰى অর্থাৎ, হ্যাঁ আপনি আমাদের রব। আপনাকে আমরা রব স্বীকার করে নিলাম। আল্লাহকে রব বলে স্বীকার করে নেয়ার মধ্যেমে এই ওয়াদা হয়ে গেল যে, তাঁর সব হুকুম-আহকাম আমরা মেনে চলব। তাই আল্লাহ্‌র হুকুম অমান্য করাও ওয়াদা খেলাফীর অন্তর্ভুক্ত। কোন মুসলমান ওয়াদা খেলাফী করতে পারে না। কোন মুসলমান মিথ্যা বলতে পারে না, কোন মুসলমান আমানতে

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com



খেয়ানত করতে পারে না। রাসূল (সা.) বলেছেন এই কাজগুলো করা মুনাফেকী চরিত্র। খাঁটি মুসলমান এগুলো করতে পারে না।

আমানতে খেয়ানত করা কথাটার অর্থ আমরা পরিষ্কার বুঝি না। আমরা মনে করি কেউ আমার কাছে টাকা-পয়সা জমা রাখল, বা সোনা-দানা গচ্ছিত রাখল, আর আমি তাকে তা ফেরত দিলাম না, বরং নিজেই আত্মসাৎ করে ফেললাম; আমরা বুঝি এটাই শুধু আমানতে খেয়ানত। কিন্তু তা নয়, শুধু টাকা-পয়সা এবং সোনা-দানাই আমানত নয়। আমানত আরও অনেক ব্যাপক। সব ধরনের আমানতে খেয়ানতই এর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্‌র সমস্ত হুকুম আহকামও আমাদের কাছে আমানত। এইসব হুকুম-আহকাম অমান্য করাও আমানতের খেয়ানত। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ الْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَ اَشْفَقْنَ مِنْهَا وَ حَمَلَهَا الْاِنْسَانُ.

অর্থাৎ, আমি আসমান-যমীন ও পর্বতমালার কাছে এই আমানত পেশ করেছিলাম যে, তোমরা কি পারবে এই আমানত রক্ষা করতে? তারা এই আমানতের বোঝা বহন করতে অপারগতা প্রকাশ করল এবং ভীত হয়ে পড়ল, আর মানুষ তা বহন করল। (আহযাব: ৭২)

এ আয়াতে "আমানত" বলতে সমস্ত বিধি-বিধানকে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহর সমস্ত হুকুম-আহকাম আমাদের কাছে আমানত। এ সব হুকুম-আহকাম লঙ্ঘন করাও আমানতে খেয়ানত। এমনকি উলামায়ে কেরাম বলেছেন, আমাদের যত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে, যেমন কান আছে, চোখ আছে, নাক আছে, হাত-পা আছে, অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে, এগুলোও আমাদের কাছে আল্লাহর আমানত। আল্লাহ পাক আস্থা করে আমাদের কাছে এগুলোকে আমানত রেখেছেন। আমানত বলাই হয় একজন আরেকজনের প্রতি আস্থা করে যা গচ্ছিত রাখে। যেমন আমি আপনার প্রতি আস্থা করে আমার টাকা-পয়সা, সোনা-দানা আপনার কাছে গচ্ছিত রাখলাম, এটা হল আমানত। এই আস্থার বিরুদ্ধে করাটাই হল খেয়ানত। আমরা আল্লাহর হুকুম মানব বলে ওয়াদা করেছি, আল্লাহ পাক তাই আমাদের উপরে আস্থা করে এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়েছেন, ক্ষমতা দিয়েছেন। যাতে আল্লাহর মর্জি মোতাবেক এগুলোকে ব্যবহার করি। তাই আল্লাহর মর্জির বাইরে এ সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে ব্যবহার করলেও আমানতে খেয়ানত হবে। যেমন আল্লাহ্‌র দেয়া চোখকে যদি আমরা গোনাহের কাজে ব্যবহার করি, এর দ্বারা গায়রে মাহরাম মহিলাদের দিকে নজর দেই, তাহলে এটা চোখের খেয়ানত হয়ে গেল। কুরআন শরীফে আল্লাহ পাক তাই বলেছেন,

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ. (اَلْمُؤْمِنُ : ١٩)

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের চোখের খেয়ানত সম্বন্ধে অবগত আছেন। এ আয়াতে চোখের পাপ না বলে চোখের খেয়ানত বলা হয়েছে। বোঝানো হয়েছে, চোখ আল্লাহ্‌র এক আমানত, আল্লাহ্‌র দেয়া এই আমানতকে আল্লাহ্‌র হুকুমের বাইরে ব্যবহার করাই হল খেয়ানত।

মানুষের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহ্‌র দেয়া আমানত। মানুষ তার মালিক নয়। মানুষ শুধু এই আমানতকে বহন করে চলবে। আল্লাহ্‌র আমানতকে আল্লাহ্‌র হুকুম অনুযায়ী রাখবে। আমি যার মালিক নই, তা আমি নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী যথেচ্ছা ব্যবহার করতে পারি না। কিন্তু আমি যার মালিক, তা আমি অনেকটা অবাধে ব্যবহার করতে পারি। যেমন আমি আমার টাকা-পয়সার মালিক, আমি এটা অনেকটা যথেচ্ছা ব্যবহার করতে পারি। আমি যদি আপনাকে বলি, আমি আমার টাকা-পয়সা আপনাকে দিয়ে দিলাম, নিয়ে যান। আর আপনি যদি নিয়ে যান, তাহলে তা জায়েয আছে। কিন্তু যদি বলি এই যে

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

একটা ছুরি দিলাম, আপনি আমাকে এর দ্বারা এক কোপে কেটে ফেলুন, আমার জীবনটা নিয়ে যান, তাহলে আমার জন্য এই বলাটাও জায়েয হবে না, আপনার জন্য সেটা করাও জায়েয হবে না। কারণ আমার জীবনের মালিক আমি নই।

শুধু জীবন নয় কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মলিকও আমি নই। আমি শুধু এর আমানতদার। আমি এই আমানত রক্ষা করে চলতে পারব, কিন্তু এটা নষ্ট করতে পারব না। তাই আমি ইচ্ছা করলেই আমার একটা হাত কেটে ফেলতে পারব না, সেটা আমার জন্য জায়েয হবে না। আমি একথা বলতে পারব না যে, আমার হাত, আমি কেটে ফেলেছি, তাতে কী অসুবিধা? আমার দেহের মালিক আমি নই। এ জন্যই একথা বলা চলবে না যে, আমার দেহ আমি দেব, যাকে খুশি তাকে দেব। এ কথা চলবে না। কারণ আমার দেহ আমার নয়, আমি এটার আমানত রক্ষাকারী মাত্র। এমনিভাবে এ কথাও বলা যাবে না যে, আমার কান, এই কান দিয়ে আমার ইচ্ছা হয় গান শুনব, মানুষের গীবত সমালোচনা শুনব, এরকম বলারও অধিকার নেই। এভাবে কানকে ব্যবহার করার অনুমতি আল্লাহ দেননি। কান দিয়ে যা ইচ্ছা তা-ই শুনব, চোখ দিয়ে যা ইচ্ছা তাই দেখব, মুখ দিয়ে যা ইচ্ছা তা-ই বলব, –এরকম স্বাধীনতা ইসলামে রাখা হয়নি।

ইসলামে ব্যক্তি স্বাধীনতা রয়েছে সত্য, কিন্তু সেই ব্যক্তিস্বাধীনতার অর্থ এ নয় যে, আল্লাহর হুকুমের বাইরে যা ইচ্ছা তা-ই করা যাবে। ব্যক্তিস্বাধীনতার অর্থ হল আল্লাহর হুকুমের ভিতরে থেকে যতটুকু করা যায়, ততটুকুর ভিতর স্বাধীনতা আছে। এর বাইরে কোন স্বাধীনতা নেই। ইসলামের সীমানার ভিতরে থেকে যা খুশি তাই আমি করতে পারব। এই সীমানা লংঘন করে বাইরে যেতে পারব না। ইসলামে স্বাধীনতা আছে, তবে লাগামহীন স্বাধীনতা নয়, বল্গাহীন স্বাধীনতা নয়, সীমাহীন স্বাধীনতা নয়। বরং সীমানাও দিয়ে দেয়া আছে। সেই সীমানার ভিতরে থেকে যতটুকু করা যায় ততটুকু করা যাবে, তার বাইরে নয়। অতএব ব্যক্তিস্বাধীনতার দোহাই দিয়ে যা ইচ্ছা তাই বলা যাবে না, যা ইচ্ছা তা-ই করা যাবে না। কিছু লোক আছে যারা ইসলামের বিরুদ্ধে কটুক্তি করে, আর তাতে বাঁধা দিলে বলে এটা আমার ব্যক্তি স্বাধীনতা। এটা ব্যক্তিস্বাধীনতার অপব্যাখ্যা। এটাকে ব্যক্তিস্বাধীনতা বললে যদি কোন ধর্মপ্রাণ মুসলমান তাকে উত্তম মাধ্যম করে, তাহলে সেটাকেও ঐ ধর্মপ্রাণ মুসলমানের ব্যক্তিস্বাধীনতা বলে স্বীকৃতি দিতে হবে। কিন্তু তা দিতে কি রাজি হবে?

যাহোক যে কথা বলা হচ্ছিল -আল্লাহ্‌র দেয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আল্লাহ্‌র হুকুমের বিরুদ্ধে ব্যবহার করলে সেটাও খেয়ানত বলে গণ্য হবে।

খেয়ানত এত ব্যাপক যে, আমি অফিস-আদালতের চাকুরি করি। অফিস আমার প্রতি আস্থা করেছে যে, আমি ঠিকমত অফিসের ডিউটি পালন করব। অতএব আমি যদি ঠিকমত ডিউটি পালন না করি, তাহলে অফিসের সাথে খেয়ানত করা হবে। যতক্ষণ সময় অফিসের ডিউটি পালন করার কথা, সেই সময়ের মধ্যে যদি আমি বন্ধু-বান্ধব নিয়ে গল্প করি, আড্ডা দেই বা অফিসের কাজ থাকা সত্ত্বেও বসে বসে সময় নষ্ট করি, তাহলে এতটুকু সময় খেয়ানত বলে গণ্য হবে। এতটুকুর বেতন-ভাতা নেয়া জায়েয হবে না।

আমরা অনেকে দারুল উলূম দেওবন্দ মাদ্রাসার নাম শুনেছি। এটা হল উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠতম ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এই মাদ্রাসার অনেক বুযুর্গ শিক্ষকের ইতিহাস এরকম আছে যে, মাদ্রাসার ক্লাসটাইমে তাদের কোন বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন আসলে এবং ক্লাস টাইমে তাদের জন্য সময় দিতে হলে তারা সেই সময়টুকু লিখে রাখতেন। মাস শেষে হিসেব করতেন, এরকম কত ঘন্টা কত মিনিট মাদ্রাসার টাইমে মাদ্রাসার কাজে ব্যবহৃত হয়নি, বরং ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। হিসেব করে মাসের শেষে মাদ্রাসার অফিসে দরখাস্ত দিতেন যে, এ মাসে আমার এত ঘন্টা, এত মিনিট ব্যক্তিগত

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com



কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই হিসেব করে আমার বেতন থেকে এত টাকা এত পয়সা কেটে দেয়া হোক। দুনিয়ায় এর কোন নমূনা নেই যে, বেতন কাটার জন্য দরখাস্ত দেয়া হয়। কিন্তু হক্কানী উলামায়ে কেরাম এবং বুযুর্গানে দ্বীন এরকম করেছেন। হক্কানী উলামায়ে কেরাম এবং বুযুর্গানে দ্বীনের আমল থেকেই দ্বীন বুঝতে হয়। দ্বীনের উপর কীভাবে আমল করতে হয় তা তাদের আমল দেখেই শিখতে হয়।

দেওবন্দ মাদ্রাসার সর্ব প্রথম শায়খুল হাদীছ শায়খুল হিন্দ মাহমূদুল হাসান দেওবন্দী (রহ.)-এর একটা ঘটনা শুনুন। তার বেতন ছিল ১০ টাকা। স্বাভাবিকভাবে মানুষের বয়স যত বাড়ে, আত্মীয়-স্বজন, সন্তানাদিও বাড়ে। তখন টাকা-পয়সার প্রয়োজনও বাড়তে থাকে। তাই শেষ দিকে মজলিসে শুরা সিদ্ধান্ত নিল যে, শায়খুল হিন্দের বেতন বাড়াতে হবে। কারণ আগের চেয়ে তাঁর খরচ বেড়ে গেছে। সিদ্ধান্ত হল আগামী মাস থেকে ১৫ টাকা বেতন দেয়া হবে। পরবর্তী মাসে যখন তিনি বেতন আনতে গিয়েছেন, তখন ১৫ টাকা পেয়ে বললেন ১৫ টাকা কেন? তাকে জানানো হল মজলিসে শুরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তিনি বললেন মজলিসে শুরা ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কারণ আমি এখন বৃদ্ধ হয়ে গেছি। আমি যখন জওয়ান ছিলাম, তখন আমার বেতন ছিল ১০ টাকা। তখন বেশি পড়াতে পারতাম, বেশি মাদ্রাসার খেদমত করতে পারতাম। এখন আমার বয়স হয়ে গেছে, আগের মত পড়াতে পারি না। মাদ্রাসার জন্য আগে যে সময় ব্যয় করতাম, এখন সেই সময় ব্যয় করতে পারি না। এখন তো আমার বেতন ৫ টাকা কমানো উচিৎ। সেখানে ৫ টাকা বাড়ানো হল কেন? এটা অন্যায়; আমি এই অন্যায়কে সমর্থন করতে পারি না। সুবহানাল্লাহ! বুযুর্গানে দ্বীনের আমল দেখেই দ্বীনের উপর চলা শিখতে হয়।

এখন বেতন বাড়ানোর জন্য, অধিকার আদায় করার জন্য কত আন্দোলন, কত সম্মেলন, কত মিছিল ও মিটিং সিটিং হয়। মানুষের অধিকার আদায় করার জন্য বহু নামে বহু সংগঠন সংস্থা গঠিত হয়েছে। অথচ দায়িত্ব পালন করার জন্য একটা সংস্থাও গঠিত হয়নি। অন্তত একটা সংগঠন সংস্থাও যদি এ রকম থাকত, যারা বলবে আসুন আমরা ঠিকমত দায়িত্ব পালন করব, এর জন্য একটা সংস্থা গঠন করি। যারা এর সদস্য হবে, তারা ঠিকমত দায়িত্ব পালন করবে। একটা সংস্থাও এরকম গঠিত হয়নি। এখন যুগটা এরকম হয়েছে যে, দায়িত্বের কথা সবাই ভুলে যায়, শুধু অধিকার আদায় করার জন্য ব্যস্ত থাকে। এ জন্য অধিকারও আদায় হচ্ছে না। দায়িত্ব পালন না করলে অধিকার আদায় হয় না। শ্রমিক দায়িত্ব পালন না করে বেতন বাড়ানোর আন্দোলন করে, এ কারণে মালিকও বেঁকে বসে যে, ওরা কাজ আরও বেশি করবে, কিন্তু বেতন আমি বাড়াব না। সবাই শুধু নিজেরটা দেখছে, অন্যেরটা দেখছে না। নিজের অধিকার দেখছে, নিজের দায়িত্ব দেখছে না। এই অবস্থা চলতে থাকলে কখনোই অবস্থার উন্নতি হবে না।

যাহোক যে কথা বলা হচ্ছিল অফিস-আদালতের সময় আমানত, এই আমানতে খেয়ানত করা যাবে না। অফিস আদালতের আসবাব-পত্রও আমানত। এগুলো ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহৃত হতে পারবে না। দেওবন্দের উলামায়ে কেরামের এরকম ইতিহাস যে, তারা মাদ্রাসার কাজ ছাড়া মাদ্রাসার একটা কাগজে নিজের ব্যক্তিগত একটা চিঠিও লিখতেন না। মাদ্রাসার কলম পর্যন্ত ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করতেন না। ব্যক্তিগত কাজে কাউকে একটা ঠিকানা লিখে দিতে হলেও অফিস আদালতের কাগজ কলম ব্যবহার করা ঠিক নয়। কারণ এগুলো আমানত। আর কোন মুসলমান আমানতের খেয়ানত করতে পারে না।

ব্যক্তিগত অফিসে বা ব্যক্তিগত ব্যবসা-বাণিজ্যে দায়িত্ব কম, ঝুঁকি কম। সরকারী পদে বা অন্যের প্রতিষ্ঠানে চাকুরিতে ঝুঁকি অনেক বেশি, সেখানে সতর্কতা অনেক বেশি প্রয়োজন।

অনেক সময় কোন্‌টা অফিসের কাজ, আর কোন্‌টা ব্যক্তিগত কাজ, তা পার্থক্য করা খুব জটিল হয়ে যায়। যেমন আমি আমার পরিচিত কোন লোকের কাছে টেলিফোন করছি, তিনি আবার আমার অফিসের

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

সাথেও সম্পর্কিত। এখন এই টেলিফোনটা কোন্ খাতিরে করছি, আমার পরিচিত সেই খাতিরে করছি, না অফিসের খাতিরে করছি, তা পার্থক্য করা কঠিন হয়ে যায়। এরকম ক্ষেত্রে তাকওয়া হল নিজের উপরে চাপটা নিয়ে নেয়া। অর্থাৎ, এই মনে করা যে, এটা অফিসের কল নয়; বরং ব্যক্তিগত কল, তাই এর খরচটা নিজে বহন করা। নিজের ফোন থাকলে সেটা ব্যবহার করা, নতুবা অফিসের ফোন ব্যবহার করলে তার বিল যেকোনভাবে হোক অফিসে দিয়ে দেয়া। এটাই হল তাকওয়া।

এমনিভাবে যদি কোন আত্মীয় স্বজন আমার বাড়িতে কোন কিছু হাদিয়া নিয়ে আসে, আর তিনি এমন আত্মীয় আমার অফিসে যার কাজও রয়ে গেছে, এরকম মুহূর্তে সন্দেহ লাগে যে, তিনি কি আত্মীয় হিসেবে ঐ হাদিয়া এনেছেন, না কি অফিসের কাজ উদ্ধার করার জন্য ঘুষ হিসেবে এনেছেন। এরকম সন্দেহের ক্ষেত্রে ঐ হাদিয়া গ্রহণ না করাই হল তাকওয়া বা পরহেযগারী। নবী কারীম (সা.) হাদীছে এরশাদ করেছেন,

دَعْ مَا يَرِيْبُكَ اِلٰى مَا لَايَرِيْبُكَ. (رواه أحمد في مسنده برقم ١٧٢٣ وإسناده صحيح)

অর্থাৎ, সন্দেহ যুক্ত জিনিস বর্জন কর। যেটা সন্দেহ মুক্ত জায়েয, সেটা গ্রহণ কর।

যাহোক বলা হচ্ছিল চাকুরি করতে যেয়ে প্রত্যেকটা পদে পদে আমানতে খেয়ানতের প্রশ্ন আসে। শুধু সরকারী চকুরি নয়, যত রকম চাকুরি আছে, সবটাতেই প্রত্যেকটা পদে পদে আমানতের খেয়ানতের প্রশ্ন আছে। আমানতের খেয়ানত যে করে, সে খাঁটি মুসলমান নয়।

বলা হচ্ছিল আমানত অনেক ব্যাপক। কাজের আমানত রয়েছে, সময়ের আমানত রয়েছে, অর্থ কড়ির আমানত রয়েছে। কথারও আমানত রয়েছে। হাদীছের ভিতর এসেছে,

اَلْمَجَالِسُ بِالْاَمَانَةِ. (سنن أبي داود برقم ٤٨٧١ وإسناده ضعيف)

অর্থাৎ, দুইজন বা কয়েকজন মজলিসে একটা কথা বললে সে কথা যারা শুনবে, তাদের কাছে সে কথাগুলো আমানত। কারণ তারা সে কথাগুলো প্রকাশ্য মজলিসে বসে আলোচনা করছে না, বরং গোপন পরিবেশে একান্তে বসে বলছে। এর অর্থই হল সে কথাগুলো বাইরে বলার কথা নয়। তাই যে সেটা শুনবে, সে অন্যের সামনে তা প্রকাশ করতে পারবে না। করলে আমানতের খেয়ানত হবে। খেয়ানতের গোনাহ হবে। এমনিভাবে দুজনে গোপনে যদি কোন কথা বলে, আর মাঝখানে কোন ভাবে কেউ সেটা শুনে ফেলে, সেটাও আমানত। সে কথা অন্যের কাছে প্রকাশ করলে আমানতের খেয়ানত হবে। এমনিভাবে টেলিফোনে কেউ কথা বলছে, আমি আড়ালে থেকে সে কথা শুনলাম, সেটা অন্যের কাছে বললেও আমানতের খেয়ানত হবে। আমরা অনেক সময় টেলিফোন করতে যাই, মাঝখান থেকে ক্রস হয়ে অন্যের কথা কানে আসে। এটা না শোনা উচিৎ। কারণ হতে পারে কোন গোপনীয় কথা হচ্ছে, আমি হয়তো তাদেরকে চিনে ফেলব, আর তারা আমার কাছে সেটা প্রকাশ করতে চায় না। তাই তাদের ইচ্ছা থাকা না সত্ত্বেও সে কথা শোনা আমার জন্য উচিৎ নয়। এ জন্যেই টেলিফোনে আড়ি পেতে কথা শোনা জায়েয নয়। আড়াল থেকে কান পেতে কারও কথা শোনা জায়েয নয়। ইসলামে এত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়েও বিধি-বিধান রয়েছে। মানুষ যখন জীবনের সব ক্ষেত্রে এগুলো মেনে চলবে, পদে পদে তারা শান্তি পাবে, ফ্যাসাদ মুক্ত থাকবে। ইসলামকে মেনে চললে তাই দুনিয়াতেও শান্তি আসে, আর আখেরাতে তো শান্তি রয়েই গেছে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে সবকিছু বোঝার এবং আমল করার তাওফীক নসীব করুন। আমীন!

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



বয়ান নং ৪৫-এর খুতবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى السَّبِيْلَ، وَيَنْهٰى عَنِ الْكِذْبِ وَخِلَافِ الْوَعْدِ وَالْخِيَانَةِ وَالتَّبْدِيْلِ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَلَا مَثِيْلَ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ اَلْاٰمِرُ بِالْاَمَانَةِ وَالصِّدْقِ وَاِيْفَاءِ الْعَهْدِ وَبِكُلِّ خُلُقٍ جَمِيْلٍ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ فِىْ كُلِّ بُكْرَةٍ وَّاَصِيْلٍ.

اَمَّا بَعْدُ :

اَيُّهَا النَّاسُ ! قَدْ ذَكَرْنَا فِى الْجُمُعَةِ السَّابِقَةِ اَنَّ الْكِذْبَ وَخِلَافَ الْوَعْدِ وَالْخِيَانَةَ مِنْ عَلَامَاتِ الْمُنَافِقِ، وَاَنَّهَا مِنَ الْكَبَائِرِ، قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثَةٌ – اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ ، وَاِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ. وَفِىْ رِوَايَةٍ – وَاِنْ صَامَ وَصَلّٰى وَزَعَمَ اَنَّهٗ مُسْلِمٌ. وَقَدْ ذَكَرْنَا اَيْضًا بِاَنَّ الْكِذْبَ لَا يَصْلُحُ بِالْهَزْلِ وَلَا بِالْجِدِّ. وَقَدْ ذَكَرْنَا اَيْضًا اَنَّ مَا يَعِدُ بَعْضُ النَّاسِ صَبِيَّهٗ وَلَا يَنْوِىْ وَفَائَهٗ، فَذَالِكَ اَيْضًا مِّنْ خِلَافِ الْوَعْدِ. لِاَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَلَا يَعِدُ الرَّجُلُ صَبِيَّهٗ ثُمَّ لَا يَفِىْ لَهٗ . اَلْحَدِيْثُ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةْ. وَحَتّٰى قَالَ الْفُقَهَاءُ : عَلَى الرَّعِيَّةِ اِطَاعَةُ اُولِى الْاَمْرِ وَالْمُلُوْكِ مَا تَكُنْ مَّعْصِيَةً. لِاَنَّ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ. وَهٰذَا اَصْلٌ شَائِعٌ فِىْ كُلِّ شُعْبَةٍ مِّنْ شُعَبِ الْحَيَاةِ، فَلَا طَاعَةَ لِاَحَدٍ مِّنَ الْاٰبَاءِ وَالْاُمَّهَاتِ وَلَا لِاَحَدٍ مِّنَ الْمَخْلُوْقِ اِنْ كَانَ الْاَمْرُ مِنْ مَعَاصِى الْخَالِقِ، قَالَ تَعَالٰى فِىْ شَاْنِ الْاٰبَاءِ وَالْاُمَّهَاتِ : وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، وَاِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ.

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

وَاعْلَمُوْا اَنَّ الْاَمَانَةَ اَيْضًا عَامَّةٌ تَشْمُلُ اَوَامِرَ اللّٰهِ وَ نَوَاهِيْهِ بِاِسْرِهَا، فَكَمَا اَنَّ الْخِيَانَةَ تَشْمُلُ الْخِيَانَةَ الْمَالِيَّةَ، تَشْمُلُ خِلَافَ اَوَامِرِ اللّٰهِ وَارْتِكَابَ نَوَاهِيْهِ. لِاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى عَبَّرَ التَّكَالِيْفَ الشَّرْعِيَّةَ كُلَّهَا بِالْاَمَانَةِ وَقَالَ : اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ، اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا. وَاعْلَمُوْا اَنَّ مَا يَسْمَعُهُ النَّاسُ فِى الْمَجَالِسِ فَهُوَ اَيْضًا اَمَانَةٌ، لِاَنَّ الْمَجَالِسَ بِالْاَمَانَةِ. وَلَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ اِلٰى دَاخِلِ بَيْتِ النَّاسِ مِنْ غَيْرِ اِجَازَةٍ، لِاَنَّ ذَالِكَ اَيْضًا مِنْ خِلَافِ الْاَمَانَةِ. وَهُوَ تَعَالٰى يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُوْرُ.

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ : وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ، اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا، وَقَالَ تَعَالٰى : اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا اَثِيْمًا. وَقَالَ تَعَالٰى: وَيْلٌ لِّكُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ. اَلْاٰيَةُ.

بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ، وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. اَقُوْلُ قَوْلِىْ هٰذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ لِىْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَاسْتَغْفِرُوْهُ، اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



বয়ান নং- ৪৬

## নেকী অর্জন করার সহজ পদ্ধতি

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَآفَّةً. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ دَعَا اِلٰى هُدًى، كَانَ لَهٗ مِنَ الْاَجْرِ مِثْلُ اُجُوْرِ مَنِ اتَّبَعَهٗ لَا يَنْقُصُ ذَالِكَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا. وَمَنْ دَعَآ اِلٰى ضَلَالَةٍ، فَعَلَيْهِ مِنَ الْاِثْمِ مِثْلُ اٰثَامِ مَنِ اتَّبَعَهٗ لَا يَنْقُصُ ذَالِكَ مِنْ اٰثَامِهِمْ شَيْئًا.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

পুরোপুরি দ্বীনদার হতে গেলে, দ্বীনের উপর পুরোপুরি চলতে চাইলে, শরীআতের সব ধরনের বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে। জীবনের সব ক্ষেত্রে ইসলামের বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে। যে পুরোপুরি মেনে চলবে পূর্ণাঙ্গ মুসলমান, সে পুরোপুরি মুসলমান। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে কারীমে আমাদেরকে শুধু মুসলমান হতে বলেননি, পূর্ণাঙ্গ মুসলমান হতে বলেছেন। ইরশাদ হয়েছে,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَآفَّةً.

অর্থাৎ, হে মু'মিনরা! তোমরা পুরোপুরি ইসলামে প্রবেশ কর, অর্থাৎ পুরোপুরি দ্বীনদার হও। পুরোপুরি মুসলমান হও। (বাকারা: ২০৮)

এ আয়াতে আল্লাহ পাক আমাদেরকে পুরোপুরি মুসলমান হওয়ার হুকুম দিয়েছেন। আর আল্লাহ পাক যে বিষয়ে হুকুম দেন সেটা ফরয হয়ে যায়। অতএব পুরোপুরি দ্বীনের উপরে চলা আমাদের উপরে ফরয। আমরা যারা দ্বীনের উপর আংশিক চলি, অর্থাৎ দ্বীনের কিছু কথা মানি আর কিছু মানি না, তাদের সর্বদা এই ফরয তরক হওয়ার গোনাহ হচ্ছে। অর্থাৎ পুরোপুরি দ্বীনের উপরে চলা যে ফরয ছিল, সেই ফরয তরক হওয়ার গোনাহ্ হচ্ছে।

পুরোপুরি দ্বীনের উপরে চলাকে আমরা কঠিন মনে করি। আমরা মনে করি পুরোপুরি দ্বীনের উপর চলতে গেলে অনেক আরাম আয়েশ ত্যাগ করতে হবে, মনের অনেক চাহিদা ত্যাগ করতে হবে। ধর্মের সবকিছু মেনে চলতে গেলে আমার ইচ্ছামত আমি চলতে পারব না। এতে আমার অনেক কষ্ট হবে। এসব কারণে আমরা পুরোপুরি দ্বীনের উপর চলাকে কঠিন মনে করি। দ্বীনের উপর চলতে অভ্যস্ত হয়ে গেলে তখন আর কষ্ট থাকে না বরং তখন এর মধ্যেই আরাম বোধ হতে থাকে।

আমরা অনেকে এরকমও বলে থাকি আধুনিক এই যুগে ধর্মের সবকিছু মেনে চলা সম্ভব নয়। একথার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, এ ধর্ম আধুনিক এই যুগে চলার মত নয়। অথচ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কিয়ামত পর্য সময়ের জন্য এই ধর্ম দিয়েছেন এবং পুরোপুরি এই ধর্মের উপর চলার হুকুমও দিয়েছেন। তাহলে বুঝা গেল এই ধর্ম এই যুগেও চলার মত এবং এই যুগেও এই ধর্মের উপর চলা সম্ভব। যদি সম্ভব না হবে তাহলে আল্লাহ পাক হুকুম দিলেন কীভাবে? আল্লাহ পাক কোন অসম্ভব জিনিসের হুকুম দেন না। আল্লাহ পাক মানুষের সাধ্যের বাইরে কোন হুকুম দেন না। তিনি নিজেই বলেছেন – কুরআন শরীফে ইরশাদ হয়েছে,

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا.

অর্থাৎ, আল্লাহ মানুষের সাধ্যের বাইরে তাকে কোন বিধান দেন না। (বাকারা: ২৮৬)

কুরআনের এ বর্ণনা থেকে বুঝা গেল, যুগ-যমানা যতই কঠিন হোক না কেন, বিজ্ঞানের উন্নতি অবনতি যা-ই হোক না কেন, সর্বাবস্থায় মানুষের পক্ষে পুরোপুরি দ্বীনের উপরে চলা সম্ভব। যুগ-যমানার প্রতিকূলতার কারণে হয়তো দ্বীনের কোন কোন বিষয় মানা একটু কষ্টকর হতে পারে, কোন কোন বিষয় মানা একটু কঠিন মনে হতে পারে, কিন্তু নিয়ত করে মেহনত শুরু করে দিলে আল্লাহ পাক আছান করে দিবেন, চলা সহজ হয়ে যাবে। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

وَ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا.

অর্থাৎ, আমাকে পাওয়ার জন্য যে মেহনত শুরু করে, অবশ্যই অবশ্যই তাকে আমি আমার পথে পৌছে দেই। (আনকাবুত: ৬৯)

তাই মেহনত শুরু করতে হবে। মেহনত শুরু করলে আল্লাহ পাকের নুসরত বা সাহায্য আসতে থাকবে। এখন আমি মনে করছি এটা করা সম্ভব নয়, ওটা করা সম্ভব নয়, আল্লাহ্‌র নুসরত হলে সব সম্ভব হয়ে যাবে। আল্লাহ পাক আছানীর সুরাত বের করে দিবেন। এর জন্য প্রথম কাজ হল আমাদেরকে আমল করার নিয়ত করতে হবে। হাদীছে এসেছে,

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ. (متفق عليه)

অর্থাৎ, আমলের ভিত্তি নিয়তের উপর।

এ হাদীছের অনেকগুলো ব্যাখ্যা আছে। তার মধ্যে একটা ব্যাখ্যা হল- সমস্ত আমল আসে নিয়তের ভিত্তিতে। তাই মানুষ যখন নিয়ত করে, তখন অনেক কিছু করতে পারে। দুনিয়াবি বিষয়ের ক্ষেত্রেও দেখা যায় পাকাপোক্ত নিয়ত হলে অনেক কিছুর ব্যবস্থা হয়ে যায়। যেমন মনের মধ্যে টাকা-পয়সা যোগাড় করার পাকাপোক্ত নিয়ত আসলে টাকা-পয়সার ব্যবস্থা হয়েই যায়। তার একটা উদাহরণ হল– কেউ যখন কোন কেস কাণ্ডে পড়ে যায়, তখন হাজার হাজার টাকারও যোগাড় হয়ে যায়। কারণ তখন টাকা যোগাড় করতেই হবে- এরকম পাক্কা নিয়ত হয়ে যায়। অথচ আত্মীয়-স্বজন বিপদে পড়ে দু'একশত টাকা চাইলেও তার টাকা থাকে না। অনেকে বলে থাকে কেসের টাকা ভূতে যোগায়। একথা ঠিক নয়। ভূতে যোগায় না, আল্লাহ পাক যোগান। পাক্কা নিয়তের পর মেহনত শুরু করে, তখন আল্লাহ পাকই ব্যবস্থা করে দেন। সে চিন্তা করে আমাকে এটা করতেই হবে, যে কোনভাবে হোক এটা আমাকে করতেই হবে। এরকম পাকাপোক্ত নিয়ত করে চিন্তা-ভাবনা এবং মেহনত শুরু করে, তখন আল্লাহ্‌র নুসরতে তার ব্যবস্থা হয়ে যায়।

নিয়ত এমন জিনিস, পাকাপোক্ত এরাদা এমন জিনিস, এর দ্বারা অনেক অসাধ্য সাধন হয়ে যায়। এজন্যই বলা হয় اَلْهِمَّةُ هِيَ الْاِسْمُ الْاَعْظَمُ অর্থাৎ, পাকাপোক্ত নিয়ত বা হিম্মত হল এসমে আযম। অর্থাৎ, এক মহা শক্তি। তাই দ্বীনের উপরে চলার পাকাপোক্ত নিয়ত হয়ে গেলে, অনেক বাঁধা এমনিতেই দূর হয়ে যায়। তারপর আমল শুরু করলে, মেহনত-মোজাহাদা শুরু করলে, গন্তব্যে পৌছা আল্লাহ পাক আছান করে দেন। এমনকি আমলের মেহনত-মোজাহাদা শুরু করার আগ থেকেই আল্লাহ পাক আছানী দেয়া শুরু করেন। হাদীছে এসেছে নবীয়ে পাক (সা.) ইরশাদ করেছেন,

مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَطْلُبُ بِهِ عِلْمًاسَهَّلَ اللّٰهُ لَهُ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ. (صحيح البخاري ٦٧ وصحيح مسلم ٧٠٢٨)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



অর্থাৎ, দ্বীনের রাস্তায় চলতে গিয়ে প্রত্যেকটা কাজ কীভাবে করতে হবে, তা জানার জন্য অর্থাৎ দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করার জন্য যখন কেউ পথ চলা শুরু করে, আল্লাহ পাক তখন তার জন্য জান্নাত পাওয়ার পথ আছান করে দেন। "জান্নাতে যাওয়ার পথ আছান করে দেন" অর্থাৎ দ্বীনের উপর চলাকে আছান করে দেন। তাই দ্বীনের উপর চলা শুরু করতে হবে, চলার জন্য জানা শুরু করতে হবে, তাহলে সবকিছু করা আছান হয়ে যাবে, কিছুই কঠিন থাকবে না। মনের বাঁধা, সমাজের বাঁধা, মানুষের বাঁধা, সব বাঁধা দূর হয়ে যাবে। এইসব বাঁধার কথা চিন্তা করেই আমরা দ্বীনের অনেক কাজ করতে পারি না। আমরা মনে করি– এই আমল করতে গেলে মানুষে বাঁধা দিবে, ঐ আমল করতে গেলে স্ত্রী বাঁধা দিবে, আত্মীয়-স্বজন বাঁধা দিবে। দ্বীনের উপর চলা শুরু করলে এইসব যতরকম বাঁধা আছে, সব বাঁধা দূর হয়ে যাবে। যারা দ্বীনের উপর চলছে তাদের কোন বাঁধা নেই। তাদের বাঁধা যখন দূর হয়ে গেছে, দ্বীনের উপর চলা শুরু করলে আমার বাঁধাও দূর হয়ে যাবে। বিবিকে পর্দা করাতে গেলে বাঁধা আসবে, দাড়ি রাখতে গেলে বাঁধা আসবে, মাথায় টুপি, হাতে তাসবীহ নিতে গেলে বাঁধা আসবে। এভাবে অনেক আমল করতে গেলে বিভিন্নভাবে বাঁধা আসবে। মনের থেকেও বাঁধা আসবে। সমাজ থেকেও বাঁধা আসবে। এই সব বাঁধাকে উপেক্ষা করে আমল শুরু করে দিলে এবং কিছুদিন করতে থাকলে সব বাঁধা দূর হয়ে যাবে। প্রথমে বাঁধা মনে হলেও পরে বাঁধা থাকবে না। সব বাঁধা দূর হয়ে যাবে, কোন বাঁধাই বাঁধা থাকবে না। প্রথমে কঠিন মনে হলেও পরে সব আছান লাগবে।

দ্বীনের কাজকে আল্লাহ পাক কঠিন করেননি বরং আছান করে দিয়েছেন। অনেকভাবেই আল্লাহ পাক দ্বীনকে আছান করে দিয়েছেন। দ্বীনের কাজ করলে ছওয়াব, এমনকি করার আগেও ছওয়াব। নেক কাজের নিয়ত করলেও ছওয়াব পাওয়া যায়। করলে তো বলা হয়েছে,

فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَّعْمَلُهَا تُكْتَبُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا اِلى سَبْعِ مِأَةِ ضِعْفٍ. (صحيح مسلم برقم ٣٥٣)

অর্থাৎ, প্রত্যেক নেক কাজ করলে ছওয়াব কম পক্ষে দশগুণ সর্বোচ্চ সাতশত গুণ। আর করার আগে শুধু নিয়ত করা মাত্রই এক ছওয়াব লেখা হবে। হাদীছে ইরশাদ হয়েছে,

مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ. (صحيح مسلم ٣٥٤)

অর্থাৎ, কেউ নেক কাজের নিয়ত করলে সেটা করার পূর্বেই তার জন্য একটা ছওয়াব লিখে দেয়া হয়।

দেখা গেল আল্লাহ পাক দ্বীনকে বহুত আছান করে দিয়েছেন। কাজ করলেও ছওয়াব, নিয়ত করলেও ছওয়াব। কাজ করলে একটা ছওয়াব নয় বরং দশটা ছওয়াব। আমি নেক কাজের নিয়ত করলাম কিন্তু কোন অসুবিধার কারণে তা করতে পারলাম না, তবুও শুধু নিয়তের কারণে আমার জন্য একটা ছওয়াব লিখে দেয়া হবে। আর করতে পারলে দশগুণ ছওয়াব দেয়া হবে। দেখা গেল ছওয়াব অর্জন করা কত আছান! নেক কাজ করলেও ছওয়াব, করতে পারিনি, শুধু নিয়ত করেছি তাতেও ছওয়াব।

একটা ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে- সনদ জানা নেই। একবার বানী ইসরাঈলের যামানায় খুব দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। তখন যাদের ঘরে ধন-সম্পদ ছিল, তারা মানুষকে প্রচুর দান-খয়রাত করছিল। এ সময় একজন গরীব মানুষ একটা পাহাড়ের পাশে দাঁড়িয়ে মনে মনে ভাবছিল আমারতো ধন-সম্পদ নেই, থাকলে আমি দান খয়রাত করতাম। আল্লাহ পাক যদি এই পাহাড় পরিমাণ খাদ্য-শষ্যের স্তুপও আমাকে দান করেন, তাহলে তা সব আমি মানুষকে বিলিয়ে দিব। তখন আল্লাহ পাক তখনকার নবীর মাধ্যমে ঐ লোককে জানিয়ে দিলেন যে, তুমি নিয়ত করেছ এই পাহাড় পরিমাণ খাদ্য-শষ্য থাকলে তুমি দান করে দিতে, তোমাকে ঐ পরিমাণ দানের ছওয়াব দিয়ে দেয়া হয়েছে।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

দেখা গেল শুধু নিয়তের ভিত্তিতেই বিরাট দান-খয়রাতের ছওয়াব পাওয়া গেল। যারা গরীব, তারা দান-খয়রাত করতে না পারলেও দান-খয়রাতকারী ধনীদের মত ছওয়াব পেতে পারে, এমন আরও একটা ব্যবস্থা আছে। একবার সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যারা গরীব ছিলেন এরকম কিছু সাহাবী রাসূল (সা.)কে বললেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত এগুলো আমরাও করি ধনীরাও করে। কিন্তু তাদের টাকা-পয়সা আছে তারা দান-খয়রাত করে অনেক নেকী অর্জন করছে যা আমরা করতে পারছি না। এভাবে তারা তো আগে বেড়ে যাচ্ছে, আমরা পিছনে পড়ে যাচ্ছি। রাসূল (সা.) শিক্ষা দিলেন যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পরে সুবহানাল্লাহ্ ৩৩ বার, আল-হামদুলিল্লাহ্ ৩৩ বার, আল্লাহু আকবার ৩৪ বার করে পড়বে। এক হাদীছে শুধু ফজর এবং আছরের কথাও আছে। আবার অনেক হাদীছে পাঁচ ওয়াক্তের কথাও আছে। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর তোমরা যদি এই আমল কর, তাহলে ঐ ধনীরা দান-সদকা করে যত আগে বেড়ে যাবে, তোমরাও তত আগে বেড়ে যাবে এই আমলের কারণে। দেখা গেল এভাবেও আল্লাহ পাক নেকী অর্জন করা আছান করে দিয়েছেন।

নেক কাজ করব তাতে ছওয়াব, নেক কাজের নিয়ত করব তাতেও ছওয়াব। নেক কাজের কথা কাউকে বলব, নেক কাজের দিকে কাউকে দাওয়াত দিব, তাতেও ছওয়াব। হাদীছে ইরশাদ হয়েছে,

مَنْ دَعَا اِلٰى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْاَجْرِ مِثْلُ اُجُوْرِ مَنِ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَالِكَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا. (رواه مسلم في صحيحه برقم ٦٩٨٠)

অর্থাৎ, কাউকে নেক কাজের পথ দেখালে অর্থাৎ নেক কাজের কথা বললে, নেক কাজের দাওয়াত দিলে এর কারণে সে যে আমল করবে, তার আমল দেখে আরও যত মানুষ আমল করবে, এভাবে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ আমল করবে, সকলের আমলের সমপরিমাণ ছওয়াব ঐ প্রথম দাওয়াতকারীকে দেয়া হবে। এরপর নবী (সা.) এর বিপরীতটাও বলেছেন,

وَمَنْ دَعَا اِلٰى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْاِثْمِ مِثْلُ اٰثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ اٰثَامِهِمْ شَيْئًا.

(المصدر السابق)

অর্থাৎ, যদি কেউ গোনাহের পথ কাউকে দেখায়, অর্থাৎ কাউকে গোনাহের পরামর্শ দেয়, কোন পাপ কাজের বুদ্ধি দেয়, কোন পাপ কাজের দিকে আহ্বান জানায়, তাহলে এই দাওয়াতের কারণে ঐ ব্যক্তি পাপ করবে, তার পাপ দেখে আরও যত মানুষ পাপ করবে, এভাবে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষের পাপ হবে, ঐ সমস্ত লোকের পাপের সমপরিমাণ পাপ প্রথম দাওয়াতকারীকে দেয়া হবে।

দেখা গেল আমল করলেও ছওয়াব, আমলের নিয়ত করলেও ছওয়াব, আমলের কথা কাউকে বললেও ছওয়াব। এমনকি বলা নয়, আমি একটা নেক আমল করলাম, আমার সেই নেক আমল দেখে আরও মানুষ যদি আমল করে, তাদেরকে দেখে আরও মানুষ যদি আমল করে, এভাবে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষের আমল হবে, সমস্ত মানুষের সব আমলের সমপরিমাণ ছওয়াব আমাকেও দেয়া হবে। হাদীছে ইরশাদ হয়েছে,

مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَه اَجْرُهَا وَمِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْءٌ. (رواه أحمد في مسنده برقم ١٩٢٢٥ وقال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم)

অর্থাৎ, একজন মানুষ যে একটা নেক আমল জারি করল, জারি করল বলতে বোঝায় যেটা চালু নেই এরকমটা চালু করল, তার দেখা-দেখি যত মানুষ আমল করবে, সকলের সমপরিমাণ ছওয়াব তাকে দেয়া

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



হবে। এতে অন্য কারও ছওয়াব কমানো হবে না। এটাকেই অন্য এক হাদীছে বলা হয়েছে,

مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِيْ قَدْ أُمِيْتَتْ بَعْدِيْ فَإِنَّ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئًا. (رواه الترمذي في سننه برقم ٢٦٧٧ وقال : حديث حسن)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি দ্বীনের এমন কোন কাজ চালু করল, যেটা মরে গিয়েছিল, অর্থাৎ ব্যাপকভাবে যেটার আমল হচ্ছিল না, ব্যাপকভাবে যে আমলটা বর্জন হচ্ছিল, এরকম আমল যে ব্যক্তি চালু করবে, তার দেখা দেখি আরও যত মানুষ আমল করবে, কিয়ামত পর্যন্ত এরকম যত আমল হতে থাকবে, সকলের আমলের সমপরিমাণ ছওয়াব তাকে দেয়া হবে। এতে অন্য মানুষের আমলের ছওয়াব কমানো হবে না। আল্লাহ পাকের ভাণ্ডারে তো কমী নেই যে ভাগাভাগি করে না দিলে ভাণ্ডারে টান পড়বে। আল্লাহ পাকের ভাণ্ডারে কোন কমতি নেই। এক হাদীছে বলা হয়েছে– আল্লাহ পাকের ভাণ্ডারে এত আছে যে, দুনিয়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যত জিন, ইনসান চলে গেছে এবং আসবে, সকলে যদি একত্রিত হয়ে আল্লাহ্‌র কাছে তাদের মনের সব আশা-আকাংখার বিষয় চায়, আর আল্লাহ পাক তাদের সব চাওয়া পুরণ করেন, তবুও আল্লাহ্‌র ভাণ্ডার থেকে এতটুকুও কমবে না। কাজেই আল্লাহ পাক ছওয়াব ভাগাভাগি করতে যান না। বরং আমি আমল করলাম, আমার দেখা দেখি আরেকজন আমল করল, সে আমল করছে তার ছওয়াব সে পুরোপুরি পাবে, ঐ পরিমাণ ছওয়াব আমাকেও দেয়া হবে।

এ হাদীছে এমন আমল চালু করার জন্য উৎসাহ দেয়া হয়েছে, যে আমল ব্যাপকভাবে চালু নেই, ব্যাপকভাবে যার উপর আমল করা হচ্ছে না। আমাদের সমাজে এরকম বহু আমল আছে, যেগুলো ব্যাপক ভাবে বর্জন হচ্ছে, যেমন– এখন খাওয়া দাওয়ার একটা সুন্নাত ব্যাপকভাবে বর্জন হচ্ছে। সবার ঘরে আমরা এখন ডাইনিং টেবিলের ব্যবস্থা রাখছি। আগের যুগের মানুষ ডাইনিং টেবিলে খেত না। তাদের কি খাওয়া হত না? ডাইনিং টেবিলে খেলে খাওয়ার যে সুন্নাত তরীকা আছে, বসার যে সুন্নাত তরীকা আছে, সেই সুন্নাতগুলো বর্জন হয়ে যায়। যদিও আমরা চেয়ার টেবিলে খাওয়াকে হারাম বলি না, গোনাহ বলি না। কিন্তু এর দ্বারা অনেকগুলো সুন্নাত বর্জন হয়ে যায়। বসার সুন্নাত বর্জন হয়, ঝুকে খাওয়ার সুন্নাত বর্জন হয় এবং মাটিতে বর্তন রেখে খাওয়ার সুন্নাত বর্জন হয়, দস্তরখান বিছানোর সুন্নাত বর্জন হয়। এভাবে বহু সুন্নাত বর্জন হয়। ব্যাপকভাবে চেয়ার টেবিলে খাওয়ার প্রচলন ঘটায় ব্যাপকভাবে এই সুন্নাতগুলো বর্জন হচ্ছে। অতএব কেউ যদি এই সুন্নাতগুলোর আমল চালু করে, তাহলে তার বিরাট ছওয়াব হবে। বিদেশীদের অনুকরণে চেয়ার টেবিলে খাওয়াকে আমরা ফ্যাশন করে বসেছি। মনে করেছি এর মধ্যে উন্নতি, এর মধ্যে কামিয়াবী। অথচ মুসলমানদের উন্নতি মুসলমানী নিয়ম কানূনের মধ্যে। আমরা উল্টো বুঝে বসে আছি। আমরা উল্টো চলছি। যে পথকে আমরা কামিয়াবীর পথ মনে করেছি, সেটা কামিয়াবীর পথ নয়। বরং সেটা অধঃপতনের পথ। এক কবী খুব সুন্দর করে বলেছেন,

ترسم نہ رسی بکعبہ اے اعرابی + کہ ایں راہ کہ تو میروی بترکستان ست

অর্থাৎ, হে বেদুঈন! তুমি মক্কায় যেতে চাও, কিন্তু যে পথ ধরেছ, এটা তো উল্টো দিকের পথ, এ পথ তো তুর্কিস্তানে যাওয়ার পথ।

আমাদের মধ্যে যারা ধনী আছি, তারা এরকম করতে পারি যে, ঘরে ডাইনিং টেবিল রাখব না, নীচে বসে সুন্নাত তরীকায় খাব, মেহমান আসলে তাদেরকেও এইভাবে খাওয়াব। সবকিছু সুন্দর রাখব- আপ্যায়ন হবে সুন্দর, ব্যবস্থাপনা হবে সুন্দর, শুধু খাওয়া হবে নীচে সুন্নাত অনুযায়ী। তাহলে অন্যরা

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

দেখে ভাববে এইলোকের কোন কিছুর অভাব নেই, সবকিছুই আছে। একটা ডাইনিং টেবিলের ব্যবস্থাও তিনি করতে পারেন। তারপরেও তিনি করছেন না, তিনি সুন্নাতের উপর আমল করছেন। তাহলে তার দেখাদেখি আরও পাঁচজন এরকম করতে উদ্বুদ্ধ হবে, তার দেখাদেখি আরও পঞ্চাশ জন এরকম উদ্বুদ্ধ হবে। এভাবে কিয়ামত পর্যন্ত এই সুন্নাতের উপর আমল বাড়তে থাকবে, মরা সুন্নাত যিন্দা হবে। সকলের আমলের সমপরিমাণ ছওয়াব পাওয়া যাবে। আল্লাহ পাক ছওয়াব পাওয়ার কত সহজ ব্যবস্থা রেখে দিয়েছেন। আমল করলেও ছওয়াব, নিয়ত করলেও ছওয়াব, আমলের কথা বললেও ছওয়াব, আমলের কথা বলা নয়; করে দেখানোর ভিতরেও ছওয়াব।

আজকাল বিবাহ-শাদীতে ব্যাপকভাবে সুন্নাত বর্জন হচ্ছে। সুন্নাতের স্থানগুলো পাপে দখল করে নিয়েছে। আজকাল ব্যাপকভাবে দেখা যায় বিবাহ হলেই সেখানে ভিডিও হয়। এমনকি খাওয়ানো হচ্ছে খাওয়ানোর অবস্থাটাও ভিডিও করে রাখা হচ্ছে। ভাবটা এমন যেন পরে কেউ খাওয়ার কথা অস্বীকার করতে না পারে, দলীল রেখে দেয়া হচ্ছে! এটাকে আমরা কোন গোনাহই মনে করছি না। এই গোনাহ ব্যাপক হয়ে গেছে। এখন যদি আমরা কিছু লোক এই গোনাহ ছেড়ে দিয়ে সহীহ তরীকার প্রচলন ঘটাতে পারি, তাহলে আমাদের দেখাদেখি আর যত লোক সেই সহীহ তরীকা মোতাবেক আমল করবে, সকলের সমপরিমাণ ছওয়াব আমরা পাব।

যাহোক বলা হচ্ছিল ছওয়াব অর্জন করার পথ আছান করে দেয়া হয়েছে। আমল করলেও ছওয়াব, আমলের নিয়ত করলেও ছওয়াব, আরেকজনকে আমলের কথা বললেও ছওয়াব, আরেকজনকে আমলের পথ দেখালে তাতেও ছওয়াব। আমলের কাজে সহযোগিতা করলে তাতেও ছওয়াব। যেমন কেউ আল্লাহ্‌র রাস্তায় জেহাদে যাচ্ছে। তার সামান নেই, আমি তার সামানের ব্যবস্থা করে দিলাম। তাহলে সে জেহাদ করে যে ছওয়াব পাবে, ঐ পরিমাণ ছওয়াব আমাকেও দেয়া হবে। এমনিভাবে একজন মানুষ দ্বীনের কাজ করছে, যেমন মসজিদ চালাচ্ছে, মাদ্রাসা চালাচ্ছে, বা যে কোন দ্বীনী প্রতিষ্ঠান চালাচ্ছে। আমি যদি বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়ে টাকা-পয়সা দিয়ে বা অন্য যে কোনভাবে সহযোগিতা করি, তাহলে সে প্রতিষ্ঠান চালিয়ে যে ছওয়াব পাবে, আমিও সেই ছওয়াব পেয়ে যাব। একজন তালিবে ইল্‌ম লেখা-পড়া করে কুরআন-হাদীছের জ্ঞান অর্জন করে যে ছওয়াব পাচ্ছে, আমি তার অর্থের যোগান দিলাম, তাহলে একজনকে আলেম বানানোর ছওয়াব পেয়ে যাব। আমি আমার ছেলেকে আলেম বানাতে পারিনি, একটা ছেলেকে আলেম বানাতে যত খরচ লাগে সেই খরচ আমি দেব, তাহলে আলেম বানানোর ছওয়াব পেয়ে যাব।

নেক কাজের মাধ্যম হলে যেমন ছওয়াব, গোনাহের ক্ষেত্রেও এরকম! গোনাহের মাধ্যম হলেও গোনাহ। যেমন সুদের ব্যাপারে হাদীছে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি সুদ দেয়, অর্থাৎ যে সরাসরি সুদের সাথে জড়িত সেও পাপী। এমনিভাবে যে সরাসরি জড়িত নয় বরং তার মাধ্যম, সেও পাপী। এজন্যেই সুদের যে সাক্ষী থাকে, যে লিখে দেয়, যে হিসাব-নিকাশ করে দেয়, তাদেরও সুদ-এর গোনাহ হয়। যারা সুদ দেয়-নেয় তারা যেমন অভিশপ্ত হয়, এই সহযোগিরাও তেমন অভিশপ্ত হয়। নেক কাজের মাধ্যম থাকলে যেমন নেকী হয়, গোনাহের মাধ্যম থাকলেও ওরকম গোনাহ হয়। যে কথা বলা হচ্ছিল নেক কাজের মাধ্যম হলে তাতেও নেক কাজের ছওয়াব পাওয়া যায়।

নানান বাহানায় আল্লাহ পাক ছওয়াব দিয়ে থাকেন। আল্লাহ পাকের রহমতের অবস্থাও এরকম। এক কবি বলেছেন–

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



رحمت حق بہانہ می جوید + بہانی جوید

অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র রহমত ক্ষমা করার এবং পুরস্কার দেয়ার বাহানা খুঁজতে থাকে, পাকড়াও করার বা না দেয়ার অজুহাত খোঁজে না।

আল্লাহ্‌র রহমত মুক্তি দেয়ার বাহানা খুঁজতে থাকে যে, একটা বাহানায় যদি লোকটাকে পার করে দেয়া যায়! আল্লাহ্‌র স্বভাব এরকম নয় যে, কোন একটা ক্লু বের করে ধরার চেষ্টা করবেন। বঞ্চিত করার জন্য সূত্র খুঁজবেন। আল্লাহ তা'আলা মহাব্বত করে বান্দাকে পয়দা করেছেন, বান্দার প্রতি আল্লাহ রহমতই করতে চান। তাই আল্লাহ্‌র রহমত বাহানা খুঁজতে থাকে কোনভাবে বান্দাকে রহমতের আওতায় আনা যায় কি-না। এ জন্যেই হাদীছে এসেছে এক বেশ্যা নারী একটা পিপাসার্ত কুকুরকে পানি পান করিয়েছিল, এ ওছীলায় আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দিয়েছে। এভাবে অনেককে আল্লাহ তাআলা এক একটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আমলের ওছীলায় নাজাত দিয়ে দিবেন। আল্লাহ্‌র রহমত নাজাত দেয়ার বাহানা খুঁজতে থাকে যে, একটা বাহানায় যদি লোকটাকে পার করে দেয়া যায়!

যাহোক আমরা যদি নেক কাজের সাথে যে কোনভাবে নিজেদেরকে জুড়ে দিতে পারি, তাহলেই আল্লাহ পাক আমাদেরকে সেই নেক কাজের ছওয়াব দান করবেন। আল্লাহ পাক দ্বীনের উপর চলার পথকে আছান করে দিয়েছেন। ছওয়াব অর্জন করাকেও আছান করে দিয়েছেন। তাই পুরোপুরি দ্বীন মেনে চলা, পূর্ণাঙ্গ মুসলমান হওয়া কঠিন নয় বরং আছান। আল্লাহ পাক আমাদেরকে পূর্ণাঙ্গ মুসলমান হওয়ার এবং দ্বীনের সব বিষয়ে আমল করার তাওফীক দান করুন। আল্লাহ পাক আমাদেরকে ঐ আয়াতের উপর পুরোপুরি আমল করার তাওফীক দান করুন যে আয়াতে বলা হয়েছে,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَآفَّةً.

অর্থাৎ, হে মু'মিনরা! তোমরা পুরোপুরি ইসলামে প্রবেশ কর, অর্থাৎ পুরোপুরি দ্বীনদার হও। পুরোপুরি মুসলমান হও। (বাকারাঃ ২০৮)

আল্লাহ পাক আমাদেরকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বয়ান নং ৪৬-এর খুতবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ خَلَقَ كُلَّ شَیْءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِیْرًا، اَحْمَدُهٗ وَاَشْكُرُهٗ وَهُوَ تَعَالٰی یَسَّرَ لَنَا دِیْنَنَا تَیْسِیْرًا، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِیْكَ لَهٗ اَلَّذِیْ یُدَمِّرُ كُلَّ شَیْءٍ تَدْمِیْرًا، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَیِّدَنَا وَنَبِیَّنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ اَلَّذِیْ فَسَّرَ لَنَا دِیْنَنَا تَفْسِیْرًا، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَنَبِیِّنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَهْلِ الْمَجْدِ طَاعَةً وَّتَشْمِیْرًا.

اَمَّا بَعْدُ :

اَیُّهَا النَّاسُ! اِنَّ فِی الْاِسْلَامِ مَنَاهِجَ وَطُرُقًا لِّكُلِّ شُعْبَةٍ مِّنْ شُعَبِ حَیَاتِنَا، لِمَنَاسِكِنَا وَشَرَائِعِنَا، وَلِاُسْرَتِنَا وَمُجْتَمَعِنَا، وَلِظَاهِرِنَا وَبَاطِنِنَا، وَحَتّٰی لِمَاْكِلِنَا وَمَشَارِبِنَا وَمَلَابِسِنَا وَمَضَاجِعِنَا، وَحَتّٰی لِتَرَجُّلِنَا وَتَنَعُّلِنَا، وَلَمْ یَتْرُكْ شَیْئًا مِّنْ اُمُوْرِ حَیَاتِنَا اِلَّا بَیَّنَ اللّٰهُ طَرِیْقَتَهٗ فِی الْكِتَابِ تَبْیِیْنًا، وَفَصَّلَهٗ تَفْصِیْلًا، وَهُوَ الْاِسْلَامُ الْكَامِلُ، وَقَدْ اَمَرَنَا اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ لِلدُّخُوْلِ فِی الْاِسْلَامِ كَامِلًا فَقَالَ : یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِی السِّلْمِ كَآفَّةً.

عِبَادَ اللّٰهِ! وَاِنَّ الدُّخُوْلَ فِی الْاِسْلَامِ كَامِلًا لَیْسَ بِعَسِیْرٍ، بَلْ هُوَ یَسِیْرٌ، وَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی جَعَلَ الدِّیْنَ یَسِیْرًا لَا عَسِیْرًا، لِاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی لَا یُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا. وَقَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : اَلدِّیْنُ یُسْرٌ، وَلَنْ یُّشَادَّ الدِّیْنَ اَحَدٌ اِلَّا غَلَبَهٗ. وَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی جَعَلَ فِیْ نِیَّةِ الْاَعْمَالِ ثَوَابًا ، وَلَمْ یَجْعَلْ فِیْ نِیَّةِ الْمَعَاصِیْ عِقَابًا، قَالَ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّیَّاتِ، وَاِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوٰی. اَلْحَدِیْثُ. وَقَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ یَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهٗ حَسَنَةٌ. وَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی جَعَلَ فِی الدَّعْوَةِ اِلَی الْاَعْمَالِ

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



وَالْهِدَایَةِ لَهَا ثَوَابًا، قَالَ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : مَنْ دَعَا اِلٰی هُدًی كَانَ لَهٗ مِنَ الْاَجْرِ مِثْلُ اُجُوْرِ مَنِ اتَّبَعَهٗ لَا یَنْقُصُ ذَالِكَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَیْئًا. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ . وَقَالَ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهٗ كَانَ لَهٗ مِثْلُ اَجْرِهٖ وَمِثْلُ اُجُوْرِهِمْ مِنْ غَیْرِ اَنْ یَّنْقُصَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَیْئًا. وَفِیْ رِوَایَةٍ – مَنْ اَحْیَا سُنَّةً مِّنْ سُنَّتِیْ فَعَمِلَ بِهَا النَّاسُ كَانَ لَهٗ مِثْلُ اَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا یَنْقُصُ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَیْئًا. كِلَا الْحَدِیْثَیْنِ فِی السُّنَنِ لِابْنِ مَاجَةَ.

عِبَادَ اللّٰهِ! وَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی سَهَّلَ لَنَا طَرِیْقَ الْجَنَّةِ اَیْضًا. قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ سَلَكَ طَرِیْقًا یَّلْتَمِسُ فِیْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ لَهٗ طَرِیْقًا اِلَی الْجَنَّةِ. فَعَلَیْنَا اِرَادَةُ الْاَعْمَالِ وَالْمُجَاهَدَةُ لَهَا. قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی : وَالَّذِیْنَ جَاهَدُوْا فِیْنَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا، وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِیْنَ.

بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِی الْقُرْاٰنِ الْعَظِیْمِ، وَنَفَعَنَا وَاِیَّاكُمْ بِالْاٰیَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِیْمِ. اَقُوْلُ قَوْلِیْ هٰذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ لِیْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِیْنَ وَاسْتَغْفِرُوْهُ، اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ.

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বয়ান নং- ৪৭

## আল্লাহর সাথে সম্পর্ক জোড়ার সহজ উপায় (১ম পর্ব)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا. وَفِى الْحَدِيْثِ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اِذَا جَرَبَهُ اَمْرٌ فَزِعَ اِلَى الصَّلٰوةِ.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

ইসলাম আমাদেরকে যত বিধি-বিধান দিয়েছে তার উদ্দেশ্য হল- আল্লাহর সাথে যেন বান্দার সম্পর্ক জুড়ে যায়। ইসলাম আমাদের জীবনের প্রত্যেকটা পদে পদে বিধি-বিধান রেখেছে। জীবনের এমন কোন ক্ষেত্র নেই, যেখানে ইসলামের কোন বিধি-বিধান নেই। অতএব মানুষের মনমত খেয়াল-খুশি মত কোন কিছু চালানোর অবকাশ নেই। উঠা-বসা, চলা-ফেরা, শয়ন-জাগরণ, ঘরে-বাইরে সব জায়গায় সব ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান রয়েছে। প্রত্যেকটা পদে পদে ইসলামের এই সব বিধি-বিধান মানতে গেলে প্রত্যেকটা পদে আল্লাহকে স্মরণ হবে। এভাবে প্রত্যেকটা পদে পদে আল্লাহকে স্মরণ করা দ্বারা আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক জুড়ে যাবে।

একজন মানুষের সাথে আরেকজনের সম্পর্ক রশি দিয়ে বেঁধে হয় না। দুইজন মানুষকে রশি দিয়ে বেঁধে রাখলাম, কিন্তু দুইজনের মনের মিল নেই, এটার নাম সম্পর্ক নয়। সম্পর্ক হল মনের সম্পর্ক। দু'জন দুই দেশে থাকুক, দুই প্রান্তে থাকুক, কিন্তু দুই জনের মন এক সাথে বাঁধা, একে বলা হয় সম্পর্ক জোড়া। আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্কের ধরনও এরকম। আমরা দুনিয়ার সবকিছু করব, কিন্তু সবকিছুর ভিতরে প্রতি মুহূর্তে আল্লাহর স্মরণ থাকবে, মনের মধ্যে থাকবে আল্লাহ, এটাই হল আল্লাহর সাথে সম্পর্ক জোড়া।

মানুষ যাকে ভালবাসে, অর্থাৎ যার সাথে সম্পর্ক জুড়ে যায়, সব সময় তার কথা তার মনের ভিতরে ঘুরতে থাকে। যখন কারও সামনে পরীক্ষা আসে, তখন সে অনেক কিছু করে – খায়, ঘুমায়, মানুষের সাথে কথা-বার্তা বলে, কিন্তু এই সব কিছুর ভিতরেও সারাক্ষণ পরীক্ষার চিন্তা তার মাথার ভিতর ঘুরতে থাকে। সে অন্য সবকিছু করে, কিন্তু অন্য কোনটা তার মনের ভিতরে ঢোকে না, মনের মধ্যে থাকে শুধু পরীক্ষার কথা। এরকম হলেই বোঝা যাবে পরীক্ষার সাথে তার সম্পর্ক জুড়ে গেছে। আল্লাহর সাথে সম্পর্কটাও এরকম। আমরা দুনিয়ার সবকিছু করব, কিন্তু মনের ভিতরে দুনিয়া ঢুকতে পারবে না, মনের ভিতরে শুধু থাকবে আল্লাহ। মাওলানা রূমী (রহ.) মাছনবী শরীফে বলেছেন,

آب اندرزیر کشتی پشتی است + آب در کشتی ہلاک کشتی است

অর্থাৎ, এ দুনিয়ায় আমাদের চলার উদাহরণ হল– যেমন পানির ভিতরে নৌকা চলে। পানি ছাড়া নৌকা চলতে পারে না। নৌকা চলতে গেলে পানি দরকারি। কিন্তু ঐ পানি নৌকার বাইরে থাকতে হবে, ভিতরে ঢুকতে পারবে না। ভিতরে ঢুকলে নৌকা ধ্বংস হয়ে যাবে। অনুরূপ দুনিয়া ছাড়া মানুষ চলতে পারবে না। দুনিয়া সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে সন্যাসী হওয়ার কথা ইসলাম বলেনি। দুনিয়া ছাড়া মানুষ চলতে পারবে না, কিন্তু দুনিয়া ভিতরে ঢুকতে দেয়া যাবে না, ভিতরে থাকবে শুধু আল্লাহ। দুনিয়া ভিতরে ঢুকে

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com



গেলে জীবনের তরীও ডুবে যাবে। তাই সব প্রয়োজনীয় কাজই আমরা করব, কিন্তু সর্বক্ষণ মনের মধ্যে স্মরণ থাকবে আল্লাহর।

এভাবে প্রত্যেকটা পদে পদে যেন মনের মধ্যে আল্লাহর স্মরণ এসে যায়, প্রত্যেকটা পদে পদে যেন সহজে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক জুড়ে যায়, এজন্য ইসলাম আমাদেরকে দুটো আমল দিয়েছে। আমরা যদি সেই দুটো আমল করতে পারি, তাহলে খুব সহজে আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্ক জুড়ে যাবে। একটা আমল হল প্রত্যেকটা পদে পদে যে সব দু'আ রাখা হয়েছে, সেই দু'আগুলো আমল করা। আর একটা আমল হল যিকির করা।

জীবনের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকমের দু'আ রাখা হয়েছে। রাসূল (সা.) আমাদেরকে সে সব দু'আ শিক্ষা দিয়ে গেছেন। খাওয়া-পান করা, উযু, গোসল, নামায, রোযা, হজ্জ, উমরা, হাটা, চলা, পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করা এমনকি জুতা পরিধান করা পর্যন্ত সবকিছুর জন্য শরীআত বিভিন্ন দু'আ রেখেছে। এই দু'আ গুলোর মধ্যে আল্লাহর কাছে সাহায্য, রহমত, বরকত ইত্যাদি আনুকূল্য কামনা করা হয়। প্রত্যেকটা কাজ যেন সুন্দরভাবে হয়, প্রত্যেকটা কাজে যেন আল্লাহর রহমত হয়, তার মধ্যে যেন বরকত হয়, আমাদের জন্য যেন সেটা উপকারী হয়, সুন্দরভাবে যেন আমার সবকাজ সম্পাদন হয় – এসব বিষয় কামনা করা হয়। প্রত্যেকটা পদে পদে এভাবে দু'আ করতে থাকার অর্থ হল তার মনের ভিতর এই চিন্তা আসছে যে, আল্লাহর রহমত ছাড়া, আল্লাহর সাহায্য ছাড়া, আল্লাহর শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া আমার কোন কাজ সু-সম্পন্ন হবে না। এভাবে প্রত্যেকটা পদে পদে আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা প্রকাশ পাবে, প্রত্যেকটা পদে পদে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক জুড়তে থাকবে। অতএব সব কিছুই আল্লাহর কাছে চেয়ে নিতে হবে। যেমন একটা উদাহরণ– আমি ভাত খেতে বসব, তখনও আল্লাহর কাছে বলে নিব যে, হে আল্লাহ! এই খাবারটা যেন আমার স্বাস্থ্যের উপযোগী হয়, এটা যেন আমার জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। দু'আ না করলেও খানার স্বাভাবিক যে ফায়দা এবং আল্লাহর যেটা ফয়সালা সেটা তো হবেই, তারপরও আল্লাহর কাছে যে চেয়ে নিলাম, এতে আল্লাহর সাথে আমার সম্পর্ক জুড়ল। এভাবে প্রত্যেকটা পদে পদে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক জুড়ে নিতে হবে।

জীবনের প্রত্যেকটা পদে পদে দু'আ আছে। যেমন আমরা ঘর থেকে বের হব, এই বের হওয়ার সময় দু'আ আছে। যখন জামা-কাপড় পরিধান করব, সে সময়ও দু'আ আছে। জামা-কাপড় পরিধান করার নিয়মও আছে। নিয়ম হল জামা পরিধান করার সময় আগে ডান হাত ঢুকাব। যখন পায়জামা পরিধান করব, তখন ডান পা আগে ঢুকাব। এভাবে প্রত্যেকটা আমলের নিয়ম তরীকা আছে। ইসলামে নিয়ম তরীকা ছাড়া কোন কাজ নেই। আবার জামা, গেঞ্জি, পায়জামা খোলার সময় হবে বিপরীত। অর্থাৎ খোলার সময় আগে বাম পা বের করব, আগে বাম হাত বের করব। এটাই হল সুন্নাত তরীকা। জুতা পরিধান ও খোলার সময়ও এরকম। অর্থাৎ, পরিধান করার সময় ডান পা আগে, খোলার সময় বাম বা আগে।

এমনকি আমরা মসজিদে প্রবেশ করব বা মসজিদ থেকে বের হব, তখনও এদিকে খেয়াল রাখতে হবে। আমরা যখন মসজিদে প্রবেশ করতে যাই, তখনও প্রথমে বাম পায়ের জুতা-স্যান্ডেল খুলতে হবে। এখানে অনেকের-ই ভুল হয়ে যায়। যেহেতু মসজিদে আগে ডান পা প্রবেশ করাতে হয় তাই অনেকে ডান পায়ের জুতা খুলেই; আগে ডান পা মসজিদের ভিতরে রাখে। অথচ জুতা-স্যান্ডেল খোলার সময় আগে খুলতে হবে বাম পায়েরটা। আগে বাম পা খুলে জুতা বা স্যান্ডেলের উপরে বাম পা রেখে তারপরে

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

ডান পায়েরটা খুলে ডান পা আগে দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করতে হবে। আবার যখন মসজিদ থেকে বের হব, তখন যেহেতু আগে বাম পা বের করা সুন্নাত, তাই আমরা কী করি আগে বাম পা বের করেই জুতা-স্যান্ডেলের ভিতরে প্রথমে বাম পা ঢুকাই। দেখা গেল এখানে আগে বাম পা মসজিদ থেকে বের করা সুন্নাত ছিল এটার উপরে তো আমল হল, কিন্তু ডান পায়ে জুতা-স্যান্ডেল আগে পরিধান করা সুন্নাত ছিল সেটা আমল হল না। তাই বাম পা আগে বের করে সেই পা জুতা বা স্যান্ডেলের উপর রেখে তারপর ডান পা বের করে আগে ডান পায়ে জুতা-স্যান্ডেল পরিধান করতে হবে। তাহলে কোন সুন্নাত ছুটবে না।

আমরা সারা যিন্দেগী মসজিদে আসছি, যাচ্ছি, কিন্তু মসজিদে প্রবেশ করা ও মসজিদ থেকে বের হওয়ার সুন্নাত তরীকাটা আমরা আমল করতে পারছি না। এভাবে অবহেলার যিন্দেগী এবং বে-খেয়ালীর যিন্দেগী চলতে চলতে এক সময় মৃত্যু এসে যাবে! অথচ সামান্য একটু মনোযোগ দিলেই আমরা আমল করতে পারতাম। এসব আমল করতে গেলে আমাদের কোন কষ্টও হয় না, কোন মেহনত-মোজাহাদারও প্রয়োজন পড়ে না। শুধু একটু মনোযোগিতার অভাব। মনোযোগিতা দিলে এরকম বহু আমল আছানী-র সাথে এসে যায়।

যিন্দেগীতে এরকম হাজারো আমল রয়েছে, যা করতে কোন কষ্ট হয় না। যেমন আমরা রাস্তা দিয়ে চলি। সুন্নাত হল যদি রাস্তা একটু প্রশস্ত হয়, তাহলে ডান পাশ দিয়ে চলা সুন্নাত। বাম পাশ দিয়ে হাটতে যে কষ্ট, ডান পাশ দিয়ে হাঁটতেও সেই কষ্ট। এমন নয় যে, ডান পাশে হাটতে কষ্ট একটু বেশি হয়। অথচ বিনা কারণে আমরা ডান পাশ দিয়ে চলার সুন্নাত বর্জন করে থাকি। একটু মনোযোগিতা দিলেই চলে। যদিও সাধারণভাবে আমাদের দেশে নিয়ম হল বাম পাশ দিয়ে গাড়ি চালানো, বাম পাশ দিয়ে হাটা, কিন্তু হাটার বেলায় তো কেউ আমাকে বাধ্য করে না যে, বাম পাশ দিয়েই হাটতে হবে। ডান পাশ দিয়ে হাটলে কেউ আমাকে নিষেধ করে না। ডান পাশ দিয়ে হাটতে কোন অসুবিধাও নেই। বরং ডান পাশ দিয়ে হাটতেই সুবিধা। দেখতেও সুবিধা-গাড়ি গায়ের উপরে উঠছে কি-না তা দেখতে সুবিধা। বাম পাশ দিয়ে চললে পিছন থেকে গায়ের উপরে গাড়ি উঠিয়ে দেয়া হচ্ছে কি-না তা দেখাও যায় না।

যাহোক বলা হচ্ছিল একটু খেয়াল রাখলেই সহজে শরীআতের অনেক আমল করা যায়। আমরা প্রতিদিন কয়েক বার মসজিদে প্রবেশ করি, বের হই, একটু খেয়াল রাখলেই সহজে অনেক সুন্নাতের উপর আমল করা যায়। আমরা অনেকে মসজিদের সুন্নাতগুলো জানি না। সাধারণভাবে আমরা জানি মসজিদে প্রবেশ করার সময় শুধু اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ -এই দু'আটা পড়তে হয়। এটাও পড়া সুন্নাত। সাথে সাথে বিসমিল্লাহ বলাও সুন্নাত, দুরূদ শরীফ পড়াও সুন্নাত। প্রবেশ করার এই ৩টা সুন্নাতের উপর আমল করার জন্য এক সাথে ৩টাকে এভাবে পড়া যায়–

بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

এভাবে বিসমিল্লাহ, দুরূদ সালাম ও প্রবেশের দু'আ ৩টা সুন্নাতের উপরই আমল হয়ে গেল। মসজিদে প্রবেশ করে এ'তেকাফের নিয়ত করে নেয়া সুন্নাত। নফল এ'তেকাফের নিয়ত করে নিলে যতক্ষণ মসজিদে থাকব, ততক্ষণ নফল এ'তেকাফের ছওয়াবও পেতে থাকব। নফল এ'তেকাফের নিয়ত আরবীতে এভাবে করা যায়– نويت الاعتكاف আরবীতে না পারলে বাংলায়ও এভাবে নিয়ত করা যায় যে, আমি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে এ'তেকাফের নিয়ত করলাম। মসজিদে প্রবেশের সময় এই ৬টা সুন্নাত।

মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময়ও ৬টা সুন্নাত। বিসমিল্লাহ পড়া, দুরূদ শরীফ পড়া এবং বের হওয়ার দু'আ পড়া। এই ৩টাকে এক সাথে সহজে এভাবে পড়া যায়–

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ.

এরপর প্রথমে বাম পা বের করা সুন্নাত। তারপর ডান পা বের করে আগে ডান পায়ে জুতা-স্যান্ডেল পরিধান করা। জুতা-স্যান্ডেল পরিধান করার সময় বিসমিল্লাহ বলাও সুন্নাত। এভাবে মোট ৬টা সুন্নাতের উপর আমল হয়ে গেল। প্রবেশ করার সময় ৬টা, বের হওয়ার সময় ৬টা। প্রতি ওয়াক্তে ১২টা সুন্নাতের আমল হয়ে যাবে। আমরা পাঁচ ওয়াক্ত মসজিদে আসি। তাহলে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্তে ৫দ্ধ১২= ৬০টা সুন্নাতের আমল হয়ে যাবে। একটু খেয়াল করলে শুধু মসজিদে আসা যাওয়ার ক্ষেত্রেই এতগুলো সুন্নাতের আমল হয়ে যাবে।

মসজিদে আসার উদ্দেশ্যে যখন ঘরের থেকে বের হব, তখনও সুন্নাত রয়েছে। শুধু মসজিদের উদ্দেশ্যে নয় যেকোন উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হওয়ার সময় সুন্নাত হল ডান পা দিয়ে বের হওয়া এবং بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ বলে বের হওয়া। ঘর থেকে বের হওয়ার এই দু'আ অর্থাৎ বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহ এর অর্থ হল– আল্লাহ্‌র নামের সাহায্য কামনা করে আল্লাহ্‌র উপরে ভরসা করে বের হলাম। অর্থাৎ, এই যে বের হচ্ছি, এই বের হওয়ার পর আমি কতরকম অসুবিধা কতরকম খারাপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারি, কত রকম বিপদের সম্মুখীন হতে পারি। এই সবকিছুর ব্যাপারে আমি আমাকে আল্লাহ্‌র উপর ন্যস্ত করে দিলাম। আমি যে উদ্দেশ্যে বের হচ্ছি, সেটা সফল হওয়ার বিষয়টাও আল্লাহর উপর ন্যস্ত করলাম। এর থেকে সুন্দর মনোভাব আর কি হতে পারে যে, আমি আমার সবকিছুকে আল্লাহ্‌র উপর ন্যস্ত করে দিলাম? যখন তাঁর উপরে সবকিছু ন্যস্ত করে দিলাম, তখন তিনিই আমার সবকিছু দেখবেন।

আমি আমার কোন্ বিষয়টা দেখতে পারি? কোন্ বিষয়টা সামাল দিতে পারি? তিনিই সবকিছু দেখার ও সামাল দেয়ার মালিক। কাজেই তাঁর উপরেই নিজের সবকিছু ন্যস্ত করে দিলাম। বের হওয়ার দু'আর মধ্যে এত সুন্দর অর্থ রয়েছে।

যিন্দেগীর প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে এরকম দু'আ রাখা হয়েছে। সব দু'আর মধ্যে এরকম সুন্দর সুন্দর অর্থ রয়েছে। পেশাব-পায়খানায় যাওয়া, পেশাব-পায়খানা থেকে বের হওয়ার পর্যন্ত দু'আ রয়েছে। বাজার ঘাট করতে যাব সেখানে পর্যন্ত দু'আ রয়েছে। উযু শুরু করার দু'আ আছে, উযুর মাঝখানে দু'আ আছে, উযুর শেষে দু'আ আছে, গোসলের জন্য দু'আ আছে, শোয়ার সময় দু'আ আছে, যখন ঘুম থেকে উঠব, তখনও দু'আ আছে, খাদ্য-খাবার সামনে আসলে দু'আ আছে, খাওয়া শুরু করব দু'আ আছে, শেষ করব দু'আ আছে। এমনকি দস্তরখানা উঠানোরও দু'আ আছে। কোনকিছু দু'আ থেকে খালি নেই। মানুষ যদি প্রত্যেকটা পদে পদে এই সমস্ত দু'আগুলো আমল করে, বিশেষভাবে দু'আগুলোর অর্থ বুঝে পাঠ করে, তাহলে আল্লাহ্‌র দিকে মনোযোগ এসেই যাবে। কারণ এইসব দু'আর ভিতরে আল্লাহ্‌র কথাই বলা হয়েছে- আল্লাহ্‌র নামে শুরু করার কথাই বলা হয়েছে। আল্লাহ্‌র সাহায্য চাওয়া হয়েছে, এই সব কাজে যেন বরকত হয়, এইসব কাজ যেন সুন্দর মত হয়, এইসব কাজ যেন খুব পরিপাটি মত হয়, কোন অসুবিধার সম্মুখীন যেন হতে না হয়, এ সমস্ত কথাই বলা হয়েছে। তাই যখন এইসব দু'আ পাঠ করা হবে এবং অর্থ বুঝে বুঝে পাঠ করা হবে, তখন দেখা যাবে প্রত্যেকটা পদে পদে আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ হচ্ছে, সাথে সাথে আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক গড়ে উঠছে, আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক জুড়ে যাচ্ছে।

বাচ্চাদেরকে আমরা এইসব দু'আ শিখিয়ে দেই। ওরা সহজে শিখতে পারে। ওদের সহজে মুখস্থ হয়ে যায়। যাদের বয়স বেশি হয়েছে, তাদের জন্য এসব দু'আ মুখস্থ করা একটু কঠিন লাগতে পারে।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

তবে মনোযোগ দিলে কঠিন থাকে না। কিছু কিছু দু'আ তো আমাদের মুখস্থ আছেই। যেগুলো মুখস্থ নেই, বই দেখে দেখে কিছুদিন আমল করতে থাকলে এক মাস দুই মাস লাগুক, তবুও এক সময় মুখস্থ হয়ে যাবে। ইনশাআল্লাহ। একান্তই যদি মুখস্থ না হয়, তবুও অন্তত এতটুকু করা যায় যে, প্রত্যেকটা কাজ করার সময় নিজের ভাষায় আল্লাহ্‌র কাছে সেই কাজে রহমত, বরকত এবং আছানীর জন্য দু'আ করে নিতে হবে।

আমরা সবকিছুই আল্লাহর কাছে চেয়ে নিব। এমনকি হাদীছে এসেছে তোমার জুতা-স্যান্ডেলের ফিতা ছিড়ে গেলে তাও আল্লাহর কাছে চেয়ে নাও। তাই ছোট বড় সবকিছুই আল্লাহর কাছে চেয়ে নিতে হবে। সব কাজের শুরুতে আল্লাহর কাছে দু'আ করে নিতে হবে। আমি দোকান খুলছি, আল্লাহর কাছে দু'আ করে নিব যে, হে আল্লাহ! আমার দোকানে যেন সুন্দর বেচা-কেনা হয়। আমার যেন ভাল মুনাফা হয়। আমার লেন-দেন যেন সহীহ-শুদ্ধভাবে হয়। আমি অফিসে যাব, আল্লাহর কাছে দু'আ করে বের হব যে, হে আল্লাহ! আমি অফিসে যাচ্ছি, আমি যেন সুস্থভাবে, সঠিকভাবে কাজগুলো সম্পন্ন করতে পারি, আমি যেন কোন অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির সম্মুখীন না হই, আমি যেন কোন অসুবিধার সম্মুখীন না হই। পদে পদে এরূপ দু'আ চাইলে আল্লাহ খুশি হবেন যে, বান্দা তো আমাকে ছাড়া কিছুই বোঝে না, সে তো সবই আমার কাছে চায়, সে তো সবকিছুই আমার উপর ন্যস্ত করছে। কাজেই আমাকে তার সবকিছু সুন্দরভাবে সম্পন্ন করে দিতে হয়।

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) অনেক উঁচু দরের বুযুর্গ ছিলেন। তিনি বলেছেন যে, আমার কাছে যখন কেউ মাসআলা জিজ্ঞাসা করতে আসে, তখন আমি আল্লাহ্‌র কাছে বলে নেই, হে আল্লাহ! আমি যেন এই মাসআলাটার সুন্দর উত্তর দিতে পারি। যখন তিনি মসজিদে বয়ান করতেন, বয়ান শুরু করার আগে দু'আ করে নিতেন যে, হে আল্লাহ! আমি যেন সুন্দরভাবে বয়ান করতে পারি, আমার কথায় যেন মানুষের হেদায়াত হয়। বুযুর্গানে দ্বীনের আমল দেখে আমল শিখতে হয়। আমরাও যখন বাচ্চা-কাচ্চাদেরকে কোন কথা বলব বা কোন কিছু শিক্ষা দিব কিংবা বিবিকে বা পরিবারের অন্য কোন সদস্যকে বা যেকোন মানুষকে কোন কথা বলব, বলার আগে মনে মনে আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করে নিব যেন আমাদের কথার ভাল আছর হয়।

কেউ মনে করতে পারে পদে পদে এতসব দুআ করতে গেলে তো সারাক্ষণ দুআর জন্য হাত তুলে রাখতে হবে। আসলে তা নয়। দু'আ করার জন্য সব সময় হাত তোলা জরুরী নয়। দিলে দিলে অর্থাৎ মনে মনেও দু'আ হয়। দিলের থেকে যে দু'আ হবে, সেটাই হল আসল দু'আ। মনে মনে আল্লাহর কাছে এটা কামনা করে নিতে হবে যে, হে আল্লাহ! আমি এই কথাটা বলছি, এ কথাটার যেন ভাল আছর হয়।

একথা মনে করা যাবে না যে, যখন কোন ভাল কথাই বলছি, তখন ভাল আছর হওয়ার জন্য দু'আ করার কী প্রয়োজন? ভাল কথারও তো খারাপ আছর হয়ে যায়। অনেক সময় দেখা যায় ভাল কথা বলা সত্ত্বেও কেউ কেউ বেঁকে বসে। বাচ্চা-কাচ্চাদের কথাই চিন্তা করি। তাদেরকে কত সুন্দর কথা শিক্ষা দেই, তারপরেও তো তারা আমল করে না। তাই আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করে নিব যে, হে আল্লাহ! আমি এই কথাটা বলছি, যেন একথার ভাল আছর হয়। আমার কথায় ভাল আছর হবে কি হবে না, আমার কথায় কারও ফায়দা হবে কি হবে না, এটা তো আল্লাহর মর্জির উপর নির্ভর করছে। আমি ফায়দা দেয়ার মালিক নই, আমি কথায় আছর ফেলানোর মালিক নই। তাই ভাল কথা বলার সময়ও আছর যেন ভাল হয়, তার জন্য দু'আ করে নেয়া চাই। আমি কাউকে দ্বীনের দাওয়াত দিতে যাব, কাউকে নামাযের জন্য

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



দাওয়াত দিতে যাব, তখন আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করে নিব যে, হে আল্লাহ! আমি দ্বীনের কথা বলতে যাচ্ছি, আমার এ কথায় যেন তার ফায়দা হয়, আমি যেন এই কাজটা সহীহ তরীকায় করে আসতে পারি। এভাবে জীবনের প্রত্যেকটা পদে পদে দু'আ রয়েছে। দু'আ বলতে যে নির্দিষ্ট দু'আগুলো শিক্ষা দেয়া হয়েছে সেগুলো। আর কোন নির্দিষ্ট দু'আ না থাকলে যেকোন কাজ করার আগে আল্লাহ্‌র কাছে সেই কাজটা সুন্দর ও সহীহ-শুদ্ধভাবে হওয়ার জন্য চেয়ে নিতে হবে। হোক ছোট কাজ, তবুও দু'আ করে নিতে হবে। রাসূল (সা.)-এর আমল তো ছিল আরও উঁচু পর্যায়ের। তিনি শুধু মুখেই দু'আ চাইতেন না। বরং রীতিমত সালাতুল হাজত পড়ে দু'আ চাইতেন। হাদীছে এসেছে,

كَانَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى. (أبو داود برقم ١٣٢١ والحديث صحيح)

অর্থাৎ, তিনি যেকোন সমস্যা দেখা দিলে নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন। অর্থাৎ, সালাতুল হাজতে দাঁড়িয়ে যেতেন।

সালাতুল হাজত হল আমার সামনে যেকোন প্রয়োজন আসুক, মানুষের কাছে প্রয়োজন হোক বা আল্লাহ্‌র কাছে প্রয়োজন হোক, দ্বীনের প্রয়োজন হোক বা দুনিয়াবী প্রয়োজন হোক, যেকোন প্রয়োজন সামনে আসলে তখন দুই রাকআত নামায পড়তে হবে এবং নামায পড়ে আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করতে হবে। এই নামাযকে বলা হয় সালাতুল হাজত, অর্থাৎ প্রয়োজনের নামায।

সাধারণত আমাদের আমল হল বড় কোন সমস্যায় পড়লে আমরা সালাতুল হাজত পড়ে থাকি। কিন্তু রাসূল (সা.) ছোট খাট সমস্যায় পড়লেও সালাতুল হাজত পাঠ করতেন। যেমন একজন পাওনাদার এল। পাওনাদার এলে আমরা কী করি? থাকলে দিয়ে দেই না থাকলে বলে দেই এখন দিতে পারব না। পরে অমুক দিন দিব ইত্যাদি। কিন্তু রাসূল (সা.)-এর আমল কী ছিল? একবার তাঁর কাছে এক পাওনাদার এল। তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন যে, সে তো পাওনা চাইতে এসেছে, কিন্তু আমার কাছে পাওনা পরিশোধ করার ব্যবস্থা নেই, তাই আল্লাহ্‌র কাছে বলি। যদি আল্লাহ পাক এন্তেজাম করে দেন আল-হামদুলিল্লাহ। আর যদি তিনি এই মুহূর্তে ইন্তেজাম করে না দেন, তাহলে তারপরে বলে দিব যে, এখন আমি দিতে পারছি না। যেভাবে হোক সুন্দরভাবে তাকে বিদায় দিব। দেখা গেল এরকম সামান্যতম সমস্যার সম্মুখীন হলেও রাসূল (সা.) নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন। নামায পড়ে দু'আ চাইতেন।

আমরা পদে পদে এরকম নামায পড়তে না পারলেও অন্তত প্রত্যেকটা কাজে আল্লাহ্‌র কাছে নিজের ভাষায় বলার এবং দু'আর অভ্যাস করতে পারি। সে স্থানে শরীআতের শিখানো নির্দিষ্ট কোন দু'আ থাকলে সেই দু'আ, না থাকলে নিজের ভাষায় আল্লাহ্‌র কাছে চেয়ে নেই। এভাবে যখন করতে থাকব, তখন পদে পদে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা হবে। এভাবে আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক জুড়ে যাবে।

এরকম করতে থাকলে এক সময় দেখা যাবে প্রতিদিন শত শত বার, হাজার হাজার বার আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা হচ্ছে, প্রত্যেকটা মুহূর্তে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা হচ্ছে। এরকম হলে আমাদের অবস্থা এই দাঁড়াবে যে, আমরা দুনিয়ার সব কাজ করে যাব, কিন্তু দিলের ভিতরে দুনিয়া থাকবে না, বরং দিলের ভিতরে থাকবে আল্লাহ। এটাই হল আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক জুড়ে যাওয়া, আল্লাহর সাথে প্রেম হয়ে যাওয়া। যার প্রতি অন্তরে প্রেম এসে যায় সে যা কিছুই করুক সারাক্ষণ তার ধ্যান থাকে প্রেমিকার দিকে। সারাক্ষণ যার মনে আল্লাহ্‌র ধ্যান থাকবে, সেই হল আল্লাহ্‌র আসল প্রেমিক। সারাক্ষণ যার মাথার ভিতরে আল্লাহ্‌র ফিকির, সেই তো আল্লাহ্‌র প্রেমিক।

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

মনের মধ্যে সারাক্ষণ আল্লাহ্‌র চিন্তা আনয়নের জন্য সারাক্ষণ আল্লাহ্‌র যিক্‌র করতে বলা হয়েছে। প্রচুর পরিমাণে আল্লাহ্‌র যিক্‌র অর্থাৎ আল্লাহকে প্রচুর স্মরণ করতে করতে এমন অবস্থা সৃষ্টি হবে যে, সারাক্ষণ মাথার ভিতরে আল্লাহ্‌র ফিকির এসে যাবে। কুরআন শরীফেও আল্লাহ্‌কে প্রচুর স্মরণ করার হুকুম দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا.

অর্থাৎ, হে মু'মিনরা! তোমরা আল্লাহকে স্মরণ কর, প্রচুর স্মরণ। (আহযাব: ৪১)

এখানে আল্লাহ্‌কে অনেক বেশি স্মরণ করতে বলা হয়েছে। কিন্তু কতবেশি তা বলা হয়নি। এর অর্থই হল যতবেশি স্মরণ করা সম্ভব, ততবেশি স্মরণ করতে হবে। এই বেশি-র পরিমাণ বাড়তে বাড়তে এমন একটা পর্যায়ে এমন হবে যে, প্রত্যেকটা মুহূর্তে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা এসে যাবে।

আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা দুইভাবে হয়- একটা হল প্রত্যেকটা পদে পদে আল্লাহ্‌র কাছে চেয়ে নেয়া, প্রত্যেকটা পদে পদে দু'আ পড়ে নেয়া। দু'আ না থাকলে নিজের ভাষায় আল্লাহ্‌র কাছে চেয়ে নেয়া, আল্লাহ্‌র কাছে বলে নেয়া। আরেকটা স্মরণ হল মুখের যিকির। মুখের যিকিরের বিভিন্ন বাক্য বা শব্দ রয়েছে। যেমন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার। এগুলোও যিকির। সব সময় এ যিকিরগুলো করা যায়। বিশেষভাবে সমতল স্থান দিয়ে চলার সময় বা বসে থাকার সময় বলতে থাকবে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। উপরের দিকে উঠার সময় আল্লাহু আকবার বলতে বলতে উঠবে। প্রতিদিন আমরা দোতলায়, তিন তলায় বা আরও উপর তলায় উঠি। যখন এরকম উপর দিকে উঠব, আল্লাহু আকবার বলতে বলতে উঠব। আবার যখন নীচের দিকে নামব, কিংবা রাস্তায় চলছি সামনের রাস্তা ঢালু, তখন সুবহানাল্লাহ বলতে বলতে নামব। রাস্তা দিয়ে চলার সময় সামনের দিকে উঁচু থাকলে আল্লাহু আকবার বলতে বলতে উঠব। লিফ্‌ট দিয়ে উপর দিকে উঠার সময় এবং নামার সময় এ আমল চলবে।

প্রতিদিন আমরা পদে পদে এই যিকিরগুলোর অভ্যাস গড়ে তুলতে পারি। হয় সুবহানাল্লাহ, না হয় আল্লাহু আকবার, না হয় লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আর ভাল কিছু সামনে পড়লে আল-হামদু লিল্লাহ। এছাড়াও পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর সুবহানাল্লাহ, আল-হামদু লিল্লাহ ও আল্লাহু আকবার পাঠ করার আমল রয়েছে। এগুলো হল মুখের যিকির। এছাড়াও আরও অনেক রকম যিকির রয়েছে। কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করাও যিকির। আল্লাহ আল্লাহ বলাও যিকির, سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ বলাও এক ধরনের যিকির। এভাবে যখন আমরা উভয়ভাবে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করতে থাকব, পদে পদে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করতে থাকব, তখন আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক জুড়ে যাবে। আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক জোড়ার এই হল সহজ তরীকা। এই হল সহজ প্রেসক্রিপশন।

সম্পর্ক জোড়ার জন্য একটা জিনিস মনে রাখতে হবে। তা হল যেকোন দুটো জিনিসের মধ্যে সম্পর্ক জুড়তে হলে সেই দুটো জিনিসকে পরিষ্কার করে নিতে হয়। যেমন আমি সলিশন দিয়ে দুটো রাবার বা দুটো কাঠের মাঝে জোড়া লাগাতে চাই, তাহলে প্রথমে ঐ দুটো রাবার বা কাঠকে ঘষে মেজে পরিষ্কার করে নিয়ে তারপরে সলিশন দিয়ে সেই দুটোকে জোড়া লাগাতে হয়। দুটো গ্লাসকে জোড়া লাগাতে চাইলেও প্রথমে সে দুটোকে পরিষ্কার করে নিতে হয়। পরিষ্কার করে না নিলে, ময়লাযুক্ত অবস্থায় থাকলে তাতে জোড়া লাগানো যায় না। তদ্রূপ আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক জুড়তে গেলেও পরিষ্কার করে নিতে হবে, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক জোড়ার অর্থ হল– দিলের সাথে সম্পর্ক জোড়া, তাই দিলকে পরিষ্কার করে নিতে হবে। অর্থাৎ দিলকে গোনাহ থেকে পরিষ্কার করে নিতে হবে। তাহলে আল্লাহ্‌র সাথে জোড়া লাগবে,

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



নতুবা জোড়া লাগবে না। দিলের ভিতরে গোনাহ্‌র যত জঞ্জাল, যত আবর্জনা আছে, তা থেকে দিলকে পরিষ্কার করে নিতে হবে। দিল যত পরিষ্কার হবে, আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক ততবেশি মজবূত হবে।

দিল পরিষ্কার থাকার অর্থ হল গোনাহ থেকে দিলকে পরিষ্কার রাখা। গোনাহ করলে দিল পরিষ্কার থাকে না, বরং ময়লা যুক্ত হয়ে যায়। হাদীছে এসেছে বান্দা যখন পাপে জড়িয়ে পড়ে, তখন,

نُكِتَتْ فِيْ قَلْبِهٖ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ. (سنن الترمذي ٣٣٣٤ وقال : حديث حسن صحيح)

অর্থাৎ, তার অন্তরে একটা কাল দাগ পড়ে যায়। এভাবে পাপ করতে করতে তার অন্তর সম্পূর্ণ কালিমা লিপ্ত হয়ে যায়। সম্পূর্ণ কালো হয়ে যায়।

গোনাহের দ্বারা অন্তর অপরিচ্ছন্ন হয়ে যায়, অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়। মানুষ যেকোন গোনাহ-ই করুক, প্রথমে দিলের ভিতরে সেই গোনাহের চেতনা আসে, তারপর সেই পাপে সে জড়িত হয়। বোঝা গেল আসল গোনাহ হয় দিলের দ্বারা। তাই গোনাহ দ্বারা দিল অপরিচ্ছন্ন হয়। অতএব আল্লাহ্‌র সাথে দিলের সম্পর্ক জুড়তে হলে দিলকে পরিষ্কার রাখতে হবে। নতুবা আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক জুড়বে না।

দিলকে পরিষ্কার করার উপায় হল তাওবা ইস্তেগফার ও যিকির। পূর্বের হাদীছেই বলা হয়েছে,

فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ.

অর্থাৎ, যখন সে গোনাহ থেকে বিরত হয় এবং তাওবা ইস্তেগফার করে নেয় তার অন্তর পরিষ্কার হয়ে যায়।

অন্য এক হাদীছে এসেছে–

لِكُلِّ شَيْءٍ صَقَالَةٌ وَصَقَالَةُ الْقُلُوْبِ ذِكْرُ اللّٰهِ. (مشكاة عن البيهقي في الدعوات الكبير)

অর্থাৎ, সবকিছুর রেত আছে যা দ্বারা জং পরিষ্কার করা হয়। আর দিলের রেত হল যিকির। তাই আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক জুড়তে হলে দিল পরিষ্কার করা জরুরী। আর দিল পরিষ্কার করার জন্য যিকির জরুরী। আল্লাহ পাক আমাদেরকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বয়ান নং ৪৭-এর খুতবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَعْطَی الْحُبَّ وَالْمَوَدَّةَ فِی الْقُلُوْبِ، وَهُوَ تَعَالٰی مُعْطِیْ كُلِّ مَطْلُوْبٍ وَّمَرْغُوْبٍ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِیْكَ لَهٗ عَلَّامُ الْغُیُوْبِ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَیِّدَنَا وَنَبِیَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهُ الْحَبِیْبُ الْمَحْبُوْبُ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ مَا تَعَاقَبَ الطُّلُوْعُ وَالْغُرُوْبُ.

اَمَّا بَعْدُ :

اَیُّهَا النَّاسُ! اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی خَلَقَ الْاَشْیَاءَ كُلَّهَا لِیَسْتَفِیْدَ بِهَا الْاِنْسَانُ، وَخَلَقَ النَّاسَ لِیَعْبُدُوْهُ وَیُحِبُّوْهُ، لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَیْءٍ فَاعْبُدُوْهُ، وَهُوَ تَعَالٰی لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَاهُ، وَلَا مُعْطِیَ لِمَا مَنَعَهٗ، فَعَلَی الْاِنْسَانِ اَنْ لَّا یَعْبُدَ غَیْرَهٗ، وَلَا یُحِبَّ اَحَدًا سِوَاهُ، وَلَا یَتَعَلَّقُ قَلْبُهٗ اِلَّا بِهٖ، وَاِنَّ الدُّنْیَا ضَرُوْرِیَّةٌ لَا بُدَّ لِلْاِنْسَانِ مِنْهَا، فَاقْدُرُوْا قَدْرَهَا، وَالضَّرُوْرَةُ لَا تَتَقَدَّرُ اِلَّا بِقَدْرِهَا.

وَاعْلَمُوْا اَنَّ الْاَدْعِیَةَ الْمَاثُوْرَةَ وَذِكْرَاللّٰهِ تَعَالٰی یَنْشَأُ بِهَا التَّعَلُّقُ مَعَ اللّٰهِ، فَالْتَزِمُوْا الْاَدْعِیَةَ الْمَاثُوْرَةَ فِیْ كُلِّ حَالٍ، وَالْجَئُوْا اِلَیْهِ مِنْ قِیْلَ وَقَالَ، وَاَكْثِرُوْا مِنْ ذِكْرِهٖ فِی الْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ، وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی شَرَعَ لَنَا الْاَدْعِیَةَ لِكُلِّ شُعْبَةٍ مِّنْ شُعَبِ حَیَاتِنَا، لِمَاْكِلِنَا وَمَشَارِبِنَا وَمَلَابِسِنَا وَمَضَاجِعِنَا، وَحَتّٰی لِتَرَجُّلِنَا وَتَنَعُّلِنَا. فَعَلَیْنَا الدُّعَاءُ فِیْ كُلِّ حَالَةٍ مِّنَ الْاَحْوَالِ، وَفِیْ كُلِّ حِیْنٍ مِّنَ الْاَحْیَانِ، سَوَاءٌ كَانَ هٰذَا الدُّعَاءُ بِالْاَلْفَاظِ الْمَاثُوْرَةِ اَوْ بِغَیْرِ الْمَاثُوْرَةِ فِی السُّنَّةِ وَالْقُرْاٰنِ. فَقُوْلُوْا اِذَا خَرَجْتُمْ مِّنَ الْبُیُوْتِ : بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَی اللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ، وَاِذَا دَخَلْتُمُ الْمَسْجِدَ فَقُوْلُوْا : بِسْمِ اللّٰهِ

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِیْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ. وَاِذَا خَرَجْتُمْ مِنْهُ فَقُوْلُوْا : بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْاَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ. وَقُوْلُوْا اِذَا اَصْبَحْتُمْ : اَللّٰهُمَّ بِكَ اَصْبَحْنَا وَبِكَ اَمْسَیْنَا وَبِكَ نَحْیٰی وَبِكَ نَمُوْتُ وَاِلَیْكَ النُّشُوْرِ، وَقُوْلُوْا اِذَا اَمْسَیْتُمْ : اَللّٰهُمَّ بِكَ اَمْسَیْنَا وَبِكَ اَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْیٰی وَبِكَ نَمُوْتُ وَاِلَیْكَ النُّشُوْرِ، وَهٰكَذَا اِتَّبِعُوا الْاَدْعِیَةَ الْمَاثُوْرَةَ. وَاِنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَدْعُوْ اِلَی اللّٰهِ كُلَّ حِیْنٍ، خُصُوْصًا اِذَا حَزَبَهٗ اَمْرٌ بَادَرَ اِلَی الصَّلَاةِ، وَیَسْتَعِیْنُ بِهَا. قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی : وَاسْتَعِیْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اَلْاٰیَةُ.

وَاعْلَمُوْا اَنَّ الْعَبْدَ اِذَا اَذْنَبَ ذَنْبًا نُكِتَتْ فِیْ قَلْبِهٖ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، وَهٰذِهِ النُّكْتَةُ هِیَ الْوَسَخُ، وَلَا بُدَّ لِلتَّعَلُّقِ مِنْ اِزَالَةِ هٰذَا الْوَسَخِ، وَالتَّعَلُّقُ مَعَ اللّٰهِ یَبْتَغِی الْقَلْبَ الْمَصْقُوْلَ، وَصَقَالُ الْقُلُوْبِ ذِكْرُ اللّٰهِ، قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : لِكُلِّ شَیْءٍ صَقَالٌ، وَصَقَالُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللّٰهِ. فَاذْكُرُوْا اللّٰهَ تَعَالٰی قِیَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰی جُنُوْبِكُمْ، وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰی غَیْرِ وُضُوْئِكُمْ، فَذِكْرُكُمْ مَمْنُوْنٌ، فَاذْكُرُوْهُ تَعَالٰی ذِكْرًا كَثِیْرًا حَتّٰی یَقُوْلُوْا مَجْنُوْنٌ.

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ : یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِیْرًا، وَسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِیْلًا.

بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِی الْقُرْاٰنِ الْعَظِیْمِ، وَنَفَعَنَا وَاِیَّاكُمْ بِالْاٰیَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِیْمِ. اَقُوْلُ قَوْلِیْ هٰذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ لِیْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِیْنَ وَاسْتَغْفِرُوْهُ، اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ.

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বয়ান নং -৪৮

## নেয়ামতের শোকর প্রসঙ্গ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ. الاٰية. وَقَالَ تَعَالٰى : لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اُنْظُرُوْا اِلٰى مَنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

আল্লাহ পাকের নেয়ামতের শোকর আদায় করা ওয়াজিব। আল্লাহ পাক আমাদেরকে যত ধরনের নেয়ামত দান করেছেন, সেই সব ধরনের নেয়ামতের শোকর আদায় করা ওয়াজিব। একেক ধরনের নেয়ামতের শোকর আদায় করার তরীকা একেক ধরনের। মালের শোকর আদায় করার তরীকা এক রকম, জানের শোকর আদায় করার তরীকা আরেক রকম, জ্ঞানের শোকর আদায় করার তরীকা এক রকম, বিবেক বুদ্ধির শোকর আদায় করার তরীকা আরেক রকম। এমনিভাবে প্রত্যেকটা নেয়ামতের শোকর আদায় করার তরীকা ভিন্ন ভিন্ন।

আল্লাহ তা'আলা যেসব বিষয়ে সরাসরি হুকুম দেন, হুকুমের ভাষা প্রয়োগ করেন, সেটা করা ওয়াজিব বা ফরয হয়ে যায়। নেয়ামতের শোকর আদায় করার ব্যাপারেও আল্লাহ পাক হুকুম দিয়েছেন। তাই নেয়ামতের শোকর আদায় করাও ওয়াজিব। তখনকার যুগে একটা বিরাট সম্প্রদায় ছিল ইহুদী সম্প্রদায়। মদীনার আশে পাশে তাদের অনেক গোত্র ছিল। তাদেরকে বলা হত বনী ইসরাঈল। আল্লাহ পাক কুরআনে কারীমে তাদেরকে সম্বোধন করে হুকুম দিয়েছেন,

يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ. الاٰية.

অর্থাৎ, হে বনী ইসরাঈল অর্থাৎ হে ইহুদীরা! তোমাদেরকে আমি যত ধরনের নেয়ামত দান করেছি, সব নেয়ামতকে তোমরা স্মরণ কর। নেয়ামতকে স্মরণ কর, অর্থাৎ নেয়ামতের শোকর আদায় কর। (বাকারা: ৪০)

এই আয়াতে ইহুদীদেরকে যে হুকুম দেয়া হয়েছে, আমাদের উপরও ঐ হুকুম। তাই আল্লাহ পাক আমাদেরকে যত ধরনের নেয়ামত দান করেছেন সব নেয়ামতের শোকর আদায় করতে হবে।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে কত ধরনের নেয়ামত দান করেছেন? সাধারণভাবে আমরা টাকা-পয়সা, ধন দৌলত তথা অর্থ সংক্রান্ত বিষয়কে আল্লাহর নেয়ামত মনে করি, এটাও অবশ্যই আল্লাহর নেয়ামত। তবে এর বাইরেও অনেক নেয়ামত আমরা ভোগ করি, যেটাকে আমরা নেয়ামত মনে করি না, অথচ সেগুলিও আল্লাহ্‌র নেয়ামত। সুস্থ থাকা, এটাও একটা বড় নেয়ামত। একেকটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এত বড় একেকটা নেয়ামত যে, সারা দুনিয়া দিয়েও একটা অরিজিনাল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পাওয়া সম্ভব নয়। এমনকি আল্লাহ পাক মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে যেভাবে সৃষ্টি করেছেন, মানুষের গঠন অবয়ব যেভাবে সৃষ্টি করেছেন, এটাও আল্লাহ্‌র নেয়ামত। আমাদের যে অঙ্গ যেভাবে তৈরি করা আমাদের জন্য ভাল, আল্লাহ পাক সেভাবেই সে অঙ্গ তৈরি করেছেন। একেকটা অঙ্গ নিয়ে যদি চিন্তা করা হয়, তাহলে খুব সহজেই অনেকটা বুঝে আসবে আল্লাহ পাক যেভাবে অঙ্গ সৃষ্টি করেছেন, তার ব্যতিক্রম হলে আমাদের জন্য

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



অনেক অসুবিধার কারণ হত। চোখটা যেখানে আছে, সেখানে না থেকে যদি অন্য স্থানে থাকত, যেমন মাথার উপরে থাকত, তাহলে আমরা কীভাবে পথ চলতাম? যদি পিছনের দিকে চোখ থাকত, তাহলেও কীভাবে সামনের দিকে চলতাম। আল্লাহ পাক চোখ দিয়েছেন, এই চোখে যেন ধূলা-বালি লাগতে না পারে সে জন্য চোখের উপরে ভ্রু দিয়েছেন। এরপরেও কোনভাবে যদি চোখে কোন ময়লা ঢুকে যায়, তাহলে চোখের পানির মাধ্যমে সেই ময়লা কেতর হয়ে বের হয়ে আসছে।

আল্লাহ পাক যেভাবে যে অঙ্গ সৃষ্টি করেছেন, তার ব্যতিক্রম হলে এর চেয়ে ভাল হত কি-না এ ব্যাপারে একটা ঘটনা শুনুন। একবার এক ব্যক্তি ট্রেন স্টেশনে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে থাকায় তার ঘুম পেল। কিন্তু লোকের ভীড়ে সে হাত পা ছড়িয়ে শোয়ার জায়গা পেল না। মনে মনে সে ভাবল -যদি হাত পা খুলে রাখার ব্যবস্থা থাকত, তাহলে হাত পা খুলে আমার ব্যাগের মধ্যে রেখে সুন্দর ঘুমাতে পারতাম। কিছুক্ষণ পর তার ব্যাগটা চুরি হয়ে গেল। তখন তার বুঝে আসল যে, হাত পা খুলতে পারার ব্যবস্থা থাকলে আজই তার হাত পা চুরি হয়ে যেত। এমনিভাবে প্রত্যেকটা অঙ্গ নিয়ে চিন্তা করলে মানুষের গঠনের যথার্থতা বুঝে আসবে। আল্লাহ তা'আলা তাই বলেছেন,

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ. (সূরা তীন)

অর্থাৎ, আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সবচেয়ে উত্তম গঠন দিয়ে। অর্থাৎ, এমন গঠন দিয়ে তৈরি করেছি যে, এর চেয়ে সুন্দর গঠন আর হতে পারে না। আল্লাহ পাক এমন সুন্দর গঠন দিয়ে মানুষকে তৈরি করেছেন যে, এর চেয়ে সুন্দরভাবে, এর থেকে ভালভাবে গঠন করা সম্ভব নয়। এভাবে নিজেদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে চিন্তা করলে আমাদের নিজেদের মধ্যেই আল্লাহ্‌র কুদরত ও মহত্বের বহু নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যাবে। আল্লাহ পাক তাই ইরশাদ করেছেন,

وَفِيْٓ اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ. (যারিয়াত: ২১)

অর্থাৎ, তোমাদের নিজেদের মধ্যেও বহু নিদর্শন রয়েছে। তবুও কি তোমরা বুঝবে না?

এ আয়াতে বলা হয়েছে– তোমরা যদি নিজেরা নিজেদেরকে নিয়েই চিন্তা কর, তাহলেই তোমাদের বুঝ আসার জন্য যথেষ্ট, তোমাদের হেদায়েত এসে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। তবুও কি তোমরা বুঝ না? মানুষের এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি ইত্যাদি একদিকে আল্লাহর বড় বড় নেয়ামত, আবার আল্লাহর কুদরত ও মহত্বকে বোঝার জন্য সহায়ক। এগুলো হল শারীরিক নেয়ামত। এছাড়াও তিনি আমাদেরকে আরও বহু রকমের নেয়ামত দিয়েছেন, আল্লাহ পাক আমাদেরকে যে চিন্তা-চেতনা দিয়েছেন এটাও আল্লাহ্‌র এক মহা নেয়ামত। এই চিন্তা-চেতনা দিয়েই আমরা দ্বীনের পথে চলি, দ্বীনের দিকে অগ্রসর হই। তাই এটাও আল্লাহ্‌র এক মহা নেয়ামত। আল্লাহ যদি অনুগ্রহ না করতেন, তিনি যদি আমাদের চিন্তা-চেতনাকে দ্বীনের লাইনে অগ্রসর না করতেন, দ্বীনী চেতনা যদি আমাদের মধ্যে না আসত, তাহলে আমরা দ্বীনের পথে অগ্রসর হতে পারতাম না। আমাদের চেয়ে কত বুদ্ধিমান, আমাদের চেয়ে কত জ্ঞানী-গুণী, সমাজের কত প্রতিষ্ঠিত মানুষ দ্বীনের পথে আসতে পারছেন না, তাদের চিন্তা-চেতনা দ্বীনী লাইনে অগ্রসর হচ্ছে না। আমাদের মধ্যে আল্লাহ পাক দ্বীনের দিকে আসার যতটুকু চেতনা দিয়েছেন, এটাও তো আল্লাহ্‌র এক মহা নেয়ামত। আল্লাহ পাক যদি আমাদেরকে এই নেয়ামত দান না করতেন, তাহলে আমরা দ্বীনের পথে অগ্রসর হতে পারতাম না। তাহলে আমরা জাহান্নামী হয়ে যেতাম। আমরা যতটুকু আমল করতে পারি, আমাদের মধ্যে যতটুকু দ্বীনী চেতনা জাগ্রত হয়, সেটাকে

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

আল্লাহ্‌রই নেয়ামত মনে করতে হবে। তার জন্য বড়ায়ী না করে বরং আল্লাহ্‌র নেয়ামতের কথা স্মরণ করে তাঁর সামনে বিনয়ী হতে হবে। কুরআনে কারীমের একটা আয়াতে তাই বলা হয়েছে,

لَا تَمُنُّوْا عَلَيَّ اِسْلَامَكُمْ بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ اَنْ هَدٰىكُمْ لِلْاِيْمَانِ. (হুজুরাত: ১৭)

অর্থাৎ, তোমরা ইসলামের কাজ করে আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছ-এমনটা প্রকাশ কর না। অর্থাৎ, বিভিন্নরকম নেক কাজ করে আমার উপর অনুগ্রহ যাহির কর না; বরং আল্লাহ্‌ই তোমাদের উপরে অনুগ্রহ করেছেন যে, তোমাদেরকে হেদায়েতের পথে নিয়ে এসেছেন, তোমাদেরকে ঈমান আমলের দিকে হেদায়েত করেছেন।

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বোঝাতে চান যে, তোমরা নেক আমল করে আমার উপর কী অনুগ্রহ যাহির করবে? আমিই তো তোমাদের উপর অনুগ্রহ করেছি। আমার অনুগ্রহেই তোমরা নেক আমল করতে পার।

নেক আমল করতে পারা আল্লাহ্‌র একটা নেয়ামত। অথচ এটাকে আমরা নেয়ামত মনে করি না। এমনিভাবে আরও অনেক নেয়ামতকে আমরা নেয়ামত মনে করি না। যত ধরনের বিপদ-আপদ থেকে আমরা মুক্ত আছি, যত ধরনের রোগ-শোক থেকে আমরা মুক্ত আছি, এটাও আল্লাহ্‌র বড় নেয়ামত। বিপদ-আপদ বা রোগ-শোকে আক্রান্ত হলেও তখন মনে করতে হবে এর চেয়ে আরও বড় বিপদ-আপদ হতে পারত, এর চেয়েও বড় রোগ-ব্যাধি হতে পারত, আল্লাহ পাক তার থেকে আমাদেরকে মুক্ত রেখেছেন, এটাও আল্লাহ্‌র নেয়ামত। তাছাড়া যতটুকু রোগ-ব্যাধি আমাকে দিয়েছেন, যতটুকু বিপদ-আপদে আমরা পড়ছি, এর ভিতরেও কোন না কোনোভাবে কল্যাণ নিহিত আছে। আল্লাহ্‌র বিবেচনায় এর মধ্যেও কোন না কোনোভাবে আমাদের জন্য মঙ্গল রয়েছে। কাজেই এগুলোও আল্লাহ্‌র নেয়ামত। এভাবে যদি আমরা চিন্তা করি যে, আল্লাহ পাক যত কিছু দিয়েছেন সবই নেয়ামত, আল্লাহ পাক কত বিপদ-আপদ, কষ্ট-ক্লেশ থেকে মুক্ত রেখেছেন, তাও সব নেয়ামত। এভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে আমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র কত নেয়ামত, কত অনুগ্রহ তা গণনা করে শেষ করা যাবে না। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَ لَوْ اَنَّ مَا فِى الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَّ الْبَحْرُ يَمُدُّهٗ مِنْ بَعْدِهٖ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمٰتُ اللّٰهِ.

অর্থাৎ, পৃথিবীর সমস্ত গাছ পালা যদি কলম হয়, আর সমুদ্রের সাথে সাত সমুদ্র যোগ হয়ে যদি কালি হয়, আর তার দ্বারা আল্লাহ্‌র জ্ঞান-গরিমা মহত্ত্ব কুদরত ও তাঁর নেয়ামতের কথা লেখা হতে থাকে, তবুও তা লেখা শেষ করা যাবে না। সুবহানাল্লাহ! (লুকমান: ২৭) অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

وَاِنْ تُعَدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَاتُحْصُوْهَا. (ইব্রাহীম: ৩৪)

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহ্‌র নেয়ামত গণনা করলে শেষ করতে পারবে না। আল্লাহ পাক এ কথার সাথে সাথে আরও বলেছেন,

اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ.

অর্থাৎ, মানুষ বড়ই যালেম, বড়ই না শোকর গোযার! (ইব্রাহীম: ৩৪)

যুলুম বলা হয়– যেকোন জিনিসের অপব্যবহার করাকে। যেটা যেখানে করার নয়, সেটা সেখানে করা, যেটা যেখানে রাখার নয় সেটা সেখানে রাখা, এটাকেই বলা হয় যুলুম। যেমন একজন তার

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



অধিকার পাবে, আমি তার জন্য সেটার ফয়সালা না করে আরেক জনের জন্য ফয়সালা করলাম, এটা হল যুলুম। কেননা আমার ফয়সালাটা সঠিক যায়গায় রাখা হল না। যেটা যে স্থানে রাখার ছিল সেটা সে স্থানে রাখা হল না, যেটা যেভাবে করার ছিল সেটা সেভাবে করা হল না। এটাই হল যুলুম। গোনাহ করাও যুলুম। কারণ আল্লাহ আমাদেরকে তৈরি করেছেন জান্নাতের জন্য। গোনাহ করে আমরা আমাদেরকে জাহান্নামের রাস্তায় রাখলাম। অর্থাৎ যেটা যেভাবে রাখার ছিল সেটা সেভাবে রাখলাম না, এটাও যুলুম। উক্ত আয়াতে আল্লাহ্‌র নেয়ামত গণনা করে শেষ করা যাবে না বলার পর "মানুষ বড় যালেম" একথা বলে বোঝানো হয়েছে যে, মানুষ আল্লাহ্‌র নেয়ামতকে যথাযথ ব্যবহার করে না। প্রত্যেকটা নেয়ামতকে আল্লাহ্‌র হুকুম অনুযায়ী ব্যবহার করাই ছিল ইনসাফের দাবি, এটাই ছিল তার যথাযথ ব্যবহার। সেটা না করাই হল যুলুম। নেয়ামতকে আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী ব্যবহার করা, আল্লাহর নেয়ামতকে আল্লাহর আনুগত্যের কাজে ব্যবহার করাই ছিল সেই নেয়ামতের শোকর আদায় করা। মানুষ আল্লাহর নেয়ামত পেয়ে সেই নেয়ামতগুলোকে আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী ব্যবহার করে না। তাই মানুষ না শোকর গোযার।

শোকর যেমন মুখের দ্বারা হয়ে থাকে, আমলের দ্বারাও শোকর হয়। যে আল্লাহ আমাদেরকে এত নেয়ামত দান করেছেন, সেই আল্লাহ্‌র হুকুম অনুযায়ী আমরা আমাদেরকে পুরো নিবেদিত করে দিব, এটাই হল আমলের মাধ্যমে শোকর। মুখের মাধ্যমেও শোকর আদায় করতে হবে। মুখে হা হুতাশ না করা, আমার এই নেই সেই নেই, আমার এই অভাব সেই অভাব, আমার এত বিপদ-মুসীবত এগুলো বেশি প্রকাশ না করা। বরং সর্বাবস্থায় আল্লাহ ভাল রেখেছেন প্রকাশ করতে হবে। তাই ইসলামের তরীকা হল– যখন কেউ জিজ্ঞাসা করবে ভাই কেমন আছেন? তখন মুখে বলতে হবে আল-হামদু লিল্লাহ! অর্থাৎ, আল্লাহ পাকের শোকর, আল্লাহ পাকের প্রশংসা, যে অবস্থায় তিনি রেখেছেন ভালই রেখেছেন।

অনেক সময় মনে খটকা জাগতে পারে যে, এটা তো একটা মিথ্যা কথা বলা হল।! আমার বিপদ-আপদ চলছে, আমার ছেলে-মেয়ে অসুস্থ আছে কিংবা আমি নিজে অসুস্থ ডাক্তার খানায় বা হাসপাতালে যাচ্ছি, এ অবস্থায় আমাকে জিজ্ঞাস করা হল কেমন আছেন? তখন আল-হামদু লিল্লাহ কেন বলব? এটাতো মিথ্যা হয়ে গেল! কিন্তু এখানে বিবেচনার বিষয় হল আমার এই একটা অসুবিধা থাকলেও আরও যে দশটা সুবিধার মধ্যে আমি আছি, তার উপর কি আল-হামদু লিল্লাহ বলা যায় না? কিংবা আমি যতটুকু বিপদগ্রস্ত আছি, এরচেয়ে আরও বেশি বিপদগ্রস্ত হতে পারতাম, তা যে হয়নি, তা থেকে আল্লাহ পাক রক্ষা করেছেন, তার উপর কি আল-হামদু লিল্লাহ বলা যায় না? এসব চিন্তা করে আল-হামদুলিল্লাহ বললে মিথ্যা কেন হবে, অবাস্তব কেন হবে? বান্দা প্রতি মুহূর্তে আল্লাহর লাখো-কোটি নেয়ামতের মধ্যে ডুবে থাকে। এক মুহূর্তে দুই চারটা বাহ্যিক অসুবিধা দেখা গেলেও; ঐ মুহূর্তে সে আরও অসংখ্য নেয়ামতের মধ্যে ডুবে আছে। সেগুলোর ভিত্তিতে কেন সে আল-হামদুলিল্লাহ বলতে পারবে না? এমনকি এখন সে যে বিপদে বা যে কষ্টে সে লিপ্ত আছে, এর দ্বারাও তার গোনাহ মাফ হচ্ছে, তার দরজা বুলন্দ হচ্ছে। তাই এটাও এক প্রকারের নেয়ামত। আল্লাহ পাক যখন যে অবস্থায় রাখেন, সে অবস্থায় আল্লাহ্‌র নেয়ামততের শোকর আদায় করতে হবে। এভাবে আল্লাহ্‌র নেয়ামতকে স্মরণ করা, আল্লাহ্‌র নেয়ামতের শোকর আদায় করা ওয়াজিব। মনে মনেও শোকর আদায় করতে হবে। মুখেও শোকর আদায় করতে হবে।

আমাদের মধ্যে না শোকরী কেন আসে? কারণ আমাদের উপর আল্লাহ্‌র যে সমস্ত নেয়ামত আছে তা আমরা চিন্তা করি না। বরং যেটা নেই সেটার চিন্তা করি। আল্লাহ কী কী দিয়েছেন? তা চিন্তা করি না

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বরং কী কী দেননি তা নিয়ে চিন্তা করি। অথচ নিয়ম ছিল আমাদের কি আছে তা নিয়ে চিন্তা করব, তাহলে দেখব অনেক কিছু আছে। এভাবে মনের অভাব বোধ দূর হয়ে যাবে, মনের ভিতরে শোকর পয়দা হবে। আর কী কী নেই, কী কী অভাব, তা নিয়ে চিন্তা করলে মনের অভাব কোন দিন মিটবে না। দিলের ভিতর শুধু না শোকরী আসতে থাকবে। আসল অভাব হল মনের অভাব। যার মনে অভাব বোধ নেই, তার কোন অভাব নেই। মনের দিক থেকে যে ধনী, সেই আসল ধনী। হাদীছে এসেছে হুজুর (সা.) বলেছেন,

اَلْغِنٰى غِنَى النَّفْسِ. (رواه الترمذي برقم ٢٣٧٣ وقال : حسن صحيح)

অর্থাৎ, মনের ধনীই আসল ধনী।

এখানে বোঝানো হয়েছে যে, অভাব থাকা না থাকাটা প্রকৃতপক্ষে মনের বিষয়। মন যদি অভাব মুক্ত থাকে, তাহলে সে অভাব মুক্ত। আর মনের ভিতরে যদি অভাব বোধ থাকে, তাহলে যত কিছুই থাকুক, সব সময়ই নিজেকে অভাবী মনে হবে। আসল ধনী সেই, যার মন ধনী। আসল অভাবী সেই, যার মন অভাবী।

আমাদের মনে অভাব বোধ কেন আসে? তার কারণ হল, আমরা প্রয়োজন বা জরুরত আর খাহেশাত এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য করতে পারি না। অনেক সময় আমাদের মনে হয় এটা প্রয়োজন, ওটা প্রয়োজন, এগুলো আমার নেই। এ কারণেই নিজেকে অভাবী মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেগুলো হয়তো প্রয়োজন নয়; বরং খাহেশাত। যার একটা দুইটা-পাঁচটা বাড়ি আছে, দশটা বিশটা গাড়ি আছে, কোটি-কোটি টাকার ব্যাংক ব্যালেন্স আছে, তারও মনে হবে যে, আমার তো আরও দরকার। দেশে একটা বাড়ি করতে পেরেছি, যদি আমেরিকায় একটা বাড়ি করতে পারতাম! লন্ডনে একটা বাড়ি করতে পারতাম!! এভাবে মনে হবে, তার আরও প্রয়োজন রয়ে গেছে। তাহলে এতকিছু থাকার পরও তার অভাব বোধ গেল কোথায়? তার অভাব বোধ যায়নি, কারণ সে প্রয়োজন আর খাহেশাতের মধ্যে পার্থক্য করতে পারছে না। যেগুলোকে সে প্রয়োজন মনে করছে, সেগুলো তার প্রয়োজন নয়, বরং তা হল খাহেশাত।

আমার ডাল-ভাতের ব্যবস্থা হয়েছে, তাহলে আমার জরুরত পূরণ হয়ে গেছে। আমি গোস্ত-ভাতের ব্যবস্থা করতে পরলাম না এটা আমার প্রয়োজন নয়। এটা হল খাহেশাত। প্রয়োজন বলা হয় ততটুকুকে, যতটুকু না হলে নয়, যতটুকু হলেই কোন রকমে চলে যায়, এর অতিরিক্ত যা কিছু প্রয়োজন বলে মনে হবে, সেটা প্রয়োজন নয়, সেটা হল খাহেশাত বা মনের প্রবৃত্তি। জরুরত বা প্রয়োজনের শেষ আছে, খাহেশাতের কোন শেষ নেই। জরুরত আর খাহেশাত এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য করতে পারি না বলে আমাদের কাছে মনে হয় আমাদের অনেক প্রয়োজন অপূর্ণ রয়ে গেছে। আমাদের অনেক কিছু নেই, আমরা অভাবী।

মনের ভিতর অভাববোধ সৃষ্টি হওয়ার আরেকটা বড় কারণ হল দুনিয়ার ব্যাপারে আমরা উপরের দিকে তাকাই। অর্থাৎ, আমাদের চেয়ে কাদের ধন-সম্পদ বেশি আছে সেটা দেখি। এখান থেকেই মনের ভিতর অভাব বোধ সৃষ্টি হয়, দিলের মধ্যে না শোকরী পয়দা হয়। রাসূল (সা.) তাই ইরশাদ করেছেন,

اُنْظُرُوْا اِلٰى مَنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ. (صحيح مسلم ٧٦١٩)

অর্থাৎ, দুনিয়ার ব্যাপারে তোমাদের চেয়ে যারা নীচে আছে অর্থাৎ নিম্নমানের আছে তাদের দিকে তাকাও।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com



এ হাদীছে শিখানো হয়েছে, আমার চেয়ে যার ধন-সম্পদ কম আছে, আমি সেটা দেখব, তাহলে আমার মনের ভিতর শোকর পয়দা হবে, আমার মন থেকে অভাববোধ কেটে যাবে যে, অমুকের এটা নেই, ওটা নেই। আমার তো আল-হামদু লিল্লাহ আছে। এভাবে মনের মধ্যে শোকর বোধ জাগ্রত হবে। এর বিপরীত যখন উপর দিকে তাকানোর অভ্যাস হবে, যখন উপরের দিকে তাকাব, তখন মনে হবে আমার অনেক কিছু নেই। এভাবে মনের মধ্যে না শোকর বোধ জাগ্রত হবে।

নিজের নজর যেন উপরের দিকে না যায়, সে ব্যাপারে যেমন খেয়াল রাখতে হবে, পরিবারের নজরও যেন উপরের দিকে না যায়– সে ব্যাপারেও সতর্ক নীতি গ্রহণ করতে হবে। তাই দুনিয়ার দিক থেকে যারা আমার চেয়ে উপরে আছে, নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া তাদের কাছে আমার বিবি, বাল-বাচ্চাদের যাতায়াত, উঠা-বসা না করানো ভাল। তাদের কাছে গেলে বিবি-বাচ্চারা ঘরে এসে নানান রকম বাহানা ধরবে যে, অমুকের ঘরে এই দেখে আসলাম, ওই দেখে আসলাম, আমাদের ঘরে এটা হলে ভাল হত, ওটা হলে ভাল হত। এভাবে বিবি-বাচ্চাদের মধ্যে জীবনের স্টান্ডার্ড বাড়ানোর চিন্তা ঢুকবে। তখন ছেলে-মেয়ে স্ত্রীর অব্যাহত দাবি আর অব্যাহত ঘ্যান-ঘ্যানানীর মুখে বিচ্যুত হয়ে যেতে হবে। তখন হালাল ইনকামের গণ্ডি পার হয়ে, হারাম ইনকামের পথে যাওয়ার চিন্তা জাগ্রত হবে। তাই উপরের দিকে না তাকানো চাই, উপর ওয়ালাদের সাথে উঠা-বসা কম করা চাই। এটা কোন মুসলমানকে ঘৃণা করা নয়। এটা করতে হবে এই নিয়তে যে, আমার ভিতরে যেন আরও বেশি দুনিয়ার কামাই করার মনোভাব জাগ্রত হতে না পারে। নিজেও এভাবে চলতে হবে নিজের পরিবারকেও এভাবে চালাতে হবে। তাহলে অভাববোধ সৃষ্টি হবে না, যতটুকু আছে তার উপরই 'আল-হামদু লিল্লাহ' এসে যাবে। যতটুকু আছে তার উপর নিজের মনকে তুষ্ট রাখা যাবে।

আল্লাহ পাক যে অবস্থায় রেখেছেন সে অবস্থার উপর তুষ্ট থাকতে হবে, সে অবস্থায় আল্লাহর শোকর আদায় করতে হবে। মুখের দ্বারা শোকর আদায় করার সাথে সাথে মনের দ্বারাও শোকর আদায় করতে হবে, শরীরের দ্বারাও শোকর আদায় করতে হবে। মনের দিক থেকেও শোকর আদায় হবে, মুখেও শোকর আদায় হবে, শরীরের মাধ্যমেও শোকর আদায় হবে।

মনের দ্বারা শোকর হল– আল্লাহ পাক যা দিয়েছেন তার উপর তৃপ্ত থাকা এবং মনে মনে তাঁর অনুগত হয়ে যাওয়া। মুখের দ্বারা শোকর হল– নেই নেই হা-হুতাশ না করা, আর শরীরের মাধ্যমে শোকর হল আল্লাহর নেয়ামত দ্বারা আমার শরীর লালিত পালিত হচ্ছে, তাই আমার শরীরকে আল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত করে রাখা, আল্লাহর গোলামীতে লিপ্ত করে রাখা। একটা কুকুর, একটা ঘোড়াকে তার মালিক সামান্য একটু খাবার দেয়, তাও নিজের তৈরি করা খাবার নয়, আল্লাহর দেয়াটা শুধু তাদেরকে সরবারহ করে। এর কারণে ঐ কুকুর কীভাবে মালিকের গোলামী করে, ঘোড়া কীভাবে মালিকের গোলামী করে? কুকুর কীভাবে মুনিবের গোলামী করে তা তো আমরা জানি। আরবদের কাছে কুকুরের ব্যবহার কম ছিল, তাদের কাছে ঘোড়ার ব্যবহার বেশি ছিল। এ জন্য আল্লাহ পাক সূরা আদিয়াতে ঘোড়ার অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন। যাতে মানুষ ঘোড়ার অবস্থা দেখে কৃতজ্ঞতা আদায় করা শিখে।

একটা ঘোড়ার মালিক তাকে সামান্য কিছু খাবার দেয়, আর মালিকের জন্য সে কী করে? যুদ্ধের ময়দানে সে নিজের জীবনটা পর্যন্ত বিসর্জন দিয়ে দেয়। একটা ঘোড়া যখন দেখে মালিকের উপরে তলোয়ারের আঘাত আসছে, তীর ছুটে আসছে, আর মালিক সেটা ঠেকাতে পারছে না, তখন ঘোড়া মালিককে বাঁচানোর জন্য নিজের ঘাড় উঁচু করে করে তলোয়ারের আঘাত নিজের ঘাড়ে নিয়ে নেয়। ছুটে আসা তীর নিজের গায়ে বিদ্ধ করে নেয়। মালিক যখন তাকে ছুটতে বলে, সে এমনভাবে ছোটে যে,

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

পায়ের আঘাতে পাথর থেকে আগুনের স্ফুলিঙ্গ বের হতে থাকে। মালিকের হুকুমে ধূলার ভিতর দিয়ে ছুটছে, অন্ধকারের ভিতর দিয়ে ছুটছে, যখন যেভাবে মালিক হুকুম দিচ্ছে সেভাবে সে ছুটছে। ছুটতে ছুটতে তার উর্ধ্বশ্বাস ছুটতে শুরু হচ্ছে, তার শ্বাস ঘন হয়ে যাচ্ছে, নাক মুখ থেকে ফ্যানা বের হতে শুরু করছে। মালিকের সামান্য নেয়ামত ভোগ করে, তার কৃতজ্ঞতা আদায় করার জন্য ঘোড়া এভাবে মালিকের গোলামী করে যাচ্ছে, মালিকের জন্য নিজের জান-প্রাণ নিবেদিত করে দিচ্ছে। নিজের আরাম আয়েশ সব বিসর্জন দিয়ে দিচ্ছে। আল্লাহ পাক ঘোড়ার এরকম দৃষ্টান্ত তুলে ধরে আমদেরকে বোঝাতে চান যে, তোমরা আমার এত নেয়ামত ভোগ কর, তবুও কেন আমার হুকুমের জন্য এরকম নিবেদিত হয়ে যেতে পার না? তবুও কেন আমার হুকুম মানার জন্য নিজেদের আরাম-আয়েশকে এভাবে বর্জন করতে পার না? তবুও কেন আমার জন্য নিজেদের জীবনকে এরকম বিসর্জন দিয়ে দিতে পার না? অবলা জানোয়ার যার কোন বুদ্ধি নেই, বুঝ নেই, সে যদি মালিকের নেয়ামত ভোগ করে মালিকের জন্য এত কিছু করতে পারে, তাহলে বুদ্ধি সম্পন্ন, বুঝ সম্পন্ন মানুষ কেন করবে না?

আল্লাহ পাক জিন ইনসানকে জ্ঞান দান করেছেন, তাদেরকে বোঝার ক্ষমতা দান করেছেন। বিচার-বিবেচনার শক্তি দান করেছেন। তাদের জন্য তো অনেক কিছু উপদেশ গ্রহণ করার রয়েছে। শিক্ষা গ্রহণ করার আছে। একটা অবলা প্রাণীর অবস্থা নিয়ে চিন্তা করলেও তার অনেক বড় শিক্ষা অর্জন হতে পারে। এমনিভাবে আল্লাহর সৃষ্টির সবকিছুর মধ্যে তার জন্য শিক্ষা রয়েছে। এক আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন,

اِنَّ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ اخْتِلَافِ الَّیْلِ وَ النَّهَارِ لَاٰیٰتٍ لِّاُولِی الْاَلْبَابِ. (ال عمران : ١٩٠)

অর্থাৎ, আসমান-যমীনের মধ্যে, রাত-দিনের পরিবর্তনের মধ্যে, এই রাত-দিন কখনও ছোট হয়, কখনও বড় হয়, এই সব-কিছুর মধ্যে জ্ঞানীদের জন্য উপদেশ রয়েছে। সবকিছুই আমাদের জন্য উপদেশ। আল্লাহর প্রত্যেকটা সৃষ্টি আমাদের জন্য একেকটা জাজ্বল্যমান উপদেশ। কবি তাই বলেছেন,

وَفِيْ كُلِّ شَيْئٍ شَاهِدٌ + عَلٰى اَنَّهٗ وَاحِدٌ

অর্থাৎ, আল্লাহর সৃষ্টি সবকিছুর মধ্যে আল্লাহকে বোঝার জন্য, আল্লাহ যে 'ওয়াহদাহু লা-শারীকালাহু' একথা বোঝার জন্য দলীল রয়েছে। সবকিছুর মধ্যে শিক্ষা গ্রহণের উপকরণ রয়েছে।

শোকর আদায় না করলে যেমন ওয়াজিব তরক হয়, যার কারণে পরকালে শাস্তি রয়েছে। তেমনিভাবে শোকর আদায় না করলে দুনিয়াবী ক্ষতিও হয়। শোকর আদায় না করলে আল্লাহ পাক নেয়ামত ছিনিয়ে নিতে পারেন। পক্ষান্তরে শোকর আদায় করলে আল্লাহ পাক খুশি হন এবং তার নেয়ামতকে আরও বৃদ্ধি করে দেন। দুনিয়াতেও আমরা কারও বাড়িতে খেয়ে যদি খাবারের প্রশংসা করি, শোকর আদায় করি, তাহলে সেই মেজবানের পক্ষ থেকে আবার তাকে খুশীতে দাওয়াত দেয়া হবে। আর যদি না শোকরী করে, তাহলে আর তাকে দাওয়াত দেয়া হবে না। কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে,

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَ لَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِیْ لَشَدِيْدٌ.

অর্থাৎ, যদি তোমরা শোকর আদায় কর তাহলে আমি বৃদ্ধি করে দিব। আর যদি না শোকরী কর, তাহলে আমার কঠিন শাস্তি তো রয়েছেই। (ইয়াছীন: ৭)

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



বয়ান নং ৪৮-এর খুতবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ وَصَلَ عِبَادَهٗ بِنِعَمِهٖ وَلَطَائِفِهٖ، وَقَسَّمَ نِعَمَهٗ وَلَطَائِفَهٗ عَلٰى حَسَبِ حُكْمِهٖ وَحِكْمَتِهٖ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ قَدَّرَ الْاَشْيَاءَ بِقُدْرَتِهٖ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ اَلَّذِیْ اِمْتَنَّ بِهٖ عَلٰى بَرِيَّتِهٖ ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ شَاكِرِیْ نِعْمَةِ اللّٰهِ وَخَائِفِیْ نِقْمَتِهٖ.

اَمَّا بَعْدُ :

اَيُّهَا النَّاسُ! اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَسَّمَ عَلٰى عِبَادِهٖ نِعَمَهٗ، وَاَوْجَبَ عَلَيْهِمْ شُكْرَهٗ، فَاشْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ، وَمَا سَاقَهٗ مِنَ الْجُوْدِ اِلَيْكُمْ. قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى خِطَابًا لِّبَنِیْ اِسْرَائِيْلَ : يَا بَنِیْٓ اِسْرَآئِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِیَ الَّتِیْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ. اَلْاٰيَةُ. وَحُكْمُ هٰذِهِ الْاٰيَةِ عَامٌّ تُوْجِبُ شُكْرَ النِّعَمِ عَلٰى جَمِيْعِ الْعِبَادِ.

اَيُّهَا النَّاسُ! اِنَّ نِعْمَةَ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَى الْعِبَادِ اَنْوَاعٌ كَثِيْرَةٌ مِّمَّا لَا تُعَدُّ وَلَا تُحْصٰى. فَهُوَ تَعَالٰى خَلَقَ الْاِنْسَانَ فِیْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ، وَذَالِكَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ، وَهُوَ تَعَالٰى جَعَلَنَا مِنَ الْاُمَّةِ الْمُسْلِمَةِ، وَذَالِكَ اَيْضًا مِّنْ نِّعْمَةِ اللّٰهِ الْعَظِيْمَةِ، قَالَ تَعَالٰى : لَا تَمُنُّوْا عَلَیَّ اِسْلَامَكُمْ، بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ اَنْ هَدَاكُمْ لِلْاِيْمَانِ. وَهُوَ تَعَالٰى مَنَحَ الصِّحَّةَ وَالْعَافِيَةَ مِنْ اَمْرَاضٍ كَثِيْرَةٍ، وَذَالِكَ اَيْضًا مِّنْ نِعَمِهِ الْعَظِيْمَةِ، وَاِنَّ مَا اَصَابَ الْمُؤْمِنَ مِنْ مَّصَائِبَ وَ بَلَاءٍ، ذَالِكَ مِنَ اللّٰهِ اِبْتِلَاءٌ ، وَفِيْهَا رَفْعُ الدَّرَجَاتِ، وَالْعَفْوُ وَالتَّنْبِيْهُ عَنِ السَّيِّئَاتِ، قَالَ تَعَالٰى : وَمَا اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْ عَنْ كَثِيْرٍ. وَقَالَ تَعَالٰى : وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْاَدْنٰى دُوْنَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ. وَقَالَ النَّبِیُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً اَلْاَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْاَمْثَلُ فَالْاَمْثَلُ، وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : عَجَبًا لِاَمْرِ الْمُؤْمِنِ اِنْ اَمْرَهٗ

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

كُلُّهُ لَهُ خَيْرٌ، اِنْ اَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ فَصَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَّهُ، وَاِنْ اَصَابَتْهُ سَرَّاءُ فَشَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَّهُ.

فَالْحَاصِلُ اَنَّ السَّرَّاءَ وَالضَّرَّاءَ، وَالشِّدَّةَ وَالرَّخَاءَ كُلَّهَا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَنِعَمِهٖ، وَاِنَّ نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُعَدُّ وَلَا تُحْصٰى. قَالَ تَعَالٰى : وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا. وَقَالَ تَعَالٰى : وَلَوْ اَنَّ مَا فِى الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَّالْبَحْرُ يَمُدُّهٗ مِنْ بَعْدِهٖ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللّٰهِ. فَكُوْنُوْا لِنِعَمِ اللّٰهِ شَكُوْرًا، وَلَا تَكُوْنُوْا كُفَّارًا. وَمَنْ شَكَرَ لِنِعَمِهٖ يَزْدَدْ نِعْمَةً، وَمَنْ كَفَرَ يَزْدَدْ نِقْمَةً، قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِىْ لَشَدِيْدٌ.

اَيُّهَا النَّاسُ! اِذَا كَانَ الْعَبْدُ اَمَدَّ نَظْرَهٗ فِى الدُّنْيَا اِلٰى مَنْ هُوَ اَعْلٰى مِنْهُ، يَنْشَأُ فِىْ قَلْبِهِ الْكُفْرُ، وَمَنْ اَمَدَّ نَظْرَهٗ اِلٰى مَنْ هُوَ اَسْفَلُ مِنْهُ يَنْشَأُ فِىْ قَلْبِهِ الشُّكْرُ ، فَلِذَالِكَ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : اُنْظُرُوْا اِلٰى مَنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ.

اَيُّهَا النَّاسُ! وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَغْنِيَاءِ، يَشْعُرُ فِىْ قَلْبِهِ الْاِفْلَاسَ وَالْفَقْرَ، مَعَ مَا لَهٗ مِنْ كَثْرَةِ الْاَمْوَالِ وَوَسَائِلِ الْمَعَاشِ، وَطَرِيْقُ النَّجَاةِ مِنْ هٰذَا الشُّعُوْرِ مَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : اَلْغِنٰى غِنَى النَّفْسِ.

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ : يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ.

بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ، وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. اَقُوْلُ قَوْلِىْ هٰذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ لِىْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَاسْتَغْفِرُوْهُ، اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



বয়ান নং -৪৯

## সময়ের গুরুত্ব প্রসঙ্গ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: وَ الْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: نِعْمَتَانِ مَغْبُوْنٌ فِيْهِمَا كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ اَلصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

গত জুমুআয় আলোচনা করা হয়েছিল বান্দার উপর আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতের শোকর আদায় করা ওয়াজিব। আল্লাহ পাক বান্দাদেরকে যত ধরনের নেয়ামত দিয়েছেন, সব ধরনের নেয়ামতের শোকর আদায় করা ওয়াজিব। এক এক ধরনের নেয়ামতের শোকর আদায় করার তরীকা একেক ধরনের। যে ধরনের নেয়ামতের শোকর আদায় করার যে তরীকা সেই তরীকা অনুযায়ী তার শোকর আদায় করা ওয়াজিব।

বান্দার উপর আল্লাহর নেয়ামত এত বেশি যে, তা গণনা করে শেষ করা যায় না। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا.

অর্থাৎ, যদি তোমরা আল্লাহর নেয়ামত গণনা করতে যাও, গণনা করে শেষ করতে পারবে না। (ইব্রাহীম: ৩৪) আর একটা আয়াতে অদ্ভুত ভাবে এ কথাটা বলা হয়েছে,

وَ لَوْ اَنَّ مَا فِى الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَّ الْبَحْرُ يَمُدُّهٗ مِنْ بَعْدِهٖ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمٰتُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ.

অর্থাৎ, সমস্ত দুনিয়ার সমস্ত গাছপালা বৃক্ষ-লতা যদি কলম হয়, আর সাত সাগরের পানি যদি কালি হয়, আর এই সব কলম ও কালি দিয়ে যদি আল্লাহর নেয়ামতের কথা লেখা শুরু করা হয়, এই কালি শেষ হয়ে যাবে, তবুও আল্লাহর নেয়ামতের কথা লেখা শেষ হবে না। (লুকমান: ২৭) সুবহানাল্লাহ! এত অগণিত অসংখ্য নেয়ামত আল্লাহ বান্দাদেরকে দিয়েছেন।

এই নেয়ামতের মধ্যে একটা বড় নেয়ামত হল সময়। আল্লাহ পাক মানুষকে যে সময় দিয়েছেন, এই সময় একটা বড় দামি নেয়ামত। সময় এতবড় নেয়ামত যে, এই সময়কে কাজে লাগিয়ে মানুষ জান্নাতী হয়ে যেতে পারে। এর বিপরীত এই সময়কে কাজে না লাগানোর কারণে মানুষ জাহান্নামীও হয়ে যেতে পারে। এই সময়কে মানুষ ঈমানের কাজেও লাগাতে পারে, এই সময়কে কুফরের কাজেও লাগাতে পারে। এই সময়কে মানুষ নেক আমলের কাজেও লাগাতে পারে, আবার এই সময়কে মানুষ গোনাহের কাজেও লাগাতে পারে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যত কথা বলে বান্দাদেরকে ধমক দিবেন এবং তিরস্কার করবেন, তার মধ্যে একটা কথা এটাও থাকবে–

اَوَ لَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ.

অর্থাৎ, আমি কি তোমাদেরকে এতটুকু বয়স এবং এতটুকু সময় দেয়নি, যে সময়কে তোমরা উপদেশের কাজে এবং নেক আমলের কাজে লাগাতে পারতে? (ফাতির: ৩৭)

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

এ আয়াতে বোঝানো হয়েছে সময়কে কাজে না লাগালে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তিরস্কার আসবে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরায়ে আছরে সময়ের কসম খেয়ে বলেছেন,

وَ الْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِیْ خُسْرٍ اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.

অর্থাৎ, সময়ের কসম, মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এই কসম থেকেও বুঝা যায় সময়ের গুরুত্ব কতখানি। যে বিষয়টাকে বড় মনে করা হয়, তার উল্লেখ করেই কসম খাওয়া হয়। বান্দার কাছে সব চেয়ে বড় হল আল্লাহ, তাই আল্লাহ্‌র নামে কছম খাওয়া হয়, অন্য কোন কিছুর নামে কছম খাওয়া হয় না। গ্রাম দেশের অনেক মানুষ বিশেষভাবে মা বোনেরা বাচ্চার মাথায় হাত দিয়ে কছম করে। তারা বাচ্চাকে অনেক বড় মনে করে বলেই এরকম কছম খায়। এই বাচ্চার বেঁচে থাকা না থাকা তাদের কাছে অনেক বড় বলেই তাদের মাথায় হাত দিয়ে কছম করে। যদিও গাইরুল্লাহ্‌র নামে অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নামে কছম খাওয়ার ব্যাপারে হাদীছে নিষেধাজ্ঞা এসেছে।

আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন কিছুর কছম খাওয়া যায় না। কারণ কছম সেই বিষয়েরই হয়, যেটাকে বড় মনে করা হয়। বান্দা তো একমাত্র আল্লাহ্‌কেই বড় মনে করতে পারে, অন্য কাউকে নয়। তাই আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নামে কছম খাওয়া নিষেধ। আল্লাহ্‌র কাছে যেহেতু বড় আর কিছুই নেই। তাই আল্লাহ শুধু গুরুত্ব বোঝানোর জন্য যে কোনটার কছম খেতে পারেন। আল্লাহ এই সময়ের কছম করে, সময়ের শপথ করে বুঝিয়েছেন যে, সময় অনেক গুরুত্বপূর্ণ জিনিস, সময় অনেক দামি জিনিস। সময়ের মত এই বড় নেয়ামতকে আমাদের কাজে লাগাতে হবে। কাজে না লাগালে এই নেয়ামতের শোকর আদায় হবে না।

সময়কে কীভাবে কাজে লাগাতে হবে, কোন্ কোন্ কাজে লাগাতে হবে, তাও আল্লাহ তা'আলা এই সূরার ভিতরে বলে দিয়েছেন। অর্থাৎ, যারা নিজেরা ঈমান আনে এবং নেক আমল করে। অন্যকেও ঈমানের কথা বলে, এবং আমলের কথা বলে। এখানে মোট চারটা বিষয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই চারটা কাজে যাদের সময় লাগবে, তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, নতুবা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, সমস্ত মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে, একমাত্র যারা এই চার কাজে নিজেদের সময়কে লাগাবে, তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। সেই চার কাজ হল নিজের ঈমান, নিজের আমল, অন্যের ঈমান, অন্যের আমল। এই চার কাজে আমাদের সময় লাগবে, এর বাইরে অন্য কোন কাজে আমাদের সময় লাগবে না। এটাই হল সময়ের যথাযথ ব্যবহার। যদি আমরা সময়কে এসব কাজে লাগাই, তাহলে আল্লাহ পাকের এই নেয়ামতের শোকর আদায় করা হবে এবং জীবন সফল হবে। হযরত ইমাম শাফিঈ (রহ.) বলেছেন, মানুষ যদি শুধু এই সূরার বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা করে এবং তদনুযায়ী আমল করে, তাহলে তার জীবনে সফলতার জন্য যথেষ্ট।

সময়ের মূল্য না দিলে জীবন ব্যর্থ হবে। কারণ গোটা জীবন হল কিছু সময়ের সমষ্টি। এক কবি বলেছেন সময়ের মূল্য দিবে না, তোমার জীবনটা কিসের নাম? তোমার জীবন তো কিছু সময়ের সমষ্টি মাত্র। তিনি বলেছেন,

حَيَاتُكَ اَنْفَاسٌ تُعَدُّ فَكُلَّمَا + مَضٰى نَفَسٌ مِّنْهَا اِنْقَضَتْ بِهٖ جُزْءٌ.

অর্থাৎ, তোমর জীবন তো কয়েকটা শ্বাস-প্রশ্বাসের নাম। একেকটা শ্বাস ছাড়ছ, জীবনের একেকটা মুহূর্ত কমে যাচ্ছে। একেকটা শ্বাস গ্রহণ করছ, তোমার জীবনের একেকটা মুহূর্ত কমে যাচ্ছে। এই

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



কতকগুলো শ্বাস প্রশ্বাসের নামই তো হল জীবন। কয়েকটা মুহূর্তের সমষ্টি হল একটা দিন, কয়েকটা দিনের সমষ্টি হল একটা মাস, কয়েক মাসে একটা বছর। এভাবে কিছু মুহূর্তের সমষ্টি হল জীবন। কতকগুলো সময়ের সমষ্টি হল জীবন। তাই জীবনকে অর্থবহ করতে হলে প্রত্যেকটা সময়কে কজে লাগাতে হবে। এই চার কাজের মধ্যে সময়কে ব্যয় করতে হবে।

যদি কেউ মনে করেন, মাত্র এই চার কাজের মধ্যেই যদি সময়কে লাগাতে হয়, অন্য কোন কাজে সময়কে লাগানো না যায়, তাহলে তো দুনিয়ার অন্য কোন কাজই করতে পারব না। চাকুরিও করতে পারব না, ব্যবসা-বাণিজ্যও করতে পারব না, ক্ষেত-খামারও করতে পারব না, বাজার-ঘাটও করতে পারব না, ঘর-সংসারও করতে পারব না, অনেক কাজই করতে পারব না। কেননা সেসব কাজ এই চার কাজের বাইরে। তাহলে শুনুন এগুলোও নেক আমল। এগুলোতে সময় ব্যয় করাও নেক আমলে সময় ব্যয় করা। বান্দা যদি দ্বীনের নেসবতে এসব কাজ করে, দ্বীনের মাকসাদকে সামনে রেখে এসব কাজ করে, তাহলে তার দুনিয়ার এ সব কাজও দ্বীনী কাজ হয়ে যায়। দুনিয়ার এ সব কাজও নেক আমলে পরিণত হয়।

কিছু কিছু নেক আমল আছে, যেগুলো সরাসরি নেক আমল। যেমন নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, দান- সদকা, দ্বীনী দাওয়াত ইত্যাদি। এগুলো সরাসরি দ্বীনের কাজ, সরাসরি নেক আমল। আর কিছু কিছু নেক আমল আছে, যেগুলো সরাসরি দ্বীনী কাজ নয়, সরাসরি নেক আমল নয়, তবে দ্বীনী কাজের মাধ্যম বা নেক আমলের মাধ্যম হওয়ার কারণে পরোক্ষভাবে সেগুলোও দ্বীনী কাজ এবং নেক আমল। যেমন একজন মুসলমানের সাথে আমার দেখা সাক্ষাৎ হল। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম ভাই কেমন আছেন, কী হালচাল? বাহ্যিকভাবে এটা দুনিয়াবী কথাবার্তা। কিন্তু যদি এই নিয়তে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, কোন মুসলমান ভাইয়ের সাথে দেখা সাক্ষাৎ হলে তার হালপুরছি করা সুন্নাত, তাহলে এই দুনিয়াবী কথাই দ্বীনী কথা হয়ে গেল, একটা সুন্নাতের উপর আমল হয়ে গেল। এমনিভাবে আমি বাজার-ঘাট করব, বাহ্যিকভাবে এটা নিছক দুনিয়াবী কাজ, কিন্তু যদি এই নিয়তে হয় যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে সংসার চালানোর যিম্মাদারী দিয়েছেন, আমি বাজার-ঘাট না করলে আল্লাহ্‌র দেয়া সেই যিম্মাদারী পালন করা হবে না। তাই আল্লাহ্‌র দেয়া যিম্মাদারী পালন করার জন্য আমি বাজার-ঘাট করছি। এই নিয়তে বাজার-ঘাট করলে সেটাও নেকীর কাজ বলে গণ্য হবে। আমি চাকুরি করব, ব্যবসা-বাণিজ্য করব, গ্রাহকের সাথে কথা-বার্তা বলব, ক্ষেত-খামার করব, এইসব এই নিয়তে করব যে, এর দ্বারা আমার হালাল উপার্জনের ব্যবস্থা হবে, এর দ্বারা আমি আমার পরিবার চালানোর যিম্মাদারী পালন করতে পারব। আমার খাওয়া দাওয়ার পেরেশানী থাকবে না, ফলে নির্বিঘ্নে দ্বীনের কাজ করতে পারব। এভাবে দুনিয়াবী কাজের মধ্যে দ্বীনী আঙ্গিক বের করে নিলে দুনিয়াবী কাজও দ্বীনের কাজ হয়ে যাবে, দুনিয়াও দ্বীন হয়ে যাবে। এর বিপরীত যদি নিয়ত ঠিক না থাকে, তাহলে দ্বীনের কাজও দুনিয়া হয়ে যাবে।

একই কাজ একেক রকম নিয়তের ভিত্তিতে একেক রকম হয়ে যায়। কোন্ আমল কোন্ পর্যায়ের গণ্য হবে, কোন্ আমল কোন্ পর্যায়ে পড়বে, সেটা নির্ণিত হয়ে থাকে নিয়তের ভিত্তিতে। যেমন একটা উদাহরণ দিয়ে বিষয়টা বুঝা যেতে পারে। সাধারণভাবে ধন-দৌলতের প্রতি আগ্রহভাব প্রকাশ করা ভাল নয়, কিন্তু আল্লাহ্‌র নবী হযরত আইয়ুব (আ.) একদিন নদীতে গোসল করছিলেন, তখন তাঁর সামনে স্বর্ণের পতঙ্গ এসে পড়ছিল আর তিনি কাপড়ের আঁচলের মধ্যে সেগুলোকে জড় করতে শুরু করেছিলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা ডাক দিয়ে বললেন, আইয়ুব, আমি কি তোমার অভাব মোচন করিনি? তারপরও

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

এগুলোর প্রতি এত আগ্রহ কেন? হযরত আইয়ুব (আ.) তখন জওয়াব দিয়েছিলেন, আমি এগুলিকে তোমার দেয়া বরকত হিসেবে গ্রহণ করছি। তোমার বরকতের প্রতি আগ্রহ থাকবে বৈকি! আল্লাহ তা'আলা তাঁর এই জওয়াবে খুশি হয়েছিলেন। দেখা গেল ধন-দৌলতের প্রতি আগ্রহ যেটা খারাপ, দৃষ্টিভঙ্গি ভাল হওয়ার কারণে সেটা ভাল বলে গণ্য হল। এভাবে দৃষ্টিভঙ্গি ভাল হলে দুনিয়ার কাজও দ্বীনের কাজ হয়ে যায়। আর দৃষ্টিভঙ্গি খারাপ হলে দ্বীনের কাজও দুনিয়ার কাজ হয়ে যায়, দ্বীনও দুনিয়া হয়ে যায়। তাই আমরা যে সমস্ত দুনিয়ার কাজ করি, সেগুলো দ্বীনের নেছবতে করতে হবে, তাহলে সেগুলোও দ্বীন হয়ে যাবে, নেক আমলের হয়ে যাবে।

যাহোক যে কথা আলোচনা করা হচ্ছিল- আমাদের সময় লাগবে হয় নিজের ঈমান এবং নিজের আমলের কাজে, অথবা অন্যের ঈমান এবং অন্যের আমলের কাজে, এর বাইরে কোন কাজে লাগবে না। এর বাইরে লাগলে আমাদের সময় নষ্ট হবে। আল্লাহ্‌র এই মহা নেয়ামতের অপব্যবহার হবে, আমাদের জীবন ধ্বংস হবে।

সাধারণত আমাদের সময় নষ্ট হয় বিনা প্রয়োজনে বেশি কথা বলার কারণে, কিংবা বিনা প্রয়োজনে বেশি মেলামেশার কারণে। বেশি কথা বললে একদিকে সময়ও নষ্ট নয়, আবার বেশি কথা বললে বেশি ভুল হয় এবং বেশি গোনাহ হয়। তাই বলা হয়েছে,

**مَنْ كَثُرَ كَلَامُهُ كَثُرَ سَقَطُهُ.** (قال الهيثمي: رواه الطبراني في الاوسط وفيه ضعفاء وثقوا.)

অর্থাৎ, যার কথা বেশি হয় তার ভুল-ভ্রান্তিও বেশি হয়। অতএব কথা কম বললে ভুল-ভ্রান্তি ও মিথ্যা থেকে নিরাপদ থাকা যায়। হযরত ওমর (রা.) বলেছেন,

**مَنْ صَمَتَ نَجَا.** (سنن الترمذي ٢٥٠١ وقال الألباني : صحيح)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কথা না বলে চুপ থাকে সে নিরাপদ থাকে।

বেশি কথা বলার আরও অনেক ক্ষতি। বেশি কথা বললে গীবত-শেকায়েতও বেশি হয়, মিথ্যাও বেশি হয়, হাসি-মস্করা, টিকা-টিপ্পনীও বেশি হয়, বাজে কথাও বেশি হয়। তাই সময়কে নষ্ট হওয়া থেকে বাঁচাতে হলে কথা কমাতে হবে। নিঃষ্প্রয়োজনীয় কথা থেকে বিরত থাকতে হবে।

কিতাবে বলা হয়েছে মানুষের কথা হবে তিন ধরনের। এই তিন ধরনের কথা হল প্রয়োজনীয় কথা, এর বাইরে আর যত ধরনের কথা আছে সব হল নিঃষ্প্রয়োজনীয় কথা। এই প্রয়োজনীয় তিন ধরনের মধ্যে এক ধরনের কথা হল যা বললে ছওয়াব হয়। আরেক ধরনের কথা হল যা না বললে গোনাহ হয়। আরেক ধরনের কথা হল যা দুনিয়ার কাজ কারবার চালানোর জন্য আমাদের বলতে হয়। যেমন কেউ অন্য কাউকে কুরআন-হাদীছের কথা বলল বা দ্বীনী দাওয়াত দিল এটা হল ছওয়াবের কথা। আর কেউ অন্যায় কাজ করছে, তাকে অন্যায় থেকে বিরত করার জন্য যা বলা দরকার, অন্যায়ের ব্যাপারে বুঝ দেয়ার জন্য যা বলা দরকার, তা না বলে চুপ থাকলে গোনাহ হয়। সেই গোনাহ থেকে বাঁচার জন্য কথা বলা প্রয়োজনীয়। আর দুনিয়ার কাজ কারবার চালানোর জন্য আমাদের যা বলতে হয়, সেখানে কথা না বলে চুপ থাকলে আমাদের ক্ষতি হয়ে যায়, তার উদাহরণ হল– যেমন: আমি দোকান খুলে বসেছি, খরীদ্দার এসেছে, কোন মালের দাম জিজ্ঞাসা করছে। এখন যদি আমি কথা না বলে চুপ থাকি, তাহলে আমার ব্যবসা চলবে না। আমি দুনিয়ার দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাব। অফিসে গিয়েছি, কাউকে কোন অর্ডার দেয়া দরকার, কিছু বলা দরকার, প্রস্তু বললাম না চুপ থাকলাম, তাহলে আমার অফিস চলবে না। এই ধরনের ক্ষেত্র যেখানে কথা না বললে আমার দুনিয়াবী ক্ষতি হবে, পার্থিবভাবে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হব,

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



এ ধরনের ক্ষেত্রে কথা বলাও প্রয়োজনীয় কথার অন্তর্ভুক্ত। এই তিন ধরনের কথা হল প্রয়োজনীয় কথা। এর বাইরে আর সব হল অহেতুক ও নিঃষ্প্রয়োজনীয় কথা। হাদীছে এসেছে,

**مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَايَعْنِيْهِ.** (رواه أحمد في مسنده برقم ١٧٣٧ وقال شعيب الأرنؤوط : حسن بشواهده)

অর্থাৎ, মুসলমানের জীবনের সৌন্দর্য হল অহেতুক কথা, অহেতুক কাজ কারবার বর্জন করা।

অতএব জীবনকে সুন্দর করার স্বার্থেও এই তিন ধরনের কথার বাইরে যত কথা আছে, সেই সব অহেতুক কথা বর্জন করতে হবে। আমরা যে কথাই বলব, সেটা এই তিন ধরনের ভিতরে পড়ে কি-না দেখতে হবে।

এ কথা মনে করা যাবে না যে, এই তিন ধরনের কথার বাইরে আর কোন কথা বলতে না পারলে অনেক প্রয়োজনীয় কথাই আমরা বলতে পারব না। প্রয়োজনীয় সব কথাই কোন না কোনোভাবে এই তিন শ্রেণির যে কোন এক শ্রেণির মধ্যে পড়বে। যেমন: আমরা বাল-বাচ্চার সাথে কথা বলব, সেটাও এই তিন ধরনের ভিতরে পড়ে। কারণ বাল-বাচ্চার সাথে কথা বললে তারা আমাদের থেকে সুন্দর কথা শিখবে। তাদেরকে শিখানো আমাদের দায়িত্ব। দায়িত্ব পালন করলে ছওয়াব হয়। বিবির সাথে ফুর্তিমূলক কথাবার্তা বলব, তাতে বিবির মন জয় করা হবে, এটা বিবির হক, শরীআতের একটা হক, এই হক আদায় করলে আমার ছওয়াব হবে। তাছাড়া বিবি-বাচ্চাদের সাথে ফুর্তিমূলক কথাবার্তা বললে আমার মন ভাল থাকবে, মন ভাল থাকলে আমি যতক্ষণ দ্বীনের কাজ করব ফুর্তির সাথে করতে পারব। অতএব এই দৃষ্টিভঙ্গিতে এটাও দ্বীনের জন্য একটা সহযোগী বিষয়। তাহলে এটাও ছওয়াবের পর্যায়ে চলে আসে। এভাবে প্রয়োজনীয় সব কথাই এই তিন পর্যায়ের ভিতরে চলে আসবে, যদি আমরা দ্বীনের নেছবতে সে সব কথা বলি। এই তিন পর্যায়ের ভিতরের কথা হল প্রয়োজনীয় কথা। এর বাইরে সব হল অপ্রয়োজনীয় কথা, বেহুদা কথা। এসব অপ্রয়োজনীয় এবং বেহুদা কথা থেকে আমরা বাঁচি না বলেই আমাদের জীবনের বহু মূল্যবান সময় নষ্ট হয়ে যায়।

গোনাহের কথার মধ্যেও আমাদের জীবনের বহু সময় নষ্ট হয়ে যায়। মানুষের গীবতের পিছনে বহু সময় নষ্ট হয়, মিথ্যা কথার মধ্যে বহু সময় নষ্ট হয়, গান-বাদ্য, সিনেমা বাইস্কোপের আলোচনায় বহু সময় নষ্ট হয়। অহেতুক আলোচনা এবং গল্প-গুজবের মধ্যেও আমাদের অনেক সময় নষ্ট হয়। এর একটা বড় উদাহরণ হল– আজকালকার রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করা। এসব আলোচনা এখন ব্যাপক রোগের মত ছড়িয়ে পড়েছে। দুই জন পাঁচজন একত্রিত হলেই রাজনীতি নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা, তর্ক-বিতর্ক শুরু করে দেই। এর দ্বারা সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কোন ফায়দা আছে বলে মনে হয় না। তবে হ্যাঁ কুরআন-হাদীছের আলোকে কোন বিষয়ের পর্যালোচনা হলে সেটা ভিন্ন কথা।

আমাদের মনে রাখা দরকার জীবনের প্রতিটা মুহূর্ত অনেক দামি। একটা মুহূর্ত চলে গেলে আর সেটা ফেরত পাওয়া যাবে না। জীবনের প্রতিটা মুহূর্ত যাচ্ছে, জীবন খাটো হচ্ছে, বড় হচ্ছে না। আমরা বলি আমাদের বয়স বাড়ছে। আসলে বয়স বাড়ে না বরং কমে। প্রতিটা মুহূর্ত যাচ্ছে, আমার বয়স বাড়ছে না বরং কমছে। বয়স তো নির্ধারিত। সেই নির্ধারিত সময় থেকে শুধু কমেই যাচ্ছে, বাড়ছে না। মওতের সময় নির্ধারিত আছে, মওত তার থেকে এক মুহূর্ত আগেও আসবে না, এক মুহূর্ত পরেও আসবে না। হায়াত নির্ধারিত। তাই যতটুকু সময় যাচ্ছে সেই নির্ধারিত হায়াত থেকে সময় কমে যাচ্ছে। অতএব আমার বয়স কমছে, বাড়ছে না। এই সমস্ত কথা সামনে রাখলেই আমাদের জীবনের একেকটা

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

মুহূর্ত কত দামি তা বুঝে আসবে। এরকম দামি সময়কে আমরা অহেতুক কথাবার্তা বলে নষ্ট করতে পারি না, অহেতুক মেলামেশা করে নষ্ট করতে পরি না।

বুযুর্গানে দ্বীন বলেছেন মানুষের জীবন গঠন করার কয়েকটা মূলনীতি রয়েছে। সেই মূলনীতিগুলোর উপর যত্নসহকারে আমল করলে দ্বীনী যিন্দেগী গঠন করা সহজ হয়ে যায়। তার মধ্যে একটা মূলনীতি হল কম কথা বলা, কম মেলামেশা করা। অর্থাৎ, অহেতুক কথা না বলা, অহেতুক মেলামেশা না করা। অহেতুক কথা-বার্তা এবং অহেতুক মেলামেশা থেকে বিরত থাকলে জীবনের অনেক সময় বেঁচে যাবে। সেই সময়কে জীবন গঠন করার কাজে ব্যয় করা যাবে।

যারা জীবন গঠন করেছেন, তারা সময়কে কাজে লাগিয়ে জীবন গঠন করেছেন। তারা জীবনের কোন একটা মুহূর্তও নষ্ট হতে দেননি। হযরত ইব্নে হাজার আসকালানী (রহ.) একজন অনেক বড় মুহাদ্দিছ ছিলেন। তিনি বোখারী শরীফের সব চেয়ে বিখ্যাত শরাহ রচনা করেছেন, যার নাম ফাতহুল বারী। তিনি জীবনের সময়কে কীভাবে কাজে লাগাতেন তার একটা অদ্ভুত বর্ণনা শুনুন। তিনি যখন কিতাব লিখতেন, তখনকার যুগে কঞ্চির কলম দিয়ে লেখা হত। লিখতে লিখতে কলমের মাথা ভোতা হয়ে গেলে চাকু দিয়ে আবার কলমের মাথা কেটে সাইজ করে নিতে হত। তিনি যখন এরকম কলমের মাথা কাটতে যেতেন, তখন মনে করতেন এই সময়টা আমার কোন কাজে লাগছে না, তাই কলমের মাথা কাটার সময় তিনি কালিমায়ে ছুওম অর্থাৎ, سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ পড়তে থাকতেন, যাতে এ সময়টুকুও বেকার না যায়। হযরত মুফতী শফী সাহেব (রহ.) বলতেন যখন আমি বাথরুমে এস্তেঞ্জা করতে যাই, তখন আমার মনে হয় ঐ সময়টুকু বেকার যাচ্ছে। তাই এস্তেঞ্জা করতে করতে ঐ সময়টুকুতে মানুষের খেদমতের নিয়তে লোটা পরিষ্কার করে থাকি, যাতে করে পরে যে ব্যক্তি এস্তেঞ্জা করতে আসবে সে যেন আরাম পায়।

সময়ের মূল্য দেয়া চাই। সময় থাকতে কাজ করে নেয়া চাই। সময় চলে গেলে পরে আফসোস করলেও আর সময় পাওয়া যাবে না। কবরবাসীরা আফসোস করবে যে, অন্তত দুই রাকআত নফল পড়ার সময়ও যদি পেতাম, তবুও অন্তত দুই রাকআত নফলের ছওয়াব আমল-নামায় যোগ হত। একবার হযরত ইব্নে ওমর (রা.) কোন এক সফরে ছিলেন। পথে একটা কবর দেখে তিনি সওয়ারী থেকে নামলেন। দুই রাকআত নফল পড়লেন। তারপর আবার চলতে শুরু করলেন। সফর সঙ্গীরা জিজ্ঞাসা করলেন হযরত! কী ব্যাপার, কবর দেখে দুই রাকআত নামায পড়লেন, তার কী কারণ? হযরত ইব্নে ওমর (রা.) বললেন কবর দেখে আমার মনে পড়ল এই কবরবাসীরা আফসোস করে যে, হায়রে অন্তত দুই রাকআত নামায পড়ার সময়ও যদি আরও পেতাম, তাহলে সেই দুই রাকআতের ছওয়াব আমলনামায় যোগ হত! কিন্তু তাদের এই আক্ষেপ সত্ত্বেও সেই সুযোগ আর জুটবে না। আমি ভাবলাম, এখনও আল্লাহ পাক আমাকে সুযোগ দিয়ে রেখেছেন। তাই সওয়ারী থেকে নেমে দুই রাকআত নফল পড়ে নিলাম।

অতএব সময় থাকতে এই সময়কে যতবেশি সম্ভব কাজে লাগানো চাই। আমরা সময়ের ব্যাপারে ধোকা খাই। মনে করি আজ নয় কাল করব। এখন নয় আগামীতে করব। এভাবে আগামীর চক্করে পড়ে এক সময় মৃত্যু এসে যায়। সময়কে আর কাজে লাগানো হয় না। সময় এবং সুস্থতা উভয়ের ব্যাপারে আমরা এরকম ধোকা খাই। তাই নবী কারীম (সা.) বলেছেন,

نِعْمَتَانِ مَغْبُوْنٌ فِيْهِمَا كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ اَلصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ. (صحيح البخاري ٦٤١٢)



অর্থাৎ, আল্লাহ্র বড় দুটো নেয়ামত রয়েছে, যে ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষ ধোকা খায়। সে দুটো নেয়ামত হল সুস্থতা ও অবসর।

আমরা অনেক সময় চিন্তা করি যে, আমল করা দরকার, আমল করতেই হবে, আমাকে তো মরতেই হবে, আল্লাহ্র কাছে হিসাব দিতে হবে, অতএব আমল করা ছাড়া কোন উপায় নেই। তবে এখন তো একটু অসুবিধার ভিতর আছি, এখন নানান ঝামেলায় আছি, আচ্ছা কয়দিন পরেই ভালমত আমল শুরু করা যাবে, সামনে ঠিকমত সব আমল শুরু করে দিব। এই বছরটা একটু ঝামেলায় আছি, হজ্জটা করতে পারলাম না, যাক আগামীতে করব। সব সময় তো আর ঝামেলা থাকবে না। আমরা ভাবি এখন টাকা-পয়সার অভাব আছে, একটু দান-সদকা কম করলাম, সামনে খুব দান-সদকা করব। ইদানিং শরীরটা একটু খারাপ, কদিন পর সুস্থ হয়ে যাব, তখন ঠিকমত আমল করব। এভাবে সব ব্যাপারেই আমরা আগামীর চক্করে পড়ে যাই। ভাবি এখন নয় আগামীতে করব। এই চক্কর থেকে কেউ কোনদিন উঠে আসতে পারবে না। এর মোকাবিলা করার উপায় হল এখনই যথাসাধ্য আমল শুরু করে দেয়া এবং একথা চিন্তা করা যে, সামনে ঝামেলা কমবে, সামনে অভাব কমবে, সামনে সুস্থতা বাড়বে –এগুলোর কোন নিশ্চয়তা নেই। বরং বাস্তবে দেখা যায়, যত দিন যায় ততই ঝামেলা বাড়ে, যত দিন যায় ততই টাকা-পয়সার প্রয়োজন বাড়ে, যত দিন যায় ততই রোগ-ব্যাধি বাড়ে। একটা হাদীছে রাসূল (সা.) তাই সুন্দর করে বলেছেন,

اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ- شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سُقْمِكَ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ. (رواه الحاكم في المستدرك برقم ٧٨٤٦ وقال صحيح على شرط الشيخين وأقره عليه الذهبي في التلخيص)

অর্থাৎ, পাঁচটা জিনিস আসার পূর্বে পাঁচটা জিনিসকে কাজে লাগাও, পাঁচটা অবস্থা আসার পূর্বে পাঁচটা অবস্থার মূল্যায়ন কর।

**এক নম্বর :** তোমার যৌবনকে কাজে লাগাও বার্ধক্য আসার পূর্বে। আমরা তো অনেকেই এই চক্করে আছি যে, বয়স হলে তখন করব, বুড়ো হলে তখন করব, এখন তো নানান ঝামেলা। সামনে ছেলে মেয়ে বিয়ে হয়ে যাবে, চাকুরি থেকে রিটায়ার্ড হয়ে যাব, তখন সারা দিন এই দ্বীন-ধর্ম আর মসজিদ-মাদ্রাসা নিয়েই পড়ে থাকব। মনে রাখতে হবে- বৃদ্ধ বয়সে খুব ভাল করে ইবাদত করা যায় না, সহীহ্ভাবে ইবাদত করা যায় না। এই মনে করুন নামাযের রুকু-সাজ্দাটাও ঠিকভাবে করা যাবে না। গিরায়-গিরায়, জোড়ায়-জোড়ায় ব্যথা দেখা দিবে। ফলে কোন ইবাদতই সহীহ্ভাবে করা সম্ভব হবে না। অতএব এখন শক্তি-সামর্থ আছে, এখন দৈহিক ক্ষমতা আছে, এখন যত সুন্দরভাবে ইবাদত করা যাবে, বার্ধক্যে সে রকম করা সম্ভব হবে না। তাই বার্ধক্য আসার আগে যৌবনকে কাজে লাগাতে বলা হয়েছে।

**দুই নম্বর :** অসুস্থতা আসার পূর্বে সুস্থতাকে কাজে লাগাও। দেখা যায় যত দিন যায়, ততই মানুষের নানান রকম রোগ-ব্যাধি দেখা দিতে থাকে। অতএব এখন যতটুকু সুস্থ আছ সেটাকে কাজে লাগাও সামনে অসুস্থতা বেড়ে যাওয়ার আগে।

**তিন নম্বর :** তোমার সচ্ছলতাকে কাজে লাগাও অভাব আসার পূর্বে। অর্থাৎ এখন যতটুকু ধন-সম্পদ আছে, সেটাকে দ্বীনের কাজে লাগাও সামনে তোমার অসচ্ছলতা আসার পূর্বে। অসচ্ছলতা আসে দুই ভাবে- এক হচ্ছে টাকা-পয়সা কমে যায়, দ্বিতীয় হচ্ছে ব্যয়ের ক্ষেত্র বেড়ে যায়। ব্যয়ের ক্ষেত্র বাড়লে

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.
Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

সেটাও এক ধরনের অভাব। যাহোক মানুষের জীবনে সাধারণভাবে বাবাস্তবতা হল– যত দিন যায় ততই অভাব বাড়ে বা ব্যয়ের ক্ষেত্র বাড়তে থাকে। এভাবে সামনে দিন-দিন অসচ্ছলতাই আসতে থাকে। কাজেই সামনে আমি বেশি দ্বীনের কাজে ব্যয় করতে পারব, এরকম মনে করা মুশকিল; বরং এখন যতটুকু আছে সেটাকেই কাজে লাগাও।

**চার নম্বর :** তোমার অবসরকে কাজে লাগাও, সামনে অবসর বেশি পাবে না; বরং সামনে দেখবে ব্যস্ততা আরও বাড়বে। এটাই মানুষের জীবনের বাস্তবতা, যত দিন যায় ব্যস্ততা ততই বাড়ে। তাই ব্যস্ততা আসার পূর্বে অবসরকে কাজে লাগাও।

**পাঁচ নম্বর :** রাসূল (সা.) বলেছেন, জীবনকে কাজে লাগাও মৃত্যু আসার পূর্বে। অর্থাৎ, তোমার মৃত্যু যেকোন সময় এসে যেতে পারে। এখন তোমার জীবন আছে, সামনে তোমার জীবন থাকা নিশ্চিত নয়। কাজেই এখন হায়াত আছে এটাকে কাজে লাগাও। মৃত্যু আসার পূর্বে হায়াতকে কাজে লাগাও।

এই হাদীছের ভিতর বোঝানো হয়েছে যে, আগামীতে করব, সামনে করব- এই চক্করে পড়বে না বরং এখনই কাজ শুরু করে দাও। সামনে নয় বরং যা করার এই মুহূর্তে করা শুরু করে দাও। উর্দূতে একটা প্রবাদ আছে,

آج کا کام کل پر نہ ڈال

অর্থাৎ, আজকের কাজ আগামীর জন্য ফেলে রেখ না।

যাহোক সময় মানুষের জীবনের একটা বড় নেয়ামত। অন্যান্য নেয়ামতের মত এই নেয়ামতেরও শোকর আদায় করা ওয়াজিব। এই নেয়ামতের শোকর আদায় হবে যদি আমরা সময়কে যথাযথ ভাবে কাজে লাগাই। আমাদের জীবন গঠন হবে, যদি আমরা সময়কে কাজে লাগাই। আল্লাহ পাক আমাদেরকে তাওফীক দান করুন। আমীন!

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



বয়ান নং ৪৯-এর খুতবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ وَصَلَ عِبَادَهٗ بِنِعَمِهٖ وَلَطَائِفِهٖ، وَقَسَّمَ نِعَمَهٗ وَلَطَائِفَهٗ عَلٰى حَسْبِ حُكْمِهٖ وَحِكْمَتِهٖ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ قَدَّرَ الْاَشْيَاءَ بِقُدْرَتِهٖ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ الَّذِىْ اِمْتَنَّ بِهٖ عَلٰى بَرِيَّتِهٖ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ شَاكِرِىْ نِعْمَةِ اللّٰهِ وَخَائِفِىْ نِقْمَتِهٖ.

اَمَّا بَعْدُ :

اَيُّهَا النَّاسُ! اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَسَّمَ عَلٰى عِبَادِهٖ نِعَمَهٗ، وَاَوْجَبَ عَلَيْهِمْ شُكْرَهٗ، فَاشْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ، وَمَا سَاقَهٗ مِنَ الْجُوْدِ اِلَيْكُمْ. وَاِنَّ نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلٰى عِبَادِهٖ كَثِيْرَةٌ لَا تُعَدُّ وَلَا تُحْصٰى. قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا. وَقَالَ تَعَالٰى : وَلَوْ اَنَّ مَا فِى الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَّالْبَحْرُ يَمُدُّهٗ مِنْ بَعْدِهٖ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللّٰهِ.

عِبَادَ اللّٰهِ! وَمِنْ نِعَمِ اللّٰهِ الْعَظِيْمَةِ الْوَقْتُ وَالسَّاعَةُ. وَلٰكِنَّ النَّاسَ يُضَيِّعُوْنَ اَوْقَاتَهُمْ فِى الْهَفَوَاتِ، غَفْلَةً عَنِ الطَّاعَاتِ، فَيَا مُضَيِّعَ الْاَوْقَاتِ! لَوْ عَلِمْتَ نَفَاسَتَهَا مَا اَضَعْتَهَا، وَيَا مُتَّبِعَ الْهَفَوَاتِ! لَوْ عَرَفْتَ رَجَاسَتَهَا مَا اتَّبَعْتَهَا. فَاِلٰى مَتٰى هٰذِهِ الْغَفْلَةُ عَنِ الْعَمَلِ وَمَتٰى تَنْتَبِهُوْنَ؟ اَمَا بِسُرْعَةِ ذَهَابِ الْاَيَّامِ تَعْتَبِرُوْنَ؟ اَمَا بِكَثْرَةِ الْمَوَاعِظِ وَالْعِبَرِ تَنْزَجِرُوْنَ؟ اَمَا بِاِدْبَارِ الْاَشْهُرِ وَاِقْبَالِهَا تَتَّعِظُوْنَ؟ عِبَادَ اللّٰهِ! هَلِ الْاَعْمَارُ اِلَّا اَعْوَامٌ؟ وَهَلِ الْاَعْوَامُ اِلَّا اَيَّامٌ؟ وَهَلِ الْاَيَّامُ اِلَّا اَنْفَاسٌ تُحْصِيْهَا الْمَلَائِكَةُ الْكِرَامُ؟ وَاِنَّ عُمُرًا يَنْقَضِىْ مَعَ الْاَنْفَاسِ لَسَرِيْعُ الْاِنْصِرَامِ. قَالَ الشَّاعِرُ :

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

حَيَاتُكَ اَنْفَاسٌ تُعَدُّ فَكُلَّمَا ÷ مَضٰى نَفَسٌ مِنْهَا اِنْقَضَتْ بِهٖ جُزْءً

فَحَقِيْقٌ اَنْ يَّغْتَنِمَ الْاِنْسَانُ بِالطَّاعَاتِ اَوْقَاتَهٗ، وَيُبَادِرُ الْاَعْمَالَ الصَّالِحَةَ سَاعَاتِهٖ، وَيَهْتَمُّوْا بِاِعْدَادِ الزَّادِ لِغَايَاتِهٖ، وَخَابَ مَنْ ضَيَّعَ اللَّيَالِيَ وَالْاَيَّامَ، وَانْسَلَخَتْ عَنْهُ اَوْقَاتُهٗ بِقَبَائِحِ الذُّنُوْبِ وَالْاٰثَامِ. وَتَذَكَّرُوْا مَا يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ تَهْدِيْدًا لِمَنْ ضَيَّعَ اَوْقَاتَ عُمُرِهٖ : اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ. فَلَا تُضِيْعُوْا اَوْقَاتَ حَيَاتِكُمْ، وَلَا تَغْبَنُوْا فِيْهَا. قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : نِعْمَتَانِ مَغْبُوْنٌ فِيْهِمَا كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ، اَلصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ. وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ- شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سُقْمِكَ، وَغِنَائَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُ مُرْسَلًا.

اَيُّهَا الْعِبَادُ! وَلَا تُضَيِّعُوْا اَوْقَاتَكُمْ فِيْ كَثْرَةِ الْكَلَامِ وَفِيْمَا لَا يَعْنِيْ. فَاِنَّ مَنْ كَثُرَ كَلَامُهٗ كَثُرَ سَقَطُهٗ، وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : مِنْ حُسْنِ اِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهٗ مَا لَا يَعْنِيْهِ.

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ : وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ، اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.

بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ، وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. اَقُوْلُ قَوْلِيْ هٰذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَاسْتَغْفِرُوْهُ، اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



বয়ান নং -৫০

## ইল্‌ম ও তাসহীহে নিয়্যত প্রসঙ্গ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ! : فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ. وَقَالَ تَعَالٰى : يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ.

মুসল্লিয়ানে কেরাম!

শরীআতে যত ধরনের আমল রয়েছে এবং প্রত্যেক আমলের যত ফযীলত রয়েছে সেইসব আমল সহীহ করার জন্য এবং সেই সমস্ত ফযীলত অর্জন করার জন্য মৌলিকভাবে আমাদের দুইটা কাজ করণীয়। প্রথম কাজ হল ইল্‌ম বা জ্ঞান অর্জন করা। অর্থাৎ প্রত্যেকটা আমল কীভাবে করতে হবে, তার নিয়ম কানূন, মাসআলা-মাসায়েল শিক্ষা করা। আর দ্বিতীয় কাজ হল তাসহীহে নিয়ত অর্থাৎ, নিয়ত সহীত করা।

নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, দান-সদকা, কুরআন তেলাওয়াত, উযূ, গোসল, এ'তেকাফ, কুরবানী, যিকির-আযকার ইত্যাদি যাবতীয় আমলের জন্য ইল্‌ম এবং তাসহীহে নিয়ত হল বুনিয়াদী বিষয়। ইল্‌ম না থাকলে অর্থাৎ, নিয়ম-পদ্ধতি, মাসআলা-মাসায়েল জানা না থাকলে কোন আমল সহীহ-শুদ্ধ হয় না। আর আমল সহীহ-শুদ্ধ না হলে তার ফযীলতও পাওয়া যায় না। এমনিভাবে নিয়ত সহীহ না থাকলে আল্লাহর কাছে আমল কবূল হয় না এবং তার ছওয়াবও পাওয়া যায় না। তাই ইল্‌ম অর্জন করতে হবে এবং প্রত্যেকটা আমল সহীহ নিয়তে করতে হবে। অনেক আমল করলাম কিন্তু নিয়ত সহীহ নেই, তাহলে কোন আমলের কোন ছওয়াব পাওয়া যাবে না। অনেক কিছু করা সত্ত্বেও আমার ভাণ্ডারে কিছুই পড়বে না। সহীহ নিয়ত বা ইখলাসকে তাই বলা হয় আমলের রূহ। রূহ ছাড়া অর্থাৎ, প্রাণ ছাড়া একটা দেহের যেমন কোন মূল্য থাকে না, সহীহ্ নিয়ত বা ইখলাস ছাড়াও কোন আমলের কোন মূল্য থাকে না। সহীহ নিয়ত বা ইখলাস তাই ফরয, আল্লাহ পাক কুরআনে কারীমে বলেছেন,

وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ. (সূরা বাইয়্যিনাহ)

অর্থাৎ, মানুষকে যে ইবাদতের হুকুম দেয়া হয়েছে, তা ইখলাসের সাথে অর্থাৎ সহীহ নিয়তের সাথে করার হুকুম দেয়া হয়েছে। সহীহ নিয়ত না হলে সেটা ইবাদত বলে গণ্য হবে না, সেটার কোন ছওয়াব পাওয়া যাবে না। তাই প্রত্যেকটা আমলের নিয়ত সহীহ হতে হবে। কোন্ আমল কী নিয়তে করতে হয়, সেটাও আমাকে জানতে হবে। নিয়ত সহীহ্ভাবে করতে পারার স্বার্থেই সেটা জানতে হবে। আর প্রত্যেকটা আমল কীভাবে করতে হবে, তার ইল্‌মও অর্জন করতে হবে। এই ইল্‌ম অর্জন করাও ফরয। হাদীছে ইরশাদ হয়েছে,

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ. (سنن ابن ماجة برقم ٢٢٤ والحديث حسن بتعدد طرقه)

অর্থাৎ, সমস্ত মুসলমানের উপরে ইল্‌ম শিক্ষা করা ফরয।

কী পরিমাণ ইল্‌ম শিক্ষা করা ফরয? যিন্দেগীর সবকিছু চালানোর জন্য যা যা জানা দরকার তা জানা ফরয। জীবনে যত আমল করা দরকার, প্রত্যেকটা কীভাবে করতে হবে, তা জানা ফরয। নামায, রোযা,

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

হজ্জ, যাকাত এগুলো আমাকে আমল করতেই হয়। এগুলোর মাসআলা-মাসায়েল এবং নিয়ম-তরীকা জানা ফরয। ঘর-সংসার সকলকেই চালাতে হয়, ছেলে-মেয়ে সকলকেই লালন-পালন করতে হয়, পরিবার সকলকেই চালাতে হয়, চাকুরি বা ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা ক্ষেত-খামার সকলকেই করতে হয়, ক্রয়-বিক্রয় প্রায় সকলকেই করতে হয়, যানবাহনে সকলকেই চলতে হয়, আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ-খবর সকলকেই নিতে হয়। এ বিষয়গুলো এমন, যা প্রত্যেককেই করতে হয়। তাই এসব বিষয়ের প্রত্যেকটার মাসআলা-মাসায়েল এবং নিয়ম-পদ্ধতি জানা সকলের উপর ফরয। এটাকে বলা হয় ফর্‌যে আইন, অর্থাৎ যা জানা প্রত্যেকের উপর ফরয। এগুলো কেউ জানবে কেউ জানবে না, তাহলে হবে না।

হ্যাঁ কিছু বিষয় এমন আছে, যেগুলোর জ্ঞান সকলের না থাকলেও চলে। যেমন এক ব্যক্তি রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে নেই, তার জন্য রাষ্ট্র পরিচালনার নিয়ম-নীতি জানা ফরয নয়। তবে কিছু লোক অবশ্যই এমন থাকতে হবে, যারা যেকোন বিষয়ের সমাধান দেয়ার মত জ্ঞান রাখে। যাতে করে যারা সেটা জানে না, তারা সেটা জানার জন্য তাদের কাছে যেতে পারে। অর্থাৎ, সমাজে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিজ্ঞ আলেম থাকা ফরয, যারা সব বিষয়ের ইসলামী সমাধান দিতে পারবেন। এই পর্যায়ের ইল্‌ম অর্জন করা ফর্‌যে কেফায়া। অর্থাৎ, এই পর্যায়ের ইল্‌ম রাখা সকলের উপর ফরয নয়; বরং প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোক এমন থাকলেই চলে। কিন্তু আমার জীবনে যা কিছু আমাকে করতে হয়, সেই সবকিছুর ইল্‌ম রাখা আমার উপর ফর্‌যে আইন। খাওয়া-দাওয়া, আহার নিদ্রা, পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করা, এমনকি জুতা পরিধান করা সম্পর্কেও নিয়ম ও মাসআলা- মাসায়েল শিক্ষা করা জরুরী। এভাবে ইল্‌ম শিক্ষা করাকে ফরয করে দেয়া হয়েছে। কারণ প্রয়োজনীয় বিষয়ের ইল্‌ম না থাকলে সে বিষয়ের আমলই সহীহ হবে না। ইল্‌ম না থাকলে আমল সহীহ হয় না। সেই সাথে সাথে নিয়ত সহীহ না থাকলে আমলের ছওয়াব পাওয়া যায় না। আমি খুব জানলাম, সব কিছু সহীহ তরীকা অনুযায়ী করলাম, কিন্তু নিয়ত সহীহ্ নয়, তাহলে আমল তো সহীহ হবে, কিন্তু নিয়ত সহীহ না হওয়ার করণে তার ছওয়াব পাওয়া যাবে না। তাই আমলের ক্ষেত্রে ইল্‌ম এবং সহীহ নিয়ত উভয়েরই খুব গুরুত্ব।

নিয়ত সহীহ্ করার চেয়ে ইল্‌ম শিক্ষা করা বেশি কঠিন, কারণ ইল্‌ম অর্জন করতে সময় দিতে হয়, অনেক পরিশ্রম করতে হয়। এজন্য ইল্‌ম শিক্ষা করার ফযীলতও অনেক বেশি রাখা হয়েছে। ইল্‌মের ফযীলত বেশি হওয়ার আরও একটি কারণ হল ইল্‌ম হচ্ছে আমলের বুনিয়াদ। বুনিয়াদ বা ফাউণ্ডেশন ঠিক না হলে যেমন বিল্ডিং ঠিক হয় না, তদ্রূপ ইল্‌ম ঠিকমত না হলে আমলের স্ট্রাকচার ঠিক হয় না। কোন একজন মানুষ যদি অনেক টাকা-পয়সা খরচ করে একটা বিল্ডিং তৈরি করে, কিন্তু বিল্ডিং কীভাবে তৈরি করতে হয় এরকম জানা লোক দিয়ে তৈরি না করে, আনাড়ি লোক দিয়ে তৈরি করে। ফলে যেভাবে সিমেন্ট বালু মিশাতে হয় সেভাবে ঠিক মত মেশানো হল না। যেভাবে লেভেল ঠিক করে ইট গেঁথে দেয়াল উঠাতে হয় সেভাবে করা হল না, যেভাবে রড, ভিম ইত্যাদি সেট করতে হয় সেভাবে করা হল না। তাহলে সেই বিল্ডিং ভেঙ্গে পড়বে, সেই বিল্ডিংয়ের কোন মূল্য নেই। একজন বিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার দেখলেও বলবে এই বিল্ডিং এর পাঁচ পয়সাও দাম নেই। কেউ সেই বিল্ডিং ক্রয় করবে না। কারণ সেই বিল্ডিং মাসায়েল অনুযায়ী তৈরি হয়নি। বিল্ডিং তৈরি করার মাসায়েল ছাড়াই সেই বিল্ডিং তৈরি করা হয়েছে। তাই সেই বিল্ডিংয়ের পেছনে যত টাকা-পয়সাই খরচ করা হোক না কেন, যত মেহনত শ্রম ব্যয় করা হোক না কেন, সেই বিল্ডিংয়ের কোন মূল্য নেই। বরং সেটা বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। যেটা হতে পারত আরামের উপকরণ, নিয়ম-নীতি অনুযায়ী না হওয়ার ফলে সেটাই হয়ে দাঁড়াবে

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

www.maktabatulabrar.com



বিপদের কারণ। এমনিভাবে কেউ যদি কোন ঔষধ তৈরি করে, কিন্তু যে যে উপাদান দিয়ে সেই ঔষধ তৈরি করা দরকার ছিল, যে যে উপাদান যে পরিমাণ দেয়া দরকার ছিল, সেভাবে যদি দেয়া না হয়, তাহলে যে ঔষধ জীবন রক্ষার উপকরণ হওয়ার কথা, সেটা নিয়ম নীতি অনুযায়ী না হওয়ার ফলে হয়ে দাঁড়াবে জীবন যাওয়ার কারণ। আমলের অবস্থাও তদ্রূপ। সহীহ তরীকা অনুযায়ী করলে যে আমল ছওয়াব বয়ে আনবে, সহীহ শুদ্ধভাবে মাসায়েল অনুযায়ী না হলে সেটাই বয়ে আনবে পাপ। যেমন এক হাদীছে বলা হয়েছে,

رُبَّ تَالٍ لِلْقُرْاٰنِ وَالْقُرْاٰنُ يَلْعَنُهُ. (التبيان في اداب حملة القران)

অর্থাৎ, অনেক কুরআন তেলাওয়াতকারী এমন আছে কুরআন যাদেরকে অভিশাপ দেয়।

এখানে বোঝানো হয়েছে যারা কুরআন শরীফ সহীহ-শুদ্ধ পড়ে না বরং গলত পড়ে, কুরআন তাদেরকে অভিশাপ দেয়। কুরআন তেলাওয়াত তাদের জন্য রহমতের পরিবর্তে আযাবের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সহীহ্-শুদ্ধভাবে তেলাওয়াত না করার কারণেই এরকম উল্টো হয়ে দাঁড়ায়। গলত পড়ার কারণে এত পার্থক্য হয়ে যায়। এ জন্যই গলত পড়লে নামাযও ফাসেদ হয়ে যায়। ইমাম সাহেবের কিরাত যদি সহীহ না হয়, তাহলে তার নিজের নামাযও ফাসেদ হয়, অন্য মুসল্লিদের নামাযও ফাসেদ হয়ে যায়। প্রত্যেকটা আমলের অবস্থাই এরকম। সহীহ তারীকা অনুযায়ী এবং মাসায়েল অনুযায়ী না হলে কোন আমলের ছওয়াব হয় না বরং গোনাহ হয়। তাই ইল্‌ম শিক্ষা করা অর্থাৎ, দ্বীনের সবকিছুর তরীকা জানা এবং সবকিছুর মাসআলা-মাসায়েল শিক্ষা করাকে ফরয করে দেয়া হয়েছে। যেহেতু সেটা আমলের বুনিয়াদ।

ইল্‌ম যেহেতু আমলের বুনিয়াদ এবং ইল্‌ম শিক্ষা করতে মেহনতও হয়, তাই ইল্‌ম শিক্ষা করার ছওয়াবও অনেক বেশি। নফল ইবাদতের চেয়ে ইল্‌ম শিক্ষা করার ফজীলত বেশি। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) এবং হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হাদীছ বয়ান করেছেন যে, মাসায়েলের একটা অধ্যায় শিক্ষা করা, দ্বীনী ইলমের একটা অধ্যায় শিক্ষা করা এক হাজার রাকআত নফল নামায পড়ার চেয়েও বেশি ফযীলত রাখে। এক হাজার রাকআত নফল নামাযে যে ছওয়াব, একটা বিষয়ের মাসায়েল শিক্ষা করায় তার চেয়ে বেশি ছওয়াব। যিনি শিখলেন তার এই ছওয়াব, যিনি শিখাবেন তারও ছওয়াব। তবে তার ছওয়াব একটু কম। যিনি একটা অধ্যায় শিখাবেন তিনি ছওয়াব পাবেন একশত রাকআত নফল নামাযের। আর যিনি শিখবেন তিনি পাবেন এক হাজার রাকআত নফল নামযের ছওয়াব। কারণ একজনকে শিখালে আমল নিজের মধ্যে নাও আসতে পারে। কিন্তু যিনি শিখছেন তিনি তো আমল করার জন্যই শিখছেন, আর মূলত ইল্‌মের ফযীলত আমলেরই কারণে। এক হাদীছে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) ইল্‌মের ফযীলত বয়ান করে বলেছেন,

مَجْلِسُ فِقْهٍ خَيْرٌ مِّنْ عِبَادَةِ سِتِّيْنَ سَنَةً. (جامع الأحاديث للسيوطي برقم ١٧٠٧٤ والإسناد ضعيف)

অর্থাৎ, দ্বীনী মাসআলা-মাসায়েল এবং দ্বীনী কথা শিখার একটা মজলিস ৬০ বছর নফল ইবাদত করার চেয়েও বেশি ফযীলত রাখে।

সুবহানাল্লাহ! ইল্‌ম শিখার একটা মজলিসকে ৬০ বছর নফল ইবাদত করার চেয়েও বেশি ফযীলতপূর্ণ রাখা হয়েছে। কারণ ইল্‌ম ছাড়া ইবাদত হলে ৬০ বছর কেন ৬০ হাজার বছর করলেও তাতে কোন ফযীলত নেই। কারণ সেই ইবাদতের কোন্ বেনিফিট পাওয়া যাবে না। গলদ আমলের কোন মূল্য নেই।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

তবে ইল্‌ম শুধু শিখলে হবে না, আমলও থাকতে হবে। নতুবা ঐ ইল্‌মেরও কোন দাম থাকবে না। ইল্‌ম শেখার এত ফযীলত তো এজন্যই যে, সেই অনুযায়ী ইবাদত করা হবে, সেই অনুযায়ী আমল করা হবে। ইল্‌ম অনুযায়ী আমল না করলে সেই ইল্‌মের কোন ফযীলত থাকে না। যাদের ইল্‌ম আছে আমল নেই তাদের উদাহরণ দিয়ে কুরআন শরীফে বলা হয়েছে,

كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا.

অর্থাৎ, তারা হল ঐ গাধার মত যাদের পিঠে এক বোঝা কিতাব রয়েছে। (জুমুআ: ৫)

অতএব ইল্‌ম শিখে আমল করা উদ্দেশ্য। ইল্‌ম ছাড়া ইবাদত আর ইল্‌মসহ ইবাদত এদুটের মধ্যে এত পার্থক্য যে, এক হাদীছে রাসূল (সা.) বলেছেন,

فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِيْ عَلٰى اَدْنَاكُمْ. (رواه الترمذي برقم ٢٦٨٥ وقال : حسن صحيح)

অর্থাৎ, একজন মানুষ ইল্‌ম ছাড়া ইবাদত করে, অর্থাৎ, মাসআলা-মাসায়েল তরীকা পদ্ধতি না জেনে ইবাদত করে, আরেকজন মাসআলা-মাসায়েল জেনে ইল্‌ম সহকারে ইবাদত করে এই দুই জনের মধ্যে প্রথম জনের চেয়ে দ্বিতীয় জনের ফযীলত এত বেশি- যেমন আমার উম্মতের মধ্যে সর্ব নিম্ন ব্যক্তির চেয়ে আমার ফযীলত বেশি। সোবহানাল্লাহ!

তাই ইল্‌ম সহকারে জেনে আমল করা, আর না জেনে ইল্‌ম ছাড়া আমল করা এ দুটোর মধ্যে ছওয়াবের কোন তুলনাই হয় না। আমরা নামায পড়ি, রোযা রাখি, হজ্জ করি, যাকাত দেই এবং অন্যান্য যত দ্বীনী কাজ করি, এসব আমল করার জযবা তো আমাদের মধ্যে আসে, কিন্তু ইল্‌ম অর্জন করার জযবা আসে না। ইবাদত করার গুরুত্ব আমাদের মনে জাগে, কিন্তু সেই ইবাদত সম্পর্কে ইল্‌ম অর্জন করা এবং তার মাসআলা-মাসায়েল জানার গুরুত্ব মনে জাগে না। এজন্যই আমরা অনেকে ইবাদতকারী হতে চাই, কিন্তু আলেম হতে চাই না। নিজেদের সন্তানকে ইবাদতকারী বানাতে চাই, কিন্তু আলেম বানাতে চাই না। অথচ একজন নিরেট ইবাদত কারীর চেয়ে একজন আলেমের ফযীলত এত বেশি এত বেশি যে, একজন নিরেট ইবাদতকারী ইবাদত করতে করতে ক্লান্ত হয়ে তারপরে ঘুমাবে, সে যতক্ষণ ইবাদত করবে, শুধু ততক্ষণ ইবাদতের ছওয়াব পাবে। আর একজন আলেম ইবাদত করে যখন ঘুমাবে, সেই ঘুমের সময়টুকুও সে ইবাদতের ছওয়াব পেতে থাকবে। আলেমের ঘুমও ইবাদত।

আল্লাহর কছে আলেমের মর্যাদা অনেক বেশি। কুরআনে কারীমে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন,

يَرْفَعُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ. (المجادلة : ١١)

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা ঈমানদার আলেমের মর্যাদা অনেক উঁচু করে দেন। কত উঁচু করে দেন আল্লাহ পাক সেটা বলেননি। হতে পারে তাঁদের মর্যাদা এত উঁচু করে দেন যা আমাদের কল্পনায়ও আসবে না, তাই সীমানা নির্ধারণ না করেই বলা হয়েছে অনেক উঁচু করে দেন। এই ইল্‌মের কারণেই তো যারা আলেম কিয়ামতের দিন তাদেরকে সুপারিশ করার ক্ষমতা দেয়া হবে। যে পাপী মুসলমানরা আল্লাহর নাফরমানী করার কারণে জাহান্নামে যাওয়ার উপযুক্ত সাব্যস্ত হবে, তাদের ব্যাপারে আলেম ব্যক্তি সুপারিশ করবেন। আল্লাহ পাক তাঁর সুপারিশে ঐ পাপীদের জন্য নাজাতের ফয়সালা করে দিবেন। আল্লাহর কাছে আলেমের মর্যাদা থাকবে বলেই তার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। আল্লাহর কাছে আলেমের মর্যাদা কীসের কারণে? তার ইল্‌মের কারণে। কুরআন-হাদীছের ইল্‌মের কারণে।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



কুরআন-হাদীছের ইল্‌মের এত মর্যাদা থাকা সত্ত্বেও আমরা এই ইল্‌ম শিখার ব্যাপারে উদাসীন। মাসআলা-মাসায়েল শিখার এত গুরুত্ব এবং ফযীলত থাকা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে আমরা উদাসীন। সারা জীবন নামায পড়েই যাচ্ছি, কিন্তু নামাযের মাসআলা-মাসায়েলের কোন খবর নেই। শুধু নামায নয় প্রত্যেকটা বিষয়ের মাসায়েল জেনে জেনে আমল করতে হবে। নতুবা এক সময় বুঝে আসবে যে, সারা যিন্দেগীর মেহনত মোজাহাদা বেকার সাব্যস্ত হয়েছে।

যাহোক ইল্‌মের ফযীলত এবং উলামায়ে কেরামের ফযীলত সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছিল। আলেমের মর্তবা বেশি হওয়ার আরেকটা কারণ হল আলেম নিজে ইল্‌ম শিখে অন্য মানুষকে ইল্‌ম শিক্ষা দেয়। যত মানুষ তাদের থেকে ইল্‌ম শিখবে এবং শেখার কারণে যত মানুষের মধ্যে আমল আসবে এবং তাদের আমল সহীহ্ হবে, তত আমলের সমপরিমাণ ছওয়াব ঐ আলেমেরও হতে থাকবে। আমি আমার সন্তানকে যদি আলেম বানাই, তাহলে সেই পরিমাণ ছওয়াব আমারও হতে থাকবে।

আমরা নিজেদের সন্তানকে আলেম বানাতে চাই না, তাদেরকে কুরআন-হাদীছের শিক্ষায় শিক্ষিত করতে চাই না। কারণ আমাদের মনে আলেমদের মর্যাদা নেই। আমাদের কাছে আলেমদের মূল্যায়ন নেই। ইল্‌মের ফজীলত সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস নেই। এই ইল্‌ম যে ফযীলতপূর্ণ ইল্‌ম, এই লাইনের শিক্ষা যে মর্যাদার শিক্ষা, এই সমঝ আমাদের ভিতরে নেই। নতুবা আলেদেরকে আমরা ছোট মনে করতে পারতাম না। আমাদের সন্তানদেরকে দ্বীনী লাইনের শিক্ষায় শিক্ষিত করা হেয় মনে করতাম না।

আলেমদেরকে হেয় জানা ধর্মীয় জীবনের জন্য অনেক ক্ষতিকর। বিধর্মীরা সব সময় সমাজে আলেমদেরকে হেয় করে তুলতে চেষ্টা করে। কারণ আলেমদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করে তুলতে পারলে সমাজের মানুষকে তাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তোলা সহজ হবে এবং আলেমদের থেকে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করা সহজ হবে। আর আলেমদের থেকে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করতে পারলে তাদেরকে ধর্মের বিরুদ্ধে যেকোন মন্ত্র গেলানো সহজ হবে, যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে তাদেরকে ধর্মবিরোধী করে গড়ে তোলা সহজ হবে। এজন্য বিধর্মীরা সব সময় চেষ্টা চালায় কীভাবে আলেমদেরকে সমাজে হেয় করে তোলা যায়। এই চেষ্টারই একটা অংশ হিসেবে এক শ্রেণির লোক পরিকল্পিতভাবে সব সময় আলেমদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের ব্যাপারে মুসলমানদের সাবধান থাকা চাই। আলেম সমাজের ব্যাপারে কোন অপপ্রচারে মুসলমানদের কর্ণপাত করা উচিত নয়।

কেউ কেউ বলেন আলেমদের এই দোষ, সেই দোষ, কীভাবে তাদের প্রতি ভক্তি রাখব? কিন্তু মনে রাখতে হবে আলেমগণ ফিরিশতা বা নবী নন। তাঁরাও সাধারণ রক্ত মাংসের মানুষ। অতএব তাঁদেরও ভুল-ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। তাঁরা যদি বাস্তবেই কোন ভুল বা অন্যায় করেন, তাহলে সেটার অনুসরণ না করা চাই, তবে সেই সব ভুল-ত্রুটির কারণে তাঁদের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হওয়া যাবে না। তাঁদের প্রতি সম্পূর্ণ ভক্তি হারিয়ে ফেলা উচিত হবে না। তাঁদের সমালোচনায় লিপ্ত হওয়া ঠিক হবে না। বাস্তবে তাঁদের কোন ভুল-বিচ্যুতি থাকলে তাঁদের সমপর্যায়ের বা তাঁদের চেয়ে বড় আলেম মুরব্বী যারা আছেন তাঁরা সেটা সংশোধন করে দেয়ার চেষ্টা করবেন। সাধারণ মানুষদের উচিত হবে তাঁদের সমালোচনায় লিপ্ত না হওয়া। বরং তাঁদের জন্য দুআ করা চাই আল্লাহ যেন তাঁদেরকে সেই ভুল-ত্রুটি থেকে ফিরিয়ে আনেন। রাসূল (সা.) হাদীছে এ কথাই ইরশাদ করেছেন,

اِتَّقُوْا زَلَّةَ الْعَالِمِ وَلَا تَقْطَعُوْهُ وَانْتَظِرُوْا فَيْئَتَهُ. (مسند الفردوس الديلمى جـ/١ صـ/٩٥ وكنز العمال حديث رقم ٢٨٦٨٢)

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

অর্থাৎ, তোমরা আলেমের ভুল-বিচ্যুতি থেকে বেঁচে থাক, তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ো না এবং তাদের সেই ভুল-বিচ্যুতি থেকে ফিরে আসার অপেক্ষায় থাক।[১]

যাহোক কুরআন-হাদীছের শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের অমর্যাদা করা চাই না। তাঁদের অব মূল্যায়ন করা চাই না। তাঁদেরকে ছোট মনে করা চাই না। তাঁদেরকে হেয় মনে করা চাই না। তাঁদের প্রতি এই হেয় দৃষ্টি থাকার কারণেই আমরা নিজেরা আলেম হতে পছন্দ করি না। নিজেদের সন্তানদেরকে আলেম বানাতে চাই না। আমরা সন্তানকে ইঞ্জিনিয়ার বানাব, ডাক্তার বানাব, বিজ্ঞানী বানাব- সেটাকে নিজেদের জন্য গর্বের বিষয় মনে করি, মর্যাদার বিষয় মনে করি, কিন্তু আমাদের সন্তানকে আলেম বানাব, দ্বীনী লাইনের শিক্ষায় শিক্ষিত করব, সেটাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করি না, সেটাকে সম্মানের বিষয় মনে করি না। আমরা সন্তানকে ডাক্তার বানাব, ইঞ্জিনিয়ার বানাব, বিজ্ঞানী বানাব, তা নিষেধ নয়। দুনিয়াবী লাইনের এসব শিক্ষা গ্রহণ করা হারাম বা নাজায়েয তো নয়, যদি নিয়ত সহীহ্ থাকে তাহলে এসব শিক্ষা গ্রহণ করাও ঠিক আছে। যদি নিয়ত সহীহ্ থাকে যে, এসব শিক্ষা গ্রহণ করে এর দ্বারা মানুষের সেবা করব, এর ওছীলায় আল্লাহ পাক আমাদের হালাল রিযিকের ব্যবস্থাও করে দিবেন, এরকম নিয়ত থাকলে এসব বিদ্যা গ্রহণ করাও জায়েয। কিন্তু যদি গলত নিয়ত থাকে যে, এই সব ডিগ্রি অর্জন করলে সরকারী চাকুরি পাব, সুদ-ঘুষের মাধ্যমে অনেক টাকা-পয়সা অর্জন করতে পারব, তার দ্বারা গাড়ি-বাড়ি অনেক কিছু করতে পারব, অনেক আরাম-আয়েশে চলতে পারব, ইঞ্জিনিয়ার হয়ে মানুষকে ফাঁকি দিয়ে অনেক টাকা-পয়সার লাইন করতে পারব। এরকম গলদ নিয়ত থাকলে এসব বিদ্যা শিক্ষা করা গোনাহের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। কারণ এইসব জ্ঞানকে আমরা গোনাহের কাজে লাগাচ্ছি। তাই তা গোনাহের কারণ হবে। এমনিতে কুরআন-হাদীছের ইল্‌ম ছাড়া অন্য কোন জ্ঞানের ফযীলত নেই। অন্য কোন জ্ঞানের নিজস্ব কোন ফযীলত নেই, তবে ভাল নিয়ত থাকলে অর্থাৎ তার মাধ্যমে অন্য কোন ভাল কাজের নিয়ত থাকলে, অন্য কোন ভাল কাজের ওছীলা বানালে সেটাও ছওয়াবের হতে পারে। কাজেই দুনিয়াবী লাইনের এসব বিদ্যা শিক্ষা করতে হলে নিয়ত সহীহ করে নিতে হবে। আর কুরআন-হাদীছের ইল্‌ম এমনিতেই অনেক ফযীলতের ইল্‌ম। অন্য কোন নেক কাজের মাধ্যম বানানোর নিয়ত ছাড়াও সেটা ফযীলতের ইল্‌ম। তাছাড়া কুরআন-হাদীছের জ্ঞান শিক্ষা করাকে ফরয করা হয়েছে।

এই ফরয পরিমাণ ইল্‌ম নিজেও শিক্ষা করা ফরয। সন্তানাদি এবং পরিবারকেও শিখানো ফরয। সন্তানাদি এবং পরিবারকে শিখানোর জন্য ঘরে নিয়মিত তা'লীমের ব্যবস্থা করা চাই। তা'লীম দুভাবে হতে পারে। এক হল আমরা পুরুষ গার্ডিয়ানরা নির্ভরযোগ্য উলামায়ে কেরাম থেকে শুনে বা নির্ভরযোগ্য কিতাব পড়ে যা শিখব, সেটাই মৌখিকভাবে বলে তাদেরকে শিখাব। আমরা যেসব মাসআলা-মাসায়েলের কথা এবং দ্বীনী ওয়াজ-নসীহত শুনে যাব, ঘরে যেয়ে তাদেরকে সেগুলো শোনাব। আর এক হল ঘরে কিতাব পড়ে তা'লীম করা। ঘরে কিতাব তা'লীম করার জন্য হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) কর্তৃক রচিত তালীমুদ্দীন কিতাবখানা উপযুক্ত কিতাব। আহকামুন্নিছা কিতাবখানাও মহিলাদের তা'লীমের জন্য উপযুক্ত কিতাব। মাসায়েলের জন্য আহকামে যিন্দেগী বা বেহেশতী জেওর এবং ফাযায়েলের জন্য ফাযায়েলে আমাল বা ফাযায়েলে যিন্দেগী কিতাবসমূহ উপযুক্ত।

১. এ হাদীছটি সনদের দিক থেকে ضعيف হলেও অর্থগতভাবে উম্মত এটাকে গ্রহণ করেছেন। اصلاحی خطبات মুফতী তাকী উছমানী, ৮ খণ্ড, ২৩৩ পৃষ্ঠা ॥

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



ঘরে প্রতিদিন একটা সময় নির্দিষ্ট করে সেই সময়ে ঘরের সকলকে নিয়ে এসব কিতাব পড়ে কিছু সময় তালীম করা চাই। রাসূল (সা.) প্রতিদিন ঘরে দ্বীনী নসীহতের মজলিস তথা দ্বীনী তা'লীমের মজলিস করতেন।

আমরা অনেকে বিবি-বাচ্চাদেরকে নিয়ে তা'লীম করতে শরমবোধ করি। অথচ এটা শরমের বিষয় নয়। এটা আমাদের যিম্মাদারী। দুচার দিন তালীম করলেই শরম ভেঙ্গে যাবে। নিজের যিম্মাদারী আদায় করার ক্ষেত্রে শরম করা বোকামী। আমাদের শরমের কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। যে ব্যাপারে শরম করার সে ব্যাপারে শরম করি না। যে ব্যাপারে করার নয় সে ব্যাপারে শরম করি। বেগানা নারীদের সাথে কথা বলতে, দেখা সাক্ষাত করতে শরম লাগার কথা ছিল, কিন্তু সেখানে শরম করি না। আর ঘরে মা-বোনকে, স্বামী-স্ত্রীকে সালাম দিতে শরম বোধ করার নয়, সেখানে শরম করি। ঘরে তালীম দেয়া জিম্মাদারী ছিল, এটা কোন শরমের বিষয় নয় অথচ এটাকেই শরম মনে করে বসে আছি। শরীয়তের দৃষ্টিতে শরম বলা হয় শরীয়তের খেলাফ কাজ করতে, গোনাহের কাজ করতে শরম বোধ হওয়াকে। অথচ আমরা শরীয়ত পালন করতেই শরম বোধ করি। অনেকে দাড়ি রাখতে শরম বোধ করে, অনেকে ইসলামী লেবাস-পোষাক পরিধান করতে শরম বোধ করে। যাহোক শরমের দোহাই দিয়ে ঘরে তালীম বর্জন না করা চাই।

ঘরে তা'লীমের ক্ষেত্রে আমাদের গাফিলতী অনেক বেশি। উদাসীনতা অনেক বেশি। এই গাফিলতী জারি থাকলে বাচ্চাদের এবং ঘরের মহিলাদের শিক্ষার ব্যবস্থা কী হবে? নারী সমাজের মধ্যে এমনিতেই জ্ঞানের খুব অভাব। যার ফলে তাদের মধ্যে নানান ধরনের কুসংস্কার মূলক ধ্যান-ধারণা অনেক ব্যাপক। তা'লীম ছাড়া তাদেরকে রক্ষা করার কোন উপায় নেই। আমাদের পুরুষদের দায়িত্ব তাদেরকে রক্ষা করা। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা হুকুম দিয়ে বলেছেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا.

অর্থাৎ, হে মুমিনরা! তোমরা জাহান্নাম থেকে নিজেদেরকেও এবং তোমাদের পরিবারকেও রক্ষা কর। (তাহরীম: ৬)

আল্লাহ পাক আমাদেরকে সবকিছু ভালভাবে বোঝার এবং আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বয়ান নং ৫০-এর খুতবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ خَلَقَ الْاِنْسَانَ وَكَرَّمَهٗ، وَكَانَ فِیْ ظُلُمَاتِ الْجَهْلِ فَعَلَّمَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِیْكَ لَهٗ شَهَادَةَ الْعَالِمِیْنَ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَیِّدَنَا وَنَبِیَّنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهُ الَّذِیْ اُوْتِیَ عِلْمَ الْاَوَّلِیْنَ وَالْاٰخِرِیْنَ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اِلٰی اَنْ یَّقُوْمَ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِیْنَ.

اَمَّا بَعْدُ :

اَیُّهَا النَّاسُ! اِنَّ صِحَّةَ الْاَعْمَالِ وَفَضَائِلَهَا مَبْنِیَّةٌ عَلَی الْعِلْمِ وَالْاِخْلَاصِ. وَاِنَّ الْاِخْلَاصَ رُوْحُ الْاَعْمَالِ. فَلَا تُقْبَلُ الْاَعْمَالُ اِلَّا اِذَا كَانَتْ مُقْتَرِنَةً بِالْاِخْلَاصِ. اَلَا وَاِنَّ هٰذِهِ الْقُلُوْبَ، هِیَ مَحَلُّ نَظَرِ عَلَّامِ الْغُیُوْبِ، وَاِنَّ اللّٰهَ لَا یَنْظُرُ اِلٰی جَسَدِكُمْ وَلَا اِلٰی صُوَرِكُمْ، وَاِنَّمَا یَنْظُرُ اِلٰی قُلُوْبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ، فَطَهِّرُوا الْقُلُوْبَ مِنَ الرِّیَاءِ فِی الْاَعْمَالِ، لِتَكُوْنَ اَعْمَالُكُمْ ذَخِیْرَةً فِی الْمَالِ، وَامْتَثِلُوْا قَوْلَ اللّٰهِ تَعَالٰی بِالصِّدْقِ وَالْیَقِیْنِ، وَمَا اُمِرُوْا اِلَّا لِیَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِیْنَ لَهُ الدِّیْنَ.

وَاعْلَمُوْا اَنَّ صِحَّةَ الْاَعْمَالِ مَوْقُوْفَةٌ عَلَی الْعِلْمِ بِهَا، وَالْاِمْتِثَالِ بِشَرَائِعِهَا وَطَرِیْقَتِهَا. وَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی فَرَضَ عَلٰی عِبَادِهٖ طَلَبَ الْعِلْمِ. قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِیْضَةٌ عَلٰی كُلِّ مُسْلِمٍ. فَالْاَعْمَالُ اِذَا لَمْ تَصِحَّ، لَا تُثَابُ عَلَیْهَا، بَلْ یُعَاقَبُ، وَمَثَلُهٗ مَا قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : رُبَّ قَارِئٍ یَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَیَلْعَنُهٗ.

اَیُّهَا الْعِبَادُ! وَاِنَّ فَضْلَ الْعِلْمِ كَبِیْرٌ، وَمَنْ تَعَلَّمَ عُلُوْمَ الدِّیْنِ فَلَهٗ خَیْرٌ كَثِیْرٌ، قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی : وَمَنْ یُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِیَ خَیْرًا كَثِیْرًا. وَقَالَ

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



النَّبِیُّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : مَجْلِسُ فِقْهٍ خَیْرٌ مِّنْ عِبَادَةِ سِتِّیْنَ سَنَةً. وَقَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَی الْعَابِدِ كَفَضْلِیْ عَلٰی اَدْنَاكُمْ. فَاسْتَبِقُوْا اِلٰی حُصُوْلِ الْعِلْمِ اَیْ عُلُوْمِ الْقُرْاٰنِ وَالسُّنَّةِ. وَبَعْضُ النَّاسِ یَتَفَقَّدُ اَحْوَالَ الْعُلَمَاءِ، وَیَنْظُرُ اِلٰی زَلَّاتِهِمْ وَیَقْطَعُ التَّعَلُّقَ بِهِمْ وَیَعْرِضُ عَنْ هٰذَا الْعِلْمِ، وَذَالِكَ مَذْمُوْمٌ. وَتَذَكَّرُوْا مَا قَالَ الرَّسُوْلُ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : اِتَّقُوْا زَلَّةَ الْعَالِمِ وَلَا تَقْطَعُوْهُ وَانْتَظِرُوْا فَیْئَتَهٗ. رَوَاهُ فِیْ مُسْنَدِ الْفِرْدَوْسِ لِلدَّیْلَمِیْ وَكَنْزِ الْعُمَّالِ.

وَاعْلَمُوْا اَنَّ الْغَرَضَ مِنَ الْعِلْمِ الْعَمَلُ، وَاِلَّا یَكُوْنُ كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی : كَمَثَلِ الْحِمَارِ یَحْمِلُ اَسْفَارًا. فَتَعَلَّمُوْا عُلُوْمَ الْقُرْاٰنِ وَالسُّنَّةِ لِلْعَمَلِ، وَعَلِّمُوْهَا الْاَوْلَادَ وَالْاَهْلَ، وَقُوْهُمْ نَارًا. قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی : یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا قُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِیْكُمْ نَارًا. اَلْاٰیَةِ.

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ : یَرْفَعُ اللّٰهُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِیْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ. وَقَالَ تَعَالٰی : اِنَّمَا یَخْشَی اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا.

بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِیْ عُلُوْمِ السُّنَّةِ وَالْقُرْاٰنِ، وَنَفَعَنَا وَاِیَّاكُمْ بِمَا فِیْهِ مِنَ الْاٰیَاتِ وَالْبَیَانِ. اَقُوْلُ قَوْلِیْ هٰذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ لِیْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِیْنَ وَاسْتَغْفِرُوْهُ، اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ.

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

সমস্ত জুমুআর জন্য ছানী খুতবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ، وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ، مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَّعْصِهِمَا فَقَدْ غَوٰى.

اَمَّا بَعْدُ :

فَيَا اَيُّهَا النَّاسُ! اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ فِيْ كِتَابِهٖ اِرْشَادًا لَّنَا وَتَعْلِيْمًا : اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ، يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا. اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اِمَامِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ.

اَيُّهَا النَّاسُ! اِسْتَقِيْمُوْا عَلَى الْاِيْمَانِ، فَاِنَّ الْاِيْمَانَ مَبْنَى الْاَعْمَالِ، وَاِنَّ الْاَعْمَالَ بِدُوْنِ الْاِيْمَانِ كَالسَّرَابِ فِي الْقِيْعَانِ، قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ. وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ ، فَاِنَّهٗ تَعَالٰى لِعِبَادَتِهٖ خَلَقَكُمْ، قَالَ تَعَالٰى : وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ. وَاَخْلِصُوْا لِلّٰهِ الْاَعْمَالَ، فَاِنَّ الْاِخْلَاصَ رُوْحُ الدِّيْنِ، قَالَ تَعَالٰى : وَمَا اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ، وَحَافِظُوْا عَلَى الصَّلَاةِ مَعَ الْجَمَاعَةِ، فَاِنَّهَا اَوَّلُ مَا تُحَاسَبُ بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاتَّقُوا اللّٰهَ تَعَالٰى بِامْتِثَالِ الْمَامُوْرَاتِ وَاجْتِنَابِ السَّيِّئَاتِ، فَاِنَّ التَّقْوٰى اَسَاسُ الْحَسَنَاتِ وَرَأْسُ الطَّاعَاتِ. وَاِيَّاكُمْ وَحُبَّ الدُّنْيَا، فَاِنَّ حُبَّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيْئَةٍ. وَاِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ، فَاِنَّ الْكِذْبَ اُمُّ الْفُجُوْرِ. وَاِيَّاكُمْ

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.



وَالْغِيْبَةَ، فَاِنَّهَا اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا. وَاِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْاُمُوْرِ، فَاِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. وَعَلَيْكُمْ بِامْتِثَالِ السُّنَّةِ، فَاِنَّ فِيْ اِمْتِثَالِ السُّنَّةِ، فَلَاحَ الْاُمَّةِ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ. وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : اَللّٰهَ اَللّٰهَ فِيْ اَصْحَابِيْ، لَا تَتَّخِذُوْهُمْ غَرَضًا بَعْدِيْ، فَمَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّيْ اَحَبَّهُمْ، وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِيْ اَبْغَضَهُمُ الْحَدِيْثُ. وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : اَرْحَمُ اُمَّتِيْ بِاُمَّتِيْ اَبُوْ بَكْرٍ، وَاَشَدُّهُمْ فِيْ اَمْرِ اللّٰهِ عُمَرُ، وَاَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ، وَاَقْضَاهُمْ عَلِيٌّ، وَفَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ، وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ. رِضْوَانُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْنَ. وَارْضَ اللّٰهُمَّ عَنِ الْبَاقِيْنَ مِنَ الْعَشَرَةِ، وَعَنِ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا تَحْتَ الشَّجَرَةِ، وَارْضَ اللّٰهُمَّ عَنْ عَمِّيْ نَبِيِّكَ حَمْزَةَ وَالْعَبَّاسِ، وَعَنْ زَوْجَاتِ نَبِيِّكَ الطَّاهِرَاتِ مِنَ الْاَرْجَاسِ.

اَللّٰهُمَّ اَعِزَّ الْاِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَاَذِلَّ الشِّرْكَ وَالْمُشْرِكِيْنَ، وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَ الدِّيْنَ، وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَ الْاِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَاخْتِمْ لَنَا بِخَاتِمَةِ السَّعَادَةِ اَجْمَعِيْنَ. اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِجَمِيْعِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَالْاَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْاَمْوَاتِ، اِنَّكَ مُجِيْبُ الدَّعْوَاتِ. اٰمِيْنَ يَا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ!

عِبَادَ اللّٰهِ! اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ، وَاِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ. فَاذْكُرُوْنِيْ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ.

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.